P 3027

বাসন্তী

নব পর্য্যায়।

প্রথম বর্ষ] ২৪শে আষাঢ়, ১৩২৯। [প্রথম সংখ্যা

বোম্বাই পাওয়াই হ্রদের মনোরম দৃশ্য।

পুনরাবির্ভাব।

(শ্রীবিজয়রত্ন মজুমদার।)

বাঙ্গালা দেশে আর যারই অভাব থাক্, দৈনিক, সাপ্তাহিক এবং মাসিক পত্রিকার অভাব নাই। দরকারের চেয়ে অনেক বেশী সংখ্যক কাগজ বাহির হইয়াছে এবং হইতেছে। এই আধিক্য শুধু বঙ্গদেশে নয়, সংবাদ পাওয়া যায়, সমস্ত ভারতবর্ষেই দেখা যাইতেছে।

আজকালকারদিনের এ ব্যাধটা যেমন অত্যন্ত সাধারণ সহজ হইয়া উঠিয়াছে, লোকের মনে একটা তুচ্ছ তাচ্ছিল্যের ভাব ও জন্মাইতে দেখিতেছি। প্রয়োজনাতিরিক্ত দ্রব্য, বিশেষ যাহা আবার মূল্য দিয়া ক্রয় করিতে হয়, লোকের কাছে কদর পায় না। বঙ্গদেশে বর্ষাকালের ছত্রকের মত যে বহু সংখ্যক কাগজ জন্মাইতেছে, তাহার কতগুলি মরিবে, কতক বাঁচিবে। জগতেরও এই ধারা, বিশ্ব সৃষ্টির এই নি[illegible] আজ যাহা নাই কাল তাহা আসিবে এবং আজ যাহা আছে কাল তাহার দেখা না পাওয়াটা আশ্চর্য্যের নহে।

যাওয়া-মরা লইয়া কথা নয়, কথা হইতেছে, এতগুলি কাগজ হইবার কি কারণ? উদ্দেশ্য বা কি? এবং ইহার কোন প্রয়োজন আছে কি না! প্রয়োজন আছে। ওকালতির প্রয়োজনের সময় এই আসিয়াছে। ধারণা হয় চারিজন লোকের মনে ভ্রান্ত ধারণা থাকিতে পারে এবং সেই ধারণার বশেই তাঁহারা এই অত্যাবশ্যকীয় সাহিত্য প্রচার-কার্য্যেও অশ্রদ্ধা প্রকাশ করিয়া থাকেন, করুন, কিন্তু প্রয়োজন আছে।

দেশের বর্ত্তমান যে অবস্থা, তাহাতে শিল্প উন্নতির ইহাপেক্ষা মাহেন্দ্রক্ষণ ইতি পূর্ব্বে আসিয়াছে কি না সন্দেহ; শিল্প বিস্তারের পূর্ব্বে শিক্ষা বিস্তার যদি না হয়, শিল্প কতদিন স্থায়ী হইতে পারে? আজ যদি দেশে রাজনীতি, সমাজনীতি, ধর্ম্মনীতি, শিল্প, বাণিজ্য, কৃষি, সাহিত্য, গণিত, স্বাস্থ্য, চিকিৎসা, দর্শন, বিজ্ঞান, প্রভৃতি সমুদয় জ্ঞাতব্য বিষয়কে কেন্দ্র করিয়া এক একখানি স্বতন্ত্র কাগজ প্রকাশিত হয় তাহাতে কোভের বস্তু ত নাই-ই, আনন্দের কারণ প্রচুর পরিমাণে আছে।

আজ দেশের যে অবস্থা, তাহাতে রাজশক্তি উদ্বেলিত, প্রজাশক্তি সংক্ষুব্ধ; রাজা ও প্রজার মনে শান্তি নেই, অথচ দুয়ের মধ্যে অশান্ত চেষ্টা চলিয়াছে ঐ শান্তি স্থাপনের জন্য। উভয়ের পথ উভয়েই বাছিয়া লইয়াছে। পথটি অতিক্রম করিতে উভয়ের একাগ্রতার সীমা নাই এবং দৃঢ়তাও আছে। ফল সংঘর্ষ অবশ্যম্ভাবী!

একটা চিরপদানত জাতির উন্নতির পথের অন্তরায় সরাইতে হইলে একের উন্নতিতে যদি অপরের স্বার্থ হানির সম্ভাবনা থাকে তবে তাহা হইতে কত বিরোধ যে সৃষ্টি হয় তাহার কি কোন সংখ্যা আছে? একের দ্রুত অগ্রগমনে বাধা দিতে হইলে হয় পিছন হইতে তাহার ঘাড় কামড়াইয়া ধরিতে হয়, নয় তাহার সামনে পিঞ্জরের ঘোড়া উঠাইতে হয়!—কথা এক!

যাঁহাদের মতে ভারতবর্ষ নিদ্রাভঙ্গে সাড়া দিয়া উঠিয়াছে, চলিতে সুরু করিয়াছে, তাঁহারাই নিঃসন্দেহে বলিতে পারেন, তাহাকে পাড় ঘুম-ঘোরে ডুবাইবার চেষ্টা ও যত্ন কম চলিতেছে না। এই জাগরণ ও উৎকট "ঘুম-পাড়ানী" গানের মধ্যে দেশটা থম্‌থমে হইয়া দাঁড়াইয়া আছে। একটা শঙ্কা, একটা ব্যাকুলতা, একটা অদম্য আত্মনির্ভরতা, একটা অসাধারণ দৃঢ়তা সমগ্র জাতির মূলে জমিয়া উঠিয়াছে! অপর দিকেও শঙ্কা আছে, ব্যাকুলতা আছে, দৃঢ়তারও বিন্দুমাত্র অভাব নাই, বাড়ার ভাগ এমন অনেক জিনিষ আছে যাহার কল্পনা করাও অঙ্কের ক্ষমতাতীত! প্রস্তুত উভয়ে—শুধু ক্ষণটির প্রতীক্ষায় নীরব, নিথর।

এ যদি না সাহিত্য প্রচারের উপযুক্ত কাল হয় ত আর সে কবে? দেশের সাহিত্য এখনই যদি কোন কাজ না করিতে পারে ত কবে করিবে? এই ত সৃষ্টির কাল, এই প্রচারের উপযোগী সময়ের আজ কবির মনে দেশের বর্ত্তমান অবস্থাই জাগিয়া আছে, দার্শনিক অদৃশ্য-জগতে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া এই সমস্যার সমাধানেই নিযুক্ত; সংগ্রাহকগণ আজ সারা জগতের স্রোতের সংবাদ দিয়া বেড়াইতেছেন, শিক্ষক শিক্ষিকা ছাত্রদের মনে এই দেশাত্মবোধ জাগাইতে যত্নপরায়ণ হইয়াছেন, এই ত নূতন গান গাহিবার সময় আসিয়াছে। আজই "বাসন্তীর" পুনরাবির্ভাবের প্রয়োজন। দেশময় ভাগিরথীর চির-ধ্বনিত কুলুকুলুনির মত যে অবিরাম সুর-লহরী ভাসিয়া বেড়াইতেছে, "বাসন্তী" তাহারই একটায় তাহার গলা মিলাইবে! তাহার গানে মা'য়ের তুষ্টি হইবে কি-না জানি-না তবে মা'য়ের কাছে কোনটাই উপেক্ষার নয় বলিয়াই বিশ্বাস করি যে সন্তানের সত্য-চেষ্টায় জননীর তুষ্টিই সম্ভব!

বাংলার জীবনের সহিত বাংলার সাহিত্যের যেন কোন সম্পর্ক নাই। জাতীয় জীবনের সত্য মরম উপলব্ধি করিয়া তাহা হইতে যে সাহিত্য বিকাশ লাভ করে সেই সাহিত্যেই দেশের লোকের প্রাণে সাড়া দিতে পারে। সেই সাহিত্যই জাতিকে নব জীবনের আশার বাণী শুনাইতে পারে। দেশের মরমের সহিত যে সাহিত্যের যোগ আছে সেই সাহিত্যই দেশের প্রাণ সঞ্চার করিতে পারে। তেমনি সাহিত্য আজ দেশের জনসাধারণ চাহে। তেমনি সাহিত্যিক আজ বাংলায় চাই, যাঁহারা জাতিকে দেশকে পথ নির্দেশ করাইতে পারেন।

• • • •

বাংলায় নিত্য রাশি রাশি উপন্যাস ও কবিতার বহি ছাপা হইতেছে। বিজ্ঞাপনের জোরে তাহা বাংলায় চলিতেছেও। প্রেম ও চুম্বনের ছড়াছড়িতে প্রেমের নব নব সংজ্ঞা নির্দেশে সে উপন্যাস ও কবিতা গ্রন্থগুলির কলেবর পূরিত। কিন্তু যে প্রেমে জাতির জীবনকে মধুময় করিয়া তোলে, যে প্রেম-প্রবাহ জাতির জীবনে সত্য সঞ্জীবনী সুধা বিতরণ করে তেমন প্রেম লইয়া একখানি উপন্যাসও বোধ হয় বৎসরে বাহির হয় না। উপন্যাসও এপিক হিসাবে রচিত হইতে পারে, উপন্যাস ও মহাকাব্যের পর্য্যায় ভুক্ত হইতে পারে, তাহাও যুগে যুগে দেশবাসীর হৃদয়ে চির নূতন থাকিয়া আলোকে সম্পাত করিতে পারে। কিন্তু তেমন উপন্যাস রচনার প্রচেষ্টা আমাদের দেশে হইতেছে কোথায়? বর্ত্তমান যুগে দু'একজন ভিন্ন তেমন প্রেম কাব্যের কবিই বা কোথায় দেখিতেছি?

• • • •

জাতীয় সাহিত্য আজ এতকাল পরে জাতির বিশ্ব-বিদ্যালয়ে স্থান পাইতে চলিয়াছে। জাতির শ্রেষ্ঠ কবি আজ দেশের বিশ্ব বিদ্যালয়ে সম্মান লাভ করিতেছেন এগুলি আশার কথা সন্দেহ নাই। যে সম্পদ না পাইয়া জাতি এতদিন লজ্জায় অধোবদন ছিল আজ সে সম্পদ পাইয়া তাহা রক্ষা করিবার যোগ্যতা যেন জাতি অর্জ্জন করিতে পারে। সত্য মনীষার দান সত্য হৃদয়ের উৎসের ক্রীড়া যেন সাহিত্যিকগণ সাহিত্যের নানা বিভাগে ফুটাইয়া জাতীয় সাহিত্যকে গৌরব মণ্ডিত করিতে পারে।

•

জাতির জীবনে আজ নব ভাবের নূতন স্রোত আসিয়াছে। জাতি আজ কি যেন আশার আলো দেখিতে পাইয়া উন্মুখ আগ্রহে তাহার পানে ছুটিয়া চলিয়াছে। এ আশার স্বপনকে সত্য জীবনে সার্থক করিয়া তুলিতে হইলে, জাতিকে মনে প্রাণে সাধনা করিতে হইবে। তাহার জাতীয়তার উৎস সন্ধান করিয়া খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে। হারাণ প্রাণকে আবার ফিরিয়া পাইতে হইবে।

সকল দেশের ইতিহাস আলোচনা করিয়া দেখিলে দেখা যায়, যে দেশে যত কিছু মহৎ ও উন্নতির আন্দোলন আসিয়াছে সাহিত্যিকেরাই তাহার অগ্রদূত হইয়া জাতিকে আশার আলোকে পথ দেখাইয়া লইয়া চলিয়াছেন। জাতির প্রাণের অবস্থা বুঝাইবার জন্য তাহার মরম কথা শুনাইবার জন্য সাহিত্যের মত বোধ হয় আর কোনও জিনিস নাই। তাই নব যুগের এ আন্দোলনকে সার্থক করিতে হইলে প্রাণবান সাহিত্য সাধক আজ জাতির চাই। সাহিত্যের একনিষ্ঠ সাধক, আজ জাতিকে তাহার মরম কথা শুনাইয়া তাহাকে পথ দেখাইয়া লইয়া চল।

• • • •

অনশন অর্দ্ধাশন, সহজ অভাবে সমগ্র দেশটা হাহাকার করিতেছে। দেশের জন সমাজ আজ প্রাণে মরিয়া প্রাণহারা হইয়া কোনরূপে জীবন ধারণ করিতেছে। এই জড় জনসমাজে জীবন সঞ্চার করিতে হইলে সহস্র মূক মুখে আজ ভাষা ফুটাইয়া তুলিতে হইবে। আবার তাহাদিগের শুষ্ক হৃদয় পদ্মকে মুকুলিত করিয়া তুলিতে হইবে।

মানুষের জন্ম গত অধিকার, জাতি গত অধিকার, দেশবাসী পুরুষ সমাজের কতকগুলি অধিকার ও নারী সমাজের কতকগুলি বিশিষ্ট অধিকার আছে। এই অধিকার তাহাদের মধ্যে সজাগ করিয়া তুলিতে হইবে, অধিকারের যোগ্যতা অর্জনে তাহাদিগের সাহায্য করিতে হইবে, তাহাদিগকে পথ দেখাইয়া দিতে হইবে। তবে জন ও সমাজ আবার নিজের পায়ের উপর ভর দিয়া দাঁড়াইতে শিখিবে, তবে আবার দেশবাসী সুপ্রতিষ্ঠিত হইবে।

• • • •

আজ দেশ বাসীর মুখে হাসি নাই, নয়নে উৎসাহ ও আনন্দের দীপ্তি নাই। দেহে যেন স্পন্দনের সাড়া পাওয়া যায় না। কেন দেশের এ অবস্থা হইল, আজ দেশের উন্নতিকামী প্রত্যেককে ইহার সন্ধান লইতে হইবে, এ হারানো আনন্দ উল্লাস আবার ফিরাইয়া আনিতে হইবে। ইহাতেই সাহিত্যিকের কৃতিত্ব, ইহাতেই দেশসাহিত্য ও জাতীয় সাহিত্য গড়িয়া উঠিবে। দেশের প্রাণ—দেশের সাহিত্য সহজ ভাবে বিকশিত হইয়া উঠিবে।

• • • •

আজ নব প্রকাশের নূতন আনন্দের দিনে আমরা দেশবাসীকে সহস্র অভিবাদন করিতেছি। আমাদের এ প্রচেষ্টা এ আশা যেন সাফল্যে মণ্ডিত হয়। আজ সাহিত্যের প্রাঙ্গনে দাঁড়াইয়া শত আশা ও কল্পনার কত উন্মাদ নৃত্য দেখিতেছি,—নব জীবনের বিকাশধারা আজ যেন দেবী মূর্তি পরিগ্রহ করিয়া আমাদিগকে পথ দেখাইয়া লইয়া চলিয়াছেন। আজ কত কথাই মনে আসিতেছে—এ পূর্ণিমার রজনী যেন আমরা জীবন ভরিয়া উপভোগ করিয়া লইতে পারি।

• • • •

শ্রীনিবাস শাস্ত্রী মহাশয় পৃথিবী ভ্রমণ করিতেছেন, ভারতবাসী তাঁহার এই বিশ্ব-ভ্রমণের খরচ যোগাইতেছে। অভাগা দেশের অভাগা অধিবাসীরা গাঁটের কড়ি দিয়া দুনিয়া ঘুরে কেমন করিয়া শাস্ত্রী মহাশয় সেইটাই দেখাইবার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়া গেছেন। ভারতবাসীর অর্থে দেশ ভ্রমণ করিয়া তিনি জগতে যেখানেই ভারতবাসী আছে তাহাদের জন্য একটা আসন খুঁজিতে গেছেন। অর্থাৎ ভারত বিশ্ববাসীর দোরে হাতজোড় করিয়া যে কাকুতি করিতেছে তিনি যেন তাহারই বাণী লইয়া, তাহাদেরই মুখপাত্র স্বরূপ গিয়াছেন। শাস্ত্রী মহাশয় ভারতের অর্থে ভারতবাসীর জন্য কতটা উপকার করিতেছেন, তাহা কি এখনও বুঝিতে কাহারো বাকী আছে?

• • • •

ভারতবাসীর কথা বাড়াইতে গিয়া ভারতের নবযুগের ঈশ্বর প্রেমের অবতার গান্ধীর কথায় বলিয়াছেন—গান্ধী একজন দার্শনিক রাজদ্রোহী। সাধু, সাধু! রাজদ্রোহী অনেক রকমের থাকিতে পারে কিন্তু দার্শনিক রাজদ্রোহী কি-রকমের তাহা জানি না। কথাটা স্পষ্ট করিয়া বলা উচিৎ ছিল।

• • • • •

অবশ্য তিনি গোড়া কাটিয়াছেন, কিন্তু সেই সঙ্গে গাছের আগায় জল ঢালেন নাই, এমন কথা আমরা বলিতে পারি না। তাঁহার মতে, মহাত্মা গান্ধী একজন মহৎ আদর্শ সম্পন্ন ব্যক্তি, পৃথিবীতে যাঁহার তুলনা নাই। শাস্ত্রী মহাশয় ভারতবাসীর নিমক খাইয়াছেন, হারামী করিবেন কেন? আবার তাহাদেরও মন ত রাখা চাই, যাহারা অর্থে বসন দিয়াছে, গমনাগমনে যান বাহন দিয়াছে, পিতৃ-পিতামহের দেওয়া নামের উপরে খেতাব দিয়াছে।

• • • •

বঙ্গসাহিত্যের স্বপ্ন মূর্তি সত্যসত্যই সফল হইতে চলিল। সার আশুতোষ! তোমার তুলনা নাই। বাঙ্গালীর সোনার চাঁদ ছেলেরা বানর না হইয়া মানুষের মত, বাঙ্গালীর মত বাঙ্গালী হইতে পারিবে। যে ভিত্তি তুমি আজ গাঁথিয়া তাহাদের জ্ঞানের গৃহ তুলিতে চাহিতেছ, সে ভিত্তি চিরস্থায়ী হোক্, ইহাই আমরা কামনা করি।

•

রোকশোধ

(শ্রীনারায়ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য)

প্রথম পরিচ্ছেদ

শীতের কুহেলিকাচ্ছন্ন প্রভাতে লুপ লাইনের বোলপুর ষ্টেশনের তার বাবু তারানাথ পাবুলী ওভার কোটটা গায়ে জড়াইতে জড়াইতে সবেমাত্র অফিস ঘরে ঢুকিয়াছে, এমন সময় ঝন্ ঝন্ শব্দে তারের 'বেল' বাজিয়া উঠিল। বিরক্তভাবে টুলখানা অধিকার করিয়া তারানাথ বৈদ্যুতিক সংবাদ সংগ্রহ করিতে লাগিল। সংবাদ আসিল—

"মধুপুর, কল্যাণকুঞ্জ
"তারানাথ পাবুলী, বোলপুর ষ্টেশন,
"ইওর অকালস্ কেস্ সিরিয়াস্ কম্ সার্প—
ডাঃ এম্ বোস।"

সংবাদটা পড়িতেই তারানাথের পা হইতে মাথা পর্য্যন্ত কাঁপিয়া উঠিল। এমন দারুণ শীতেও তাহার কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম দেখা দিল।

সর্ব্বনাশ, এই সেদিন যে সংবাদ পাইল, তাহার মামা দীননাথ চক্রবর্ত্তী ম্যালেরিয়া ও কালাজ্বরের হাত হইতে কিছুতেই নিষ্কৃতি না পাইয়া বায়ু পরিবর্ত্তনের জন্য মধুপুর অঞ্চলে যাত্রা করিয়াছেন। ইহা বোধ হয় মাস খানেক আগেকার কথা। এখানে বদলী হইয়া আসিবার সপ্তাহ দুই পরেই মাতুলানীর পত্র আসিয়াছিল। ইহারই মধ্যে এমন কি হইল, যাহাতে 'কেস সিরিয়াস্' হইয়া উঠিল, এবং অবিলম্বে উপস্থিত হইবার জন্য তাহাকে ডাক পড়িল।

ষ্টেশনের কুলী তিকনলাল তামাক দিয়া গেল। হুঁকায় মৃদুমন্দ টান দিতে দিতে তারানাথ এক্ষণে কর্ত্তব্য কি তাহাই ভাবিতে লাগিল।

বাল্যে পিতামাতা উভয়কে হারাইয়া তারানাথ মামার বাড়ীতেই মানুষ হইয়াছিল। মামার যথেষ্ট বিষয় সম্পত্তি ছিল, কিন্তু সন্তান সন্ততি কিছুই ছিল না। সুতরাং মামার কাছে না হউক, মামীর কাছে তারানাথ যে স্নেহ যত্ন লাভ করিয়াছিল, তুলনায় তাহা মাতৃস্নেহের সমকক্ষ না হইলেও এক সময়ে তাহাই তারানাথের যথেষ্ট লোভনীয় হইয়াছিল। মামীর স্নেহ-যত্নে মা-মরা ছেলে বলিয়া তারানাথকে কোন দিন দুঃখ করিতে হয় নাই।

মামার প্রকৃতি কিন্তু স্বতন্ত্র ছিল। এক কথায় নগদ দশ হাজার টাকা গণিয়া দিতে সম্মুখ হইলেও বিশেষ বিবেচনা ও রীতিমত হিসাব না করিয়া তিনি একটী পয়সাও খরচ করিতেন না। তা ছাড়া তাঁহার মেজাজে এমন একটা রুক্ষতা ছিল, যাহাতে তারানাথ কোন দিনই মামাকে চক্ষু বা অধর চক্ষে দেখিতে পারে নাই। ছেলেবেলায় সে মামাকে যমের মত ভয় করিত, বড় হইয়া তাহাকে বিরাগের দৃষ্টিতে দেখিত।

লেখাপড়া যা কিছু মামীর টানেই হইয়াছিল। তাহাও প্রবেশিকা পর্য্যন্ত। প্রবেশিকা পরীক্ষায় অনুত্তীর্ণ হইয়া তারানাথ যখন আর এক বৎসর পড়িবার সংকল্প করিল, মামা তখন রসপুরের মতি মুখুর্জ্যের চোদ্দ বছরের অরক্ষণীয়া মেয়েটীকে ঘরে আনিয়া ব্রাহ্মণকে কন্যাদায় হইতে উদ্ধার করিবার জন্য তারানাথকে অনুরোধ করিতে লাগিলেন; তিনি ভাগ্নিনেয়কে বুঝাইয়া দিলেন যে, এক বৎসরের পড়িবার খরচ পঞ্চাশ টাকার কম নহে, কিন্তু বিবাহটা হইয়া গেলে যদি নগদ এক হাজার টাকা পাওয়া যায়, তবে মাসিক শতকরা এক টাকা সুদ ধরিলেও এক বৎসরে শতকরা কুড়ি টাকা হইবে; পড়ার খরচ বাদ দিলেও ষাট টাকা লভ্য থাকে। সুতরাং বিবাহ সম্পন্ন করিয়া পড়াশুনা করিবে, তাহাতে লাভ ভিন্ন ক্ষতি কিছুই নাই।

লাভের আশায় না হউক, মামার আদেশ এবং মামীর সস্নেহ অনুরোধ উপেক্ষা করিতে না পারিয়া তারানাথ বিবাহে সম্মতি দিল, বিবাহ হইয়া গেল। কিন্তু স্ত্রীর মসীনিন্দিত বর্ণ ও শানিত শায়ক অপেক্ষা তীক্ষ্ণ বচনাবলী তারানাথের চিত্তে একটা বিরক্তি আনিয়া দিল যে, পড়া দূরের কথা, মাতুলের অন্নেও তাহার অরুচি জন্মিয়া গেল। সে কলিকাতায় গিয়া চাকরীর চেষ্টা করিতে লাগিল, এবং অনেক ঘুরিয়া ফিরিয়া শেষে টেলিগ্রাফের কাজ শিখিতে আরম্ভ করিল।

মাস কতক কাজ শিখিয়া তারানাথ রেলওয়ে আপিসে প্রবেশ করিল এবং বছর খানেক এখানে সেখানে ঘুরিয়া মাস ছয়েক আগে বোলপুর ষ্টেশনে বদলী হইয়া আসিয়াছে। ইহার মধ্যে সে দুই তিন-বার বাড়ীতে গিয়াছিল। কিন্তু মাস ছয়েক আগে শেষ বার বাড়ীতে গিয়া যখন দেখিল যে বধূ জ্ঞানদা-সুন্দরী কতকগুলি তীব্র বাক্যবাণ লইয়া তাহার জন্য অপেক্ষা করিতেছে, তখন তারানাথ দুই দিন মাত্র বাড়িতে থাকিয়াই এবং জ্ঞানদা এখানে থাকিতে

আর কখন এখানে আসিবে না, মামীর নিকট এইরূপ শপথ করিয়া চলিয়া আসিয়াছিল। তারপর সে দুই তিনখানা পত্রে মামার অসুখের সংবাদ পাইয়াছে, কিন্তু জানদার ভয়ে মামাকে দেখিতে পর্য্যন্ত যায় নাই।

তারে সেই মামার কঠিন অসুখের সংবাদ পাইয়া তারানাথ বিচলিত হইয়া পড়িল। মামার উপরে রাগ করিয়া থাকিলেও মামী যে বিদেশে তাঁহাকে লইয়া বিপন্ন হইয়া পড়িয়াছেন, এবং তজ্জন্যই সত্বর যাইবার জন্য তারানাথকে আহ্বান করিয়াছেন ইহা বুঝিয়া লইয়া তারানাথ তথায় যাইবার জন্য উৎসুক হইয়া পড়িল। তা ছাড়া মামার বিষয়-সম্পত্তি গুলার কথা ভাবিয়াও সে এ সময়ে না যাওয়াটা নিতান্ত অনুচিত জ্ঞান করিল। অপুত্রক মাতুলের স্থাবর অস্থাবর সমগ্র সম্পত্তিতেই তাহার অধিকার থাকিলেও এ সময়ে উপস্থিত না হইলে মামা যদি সে গুলার অন্যরূপ ব্যবস্থা করিয়া যান, তা ছাড়া নগদ টাকাগুলা যদি বেহাত হইয়া যায়! মামার এক জ্ঞাতি ভাইপো আছে, বিষয়ের লোভে সে সময়ে সময়ে খুড়া মহাশয়ের সহিত আত্মীয়তা প্রকাশ করিতে আসে, অনুচিত তোষামোদ বাক্যদ্বারা খুড়ার অনুগতা, স্বীকার পূর্ব্বক তাঁহার অনুরাগ আকর্ষণের চেষ্টা করে। তারানাথ কাছে না থাকিলে মামা যদি সেই হতভাগাকেই সর্ব্বস্ব দিয়া যান? অবশ্য মামী সহজে ইহা ঘটিতে দিবেন না, কিন্তু মেয়ে মানুষ তিনি, বিদেশে তাঁহার সহায় সম্পদ কে আছে? ইহা ছাড়া টেলিগ্রাম পাইয়াও তারানাথ যদি নিশ্চিন্ত থাকে, তাহা হইলে রাগের মাথায় মামীমাও মামার মতেই মত দিতে পারেন। সুতরাং তারানাথকে যাইতেই হইবে।

কিন্তু ছুটী যদি না পায়? উপরে দরখাস্ত করিয়া ছুটী লইবার সময় নাই; ষ্টেশনমাষ্টারকে দুইটা কথা বলিয়াই যাত্রা করিতে হইবে। মাষ্টার বাবু যদি ছুটী না দেন? ছুটী না দেন, তারানাথকে চাকরী ছাড়িয়াই ছুটিতে হইবে। ত্রিশ টাকা মাহিনার চাকরির আশায় সে নগদ ও সম্পত্তিতে পনেরো ষোল হাজার টাকার লোভ ত্যাগ করিতে পারে না; তারানাথকে অতঃপর চাকরীই বা করিতে হইবে কেন? মামার বিষয় পাইলে সে চাষবাস ও তেজারতি কারবার করিয়া পায়ের উপর পা দিয়া খাইতে পারিবে।

ঘন ঘন শব্দে বেল বাজিয়া উঠিল। তারানাথ হুঁকা রাখিয়া ঘড়ি ধরিয়া দেখিল, একখানা ডাউন গুড্‌স্ ট্রেণ (মালগাড়ী) আসিতেছে। পয়েণ্ট ম্যানকে বেল দিতে আদেশ দিয়া তারানাথ পকেট হইতে ঘড়ী বাহির করিয়া দেখিল, ৭টা ৩৫মিনিট। আর আধ ঘণ্টা পরেই আপ্ প্যাসেঞ্জারখানা আসিবে। তারানাথ টেলিগ্রাম হাতে ষ্টেশন মাষ্টারের কাছে ছুটিল।

মাষ্টার বাবু ছুটী দিতে ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন। কিন্তু ছুটী না পাইলে তারানাথ চাকরীর মায়া ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইবে, দৃঢ়তার সহিত এই সঙ্কল্প জানাইয়া দিল, তখন অগত্যা ষ্টেশন-মাষ্টার তাহাকে ছুটী দিলেন, কিন্তু তাহার চাকরীর সম্বন্ধে উপরওয়ালারা কিরূপ ব্যবস্থা করিবেন তাহা ঠিক বলিতে পারিলেন না। তারানাথও সে জন্য কিছুমাত্র চিন্তিত না হইয়া আপনার ট্রাঙ্কটীর ভিতর কাপড় চোপড় হইতে হুঁকা কলিকাটি পর্য্যন্ত পুরিয়া ৮টা ৭মিনিটের আপ্ প্যাসেঞ্জারে উঠিয়া বসিল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

অনেক জিজ্ঞাসাবাদের পর খুঁজিয়া খুঁজিয়া তারানাথ যখন কল্যাণকুঞ্জের সম্মুখে দাঁড়াইল, তখন সন্ধ্যার ধূসর ছায়ার সহিত দীপের ঝুঙ্কাটিকা মিশিয়া একটা অতি গভীর মেঘের সৃষ্টি করিতেছিল। সেই অন্ধকারের মধ্যে 'কল্যাণ কুঞ্জ' যেন একটা গভীর অকল্যাণের ছায়া লইয়া স্থির অসাড় ভাবে দাঁড়াইয়াছিল। তারানাথ সশঙ্কিতপদে অগ্রসর হইয়া জোরে জোরে দরজায় কড়া নাড়িতেই অনেক হিন্দুস্থানি ভৃত্য আসিয়া দরজা খুলিয়া দিল, এবং তারানাথকে কোনকথা জিজ্ঞাসা না করিয়াই ভিতরে আসিবার জন্য সসম্ভ্রমে আহ্বান করিল। তাহার ভাব দেখিয়া বোধ হইল, সে যেন তারানাথের জন্যই প্রতীক্ষা করিতেছে। তারানাথ দরজায় ঢুকিতে ঢুকিতে মাতুলের অবস্থা জিজ্ঞাসা করিলেন, ভৃত্য তাহার দুর্ব্বোধ্য ভাষায় অনেকগুলো কথা বলিয়া একটা ঘরের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিল। তারানাথ জুতার মাথা হইতে ষ্ট্রাপ নামাইয়া লইয়া পরনা দিয়া তাহাকে বিদায় করিল। তারপর ধীরে ধীরে ভৃত্যের অঙ্গুলিনির্দ্দিষ্ট কক্ষের দিকে অগ্রসর হইল।

ঘরের দরজা ভেজান ছিল, হাত দিয়া ঠেলিতেই খুলিয়া গেল। তারানাথ ঘরে ঢুকিয়া আর্ত্তকণ্ঠে ডাকিল, "মামা"!

"কিন্তু কোথায় মামা?" তারানাথ আসে সঙ্কোচে বিস্ময় সূচক শব্দ করিয়া দুই পা পিছাইয়া দাঁড়াইল। সম্মুখে পরিষ্কৃত শয্যার উপর এক প্রৌঢ়বয়স্ক ব্যক্তি নিমীলিত নেত্রে শবের মত পড়িয়াছিলেন; তাঁহার রোগপাণ্ডুর মুখের উপর মৃত্যুর করাল ছায়া যেন জমাট বাঁধিয়া বসিয়াছিল। তাহার কাছে এক অনিন্দ্যসুন্দরী পঞ্চদশ বর্ষীয়া কিশোরী বসিয়া ব্যাকুলনেত্রে সেই মৃত্যুছায়া-বিমলিন মুখের দিকে চাহিয়াছিল। সহসা এ হেন অপরিচিত যুবককে গৃহমধ্যে প্রবিষ্ট হইতে দেখিয়া সে ভয়ে যেন আঁৎকাইয়া উঠিল, এবং সন্ত্রস্তভাবে অঞ্চলখানি সংযত করিয়া লইল। তারানাথ কি বলিবে, কি করিবে স্থির করিতে না পারিয়া যেন হতবুদ্ধির ন্যায় দাঁড়াইয়া রহিল।

এমন সময় কৃতা ঝিয়ের সম্মুখে আসিয়া বলিল, "ডাক্তার বাবু আসা।"

কিশোরী ত্রস্তভাবে উঠিয়া দাঁড়াইল। সঙ্গে সঙ্গে জুতার মস্ মস্ শব্দে প্রাঙ্গণ প্রকম্পিত করিয়া ডাক্তারবাবু গৃহমধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন এবং তারানাথের দিকে চাহিয়া বলিয়া উঠিলেন, "এই যে আপনি এসেছেন! কতক্ষণ?"

তারানাথ কি উত্তর দিবে স্থির করিতে পারিল না; ডাক্তার বাবুও তাহার উত্তরের জন্য অপেক্ষা না করিয়াই রোগীর পাশে গিয়া বসিলেন। তিনি হাত বাড়াইয়া রোগীর নাড়ী টিপিলেন কিশোরী ব্যগ্র কাতর কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, "কেমন দেখছেন"

ডাক্তার বাবুর ভ্রূযুগল কুঞ্চিত হইল। তিনি কিশোরীর কথার কোন উত্তর না দিয়া তারানাথের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "আপনি বড্ড সময়েই এসে পড়েছেন, আর আধ ঘণ্টাপরে এলে বোধ হয় সাক্ষাৎ হ'তো না। বাবু আপনি এসে না পড়লে মেয়েটিকে বড়ই বিপন্ন হ'য়ে পড়তে হ'তো। টেলিগ্রাম বোধ হয় ঠিক সময়েই পেয়ে ছিলেন?"

জড়িত কণ্ঠে তারানাথ উত্তর করিল, "হাঁ, কিন্তু আমি—"

তাহাকে সব কথা বলিবার অবসর না দিয়াই ডাক্তার বাবু বলিলেন, "আর্জেণ্ট টেলিগ্রাম—ঠিক সময়ে পাবারি কথা। আমি ভোর ৪টার সময় নিজের হাতে লিখে বেয়ারাকে দিয়ে পাঠিয়ে দিয়ে ছিলাম।"

তারানাথ পকেট হইতে টেলিগ্রামখানা বাহির করিয়া সঙ্কুচিত ভাবে বলিল, "আমার বোধ হয় মস্ত একটা ভুল হইয়া গিয়াছে। ভুলটা হয় আমি ক'রেছি, নয় আপনার—"

বাধা দিয়া ডাক্তার বাবু ত্রস্তভাবে সহকারে বলিলেন, "আমার ভুল! 'সেম্'! আমার অভিধান হ'তে ভুল কথাটাকে মুছে দিয়েছি। ভুলটা কি হ'য়েছে দেখি।"

বলিয়া তিনি তারানাথের হাত হইতে টেলি গ্রামের কাগজ খানা লইলেন এবং সেটাকে আলোর কাছে লইয়া গিয়া পড়িলেন, "এই তো, তারানাথ গাঙ্গুলি, বেনাপুর—"

কিশোরী বলিয়া উঠিল, "তারানাথ নয়তো ডাক্তার বাবু, অরবিন্দ।"

"তারবনাথ! ও্যাণ্ড্ মিষ্টেক্।" বলিয়া ডাক্তারবাবু তারানাথের মুখের দিকে চাহিলেন।

তারানাথও এবার ভুলের রহস্যটা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়া ধীরে ধীরে বলিল, "তারকনাথ গাঙ্গুলি বেনাপুর ষ্টেশনে বুকিং ক্লার্ক ছিলেন, মাসখানেক আগে তিনি পলাশপুরে কি এই রকম একটা ষ্টেশনে বদলী হ'য়ে গিয়েছেন।"

ডাক্তার বাবু সপ্রতিভ ভাবে বলিয়া উঠিলেন, "আপনি তাঁর ঠিকানা জানেন যখন, তখন টেলিগ্রামখানা তাঁকে 'রিডাইরেক্ট' ক'রে দিলেই বোধ হয় সব গোল চুকে যেতো"—

তাঁহার এই নির্লজ্জ উক্তিতে বিরক্ত হইয়া তারানাথ বলিল, "তা যেতো। যদি আপনি আর একটু ভদ্র ক'রে তারানাথের পরিবর্ত্তে তারকনাথ নামটা লিখে দিতেন।"

ডাক্তারবাবুর ললাট কুঞ্চিত হইল। এ দিকে নামের ভুল লইয়া যখন তর্ক বিতর্ক চলিতেছিল, তখন ওদিকে রোগীর অবস্থা ক্রমেই পরিবর্ত্তিত হইয়া আসিতেছিল। তাহার শ্বাস প্রশ্বাস প্রবল হইয়া আসিতেছিল এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে হইতে একটা ঘড় ঘড় শব্দ উত্থিত হইতেছিল, মণ্ডলে যাতনার একটা গভীর চিহ্ন ফুটিয়া উঠিতেছিল। তদ্দর্শনে কিশোরী ভয়ে চীৎকার করিয়া উঠিল। ডাক্তারবাবু রোগীর দিকে একবার উপেক্ষা পূর্ণ দৃষ্টিপাত করিয়াই দ্রুতপদে কক্ষের বাহিরে চলিয়া গেলেন। তারানাথ কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ় ভাবে সেইখানে দাঁড়াইয়া রহিল। শুধু কিশোরীর আর্ত্ত সকরুণ চীৎকারে কক্ষ প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল।

কিছুক্ষণ পরে তারানাথের কর্ত্তব্যজ্ঞান যখন ফিরিয়া আসিল, তখন সে এরূপ নিশ্চেষ্টভাবে দাঁড়াইয়া থাকার জন্য নিজের কাছেই যেন লজ্জিত হইয়া পড়িল। চক্ষের সম্মুখে মৃত্যুর তাণ্ডবলীলা চলিতেছে, একটা অসহায়া বালিকা যেন নিতান্ত অনাথের ন্যায় কক্ষতলে লুটাইয়া পড়িয়া আর্ত্তনাদে গগণ বিদীর্ণ করিতেছে আর তারানাথ পাষাণ পুত্তলীর ন্যায় নিশ্চেষ্টভাবে দাঁড়াইয়া তাহাই প্রত্যক্ষ করিতেছে! তারানাথ নিজের বুদ্ধির উপর রাগিয়া তাহাকে ধিক্কার দিল, তারপর একমুহূর্ত্ত ভাবিয়াই নিজের কর্ত্তব্য কি তাহা স্থির করিয়া লইল।

সে তাড়াতাড়ি জুতাটা খুলিয়া অগ্রসর হইল, এবং মুমূর্ষুর মুখের কাছে ঝুঁকিয়া পড়িয়া বেশ লক্ষ্য করিয়া বুঝিল সব শেষ হইয়া গিয়াছে, মৃত্যুর সহিত তুমুল সংগ্রামে ক্লান্ত হইয়া তাহার আত্মা চির বিশ্রাম লাভ করিয়াছে। জোরে একটা নিশ্বাস ফেলিয়া তারানাথ ভূলুণ্ঠিতা কিশোরীর দিকে ফিরিয়া দেখিল, যে এতক্ষণ করুণ চিৎকারে কক্ষ প্রতিধ্বনিত করিতেছিল, তাহার মুখে শব্দ মাত্র নাই? সে নীরব নিশ্চেষ্ট ভাবে কক্ষতলে পড়িয়া রহিয়াছে। তারানাথ ভয়ে ভয়ে তাহার কাছে গিয়া আসিয়া দেখিল, সে মূর্চ্ছিতা। উচ্চকণ্ঠে ভৃত্যকে আহ্বান করিয়া তারানাথ তাহার শুশ্রূষায় প্রবৃত্ত হইল।

কিছুক্ষণ শুশ্রূষার পর কিশোরীর চৈতন্য হইল। সে চক্ষু উন্মীলন পূর্ব্বক তারানাথের মুখের দিকে চাহিয়াই পুনরায় চক্ষু মুদ্রিত করিল। তারানাথ তাহাকে আশ্বাস দিয়া বলিল, "তোমার কোন ভয় বা চিন্তা নাই, আমাকে ঠিক বড় ভায়ের মত মনে করবে।"

তাহার এই সহানুভূতি পূর্ণ আশ্বাস বাক্যে আশ্বস্ত হইয়া কিশোরী ধীরে ধীরে উঠিয়া বসিল। তারানাথ তখন মৃতের সৎকারের আয়োজনে ব্যস্ত হইল।

সৎকারাদির পর তারানাথ কিশোরীকে তাহাদের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। কিশোরী সংক্ষেপে আপনাদের পরিচয় ব্যক্ত করিল। আবশ্যক বোধে আমরা এইখানে তাহাদের বিস্তৃত পরিচয় প্রদান করিলাম।

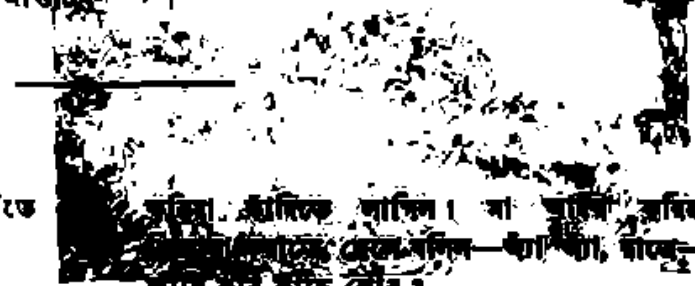

ছেলে। হাঁ মা, বিলিতি জিনিষ ছুঁতে না?

মা। হাঁ।

ছেলে। যদি কেউ ছোঁয়?

মা। তাকে তুমি ছুঁয়ো না, বাবা! সে দেশদ্রোহী।

ছেলে কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া কোন্ কোন্ [illegible] করিয়া তাহাকে জানিল। মা আদর করিয়া ছেলেকে বলিল—হাঁ বাবা, তাকে—

আমি কার কাছে যাব?

সে কি রে। আমার কাছে তুমি?

তোমাকে বুঝি ছুঁতে আছে। তুমি ত বিলিতি কুমড়ো কুটছো। আমি বাবাকে বলে দিয়ে আসি—তোমাকে আর ছোঁবে না।

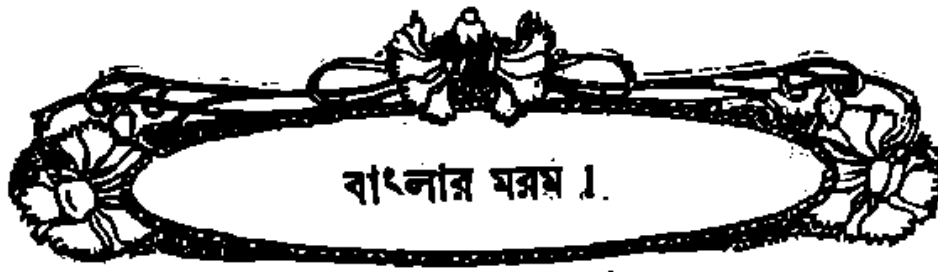

বাংলার মরম।

(শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী)

'অন্নাভাবে জীর্ণ, চিন্তা ভরে জীর্ণ,
অনশনে তনু ক্ষীণ।'

ইহাই আজ বাংলার বাহিরের রূপ, অন্তরের রূপ আরও দরিদ্র, মলিন কঙ্কালসার। মিথ্যা বসন ভূষণ, হাসি আনন্দে অন্তরের ম্লান মূর্ত্তি কেহ চাপা দিয়া চলিতে চাহিলেও সেই ম্লান রূপ প্রতি মুহূর্ত্তেই স্বপ্রকাশ হইয়া পড়ে। বাংলার প্রতি নরনারী আজ মরম দহনের তীব্র জ্বালা বোধ করিতেছে। বাহিরেও সে হীন, অন্তরেও সে হত দরিদ্র।

বাংলার নরনারীর বাহিরের অভাব অনাটন, সাংসারিক দুঃখ বেদনা, জ্বালা যন্ত্রণার বোঝা যেমন ভারী হইয়া চলিয়াছে, অন্তরের বৈভবও তাহার তেমনি বাড়িয়া যাইতেছে। স্বচ্ছল অভাব-হীন নরনারী বা কোন সংসার বাংলায় খুব অল্পই আছে, যদিও বা থাকে তাহাদের মুখেও অভাব অনাটনের কথা ভিন্ন অপর কিছু শুনিতে পাওয়া যায় না। আর বাংলার সাধারণ গৃহস্থের কথা—তাহারা যেভাবে তাহাদের সংসার চালাইতেছে, যেভাবে জীবন নির্ব্বাহ করিতেছে, তাহাতে তাহাদের মুখে আর কি কথা শুনিবার আশা করা যায়! নিত্য অভাবে দুশ্চিন্তায় দেশের নরনারীর জীবন-শোণিত জল হইয়া যাইতেছে, প্রাণের আশা উৎসাহ, হাসি আনন্দ হারাইয়া তাহারা জীবন্মৃত হইয়া আছে।

দেশের যুবকগণ দেশের আশা, দেশের ভরসা। দেহে প্রাণের পূর্ণ বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে এই সময়েই আশা উদ্দীপনায় যুব-জনের প্রাণ ভরপুর হইয়া উঠে। মানুষের জীবনে এমন সুখময় আর আসে না। কর্ম্ম-চাঞ্চল্য ও ভোগ সুখের মাদকতায় মানুষের জীবন-প্রবাহ তখন পূর্ণবেগে প্রবাহিত হইতে থাকে। যৌবন কালই মানুষের জীবনের বসন্ত-প্রভাত।

এই বসন্ত-প্রভাত আমাদের বাংলার আশা ও আনন্দের স্থল যুবকগণের দ্বারা কি ভাবে ব্যয়িত হইয়া থাকে? শিক্ষা-স্রোতে পাড়ি দিতেই অনেকের যৌবন চলিয়া যায়। তারপর দেশের শিক্ষা মন্দিরের পরীক্ষা সঙ্কট কাটাইয়া যুবকগণ যখন সত্য কর্ম্মক্ষেত্রে আসিয়া দাঁড়ায় তখন তাহারা দেখিতে পায় এতকালের শিক্ষাদীক্ষার সহিত তাহাদের সত্য কর্ম্মজীবনের কোন যোগ নাই। জীবনসংগ্রাম আরম্ভ হইবার সঙ্গে পদে পদে তাহার বিফলতায় যুবকগণ আশাহত হইয়া পড়িতে থাকে। শিক্ষার ধারার সহিত জীবনের ধারার কোন সম্বন্ধ নাই দেখিতে পাইয়া এতকালের শ্রম-শ্রম লব্ধ পরীক্ষা পাশের উপর তাহারা বীত-শ্রদ্ধ হইয়া পড়ে, জীবন সম্বন্ধেও হতাশ হইয়া যায়।

যুবক গণের এই বিফলতাময় সত্য জীবন আরম্ভের সঙ্গে জাতীয় জীবনের মরম কথার অনেক যোগ আছে। সর্ব্ব দেশে সর্ব্ব কালেই নর নারীর যোগ সূত্র অতি ঘনিষ্ঠভাবে আবদ্ধ। নর বিহনে নারী যেমন চলিতে পারে না নারী বিহনে নরও তেমনি চলিতে পারে না। নর নারীর মিলন বন্ধন হইতেই জাতির বিকাশ। বাহিরের অভাব অনাটন আমাদিগকে এত অবশ অথর্ব্ব করিয়া ফেলিতে পারে না যদি ঘরের মিলন বন্ধন মধুময় ও মিষ্ট থাকে।

নারীকে শান্তিদায়ী, জীবন সঙ্গিনী, সহধর্ম্মিণী কত মধুময় সার্থক পূর্ণ নামেই না আমরা অভিহিত করিতে শিখিয়াছি! কিন্তু এই নামের সার্থকতা সম্পাদনের জন্য নারীদিগকে আমরা কি সুযোগ দিয়াছি? যিনি শক্তিময়ী যাহার প্রভাবে সন্তান প্রভাবিত হইবে, যাহার সরল প্রাণ ও হাসিভরা মুখের গৌরবে জাতি গড়িয়া উঠিবে, মানুষ বলিয়া পরিচিত হইবার গৌরবে গৌরবান্বিত হইবে তাহাদিগের অবস্থা আমাদের বাংলার সমাজে কিরূপ, জাতির জীবন ধারা জাতির মরম কথার সন্ধান পাইতে গেলে তাহাই সর্ব্বাগ্রে দেখিতে হইবে।

নর নারীর মিলন হইতে বিবাহের অবশ্যম্ভাবী ফল সন্তানের জন্ম। সন্তান পুত্র ও হয় কন্যাও

হয়। কিন্তু কন্যা জন্মিলেই পিতা মাতার মুখের হাসি শুকাইয়া যায়, সমাজে কন্যা দায় বলিয়া বিবেচিত হয়। মেয়েদের জীবনারম্ভ কাল হইতে মরণ কাল পর্যন্ত সমাজজীবনে ও দেশজীবনে তাহারা ভার রূপেই থাকিয়া যায়। কন্যার বিবাহ ভাবনায় পিতা মাতা ও আত্মীয় স্বজনের বুকে পাষাণ ভার চাপিয়া থাকে। এই প্রাণহীন ভার সত্য সত্যই যদি জীবনহীন পাষাণ রূপ হইত তবে কোন কথা ছিল না, কিন্তু এ রক্ত মাংসে গড়া দেহ ও মন সম্পন্ন জীব, ইহারও বোধ শক্তি আছে। বুদ্ধি বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে যখন নারী জানিতে পারে যে তাহার জন্যই তাহার পিতা মাতা আত্মীয় স্বজনের মুখে হাসি নাই, প্রাণে তৃপ্তি নাই, তখন তাহার জীবন ও যে কি অশান্তির দুঃখ পূর্ণ হইয়া উঠে—তাহা সহজেই অনুমেয়।

বিবাহ দিতেই হইবে বিবাহ না দিয়া মেয়ে ঘরে রাখিবার উপায় সমাজে কাহারও নাই। সমাজে ছেলে শিক্ষিত হউক বা অশিক্ষিত হউক যোগ্য হউক বা অযোগ্য হউক বিবাহের বাজারে তাহার মূল্য আছে যে পণে আজ দেশের ছেলে বিকাইতেছে সে পণ ছেলে জীবনে কোন দিন অসম্ভাবিত উপায়ে কিছু না পাইলে নিজ যোগ্যতায় আর উপার্জ্জন করিতে পারে না। এই যে পরের ঘাড় ভাঙ্গিয়া লইবার ইচ্ছা এই যে নীচতা ইহাতে দেশের পুরুষ সমাজকে ও যেমন নীচ স্বার্থপর করিয়া দিতেছে নারীর মরমকে ও তেমনি আঘাতে পিষ্ট করিয়া ফেলিতেছেন।

জীবনকে সুন্দর শোভন করিবার যে প্রথম সোপান বিবাহ, যাহার ভবিষ্যৎ, দেশের নর নারী, দেশের সমাজ রাষ্ট্র, আজ দেশবাসী বিদেশের ধারাই তাহা এ মন পঙ্কিল হইয়া উঠিয়াছে যে তাহাতেই দেশের সর্ব্বনাশ করিয়া দিতেছে। আজ যে বর তাহার জীবন সঙ্গিনীর পিতা মাতাকে পথে বসাইয়া তাহার নিকট হইতে অর্থ শোষণ করিলেন তাহারই পরে হয়ত দু'তিনটি মেয়ে হইল। তাহার অবস্থা ও তখন তাহার জীবন-সঙ্গিনীর পিতার মতই হইয়া দাঁড়াইল। এই ভাবে সমাজে জন্মেই দুর্ভাগ্যের গভীরতম পঙ্কে নিপতিত হইতেছে। নারীর জীবন পিতার গৃহেও যেমন ছিল দুর্বহ গৃহে তাহার অপেক্ষা ও ভীষণ হইয়া দাঁড়ায়। মরম যাতনায় নারী শুষ্ক শীর্ণ হইতে থাকে, কঙ্কালের অবস্থা ও তাহাই।

আজ দেশবাসী যখন জীবন হইতে মুক্তি চাহিতেছে, কিন্তু দেশবাসী নিজ হস্তে ক্ষুদ্র স্বার্থপরতায় অন্ধ হইয়া সমাজ জীবনের উপর ও জাতীয় জীবনের উপর যে বন্ধন জড়াইয়া নিজেদের পঙ্গু করিয়া রাখিয়াছে সে বন্ধন মোচনের চেষ্টা তাহারা করিতেছে কই?

আজ অস্পৃশ্যতা দোষে দূষিত হইয়া দেশের অসংখ্য নর নারী সমাজ জীবনের সহিত মিলিত হইতে না পারিয়া সমাজ হইতে দূরে সরিয়া পড়িতেছে। তাহাদের মরম বুঝিয়া তাহাদিগকে সমাজ বক্ষে টানিয়া লইবার কি আয়োজন হইতেছে!

দেশ আজ দেশ হিসাবে পরিচিত হইতে চাহিলে, দেশের সমাজজীবন ও রাষ্ট্রজীবন গড়িয়া তুলিতে হইলে, আজ দেশবাসীর মরমের কথা শুনিতে হইবে, প্রাণ দিয়া তাহা বুঝিতে হইবে। প্রাণে প্রাণে দেশের জনে জনের সহিত যোগ দিতে হইবে। তবে দেশের জাগরণের আন্দোলন একটা সত্য সুন্দর মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিবে। বিকাশ ও অগ্রগতির ধারাকে প্রাণ দিয়া মরমে গ্রহণ করিতে না পারিলে সে ধারায় সঞ্জীবনী উৎসের সন্ধান মিলিবে না, ধারা প্রাণ না পাইয়া আবার মরুভূমিতে বর্ষণের কত শুষ্ক হইয়া অর্দ্ধ পথ হইতেই লুপ্ত হইয়া যাইবে।

আজ দেশবাসীগণ সর্ব্বাগ্রে দেশের মরম কথাটি জানিবার চেষ্টা কর। কত দিক্ হইতে নিজেদের অত্যাচারে অবিচারে জড়িত হইয়া আমরা প্রাণ শূন্য হইয়া শুধু দুঃখের মরম লইয়া বাঁচিয়া আছি, তাহারই সন্ধান আজ চাই। জাতির মরমকে একবার দুঃখের জড়িত বন্ধন হইতে মুক্তি দিয়া তাহাতে উৎসাহ দাও—হাসি ফুটাইয়া তোল—দেখিবে সব তাহা প্রাণ, আবার ঘোড়া দাগিবে, আবার তেজে ও বীর্য্যে জাতির প্রাণ পূর্ণ হইয়া উঠিবে, জাতি উঠিয়া দাঁড়াইবে, দেশে হাসি ফিরিয়া আসিবে, জাতীয় জীবনের পরিত্রাণ হইবে।

লাউসেন

(শ্রীশিবরতন মিত্র)

প্রথম খণ্ড—সূচনা

প্রথম অধ্যায়

গৌড়েশ্বর—সোম ঘোষ

গৌড়াধিপতি, একদিন বিপুল সৈন্যসামন্ত সঙ্গে লইয়া শীকার-যাত্রায় বহির্গত হইয়াছেন।

তিনি স্বয়ং এক গজেন্দ্র-পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়াছেন। সহস্র সহস্র সশস্ত্র সৈন্যগণ, তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া বাদ্যভাণ্ড সহ পরম উৎসাহে অগ্রসর হইতেছে। নিশানদারগণ লাল, নীল, শ্বেত প্রভৃতি নানাবর্ণের ধ্বজাপতাকা সহ অগ্রে অগ্রে গমন করিয়া, গৌড়পতির সদৈন্যে শুভাগমন-বার্ত্তা দেশে দেশে বিঘোষিত করিয়া চলিতেছে।

রাজধানী হইতে কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়া এক গ্রামে উপস্থিত হইলে, গৌড়েশ্বর গজ-পৃষ্ঠ হইতে এক রাজ-বন্দীকে দেখিতে পাইয়া, তৎক্ষণাৎ তাহাকে তাঁহার নিকট আনয়ন করিবার আদেশ প্রদান করিলেন। বন্দী, শৃঙ্খলিত অবস্থায় রাজার সমক্ষে উপস্থিত হইয়া প্রণামান্তে করযোড়ে দণ্ডায়মান হইল। গৌড়েশ্বরের অনুমান সত্য হইয়াছে—বন্দী অপর কেহ নহে, তাঁহারই চিরপরিচিত ও অনুগ্রহপুষ্ট গোপকুমার—সোম ঘোষ!

সোম ঘোষের এরূপ দুর্দ্দশা দেখিয়া রাজার বিস্ময়ের অবধি রহিল না। কিয়ক্ষণ পরে তিনি সাগ্রহে কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, সোম ঘোষ করযোড়ে বলিল—'মহারাজ, আপনার স্বর্গীয় জনক পুণ্যশ্লোক রাজা ধর্ম্মপাল, প্রজাবৃন্দকে সন্তানবৎ স্নেহ সহকারে প্রতিপালন করিয়া গিয়াছেন। আপনি তাঁহারই পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া, তদ্রোধিক স্নেহ ও যত্ন সহকারে প্রজাপালন করিতেছেন। আপনি রূপে গুণে, কুলে শীলে, জগতে সর্ব্বত্র সমভাবে সম্পূজিত ও সম্মানিত। আপনি দানে কল্পতরু—প্রত্যহ পর্ব্বত-প্রমাণ অন্ন দীনদুঃখীকে বিতরণ করেন। আপনি সূর্য্যের ন্যায় প্রতাপশালী এবং দুষ্ট ও অত্যাচারীর যম সদৃশ। আপনার সুবিস্তীর্ণ রাজ্য মধ্যে দুর্ভিক্ষ নাই—নিতান্ত অভাগা আতুর ও অন্ধ ব্যক্তিগণও আপনার রাজত্বকালে, বেশ সুখ স্বচ্ছন্দে কালাতিপাত করিতেছে। আপনার দয়ার সীমা নাই—জ্ঞানের অন্ত নাই! সুতরাং, আমার ন্যায় ক্ষুদ্র ব্যক্তির প্রতি যে এই রাজদণ্ড প্রদত্ত হইয়াছে, ইহা আমারই কর্ম্মদোষে ঘটিয়াছে। আমার কর্ম্মফল, আমি সন্তুষ্টচিত্তে ভোগ করিতেছি—ইহার জন্য অপর কাহাকেও আমি নিমিত্তভাগী বলিয়া মনে করি না। বিধি-বিড়ম্বনায়, আমার পরিবারস্থ বহুলোকের বিয়োগ হইলে, আমি মৃতবৎসর রাজকর প্রদান করিতে সমর্থ হই নাই। আমার এই অসামর্থ্যের কথা যথাসময়ে মহারাজের কর্ণগোচর করিলে, আপনি কৃপাপরবশ হইয়া আমায় নিষ্কৃতি প্রদান করিয়াছিলেন। কিন্তু, আপনার নিকট অভয় প্রাপ্ত হইয়াও, আমার এই এক বৎসরকাল দুর্গতির সীমা নাই! আপনি আমাদিগকে এতদিন সন্তানের ন্যায় প্রতিপালন করিয়াছেন—এখন, আপনার পাত্র মহাশয় কিন্তু, আমাদের চোরের দুর্গতি করিয়াছেন। মহারাজের আদেশ অতিক্রম করিয়া যে আমাদের প্রতি, দেশদ্রোহী দুষ্ট চোরের ন্যায় দণ্ড প্রযুক্ত হইবে, ইহা স্বপ্নেরও অগোচর! কিন্তু, তাহাও সত্য হইয়াছে!—সুতরাং আমাদের প্রতি এই রাজদণ্ড, দৈব-বিড়ম্বনা ভিন্ন আর কি বলিব?

রাজা, সোম ঘোষের নিকট হইতে অপ্রত্যাশিতভাবে এইরূপ অদ্ভুত অনুযোগ-বাক্য শ্রবণ করিয়া কিয়ৎক্ষণ নীরব ও স্তম্ভিত হইয়া রহিলেন। তদনন্তর, রোষকষায়িত-নেত্রে, পাত্র মহামদের প্রতি লক্ষ্য করিয়া কহিলেন—'তুমি রাজ-মহিষীর ভ্রাতা, এই সাহসে তুমি আমার অজ্ঞাতে, আমার সন্তানতুল্য নিরীহ প্রজাবৃন্দের প্রতি অযথা উৎপীড়ন আরম্ভ করিয়াছ! আমি তোমায় এবার ক্ষমা করিলাম—আশা করি, ভবিষ্যতে তুমি আমার অনভিপ্রেত কোনরূপ অপকর্ম্মে লিপ্ত রহিয়া আমার কোনরূপে অসন্তোষ উৎপাদন করিয়া নিজে বিপন্ন হইবে না।'

পাত্র মহামদকে এইরূপ ভর্ৎসনা করিয়া, গৌড়েশ্বর সোম ঘোষের বন্ধন-মোচন করিবার আদেশ প্রদান করিলেন এবং তাহাকে লাল ও 'সরবন্ধ ঘোড়া' পুরস্কার প্রদান করিয়া, অশ্বারোহণে তাহাকে অন্যতম পার্শ্বচররূপে সঙ্গে লইয়া চলিলেন। সর্ব্বজন সমক্ষে এরূপভাবে ভর্ৎসিত ও অপমানিত হইয়া, মহামদ ক্রোধে ক্ষোভে স্তম্ভিত হইয়া, অধোমুখে নীরবে করতলে অঙ্গুলি-সঞ্চালন করিতে লাগিলেন—প্রকাশ্যে কোন কথা কহিতে

না পারিয়া লোষ ঘোষের প্রতি, তাঁহার চিরাগত ক্রোধ সঞ্চিত করিয়া রাখিলেন এবং তাহা ব্যক্ত ও প্রযুক্ত করিয়া মনের জ্বালা ও ক্ষোভ মিটাইবার জন্য সময় ও সুযোগের প্রতীক্ষা করিবার সঙ্কল্প করিলেন।

মহারাজ গৌড়েশ্বর, শিকারান্তে যথাসময়ে রাজধানীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। সোমঘোষ মহীরাজ গৌড়েশ্বরের একজন অতি সম্মানিত নিত্য পার্শ্বচর রূপে রাজদর্শীর বিরাজ করিতে লাগিল।

পাত্র মহামদ, সোমঘোষের অকস্মাৎ এরূপ ভাগ্য পরিবর্ত্তন অপ্রত্যাশিত রাজ সম্মান দর্শনে, প্রচণ্ড ঈর্ষানলে দগ্ধীকৃত হইতে লাগিলেন। পূর্ব্ব-সঞ্চিত ক্রোধের সহিত এখন দারুণ ঈর্ষা সংযুক্ত

নিরর্থক, বিনাপরাধে দীর্ঘকাল কারা-যন্ত্রণা ভোগ করিয়াছে ভাবিয়া তিনি তাহার প্রতি অত্যন্ত কৃপান্বিত ও সমধিক আকৃষ্ট হইয়া পড়িলেন—ক্রমেই রাজ-সভায় সোমঘোষের প্রসার প্রতিপত্তি বাড়িয়া উঠিল। স্বয়ং মহারাজা, সোমঘোষের যুক্তি ও অভিমত অতীত কোন কার্য্যই করিতে অগ্রসর হন না—এমন কি, সোমঘোষের প্রতি, তাঁহার বিশ্বাসের মাত্রা এত অধিক, বর্দ্ধিত হইয়া যে তিনি তাহার হস্ত হইতে 'ওষাকপান' পর্য্যন্ত প্রকাশ্য ভাবে গ্রহণ করিতে লাগিলেন। সুতরাং, সোমঘোষ এখন হইতে পাত্র মহামদ অস্থির হইয়া পড়িলেন—অথচ, রাজার বিরুদ্ধে তাঁহার কোনরূপ মনোভাব ব্যক্ত করিবার উপায় নাই। অন্তর মধ্যে দারুণ দাহ-যন্ত্রণা নীরবে সহ্য করিয়া, অনাগত সুযোগের সাগ্রহ প্রতিক্ষায় কালাতিপাত করা ভিন্ন তাঁহার উপায়ান্তর রহিল না।

পাত্র মহামদকে কিন্তু দীর্ঘকাল অপেক্ষা করিতে হইল না। দৈবের নির্ব্বন্ধে, সুযোগ, সত্বরেই অযাচিত ভাবে আসিয়া উপস্থিত হইল। রাজা গৌড়েশ্বর একদিন অকস্মাৎ সোমঘোষকে আহ্বান

করিয়া বলিলেন—'দেখ সোমঘোষ, এখানে তোমার আর অবস্থান করিবার প্রয়োজন নাই। আমার পরম বন্ধু বীরবর কর্ণসেন, বারভূঞা মধ্যে ত্রিবঙ্গীগড়ে, আমার প্রতিনিধি স্বরূপ তদঞ্চলে অখণ্ড প্রতাপে শাসনদণ্ড পরিচালনা করেন। এখন তোমায় আমি 'সানা' বা তাঁহার উপরিতন কর্ম্মচারী রূপে নিযুক্ত করিতেছি—তুমি তথায় কর্ণসেনের উপর কর্তৃত্ব করিয়া, সংগৃহীত যাবতীয় খাজনা প্রতিমাসে নিয়মিত রূপে রাজধানিতে প্রেরণ করিবে। এইরূপে আদেশ প্রদান করিয়া রাজা গৌড়েশ্বর সোমঘোষকে 'রো-সালা' ও পরবন্দ যোড়া পুরস্কার এবং তাহার এই কর্ম্ম নিয়োগের দর্শন স্বরূপ, 'নাগরা' ও 'নিশান' সহ 'পরয়ানা' বা নিয়োগ পত্র প্রদান করিলেন।

সোমঘোষ, রাজার চরণ বন্দনা করিয়া গন্তব্য স্থানে যাত্রা করিল এবং অচিরেই তাহার যুবতী পত্নী ও মূলপ্রদীপ স্বরূপ একমাত্র শিশুপুত্র ইহাই সহ, ত্রিবঙ্গীগড় অভিমুখে প্রস্থান করিল।

রাজাদেশে বহু সংখ্যক সুসজ্জিত ধানুকী বন্দুকী ঢালী, পাইক ও পদাতিক প্রভৃতি, অনুচররূপে তাহার অনুগমন করিল। দলবল সহ ক্রমে ক্রমে অগ্রসর হইয়া সোমঘোষ, অনতি বিলম্বে বড়গঙ্গা অতিক্রম করিল। এবং বহুগ্রাম ও নগর পার হইয়া অবশেষে একদিন বেলা দুইপ্রহরের সময় বীরভূমি মধ্যে প্রবাহিত অজয়নদের তীরে উপনীত হইল।

অদূরে ত্রিবঙ্গীগড়। গৌড়েশ্বরের পরয়ানা বা নিয়োগ পত্র সহ সদলবলে সোমঘোষের আগমন বার্ত্তা শ্রবণ মাত্র, অশ্বারোহণে দুই পুত্র সহ, নরমনোমোহনে কর্ণসেন স্বয়ং অগ্রসর হইয়া ত্রিবঙ্গীগড় হইতে অজয়তীরে তাহার অভ্যর্থনা জন্য উপনীত হইলেন। যথাযোগ্য সাদর সম্ভাষণে পরিতৃপ্ত করিয়া কর্ণসেন সোমঘোষকে পরম সন্তোষ সহকারে ত্রিবঙ্গীগড় মধ্যে লইয়া গেলেন এবং রাজাদেশ মত তদ্দেশ মধ্যে তাহাকে যথাযোগ্য অধিকার প্রদান করিলেন।

সোমঘোষ, আপন অধিকার বিস্তার করিয়া, অচিরেই গড়মধ্যে স্থায়ীভাবে বসতি সংস্থাপন করিল।

নাঃ, খাওয়াটা আজ চাপ হ'য়ে গেছে, কাল থেকে একটু জোরে হাঁটতে হ'বে, বাবা!- রোজই শালার—দেরী হ'য়ে যায়!

কেশের গুচ্ছ

(শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী)

নাদির শাহ সম্রাট হইয়া তাঁহার বিরাট সৈন্য বাহিনী লইয়া দেশের পর দেশ জয় করিয়া যাইতেছিলেন। কোনও দেশ সাহস করিয়া তাঁহার প্রচণ্ড আক্রমণের বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়া তাঁহাকে বাধা দিয়া হারিয়া নিজের গৌরব মান রক্ষা করিতেছিল, কোন দেশ বা তাঁহার নাম শুনিয়াই ভয়ে বশ্যতা স্বীকার করিয়া নিজেদের স্বাধীনতা গৌরব ও মান বিসর্জ্জন দিতেছিল।

দেশের পর দেশ জয় করিয়া সম্রাট নাদির শাহ তাঁহার বিরাট বাহিনী লইয়া অগ্রসর হইতেছেন, কাহার সাধ্য সে বিরাট বাহিনীকে বাধা দেয়—কাহার সাধ্য যুদ্ধংদেহি বলিয়া বুক ফুলাইয়া সোজা হইয়া সে শক্তির সম্মুখে দাঁড়ায়! এই ভাবে কত বড় বড় রাজা কত দেশ জয় করিয়া বিজয়গর্ব্বে শির উন্নত করিয়া সম্রাট চলিয়াছেন।

অমরনগর ভারতবর্ষের একটি ক্ষুদ্র রাজ্য। সে রাজ্যের জনবলও তেমন নাই, ধনবলও তেমন নাই। কিন্তু তাহাদের সাহস ও আত্ম-সম্মান জ্ঞান আছে যথেষ্ট। অমর নগরের অধিবাসিগণ স্থির করিল, প্রাণ থাকিতে বিনাযুদ্ধে তাহারা নাদির শাহের বশ্যতা স্বীকার করিবে না। তাহারা বিশ্বজয়ী নাদিরের সঙ্গে যুদ্ধ দিবে, যুদ্ধে জেতে ভাল, না-জয় হয় সম্মুখ সমরে প্রাণ বিসর্জ্জন দিয়া তাহারা অক্ষয় স্বর্গ লাভ করিবে। তবু বশ্যতা স্বীকার করিয়া স্বাধীনতাকে আক্রমণকারীর পায়ের তলে ডালি দিয়া তাহারা বাঁচিয়া থাকিতে চাহে না। স্বাধীনতা হারাইয়া শত্রুর অনুগ্রহের উপর জীবন বাঁচাইয়া রাখা অপেক্ষা মরণ যে সহস্র গুণে শ্রেয়। নাদির শাহকে বাধা দিতে হইবে, ক্ষুদ্র অমর-নগরের বালক বৃদ্ধ যুবক সকলেই যুদ্ধ সাজে সাজিতে লাগিল। সকলেরই মুখে হাসি, প্রাণে উৎসাহ, হৃদয়ে দেশ রক্ষার—পরাক্রান্ত শত্রুকে বাধা দেওয়ার একটা প্রবল আকাঙ্খা, একটা বিরাট হর্ষ জ্বালা!

দেশবাসীর যাহার যাহা সম্বল আছে সে তাহা দিয়াই যুদ্ধের সাহায্য করিতেছে। কতজনে যুদ্ধ ভাণ্ডারে কত টাকা দিতেছে, কিন্তু পনের বৎসরের বালিকা বেলা কি দিবে, কি দিয়া যুদ্ধের সাহায্য করিবে—কি দিয়া এ সময় দেশকে সে সাহায্য করিবে—তাহার যে কোন সম্বলই নাই! ঘরে এক বুড়ী দিদিমা—চুল বিক্রী করিয়া বালিকা কোন মতে দু'জনার পেট চালায়, দিবার মত যে তাহার কিছুই নাই। বালিকা বেলা সুন্দরী,—অপূর্ব্ব সুন্দরী, যেমন তাহার চোখ মুখ তেমনি তাহার দেহের গড়ন, মাথায় তাহার ঢেউ খেলান এক রাশি কেশ। সেই রেশমী-কোমল কেশের রাশিতে বালিকার সৌন্দর্য্য যেন ওর বাড়াইয়া তুলিয়াছে—বুঝি বা তেমন সুন্দর কেশ সে দেশে আর কোন বালিকার আছে কি না সন্দেহ। ফুলের সাজি হাতে বালিকা যখন এলো চুলে পুষ্প চয়ন করিত তখন তাহাকে দেখবালা বলিয়া ভ্রম হইত। বেলা ভাবিতেছিল কি করিবে, কি দিয়া সে দেশের এই দুঃসময়ে দেশকে সাহায্য করিবে! এলো চুলের রাশি কতক তাহার পিঠে কতক বা কোলে ছড়াইয়া পড়িয়াছে, কপোলে গুচ্ছ গুচ্ছ কেশ ছড়াইয়া রহিয়াছে। ভাবিতে ভাবিতে বালিকার মুখে বিন্দু বিন্দু ঘর্ম্ম বাহির হইতেছিল। গোলাপী আভা রঞ্জিত সুন্দর মুখের উপর কাল কেশ, তাহাতে বিন্দু বিন্দু ঘর্ম্ম—বেলা দেশের জন্য তন্ময় হইয়া ভাবিতেছে—কি দিয়া কি উপহার দিয়া সে দেশের মান রাখিবে—নিজের মুখ রক্ষা করিবে!

ভাবিতে ভাবিতে হঠাৎ তাহার মুখখানি হাসিতে ভরিয়া উঠিল, যেন সে এই বিপদ হইতে উদ্ধার পাইবার পথ খুঁজিয়া পাইয়াছে। বেলা তাহার কালো রেশমী-কোমল কেশের গুচ্ছ হাতে লইয়া নাড়িতে লাগিল। এত সাধের এত আদরের তাহার এই কালো ঢেউ খেলান কেশের রাশি—এতকাল এই কেশ রাশিকে সে কত আদরে মাথায় রাখিয়াছে—আজ এই কেশ রাশির মায়া তাহাকে ছাড়িতে হইবে—কেন—কেন—কি জন্য?

দেশের জন্য নারীর বড় আদরের বড় সোহাগের কেশরাশি কাটিয়া ফেলিবার সঙ্কল্প তাহার মাথায় আসিয়াছে—তাই মুখে হাসি, বড় তৃপ্তির মধুর হাসি! বেলা তাহার বড় সোহাগের কালো কেশের রাশি কাটিয়া ফেলিবে, মেয়েদের কালো এক রাশ চুলের চেয়ে দেশের জিনিষ বুঝি আর কিছুই নাই। সেই রেশমি কোমল কেশের রাশি বিসর্জ্জন দিয়া যদি বেলা তাহার বিনিময়ে দেশকে কিছু সাহায্য করিতে পারে! —এমন সুন্দর এতদীর্ঘ ঢেউ খেলান কেশের গোছা লইয়া কেহ কি তাহাকে কিছু অর্থ দিবে না? দেশে কি এমন

সেখিন পুরুষ বা নারী কেহ নাই যে এই কেশের বিনিময়ে তাহাকে কিছু অর্থ দিতে পারে?

যুদ্ধোৎসবে দেশ তখন মত্ত। দেশের সব নারী বালক বৃদ্ধ, যুবা, কাহারও মুখে যুদ্ধ ছাড়া আর কোন কথাই নাই, চারি দিকেই সাজ সাজ রব। ফুলওয়ালী বেলা সাজি ভরা ফুল-মালা লইয়া দীর্ঘ চুলের রাশি এলাইয়া দিয়া রাজপথে বাহির হইয়া পড়িয়াছে। রাজপথ—পথে কত নর নারী চলিয়াছে, কেহ ফুল-মালা কিনিতেছে, কেহ বা কিনিতেছে না। কিন্তু ফুলওয়ালীর দিকে একবার না চাহিয়া কেহই চলিয়া যাইতে পারিতেছে না। এই ফুলওয়ালীকে নিত্য এই রাজপথে পথচারিগণ দেখে, কই এমন করিয়া এত লোককে তো আর কখনও তাহার পানে চাহিয়া থাকিতে দেখা যায় না। আজ ফুলওয়ালীর কি সৌন্দর্য্য দেখিয়া এত লোক মুগ্ধ হইয়া তাহার পানে চাহিয়া আছে?

রাজপথে লোকের ভিড় জমিয়া গেল। বালিকার হাতে ফুলের মালা, মাথায় কালো কেশ। বেলা পথচারিজনকে বলিতেছে:—

'ওগো তোমরা কেউ আমার কেশের গুচ্ছ কিনিবে গো—দেশের যুদ্ধ ভাণ্ডারে আমায় কিছু দিতে হবে, কিন্তু আমার যে সম্বল কিছুই নেই, এই কেশের গুচ্ছ নিয়ে তোমরা আমায় কি দিতে পার?'

এমন অদ্ভুত প্রস্তাব সে দেশে কেহ কখনও শোনে নাই। এই মেয়েটা পাগল না ক্ষেপা—নহিলে এমন বয়সে কেউ কখনও তার এত সুন্দর কেশের রাশি অর্থের লোভে কেটে বিকিয়ে দিতে চায়? কেশের রেশমী-কোমল গুচ্ছ দেখিয়া অনেকেরই মনে লোভ হইতেছিল—এ কেশরাশি অমূল্য বটে,—কিন্তু এমন হৃদয়হীন কে আছে যে নিজের সামান্য সুখের জন্য এই সুন্দরীকে এত বড় সৌন্দর্য্য-সম্পদ হারা করিবে! জনতা ক্রমেই বাড়িয়া চলিল—বালিকা তখনও তেমনি এলো চুলে ফুলের মালা হাতে দাঁড়াইয়া! দেশের যুদ্ধ ভাণ্ডারে সাহায্য করিবার জন্য এক পরমা-সুন্দরী বালিকা তাহার সুন্দর কেশের গুচ্ছ বিক্রয় করিতে রাজপথে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে এ সংবাদ রাজধানীর এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত ছড়াইয়া পড়িল। দলে দলে লোক বালিকাকে দেখিতে ছুটিয়া আসিতে লাগিল।

এমন সময় এক পরম সুন্দর যুবক ঘোড়া ছুটাইয়া ভিড়ের মধ্যে আসিয়া পড়িলেন। জনতা পথ ছাড়িয়া দাঁড়াইল, যুবক বালিকার সম্মুখে আসিয়া বলিলেন—

'বালিকা, এ কেশের মূল্য তুমি কি চাও?'

বালিকা বলিল 'অর্থ—যুদ্ধ ভাণ্ডারে সাহায্যের জন্য অর্থ।"

যুবক বলিল 'শুধু অর্থ—আর কিছু নয়?'

বালিকা বলিল 'আর কি চাইব?"

যুবক বলিল 'প্রাণ—অর্থের সঙ্গে প্রাণ চাও না?"

বালিকা হাসিয়া বলিল 'চাই তো কত—পাই কই—

"যদি পাও।"

"আনন্দের সঙ্গে বরণ করে নি। অর্থের সঙ্গে যদি প্রাণ পাই সে তো দেশের ও আমার পরম সৌভাগ্য।"

যুবক বলিলেন 'বেশ আমি যদি দু'ই দি?

জনতা স্তব্ধ হইল। জনতার মধ্যে চারিদিক হইতে মৃদু গুঞ্জন উঠিল 'এ যে যুবরাজ, যুবরাজ!' এই রাজপথে বিপুল জনতার মধ্যে দেশের রাজপুত্র সর্ব্বজন প্রিয় যুবরাজ এক ফুলওয়ালীর কেশের জন্য তাহাকে অর্থ ও প্রাণ দিতে চাহিতেছেন।

বিপুল জনতার সকলের মুখেই এক কথা 'এ যে যুবরাজ, যুবরাজ!' বালিকা বেলা সে কথা শুনিল—বেলা যুবরাজের মুখের পানে চাহিল, যুবরাজ ও বেলার মুখের পানে চাহিলেন, বেলা দৃষ্টি নত করিল।

যুবরাজ বলিলেন 'তোমার কেশের বিনিময়ে কি চাও বালিকা?'

বেলা বলিল 'আমি কিছুই চাই না, আপনি ইচ্ছা করে যা দেবেন তাই পরম সৌভাগ্য মনে করে মাথা পেতে নেব যুবরাজ!'

"বেশ বালিকা, সত্য তোমার এ কেশ অমূল্য। পৃথিবীর সমস্ত ধন রত্ন এক দিকে আর তোমার ঐ কাল কেশের গুচ্ছ একদিকে তবুও ওর মূল্যের তুলনা হয় না। ও কেশ গুচ্ছের বিনিময়ে আমি যদি আমার এ প্রাণ দেশের জন্য তোমায় দি—তবে তুমি ও কেশের গুচ্ছ আমায় দিতে পার?"

বেলার মুখে কথা নাই, সে কি উত্তর দিবে। প্রাণের বিনিময়ে দেশের যুবরাজ তাহার কেশের গুচ্ছ কিনিয়া লইতে চাহিতেছেন। ভগবান কি তাহার প্রাণের প্রার্থনা শুনিয়া তাহাই পূর্ণ করিবার জন্য আসিয়াছেন! প্রাণ বিনিময়ে আজ তাহার প্রাণের চেয়েও-প্রিয়-কেশের গুচ্ছ বিকাইবে।

যুবরাজ বলিলেন 'আমার এ প্রাণ বিনিময়ে

তোমার ঐ সুন্দর কেশ শুদ্ধ আমি কিনলেম—এইবার তোমার হাতে গাঁথা একগাছা ফুলের মালা আমায় দাও—'

বালিকা সাজিভরা ফুলমালা যুবরাজের পানে কম্পিত হস্তে আগাইয়া দিল।

যুবরাজ বলিলেন 'ওতে হবে না—আমার গলায় পরিয়ে দাও।

বালিকা ফুলমালা যুবরাজের গলায় পরাইয়া দিল। জনতা সমস্বরে চীৎকার করিয়া উঠিল 'জয় যুবরাজের জয়—জয় দেশবাসীর জয়!'

তোমার যত নারী আছে সে দেশের আর তবের কিছু নেই। 'যাও ঘরে ফিরে যাও—আমার কেশ শুদ্ধ তোমার কাছে গচ্ছিত রইল। আর তোমার প্রাণ তোমার আকাঙ্খিত দেশ রক্ষায় চলল—যদি ফিরে আসি তোমার প্রাণ তুমি ফিরে পাবে—আর এ ফুল মালার মূল্যও তখন দেব।'

সূর্য্যদেব তখন পশ্চিম আকাশের সুদূর প্রান্তে সোনার থালার আকার ধারণ করিয়া ধীরে ধীরে ডুবিয়া যাইতেছে। সমস্ত আকাশ রঙ্গীন হইয়া গিয়াছে সেই রঙ্গীন আকাশ তলে সহস্র সৃষ্টির

যুবরাজ ফুলমালা গলায় পরিয়া বালিকাকে কহিলেন 'আজ দেশের বিপদে তুমি তোমার যে সম্বল এমন করে গচ্ছিত হতে এনেছিলে সে সম্বল পেয়ে তোমার দেশবাসী ধন্য হয়েছে, যে দেশে সম্মুখে যুবরাজ ও বেলার আবার দৃষ্টি বিনিময় হইল। যুবরাজ বোড়া ছুটাইয়া দিলেন, তাঁহার মনে তখন জাগিতেছিল শুধু বেলার সুন্দর হাসি ভরা মুখ-খানি, আর তাহার কালো কেশের

হাসি—আর সেই প্রাণের আগ্রহ, যাহাতে বালিকাকে তাহার এমন সুন্দর কেশরাশিও বিকাইয়া দেশের দুর্দিনে যাহা পারে তাহাই সাহায্য করিবার ব্যাকুলতা।

বেলার আগ্রহ ব্যাকুলতা দেখিয়া দেশবাসীগণ ধন্য ধন্য করিতে লাগিল, যুবরাজের অমন প্রবল শত্রুকে বাধা দিবার বলও যেন সহস্রগুণ বাড়িয়া গেল।

নাদির শাহের সৈন্যগণ বন্যার জলের মত ক্ষুব্ধ অবরোধগুলি ভাঙ্গিয়া ফেলিল। দুপক্ষে তুমুল যুদ্ধ বাধিয়াছে, যুবরাজ সেই যুদ্ধের সেনাপতি—অপর পক্ষের বাহিনী চালনা করিতেছেন স্বয়ং সম্রাট নাদির শাহ। প্রাণ তুচ্ছ করিয়া এমন যুদ্ধ সহস্র সমর-বিজয়ী নাদির ও বুঝি আর দেখেন নাই। নাদিরের বিপুল বাহিনী ক্ষুদ্র অমর নগরের বাহিনীর বিক্রমে চঞ্চল হইয়া উঠিল। কিন্তু যুবরাজের সামান্য সৈন্য কতক্ষণ এই বিপুল বাহিনীকে বাধা দিবে, একে একে যুবরাজের সৈন্য সংখ্যা কমিয়া আসিতে লাগিল, যুবরাজের অঙ্গ অবশ হইয়া আসিতে লাগিল। যুবরাজ তাহার সৈন্য দিগকে ডাকিয়া বলিলেন—'সৈন্যগণ দেশবাসী বন্ধুগণ, এ বিপুল বাহিনীর কাছে আর আমাদের জয়ের আশা নাই, তবে আমরা প্রাণ দেব কিন্তু পরাজয় মানিব না। যদি কেউ বাঁচে বন্ধু, তবে এক কাজ কোরো—দেশে নারীদের সন্ধান যেন দেয়া হয় আর একটি অনুরোধ তাই সব—সেই রাজপথ যেখায় ফুলওয়ালীর কেশ আমি ক্রয় করেছিলেম, সেখায় যেন একটি প্রস্তর মূর্তি গড়ে রাখা হয়। আর সেই প্রস্তর মূর্তির নীচে যেন লিখে রাখা হয়, 'বালিকা দেশের মান রক্ষার জন্য কেমন করে তার বড় আদরের কেশের গুচ্ছ বিকিয়ে দিতে এসেছিল, আর যবনগণ তোমাদের যুবরাজ নিজের প্রাণ তাকে দিয়েছিলেন সে কথাটিও লিখে রেখো।'

যুদ্ধ চলিল—দেশবাসিগণ প্রতিজ্ঞা করিল, অমর নগরে যদি একটি লোকও জীবিত থাকে তবে যুবরাজের শেষ ইচ্ছা তাহারা পূর্ণ করিবে।

একটি তীর আসিয়া যুবরাজের বক্ষে বিঁধিল। যুবরাজ অশ্ব পৃষ্ঠ হইতে এলাইয়া ভূতলে পড়িয়া গেলেন। সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনাইয়া আসিল, যুদ্ধ বন্ধ দিয়া নাদিরের সৈন্যগণ নগর প্রবেশের চেষ্টা করিতে লাগিল।

যুবরাজ ভূতলে পড়িতে কে তাহাকে ধরাইয়া ধরিল। যুবরাজ ক্ষীণ কণ্ঠে কহিলেন—'কে তুমি?

'যুবরাজ—যাহার নিকট আপনি আপনার কেশ গুচ্ছ গচ্ছিত রাখিয়াছেন, আমি সেই ফুলওয়ালী।'

যুবরাজ চমকাইয়া বলিলেন 'তুমি—তুমি এখানে—তোমার ফুলমালা যে এখনো আমার গলায় রয়েছে।"

বেলা বলিল 'যুবরাজ—এই আপনার কেশের গুচ্ছ এনিয়ে দিয়েছি—এই বলিয়া যুবরাজের বেলা তাহার এলায়িত কেশ গুচ্ছের উপর শোয়াইল। চন্দ্র কিরণে যুদ্ধে আহত যুবরাজের মুখখানি বেলা দেখিতেছিল। যুবরাজ বেলার মুখপানে চাহিয়া বলিলেন 'বেলা—ভেবেছিলাম তোমায় মত সঙ্গিনী নিয়ে রাজত্ব করব—তাতে সুখ আছে, কিন্তু তা হোল না, তীর বক্ষে বিঁধেছে আর বাঁচবো না। কিন্তু তুমি কেমন করে এলে বেলা?"

'আমি আপনার পাশে থেকেই যবনের যুদ্ধ করেছি—যুবরাজ আমি ও আহত—'

যুবরাজ বলিলেন 'আঁ। তুমি ও কেন বেলা এ ভাবে প্রাণ দিলে?

বেলা বলিল 'আপনি কেন দিলেন—ও প্রাণ ত আমারই—'

যুবরাজ ক্ষীণ কণ্ঠে বলিলেন 'তোমারই প্রাণ—কিন্তু বেলা দেশের কারণ'—বেলা হাসিয়া বলিল 'আমি ও তাই যুবরাজ।"

সেই ভীষণ যুদ্ধক্ষেত্রে সহস্র সহস্র হত আহতের মধ্যে দুইটি তরুণ নর নারী এক জনের কোলে আর এক জনের মাথা রাখিয়া প্রাণ ত্যাগ করিল। পূর্ণিমার পূর্ণ চন্দ্র হাসিয়া হাসিয়া তাহাদের উপর মধুর কিরণ ছড়াইতেছিল। স্নিগ্ধ বায়ু সুগন্ধ বহন করিয়া আনিয়া তাহাদের শ্রান্ত দেহের ক্লান্তি নাশ করিতেছিল।

আকাশে চাঁদ হাসিতেছে—ধরাতলে হাসিমুখে দুটি প্রাণ শয়ান; চির নিদ্রায় নিদ্রিত।

যে পথে ফুলওয়ালীর সঙ্গে রাজকুমারের প্রথম দেখা সেই খানে আজও ফুলওয়ালী তেমনি এলো চুলে কুয়ারের গলে ফুলমালা পরাইতেছে। তবে সে বিচিত্র দৃশ্য ঘটিত নহে, প্রস্তরের। দেশবাসী সে মধুর কেশগুচ্ছের কথা এখনো গৌরবের সহিত স্মরণ করে।

আধুনিক রঙ্গালয়

রঙ্গালয়—থিয়েটারের কথা উঠিলেই সঙ্গে সঙ্গে দল জাগ হইতে দেখা যায়। দল নানান রকমের। তন্মধ্যে দুইটির আমরা উল্লেখ করছি। বর্ত্তমান কালে যাঁরা থিয়েটার দেখতে যান, তাঁরা প্রায়ই বলেন, দিশী থিয়েটারগুলো দিন দিন কি অশ্লীল হ'য়ে উঠ্‌ছে! এ কথাটা হয়ত কতক ঠিক! এবং অশ্লীল হ'য়ে উঠ্‌ছে তার যে কারণ শুনতে পাওয়া যায়—তার প্রথম কারণ দেখান হ'য়ে থাকে যে থিয়েটারের রুচি কুরুচি এবং কলা (art) সত্যি-কারের কলা (রঙ্গ) হ'য়ে দাঁড়াচ্ছে। কুৎসিৎ রঙ তামাসা, নাচের সঙ্গে কুৎসিৎ হাবভাব, কথা-বার্ত্তায় আবার একটা কি জানি কিসের রং চং—এ না হ'লে যেন থিয়েটারওয়ালাদের দিন চলে না।

একদল বলেন—বহি তেমন নেই, যা'তে এই সব অশ্লীলতা রেহাই পাচ্ছে।

আর এক দল বলে থাকেন, অভিনেতা ও অভিনেত্রীরা উপযুক্ত শাসন ও সংস্কারের অভাবে নিজেদের নগ্ন প্রকৃতিকে খোলস খুলে বেরিয়ে ফেলছে। তাদেরই বা দোষ কি? করতালি পড়ছে, দর্শকের হৃদয়ে হৃদয়ে বিদ্যুৎ প্রবাহ ছুটছে, উড়ে এসে ফুলের মালা গলায় দুলছে—কেন না তারা এই করবে?

আর একদল লোক আছেন, যাঁরা মনে করেন—এ সমস্তই হ'চ্ছে নেতা নেই বলে! শিক্ষক নেই বলে!

বাস্তবিক আরও একদল লোক আছেন, যাঁরা বলেন আছে সবই। নেই কেবল সেই একটা জিনিষ, যে জিনিষ থাকলে সব থাকাই সার্থক হ'য়ে ওঠে, এবং একমাত্র যার অভাবে স্বভাবও নষ্ট হয়। সে জিনিষ হ'চ্ছে অর্থ! যাঁরা কথায় কথায় উপমা দিয়ে কথা কন্, তাঁদের কাছে শুনতে পাই, অমুকটা যেন এল; যেখ্‌লে জিনার্ডা, মনোমোহন, তাঁর এ সবে চুকতে যেন্নায় মাথা নীচু হ'য়ে যাবে! যেখ্‌বে—আকাশ আর পাতাল! এঁরা প্রায়ই বিলিতি নাচঘর গুলোর উপমা দিয়ে থাকেন।

যাঁহারা কথায় কথায় এইরূপ উদ্ভট উপমা দিয়ে যেন মুক্তিয়ানা গলায় বলে থাকেন—ছ্যা ছ্যা আর ছ্যা ছ্যা—তাঁদের কথার উত্তর দেবার বেশী দরকার দেখিনে। তবে জানি যে বিলিতি থিয়েটারগুলোর টাকার পরিমাণে যে তাঁরা নিজেরাও ন্যূন আনেন তা নয়, এবং জেনেও যখন এমন মুখা বল্‌তে তাঁদের মুখে বাধে না—আমরা যদি তিনি বল্‌তে থাকুন; কিছু এসে যাবে না। এদেশ বিলেত হ'বে না এবং এদেশের লোকগুলো সম্ভবতঃ বিলাতি হ'বার জন্যে আর বেশী লালায়িত নেই।

তবে কথাটা ঠিক যে রঙ্গালয় অধঃগতির দিকে বেশ দ্রুত অগ্রসর হচ্ছে। রঙ্গালয় বলতে যেন আবার লোকের মনে একটা ঘৃণাভাব জন্মে উঠ্‌ছে এর জন্যে দায়ী কিন্তু স্বত্বাধিকারীগণ নিশ্চয়ই। বহি ও অভিনেতার দোহাই পেড়ে দায় খালাস হবার উপায় নেই; দর্শকগণের ঘাড়ে বোঝা চাপালেও বোধ করি নিষ্কৃতি মিলবে না। দোষ তাঁদেরই। রুচির রশ্মিটা মনে হয়—তাঁদেরই হাতে আছে। তাঁরা সুযোগ বুঝে রাশ টানতে ও ঢিলে দিতে পারেন। অভিনয়ে দর্শককে আনন্দ দেওয়াই অভিনয়ের উদ্দেশ্য। আনন্দটা একটা পাশবিক লালসায় ভরা না হ'য়ে যদি কেবলমাত্র আনন্দই হয়—দর্শক তাতে ক্ষুণ্ণ হ'বেন না—মনে করি।

তাঁরা যদি বলেন, সুরুচি সঙ্গত বহি হাতে আসে না—আমরা বলব এটা খোঁড়া কথা! বহি আসে ত, তাঁদের নিজেদের রুচিজ্ঞান আছে ত, সেই যথেষ্ট! করে নিতে কতক্ষণ? তাঁরা ত সব বহি-ই পরিমার্জ্জিত করে, পরিশোধিত করে তবে অভিনয় করেন, কেন সেই শিক্ষার সময়ে একটু দর্শকের স্থানে বসে আধঘণ্টাই-টা দেখেন না? আর তাঁদের কাণ যদি সত্যি সত্যিই অসাড় হ'য়ে গিয়ে থাকে, যেসে শিক্ষিত ও জ্ঞানবুদ্ধি সম্পন্ন লোকের অভাব নেই; বন্ধু হিসাবে তাঁদের আহ্বান করলেও ত করতে পারেন। যে জিনিষটা দেশের, সমাজের লোকের মনের উপর প্রভাব বিস্তার করবে বলে মনে হয়, তার উন্নতি বিধান চেষ্টায় যে কোন শিক্ষাভিমানী ব্যক্তিই থিয়েটারের অধ্যক্ষগণের আহ্বান অবহেলা করিতে পারেন না—এ নিশ্চয়।

গ্রন্থে কতটুকু লেখা থাকে? তার শতগুণ ফুটে ওঠে অভিনেতার অভিনয়ে। গ্রন্থের ভাষা সব রঙীন হ'য়ে দেখা দেয়, অভিনেতার কৃতিত্বে, তাঁর নৈপুণ্যে। মুখের একটা বিকৃতিতে, চক্ষের একটা বঙ্কিম কটাক্ষে যে অভিনয় দেখান হয়—গ্রন্থকার এক শত পৃষ্ঠা লিখেও তা দেখাতে পারেন না। এজন্যে উপর গ্রন্থকারের হাত নেই—হাত দিক্‌করের এবং অধ্যক্ষের। তাঁরা ইচ্ছা করলে এই সমস্ত স্থানে বীভৎস রসও ঢুকিয়ে দিতে পারেন—তাঁরা চেষ্টা করলে সেগুলিকে অনাবিল ও নির্দ্দোষ সহজ সরল-মধুর রসে ভরপুর করেও দিতে পারেন।

কাজ হয়ত একই হয়—দর্শকের তুষ্টি তাতে কম হ'বে এমন ভয় করবার দরকার নেই। বেশের লোকের রুচিটা পুতুলের পটা পাক নয় যে কোন কালেই তার রঙ বদলাবে না, বা তাতবে না, তার পরিবর্ত্তন ঘটবে না! এ রকম মনে করা অন্যায়! পরিবর্ত্তন সবেরই হ'চ্ছে—ভিতরে ভিতরে রুচিরও হচ্ছে—সেটা পরখ করে নিতে হয়।

অবশ্য শিক্ষার পরেও যে অভিনেতা বা অভিনেত্রীর রসবোধের গুণে অনেক সময় রস ভিন্ন ভিন্ন রূপ ধারণ করে, দর্শকদের চমকিয়ে দেয়—তা'তে আশ্চর্য্য হ'বার কিছুই নেই। অভিনেতা বা অভিনেত্রী হঠাৎ স্ব-স্ব "প্রতিভা"র বিকাশে এমন একটা "নিজস্ব" (orignality) দেখিয়ে দেন যে গ্রন্থকার, শিক্ষক, অধ্যক্ষ এবং পরীক্ষকেরা কল্পনাতেও তা আশা করেন নি। এমন আমরা হ'তে দেখেছি। একদিনের অভিনয়ে একটা স্থান ভালোই দেখা গেল, পরের দিন উল্লসিত দর্শকগণকে অধিকতর উল্লাস দেবার জন্যে অভিনেতা বা অভিনেত্রী যেমন একটু তথাকথিত "প্রতিভার" পরিচয় দিয়েছেন, ব্যস্—আর দেখতে শুনতে নেই। এগুলো আর কিছুই নয় সহবৎ-এর অভাব! বাঙ্গালী সহবৎ মান্‌তে চায় না, বাপ পেলেই নিয়মকে বেনিয়ম করে, এই তার স্বভাব। এবং প্রবাদ যে তার 'স্বভাব যায় না মলে, ইজ্জত যায় না ধুলে।'

Descipline নাই! কথাটা নিছক্ সত্য! এই descipline এর অভাবে অনেক সময় অভিনয় এত কুরুচি পূর্ণ হয়ে উঠে, যাহা সত্যই অমার্জ্জনীয়! অভিনয়ের খুঁটি নাটি দোষগুণ ধরবার আগে আমরা মোটামুটি কতকগুলো কথার আলোচনা করে নেই।

দেখা দরকার,—শুনতে চাই, দর্শক কি চায়? থিয়েটার করেই যাদের কালো মাথা সাদা হয়েছে তাঁরা এ জিনিষটা খুব ভালো বোঝেন। তাঁরা জানেন, দর্শক চায়—আমোদ-প্রমোদ! নাচ্ গান তাঁমাসার আদর বহুৎ! রমণীর বিলোল কটাক্ষের মোহও কতকটা মিশে আছে, তার সঙ্গে! তা ছাড়া নাটকের অভিনয়েরও কদর আছে। দ্বিজেন্দ্রলালের যে কোনো নাটক অভিনয় কালে নাচ গান রং থাক্ আর নাই থাক্, রমণী রূপের তরঙ্গ উঠুক্ আর নাই উঠুক্—কিছু আসে যায় না, দর্শক মন্ত্রমুগ্ধের মত বসে থাকেন। কিন্তু সব নাটক—তা নয়—সেকথা থাক্। যা বল্‌ছিলাম, দর্শক রঙ চায়, তামাসা চায়, আমোদ চায়—এগুলো দিতে থিয়েটার-অধ্যক্ষগণ যে কার্পণ্য করেন না, তা যে স্বীকার না করে তাকে আমরা বিশ্বনিন্দুক বলতেও ভয় পাই নে—কিন্তু মুক্তহস্তের দানও ঐ সহবতের অভাবে কেমন হয়ে ওঠে তা যারা থিয়েটারের দর্শক তাঁরা ভালই জানেন।

আর তা'ও বলি দর্শকদের আচরণ, অনেক সময়েই যে-সকল রকমের ভদ্রতার গণ্ডী পার হ'য়ে অনেক দূরে গিয়ে হাজির হয়, আমাদের বিশ্বাস তাঁরা নিজেই সেটা ভালো জানেন! অনেকে একেবারে ভুলে যান যে রঙ্গমঞ্চটা পাড়ার ওঙ্কারের স্থান নয়, যে রঙ্গমঞ্চে বারবণিতা থাকলেও তাদের তখনকার উদ্দেশ্য অন্ততঃ অভিনয় করা ছাড়া আর কিছু নয়। দর্শক যদি এ কথাগুলো মনে রাখেনত অভিনয় ভালো হয়, অশ্লীলতা কমে যায়।

রঙ্গমঞ্চের অভিনেত্রীদের কাছ থেকে সুরুচি সঙ্গত সভ্য ব্যবহার, শীলতাপূর্ণ আচরণ পেতে গেলে নিজেদের সংযত করতে হয়! যে জিনিষটা দেবার ক্ষমতা নেই, তা পাবার প্রত্যাশা করা সব সময়েই সঙ্গত কি?

তবে একটা আশার আলোক জেগে উঠেছে। হয়ত এ গ্লানি এ কালি ঘুচবে—তারই পূর্ব্বাভাষ দেখা গেছে। এই যে বঙ্গ রঙ্গমঞ্চে সুরুচী সুশিক্ষিত যুবকদের আগমন আরম্ভ হয়েছে—এর ফল যে আশাপ্রদ হ'বে তাতে সন্দেহ নেই। হয়ত আবার আমরা পিতা-পুত্রে, ভাই-বোনে, মায়ে-ঝিয়ে এক-সঙ্গে বসে থিয়েটার দেখ্‌তে পারবো। শিক্ষা যখন ঢুকেছে তখন সঙ্কীর্ণতা, অশ্লীলতা, সেকেলে বাঈয়ামী—এসব যাবে, বলে আশা হয়।

আগামী সংখ্যা হতে আমরা অধুনা যে কয়খানি নাটক নাটিকা বঙ্গীয় রঙ্গালয়গুলিতে অভিনীত হচ্ছে, ক্রমান্বয়ে সেইগুলোর বিষয় আলোচনা করিব। নিবন্ধগুলি চিত্রিত করিবার বন্দোবস্তও করা হচ্ছে।

এক ভদ্রলোক আমেরিকা হইতে পদব্রজে কলিকাতায় আসিয়া পৌঁছিয়াছেন। তাঁহার চরণের ধূলি এতই ছত্র, যে সাধারণ লোকে ন্যূনাধিক পায় না। ভগবান না করুন, পা দু'টি অচল হইলে, মিউজিয়মে রাখিবার চেষ্টা করা পৃথিবী-বাসীর কর্ত্তব্যের মধ্যে।

দ্বাদশ গোপাল

(শ্রীবিজয়রত্ন মজুমদার।)

চমৎকার!

ছিপ ঠেলিয়া বজরাপুরের ঘাটের সর্ব্বনিম্ন সোপানে দাঁড়াইয়া বিমান সহর্ষকণ্ঠে বলিয়া উঠিল—চমৎকার!

তাহার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া অজিত বলিল—এরই মধ্যে চমৎকার?

বিমান পুলকিত স্বরে বলিল—একসঙ্গে এত বাঙ্গালী দেখ্‌ছি,—চমৎকার নয়!

অজিত একটা মাঝিকে বলিল—এই মাঝি, হামলোক্‌কো ঘুমাওগা?

মাঝি একবার মাত্র বক্তার মুখের পানে চাহিয়া বলিল—আইয়ে না হুজুর।

অজিত বিমানের হাত ধরিয়া নৌকায় উঠিয়া পড়িল। আর দুইটি যুবকও সেই সঙ্গে নৌকায় উঠিল—এক জনের নাম সত্যরঞ্জন, ইনি প্রিয়দর্শন যুবাপুরুষ, চোখে একখানি আবাধা চশমা, আর একজনকে দেখিলে ইহাদের পাড়্‌গাঁমছাবাহী ভৃত্য বলিয়াই মনে হয়।

খান দুই বড় আর খানদশেক ছোটখাট ডিঙ্গার অল্পদূরে দাঁড়াইয়া, আর কম করিয়া পঞ্চাশখানা ডাউল নৌকা তাহাদের ঘিরিয়া। ভাগিরথীর এ কূলে জল যেন আর নাই, নৌকা, আর—নৌকা! একখানা প্রকাণ্ড বজরার উপর একদল সুবেশধারী যুবক কনসার্ট বাজাইতেছিল, লোকে উৎকর্ণ হইয়া শুনিতেছে। মাঝি ইহাদের লইয়া নৌকাখানিকে যেমনিই চালিত করিল, কিন্তু অগ্রসর হয় কাহার সাধ্য? সব স্থানটুকুই লোকে লোকারণ্য হইয়া আসিয়া ইজারা করিয়া লইয়াছে, যাহারই পাশ দিয়া অগ্রসর হইতে চায় সেই বিরক্ত,—সেই রক্তচক্ষে চাহিয়া উঠে।

হঠাৎ—ধর্‌ধার, ধর্‌ধার!

একখানা ছিপের উপরে এক নকল নর্ত্তকী নৃত্যতন্বী করিতে করিতে আসিতেছিল, কনসার্ট ছাড়িয়া সকলে নাচ দেখিতে উঠিল, দর্শকগণের মধ্য হইতে ঘন ঘন উচ্চ চীৎকার ও হর্ষধ্বনি উত্থিত হইতে লাগিল।

ওরে এযে বুড়ো মহেশ বারিকের ঘর যে-রে! বুড়ো কিন্তু সবাইকে টেক্কা দিয়েছে ভাই! ঐ দেখ-দেখ, ও আবার কি! মাস্তুলে-ওকি বাঁধা? ঝুড়ো! ঝোড়াছয় ঝুড়া, একটা ঘরের ছোতল ও একখানা সাড়ী বাঁধা! আবার খর্‌ধার! ক্ষেত্র সাহার ছিপ্ আসিতেছে—নক্ষত্রবেগে শীতবর্ণের উষ্ণীষধারী চালকগণ ছিপখানিকে নিমিষমধ্যে অদৃশ্য করিয়া লইয়া চলিয়া গেল। আর একখানি নৌকায় এক কৃত্রিম মুসলমানের বাইনাচ চলিয়া গেল, তারপরেই চাতরার বালক সম্প্রদায়ের নৌকা, তাহারা তীর সন্নিকটে নৌকা ভাড় করাইয়া গান ধরিয়া দিল, বজরার কনসার্ট থামিল এবং যে সকল নৌকা এতক্ষণ বড় বজরাখানাকে ঘিরিয়া ভিড় করিয়া দাঁড়াইয়াছিল, তাহারা বালক সম্প্রদায়ের গান শুনিতে তীরের দিকে ঝুঁকিতেই অজিত মাঝিকে বলিল—আগে চালাও।

মাঝি নৌকা চালিত করিল। বিমান তীরের দিকে চাহিয়া চাহিয়া সৈরিক বসন পরিহিত সুকুমার দেহ বালকগণকে দেখিতেছিল, তাহাদের মিলিত কণ্ঠের মধুর সঙ্গীত শুনিতেছিল, হঠাৎ কে যায়—কে যায় শব্দে ফিরিতেই দেখিল একখানা মধুরপক্ষীতে বসিয়া কয়েকটি যুবক চরকা কাটিতে কাটিতে চরকার গান গাহিতে গাহিতে অগ্রসর হইতেছে।

ওদিকের নৌকা হইতে কয়েকটি বালক হাত তালি দিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল—ওরে আমাদের খাড় মাষ্টার রয়েছে ভাই! আর একজন—আমার বাবাকে দেখ্‌তে পাচ্ছিস্‌নে? ঐ যে সবার শেষে খালি গায়ে বসে চরকা ঘোরাচ্ছে, ঐ যেরে কানা...

চরকার নৌকা চলিয়া গেল, বজরার কনসার্ট আবার বাজিয়া উঠিল—আষাঢ়ের শীতবক্ষ আছড়ী যেন কাণায় কাণায় পূরিয়া তালে তালে ছল-ছল করিল, সহস্র সহস্র দর্শক একেবারে নীরব নিস্পন্দ, ওপারের অগণিত কালো কালো ক্ষুদ্র মস্তক দেখিয়া অজিত বলিল—আচ্ছা, ওপার থেকে ওরা কিছু দেখ্‌তে পাচ্ছে—না, হাঁ করে শুধু ঐ দাঁড়িয়েই আছে?

অভিশাপ দিচ্ছে এপারের লোকগুলোকে।

মাঝি ফিরা লাগাও!

বজরার পার্শ্বে নৌকা লাগিতেই অজিত এক লাফে বজরায় উঠিয়া পড়িল—আস্‌ছি বিমানবাবু, এক মিনিট!

পরক্ষণেই নামিয়া আসিয়া বিমানের স্কন্ধোপরি হাত রাখিয়া বলিল—চলুন, একবার ওর উপরে।

কেন?

ওসব আমার বন্ধু, আসুন,—বিমানের হাত ধরিল, এস সত্য! সঙ্গে সঙ্গে গঙ্গারামও দাঁড়াইয়া উঠিল—আমি যাব নাকি শঙ্কর?

সত্যবাবুকে সে শঙ্কর বলিত। সত্যবাবু না-কি তাহাদের কৈলাস সম্প্রদায়ের প্রধান পুরুষ!—শঙ্কর অজিতের দিকে চাহিলেন, অজিত খতমত ভাবে বিমানের দিকে দৃষ্টিক্ষেপ করিলেন, বিমান হাসিয়া বলিল—তুই বস্‌না বাপু!

গঙ্গারাম বসিল না, দুই হাত কাৎ দিয়া এমনই এক বিকট স্বরনিক্ষিপ্ত সুরে বাবা বিশ্বনাথের স্তুতি-গান ধরিল যে তামাম লোক রঙ তামাসা, নাচ গান সব ভুলিয়া, হাঁ করিয়া তাহার দিকে চাহিয়া স্তব্ধ হইয়া গেল। অজিত মৃদু হাসিয়া বলিল—নদীর অশেষ গুণ দেখি! বিমান চক্ষুর ইঙ্গিতে গঙ্গারামকে উৎসাহিত করিয়া বলিল—একটি রত্ন বিশেষ।

তাহারাও বজরার উপরে উঠিল, কনসার্টও থামিয়া গেল। একটি হৃষ্টপুষ্ট গৌরবর্ণ যুবক—একটি সিগারেট ধরাইয়া হার্মোনিয়মে বসিয়া নদীতরের জনতার দিকে চাহিয়াছিলেন, অজিত তাঁহারই সম্মুখে আসিয়া বলিল—কিরণ-দা!—বিমানবাবু এসেছেন।

ভদ্রলোকটি সসম্ভ্রমে উঠিয়া দাঁড়াইলেন, দুহাত তুলিয়া নমস্কার করিয়া একখানি চেয়ার দেখাইয়া বলিলেন—বসুন।

অজিত বলিল—বিমানবাবু, ইনি মিষ্টর কে, সে, গোসাঞী, এম-এ, বি-এল, এই দলের সম্পাদকই বলুন, সভাপতিই বলুন, উনিই সব। রায় বাহাদুর শরৎ গোসাঞীর বড় ছেলে!

ওঃ! আপনার বাবা কেমন আছেন বলুন? তাঁর সঙ্গে একবার আমার খুব আলাপ হয়েছিল।

কিরণ সবিনয়ে বলিলেন—শুনেছি। বাবার চোখ দু'টিত গেছে বয়েই হয়, কিন্তু আপনার কোন নতুন লেখা বেরুলে, কাঁক যাবার জোটি নেই।

বটে?—বিমান হাসিয়া চেয়ারখানায় বসিল। কিরণবাবুর হার্মোনিয়মের পার্শ্বে শুভ্রবেশ পরিহিতা বেহারা দাঁড়াইয়াছিল, সে খান দুই চেয়ার আনিয়া অজিত ও সত্যবাবুকে বসিতে দিল।

বিমান বলিল—আর বাজাবেন না আপনারা?

বাজাব বৈ-কি! ও-হে নরেশ—কিরণ হার্মোনিয়মে সুর দিলেন; মুহূর্ত মধ্যে খানটি গম্ গম্ করিয়া উঠিল। পঞ্চাশটি যন্ত্র বাজিতেছে, আর বাদকগণ যে প্রাণপণ শক্তিতে বিদ্যাটুকু পরিস্ফুট করিয়া তুলিবার চেষ্টা করিতেছেন, তাহা তাঁহাদের মুখের ও অর্দ্ধ-নিমিলিত চোখের দিকে চাহিলে স্পষ্টই বুঝা যায়।

বিমান বলিতেছিল—বেশ হে!

অজিত বলিল—কেমন দাদা? রাস্তায় ভিড় দেখে আমার উপর বড্ড চটেছিলে যে! এত কষ্ট দিয়ে তোমাদের কলকাতা থেকে আন্‌লাম, তখন যে ভারি বলছিলে—

বিমান সস্নেহে তাহার হাতটা ধরিয়া বলিল—নাঃ রে, চমৎকার!

কনসার্ট থামিল, বিমান বলিল—চল অজিত, ৬টার ট্রেনে আবার ফিরতে হ'বে...

এখনি যাবেন?—কিরণও সঙ্গে সঙ্গে উঠিলেন।

অজিত গদগদ কণ্ঠে বলিল—আকাশের দিকে দেখ বিমানদা?

তাই ত, এ যে ইন্দ্রধনু রে! আর যে সবই সুন্দর রে অজিত। স্থলে, জলে, দূরে কাছে দেখ্‌ছিস্!

অজিতের আনন্দ ধরে না।

কিরণ বিমানকে বলিলেন—একবার নীচে নাম্‌তে হ'চ্ছে কিন্তু আপনাকে। একটু কষ্ট দেব?

যেমেন—তা দিন, বলিয়া বিমান হাত ধরিয়া কিরণের সঙ্গে নামিয়া গেল।

অজিতকে টানিয়া সকলে বিমানবাবুর পরিচয় লইতে লাগিলেন। বিমান কে? বর্ত্তমান যুগের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবি এবং ঔপন্যাসিক বিমানবাবু? বয়স ত বেশী নয়, কত, চব্বিশ, ছা, তা হইতে পারে? কিছু কম হওয়াই সম্ভব! সকলের মনই সম্ভ্রমে ভরিয়া উঠিল। অজিতের বন্ধুভাগ্যের প্রশংসা করিতে লাগিল।

অজিত!

যাই বিমানদা...সেও সিঁড়িতে পা দিয়াছে, রক্তমূর্ত্তিতে বিমান সিঁড়ির নীচে দাঁড়াইয়া ভীমনাদ করিয়া উঠিল—রাস্কেল এই দেখাতে এনেছ?

অজিত হতভম্ব হইয়া গেল। "কি হ'য়েছে"—ভাবিতে ভাবিতে নীচে আসিতেই বিমান গর্জ্জন করিলেন—আগে বলেই পারতে অজিত!

অজিত বজরার ভিতরের দিকে চাহিতেই স্তম্ভিত হইয়া গেল। ও কাহারা বসিয়া! সুকেশা, সুরূপা, সুবেশা—ওগুলি কাহারা?

অজিত হাসিল—কিরণদা, এ কতদিন থেকে আরম্ভ করেছ?

কিরণ নতমুখ, নীরব।

আমাদের নৌকো? নৌকো কোথায়?

এই যে গুরুদেব—গঙ্গারাম দাঁড়াইয়া উঠিল; হাতে তিনপয়সা মূল্যের একটা ট্যাম-টেমী, দাঁতগুলি পানের ছোপে টক্‌টক্ করিতেছে। মাথায় একটা বেতের তৈরী মাসের মত টুপী!

বিমান নৌকায় উঠিতেই কিরণ হাত তুলিয়া নমস্কার করিল, কিন্তু বিমান তাহার কোন উত্তর দিল না।

ক্রমশঃ

কর্ত্তা। চরকা নিয়ে খেলা, হতভাগা মেয়ে!

মেয়ে। উঁ।.....

গিন্নী। খেলবে না ত কি করবে? ওঃ কি আমার চরকাওলা বাপ্ গো! এক পয়সার খেলনা দেবার মুরদ নেই আবার মার্।..... কাল থেকে দাঁড়াও না, আমিই ওটাকে নিয়ে খেলব।

নারিকেলের কথা।

(শ্রীপ্রফুল্লকৃষ্ণ ঘোষ)

নারিকেলের ফল সৃজন করিবার সময়ে স্বয়ং ঋষি বিশ্বামিত্রের মনে কি উদ্দেশ্য ছিল তা হয়ত বিশ্বকর্ম্মাও জানিতেন না। নূতন সৃষ্টি করিতে যাইয়া তাঁর প্রখর কল্পনাশক্তি কতদূর উন্মুখ হইয়া উঠিয়াছিল তার আর কোন প্রমাণ আমরা পাই না, শুধু এই নারিকেল ফলই আজ পর্য্যন্ত নূতন ভুবন-সৃজন-প্রচেষ্টার একমাত্র সাক্ষ্য বাঁচিয়া আছে।

এই নারিকেল যে কি এক বিচিত্র ফল তা আমরা অনেকেই জানি না। ছেলে বেলায় ঠাকুরমাকে হেঁয়ালীতে প্রশ্ন করিতে শুনিয়াছি,—

গাছের আগায় জন্ম তাহার
গাছের আগে জল
বলতে পার কিনাম তাহার
বিচিত্র এক ফল ?

নারিকেল এই মানব সমাজের কি কি উপকার সাধন করিতেছে তার সমাক আলোচনা এখানে সম্ভব পর নয়। তবে উহার গাছ হইতে আরম্ভ করিয়া পাতা পর্য্যন্ত কিছুই যে বৃথা নষ্ট হয় না, সবই মানুষের অত্যাবশ্যকীয় দৈনন্দিন ব্যবহার্য্য জিনিষে পরিণত হইতেছে তাহা জানিয়া রাখা আবশ্যক।

পৃথিবীতে এমন আর কোনও ফলের নাম করা যায় না, যাহার ছোবড়া হইতে আরম্ভ করিয়া আঁটি পর্য্যন্ত সকলই মানুষের ব্যবহারে আসে।

গ্রীষ্মপ্রধান দেশেই নারিকেলের জন্ম। সমুদ্র-তীরে লোনা মাটিতেই উহা ভাল জন্মে। গ্রীষ্ম প্রধান দেশে ইহার জন্ম হইলেও সকল দেশে সকল জাতির নিকটেই ইহা পরম আদরের সামগ্রী।

দেখিতে লঘা হইলেও তার চেহারার মধ্যে একটা গাম্ভীর্য্য আছে, সারি সারি নারিকেল গাছ দিয়া বিলাতের Avenue সৃষ্টি হয়। আমাদের দেশেও—সুপারি নারকেল গাছ সারি সারি—না থাকিলে সেটা ভদ্রলোকের বাড়ী বলিয়া গণ্য হয় না।

এই নারিকেল গাছ ৫০ হইতে ৬০ হাত পর্য্যন্ত উঁচু হয়। নারিকেল ফলের চারিটি স্তর—প্রথম ভিতরের স্তরে জল, দ্বিতীয় স্তরে নারিকেলের শাঁস বা খোলা এবং চতুর্থ স্তরে নারিকেলের ছোবড়া এবং সর্ব্বোপরি একটি সবুজ আবরণ। এই বিচিত্র ফলটি সৃজন করিতে বিশ্বামিত্রকে অনেক মাথা ঘামাইতে হইয়াছিল।

ভিতরের জলটি অতি উপাদেয়, নারিকেলের শাঁস ইহার ভিতরের পানীয়কে ঠাণ্ডা রাখিবার পক্ষে সহায়তা করে; তাহার বাহিরে কঠিন খোসা না থাকিলে পেচক জন্তুর হাত হইতে ইহাকে রক্ষা করা কঠিন হইত এবং সেই খোসার বাহিরে ছোবড়ার আবরণ না থাকিলে এই সুপেয় সুস্বাদু জল মানুষের ভোগে আসিত না; কারণ ঐ ৫০।৬০ হাত উঁচু হইতে কঠিন মৃত্তিকার উপর পড়িলে নিশ্চয়ই উহা ফাটিয়া যাইত এবং সঙ্গে সঙ্গে জল টুকুও ফাটিয়া পড়িত।

কচি নারিকেলকে আমাদের দেশে ডাব বলে এবং এই গ্রীষ্ম প্রধান দেশে উহাই আমাদের নিকট অতি উপাদেয় সামগ্রী। এই কচি অবস্থায় নারিকেলের জলটি যেমন ঠাণ্ডা, তেমনি সুস্বাদু। পরে নারিকেলের শাঁস ক্রমে কঠিন হইতে থাকে এবং মিষ্টত্বও ক্রমে ক্রমে বর্দ্ধিত হয়। ভিতরের জল এবং বাহিরের খোসার রস ইহার মিষ্টতা বর্দ্ধনে সহায়তা করে। পাকা নারিকেলকে আমরা বুনো নারিকেল বলি।

কোনও ফল কিম্বা শস্যকে বীজরূপে ব্যবহার করিতে হইলে মাটিতে পুঁতিয়া তাহা পচাইয়া লইতে হয়। কিন্তু এই নারিকেলের আবরণ এমনি কঠিন যে তাহা ভেদ করিয়া ইহার ভিতরে জল প্রবেশ করিবার কোন সম্ভাবনাই দেখা যায় না। তবে উপায় ? কেমন করিয়া এই নারিকেলকে বীজরূপে ব্যবহার করা যাইতে পারে ?

ছুরীর সাহায্যে মুখের ছোবড়াগুলি ছাড়াইলে তিনটি কালো কালো দাগ দেখা যায়, উহাকে নারিকেলের চোখ বলে, এই তিনটির মধ্যে ২টি খুবই কঠিন, কিন্তু তৃতীয় চোখটি নরম এবং ছুরীর সাহায্যে ছিদ্র করিয়া সেই পথে উহার ভিতরের জল বাহির করিয়া আনা চলে।

এই তৃতীয় পথেই জল প্রবেশ করিয়া নারিকেল পচিয়া উঠে, এই পথেই চারা বাহির হইয়া আসে প্রথম চক্ষু দুইটি নিতান্তই মূল্যহীন বলিয়া মনে হয়, কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে তাহা নহে। শত্রুকে প্রতারণা করার পক্ষে এই মিথ্যা চক্ষু দুইটি খুবই সাহায্য করে।

তা ছাড়া উহার আরো অর্থ আছে। তাল, তাগারী খেজুর এবং নারিকেল সকলই এক শ্রেণীর

বৃক্ষ। ইহাদের সকলের ফুল একই ভাবে প্রস্ফুটিত হইয়া ফলে পরিণত হয় একটু লক্ষ্য করিলেই দেখা যায় যে এই সকল গাছের ফুল ছড়ায় ছড়ায় বাহির হইয়া আসে—প্রত্যেক বোঁটায় ৩টি করিয়া ফুল, প্রত্যেক ফুলে ৩টি পাপড়ি, প্রত্যেক ফুলে ৩টি শির এবং ৩টি করিয়া সারি বাঁধিয়া ইহারা চলিতেছে।

সাধারণতঃ দেখা যায়, যে সকল ফলের বীজ অধিক পরিমাণে নষ্ট হইবার সম্ভাবনা সে সকল ফলের বীজ পর্য্যাপ্ত পরিমাণেই ফলে। যে কোনও ফলের ভাঁটি হইতে খোসা ছাড়াইয়া লইলে দেখা যায় ভিতরের শাঁস দুই ভাগে বিভক্ত এবং তাহারই মাঝখানে বৃক্ষের বীজটি সুরক্ষিত আছে। কিন্তু যে সকল ফল কঠিন আবরণের অন্তরালে আপনার বীজটিকে রক্ষা করিয়া রাখিয়াছে তাহাদের ভিতরের শাঁস দুই ভাগে বিভক্ত নহে এবং বীজটিকে তাহারা পরম স্নেহে তবে তবে বুকে জড়াইয়াও রাখে না।

লক্ষ লক্ষ বৎসর পূর্ব্বে নারিকেলের বীজ বর্ত্তমান কালের মত সুরক্ষিত অবস্থায় ছিল না, তাহার বাহিরের খোসাটি তখন নরম ছিল, সুতরাং বীজ নষ্ট হইবার আশঙ্কাও তখন বেশী ছিল। এই কারণে তখন প্রত্যেক নারিকেলের ভিতর ৩টি করিয়া বীজ থাকিত এবং ৩টি ছিদ্রপথে তাহারা বাহির হইয়া আসিত সেই ছিদ্র পথই নারিকেলের চক্ষু।

ক্রমে বাহিরের আবরণ কঠিন হইয়া বীজটি যখন সুরক্ষিত হইয়া গেল, তখন হইতেই সৃষ্টি কর্ত্তা অপর দুইটি বীজ বাহুল্য মনে করিয়া তাহা উঠাইয়া লইলেন কিন্তু মানব জাতির ক্রমবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে তার ল্যাজটি খসিয়া পড়িলেও তার পশ্চাৎভাগে আজও যেমন তার চিহ্ন বর্ত্তমান রহিয়াছে তেমনি নারিকেল জাতির ক্রমবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে তার বীজ দুইটি লুপ্ত হইলেও তাদের ছিদ্রপথের চিহ্ন আজও বর্ত্তমান রহিয়াছে।

বাদামের অবস্থাও ঐরূপই ছিল। পূর্ব্বে উহার ভিতরের শাঁস দুইভাগে বিভক্ত ছিল—ক্রমে উহার বাহিরের আবরণ কঠিন হইয়া ভিতরের বীজ সুরক্ষিত হইয়া গেল এবং তখন হইতেই ভিতরের শাঁস আর দিধা বিভক্ত রহিল না। এখনো মাঝে মাঝে কোন কোন বাদামের ভিতর দুইটি করিয়া শাঁস দেখিতে পাওয়া যায়, যাহারা পূর্ব্বের স্বভাব আজও সে সম্পূর্ণ ভুলিয়া যাইতে পারে নাই।

নারিকেল গাছ ৮ বৎসর বয়সে ফলবান হয়, এবং ৭০।৮০ বৎসর পর্য্যন্ত প্রতি বৎসর ১০০।১২০টি নারিকেল প্রসব করে। এই নারিকেল গাছ আমাদিগকে খাদ্য, পানীয়, বস্ত্র, গৃহ সজ্জা এবং বহুতর নিত্যব্যবহার্য্য বস্তু যোগাইতেছে।

ইহার ভিতরের জল সুস্বাদু পানীয়রূপে ব্যবহৃত হয়। শাঁস বাটিয়া তাহা হইতে নারিকেলের দুধ বাহির করা হয়, এই শাঁস দিয়াই নানাপ্রকার সন্দেশ, মিঠাই এবং পিঠক তৈয়ার করা যায়। নারিকেল হইতে Margarine নামে একপ্রকার জিনিষ তৈরি হয়, তাহা মাখনের মত মোলায়েম ও সুস্বাদু। ছুরী প্রভৃতির বাট বা হ্যাণ্ডেলে নারিকেলের খোলা ব্যবহৃত হয়। এই খোলা হইতে ধূম্রপায়ীদের প্রিয়ধন হুকা প্রস্তুত হইতেছে। নারিকেলের পাতা দিয়া নানাপ্রকার টুপী, ধামা ও পাখা তৈরি হয়। আস্ত গাছ কুঁদিয়া নৌকা তৈরি হয় এবং গাছ চিরিয়া সেই কাঠে ঘরপর্য্যন্ত প্রস্তুত হয়। নারিকেল পাতার ভিতরের সরু কাঠিটি পর্য্যন্ত নষ্ট হয় না—ঐ কাঠি দ্বারা ঝাঁটা প্রস্তুত হয়। নারিকেল তৈল আমাদের দেশের রমণী সমাজের অতি প্রিয় সামগ্রী। লক্ষ্মীবিলাসতৈলের সমাদরই তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। নারিকেল তৈল দিয়া কল ইত্যাদিতে ব্যবহারের জন্য Lubricating oil প্রস্তুত হয়। কেহ কেহ আমাদের দেশে নারিকেল তৈলে আলোও জ্বালিয়া থাকেন।

নারিকেলের ছোবড়া যে কত ভাবে ব্যবহৃত হয়, তা বলিয়া শেষ করা যায় না। নারিকেলের দড়ি ছোটখাট কাজ হইতে আরম্ভ করিয়া বড় বড় ষ্টীমার জাহাজ বাঁধিয়া রাখার কাজে পর্য্যন্ত লাগিতেছে। এই দড়ির গুণ এই যে ইহা ভিজিয়া ও পচিয়া নষ্ট হয় না। এই ছোবড়া দিয়া নানাপ্রকার ব্রাশ (Brush) প্রস্তুত হয়।

ইহার সাহায্যে শতরঞ্চ, তোষক, গদি, ছালার চট, নৌকার পাল মাদুরিয়ার জাল পর্য্যন্ত তৈরী হইতেছে। কাগজের উপাদানও এই নারিকেলের ছোবড়ার মধ্যে বর্ত্তমান রহিয়াছে। জ্বালানী কাঠ হইতে আরম্ভ করিয়া মশাল এবং (Candle) মোমবাতী পর্য্যন্ত এই নারিকেলই আমাদিগকে যোগাইয়া আসিতেছে।

এই বাংলাদেশেই প্রচুর পরিমাণে নারিকেলের চাষ হইতেছে কিন্তু আমাদের এই পরম হিতকারী বন্ধুকে আজও আমরা সমাদর করিতে শিখিলাম না। কত ভাবে বৃথা অপচয় হইয়া যাইতেছে। এই ব্যবসা বাণিজ্যের মূলেও কাহারো দৃষ্টি এদিকে ধাবিত হইল না—ইহা নিতান্তই দুঃখের বিষয়।

মাতৃত্বের কার্য্যক্ষেত্র।

(শ্রীরামানন্দ চট্টোপাধ্যায়।)

জগতে পুরুষদিগের মধ্যে যাঁহারা মহত্তম বলিয়া বিখ্যাত তাঁহারা পারিবারিক স্নেহ-মা-কোন সম্বন্ধে আত্মনির্ভরশীল ছিলেন বলিয়াই মনুষ্য সমাজে শ্রেষ্ঠ স্থান লাভ করেন নাই। তাঁহাদের সাধনা ও সিদ্ধির ক্ষেত্র পরিবারের গণ্ডীতে প্রতিরুদ্ধ করিয়াছিল।

পুরুষজাতীয় মানুষেরা প্রায়শঃ পিতা, পুত্র, পতি, বা ভ্রাতা রূপে বিচারিত হয় না, মানুষ বলিয়াই বিচারিত হয়। তাঁহারা পারিবারিক জীবনের কর্ত্তব্য করিয়াই প্রকৃতিরাজ্যের দাবী হইতে নিষ্কৃতি পায় না। মানুষেরা তাঁহাদের নিকট হইতে আরও কিছু চায়। তাঁহারা বিশ্ব-বিদ্যা ও বিশ্ব-শিল্পের কি পরিমাণে আবিষ্কার পারস্পর্যের সহিত কি ক্রমশঃ ঘনিষ্ঠ করিতে পারিয়াছেন, বিজ্ঞানের ও অপরের আহারে কি উৎকর্ষ সাধন করিয়াছেন, দেশের জাতীয় জীবনে তাঁহারা কি দুঃখ-দুর্গতি হইতে উদ্ধার করিয়াছেন, কাব্য চিত্র প্রভৃতি সৃষ্টি করিয়া তাঁহারা মানুষকে কি অমেয় অনুপ্রাণনা শিক্ষা দিয়াছেন, নৈতিক ও আত্মিক আবিষ্কিয়া দ্বারা কি মহত্ত্ব উদ্ভাবন করিয়াছেন, কি তত্ত্ব নিরূপণ করিয়াছেন, কি সন্দেহের মীমাংসা করিয়াছেন, মানুষ তাহা জানিতে চায়।

আমরা আমাদের শিক্ষা ও জ্ঞানের জন্য কতজনের কাছে কেবলমাত্র পিতা মাতা ও আত্মীয়-স্বজনের নিকটেই ঋণী নহি; সমুদয় সমাজ, সমুদয় জগৎ, সাক্ষাৎ বা পরোক্ষ ভাবে আমাদের শিক্ষক ও অধ্যাপক। সুতরাং আমরা সকলেই সমস্ত-নির্দ্দিষ্ট সমাজের, দেশের, জাতির ও জগতের জন্য সেবা করিতে বাধ্য। ঈশ্বরদত্ত সমুদয় শক্তির সদ্ব্যবহার করিলে আমরা কিয়ৎপরিমাণে এই ঋণ শোধ করিতে পারি।

পারিবারিক জীবনের বাহিরে নারীরও কীর্ত্তি আছে। তথাপি, নারীরা প্রধানতঃ তাঁহাদের পারিবারিক জীবন দ্বারাই বিচারিত হন। কিন্তু তাঁহারা পরিবারের সহিত পারিবারিক সম্বন্ধে সম্বদ্ধ তাঁহাদের প্রতি কর্ত্তব্য সম্পাদন করিয়াও তাঁহারা মানবসমাজের অনেক কিছু করিতে পারেন। অনেক নারী তাহা করিয়াছেন। পুরুষেরা যত তাঁহাদের শিক্ষা, জ্ঞান, সভ্যতা ও আনন্দের জন্য পিতামাতা আত্মীয়-স্বজন ভিন্ন জগতের নিকটের সাক্ষাৎ ও পরোক্ষভাবে ঋণী; এবং এই ঋণ শোধ করা তাঁহাদের ও কর্ত্তব্য। তদ্ভিন্ন, ভগবান্ নারীদিগকেও অন্য বিস্তারের এই সমস্ত গুণ ও শক্তি দিয়াছেন। সুতরাং আমার উৎকর্ষ-সাধন ও এই সকল গুণ ও শক্তির সদ্ব্যবহার করা তাঁহাদেরও কর্ত্তব্য। জগৎকে আনন্দ, অনুপ্রাণনা শিক্ষা দিবার জন্য, মানবের দুঃখ-দুর্গতি মোচনের জন্য পুরুষেরা কত-রকম কাজ করেন, মহিলারাও তাহা করিতে পারেন, এবং তাহা করা তাঁহাদের উচিত।

নারীর মানুষ হওয়ার একটি অবয়ব, মূর্ত্তি, ধর্ম্ম ও স্বরূপ। কিন্তু তাহাই তাঁহার একমাত্র মূর্ত্তি, ধর্ম্ম ও স্বরূপ নহে। পুরুষ যেমন আত্মা, নারীও তেমনি আত্মা। পুরুষ যেমন মানুষ, নারীও তেমনি মানুষ। আমরা নারীর নিকট অবশ্যই এই আশা করিব, যে, তিনি জননী, গৃহলক্ষ্মী, ধাত্রী ও ধাত্রী হইবেন; অবশ্যই এই আশা করিব, যে তিনি নারীপ্রকৃতির সমুদয় সৌরভে ভূষিত হইবেন। কিন্তু এ আশাও করিব, যে, তিনি মহৎ মানুষ হইবেন, শ্রেষ্ঠ মানুষ হইবেন, সেই-সব গুণ ও শক্তির বিকাশ তাঁহাতে হইবে যাহা নারী ও পুরুষ উভয়েরই সাধারণ সম্পত্তি, সেই-সব কাজ তিনি করিবেন যাহা লোক-সেবা সাধারণ ও জগতের ঘর পরিশোধার্থ পুরুষ ও নারী উভয়েই করিতে পারেন এবং উভয়েরই কর্ত্তব্য, সেই-সব আধ্যাত্মিক সাধনা ও সিদ্ধি তাঁহার হইবে যাহা মহিলা ও পুরুষ উভয়েরই হওয়া হইতে পারে, যেন-মা উভয়েই মানবাত্মা এবং উভয়ের সাধনাই পরমাত্মার একই প্রকার সম্বন্ধ।

পরিবারের মধ্যে সুমাতৃত্ব চাই, পরিবারের বাহিরে সুমাতৃত্ব চাই। শিশুর কল্যাণের জন্য যাহা-কিছু প্রয়োজন, তাহার ব্যবস্থা করার নাম সুমাতৃত্ব। আমরা যদি নিজের ঘর বাড়ী খুব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখি, কিন্তু পাড়াপ্রতিবেশীর মধ্যে যদি মহামারক বা ছোঁয়াচে রোগ হয়, তাহা হইলে রোগের বীজ আমাদের বাড়ীতেও আসিতে পারে। সুমাতৃত্বের কার্য্যক্ষেত্র পৃথিবীর বাহিরের বিস্তৃত না হইলে পৃথিবীর মধ্যে উহা ব্যর্থ হইবার সম্ভাবনা আছে।

ইহা যে কেবল শারীরিক স্বাস্থ্য সম্বন্ধেই সত্য, তাহা নহে। চরিত্র মনের পক্ষেও ইহা সত্য।

শিশুর সমুদয় মানসিক পরিবেষ্টন তাহার জ্ঞান ও সুচরিত্রের অনুকূল হওয়া আবশ্যক। এইদিকে দৃষ্টি রাখা, তাহার ব্যবস্থা করা সুমাতৃত্বের কাজ।

সবাই সুখী না হইলে কেহ সম্পূর্ণ সুখী হইতে পারে না, সকলে জ্ঞানী না হইলে কেহই মূর্খতা ও কুসংস্কারের হাত হইতে পূর্ণ মুক্তি পাইতে পারে না, সকলে বীরোচিত না থাকিলে কেহই সাক্রামক ব্যাধির আক্রমণ সম্বন্ধে নিরুদ্বেগ হইতে পারে না, সকলে যথেষ্ট ভোজনে পুষ্ট না হইলে অল্প-বস্ত্রও দারিদ্র্যজনিত সাংক্রামক রোগের কবলে পড়িতে পারে, সকলে নীতিপরি সচ্চরিত্র এবং চিত্তাকর্ষক না হইলে সাধু ব্যক্তিদেরও শান্তিতে বাস করা কঠিন হইয়া যায়। এই-সব কথা প্রাপ্তবয়স্কদের অপেক্ষা শিশুদের জীবনে অধিকতর সত্য। এইজন্য সন্তানের জননীরা কেবল নিজের শিশুসন্তানের স্নেহ যত্ন আর কল্যাণের বিষয়ে যত্নবান থাকিলে সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে না। তাঁহাদিগকে নিজের গৃহদ্বারের বাহিরে যত হইতে হইবেই, পাড়ার সমাজের জাতির দেশের জগতের সুমাতৃত্বের কাজ তাঁহাদিগকে বিশেষের মধ্যে ভাগ করিয়া লইয়া করিতে হইবে।

এই ব্যাপক, ব্যাপকতর ও ব্যাপকতম মাতৃত্ব যাহা বিষয়ক জ্ঞান শিক্ষা এবং সাধনা আপেক্ষ।

মাতৃত্বের ব্যাপকক্ষেত্রে কাজ করিতে হইলে মাতৃজাতীয়াদিগকে বলবদ্ধ হইতে হয়। পৃথিবীর নানাদেশের দু'দশা লইয়া অনেকগুলি মহিলা-সমিতি আছে। পৃথিবীর সকল দেশ হইতে দুরবস্থার দূর করা এইরূপ একটি সমিতির উদ্দেশ্য।

জননীরা নিজের নিজের শিশুদের শরীর মন আত্মার পুষ্টি স্বাস্থ্য পবিত্রতা ও আনন্দ বিধানের জন্য যাহা যাহা চান, সমস্ত জাতের আরও যতগুলি সম্ভব শিশুর জন্য তাহার আয়োজন করিতে চেষ্টা করুন। এইরূপ করিলে মাতৃত্বের আলোক জীবন-পথ আলোকিত করিবে। সেই আলোকে চলিতে চলিতে মাতৃত্ব-শক্তি বাড়িবে। তাহাতে নিজের এবং অন্যের শিশুদের মঙ্গল হইবে।

মাতৃত্ব কেবল যে শিশুদের জন্য তাহা নহে, প্রাপ্তবয়স্কদের

অন্তত নহে। যেখানে দুঃখ দারিদ্র্য রোগ তাপ মলিনতা, সেখানে মঙ্গল-ঘট সেইখানেই কাজ করিবে।

আপনারা তুলিয়া ঐতিহাসিক-দেশে বিয়া অতি ক্ষুদ্র অতি নগণ্য অতি উপেক্ষিতকেও রক্ষা করা মাতৃহৃদয়ের কার্য্য। মাতৃহৃদয়ের কাজ মুখে ও মুখের বাহিরে রহিয়াছে। মাতৃ-জাতীয়ারা যাহা-দিগকে জন্ম দিয়াছেন, কেবল যে তাহাদেরই মানুষ করিতে পারেন, তাহা নহে; অপরেরও পারেন। আমার যাহারা দৈহিক অর্থে মাতা হন নাই, তাঁহারাও বহু শিশু ও প্রাপ্তবয়স্ক লোকদের মানসিক, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক নবজীবনের কারণ হইয়া প্রকৃত মাতৃপদবাচ্য হইতে পারেন।

নব্যভারত।

নারী।

(শ্রীমতী খুরসিদজাহা বেগম)

নারী আজ সর্ব্বদেশে সর্ব্ব কার্য্যে পুরুষের সঙ্গিনী হইয়া তাহাদের সহিত একযোগে কার্য্য করিয়া যাইতেছেন। নারী জাতি, জীবনে মঙ্গল-ময়ী দেবী। গৃহ কার্য্যে, গৃহের শৃঙ্খলা রক্ষণে, সমাজ-জীবন ও জাতীয়-জীবন গঠনে ও আমরা নারীর কৃতীত্ব—তেমনি দেখিতে পাই।

নারীর জীবনের সঙ্গে জাতির জীবন ও দেশের জীবনের যোগ বড় বেশী। নারীর হাসি ভরা মুখের সরস মধুর বচনে ও প্রাণের উৎসাহে জাতীয় জীবন যেমন সঞ্জীবিত হইয়া উঠে এমন আর কিছুতেই হইতে পারে না। আজ বাঙ্গলার মহিলা সমাজ, সমাজ-সেবায়, দেশ সেবায়, সাহিত্য সেবায় আত্ম নিয়োগ করিয়াছেন। দেশ সেবায় নারী তাহার ক্ষুদ্র স্বার্থ, সুখ ও বিলাসিতা বর্জ্জন করিয়া অসীম কষ্টকে বরণ করিয়া লইতেছেন। কুসুম কোমলা নারী যে প্রয়োজন হইলে হৃদয় বলে বলীয়ান হইয়া দাঁড়াইতে বিন্দু মাত্রও সঙ্কুচিতা হন না তাহার প্রমাণ আজ আমরা নিত্যই পাইতেছি।

সাহিত্য ক্ষেত্রেও নারী আজ তাহার অপূর্ব্ব প্রাণশক্তি লইয়া দাঁড়াইয়াছেন। সাহিত্যের সঙ্গে জাতির যোগ-সূত্র বড় নিবিড় সম্বন্ধে আবদ্ধ। নারী রচিত সাহিত্যে আমরা দেশের প্রাণ স্পন্দন বড় বেশী আশা করি। দেশের সর্ব্বকার্য্যে আজ নারীকে শক্তিময়ী মূর্ত্তিতে দাঁড়াইতে দেখিয়া আমাদের মনে কত আশা হইতেছে। নারী খেলার পুতুল ও বিলাসের সামগ্রী না রহিয়া যদি দেশের সত্য মাতা, ভগিনী, সহধর্ম্মিণী রূপে পরিচিত হইতে পারেন তবেই দেশের মঙ্গল, তবেই নারীর নারী নামের সার্থকতা।

পুত্র কন্যার শিক্ষা বিধানে ও চরিত্র গঠনে নারীর অসীম প্রভাব আমরা যেমন অনুভব করিতে পারি এই 'নারী-মঙ্গল' বিভাগে আমরা দেশীয় ও বিদেশীয় মহিলাদিগের কর্ম্ম পদ্ধতির প্রদান করিব।

শ্রীযুক্ত ধনিরাম গৃহীত
ফোটোগ্রাফ হইতে।

ভিক্টোরিয়া স্মৃতি-সৌধ।

সচিত্র সাপ্তাহিক

বাসন্তী

নব-পর্য্যায়।

প্রথম বর্ষ।] ৩১শে আষাঢ় শনিবার, ১৩ ৯ সাল। [দ্বিতীয় সংখ্যা।

বাঙ্গালার শ্রেষ্ঠা ফিল্ম অভিনেত্রী
শ্রীমতী সুশীলাবালা দেবী।

Lakshmibilas Press, Calcutta.

অর্থাভাবে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ শিক্ষা বিভাগ (পোষ্ট গ্রাজুয়েট) উঠিয়া যাইবে কথা উঠিয়াছিল। সরকারের নিকট হইতে সাহায্য না পাওয়ার দরুণই কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এই অর্থ সঙ্কট পড়িয়াছিল। ঘাটতি পড়িয়াছে প্রায় পাঁচ ছয় লক্ষ টাকা। তবে এবারকার কৌন্সিলে অনেক বাদানুবাদের পর বাংলা সরকার হইতে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে সম্প্রতি আড়াই লক্ষ টাকা মঞ্জুর করা হইয়াছে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় পূর্ব্বে ভারত গবর্ণমেণ্টের অধীনে ছিল, এখন হইতে উহা বাংলার সরকারের অধীন হইল। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ঠিক দেশ কালের উপযোগী শিক্ষা প্রথা দেশে প্রচলিত করিতে পারিয়াছে কিনা সে সম্বন্ধে অনেক মতদ্বৈধ থাকিতে পারে, তবে এই বিশ্ববিদ্যালয় যে বাংলা তথা ভারতের গৌরব, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। অর্থাভাবে যদি ইহার উচ্চ শিক্ষা বিভাগ উঠিয়া যাইত তবে সরকার তথা দেশবাসীর পক্ষে পরম অগৌরবের কারণ হইত। এ বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই।

• • • •

বাংলার লাট মজলিসে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় লইয়া আলোচনা ও বাগবিতণ্ডা চলিবার সময় মুসলমান সভ্য মৌলবী কজলল হক অভিযোগ আনাইয়াছিলেন যে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে মুসলমানদের সেরূপ স্থান বা প্রভাব নাই। তাই এই বিশ্ববিদ্যালয়ে অর্থ সাহায্য করিবার বিরুদ্ধে মত তিনি দিয়াছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চান্সেলর মুসলমান হইতে পারেন নাই বা সেরূপ কোন সম্মানজনক কার্য্যভার মুসলমান সমাজ হইতে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে কেহ পান নাই—এজন্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কিম্বা বিশ্ববিদ্যালয়কে দোষী করা যাইতে পারে না। শুনিয়াছি এবারও সার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্য্যভার দিবার পূর্ব্বে মুসলমান সার আব্দুর রহিম ও নবাব সার সামসুল হুদাকে এই কার্য্যভার গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহারা কেহই এ কার্য্যভার গ্রহণ করিতে সম্মত হন নাই। মুসলমান সমাজ হইতে কেন, কোন ইংরাজ বা হিন্দুও এ কার্য্য গ্রহণ করিয়া তেমন সুচারুরূপে কার্য্য চালাইতে পারেন নাই—অনেকেই কার্য্যভার গ্রহণ করিতেই স্বীকার করেন নাই। তাই বাধ্য হইয়া অবশেষে সুসময়ে সার আশুতোষকেই ইহার কার্য্য ভার দেওয়া হইয়াছিল। সার আশুতোষের নামের সঙ্গে ও কার্য্যের সঙ্গে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় যেন একেবারে পরতে পরতে জড়িত হইয়া গিয়াছে। আর এই সার আশুতোষও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে এমনভাবে যে জড়াইয়াছেন—সেও সার আশুতোষের কর্ম্ম-দক্ষতা গুণেই।

• • • •

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অব্যবস্থা বা সুব্যবস্থার সম্বন্ধে কোন কথা উঠিলেই বাংলা দেশের অনেকেই সার আশুতোষকে ইহার সঙ্গে এমনভাবে লিপ্ত করিয়া ফেলেন যে তাহাতে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় অনেক নীচে পড়িয়া যায়—উপরে ভাসিয়া উঠেন সার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে সরকার মনোনীত সভ্য শতকরা আশী জনের কম নাই, তাহার উপর বাংলা দেশের শিক্ষিত ব্যক্তিরাই ইহার সভ্য বা সহযোগপদে নিযুক্ত হইতে পারেন। ইহাদের বিনানুমোদনে সার আশুতোষের একের ইচ্ছায় কোন কাজ হইতে পারে না। সুতরাং সার আশুতোষকে কোন বিষয়ে একা দোষী করা যায় না। তাহার আজিকার কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এ উন্নত অবস্থা সার আশুতোষের দ্বারাই হইয়াছে। নতুবা এ অবস্থায় সার আশুতোষ ভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের এই উন্নত রূপ দিতে অপর কেহই পারিতেন না।

• • • •

আজ দেশের চারিদিকে ইহার সন্তোষের কথা চলিতেছে।

বিলাত হইতে লর্ড ইরুকেশ ভারতের ব্যয় সঙ্কোচ ঘটাইবার জন্য ভারতে আসিতেছেন। ভারতীয় শাসন ব্যাপারে আজ সব দিকে অতিরিক্ত ব্যয় বাহুল্য চলিতেছে। এই ব্যয় সঙ্কোচের প্রয়োজনীয়তা দেশবাসী যেমন হাড়ে হাড়ে বুঝিতেছে দেশের গবর্ণমেণ্টও সেইরূপ অনুভব করিতেছেন, তাই এ ব্যবস্থা হইয়াছে। দেশের গবর্ণমেণ্টের বড় ব্যয় সৈন্যবিভাগ ও পুলিশ বিভাগ পোষণের জন্য। তারপর রিফর্ম গবর্ণমেণ্ট ভারতে প্রচলিত হইবার পর আরও নানা বিভাগে ব্যয় বাহুল্য অতিরিক্ত হইয়া গিয়াছে। এ সব ব্যয় কি ভাবে সঙ্কোচ হয় তাহা দেশবাসী দেখিবার প্রতীক্ষায় আছে।

• • • •

ভূতপূর্ব্ব বড়লাট কৌন্সিলের খ্যাতনামা সদস্য অধুনা অ-সহযোগী শ্রীযুক্ত প্যাটেল এলাহাবাদে বক্তৃতা দানকালে বলিয়াছেন, গত দুই বৎসরে মডারেটগণ ভারতের উপর চল্লিশ কোটী টাকা অতিরিক্ত কর ভার চাপাইয়াছিল। এ অভিযোগ বড় গুরুতর অভিযোগ। যে দেশে অন্নাভাব, বস্ত্রাভাব, আজ দেশবাসীকে জ্বালাইয়া মারিতেছে সে দেশে যদি সাড়ে-শাসন লাভ হইবার পর হইতে এইভাবে ব্যয়ভার বাড়িয়া গিয়া থাকে তবে দেশবাসী এ সংস্কারকে কি ভাবে গ্রহণ করিবে?

• • •

এবার বাংলার লাট কৌন্সিলের এক সদস্যের প্রশ্নের উত্তরে জানা গিয়াছে যাঁহারা সভার আরদালি লাট মজলিসের সভ্য হইয়াছেন তাঁহারা নিজেদের মাসিক খরচ ইত্যাদি বাবদ কেহ তিন হাজার কেহ চারি হাজার—কেহ কিছু কম কেহ কিছু বেশী টাকা সাধারণের তহবিল হইতে গ্রহণ করিয়াছেন।

•

কৌন্সিলে একজন সভ্য প্রশ্ন করিয়াছিলেন:—কোন সভ্যকেই এ ভাবে মাসিক খরচ ইত্যাদি বাবদ কিছু না দিয়া সকলকেই বাৎসরিকী হিসাবে তিন হাজার করিয়া দেওয়া হোক্। কৌন্সিলে সে প্রশ্ন টেঁকে নাই। প্রশ্ন টেঁকে নাই বটে—বাৎসরিকী তিন হাজার করিয়া দেওয়া হয় নাই বটে—তবে কল সমানই—এ ভাবেও ত প্রতি সভ্যই বিশ করিয়া তিন হাজার ছাব্বি হাজার করিয়া লইতেছেন। তবে আর বাৎসরিকী বাঁধিয়া দিতে ক্ষতি কি?

কলিকাতার কোন এ্যাসিং সিপিং আফিসে একজন বাঙ্গালী কেরাণী বদলি পরিয়া গিয়াছিলেন; বড়বাবু বা বড় সাহেব তাহাকে পোষাক বদলাইয়া আসিবার জন্য দু' ঘণ্টা সময় দিলেন। অপর একজন বাঙ্গালী ভদ্রলোক কলিকাতার কোন ইংরেজী কাগজে কাজ করেন। বাদলার রাতে তিনি দেশীয় পোষাক পরিয়া আফিসে গিয়াছিলেন। বড়কর্ত্তার অর্ডার হইল ঠিক জায়গায় বসিতে হইলে যথাযোগ্য পোষাকে আফিসে আসিতে হইবে। বাস্—তখনি হুকুম তামিল। প্রভু ভৃত্যের সম্বন্ধ বড় মধুর!

• • • •

লক্ষ্ণৌ হইতে প্রকাশিত একখানি উর্দ্দু দৈনিকে প্রকাশ বোম্বাই গবর্ণমেণ্ট সম্প্রতি আলি ভ্রাতৃদ্বয়ের অভিভাবকের কার্য্য করিতেছেন। জেল সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের আদেশ জারী হইয়াছে ইহাদের সহিত কথাবার্ত্তা কহিতে হইলে তাহা জেল সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের সম্মুখে ইংরেজীতে কহিতে হইবে। ইহার মানে আলী-ভ্রাতৃদ্বয়ের মাতা বৃদ্ধা বাই আম্মাকে আবার ইস্কুলে গিয়া ইংরেজী শিখিতে হইবে, নতুবা ত আর ছেলেদের সহিত কথা বলিবার ভাগ্য হইবে না।

• • • •

কলিকাতার রাজপথে চলিতে আজকাল প্রায়ই দেখা যায় দুটি বা একটি পুরুষের সঙ্গে একটি বা দু'তিনটি নারী রহিয়াছে। এই লোকগুলি পশ্চিমের নহে। ইহাদিগকে দেখিয়া ইরাণী বলিয়া মনে হয় বা ঐরূপ পার্ব্বত্য কোন জাতীয় বলিয়া ধারণা হয়। ইহাদের পুরুষ গুলির চেহারাও মন্দ নহে, নারী গুলির মধ্যে অনেকেই পরমা-সুন্দরী, সুগঠিতা, বেশ লাবণ্যমণ্ডিতা। এই শ্রেণীর অযুত নর নারীরাই কি জিপসি নামে অভিহিত হয় নাকি? ইহাদের ঘর বাড়ী কলিকাতা সহরে কোথাও আছে কি? ইহারা থাকে কোথায়? কলিকাতায় ইহাদের রুজি কি? কি উপায়ে ইহাদের দিন চলে? আর এই পরমাসুন্দরী নারী লইয়া ইহারা পথে পথে ঘুরিয়াই বা বেড়ায় কেন? আজব সহর কলিকাতা, এখানে বাঙ্গালীর অন্ন জুটুক আর নাই জুটুক, ভিন দেশীয়ের অন্ন জুটিবেই সন্দেহ নাই—তা সে যে উপায়েই হউক না কেন।

• •

বাংলায় বর্ষা আসিয়াছে, জলকষ্ট ঘুচিয়াছে। বাংলায়

আকাশ আজ মেঘ মেহুর, পবন আজ ভারাক্রান্ত। বর্ষার বর্ষণ দেখা দিয়াছে—সারাদিন ঝির ঝির ঝম্ ঝম্ বারি বরিষণ হইতেছে। এই বারির আশায় বাংলার কোটী কোটী নরনারী উদ্গ্রীব হইয়াছিল, আজ তাহাদের আশা মিটিল। সময়ের বারি সময়ে বরিষণ না হইলে জীবের যে দুর্দশা হয় তাহা জীব বুঝিতে পারে। তখন—যখন প্রকৃতির নির্দ্দয় আঘাতে তাহাদের মোহ ভাঙ্গিয়া যায়। অনাবৃষ্টি বা অতিবৃষ্টি দেশের লোকের পক্ষে কিছুই মঙ্গলকর নহে। সময়ের যাহা তাহা না হইলেই আমাদের দুর্ভাগা দেশে হাহাকার পড়িয়া যায়। নিজের কিছুই করিবার ক্ষমতা নাই আমাদের—তাই প্রকৃতির মুখ চাওয়া জীব আমরা প্রকৃতি বিরূপ হইলেই আকুল হইয়া পড়ি।

* * *

সম্প্রতি বার্লিন হইতে ইউরোপের নরনারীর সংখ্যা কত তাহারই একটা হিসাব বাহির হইয়াছে। এই হিসাবে দেখা যায় ইউরোপে পুরুষের সংখ্যা এখন ২২৫০০০০০০, আর নারীর সংখ্যা ২৫০০০০০০০। নারীর সংখ্যা তাহা হইলে এখন সমগ্র ইউরোপখণ্ডে পুরুষ অপেক্ষা অনেক বেশী; প্রতি হাজারে এখন নারীর সংখ্যা ১,১১১ জন। যুদ্ধের পূর্ব্বে নারীর সংখ্যা পুরুষের অপেক্ষা হাজার করা ২৮ জন মাত্র অধিক ছিল। ইউরোপে পুরুষের চেয়ে নারীর সংখ্যা ক্রমশই অধিক হইতেছে। যুদ্ধের পূর্ব্বে ফ্রান্সিয়ার পুরুষের অপেক্ষা নারীর সংখ্যা শতকরা ৪জন বেশী ছিল এখন হইয়াছে ৩০জন বেশী। গ্রেটব্রিটেন, অষ্ট্রিয়া, জার্ম্মেনী, যুগো সার্ভিয়া, ফ্রান্স ইটালী প্রভৃতি স্থানেও এই পরিমাণেই নারীর সংখ্যা বেশী। এদিকে, ডেনমার্ক, নরওয়ে, সুইজারল্যাণ্ড, হলাণ্ড প্রভৃতি দেশ যাহারা যুদ্ধে লিপ্ত হয় নাই তাহারা নারী ও নরের সংখ্যার বৈষম্য ক্রমেই পুরাইয়া লইতেছে।

শুভম বস্তু ভয়ানক জিনিষ। ইহার হাত হইতে কাহারও অব্যাহতি পাওয়ার উপায় নাই। অমন যে দেবকুলা মহাত্মা তাঁহারও শুভমের হাত হইতে নিস্তার নাই। শুভম তাঁহাকে লইয়াও খেলা করিতেছে। শুভমাটের প্রাণে প্রাণে এই শুভম দেবতার সম্বন্ধে শুভম রটিতেছে যে মহাত্মাজীকে মুক্তি দিয়া তাঁহাকে বিচার বিভাগে একটা মোটা মাহিয়ানার চাকুরী দেওয়া হইবে। বাহবে চাকুরী! হাজার মোটা মাহিয়ানা—সবই তোমরা করিতে পার।

কৌন্সলে বাবু ইন্দুভূষণ দত্ত (ইনি বহুদিন বিলাতে অধ্যয়ন করিয়াও এ পর্য্যন্ত মিষ্টার হইতে পারেন নাই) ব্যয় সংক্ষেপের কথায় প্রশ্ন করিয়াছিলেন, এ কমিটির কার্য্য ক্ষমতা কত দূর। বাংলা যে এরূপ ব্যয়-বহুল ইন্সিটিউশন সমূহ রাখিতে অক্ষম ইহারা কি উহা বিবেচনা করিতে সক্ষম হইবেন? যখন আমি মনে করি যে আপানের উচ্চ সিবিল সার্ভিসের লোকে বৎসরে ৫০০০০ টাকা হইতে ৬০০০০ টাকা পান, এখানকার ইনস্পেক্টর জেনারেলের সমান পদবীর বেতন দেখার বৎসরে মাত্র ১৫০০৲ আর সেখানে বাংলার ঐ পদবীর লোকেরা প্রায় তিন গুণ পান তখন আমার মনে হয় বিপুল ধনশালী আমেরিকার ২৪০০০ বাৎসরিক মাহিনার মাত্র তিনটি পদ আছে, অন্যান্য পদের বেতন ৬০০০৲ হইতে ৫০০০৲ পর্য্যন্ত; তখন আমার মনে হয় এ কমিটিতে শাসক ও সাধারণ এ সকলেরই যোগ দেওয়া উচিত।" নিরন্ন বাংলা কি করিয়া কি উপায়ে এই খরচ যোগায়?

পুলিশ—কেয়াবাৎ! তোম বোলতা হ্যায় হামকো ঘুস দেগা! এইসা বাৎ বোলকে সরকারকো অপমান করতা!

পথিক—'ক্ষমা কর বাবা, পুলিশ সাহেব—আমি—'।

পুলিশ—'আচ্ছা ধর লেও—হাম তেইসা আদমী হ্যায়, আভি তোম কেতনা দেনে সেকোগে!

—•—

বর্ষা খুব ঘন ঘটা হইয়া নামিলেও ওমোট কমে না। নরম-গরম চানাচুর!

মহাত্মা গান্ধীর পত্নী বলিয়াছেন, ইংরাজকে আমাদের চাই-ই, এবং ভারতের বাহিরে নয়, ভিতরেই চাই। তবে শাসক ও শোষক রূপে নয়, বন্ধু ও সমান হিসাবে।

—•—

শ্রাবণ মাসের পরে পাঁজিতে শুভদিনের নির্ঘণ্টে তিন-তিনটা মাসের আর উল্লেখই নাই। অনন্ত অন্ধকার জাঁকাশ বলিয়া রাখিলাম।

বাংলার ভাগ্য।

(শ্রীজ্ঞানেন্দ্র নাথ চক্রবর্ত্তী)

"মরো বঙ্গভূমি মাতঙ্গিনী
যুগে যুগে তুমি লোকপালিনী মা!"

কবি বঙ্গমাতার অন্নপূর্ণা মূর্ত্তি ধ্যানে আনিয়া সকল কাব্য কথায় তাহাতেই প্রাণ সঞ্চার করিয়াছেন। বাংলার আকাশে বাতাসে, তাহার পল্লীতে, নগরীতে, নদনদী, পর্ব্বত বনানীতে এমনি একটা শান্ত মধুর শ্রী বিরাজ করিতেছে যাহা দেখিয়া অন্যান্য প্রদেশের অধিবাসীদিগের মনে বাংলার প্রতি একটা লোভ, একটা মোহ জন্মিয়া যায়। বাংলার সোণার বরণ শস্যরাজি পরিপূরিত মাঠ, বিস্তীর্ণ প্রান্তর দেখিলে মনে ইর্ষা জাগে, আনন্দ হয়। বাংলার বৃক্ষরাজিতে এত প্রকার সুমিষ্ট ফল ফলে; তেমন বোধ হয় আর কোন দেশে ফলে না। বাংলার ভূমির যত উর্ব্বরা শক্তি বোধ হয় অপর কোন দেশের নহে। বাংলার সবই মধুর; এমন বৈচিত্র্যময়, সৌন্দর্য্য পরিপূরিত দেশ বোধ হয় খুব কমই আছে।

বাংলার সবই বিচিত্র, সবই মধুর, সকলই অতুলনীয়। তবু যখন তুমি বাংলার সহরে সহরে, পল্লীতে পল্লীতে লোকে অন্নাভাবে না খাইয়া মরিতেছে, জলাভাবে তৃষ্ণায় ছাতি ফাটিতেছে, সহস্র সহস্র নর নারী দুর্ভিক্ষোদ্ভূত জীবন ব্যাধির প্রকোপে প্রাণ বিসর্জ্জন দিতেছে—তখন সত্য সত্যই মনে হয়, এত সুন্দর এমন মধুর দেশবাসীর এ হীন অবস্থা কেন? কেন এই সুন্দর শস্যপূর্ণ দেশের সহস্র সহস্র নর নারী অন্নাভাবে হা অন্ন—বো অন্ন করিয়া প্রাণ বিসর্জ্জন দেয়। কেনই বা এ দেশে ব্যাধি পীড়ার এত প্রাদুর্ভাব।

ভূমির উর্ব্বরা শক্তি যদিও বা কিছু কমিয়া থাকে, তবু বাংলার সর্ব্বত্র ভূমির এতটুকু উর্ব্বরতা আছে, যাহাতে সে তাহার দেশকে আহার দিয়া বাঁচাইয়া রাখিতে পারে। সস্যশ্যামল; নব নবী শিশিরস্নাথী পরিশোভিত বঙ্গের নীলাকাশের বায়ু প্রবণও বোধ হয় এমন বিষাক্ত হইয়া যায় নাই যাহাতে বাংলার নর নারী ও শিশু সন্তানদিগের অকাল মৃত্যুর এমন আধিক্য হইতে পারে। বাংলার ম্যালেরিয়া, মহামারী, বসন্ত, ইনফ্লুয়েঞ্জা আরও কতপ্রকার নূতন নূতন ব্যাধি যেন তাহাদের ধ্বংসের আসন একেবারে পাতিয়া বসিয়া আছে। বাংলা জুড়িয়া এই ধ্বংস লীলার বিরাট তাণ্ডব নর্ত্তন চলিয়াছে। বিশ্বের উপর দেবতা যদি কেহ থাকেন ত এ ধ্বংস লীলায় তাঁহারও সিংহাসন কাঁপিয়া উঠিবার কথা। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই বাংলার সাহস ক্ষমতা,—চারিধারের এই বিরাট ধ্বংস লীলার মধ্যেও সে মরিয়া বাঁচিয়া রহিয়াছে।

বাংলার প্রাণের ধারা বা তাহার জাতীয় বিশিষ্টতার আমরা যতই কেন খোঁজ করি না, সকলের উপরে সেইটাই আমাদের মনে ও চোখে বড় বাজে,—যে বৈশিষ্ট বাংলার জীবনমৃত অস্তিত্বের শোচনীয় হীন অবস্থাতেই সুপ্রকাশ।

বঙ্গভূমির এই নিত্য নব সৌন্দর্য্যের রসধারা পান করিয়া দেশ দেশান্তরের লোক তাহাদের সৌন্দর্য্য সম্পদ বর্দ্ধিত করিয়া লইতেছে;—বাংলা হা মুখে অবাক বিস্ময়ে তাহাই দেখিতেছে আর ভাগ্য ভাগ্য বলিয়া নিজের কপালে করাঘাত করিতেছে।

সমগ্র বঙ্গে এখন বঙ্গের সত্য অধিবাসী চির বিদেশীর কত আছে? বোধ হয় সংখ্যায় তাহা কম হইবে না। বাংলার অর্থ সম্পদ শস্য স্বাস্থ্য তাহারা পূর্ণ মাত্রায় উপভোগ করিতেছে কিন্তু বাঙ্গালার দুর্ভিক্ষ বাংলার মহামারিতে তাহারা তেমন ভুগিতেছে না, যত ভুগিতেছে বঙ্গের অধিবাসিগণ।

পরবশতায় সমগ্র ভারতের যে অপকার হইয়াছে, চারিদিক হইতে হীনতায় ও দুর্ব্বলতায় সে যে আচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছে তাহাতে সংশয় নাই। কিন্তু ভারতের অপর সকল প্রদেশের তুলনায় বঙ্গের যাহা অবস্থা হইয়াছে তাহা ভাষায় বুঝাইতে পারা যায় না। বাঙ্গালী আজ

তাহার যত্নের বহুমূল্য রত্ন সন্তার পরের হাতে সঁপিয়া দিয়া পরে স্বেচ্ছায় তাহার হাতে মাথা তুলিয়া দিতেছে সে তাহাতেই তৃপ্ত হইতেছে। পল্লী নির্জ্জীবতায় সমস্ত জাতি এমন অলস অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িয়াছে যে তাহার নিজের চেষ্টায় কিছু করিয়া খাইবার সামর্থ একেবারে লোপ পাইতে বসিয়াছে।

বাংলার পল্লীগুলি যাহা কিছুদিন পূর্ব্বেও পরম শান্তির স্থান ছিল তাহা যেন একেবারে শ্মশানের মত হইয়া গিয়াছে। পল্লী যেন তাহার সমস্ত লক্ষ্মী শ্রী হারাইয়া বিধবা নারীর মত রুদন-ভূষণ-প্রাণহারা হইয়া পড়িয়া আছে। গ্রামে গ্রামে গৃহস্থের বাটীতে বাটীতে এমন বার মাসে তের পার্ব্বণ নাই, নিত্য সন্ধ্যায় শঙ্খ ঘণ্টা কাঁসরের শব্দে আর ঘরে ঘরে দেবতার আরতি হয় না। মঙ্গল শঙ্খের মধুর কণ্ঠ আর যেন লক্ষ্মীকে আহ্বান করিয়া লইতে পারিতেছে না। যে প্রাণ, যে উৎসাহ দেখিয়া লক্ষ্মী আপনি আসিয়া ধরা দেন, সে প্রাণ, সে উৎসাহ যেন বাংলা হইতে অন্তর্হিত হইয়া গিয়াছে।

বাংলার পল্লীতে পল্লীতে আজ ভীষণ জল কষ্ট। পূর্ব্বকালে—বেশী দিন আগের কথা নয়, পুণ্য-ব্রত নয় নারীগণ জলাশয় খনন করাইয়া লোকের জলপানের ব্যবস্থা করিয়া পুণ্য সঞ্চয় করিতেন। এখন সেই হইতে সে প্রথা উঠিয়া গিয়াছে। এইভাবে অনেক গ্রামে যে সমস্ত জলাশয় খনিত হইয়াছিল তাহা যত্নের অভাবে, পঙ্কিল গণ্ডগোলে ভরিয়া মজিয়া গিয়াছে। গ্রামের লোক জলাভাবে মরিবে তাহাতেও রাজী কিন্তু নিজেরা বল চেষ্টা করিয়া পুকুরটির সংস্কার করিবে বা অপর একটি জলাশয় খনন করাইবে সে উৎসাহ উদ্যম তাহাদের নাই। যদি কেহ ভাল করিয়া দেয় ভাল—নতুবা কি প্রয়োজন। এই যে শান্ত উদাসিনা, এই যে নিষ্কর্ম্ম ভাব ইহাই এখন বাংলার বৈশিষ্ট, ইহাই এখন জীবন্মৃত বাঙ্গালী সমাজের প্রাণ।

গ্রামে গ্রামে লোকের বসত বাটীর সম্মুখে বহু জমি অকর্ষিত অবস্থায় পড়িয়া রহিয়াছে, সে জমিগুলি জঙ্গল-কীর্ণ ও ডোবা পরিণত হইয়া গ্রাম গুলিকে অস্বাস্থ্যের নিদান করিয়া তুলিতেছে। অথচ সেই জমিগুলি পরিষ্কার করিয়া তাহাতে শাক সব্জি তরিতরকারী ফলাইলে এক গৃহস্থের সংসার খরচ স্বচ্ছন্দে চলিয়া যাইতে পারে। গৃহস্থ সে ব্যবস্থায় মন না দিয়া সহরে কিম্বা গ্রামেই কোন পদের টাকা আদায়ের কর্ম্মের উমেদার হইয়া দিবা নিশি ঘুরে।

নিরক্ষর কৃষকেরা চাষবাস করিয়া কোনরূপে খাইতেছে —তাহাও বিধাতা বাংলার উপর সুপ্রসন্ন বলিয়া। নতুবা কোন বৎসর অতিবৃষ্টি বা অনাবৃষ্টি হইলে বাংলা দেশের কৃষাণদের মুখ শুখাইয়া যায়। আকাশের পানে চাহিয়া দেবতার অনুগ্রহ ভিক্ষা করা ভিন্ন তাহাদের নিজেদের করিবার আর কিছুই থাকে না।

অশিক্ষিতের কথা ছাড়িয়া দিলে অল্প শিক্ষিত বা অধিক শিক্ষিত জন সমাজের অবস্থা আরও ভীষণ। শিক্ষায় লোকের যোগ্যতা বর্দ্ধিত করে, আত্মবিশ্বাস দৃঢ় করে। কিন্তু আমাদের দেশের শিক্ষায় লোককে আত্ম অবিশ্বাসী এবং সর্ব্ববিষয়ে অযোগ্য করিয়া তোলে। অল্প শিক্ষা পাইবাই দেশীয় কাষের কুমার, তাঁতি তাহাদের কায়িক ব্যবসায় ছাড়িয়া সকলে চাকরীর সন্ধানে ছোটে। অধিক শিক্ষা পাইয়া লোকে চাকরীর সন্ধান করিতে করিতে যখন নিরাশ হয়—বিরক্ত হইয়া পড়ে, তখন তাহার অযোগ্যতা ও অকর্ম্মণ্যতা বুঝিয়া সে ম্রিয়মান হইয়া পড়ে।

বাঙ্গালীর একটা ধারণা হইয়াছে—সে পরের কাজ করিতে যেমন দক্ষ, আপনার কাজে তাহার শতাংশের একাংশও নয়। পরের কাজ সে প্রাণ দিয়া করিবে, না পারিলে প্রভুর বাক্যবাণ ছাই চিত্তে পরিপাক করিবে; অথচ নিজের কোন কাজে গেলেই সে অলস অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িবে।

একজন বা দুই জনের এ অবস্থা নহে; সমগ্র বঙ্গের কমপক্ষে পুরুষ মাত্রেরই এই দশা। তাই সোনার বাংলার আজ এই ম্লান অবস্থা, তাই বাংলার যুবকেরা সোজা হইয়া হাঁটিতে পারে না,—তাই তাহাদের মুখে হাসি নাই—প্রাণে উৎসাহ নাই। তাই তাহারা জীবন থাকিতেও জীবন্মৃত হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে। বাঙ্গালীকে আজ জীবনের সাধনা করিতে হইবে, প্রাণের সন্ধান লইতে হইবে, জীবনের সঞ্জীবনী উৎসের সন্ধান লইয়া তাহাকে কর্ম্মক্ষেত্রে ঝাঁপাইয়া পড়িতে হইবে; আর ভগবানের কাছে প্রার্থনা করিতে হইবে—ভগবান্, আত্ম-অবিশ্বাস নাশ কঠিন আঘাতে।"

ডাক্তার। না, রোগী টুগী না ছুঁলে আর চলে না। কোন ব্যাটার কিছু হ'বার নামটি নেই।

স্ত্রী। এক কাজ কর, পাড়ার লোকগুলোকে মেরেয় করে খাবারের সঙ্গে কিছু খাইয়ে দাও···ঘুমে আসলে উঠে আসবে।

পিতা:—তোমার বিয়েতে টাকা আমায় দিতেই হবে, নইলে উপায় নেই। বাপ-ভাবনা কি দিয়ে? পাওনা-দারদের জন্যেই এ না-দিয়ে উপায় নেই।

পুত্র:—যেন বাবা, পাওনাদারদের টাকার যদি এতই দরকার হয় ত তারা নিজেরা বিয়ে করে টাকা যোগাড় করলেই তো পারে।

চাতক। ফটিক জল, ফটিক জল!

(এক বিন্দু পড়িল)

চাতক। বিদ্যুতে কি মেটেরে ঐ সিন্ধুসম ক্ষুৎ-পিপাসা?

জলধর। আড়াই লাখ—ধর, ধর।

বহির্জগতে হট্টগোল। আল্লা-হো-আকবর!

চাতক। নিরুপায়, আড়াই-আড়াই-ই সই।

রোকশোধ

শ্রীনারায়ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

নরোত্তমপুরের মহেন্দ্রনাথ রায় শুধু যে ধনের জন্যই প্রসিদ্ধ ছিলেন তাহা নহে, দাতা ও পরোপকারী বলিয়াও লোকে তাঁহার প্রশংসা কীর্ত্তন করিত। খুব বড় জমিদার না হইলেও যে অল্প স্বল্প জমিদারী ছিল, জমিদারীর অবস্থা ভাল হওয়ায় তাহার যে আয় ছিল, অনেক নাম মাত্র সার বড় বড় জমিদারের আয়ও সেরূপ ছিল না। ব্যয়ও তাঁহার যথেষ্ট ছিল; দেশের রাস্তাঘাট, স্কুল, দাতব্য চিকিৎসালয় প্রভৃতি সাধারণ হিতকার্য্যে তিনি অনেক টাকা ব্যয় করিতেন। তাঁহার চেষ্টায় একটী অবৈতনিক বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। এই বিদ্যালয়ের সম্পূর্ণ ব্যয়ভার তিনি বহন করিতেন। এ সকল ছাড়া অনাথ আতুরদিগের সাহায্যের জন্য তিনি একটী সাহায্য ভাণ্ডারের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। অনাথ বিধবাদিগের সাহায্যও তাঁহার একটী অত্যাবশ্যক কর্ত্তব্য কর্ম্মের মধ্যে পরিগণিত ছিল। এই সকল গুণে মহেন্দ্রবাবু দেশের মধ্যে একজন প্রাতঃস্মরণীয় ব্যক্তি হইয়া পড়িয়াছিলেন।

কিন্তু মানুষ যদি শুধু গুণ লইয়াই জন্মগ্রহণ করিত, তাহা হইলে মানুষ ও দেবতার মধ্যে কোন পার্থক্য থাকিত না। বহুতর গুণের মধ্যেও মানুষ এমন দুই একটা দোষ লইয়া জন্মগ্রহণ করে যে, সেই দুই একটা দোষই চন্দ্রে কলঙ্কের মত গুণরাশিকে মলিন করিয়া তাহাকে দেবতার সহিত স্বতন্ত্র করিয়া দেয়। বহুগুণশালী মহেন্দ্র বাবুরও এমন একটা দোষ ছিল, যাহা তাঁহার যশো-কৌমুদীকে মলিন করিয়া অনেকের নিকট তাঁহাকে অবজ্ঞা ও অশ্রদ্ধাভাজন করিয়া তুলিয়াছিল। ধর্ম্মের উপর মহেন্দ্রবাবুর বিন্দুমাত্র আস্থা ছিল না। শুধু ধর্ম্মের নয়, দেব দ্বিজেও তিনি সম্পূর্ণ বীতশ্রদ্ধ ছিলেন।

বড় লোকের ছেলে যে কখন কোশাকুশী নাড়িয়া আহ্নিক করে, বা গলবস্ত্র হইয়া দেব দ্বিজ সমীপে ভক্তি প্রদর্শন করে, এমন ঘটনা কেহ কখন প্রত্যক্ষ না করিলেও সে অন্ততঃ মুখেও যেরূপ ধর্ম্মনিষ্ঠা প্রকাশ করিয়া থাকে, তাহাতেই লোকে তদীয় ধার্ম্মিকতার পরিচয় পাইয়া তাহার অসাক্ষাতে বিগত মুখরিত করে। এই মৌখিক ধর্ম্মনিষ্ঠার ফলে তাহার অনাচার, অত্যাচার, অবিচার প্রভৃতি সকল দোষই অনায়াসে ঢাকা পড়িয়া যায়। এক ধর্ম্মের দোহাই দিয়া লোকে তাহার সকল অপরাধ ক্ষমা করিতে পারিবে। কিন্তু মহেন্দ্রবাবুর সেই মৌখিক ধর্ম্মনিষ্ঠার অভাবটুকুই সাধারণের নিকট তাঁহাকে অধার্ম্মিক বলিয়া পরিচিত করিয়া দিয়াছিল এবং হিন্দুর অস্পৃশ্য কোন দ্রব্য স্পর্শ করিলেও লোকে তাঁহাকে অহিন্দু আখ্যা দিতে ইতস্ততঃ করে নাই।

এরূপ আখ্যা দিবার কারণ ছিল। মহেন্দ্রবাবু যখন কলিকাতায় থাকিয়া কলেজে পড়িতেন, তখন কেশব সেনের বক্তৃতার প্রভাবে হিন্দুসমাজে একটা আলোড়ন উপস্থিত হইয়াছিল। সে বক্তৃতার প্রভাব স্কুল কলেজের ছাত্রদিগের হৃদয়ে যতটা বিস্তৃতি লাভ করিয়াছিল, এত বিস্তৃতি আর কোথাও লাভ করিতে পারে নাই। ইহার ফলে অনেকেই হিন্দুসমাজ ত্যাগ করিয়া ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছিল। মহেন্দ্রবাবুও হিন্দুধর্ম্মে বীতশ্রদ্ধ হইয়া ব্রাহ্ম-সমাজে যাতায়াত আরম্ভ করিয়াছিলেন এবং তিনি যে অচিরাৎ এই নবধর্ম্মে দীক্ষিত হইবেন এরূপ সম্ভাবনাও অনেকে করিয়াছিল। মহেন্দ্রবাবুর পিতা তখন জীবিত। তিনি এই সংবাদ পাইয়া সত্বর পুত্রের নিকট উপস্থিত হইলেন এবং পুত্রকে অনেক উপদেশ দিয়া নিবৃত্ত করিবার চেষ্টা করিলেন। মহেন্দ্রবাবু কিন্তু স্বীয় আন্তরিক বিশ্বাসের বিপরীত ধর্ম্মে আস্থা স্থাপন করিতে স্বীকৃত হইলেন না, এবং নানারূপ যুক্তি তর্ক দ্বারা বর্ত্তমান হিন্দুধর্ম্মের অসারত্ব ও ব্রাহ্মধর্ম্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করিয়া দিলেন। পিতা এই যুক্তিতর্কের খণ্ডন করিতে পারিলেন না, কিন্তু তিনি পিতৃত্বের দোহাই দিয়া পুত্রকে জ্ঞাপন করিলেন যে, মহেন্দ্রনাথ যদি ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষা গ্রহণ করেন, তাহা হইলে তিনি আর দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিবেন না, গঙ্গা-গর্ভে আত্মবিসর্জ্জন করিয়া এই লোকলজ্জার হাত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিবেন। পিতৃভক্ত পুত্রকে পিতার এই দৃঢ় সঙ্কল্পের নিকট পরাভব স্বীকার করিতে হইল; তিনি পিতার পাদস্পর্শ পূর্ব্বক শপথ করিলেন, মনে প্রাণে তিনি ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রতি অনুরক্ত হইলেও কদাপি এই ধর্ম্মে দীক্ষা গ্রহণ করিবেন না; কিন্তু হিন্দুসমাজে থাকিলেও তিনি

কোন কালেই হিন্দুধর্ম্মে আস্থাবান হইতে পারিবেন না। পিতা অগত্যা পুত্রের এই প্রতিজ্ঞাতিতেই সম্মতি দিতে বাধ্য হইলেন এবং পুত্রকে আশীর্ব্বাদ করিয়া স্বগৃহে প্রত্যাবর্ত্তন হইলেন। মহেন্দ্রবাবু স্বীয় বিশ্বাসে বলি দিয়া ব্রাহ্মসমাজের সহিত সর্ব্ববিধ সংস্রব ত্যাগ করিলেন।

স্বীয় প্রতিজ্ঞতি রক্ষার জন্য মহেন্দ্রনাথ ব্রাহ্মসমাজে যাতায়াত পরিত্যাগ করিলেন, ব্রাহ্মধর্ম্ম সম্বন্ধীয় যে সকল পুস্তক তিনি সর্ব্বদা পাঠ করিতেন, সে সব ফেলিয়া দিলেন, পিতার আদেশে মন্ত্র পাঠ করিয়া হিন্দু বালিকার পাণিগ্রহণ করিলেন, কিন্তু তাঁহার মনের ভিতর ব্রাহ্মধর্ম্মের যে একটা ছাপ পড়িয়া গিয়াছিল, সেটাকে কিছুতেই মুছিতে পারিলেন না; মনের ভিতর ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রতি তীব্র অনুরাগ ও হিন্দুধর্ম্মের উপরে গভীর অনাস্থা লইয়া হিন্দুসমাজে বিচরণ করিতে লাগিলেন।

পিতা যতদিন জীবিত ছিলেন, ততদিন কোনরূপে চলিয়া গেল, কিন্তু তাঁহার মৃত্যুর পর বড়ই গোল বাধিল। নৈত্যক দোল দুর্গোৎসব ক্রিয়া-কলাপ সকলই বজায় রাখিতে হইল, অথচ বিশ্বাসের বিপরীত এই সকল কার্য্যের অনুষ্ঠানে যে বিরক্তি উপস্থিত হইতে লাগিল সেটাকে মহেন্দ্রনাথ কিছুতেই দমন করিতে পারিলেন না। এই দোটানা ভাব লইয়া তিনি যেন অশান্তির আগুনে দগ্ধ হইতে লাগিলেন। যে দেবপ্রতিমাকে তিনি অচেতন পুত্তলিকা ব্যতীত আর কিছুই মনে করিতে পারেন না, সেই দেবতার নির্ম্মাল্য মাথা পাতিয়া লইতে হয়; যে উপবীতটাকে অসার জ্ঞানে পথের ধূলায় ফেলিয়া দিতে তিনি উদ্যত হইয়া ছিলেন, ব্রাহ্মণেরা সেই উপবীত দেখাইয়া তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিতে আসে; পণ্ডিতেরা পুরাণ' উপপুরাণের কুৎসিত ব্যাখ্যায় তাঁহাকে অস্থির করিয়া তুলে। চারিদিকেই ধর্ম্মের ভাণ। ঘরের ভিতরেও শান্তি নাই। সেখানে গৃহিণী বারব্রত পূজা অর্চ্চনা লইয়া তাঁহার শান্তিহীন চিত্তে আরও যেন অশান্তির আগুন জ্বালাইয়া দেয়। গৃহে অবস্থান মহেন্দ্রনাথের পক্ষে যেন দায় হইয়া উঠিল। অথচ তিনি কি করিবেন তাহাও ভাবিয়া পাইলেন না।

পরিশেষে মহেন্দ্রনাথ শান্তি লাভের আশায় নানাস্থানে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। অনেক সাধু সন্ন্যাসীর সেবা লইলেন, তাঁহাদের সহিত ধর্ম্মালাপ করিলেন, কিন্তু কেহই তাঁহাকে ধর্ম্মের পথ—প্রকৃত শান্তির পথ দেখাইয়া দিতে পারিলেন না। সেই হটযোগ, রাজযোগ, রেচক কুম্ভক, প্রাণায়াম, সেই স্বর্গ নরক মোক্ষ ছাড়া আর কোন নূতন কথা কাহারও নিকট শুনিতে পাইলেন না।

পরিশেষে মহেন্দ্রনাথ এক সাধুর সাক্ষাৎ পাইলেন। সাধু তাঁহাকে বুঝাইয়া দিলেন যে, ধর্ম্ম কোন জাতীয়তার গণ্ডীর মধ্যে নিবদ্ধ নহে। যাহা ধারণ বা পোষণ করে তাহাই ধর্ম্ম; সুতরাং যাহা আত্মার হিতকর তাহাই ধর্ম্ম নামে অভিহিত। অতএব লোকহিতকর কার্য্যের অনুষ্ঠানেই প্রকৃত ধর্ম্মানুষ্ঠান সম্পাদিত হইয়া থাকে, সমাজ বিশেষের গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ থাকিয়া কেবল আপনার ইষ্ট চিন্তা করিলে ধর্ম্মের ভাণ করা হয় মাত্র।

মহেন্দ্রনাথ যেন নূতন পথ দেখিতে পাইলেন। তিনি ঘরে ফিরিয়া সাধুর উপদেশ মত লোকহিতকর কার্য্যের অনুষ্ঠানে ব্যাপৃত হইলেন। দেশের স্বাস্থ্য ও শিক্ষার উন্নতি বিধান তাঁহার প্রধান কার্য্য হইল। অনাথ আতুরের দুঃখ মোচনে তিনি মুক্তহস্ত হইলেন। তাঁহার অধিকৃত জমিদারীর মধ্যে খাল কাটাইয়া, বাঁধ বাধিয়া প্রজাদের সুখস্বাচ্ছন্দ্যের বিধান করিয়া দিলেন। ইহার ফলে শুধু প্রজাদের অভাব মোচন হইল না, জমিদারীর আয়ও বাড়িয়া গেল, এবং সেই বর্দ্ধিত আয়ে সাধারণের হিতকর কার্য্যের ব্যয় অনায়াসেই নির্ব্বাহিত হইতে লাগিল।

মহেন্দ্রনাথ যখন বাহিরে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিলেন, সেই সময়েই তাঁহার পত্নী এক বৎসরের মেয়ে অনুপমাকে রাখিয়া সংসার হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়াছিলেন। মহেন্দ্রনাথ যথা সময়ে এই সংবাদ পাইয়াছিলেন, পাইয়া একটু কাতরও হইয়াছিলেন। কিন্তু আপনার অশান্তির একটা কারণ দূরীভূত হইল ভাবিয়া একটা স্বস্তির দীর্ঘশ্বাসও ত্যাগ করিয়াছিলেন।

ঘরে ফিরিয়া মহেন্দ্রনাথ কিন্তু স্বস্তি পাইলেন না; মাতৃহীনা কন্যাকে দেখিয়া তাঁহার প্রাণটা যেন কাঁদিয়া উঠিল। তিনি কন্যাকে বুকে চাপিয়া সে কান্নার বেগ রোধ করিলেন।

তারপর সকলেই তাঁহাকে পুনরায় বিবাহ করিবার জন্য অনুরোধ করিয়াছিল। মহেন্দ্রনাথ কিন্তু তাহাদের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধে উপেক্ষা প্রদর্শন পূর্ব্বক হৃদয়ের সমগ্র

স্নেহ ও ভালবাসা দিয়া কন্যাকে লালন পালন করিতে লাগিলেন। স্নেহকে মানুষ করিবার লোকের অভাব ছিল না। বিশেষতঃ গৃহিণীর মৃত্যুর পর হইতে মহেন্দ্রনাথের এক বিধবা মাতুলতনয়া মাতৃহীনা কন্যার লালন পালনের ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। মহেন্দ্রনাথ কিন্তু সংসারের একমাত্র স্নেহবন্ধন কন্যার ভার তাঁহার হাতে দিয়াই নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিলেন না, বিষয়কার্য্য হইতে অবসর পাইলেই ছুটিয়া আসিয়া কন্যাকে বুকে তুলিয়া লইতেন এবং সেই ক্ষুদ্র শিশুটীর মধ্যেই সংসারের যাবতীয় সুখ শান্তি নিহিত রহিয়াছে ভাবিয়া তাহাকে যেন আপনার বাহুবেষ্টন হইতে মুক্তি দিতে পারিতেন না।

মহেন্দ্রনাথ কেবল অতুল স্নেহে ও অপরিমিত আদরে কন্যাকে লালন পালন করিয়াই ক্ষান্ত রহিলেন না, বয়োবৃদ্ধির সহিত তাহার শিক্ষা দীক্ষার ব্যবস্থাও করিয়া দিলেন। তাহার শিক্ষার জন্য বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইল, অধিক বেতন দিয়া শিক্ষয়িত্রী নিযুক্ত করিলেন। তাহার নিকট অনুপমার শিক্ষা লাভ হইতে থাকিল। পুস্তকগত শিক্ষা ছাড়া, আর যে কিছু শিক্ষা তাহা হইতে লাগিল পিতার নিকট। সে শিক্ষায় পিতার চরিত্রের প্রভাব সংক্রমিত হইয়া কন্যার চরিত্রকে গঠিত করিতে লাগিল।

ইহার মধ্যে মহেন্দ্রনাথ একবার বিবাহ করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন। কিন্তু সে বিবাহের মধ্যে প্রবৃত্তির তাড়না কতটা ছিল বলা যায় না, তবে কন্যার উল্লাস যে খুব বেশী ছিল ইহা অসঙ্কোচে বলা যাইতে পারে। রঘুরাম চক্রবর্ত্তী মারা গেলে তাহার ষোড়শবর্ষীয়া বিধবা পত্নী একদিন জমিদার বাড়ীতে উপস্থিত হইয়া, এবং মহেন্দ্রনাথ বাড়ীর ভিতর গেলে কাঁদিতে কাঁদিতে তাঁহার নিকট অভিযোগ করিল যে, স্বামীর মৃত্যুতে সে সম্পূর্ণ অনাথ হইয়া পড়িয়াছে, তাহার দিন চলিবার উপায় নাই। ইহার উপর স্বামী যে দেনা রাখিয়া গিয়াছেন, তাহার জন্য মহাজন আসিয়া উৎপীড়ন করিতেছে, এবং ঘর ভিটাটুকু বেচিয়া লইবে বলিয়া ভয় দেখাইতেছে। এই ঘর ভিটা-টুকু গেলে তাহার আর দাঁড়াইবার স্থান থাকিবে না, তাহার ভিনকুলে এমন কেহই নাই যাহার নিকট গিয়া আশ্রয় লইতে পারে। পেটের জন্য সে পরের বাড়ীতে দাসীবৃত্তি করিতেও প্রস্তুত। কিন্তু কোন সহৃদয় ব্যক্তিই তাহাকে দাসীত্বে নিয়োজিত করিতে ইচ্ছুক নহে। অথচ পাড়ার অনেক ভদ্র ব্যক্তি তাহার নারীধর্ম্মের উপর হস্ত-ক্ষেপ করিতে উদ্যত হইয়া তাহাকে ভীষণ ভীতি ও প্রলোভন প্রদর্শন করিতেছে যে, পাড়ার মধ্যে বাস করাও তাহার পক্ষে দুঃসাধ্য হইয়া উঠিয়াছে।

অনাথা বিধবার এই সকরুণ দুঃখ কাহিনী শ্রবণে মহেন্দ্রনাথ মর্ম্মাহত হইয়া বদ্ধ হিন্দুসমাজের উপর অভি-সম্পাত দিতে লাগিলেন। এই যুবতী ভদ্রকন্যা—হীন দাসীবৃত্তি দ্বারা ইহাকে জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে হইবে? অন্যথায় রূপ-যৌবন বিক্রয় করিয়া ইহাকে মনুষ্যসমাজের বাহিরে চলিয়া যাইতে হইবে। ইহা ব্যতীত এই বিধবার পক্ষে অন্য পথ আর নাই। ওঃ, কি নিষ্ঠুর বিধান! আর কোন্ দেশে কোন্ জাতির মধ্যে বিধবার জন্য এমন নিষ্ঠুর বিধান রহিয়াছে? হায় অধঃপতিত হিন্দুসমাজ!

বহু কাল পরে মহেন্দ্রনাথের হৃদয়ে বিধবা বিবাহের সঙ্কল্প জাগিয়া উঠিল। তিনি এই অনাথা বিধবাকে পুনঃ পরিণীতা করিয়া তাহার দুর্ভাগ্যের অবসান করিয়া দিতে উদ্যোগী হইলেন। বিস্তর অর্থ ব্যয় করিয়া তিনি নানা-স্থান হইতে বিধবা বিবাহের অনুকূলে ব্যবস্থা আনয়ন করিলেন, কিন্তু পাত্র পাওয়া দুর্ঘট হইল। প্রচুর অর্থ লোভেও কেহ সমাজের বিরুদ্ধে দাঁড়াইতে সাহসী হইল না। মহেন্দ্রনাথ তখন স্বীয় ভাগিনেয় তারকনাথকেই পাত্র স্থির করিয়া বিবাহের উদ্যোগ আয়োজন করিতে লাগিলেন। কিন্তু বিবাহের একদিন মাত্র পূর্ব্বে তারক-নাথ আসিয়া বলিল; মাতুলকে বলিল, "যদি আপনার সমগ্র সম্পত্তি আমার নামে দানপত্র ক'রে দেন, তবেই আমি বিবাহ কত্তে পারি।"

মহেন্দ্রনাথ কন্যার জন্য অর্দ্ধেক রাখিয়া বাকী অর্দ্ধেক তাহার নামে লিখিয়া দিতে সম্মত হইলেন; তারকনাথ কিন্তু তাহাতে রাজী হইল না। মহেন্দ্রনাথ তাহাকে অনেক বুঝাইলেন, অনেক উপদেশ দিলেন। তারকনাথ তাঁহার উপদেশে কর্ণপাত করিল না, তাহার সেই এককথা —সমগ্র সম্পত্তি না পাইলে এ বিবাহে সম্মত হইবে না। তাহার এই অন্যায় লোভে মহেন্দ্রনাথ রাগিয়া উঠিলেন, বলিলেন, "তুমি দূর হও, আমি নিজে বিবাহ করিব।"

তারকনাথও রাগিয়া মাতুলের গৃহ ত্যাগ করিল।

মহেন্দ্রনাথ তখন নিজেই বিবাহ করিতে প্রস্তুত হইলেন। চারিদিক হইতে প্রতিবাদের তুমুল কোলাহল উত্থিত হইল; সমাজের মাথা যাঁহারা তাঁহারা দণ্ডমুণ্ডের কর্ত্তা জমিদারের এই সমাজ-বিগর্হিত কার্য্য হইতে নিরস্ত করিবার জন্ত মহেন্দ্রনাথের দ্বারে ধন্না দিয়া পড়িলেন। পরিশেষে যাহার জন্ত এত উদ্যোগ, সেই বিধবা আসিয়া মহেন্দ্রনাথের পা দুইটা জড়াইয়া ধরিল; কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, "আপনি এই দুঃখিনীর জন্ত যে দয়া দেখিয়েছেন, তাই আমার পক্ষে যথেষ্ট। এর বেশী দয়া দেখিয়ে যদি আপনি নিজের মাথা হেঁট কত্তে যান, তবে সে দয়া আমি গ্রহণ কত্তে পারবো না; তার আগেই আত্মহত্যা ক'রে আপনাকে আমি এই অমর্য্যাদার হাত হ'তে বাঁচিয়ে দেব।"

নৈরাশ্যের গভীর দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া মহেন্দ্রনাথ নিরস্ত হইলেন।

অতঃপর তিনি অনাথা বিধবাদিগের জন্ত স্বতন্ত্র সাহায্য ভাণ্ডার প্রতিষ্ঠিত করিলেন।

(ক্রমশঃ)

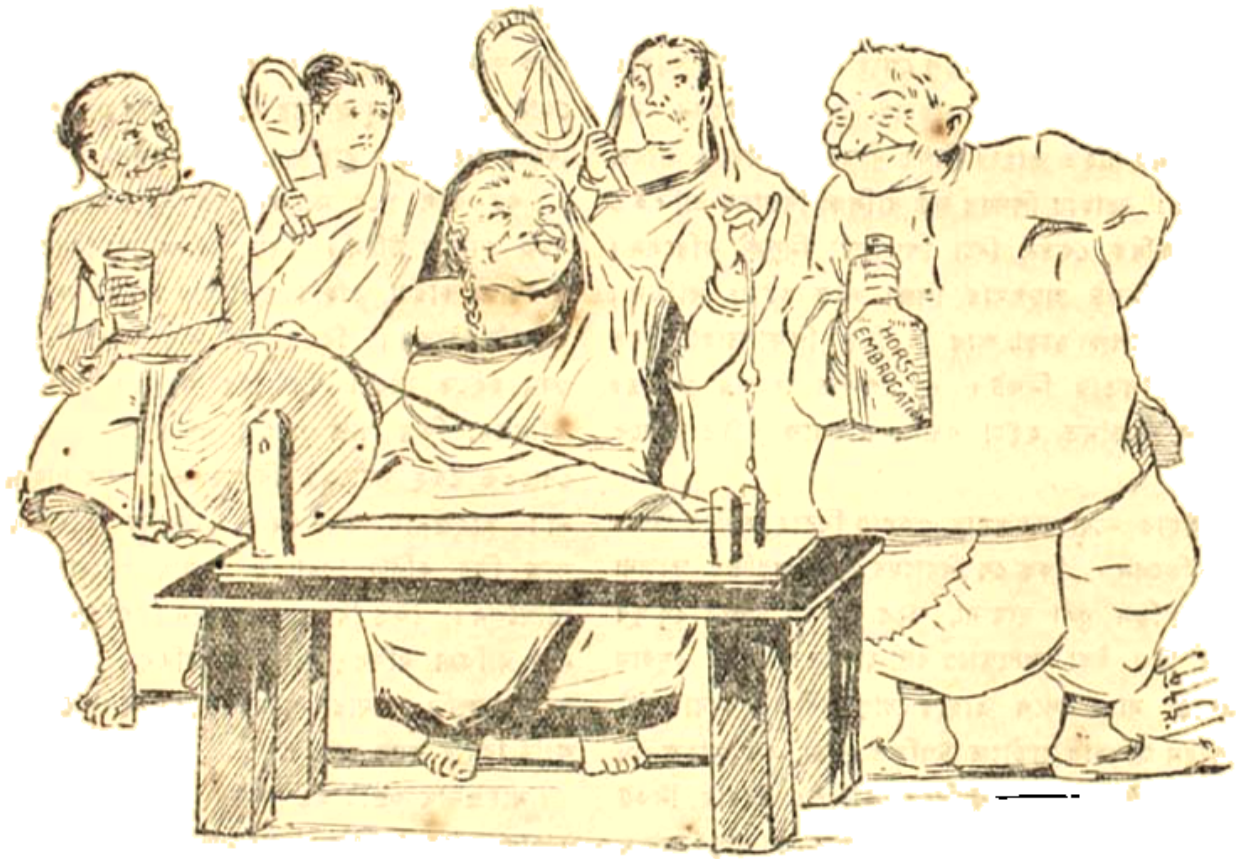

গৃহিণী। (চরকা কাটিতে কাটিতে) এ আমি খুব পারি, খুব পারি।

কর্ত্তা। আহা, তা পারবে বৈ-কি! তুমি কি আমার যে-সে গিন্নী। তবে দেখ, বেদনা-টেদনা হ'লে বলো, এই ঘোড়া-মালিস এনেছি, ডলে দেব।···এই বেটা-বেটিরা হাঁ করে' দেখছিস্ কি···অ্যাঁ? পাখা কর্, পাখা কর্···তো বেটার হাতে কি? সরবৎ···দে-দে। ওগো, শুনছ, ওটুকু খেয়ে নাও।

শৈবলিনী

(শ্রীবিজয়রত্ন মজুমদার)

প্রথম পরিচ্ছেদ

শরচ্চন্দ্র বিপত্নীক হওয়া অবধি কলিকাতাতেও আসে নাই, থিয়েটারও দেখে নাই। কলিকাতায় আসে নাই কারণ কলিকাতার দৃশ্যাবলী বড়ই চিত্ত বিভ্রমকর আর থিয়েটার না দেখার কারণ কি কাহাকেও খুলিয়া বলিতে হইবে? বিধির বিপাক! বাল্যবন্ধু বিনয়বাবুর বড় মেয়েটির বিবাহে বাধ্য হইয়া শরচ্চন্দ্র বাবুকে কলিকাতায় আসিতে হইল এবং আরো দুর্ব্বিপাক, তাঁহাকে থিয়েটারও দেখিতে হইল।

কন্যা সম্প্রদান হইয়া গেছে, বাহিরের প্রাঙ্গনে "সাবিত্রী থিয়েটার" প্রকাণ্ড ষ্টেজ খাটাইয়া অগণিত দর্শকমণ্ডলীর সম্মুখে বসিয়া কনসার্ট বাজাইতেছে, বিনয়বাবু শরচ্চন্দ্রের হাত ধরিয়া বলিলেন—চল একটু দেখা যাক।—কোন আপত্তাই টিকিল না, বিশেষ কারণ কিছু প্রকাশ হইবার পূর্ব্বেই বিনয় শরচ্চন্দ্রের হাত ধরিয়া টানিতে টানিতে দ্বিতলের বারান্দায়—যেখানে বিনয় বাবুর অন্যান্য বন্ধুগণ বসিয়াছিলেন—বসাইলেন।

সাবিত্রী থিয়েটার কলিকাতার বাজারের মধ্যে তখনকার নামজাদা থিয়েটার।—কোকিল-কণ্ঠী বিনোদ কুমারী, বীররসসম্পন্না সুধীরাবালা এবং নৃত্যগীত পটিয়সী হেনা সুন্দরী তখন এই দলভুক্ত। আবার মণিকাঞ্চন সংযোগ হইয়াছিল, সেই বিশ্ববিখ্যাত "শৈবলিনী"! যাহার অভিনয় দেখিয়া স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্র মুগ্ধ-মোহিত হইয়া গিয়াছিলেন, সেই রূপ লাবণ্যময়ী সুন্দরী শিরোমণি অভিনেত্রী কুলরাণী কিরোজাসুন্দরী স্বয়ং শৈবলিনী সাজিয়াছিলেন। উপর্য্যুপরি বাৎসরাধিক কাল সাবিত্রী রঙ্গমঞ্চে "চন্দ্রশেখরের" অভিনয় হইতেছে, প্রত্যহ স্থানাভাবে কুরঙ্গনে পূর্ণ প্রাণে বহুলোক ফিরিতেছে। বিনয় বাবু অর্থবান ব্যক্তি, কন্যার বিবাহ রাত্রে সেই "চন্দ্রশেখরের"ই অভিনয় আয়োজন করিয়াছিলেন। বাড়ীর মেয়েরা না-কি বলিয়াছিল, কি মিলন রাত্রে ঐ ছাইপাশ পরকীয় প্রেমের বই যে!···বিনয়বাবু মুচ্চিত পুরুষ, মেয়েদের কথাটা হাস্য করিয়াই উড়াইয়াছিলেন। দুই শত টাকা বেশী দিয়া তিনি "চন্দ্রশেখরের"ই অভিনয় করিতে সাবিত্রী-মকাধ্যক্ষ রমেশ বাবুকে সম্মত করাইয়া ফেলিলেন।

ড্রপ উঠিল। একটা গান—শরচ্চন্দ্র অন্যমনা হইয়া শুনিতেছিলেন, হঠাৎ সহস্র হস্তের করতালিতে অট্টালিকা কাঁপিয়া উঠিল, শরচ্চন্দ্র চক্ষু ফিরাইলেন—এই প্রথম রঙ্গমঞ্চের দিকে চাহিলেন, শৈবলিনী ফিরিঙ্গীর সঙ্গে রসিকতা করিয়া ভাগাইল। শৈবলিনীর রূপের ছটায় করতালি, অভিনয়ে করতালি, বীণানিন্দিত কণ্ঠস্বরে করতালি! শরচ্চন্দ্র বন্ধুকে জিজ্ঞাসিলেন—ও-কে হে?

বিনয় হাসিয়া বলিলেন—কিরোজা!

কিরোজা কে?

সে-কি? কিরোজার নাম শোন-নি?...হালালে তুমি শরৎ! সে কি-হে···কিরোজা! প্রেমের পার্টে কিরোজার তুলনা নেই। চন্দ্রশেখরে—শৈ, রাজসিংহে চঞ্চল, মৃণালিনীতে মৃণালিনী···কিরোজা যে পৃথিবী বিখ্যাত। হাজার হাজার ভক্ত ও আমি আরও চন্দ্রশেখর করাবার বাড়ীতে। রমেশ বাবু কিছুতেই রাজী নন; পুতুর, গয়না, এ সব দিন কিই করা কি সোজা কথা! নগদ দু'শো টাকা বেশী দিয়ে তবে রাজী করেছি।

শরচ্চন্দ্র বলিলেন, "নইলে ফষ্টর আমার কে?"—শুনিতে শুনিতে শরচ্চন্দ্র মোহিত হইয়া গেলেন। হাঁ, অভিনেত্রী বটে! যেমন রূপ, তেমনি গুণ!

শৈবলিনী নবাব-দরবারে আসিয়া নবাবকে ভুলাইল। কি দিয়া ভুলাইল? বঙ্গবিহার উড়িষ্যার অধিপতি, অমিত বিক্রম নবাব মীরকাশিম আলিকে কিরোজা, না-না, শৈবলিনী কি দিয়া ভুলাইল? সুন্দর মুখের সর্ব্বত্র জয়, নবাব কিরোজার রূপে ভুলিলেন, বাক্-চাতুর্য্যে ভুলিলেন; অমন যে যেগমের শোক, নবাব তাও ভুলিলেন।

শরচ্চন্দ্রের কেবল ভাল লাগিল না, সেই স্থানটা, যেখানে কিরোজা প্রতাপকে মরিতে পাঠাইল; যখন বলিল—তুমি থাকিতে আমার সুখ নাই, শরচ্চন্দ্রের কাণ দুটা জ্বালা করিয়া উঠিল, উঃ-শৈবলিনী এত নিষ্ঠুর! না, না, তাহার দোষ কি! সমাজ! সমাজ যে তাহা না হইলে কষ্ট হইয়া উঠে!

অভিনয় শেষ হইল, ধন্য ধন্য পড়িয়া গেল। সকলের

মুখেই ঐ এক কথা—ফিরোজা, ফিরোজা, শৈবলিনী আর শৈবলিনী!

আর রাত্রি ছিল, শরচ্চন্দ্র চক্ষু মুদিয়া ভাবিতে লাগিলেন, ফিরোজা! ফিরোজা!

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

অভিনয় যদি প্রাণ ঢালিয়া করে ত এমনই মনে হয় বটে! লোকমুখে শুনা গিয়াছে—চৈতে চৈতন্যকে নাচিতে দেখিয়া রামকৃষ্ণদেব সত্য সত্যই প্রেম বিহ্বল হইয়া নাচিয়াছিলেন। বুদ্ধদেবের অভিনয় দেখিতে গিয়া কলিকাতাবাসী কোন ধনীসন্তান স্বগৃহে পূজার সময় পশু বলি রহিত করিয়া ছিলেন। অভিনেতা বা অভিনেত্রী অভিনয় করিতেছে যদি ভাবেন, তবে তেমনটা হওয়া সম্ভব নয় বটে, কিন্তু যদি ভাবেন, আমিই সেই চৈতন্য, অন্ততঃ আমাতে আর তাঁহাতে মাত্রা নাই তবে হওয়াটা বিচিত্র নয়—ফিরোজা এমনই অভিনয় কুশলী বটে!

পরের শনিবারে শরচ্চন্দ্র "সাবিত্রী থিয়েটারে" আসিয়া "চন্দ্রশেখরের" অভিনয় দেখিতে বসিলেন। প্রথমেই তাঁহার পার্শ্বদিকের একখানি বক্স নগদ ষোলটি টাকা বাঁধে ক্রয় করিয়াছিলেন। ফিরোজা অভিনয় করিতেছিল—মধ্যে মধ্যে তাহার সেই আকর্ণ বিস্তৃত নয়নদ্বয় তুলিয়া, শরচ্চন্দ্রের মনে হইতেছিল,—ফিরোজা তাঁহাকেই দেখিয়া লইতেছিল। কি সুন্দর ঐ নেত্রদ্বয়! হাঁ হরিণী নয়না বটে! কি সুন্দর মুখশ্রী! হাঁ—মুখ কমল বটে! কি পরিপূর্ণ দেহলতা! যেন গঙ্গার পবিত্র বারিবক্ষে বাণ আসিয়াছে, দুলিয়া কাঁপিয়া কি সুন্দর করিয়াছে! ফিরোজা এত সুন্দর! ফিরোজা যদি ঐ সামান্য রঙটুকুই না-ই মাখিত কি এমন ক্ষতি হইত? কিছু না! তবে হাঁ, থিয়েটারে নামিতে হইলে মাখিতে হয় বটে। তাঁহাদের গ্রামে নাট্য সমাজে দেবার নারদই কি রকম রঙটা মাখিয়া! ও থিয়েটারের ধর্ম্ম!

গঙ্গাবক্ষে প্রতাপ ও শৈবলিনী। প্রতাপ ডাকিতেছে, শৈবলিনী উত্তর দিতেছে। কিন্তু শৈবলিনীর দৃষ্টি কোথায়? উর্দ্ধে, নিম্নে, সম্মুখে না প্রতাপের দিকে! কোথাও না—শরচ্চন্দ্র স্থির লক্ষ্য করিতেছেন, শৈবলিনীর দৃষ্টি তাঁহারই মুখের পরে বদ্ধ রহিয়াছে!…"চল প্রতাপ তীরে উঠি"—বলিয়া শৈবলিনী প্রতাপের কণ্ঠালিঙ্গন করিয়া ধরিল—শরচ্চন্দ্র ভাবিতেছিলেন ঐ প্রতাপ লোকটা কি সুখী! উঃ একেবারে শচীপতি ইন্দ্র বলিলেই হয়।

একটা লোক বক্সের ধারে পান লেমনেড্ ফিরি করিয়া ফিরিতেছিল, হাতে একটা লেমনেডের বোতল, বগলে খান দু'চার বহি, মাথায় মস্ত ঝেড়ী! শরচ্চন্দ্র বলিলেন মিঠা পান হায়? লোকটি, আনিয়া দিতেছি, বলিয়া নামিয়া গেল, দুই মিনিট পরে ফিরিয়া আসিয়া চার খোনা মিঠা পানের খিলি বক্সের উপর রাখিতেই শরচ্চন্দ্র একটি টাকা দিলেন। লোকটা পায়ের মেরজাই-এর পকেট-টা হাতড়াইয়া বলিল—এনে দিই। শরচ্চন্দ্র উদাসীনভাবে কহিলেন—নেহি, ও তুমকো হাম বখ্‌শিষ দিয়া!

লোকটির নাম কালোবরণ। কালোবরণ এই এতটুকু বয়সে থিয়েটারে ঐ কর্ম্ম সুরু করিয়াছিল, তাহার ঐ ঝেড়ীরই বদৌলতে ত্রিশ বত্রিশ হইয়া গিয়াছে, বুঝিল, বাবুর বিশেষ কোন কাজ পড়িয়াছে। চার খোনা পান লইয়া টাকা বক্‌সিস্ দেয়, এমন "বাবুর" সন্ধান কালো বরণ অদ্যাপি পায় নাই। সে আর দুইটা হাঁক পাড়িয়া পুনরায় বাবুটির পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইল।

শরচ্চন্দ্র জিজ্ঞাসিলেন—তোম ইসি থ্যাটারকো সব আওরৎ—আদমীকো পহচানতা হো?

কালোবরণ বাঙ্গালী। বলিল—আজ্ঞে হ্যাঁ।

উহো ফিরোজা বিবিকো……

আজ্ঞে হ্যাঁ। ফিরোজাবিবিকে আর জানি না? রাজার বাগানে নিজের বাড়ী করিয়াছে!

আরো দুই চারিটি কথার পর স্থির হইল, শরচ্চন্দ্র অবিলম্বে একটি লিপি পাঠাইবেন, বাহক কালোবরণ, জবাব আনিবে। কালোবরণ কাগজ পেন্সিল সংগ্রহ করিয়া আনিল। শরচ্চন্দ্র লিখিলেন—আমি আপনার দর্শন প্রার্থী।

জবাব আসিল, মুখে মুখে, মোটর ঠিক করিয়া রাখিতে, অভিনয় শেষে কালোবরণ ফিরোজা বিবিকে মোটরে তুলিয়া দিবে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

শরচ্চন্দ্র যে ফিরোজার সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়াছেন, ফিরোজাকে বক্ষে না ধরিলে তাঁহার এ অশান্ত হৃদয় শান্ত হইতেছে না—শুনিয়া ফিরোজা বারংবার তাঁহাকে নমস্কার করিয়া বলিল—আপনার অনুগ্রহ।

কালোবরণ ড্রাইভারের পার্শ্বেই বসিয়াছিল, সেই বাড়ী দেখাইয়া চলিল। পথে সেই একই কথা ভালবাসা এবং সেই একই উত্তর! ফিরোজার অধরে সেই মৃদু হাসি!

বাড়ী পৌঁছিয়া ফিরোজা শরচ্চন্দ্রকে বৈদ্যুতী আলোকোদ্ভাসিত একটি কক্ষে আনিয়া বসাইল, নিজে বসিল। ফিরোজা ঝিকে ডাকিয়া দুই গ্লাস বরফ লেমনেড আনিতে পাঠাইয়া, মধুরকণ্ঠে কহিল—আপনি আমার অভিনয়ের প্রশংসা করিতেছেন, তাহাতে আমি গর্ব্ব বোধ করিতেছি। প্রশংসার ত কিছুই নাই, কেবল আপনার মহত্বগুণেই আপনি আমার অভিনয়ের প্রশংসা করিতেছেন।

শরচ্চন্দ্র আরো মুগ্ধ হইলেন—ফিরোজা, আমি তোমার অভিনয়ের শুধু প্রশংসা করিতেছি না, আমি তোমার রূপে মুগ্ধ, আমি—আমি—আমাকে—তুমি দয়া কর।

ফিরোজা একটু খানি হাসিয়া বলিল, কি বলিতেছেন?

সত্য বলিতেছি ফিরোজা, আমি তোমাকে ভালো বাসিয়া ফেলিয়াছি। আমাকে তুমি অবিশ্বাস করিয়ো না, আমি মরিয়াছি।

ফিরোজার অধর কোণে তখনও সেই হাসি! বলিল—আপনি...

বাধা দিয়া শরচ্চন্দ্র কহিলেন—দয়া—দয়া কর! আর কিছু না, দয়া কর। আমি যেদিন বন্ধু বিনয়ের বাড়ীতে তোমাকে দেখিয়াছি, তখনই মরিয়াছি। ফিরোজা, তুমি আমাকে দয়া কর।

ফিরোজা বলিল—মহাশয়...

কোন কথা না। দয়া...দয়া কর।

মহাশয়—শুনুন। আমি...

না। শুনিব না, এই আমি তোমার পদতলে বসিলাম, আমার সর্ব্বস্ব তোমার চরণতলে রাখিলাম, ফিরোজা...

আপনি আমাকে ভাল বাসিয়াছেন? সত্য বলিতেছেন?

বাসিয়াছি ফিরোজা, বড় ভালোবাসিয়াছি! তোমাকে না পাইলে আমার জীবন বাহির হইয়া যাইবে...

কিন্তু পুরুষের ভালোবাসায়...

শরচ্চন্দ্র আকুলস্বরে কহিলেন—মোহাই ফিরোজা, অবিশ্বাস করিয়ো না। আমার সর্ব্বস্ব তোমার। দয়া কর, ফিরোজা, পায়ে ঠেলিয়ো না।

ফিরোজা নীরবে বসিয়া কি ভাবিতে লাগিল—মুখের উপর দিয়া বিচিত্র বর্ণ খেলা করিয়া যাইতেছে, আর শরচ্চন্দ্র মন্ত্র-মুগ্ধ সর্পের মত গ্রীবা উচ্চ করিয়া তাহাই দেখিতে লাগিলেন। ফিরোজা অল্পক্ষণ পরে কহিল—আমাকে লইয়া আপনি কি করিতে চাহেন?

কিছু না, ফিরোজা, কিছু না, শুধু তোমাকে আমি ভালবাসিতে চাই।

ফিরোজা আবার নীরব। এক মিনিট পরে মুখখানি নত করিয়া দুঃখিত স্বরে কহিল—আমারো ইচ্ছা, আপনাকে ভালোবাসি। কিন্তু জানেন-ই ত—আমাদের শতর খাটাইয়া রোজগার করিতে হয়!—শুধু ভালোবাসিয়া পেট ভরে না?

আমি ফিরোজা! আমি এতই আত্মসর্ব্বস্ব নই যে...

শুনুন। থিয়েটার হইতে আমি দুইশত টাকা পাই...

আমিও দুইশত টাকা দিব। আমার কলিকাতায় এক বাড়ী আছে...

ফিরোজা বলিয়া উঠিল—না, না—বাড়ী আপনাকে দিতে হইবে না...তবে একান্তই যদি দেন, বাঈ কি আর 'না' বলিতে পারে।

তাই দিব, ফিরোজা তাই দিব!—শরচ্চন্দ্র উঠিয়া দাঁড়াইলেন। দাঁড়াইয়া দুই বাহু প্রসারিত করিয়া ফিরোজা—জগৎবিখ্যাত শৈবলিনীকে আলিঙ্গন বদ্ধ করিবেন, ফিরোজা দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিল—দাঁড়ান, থিয়েটারের কাপড় চোপড় ছেড়ে ফেলি। বলিয়া বিদ্যুৎ-আলোর বোতাম টিপিয়া দিল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

শরচ্চন্দ্র ইজি চেয়ারটায় এলাইয়া পড়িয়া ভাবিতেছিলেন, ইহা কি সত্যই সত্য? বঙ্গবিশ্রুত জনপ্রিয়া অভিনেত্রী ফিরোজাসুন্দরী তাঁহার? তাঁহার? সত্য ছাড়া আর কি? ফিরোজা তাঁহার! শৈবলিনী তাঁহার! আর কাহারো নহে—তাঁহার! হে বঙ্গদেশবাসী-দর্শকবৃন্দ, আর তোমরা শৈবলিনী দেখিতে পাইবে না। শৈবলিনী,—শৈ—শৈ—এখন আমার—আমার—আমার! শৈ! কি মধুর নাম।

শৈ ?

প্রিয়তম ?

কোথায় তুমি ?

এই যে প্রাণেশ !—হঠাৎ আলো জ্বলিয়া উঠিল।

শরচ্চন্দ্র চক্ষু মেলিয়া উঠিয়া বসিলেন। সম্মুখ দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিলেন—এ কে ? আমার ফিরোজা কোথায় ?... আপনাকে ত আমি চিনিতে পারিতেছি না। আমার শৈ...

সে কি প্রিয়তম ! এখনও যে আবরণটা হয় নাই। এরই মধ্যে ভুলিলে, প্রিয়তম ? আমিই তোমার শৈ ! চিনিতে পারিতেছ না ? হা অদৃষ্ট, এই বুঝি তোমার প্রেম ?

শরচ্চন্দ্রের চক্ষুঃস্থির। এ বলে কি ? এ-কে ? ইহার সমস্ত চুল যে সাদা হইয়া গেছে, গালের মাংস ঝুল ঝুল করিতেছে, কাপড়ের ফাঁকে ফাঁকে লোল চর্ম্ম দেখা যায়, সামনের দাঁত যে একটিও নাই। শরচ্চন্দ্র দাঁড়াইয়া উঠিতেই—বৃদ্ধা তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া বলিল—এই আমি কালোবরণকে দিয়া থিয়েটারে চিঠি পাঠাইতেছি, কাল হইতে আর থিয়েটার করিব না। আমি যে তোমার জন্য সব ছাড়িলাম প্রিয়তম, আর তুমি আমাকে চিনিতেও পারিলে না ?

শরচ্চন্দ্র নির্ব্বাক !

চল প্রিয়তম, ওঘরে যাই। ওকি, তুমি কাঁপিতেছ কেন ? ও-হো, এই তোমার ভালোবাসা ! নিষ্ঠুর নিষ্ঠুর ! তুমি আমার কি সর্ব্বনাশ করিলে ? তোমারই জন্য আমি সর্ব্বত্যাগী হইলাম, আর তুমি, তুমি কি প্রিয়তম...

সেই ঘর, সেই জরী, সেই সব !

শরচ্চন্দ্র ফুটবলে বসিয়া পড়িয়া বলিলেন—আমাকে আপনি মাপ করুন। আমার পকেটে এই...একশ'টি টাকা আছে, নিন, আমায় অব্যাহতি দিন।

ফিরোজা বলিল, টাকার দরকার নেই।

শরচ্চন্দ্র লজ্জিত অনুতপ্তের মত চাহিতেই ফিরোজা সম্মুখস্থিত টেবিলটা দেখাইয়া বলিল—ঐগুলির উপরেই তোমার ভালবাসা, প্রিয়তম, ওগুলি লইয়া যাও !—শরচ্চন্দ্র দেখিলেন, একটা পরচুল, দুইপাটী পাথরের দাঁত, আর খানিক খানিক মোম। শরচ্চন্দ্র কুণ্ঠিতস্বরে কহিলেন আমাকে আপনি...ফিরোজা হাসিয়া বলিল, নমস্কার।

শরচ্চন্দ্র ছড়ি হাতে লইয়া প্রস্থানোদ্যত হইলেন।

ফিরোজা ওরফে শৈবলিনী হাসিয়া বলিল—কিন্তু এই তোমার প্রেম, এই তোমার ভালবাসা ! ওগো, বুক যায়, বুক যায়...যায়...যায়...

শরচ্চন্দ্র রাস্তায় পড়িয়া এক দৌড়ে বিনয়ের বাড়ীর মধ্যে ঢুকিয়া পড়িলেন। আমরা বিশ্বস্তসূত্রে জানিয়াছি, তদবধি তিনি আর কলিকাতায় পদার্পণ করেন নাই। বঙ্কিমচন্দ্রের দুর্ভাগ্য শরচ্চন্দ্র দেশে ফিরিয়াই চন্দ্রশেখর গ্রন্থখানি পুষ্করিণীর জলে নিক্ষেপ করিয়া দিলেন।

বাহির

(শ্রীসরলাবালা বসু।)

একলা ছিনু আপন ঘরে আপনাটিরে লয়ে,
বাহির পানে চাইতে হোতো ভয়,
বাহির—সে যে মুচ্‌কি হেসে চোখের ইসারাতে
বারে বারে কিসের কথা কয় ?
ভয়ে ভয়ে প্রাচীর গেঁথে,
সুদক্ষোচে দিবস রেতে—
(ভয় যে বড়, বাহির যদি লুটেই মোরে লয়,
ভয়ের মোর করেই পরাজয়)
সাবধানে তাই আড়াল করে রাখ্‌তু আপনারে,
বাহির তবু নিতুই দেয় তাড়া,
প্রাচীর পরে যা দেয়ে যায় সে তাক্‌তুই তাক,—
মুখে আমার সরে নাকো রা।

কেঁপে উঠি আপন মনে,
কেঁপে উঠি সে নির্জ্জনে,
মনের ব্যথা, মনের কালী লুকিয়ে মনে থাক্‌,
অতীত যা তা অতীত হয়ে যাক্‌।
হঠাৎ দেখি প্রাচীর মোর বক্ষে কত গাঁথা,
ঝড়ের রাতে লুটিয়ে ভুমে আছে।
বাহির,—যারে ভয় করেছি লুটবে বলে মোরে,
দু-হাত মেলে দাঁড়িয়ে সেই কাছে।
কণ্ঠেতে তার অভয় বাণী,
নেহ কোমল দৃষ্টি খানি,
লুটল না সে, লুটিয়ে দিল নিজের যাহা কিছু
এক নিমেষে সকলি মোর মাঝে।

দ্বাদশ গোপাল

শ্রীবিজয়রত্ন মজুমদার

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পরে)

মাঝি বলিল—ঘুরে যেতে হ'বে, অনেকটা। সব নৌকা ঘাট ঘিরে দাঁড়িয়ে গেছে, ঘাটের নীচেই চাড়বার বাবুরা বাজি বাজাচ্ছেন, হুকুম হলে একটু থেকে যায়।

গঙ্গারাম তাহার প্রস্তাব সমর্থন করিয়া কহিল—ঠিক হ্যায় মাঝি ভাই, থাকনে হ'বেগা! এই যোগ ভালে...

বিমান কৃত্রিম রোষে চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া তাহার দিকে চাহিতেই দৃষ্টি-টা গঙ্গারামের দৃষ্টির অনুসরণ করিয়া গিয়া হোর মিলার কোম্পানীর "শীতলাদেবী" ষ্টীমারখানার উপর। একটা রমণী ঠিক রেলিঙের ধারে মাথায় তরল পদার্থ পূর্ণ একটা কাঁচের গ্লাস বসাইয়া গানের সঙ্গে নৃত্য করিতেছিল—তাহাকে ঘিরিয়া তিনদিকে পাগড়ী আঁটা মাড়োয়ারীর দল চলা চলি করিতেছে।

বিমান মাঝির দিকে ফিরিয়া বলিল—চালাও! গঙ্গারাম তখনও কাণের নীচে হাত রাখিয়া বিশ্বেশ্বর ভোলানাথের নামে গগন বিদীর্ণ করিতেছিল, বিমান গলাটা টিপিয়া ধরিয়া তাহাকে বসাইয়া দিল।

২

অজিতের লজ্জা রাখিবার স্থান ছিল না। অনেক চিঠিপত্র লিখিয়া, অনেক সাধ্য সাধনের পর অজিত বন্ধুটিকে আনাইতে পারিয়াছিল। নিজে সে শ্রীরামপুরের ছেলে, মাত্র ১৬ সে এই দ্বাদশ গোপালের মেলা দেখিয়াছে, তাহার কাছে নূতনত্ব বিন্দুমাত্র না থাকিলেও যে জিনিষটা তাহার ভাল লাগিত সে চাহিত তাহার প্রিয়জনকে তাহা দেখাইতে!

বিমান যখন নৌকায় উঠিয়া ওধারে মুখ করিয়া নীরবে বসিয়া রহিল, অজিত বার বার ভাবিতেছিল, উঠিয়া গিয়া বিমানের হাতটা চাপিয়া ধরিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া ফেলে। কিন্তু সে অবসর মিলিবার পূর্ব্বেই মাঝি নৌকা খানাকে ডাঙ্গায় ভিড়াইয়া দিল। বিমান দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিল—আয়রে অজিত!

সেই স্নেহভরা কণ্ঠস্বর! অজিত তড়াক করিয়া লাফাইয়া ডাঙ্গায় পড়িয়া মাঝির হাতে একটা টাকা ফেলিয়া দিয়া বলিল—চা খেয়ে যাবেন ত বিমান দা?

আর ত সময় হবে না ভাই চা খাবার! ওকি রে অজিত?—অজিত চাহিয়া দেখিল, বিমান রক্ত পতাকা উড্ডীন একখানা লঞ্চ পানসীর দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া আছে। বিশেষত্ব কিছুই না পাইয়া বলিল—কি দাদা?

ঐ যে রে! কতকগুলো স্কুল কলেজের ছেলে না ওরা?

হ'বে...

ওদের পাশে ও কারা রে?

অজিত দেখিল, বলিল—জানি নে।

বিমান তাহার পৃষ্ঠে মৃদু করাঘাত করিয়া কহিল জানিস ঠিক,—তোর দেশের কাও তুই জানিস্ নে!

সত্যি জানি নে বিমান-দা! আমি ঐ ডাঙ্গা থেকেই দেখে যাই কিছুর; একবারও নৌকায় উঠিনি। আজ নেহাৎ আপনি এসেছিলেন, তাই।

চলিতে চলিতে কথা কহিতেছিল। একটা সরু গলি পার হইয়া বড় রাস্তায় পড়িতেই বিমান বলিল—মেয়ে-মানুষ না থাকলে ফূর্ত্তি হয় না, না-রে?

অজিত সে কথার উত্তর দিল না সত্যরঞ্জন বলিলেন নিয়মিত হয় দাদা, জমে না।

তোর জমার বিচুচি করেছে। দশ হাজার লোকের সামনে ও বাহাদুরিটা না করলেই নয়? ও মেয়েদের কথা আমি ধরি নে। ও বেটাদের লজ্জাও নেই কিছুই নাই। হঠাৎ চুরী জুচ্চুরী করে কিছু পয়সা হ'য়েছে আর ট্যাকে হাত দেয় কার বাবার সাধ্যি! কিন্তু বাঙ্গালীর ছেলে, সব সম্ভ্রান্ত বংশের ছেলেদের এ কি কাণ্ড কারখানা!

অজিত সত্যবাবুকে দেখিতে না পাইয়া চতুর্দ্দিকে চাহিতে চাহিতে বলিয়া উঠিল—সত্যবাবু কোথায় গেলেন? সত্যবাবু! সত্যবাবু!

বিমান অজিতের হাতে টান দিয়া বলিলেন—ঠিক আছে, তুই আয়...

কৈ দাদা, তাঁদের ত দেখ্‌ছি নে।

আসবে 'খন, আয়।

ইহাতেও অজিত স্থির হইতে পারিল না, সত্যবাবু

আর কখনও এ-অঞ্চলে আসেন নাই, যে ভিড়—তাহাতে একবার হারাইলে খুঁজিয়া পাওয়াও দুঃসাধ্য, বিশেষতঃ অজিত তাঁহাকেও আমন্ত্রণ দিয়া আনিয়াছে, তাঁহার সন্ধান না করাটা সে ভদ্রতা বোধ করিল না। অজিত বিমানের দিকে ফিরিয়া বলিল—দাদা, ঐ রামযাত্রার ঐ খানটায় আপনি একটু দাঁড়ান, আমি একবার দেখি··· বলিতে বলিতেই; দেখা গেল, গঙ্গারামের হাতে দিনা-খানেক পাপড় চাপাইয়া সত্যরঞ্জন নিজে একখানি ভাঙিয়া খাইতে খাইতে ভিড় ঠেলিয়া হাসিমুখে এদিকেই আসিতেছেন।

বেশ দাদা, আমি এদিকে খুঁজে খুঁজে হায়রাণ!

সত্যরঞ্জন নির্ব্বিকারচিত্তে সমস্বে পাপড় খাইতে লাগিলেন, কথা কহিলেন না।

গঙ্গারাম তাঁহার হইয়া বলিল—ওদিকে দেখ্‌লে না ত বাবা...কথাটা তাহার শেষ হইতে পারিল না, শঙ্কর—সত্য বিস্ফারিতনেত্রে চাহিতেই সে নীরব হইয়া গেল।

আটচালা বাঁধা একটা মাঠের সম্মুখে দাঁড়াইয়া দুইটা লোক সঙ সাজিয়া বাদল বাজাইতেছিল, গঙ্গারাম সহর্ষে বলিল—শঙ্কর! ভবানীর সার্কাস আছে এইখানে! চল-না একটু দেখা যাক্!

সত্যরঞ্জন ওরফে শঙ্করের তাহাতে কিছুমাত্র আপত্তি ছিল না, কিন্তু বিমান ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে চাহিতে শঙ্করের বা শঙ্কর-সেবক নন্দীর কাহার আর একটুও উৎসাহ রহিল না।

আবার সকলে চলিতে আরম্ভ করিলেন। দুই ধারে বিপণী শ্রেণী, মধ্যে যে অল্পপরিসর স্থানটুকু আছে তাহাতে ভীষণ জনতা। জনতা ঠেলিয়া ঠুলিয়া যখন তাঁহারা থানার সম্মুখে পৌঁছিলেন, তখন থানার বারান্দার ঠিক নীচেই একদল লোক একস্থানে খুব ভিড় করিয়া দাঁড়াইয়া কি বলা-বলি করিতেছিল।

সত্যবাবু লোকটী প্রায় সেই সত্যযুগের মানুষের মত লম্বায় কম করিয়া তিনি ৬ ফুট হইবেন, জনতার সামনে আসিয়া উঁকি মারিয়া বলিয়া উঠিলেন—মজা আছে হে!

কি? কি? অজিত ও গঙ্গারাম তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ভিড়ের মধ্যে ঢুকিয়া পড়িলেন। বিমান অল্পক্ষণ দাঁড়াইয়াই জানিতে পারিল, কোন একটি রমণী সঙ্গী-হারা হইয়া পথে পথে কাঁদিয়া বেড়াইতেছে। এখানকার ভদ্র ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ অনেকেই সাগ্রহে তাহাকে স্থান দিয়া ঔদার্য্য দেখাইতে প্রস্তুত, কিন্তু মাগী এমনই হতচ্ছাড়া একগুঁয়ে যে কাহার কথা শুনিতেছে না; ঘাড় গুঁজিয়া সেই যে লাম্বের মত খাড়া দাঁড়াইয়া আছে—না বলে একটি কথা, না নড়ে চড়ে! শ্রীরামপুর স্থান অতি ভদ্র, নহিলে উহাকে কি-বিপদেই না পড়িতে হইত! মাগীটা এমনই অভদ্র বটে, কৃতজ্ঞ হওয়া দূরের কথা, থাকিয়া থাকিয়া ফোঁস করিয়া উঠিতেছে!

বিমান দুইটি কুহুয়ের বলে আশে-পাশের লোকগুলিকে সরাইয়া বুকে পিঠে ধাক্কা খাইতে খাইতে অগ্রসর হইয়া যাহা দেখিল, তাহা এই:—রমণী নীরবে, নতমুখে দাঁড়াইয়া আছে, আর কম করিয়া একশত জোড়া তীক্ষ্ণ দৃষ্টি তাহাকে একেবারে গ্রাস করিতে উদ্যত! শুনা গেল, একজন বলিতেছে, কেন চাঁদ আর কান্না—বল্‌ছি এস! সঙ্গী হারিয়েছে তার হ'য়েছে কি! সঙ্গীর আবার অভাব! এক রাজা যাবে, অন্য রাজা হবে, তোমার ও সিংহাসন খালি নাহি রবে!—বেছে নাও না যাকে পছন্দ হয়!

রমণী কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল—আপনারা দয়া করে আমাকে ষ্টেশনে পৌঁছে দিন, আপনাদের কাছে আমি চিরদিন কৃতজ্ঞ হ'য়ে থাকব।

কৃতজ্ঞতাটা একটু আগেই দেখিয়ে দাওনা চাঁদ—বলিয়া অনেক যুবক রমণীর পদতলে রক্ষিত পুঁটলীটি লইয়া বলিল—এস গো মেয়ে মানুষ, এস—ইষ্টিশানে নিয়ে যাচ্ছি···বলিয়া যুবক এক অতি কদর্য্য হাসি হাসিয়া উঠিল।

বিমানের চোখ দু'ইটা হিংস্র পশুর মত জ্বলিয়া উঠিল! ইচ্ছা হইতেছিল ঐ কুশ্রী হাসিভরা বদন খানি দুই চড়ে বাঁকাইয়া দেয়! ঠিক সামনেই সত্যবাবু ও গঙ্গারামকে দেখিয়া রাগ আরো বাড়িয়া গেল। এই কি তাহাদের আনন্দ উপভোগের সময়? ছিঃ ছিঃ—এতটুকু ভদ্রতা জ্ঞানও উহাদের নাই! একটু মনুষ্যত্ব, একটু বিবেক-বুদ্ধি—তাহাও নাই!

বেলা দেখ্‌লে, দু'চো কলা বেচবে না চাঁদ? তা'ও কি হয়—এস, এস···

বিমানের কাণ দুইটা পুড়িয়া গেল। সে আবার দু'টি হাতের জোরেই ভিড়ের বাহিরে আসিয়া থানার রোয়াকে উপবিষ্ট দীর্ঘকায় কনেষ্টবলের সম্মুখীন হইয়াছে,

কনেষ্টবল রোষপূর্ণ স্বরে বলিয়া উঠিল, হিয়া ক্যা ঘাস রে! কুছ নেই হিয়া কুছ নেই, উতার যাও!

দারোগা কোথায়—জিজ্ঞাসা করাতে কনেষ্টবল কহিল—দারোগা বাবু তুমাহারা নোকর নেহি হায়!

বিমান মুষ্টিতে তাহার দিকে অগ্রসর হইতেছিল, কি ভাবিয়া আবার ফিরিল। আবার অনন্তার সম্মুখীন হইতেই শুনিল—ভ্যালা মেয়েমানুষ বাবা! বলছি এস...বাবা, সহরের মেয়েমানুষ তোমরা, এমন বেরসিক তা ত জানতম না। অমন ধারা কি করতে আছে ধনমণি!—

ঠিক এইসময়েই ভিড় ঠেলিয়া বিমান একেবারে রমণীর নিকটে গিয়া তাহার একখানি হাত হাতের মধ্যে চাপিয়া লইয়া বলিল—এস।

সিল্কের চাদরের ঘোমটা আপনা হইতেই সরিয়া গেল; রমণী বিকসিত নেত্রে একবার বিমানকে দেখিয়া নিঃশব্দে চলিতে আরম্ভ করিল। ক্রমশঃ

তারকেশ্বরের প্রবল বন্যা।

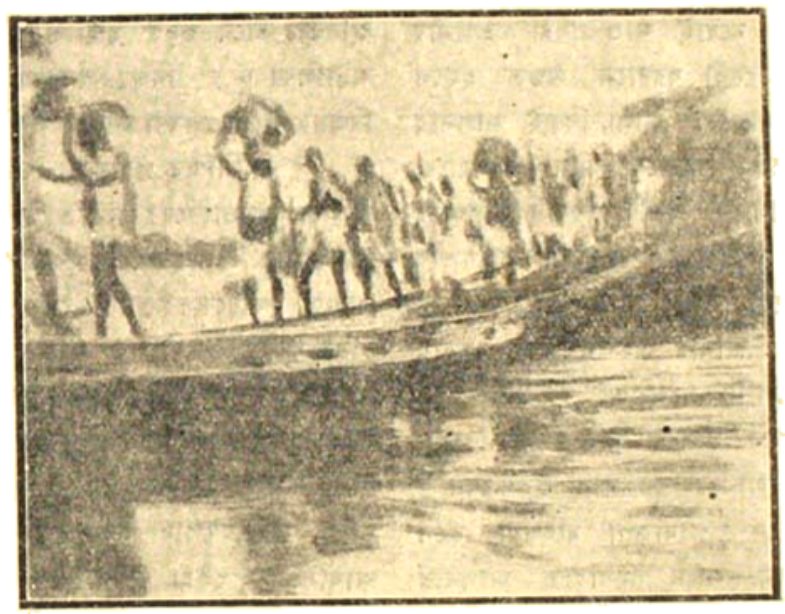

আর ট্রেণ চলে না, রেল লাইনের উপর দিয়া মোট-মাটরা বহিয়া যাইতে হইতেছে।

লাউসেন

(শ্রীশিবরতন মিত্র)

দ্বিতীয় অধ্যায়।

ইছাই ঘোষ—ঢেকুর সংস্থাপন।

ইছাই, শৈশবাবধি শক্তি আরাধনায় মনোযোগী হইল। বালসুলভ চপলতা, ইহার উপর কোনরূপ প্রভাব বিস্তার করিতে সমর্থ হইল না। সে অনন্যমনে একান্তে, কেবল মাত্র শক্তি উপাসনা ও শক্তি সেবা করিয়াই বাল্য-জীবনে পরম আনন্দ অনুভব করিতে লাগিল। তাহার এই ঐকান্তিক অনুরাগ বিফল হইল না—সে অচিরেই ভবানীর প্রতি অচলা ভক্তি লাভ করিয়া ধন্য ও চরিতার্থ হইল।

এই সময়, ত্রিবটীগড়ে একজন সুদর্শন অবধূত সন্ন্যাসী আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহার শিব-সদৃশ সৌম্যমূর্ত্তি দর্শনে, ইছাই তাহার প্রতি অতিশয় আকৃষ্ট হইয়া পড়িল—তাহার ভক্তি প্রবণ হৃদয়ে ভক্তি-

স্রোত উছলিয়া উঠিল। সন্ন্যাসী, এই শিশুর সৌভাগ্য দর্শনে পুলকিত হইলেন এবং তাহাকে নানাবিধ সদুপদেশ প্রদান করিয়া কহিলেন—"বৎস, তুমি নিভৃতে অনন্যমনে অচলা ভক্তি সহকারে এই মন্ত্র জপ করিতে থাক—দেবতা অচিরেই তোমার প্রতি প্রসন্ন হইবেন—তোমার মনোভিলাষ পূর্ণ হইবে। সন্ন্যাসী, ইছাইকে এইরূপ আশির্ব্বাদ করিয়া তীর্থবাসে প্রস্থান করিলেন।

ইছাই, সেই সন্ন্যাসী গুরুর উপদেশ মত নির্জ্জনে হেমযজ্ঞাদি বিবিধ আয়োজন সহকারে, মহানন্দিত মনে ভবানীর পূজা আরাধনায় নিযুক্ত হইল। কঠোর তপস্যা, অনুষ্ঠিত আত্ম-নিবেদন ও আবেগ পূর্ণ স্তব-স্তুতি দ্বারা ইছাই অনতিকাল মধ্যেই আশু প্রসন্না ভবানীর প্রসন্নতা লাভ করিল। দেবী বরদানে উদ্যত হইলে ইছাই বলিল—"মা, আমার তাপ জ্বালা, কিছুই আপনার অগোচর নাই। 'আমার পিতাকে বিনা অপরাধে, অবিচারে গৌড় কারাগারে বন্দী করিয়া অনাহারে কতই না যন্ত্রনা প্রদান করিয়াছে! মা, আমার পিতার প্রতি এই দারুণ দুর্ব্যবহার জন্য আমি যে কি বিষম যন্ত্রনা ভোগ করিতেছি, আমার এই মর্ম-দাহ যন্ত্রনার শান্তি হইবে না। আপনি যখন এই অধমের প্রতি প্রসন্না 'হইয়া বর প্রদানে উদ্যতা হইয়াছেন, তখন আপনি কৃপা পূর্ব্বক আমায় বর দান করুন যেন—(১) আপনি এইস্থানে শ্যামারূপা মহেশ্বরী রূপে চির অধিষ্ঠিতা রহিবেন—আমি দিবারাত্র আপনার শ্রীচরণ দর্শনে চরিতার্থ হইব, (২) আমি অবধ্য হই, (৩) আমি দেবতা দানব বা মানব—কাহারও কর্ত্তৃক হত না হই, (৪) আপনার হস্তধৃত অসি ব্যতিত অপর অস্ত্রাঘাতে আমার মৃত্যু না ঘটে, (৫) আমার এই গড়মধ্যে কোন শত্রুরই প্রবেশাধিকার রহিবে না—শত্রু আক্রমন কালে অজয় নদের স্রোত প্রবল হইয়া তাহাদিগকে গড় প্রবেশে বাধা প্রদান করিবে, (৬) এই ত্রিযষ্টীগড় এখন হইতে "অজয় ঢেকুর' নামে অভিহিত হইতে থাকিবে।

দেবী, ইছাইর ভক্তিতে পরিতুষ্টা হইয়াছেন—সুতরাং তাহাকে তাঁহার অদেয় নাই। তিনি, সন্তুষ্ট-চিত্তে ইছাইর যাবতীয় প্রার্থনা পূরণ করিলেন।

ইছাই, দেবীর অভয় আশ্বাস লাভ করিয়া সর্ব্বাগ্রে গড়মধ্যে শ্যামারূপা মহেশ্বরী দেবীর কনক প্রতিমা প্রতিষ্ঠিত করিয়া মহাসমারোহ সহকারে নিত্য পূজার ব্যবস্থা করিল। তদনন্তর ইছাই, একাধিপত্যের নিদর্শন স্বরূপ, আপনার স্বাতন্ত্র্য ঘোষিত করিয়া গৌড়েশ্বরের প্রাপ্য কর বন্ধ করিয়া দিল। গৌড়েশ্বরের দোহাই দফতর মুক্ত হইয়া গেল—সকলেই এখন হইতে ইছাই ঘোষের দোহাই দিতে আরম্ভ করিল।

এইবার ইছাই, ত্রিযষ্টীগড়ের আমূল সংস্কার সাধন ও নূতন রাজধানীর পত্তন ও প্রতিষ্ঠাকল্পে মনোনিবেশ করিল। পাহাড়শ্রেণী পরিবেষ্টিত সুবিস্তৃত অজয়নদ তীরভূমি পরিষ্কৃত করিয়া নব রাজধানী জন্য স্থান মনোনীত হইল। এইস্থানে রাজঅট্টালিকা নির্ম্মান করিয়া যথাযথ সুবিস্তৃত ভাবে সুদৃশ্য হর্ম্ম্য ও গৃহশ্রেণী নির্ম্মিত হইল—অট্টালিকা চূড়ে বিজয় পতাকা উড্ডীন হইয়া ইছাইর বিজয় গৌরব ঘোষণা করিতে লাগিল।

এই নবনির্ম্মিত পুরীমধ্যে ইছাই বিভিন্ন জাতীয় লোক আনয়ন ও তাহাদের বসতি স্থাপন করিয়া নবপ্রতিষ্ঠিত রাজধানীর গৌরব বৃদ্ধি করিল। আচারনিষ্ঠ ব্রাহ্মণ পণ্ডিত, আয়ুর্ব্বেদ কুশল বৈদ্য, সমরকুশল ক্ষত্রিয়, পূত চরিত্র কুলীন ও মৌলিক কায়স্থ, বৈদ্য, গোপ, রাজবংশী, নাপিত, তেলী, মালী, তাম্বুলী, তাঁতি, কর্ম্মকার, কুম্ভকার, উগ্রক্ষত্রিয়, সাধারী, মদক, বারুই ইত্যাদি, এবং সুবর্ণ-বণিক, কলু, কেওরা, কৈবর্ত্ত, স্বর্ণকার, ছুতার, মাইতি, রজক, ডুম্বি, গোপ ইত্যাদি জাতি, যথাযোগ্য স্থানে আবাসপ্রাপ্ত হইয়া সুখস্বচ্ছন্দে বাস করিতে লাগিল। পুরীর প্রান্তদেশে, গণিকা ও হীনজাতীয়গণের জন্য স্থান নির্দ্দিষ্ট হইল। ডোম, হাড়ি, শুঁড়ী, কোল, কিরাত, ইত্যাদি জাতি, পুরী সংলগ্ন প্রান্তভূমিতে আশ্রয় প্রাপ্ত হইল। সেখজাদা, মীরজাদা, সৈয়দ পাঠান, সমর কুশল মোগল ইত্যাদি সম্মানিত যবন জাতির জন্য স্বতন্ত্রভাবে বাসস্থান প্রদত্ত হইল। এইরূপভাবে নবনির্ম্মিত নগর মধ্যে বসতি সংস্থাপিত হইল, পুরী রক্ষার জন্য, নগরের প্রান্তসীমা বেষ্টন করিয়া বিক্রমশালী অহরা, মওতি, কোল প্রভৃতি চোয়ার জাতির বসতি নির্দ্দিষ্ট হইল। ইছাই আদর করিয়া তাহার এই সাধনের নবনির্ম্মিত পুরী 'ঢেকুর' নামে অভিহিত করিল।

পুরী সংস্থাপন কার্য্য সমাধা হইলে ইছাই, শ্যামারূপা ভবানীর প্রীতিকামনায় শত বলিদানসহ ষোড়শোপচারে

পূজা করিয়া, তাঁহার ভক্তের আশ্রয়ভূমি এই নব-প্রতিষ্ঠিত ঢেকুরের অলৌকিক মাহাত্ম্য প্রদর্শন জন্য দেবীকে করজোড়ে প্রার্থনা করিল। ভক্তের কাতর-প্রার্থনা বিফল হইল না—দেবী হৈমবতী, সহাস্য বদনে কৈলাস হইতে কিছু বীরমাটী আনয়ন করিয়া ঢেকুরের গর্ভে নিক্ষেপ করিলেন। সঙ্গে সঙ্গে তথায় অপূর্ব্ব অভিনয়ের আরম্ভ হইল। নিঃসহায় ভেক, ক্ষুধিত ভুজঙ্গকে তাড়া করিতে লাগিল—সাপের ওঝা ইঁদুর, মহাদর্পে সর্পকে ধৃত করিতে লাগিল এবং ঢোড়া সাপকে সহায় করিয়া বিড়ালকে বিতাড়িত করিতে লাগিল! তক্ষক সদৃশ তেজস্বী সর্প, ভেকের প্রতাপ সহিতে অসমর্থ! নিত্যস্বপক্ষারূঢ় নকুল, সর্পের সহিত দ্বন্দ্ব করিতে বিরত!—এই অভাবনীয় বিপরীত ব্যাপার দর্শন করিয়া, ইছাই ভবানীর অলৌকিক প্রভাব ও মাহাত্ম্যের কথা হৃদয়ঙ্গম করিয়া পুলকিত ও চমৎকৃত হইয়া গেল।

ঢেকুর রাজপুরী অচিরেই জনকোলাহল মুখরিত ও অতুল ঐশ্বর্য্যে বিভবান্বিত হইয়া উঠিল। ইছাই ঘোষ ও নব রাজধানী প্রতিষ্ঠার পর হইতে ক্রমেই, বিপুল বিক্রমশালী ও সমর কুশল সহর কোটাল লোহোটা বজ্জর প্রভৃতির সহায়তায় যথেষ্ট বল সঞ্চয় করিয়া লইল এবং অনতিকাল মধ্যেই ঢেকুর রাজপাটে অধিষ্ঠিত হইয়া তাম্রদেশের একছত্র নরপতিরূপে পরিগণিত হইল। গৌড়েশ্বর রাজার সমস্ত আদেশ 'বরদ' হইয়া গেল; এতদ্দেশে তাঁহার শাসন ও অধিকার বিলুপ্ত হইল!

এখন হইতে ইছাইএর প্রতাপে, অন্যের কথা কি, স্বর্গে দেবতা পর্য্যন্ত ত্রস্ত ও ভীত হইতে লাগিল—যমরাজ, ঢেকুর রাজ্যের ত্রিসীমা পরিত্যাগ করিয়া পলাইয়া গেলেন! ত্রিবেণীগড়ের পূর্ব্ব রাজপ্রতিনিধি কর্ণসেন রায় মহাবিপন্ন হইলেন। ইছাই, তাঁহার সমস্ত সম্পত্তি—হাতী ঘোড়া, উঁরগাড়ী, বাড়ী রাজপাট—লুণ্ঠন করিয়া, বৃত্রাসুর যেরূপ ইন্দ্রকে স্বর্গ হইতে বিতাড়িত করিয়াছিল, সেইরূপে তাড়িত করিল কর্ণসেন, মহাপ্রমাদ গণিয়া শিরে করাঘাতপূর্ব্বক গড় পরিত্যাগ করিয়া কোনরূপে প্রাণ লইয়া সপরিবারে পলায়ন করিল।

পেলারামের স্বদেশিতা

নামটায় একটু ঘোর আছে। দেশবাসী এই নাটকের অভিনয়ে হিন্দু-মুসলমানের ভ্রাতৃত্ব দেখিতে পাইবেন, পল্লী কর্ম্মক্ষেত্রে সম্মিলিত যুবকগণের কার্য্য প্রণালী দেখিয়া সন্তুষ্ট হইবেন। পেলারাম দেশ-হিতৈষী বটে, কিন্তু সে রাজদ্রোহী নয়। দেশের উন্নতি করিতে সে বদ্ধপরিকর, কিন্তু এনার্কিষ্ট নয়—! স্বয়ং রাজপুত্রের মহিমাময় নাম লইয়া সে রাজা মামা-মশাইয়ের অত্যাচার বন্ধ করিতেও পারিয়াছিল, তাঁহার নাম লইয়া মামাকে অনেক পাপ ও অন্যায় কার্য্য হইতে নিবৃত্ত করিয়াছিল। পেলারাম দেশের মঙ্গল চায়, রাজার অমঙ্গল কামনা তাহার উদ্দেশ্য নয়।

নাটকের মোটামুটি গল্পটি এই—পেলারাম একটা সওদাগরী আফিসে কেরাণীগিরি করিত, খুব পরিশ্রমী, আফিসে স্বদেশ-প্রেমপূর্ণ বক্তৃতা দিত, সহকর্ম্মীগণকে স্বদেশ-হিত ব্রতে উৎসাহিত করিত। বড় বাবুকে "কম্‌মোকার মশাই" বলিত, ছোট সাহেব কবে ছোট অবস্থায় টিকিন-ঘরে বসিয়া শুখনো চিংড়ী ভাজা খাইয়া 'ফাঁকো দিয়া যে প্রাণপাখী উড়িয়া গিয়াছে'—তাহারই বিরহে আকুল হইয়া গান-গাহিত—সেই কথা স্মরণ করাইয়া দিত—বেচারির চাকরিটি গেল; সাহেব সে-সব পূর্ব্ব-কথা বিস্মৃতির অতল-তলে ডুবাইবার চেষ্টায় ছিল, পেলারাম কম্‌মোকার মশাই-এর সামনে হাত পা ছুঁড়িয়া, অঙ্গভঙ্গী সহকারে হাটে হাঁড়ী ভাঙ্গিয়া দিতেই, মোটিশ। পেলারাম সেখান হইতে এক ধোঁড়ে রাজা-মামা মশাই-এর বাড়ী, নবগ্রাম। মামা-মশাই দ্বিতীয়পক্ষের মনোহারা সম্পত্তি মেলেন-ট্যাপাকে লইয়া রঙ্গে মশ্‌গুল্, খবর আসিল, লর্ড ম্যাইর পেলারাম আসিতেছে, পেলারাম যে সোজন্য-কেরাণীজন্ম হইতে নিস্তার লাভ করিয়া আসিতেছে, তাহা কেহই জানিল না; মামা-মশাই শুনিলেন, বিলাত হইতে একটা বড় সাহেব হইয়া আসিতেছে। পেলারামের অবশ্য এ-কথা রটাইবার কারণ ছিল। তাহার রাজা-মামা-মশাই বিধবা ভগ্নী গোপালের মা'র আট হাজার ও নবীনরায়ের পুত্র রাধাকান্তের বাইশ হাজার টাকা বেমালুম আত্মসাৎ করিয়া বসিয়াছিলেন, বসিয়া বসিয়া ভূতো-সরকারের

সাহায্যে লাঠির মুখে প্রজাশাসন করিতেছিলেন। পেলারাম কোল্ বয়লাইয়া, একেবারে খাঁটী লর্ড মাউার প্যালারাম হইয়া কুতো-সরকারকে পশ্চাদ্দিকে রুমাল ঘষিয়া 'সটা-সট্' গুলি করিবার ভয় দেখাইয়া, নিজেই পকেট হইতে হাজার টাকার নোট্ বাহির করিয়া প্রজাদের দেখাই দিল। রাজা-মামা-মশাই কারণ জানিতে চাহিলে বলিল—আমার বন্ধু প্রিন্স-অব-ওয়েলস (রাজপুত্র) কে আপনার এখানে নিমন্ত্রণ করিয়া আসিয়াছি, তিনি আসিয়া যদি শুনিতে পান যে আপনি এইরূপ Cruelty to animals করিয়া খাজনা আদায় করিতেছেন, তাহা হইলে আর কি রক্ষা আছে? একেবারে দু'হাতে এই কড়াক্কড় আর সেই কড়াক্কড় দড়ি! মামা-মশাই ভয় পাইয়া গেলেন। রাজা-মামা-মশাইকে দিয়া আরও একটা কাজ সে করাইল। বিধবা ভগ্নী নবতারা ও রাধাতারার ত্রিশ হাজার টাকার উল্লেখ যে খাতায় আছে, সেই খাতা পুকুরপাড়ে গর্ত্ত খাটিয়া পুঁতিয়া দিল, জানি-কি যদি রাজপুত্র আসিয়া উহাদের নালিশ শুনিয়া খাতাপত্র দেখিয়া বসেন, তবে কি আর রক্ষা আছে, কড়াক্কড় কড়াক্কড় বাঁধিয়া ফেলিবে। লর্ড মাউার পেলারাম তখন মহাধনী লোক, তেই পকেটে হাজার হাজার টাকার তাড়াবন্দী নোট্, আর নীচের পকেটে চেক বহি। ত্রিশহাজার টাকার দরকার। রাজা-মামা-মশাই-এর দেশে, যুবরাজ আসিতেছেন, সাজাইতে গোজাইতে হইবে, ত্রিশহাজার টাকা চাই। মামা-মশাই অবশ্যই ছয়চার আনা খরচ করিতে প্রস্তুত ছিলেন, কিন্তু প্যালারামের বাজার যাহে তখন সতেরো লাখ্ নয় হাজার মারকেন্টাইল ব্যাঙ্কে···ওঃ—মামার চক্ষু স্থির হইয়া গেল—কিন্তু টাকা ত আর সে সঙ্গে আনে নাই, আনিয়াছে একখানা চেকবহি; চেক কাটিয়া দিতে গেলে, দোলন চ্যাপা বিজ্ঞার মিত্র স্বামীকে বলিল—রাজপুত্র তোমার দেশে আসছেন, খরচ করতে হয় তুমি কর।···বৃদ্ধত ভগ্নী বিধবা। তবুও রাজা মামা-মশাই অনেক কাকুতি মিনতি করিলেন, কহু করিয়া প্রাণটি বাহির হইয়া যাইবে বলিলেন, কিছুতেই কিছু না, দোলন লিপুক খুলিয়া টাকা দিয়া দিল। পেলারাম আট হাজার সেই বিধবা নব তারাকে, বাইশ হাজার রাধাতারাকে দিয়া রাজা-মামার ঋণ শুধিল। রাজা তখন কিছুই জানিলেন না; কিন্তু জানিতে ও বড় দেরী হইল না। কলিকাতার প্রসিদ্ধ জমিদার পূজ্য রঘুনাথ প্রাইভেট্, রিসেল্ সান্ কাণ্ডের টাকা আদায় করিতে মানিকচাঁদ বাবুর দেশে আসিলেন। রঘুনাথ বাবু বন্দেমাতরম্ গাহিলে পুলিশ ডাকেন, বন্দ আদায় জননী আমার শুনিলে পুলিশ কমিশনারকে নিমন্ত্রণ করিয়া পাঠান, ভাবেন—এ হল কি। এহেন রঘুনাথ তারা দেশে আসিয়া মুসলকী তাগিদা দিলেন। দিলেন বটে কিন্তু তাহাতে বিশেষ সুবিধা হইল না। একদিকে বাঘ এদিকে সাপ দেখিলেন। প্রথমতঃ রাজা মানিকচাঁদের বড় গিন্নি রঘুনাথ ভাইকে ছেলেবয়া ভাবিয়া মা-নয় তাই বলিলেন। ছোটগিন্নি তাহাকে বেশছাড়া করিয়া দিলেন। রঘুনাথ বাবু কণ্ঠশিলে হেভি এ্যাজিটেশন করিবেন বলিয়া প্রস্থান করিলেন। রাজা মামা মশাই পুলিশ ডাকিয়া আনিয়াছিলেন, প্যালাকে ধরাইবার জন্ত ত্রিশহাজার টাকা ধারে। নবীনা পত্নী দোলন বলিল—সে টাকা প্যালারামকে দেশের উন্নতির জন্ত তিনি তাঁহার বৃদ্ধ স্বামীর অনুমতি লইয়া দান করিয়াছেন, দোলন চ্যাপা যাহা বলে—দেবাদেশ।

আজ কয়েক রাত্রি নাটকটি মিনার্ভা রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হইতেছে; দর্শকগণ যে পরিতৃপ্ত হইতেছেন, তাহা অসাধারণ জনতা দেখিলেই বুঝা যায়। গোড়া হইতে শেষ পর্য্যন্ত হাসি ছড়াছড়ি, রঙ্গ ভরপুর, তামাসা প্রচুর—সবগুলি স্বচ্ছ, নির্ম্মল এবং সেই স্বচ্ছ নির্ম্মল তরঙ্গের নিম্নে তরঙ্গ-তরঙ্গ করিয়া বহিয়া যাইতেছে, দেশভক্তির অমৃত নদীটি।

মানিক চাঁদের মত অর্থগৃধ্নু জমিদারও শেষে দেশের কাজে লাগিয়া যান; যতীন পিতা যিনি চামড়ার গুদামে কাজ করিয়া চামড়া হইয়া গিয়াছিলেন, মরা মা'কে ঘরে রাখিয়া আফিস্ সারিয়া সন্ধ্যায় ফিরিয়া যিনি গর্ভধারিণীর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া করিতেও অগৌরব বোধ করেন নাই তিনিও শেষাশেষি প্যালারামের স্বদেশিতায় যোগ দিয়াছিলেন। অলিভার ডেভিসের ছোট সাহেব বিনোদ যদুর পরে, সার্জেন্ট পড়ে আসিয়াও তাহাকে ভালোবাসিত; মেথরে কোন এক কেরাণী বাবুকে হরতালের দিন আফিস্ যাইতে দেয় না'—মেথরের কথায় তাহার চৈতন্তোদয় হইয়াছিল, সেও প্যালারামের কর্ম্মক্ষেত্রে আসিয়া জীবন যন নিযুক্ত করিল। আর করিল দোলন চ্যাপা, বড় লোকের সংযোগ্যা স্ত্রী, রূপে গুণে অতুলনীয়। তাহার জা'ও মাতিয়া গেল।

নাটকটিতে যাঁহারা প্রশংসার যোগ্য অভিনয় করিয়াছেন, তাঁহাদের নাম :—পেলারাম···শ্রীযুক্ত রাধিকানন্দ মুখোপাধ্যায় এমেচার। ছোটসাহেব নরেশচন্দ্র মিত্র বি,এল, কর্ণেকার মহাশয়, কার্ত্তিক চন্দ্র দে,দাদা মামা-বশাই, কুঞ্জলাল চক্রবর্ত্তী; বলরাম ভাই, কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়; বড়গিন্নি, শ্রীমতী প্রকাশমণি; ষোলন চাপা, নলিবালা। ইহা ব্যতীত ছোটখাট ভূমিকাতেও কোন কোন অভিনেতাও অভিনেত্রী যথেষ্ট কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন। যথা গাট কাটার ভূমিকায় বিনয়বাবু মাদ্রোয়ারীর ভূমিকায় কালীপ্রসন্নবাবু। আমরা নিঃসন্দেহে বলিতে পারি বঙ্গ মঞ্চকে এমন সর্ব্বাঙ্গসুন্দর অভিনয় অনেকদিন দেখি নাই। ত্রুটী নাই বলিলেই হয়। যদিও থাকে, তাহা অতি সামান্য। দু' একটি ভূমিকায় সে উৎকর্ষ সাধিত না হইতে পারিত তাহা বলা যায় না,—যাযাবরের ভূমিকাটির অভিনেতা নির্ব্বাচনের প্রশংসা করা অসম্ভব।

দর্শক যে কয়টি গান শুনিতে পাইবেন, সব ক'টিই সুর এবং তালোপযোগী। যদি সুন্দর হয় ত সুন্দর পদ—শুনিয়া বিলাতী বসন প্রীতি দূর হইবে বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস। সাজন কেনার পরামর্শটিও বেশ। দর্শক এ সব গান ত শুনিবেন-ই, আর শুনিবেন, সেই বন্দেমাতরম্; সেই বঙ্গ আমার জননী আমার—শুনিতে শুনিতে দর্শক ও কোরাসে যোগ দিয়া বেশ মাতার স্তব করিবেন।

এই গীত প্রসঙ্গে একটী কথা উল্লেখ যোগ্য বলিয়া মনে করি। স্বর্গীয় দ্বিজেন্দ্র লালের গানের দু'এক কলি গীত হইয়া থাকে। বিলাতী থিয়েটারে সঙ্গীত বিদ্যাবিদ দেবকণ্ঠ সমস্বরী থাকিতে দ্বিজেন্দ্র লালের গানের সুরের এমন বিকৃতি ঘটিল কেন? দ্বিজেন্দ্রলাল স্ব-রচিত সঙ্গীত সমূহে নিজে সুর যোজনা করিতেন, ইহাই ছিল তাঁহার বিশেষত্ব। সে সুর আমরা শুনিয়াছি,সে সুরে সুর মিলাইয়া লক্ষ লক্ষ লোক সে গান গাহিয়াছে—দ্বিজেন্দ্রলালের সঙ্গীত আমাদের জাতীয় সঙ্গীত হইয়াছে, সে সুর আমাদের মনে প্রাণে গাঁথিয়া গিয়াছে, আজ যদি থিয়েটারে ঢুকিয়া তাহার বিকৃতি ঘটে, তাহা কি সত্য সত্যই পরিতাপের বিষয় নহে?

তাহার পর দৃশ্যপটের কথা। এ সকলেরও কোন ত্রুটী নাই, যেমনটি হওয়া উচিৎ ঠিক তেমনিই হইয়াছে। প্রস্তাবনা ও শেষ দৃশ্যে স্টেজ আলোকে যে সমুজ্জ্বল চিত্র দেখিবেন তাহা বাস্তবিক সুন্দর, পবিত্র।

একটা জিনিষের উল্লেখ করি নাই বলিয়া নিরপেক্ষ পাঠক হতাশ হইবেন না যেন! নাচ। আছে বৈ কি! বেশ নতুনত্ব পূর্ণ নাচ আছে। তবে হাঁ, পেলারামের স্বদেশিতায় 'লে সখি তের তর পিরালা' গোছের নাচ নাই বটে, ইহাতে যদি কেহ কুর ইন নাচায়! মকাদার গানের অভাব নাই। ষোলন চাপার কণ্ঠের 'সাত রাজার ধন একটি মানিক' শুনিতে পাইবেন।

এইবার নাটকের মূল ভূমিকার সম্বন্ধে একটি কথা বলিয়া নিবন্ধ শেষ করিব। রাধিকানন্দ বাবুর অ্যান্টিগোনোসের ভূমিকা অনেকে দেখিয়াছেন, তাহার তুলনা হয় না। এই ভূমিকা দ্বারাই তিনি সুধী সমাজে আদৃত হইয়াছিলেন। আমরা তাঁহার নাদির শাহ দেখিয়াছি, রাধিকাবাবুর গৌরব অক্ষুণ্ণ থাকিয়াছে, তাঁহার কেলোর কীর্ত্তিতে কেলো দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছি—আর চমৎকৃত হইলাম, তাঁহার পেলারাম দেখিয়া। বাঙ্গালা দেশে প্রথম শ্রেণীর অভিনেতার নাম করিতে হইলে রাধিকানন্দের নাম করিতেই হইবে।

এই নাটকে সুপ্রসিদ্ধ শিল্পী নরেশচন্দ্র একবার মাত্র অলিভার ডেভিস্ ক্লোপানির ছোট সাহেবের ভূমিকায় অবতীর্ণ হ'ন। ভূমিকা দীর্ঘ হৌক অল্প হৌক, অভিনেতার গুণেই তাহা ফুটিয়া উঠে! যাঁহারা পেলারামের স্বদেশিতার অভিনয় দেখিবেন তাঁহারা একবাক্যে নরেশচন্দ্রের অসামান্য কৃতিত্ব স্বীকার করিবেন। পেলারাম যখন সাহেবের বাল্য-লীলা স্মরণ করাইয়া দিতে বলিতেছে, মনে আছে সাহেব, আমার সেই পয়েন্টার ভাগ বলিয়ে পেট পোয়ানোর কথা—তখন সাহেবের-চক্ষে মনে বাল্যকালের ছবি খেলা করিতেছে; বর্ষাক্ত-কলেবরে সাহেব মুহুর্মুহু রুমালে মুখ মুছিতেছেন, সাহেবের চক্ষু দু'টি হইতে আগুন ছুটিতেছে, কপালের শির ফুলিয়া উঠিয়াছে, কণ্ঠ রুদ্ধ, কিছুক্ষণের জন্য বোধ করি সাহেবের হাত-পা'ও অবশ হইয়া গেছে—সাহেব, পেলারাম তাঁহার দুঃসময়ে অনেক সাহায্য করিয়াছে, তাবিয়াই বোধ করি অকৃতজ্ঞ হইতে পারিলেন না, একটু দয়া-ও দেখাইলেন, কিন্তু পেলারাম্ তখন কেরাণীজীবনের পরিসমাপ্তি করিতে প্রস্তুত, দয়া সে গ্রাহ্য করিল না, এবং মো-ফিয়ার করিয়া বড় বড়

বক্তৃতা দিতে লাগিল। এতখানি Impertinance, Insubordination ইহাপেক্ষাও বরদাস্ত করিতে পারিলেন না—হুকুম দিলেন, খতম্!

দর্শক এই দৃশ্যে, কান্তিক বাবুর দ্বারা অভিনীত 'কম্মোকারের ম'শায়ের' ভূমিকা দেখিয়া মুগ্ধ-বিমোহিত হইবেন। নাটকটির মধ্যে এই দৃশ্যটিই সর্ব্বাপেক্ষা উপভোগ্য বলিয়াই মনে হয়। একসঙ্গে নরেশচন্দ্র, কান্তিকচন্দ্র ও রাধিকানন্দ—তিনটি উজ্জ্বল নক্ষত্র সমাবেশ—অতুলনীয়! প্রত্যেক মুহূর্ত্তে অভিনয়ে তাদের যে বিচিত্র অভিব্যক্তি দৃষ্ট হইবে, তাহা বাস্তবিক রঙ্গ রহস্যকে একান্ত বিরল।

সুলেখক শ্রীযুক্ত বিজয়রত্ন মজুমদার প্রণীত

গ্রন্থাবলী।

১। হীরার কণ্ঠি ১৷৷০, ২। আলোকে আঁধারে ১৷৷০, ৩। প্রীতির নিদর্শন ২৲, ৪। দিশেহারা ২৲, ৫। স্বপ্ন-পরিণীতা ১৷৷০, ৬। হাতের নোয়া ২৲, ৭। নূতন বধূ ১৷০, ৮। সীতার ভাগ্য ১৲, ৯। কিশোরী ১৲, ১০। গৃহদেবী (২য় সংস্করণ) ৷৷০, ১১। বৌ-রাণী ১৲, ১২। টিকটিকি ৷৷০, ১৩। কোকিল ৷৷০, ১৪। জননী ৷৷০ আনা।

শিশুপাঠ্য গ্রন্থ।

ছেলেদের সত্যাগ্রহী ৷৵০ আনা। ছেলেদের গান্ধী ১৲ টাকা। সংশোধন (৩য় সংস্করণ) ৷৵০। রাজস্থানের গল্প প্রতিখণ্ড ৷৵০ আনা। বাপ্পারাবীর, কর্ম্মদেবী, হাম্মীর প্রকাশিত হইয়াছে। জাতকের গল্প ৷৵০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—বরেন্দ্র লাইব্রেরী, ২০৪ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

চিত্রে শ্রীকৃষ্ণ

(বাল্যলীলা)

শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলা ৪১ খানি ত্রিবর্ণের চিত্রে প্রকটিত করা হইয়াছে, প্রত্যেক চিত্রের সঙ্গে সঙ্গে চিত্র পরিচয়গুলি পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ দ্বারা সম্পাদিত হইয়াছে। ছবিগুলি যেমন নয়নমুগ্ধকর করিয়া অঙ্কিত করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে, লেখাগুলিও সেইরূপ মনোমুগ্ধকর করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে।—উত্তম সিল্কের কাপড়ে বাঁধা সোনার জলে লেখা—মূল্য ৪৲ চারি টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স।

২০১ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট কলিকাতা।

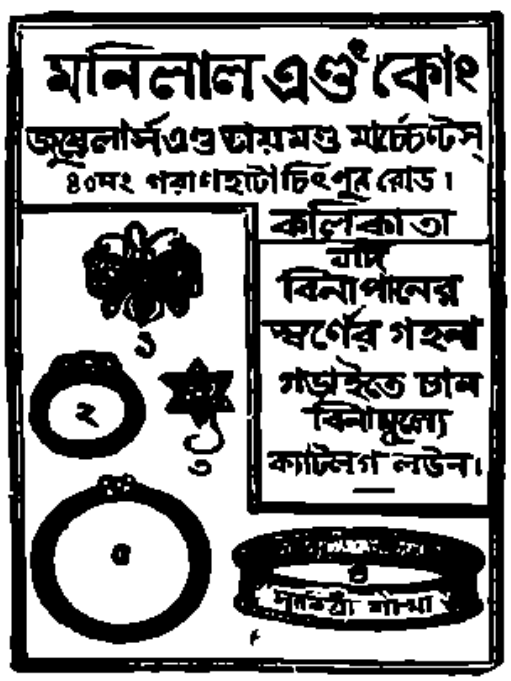

Printed by B. K. Das. at the Lakshmibilas Colour Studio & Printing works.
14, Jaggannath Datta Street, Calcutta.

সচিত্র সাপ্তাহিক পত্রিকা

বাসন্তী

নব পর্য্যায়।

প্রথম বর্ষ] ৬ই শ্রাবণ, শনিবার, ১৩২৯। [তৃতীয় সংখ্যা

পল্লী-শ্রী—শ্রাবণে

Lakshmibilas Press.

বাসন্তী—

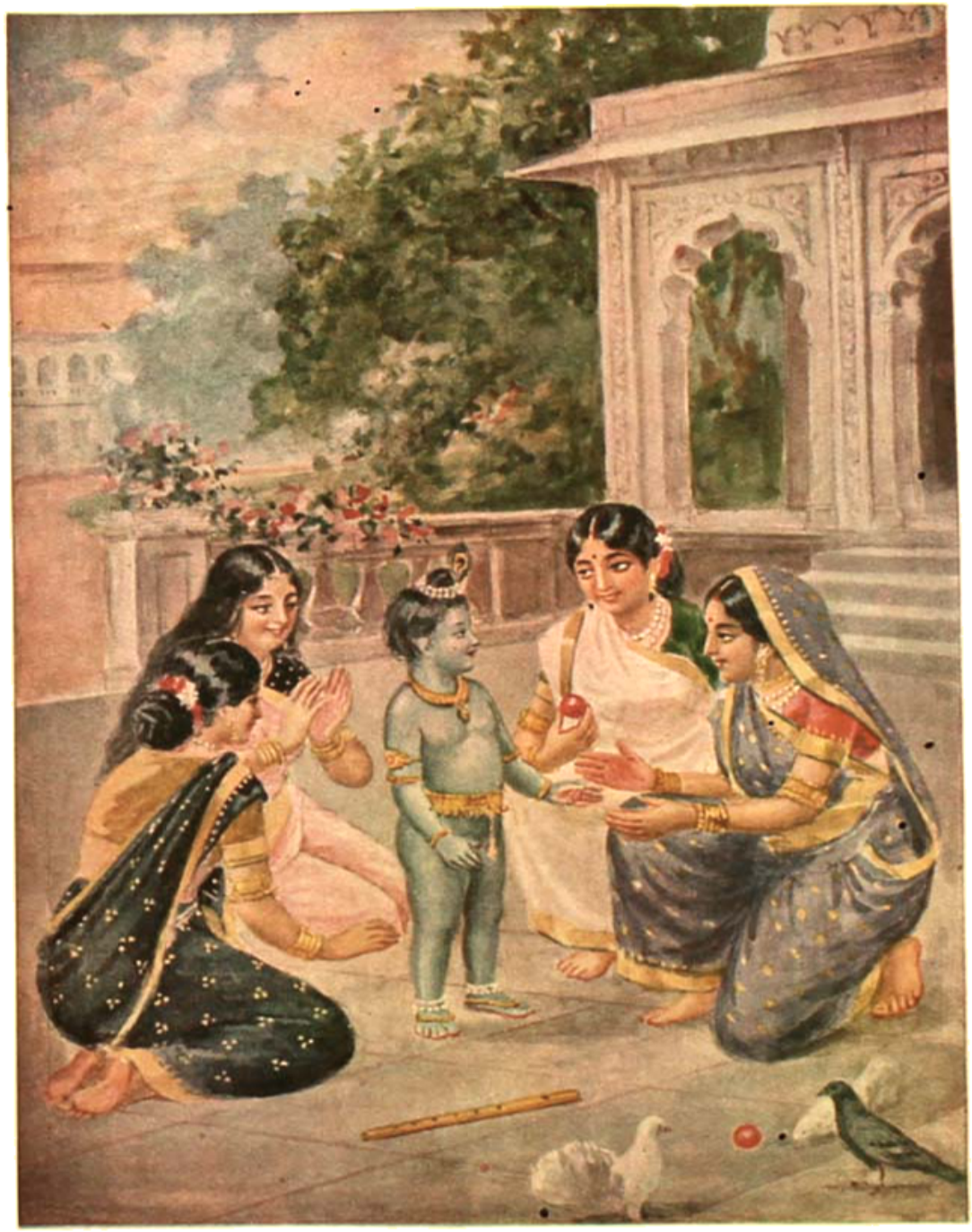

নন্দের নন্দন।

এক্সাইজ ডিপার্টমেণ্ট বা মাদক দ্রব্য বিভাগে ভারত সরকারের বৎসরে বৎসরে প্রচুর আয় হইয়া থাকে। এই আয়ের সংখ্যা ক্রমাগত বাড়িয়াই চলিয়াছে। আমরা নিম্নে গত দশ বৎসরের আয়ের একটি তালিকা দিলাম।

সন	আয়
১৯১০—১১	৭০৩০৩১৪ পাউণ্ড
১৯১১—১২	৭৮০৯৯৫৩
১৯১২—১৩	৮২৭৭৯১৯
১৯১৩—১৪	৮৮৯৪০০০
১৯১৪—১৫	৮৮৫৯৮৮১
১৯১৫—১৬	৮৮৩২২০৯
১৯১৬—১৭	৯২১৫৫৯৯
১৯১৭—১৮	১০১৬১৭০৬
১৯১৮—১৯	১১৫৫৭৫১৮
১৯১৯—২০	১২৭৫২৩৫০
১৯২০—২১	১৩৬৭৪০০০

যেখ মন্দিরের মত ভারতের সর্ব্বস্থানে এখন মাদক দ্রব্যের দোকানগুলি বিরাজ করিতেছে। মহাত্মা গান্ধীর আদেশ এ পাপ ভারত হইতে বিদূরিত করিতে হইবে। কিন্তু এ কথায় জাতি এখনও কাণ দেয় নাই। চীন গবর্ণমেণ্ট নিজের দেশের পক্ষে অহিতকর জানিয়া অত-কালের পুরাণ আফিংখোর আস্তিন আফিং এক মুহূর্ত্তে বন্ধ করিয়া দিলেন—চীন সরকারের অত বড় একটা বিরাট আবগারী আয় বন্ধ হইল সেল আয় আমাদের দেশে উত্তরোত্তর এই পাপের বৃদ্ধিই চলিয়াছে।

• • • •

প্রসিদ্ধ রুশ সাহিত্যিক ম্যাক্সিম গোর্কি শারীরিক উন্নতির জন্য ফ্রান্সে যাইতে ইচ্ছুক। কিন্তু ফরাসী গবর্ণমেণ্ট সে আদেশ যেন নাই। তাই ম্যাক্সিম গোর্কি যাহাতে ফরাসী রাজ্যে ঢুকিতে পারেন, সেই জন্য ফরাসী দেশের মনীষী মণ্ডল সরকারকে অনুরোধ করিতেছেন। কিন্তু আনাতোল ফ্রান্স, রোমান রোলা হেনরী বারবুস প্রভৃতি বিশ্ববিখ্যাত মনীষী দিগের সমবেত প্রার্থনায় ও ফরাসী সরকার ম্যাক্সিম গোর্কিকে ফ্রান্সে ঢুকিতে দিলেন না। মুসো পঁয়কারই নাকি এজন্য দায়ী। এজন্য সকল ফরাসীই তাঁহার উপর খাপ্পা হইয়া উঠিয়াছেন। প্রায় সত্তাধিক বিশ্ব বিখ্যাত ফরাসী মনীষী পুনরায় ফরাসী গবর্ণমেণ্টের নিকট গোর্কিকে ফ্রান্সে আনিবার জন্য আবেদন পেশ করিয়া-ছেন। দেখা যাক্ কি হয়।

• • • •

সহর মফঃস্বলে কর্ত্তাদের মধ্যে খাদী জীতি অত্যন্ত প্রবল হইয়া উঠিয়াছে দেখিতেছি। সাহেব মিউনিসিপ্যা-লিটি সম্প্রতি প্রচার করিয়াছিলেন যে, চৌদ্দা চাপরাশীরা খাদী পরিধান করিয়া বাহির হইবে, কিন্তু ডেপুটি কমিশনার এ প্রস্তাব নাকচ করিয়া দিয়াছেন।* পঞ্জাবে একজন ইউরোপীয় মহিলা খাদিভূষিত একজন ভদ্রলোকের উপর চিল ছুঁড়িয়াছিলেন এবং কুকুর লেলাইয়া দিয়াছিলেন। এমন নির্দ্দোষ খদ্দরের পরিচ্ছদের উপর ইহাদের এমন নেক নজর কেন?

• • • •

প্রাথমিক শিক্ষার উন্নতি বিধানের জন্য বিস্ সাহেবের রিপোর্ট অনুসারে এবার নাকি সরকার যথেষ্ট অর্থব্যয় করিবেন। প্রতি ইউনিয়ন বোর্ডগুলির তত্ত্বাবধানে এই-রূপ প্রাথমিক শিক্ষালয় খোলা হইবে, এজন্য সরকার ১৫৫০০০৲ মঞ্জুর করিবেন।

মিউনিসিপ্যাল স্কুলগুলির জন্য ৪৭০০০৲ মঞ্জুর করা হইবে। বিস্ সাহেবের বিধান অনুযায়ী কার্য্যের জন্যই এই টাকা মঞ্জুর করা হইবে। দেখা যাক্—এই টাকায় প্রাথমিক শিক্ষার কতটা উন্নতি হয়!

• • •

বাংলার নানা বিভাগের মন্ত্রীরা জাতি গঠনের অভিলাষে কমার্শ্যাল, টেকনিক্যাল প্রভৃতি নানা কার্য্যকরী শিক্ষার প্রথা প্রবর্ত্তন করিতে চাহিতেছেন। মফঃস্বলে মফঃস্বলে দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন করিতে চাহিতেছেন। অথচ সঙ্গে সঙ্গে তাঁহারা আশঙ্কা করিতেছেন টাকায় কুলাইবে কি না। জাতি গঠনকারীরা আশঙ্কা করিতেছেন তাহাদের জাতি গঠন জিব্রাল্টারিয়া মেমোরিয়ালের ন্যায় মন্থর গতিতে অগ্রসর হইবে। বর্ত্তমান মন্ত্রীদিগের কার্য্যকালে জাতিগঠন আশা তাহাদের পূর্ণ হইবে কিনা বলিতে পারেন না, তবে ভিত্তি তাহারা গড়িয়া যাইবেন এই যা তাঁহাদের আনন্দ! বর্ত্তমান জাতিগঠনকারী মন্ত্রীদের কার্য্যকালের ত এখন মাত্র এক বৎসর কয়মাস বাকী, যেদিন ত তাহাদের কার্য্যক্ষেত্রে অতিবাহিত হইয়া গেল—এখন কেবলমাত্র ভিত্তি স্থাপনের আয়োজন। আমরা ভাবিয়া অবাক্ হইয়া যাই বাংলা দেশের সব বিভাগের খরচ চলে, শুধু জাতিগঠন বিভাগের বেলা অর্থের অনাটন হইবে বলিয়া মন্ত্রীবর্গ সদা আশঙ্কিত হন। জাতিগঠন না করিয়া যে অন্যান্য বিভাগের খরচ কিরূপে চলে তাহা ত আমরা বুঝি না। ভূতপূর্ব্ব বড়লাট কৌন্সিলের সদস্য প্যাটেল মহোদয় হিসাব করিয়া নূতন শাসন সংস্কারে যে চল্লিশ কোটি রুপী বেশী ব্যয় হইতেছে দেখাইয়াছেন সে টাকাটা কি শুধু এই সব মন্ত্রীবর্গের মাহিয়ানা আর কৌন্সিল লজ্জনের (এম-এল-সি) মাহিয়ানাতেই ব্যয় হয় না কি?

দেশে পুলিশ বিভাগের সাহায্য যতই বৃদ্ধি হইতেছে দেশে চুরি ডাকাতী রাহাজানীও সেইরূপই বাড়িয়া চলিয়াছে। চোর ডাকাতের উপদ্রবে ত পল্লীর লোক রাত্রে প্রাণ করিয়া নিদ্রাও যাইতে পারে না। বাংলার রাজধানী কলিকাতা সহরের উপরেই দিনে ডাকাতী অসম্ভব রকম বৃদ্ধি পাইয়াছে। নিত্য কত রকম নূতন ধরণের ডাকাতীর খবরে বাংলার সংবাদ পত্রগুলি পূর্ণ দেখি, পথে চলিতে চলিতে পথচারীগণের টাকাগুলি কি ভাবে গুণ্ডা কর্ত্তৃক অপহৃত হয়, কি ভাবে কতজন গুণ্ডার ছোরার আঘাতে ধরাশায়ী পতিত হয়, কি ভাবে ট্যাক্সী ডাকাত একাস্ত দিবসে সহরের মাঠে জিব্রাল্টারিয়ান মৌমের নিকট হাজার হাজার টাকা লুটিয়া লয় ও সব ব্যাপার যত দেখি ততই আমাদের প্রাণ পুলিশ পুলিশ বিভাগের গুণ কীর্ত্তন করিবার ইচ্ছা হয়।

• • • •

টোকিওর সংবাদে প্রকাশ জাপানের সামরিক ব্যয় হ্রাসের জন্য বিশেষ আলোচনা হইতেছে। মন্ত্রী সভায় এই আলোচনার ফলে সকলেই সামরিক ব্যয় হ্রাসের প্রস্তাব সমর্থন করিয়াছেন। বোধ হয় শীঘ্রই এই প্রস্তাব অনুসারে কার্য্য হইবে। জাপান প্রাচ্যের বিপুল ক্ষমতাশালী স্বাধীন দেশ, পাশ্চাত্যের সকল শক্তিই ইহার সহিত মিত্রতা বন্ধনে বদ্ধ হইতে গৌরবানুভব করেন, ইহাকে সমীহ করিয়া চলেন। জাপানকেও এই সব শক্তিশালী শক্তিগণের সঙ্গে পাল্লা দিয়া চলিতে হয়। এমন জাপানও আজ তাহার সৈন্য সংখ্যা ও সামরিক ব্যয় হ্রাস করিয়া ফেলিতেছে আর আমাদের ভারত এ যে কি বিপুল ক্ষমতাশালী, জগতের সেরা শক্তি, যে ইহাকে ইহার সামরিক ব্যয় ক্রমশ বাড়াইয়াই যাইতে হইতেছে।

• • • •

আমরা কলিকাতার মত বিশ্ববিদ্যালয়কে সামান্য অর্থ সাহায্য করিতেই এত বাক্‌বিতণ্ডা করি, এত সব বাজে কথা কাটাকাটি করি কিন্তু বিলাতের বিশ্ববিদ্যালয়গুলি-এ ভাবে যে দেশের গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে কত অর্থ সাহায্য পায় তাহা আমরা একবার দেখিও না। উচ্চ শিক্ষার জন্য একমাত্র অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন কোন বিভাগ কিরূপ অর্থ সাহায্য পাইয়াছে তাহার একটা তালিকা ইংলিশম্যান পত্র হইতে দেওয়া হইল। ১৯১৯—২০ সালে এক বৎসরে মাত্র এই সাহায্য সরকার হইতে দেওয়া হইয়াছে।

১। বোডলিয়ান লাইব্রেরীর জন্য—৫১৫০০ পাউণ্ড।

২। আমেরিকান ইতিহাসের চেয়ারের জন্য—

২০০০০ পাউণ্ড।

বায়োকেমিষ্ট্রীর চেয়ারের জন্য—১০০০ পাউণ্ড।

অর্গানিক কেমিকেল লেবোরেটরি বৃদ্ধির জন্য—

৫০০০ পাউণ্ড।

৪। রোমান ল্যাটিন চেয়ারের জন্য—১০০০০ পাউণ্ড।

এই গেল অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে সরকারী সাহায্য প্রাপ্তির কথা। তারপর কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় সরকারের নিকট হইতে মোট ২৬৪৩৫১ পাউণ্ড অর্থ সাহায্য পাই-

যাচ্ছে। লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয় দেড়লাখ পাউণ্ডের উপর সরকারী সাহায্য পাইয়াছে। অক্সফোর্ড ও কেম্ব্রিজ বিশ্ব-বিদ্যালয় পার্লামেণ্টের নিকট হইতে মোট ১১০০০০ পাউণ্ড সাহায্য পাইয়াছে।

• • • •

আমাদের দেশের রাজা মহারাজারা ও অর্থশালী লোকেরা ক্রমে চাঁদা দিতে বেজায় নারাজ। এ সব বিষয়ে তাঁহাদিগকে বড় বেশী অনুরোধ উপরোধ করিতে হয় না। ধমক দিতে পারিলেই যেন নিজেদের ভাগ্যবান মনে করেন। দেশের সরকারও দেশের আইন ও শৃঙ্খলা রাখিবার জন্যই এত ব্যস্ত ও খরচে লিপ্ত যে তাঁহারা এ সব শিক্ষার দিকে নজর দিবার যেন অবকাশ পান না। এরূপ অবস্থায় দেশের শিক্ষার ভাগ্যে আর কি আশা করা যায়?

• • • •

বিশ্ব বিদ্যালয়ও বাংলা দেশে শুধু জীবন হীন, সম্মান হীন কতকগুলি কেরাণীই গঠন করিতেছে। বিশ্ববিদ্যালয় তাহার এই গঠনের রূপের পরিবর্তন না আনিতে পারিলে জন-সাধারণকে সুখী করিতে পারিবে না। জন-মত ইহার অনুকূলে আনিতে চাহিলে জনসাধারণের উপযোগী শিক্ষা এই বিশ্ববিদ্যালয়ে অবিলম্বে প্রচলন করিতে হইবে।

• • • •

সহযোগী অমৃতবাজার সংবাদ দিতেছেন ভবনগর গ্রামে স্কুলের পারিতোষিক বিতরণের দিন একটি বালক আনন্দের আতিশয্যে 'মহাত্মা গান্ধীজীকী জয়' বলিয়া চীৎকার করিয়াছিল। ইহাতে তথাকার পলিটিকাল এজেণ্ট মহাশয় এতদূর খাপ্পা হইয়া উঠেন যে তিনি সেই স্থানেই বালক-টিকে তাঁহার ছড়ি দিয়া প্রহার করিতে থাকেন। কি ব্যাপার! ত্রিমে দিনে কি আরম্ভ হইল!

• • • •

বাংলার শাসন পরিষদের সভ্য সার আবদার রহিমের পদত্যাগ সম্বন্ধে একটা জোর গুজব বাজারে রাষ্ট্র। এ সম্বন্ধে সহযোগী বসুমতী বলিয়াছেন:—'পত্রিকা সংবাদ দিতেছেন, সার আবদার রহিম নাকি জেল বিভাগের ভার ত্যাগ করিয়াছেন।' যদি তা হয়, তবে আমরা তাহাতে বিস্মিত হইব না। কারণ আমরা জানি, তিনি তাঁহার কোন বন্ধুকে বলিয়াছিলেন, তিনি যে প্রস্তাব করেন তাহাই ওঁরেষ্টে টেঁকে না—শাসন পরিষদে সার হেমন্রি হুইলার, বিটার কার ও মহারাজাধিরাজ বিজয়চন্দ তাহার প্রতিবাদ করেন। তিনি জেলে রাজনৈতিক বন্দীদিগকে বেত্রাঘাত সম্বন্ধে যে ব্যবস্থা করিতে চাহিয়াছিলেন, তাহাও হয় নাই। তাঁহার সেক্রেটারী নাকি সরাসরি লাটের কাছে যাইয়া 'পদ্মিয়া পিটিয়া' আনেন। এ সব কথা যদি সত্য হয় তবে তিনি যে এখনও চাকরী করিতেছেন তাহার জন্য কি তাঁহাকে প্রশংসা করা যায়। শেষে সেদিন ব্যবস্থাপক সভায় কুমার দেবেন্দ্রলাল খাঁর প্রশ্নের জবাবে তিনি যেরূপ Sorry figure দেখাইয়াছেন, তাহাতে তিনি যদি অতঃপর কার্য্যত্যাগ করেন তবে আমরা তাঁহার প্রশংসা করিবার একটা অবসর পাইব!

• • • •

বাংলা কৌন্সিলে পুলিশের অতিরিক্ত ব্যয় ভার মঞ্জুর করা লইয়া যে সমস্ত এম এল সি (কৌন্সিল সভ্য, সংস্কার আইন অনুসারে) পুলিশের পক্ষে ভোট দিয়াছিলেন তাঁহারা দেশবাসীর ও সংবাদপত্র সমূহের বিরাগ ভাজন ও তীব্র মন্তব্যের পাত্র হইয়াছেন। এ বিষয়ে কোন কোন কৌন্সিল সভ্য নিজ পক্ষ সমর্থনার্থে জানাইতেছেন যে তাঁহারা কলিকাতার রাজপথের হাদারা ও মোটর গাড়ী প্রভৃতির উৎপাতের হাত হইতে সাধারণকে রক্ষা করিবার জন্যই এই অতিরিক্ত অপব্যয়ের পুলিশের ব্যয়ভার মঞ্জুর বাধ্য হইয়াছেন। বেশ কথা তাহা হইলে দেখিতেছি এখন হইতে কলিকাতার পাণ্ডব বর্জ্জিত অংশেও অপূর্ব্ব [illegible] সজ্জিত অল এল গুলোরায় শোভিত মূর্ত্তিতে ষোড়সোয়ার দেখিতে পাইব। ১৯১৯ সনে এইরূপ রাজপথের দুর্ঘটনা (যথা গাড়ী চাপা, মোটর চাপা ইত্যাদি) ১৩৮২টি এবং ১৯২১ সনে ১২৫২টি সংঘটিত হইয়াছিল। এই সব দুর্ঘটনা ও প্রাণহানি নিবারণের জন্যই কি পুলিশের অতিরিক্ত ব্যয় মঞ্জুর করা হইয়াছিল।

• • • •

মোটরের একটা গতি বেগ কর্তৃপক্ষ নির্দ্ধারিত করিয়া দিয়াছেন। তবু কলিকাতার রাজপথে এখনও মোটর ও ট্যাক্সি গুলি যে ভাবে বে-পরোয়া হইয়া চলে তাহার দিকে কি কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয় না? কে এ বে-তাল উদ্দাম গতিবেগকে সংযত করিবে? কলিকাতা রাজধানীতে এই সব বিভাগের কর্তৃপক্ষীয়দের বোধ হয় পায়ে হাঁটিয়া পথ চলিবার দুর্ভাগ্য কোন দিন হয় নাই। কারণ

তাহারাও সম্ভবতঃ মোটরচারী। কলিকাতার রাজপথে এই মোটর ও ট্যাক্সি গুলি কিরূপ উপদ্রব করে তাহা সংবাদপত্রের মারফতে কর্তৃপক্ষীয়দের বহুবার জানাইবার চেষ্টা করা হইয়াছে, কিন্তু এ উপদ্রব নিবারণের কোন চেষ্টাই আমরা এপর্য্যন্ত দেখিতে পাইতেছি না। এম কত ধনী বিলাসী, মোটরওয়ালা বাবুর জন্যই কলিকাতা সহরের লাখ লাখ অধিবাসীকে কতদিন এই উপদ্রবের ভাড়া সহিতে হইবে? কতদিন যে এই উপদ্রবে হাজার হাজার অধিবাসী প্রাণ হারাইবে, আজীবন খোঁড়া পঙ্গু হইয়া রহিবে তাহা কে বলিবে?

* * * *

রামমোহন হলে সত্যেন্দ্র স্মৃতিসভা হইয়া গিয়াছে, সাহিত্যপরিষৎ মন্দিরেও হইয়াছে। জগৎ কবি রবীন্দ্রনাথ সভাপতির সম্মান আসন গ্রহণ করিয়া মৃত দেশকবির প্রতি শ্রদ্ধা ও স্নেহপ্রদর্শন করিয়াছেন। সব ভাল কিন্তু একটা জিনিস এই স্মৃতি সভায় আমাদের চোখে বড় লাগিয়াছে। আজ সমগ্র দেশ সত্যেন্দ্রের শোকে আকুল, এ যুগে এমন সম্মান এত অল্প বয়স্ক কোন কবির ভাগ্যে ঘটে নাই। আমরা মনে করি সত্যেন্দ্রনাথ তাঁহার দেশ প্রিয়তার জন্যই দেশের কথা কাব্যে গাহিবার জন্যই দেশবাসীর এত প্রিয় হইয়াছেন। সত্যেন্দ্রনাথ দেশ জাগরণের সঙ্গীত গাহিয়াছেন,—দেশীয় পোষাক পরিয়া অঙ্গ ভূষিত করিয়া চলিয়াছেন, ইহাই তাঁহার গৌরব ছিল, ইহাতেই তিনি প্রীতি পাইতেন। কিন্তু যাঁহারা দেশ কবিকে শ্রদ্ধা দান করিবার জন্য সভায় উপনীত হইয়াছিলেন তাঁহাদের পরিধানে বিদেশী বসন ভিন্ন স্বদেশী বসন বড় ছিল না। মহিলারা যাঁহারা দেশ কবির প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিতে আসিয়াছিলেন তাঁহাদের পোষাক-ও সেই মিহি ধুতি। ইহা কোভের কথা, দুঃখের কথা! এ অশ্রদ্ধার স্বর্গে থাকিয়াও কবি মরমে মরিবেন, প্রাণে বড় ব্যথা পাইবেন।

কবি সত্যেন্দ্রনাথ

বাংলার কাব্যাকাশের উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক দেশাত্মবোধের সাধক কবি সত্যেন্দ্রনাথ আর ইহলোকে নাই। জীবন মধ্যাহ্নে জীবনের পরিপূর্ণ বিকাশের সময় দেশের নব জাগরণের দিনে দেশবাসীকে প্রাণ-মাতান সঙ্গীত শুনাইতে শুনাইতে দেশ কবি সত্যেন্দ্রনাথ অকালে তাঁহার সাধ লোকের ধামে প্রস্থান করিলেন।

এক এক যুগে বাংলার সাহিত্য মন্দিরে এক এক জন কবি তাদের পসরা লইয়া মনোমন্দিরের অধিষ্ঠাত্রী দেবী বীণাপাণির অঞ্জলি দিবার জন্য বাংলায় আসিয়া গিয়াছেন। তাদের দেশে তাদের পসরায় প্রাণ সঞ্চার করিয়া যে সকল যশ-জয়ী সাধক কবি গানে দেশবাসীর চিত্ত হরণ করিয়া অমর হইয়া গিয়াছেন কবি সত্যেন্দ্রনাথ তাঁহাদেরই অন্যতম অগ্রণী ছিলেন।

দেশবাসীর চিত্তকে উদ্বোধিত করাইবার জন্য, দেশবাসীর দেহ ও মনে প্রাণের স্পন্দন অনুভব করাইবার জন্য কবি সত্যেন্দ্রনাথ দেশের এ প্রাণহীনতার যুগে দুর্ভাগা দেশে আগমন করিয়াছিলেন। দেশ কবির গানের তান কি অর্দ্ধপথেই সমাপ্ত হইয়া গেল—প্রাণ-মাতান গানে দেশবাসীর প্রাণের সাড়া না পাইয়া, কি কবি অভিমানে বীণা ত্যাগ করিয়া দেশবাসীর চক্ষুর অন্তরালে লুকাইলেন?

বাঙ্গালী আজ যে দেশের গানের সন্ধান করিতে শিখিতেছে, বহুকে শ্রদ্ধা অর্ঘ দিবার জন্য তাহার প্রাণ যে আজ ব্যাকুল আলোড়িত হইয়া উঠিতেছে—আজ যে সে গানে হারান প্রাণের সন্ধান পাইতে চাহিতেছে। কবি সত্যেন্দ্র তুমি জাতিকে, দেশকে, বহুর সম্মান, বীরের প্রতি শ্রদ্ধা, আত্ম-শক্তির প্রতিষ্ঠা শিক্ষা দিতেছিলে। তোমার কাব্য, তোমার গান দেশের নিভৃত প্রান্তেও পৌঁছিয়াছিল। তুমি ছন্দ সম্রাট্—তোমার গান ও কাব্যের অনুপম ছন্দে দেশবাসী যে তোমাকে প্রাণের কবি—মরমের কবি বলিয়া বরণ করিয়া লইয়াছিল।

কবি সত্যেন্দ্রনাথ, সত্যাশ্রয়ী ছিলে তুমি। সত্যকেই শ্রেষ্ঠ সম্পদ জানিয়া জীবনের প্রধান সুখ হইতে বঞ্চিত হইয়া জীবন অতিবাহিত করিয়াছ তুমি। সঙ্গী ছিল তোমার অতীত ও বর্ত্তমানের জ্ঞানের ভাণ্ডার পুস্তক রাশি। আর সঙ্গী ছিল তোমার সাহিত্যিক বন্ধু বান্ধবেরা।

নিরানন্দিত ব্যথিতের বন্ধু ছিলে তুমি সত্যেন্দ্রনাথ

দেশবাসীর হিয়ার কথন সাহিত্যে তুমিই দেশবাসীর প্রাণের দুয়ারে উপস্থিত করিয়াছ। যাহার স্তুতি মহতের স্তুতি, কাব্যে বাংলার তুমিই উজ্জ্বল করিয়া ধরিয়াছ। জগৎ গৌরব মহাত্মার স্বরূপ, কাব্যের ছন্দে তুমিই বাংলায় ফুটাইয়া তুলিবার চেষ্টা করিয়াছ। বিদেশের ও স্বদেশের মহৎ যাহা গৌরবের বস্তু তাহাই তুমি কাব্যে জীবন্ত করিয়া দেশবাসীর চোখের সম্মুখে ধরিয়া তোমার অনুপম সঙ্গীতের তানে দেশবাসীর প্রাণের দ্বারে আঘাত করিবার চেষ্টা করিয়াছ। দেশের কাব্যে ও ছন্দে বহু নূতনত্ব আনিয়াছ তুমি।

কবিবর সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত বঙ্গ-সাহিত্যের অন্যতম স্রষ্টা অক্ষয়কুমার দত্তের পৌত্র ছিলেন। মুক্তিকাম কবি আষাঢ়ের ঘনী বরিষণের মধ্যে দেহের বন্ধন মুক্ত হইয়া অনন্ত ধামের যাত্রী চলিয়া গেলেন। আজ মাতৃ ভক্ত একমাত্র পুত্রের মাতা, পত্নী, মাতৃভূমি তাঁহার শোকে শোকাচ্ছন্ন। আকাশ আজ মেঘমেদুর, তাহা আজ তাহার প্রকাশের ক্ষমতা হারাইয়া 'ফেলিয়াছে।' সকল দেশের চাইতে বাঙ্গলা তরুলতার আশ্রয় ছাড়িয়া কবি কোন বাঞ্ছিত অমরার আজ চলিয়া গেলে।

দেশীয় পোষাক বন্ধুর তুষিত হে নয়নের পাপিয়া বাঙ্গালী কবি, তোমার বাঙ্গালী ভাই বোনের শ্রদ্ধার অশ্রুসিক্ত পুষ্পাঞ্জলি আজ স্বর্গ হইতে তুমি গ্রহণ কর। আজ থাকিয়া থাকিয়া তোমার সরল হাসি মাখা মুখ খানি মনে পড়িতেছে আর তোমার তোমারই ছন্দে মনে হইতেছে—

'কোন দেবতার বুকের মাঝে,
ছিলে গো
তুমি কোন স্বপনে—
কোন রজনীগন্ধা তুমি ফেল
গো নিশ্বাসে!'

বাংলা ভাষা ও সাহিত্য যতদিন থাকিবে ততদিন তোমার রজনীগন্ধার নিঃশ্বাসে বাংলার অপূর্ণ সুরভি বহিয়া যাইবে।

সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

বর্ষার নবীন মেঘ এল যবনীর পূর্ব্বদ্বারে,
বাজাইল বজ্রভেরী। হে কবি, দিবে না সাড়া তা'রে
তোমার নবীন ছন্দে? আষিকন্যা কাজরী গাথায়
ঘুলমেঘ ঘোলা নাচে ডালে ডালে পাতায় পাতায়;
হর্ষে হর্ষে এ মেলায় কিত তাল তোমায় মেশাই—
দ্বিজেন্দ্র-লালের গানে, সে আজি ললাটে কর বুলি'
বিদায়ের বেণু কেন নিঃশব্দে লুটায় ধূলিপায়?
আষিনে উৎসব-সাজে পরব তুলব তব তরে
কেয়ালির সাজি নিয়ে কেবা দিবে তোমার অঙ্গনে;
প্রতি বর্ষে-ঝিক সেঁ যে শুভ্রহাতে তোমার চন্দনে
ডাকে তব যজ্ঞের টীকা: কবি, আজ হতে সে কি
ধারে ধারে আসি' তব শূন্যকক্ষে, তোমারে না দেখি'
উৎসবে ভরাবে ধারে শিশিরসিঞ্চিত পুষ্পাঞ্জলি
শীরব-সঙ্গীত তব স্মরণে?

আমি তুমি প্রাণ খুলি'
এ পৃথ্বীর ধরণীর ভালবেসেছিনু। তাই তারে
সাজায়েছ নিবে নিবে নিত্য নব সঙ্গীতের হারে।
অজস্র অসত্য তব, তত কিছু অন্যায়ের পাপ
কুঠিল মুখরিত কুহকের পরে তব অভিশাপ।
ধরিত্রীর ক্ষিপ্রবেগে অন্তরের অগ্নিযাগ সম,
তুমি সত্যবীর, তুমি দুরন্ত-চঞ্চল, নির্ম্মল, নির্ম্মম,
কঠোর কোমল। তুমি বঙ্গ-ভারতীর বীণা-পরে
একটি অপূর্ব্ব তার প্রেমছিলে গানায়ার তরে।
সে তব হয়েছে বাঁধা; আজ হতে বাণীর কঙ্কণে
তোমার আসন, সুর কখনো লভিবে অন্তরে,
কখনো ধ্বনিবে বাহিরে। বঙ্গের অন্তরতলে
বসন্ত-বসন্তের মুক্তা রবে এবে উজ্জ্বল উজলে;
সেবা তুমি একে গেলে বর্ষে বর্ষে বিচিত্র লেখায়

আলিম্পন ; কোকিলের কণ্ঠস্বরে, লিখীর কেকায়
দিয়ে গেলে তোমার সঙ্গীত ; কাননের গন্ধরে মুকুলে
রেখে গেলে আনন্দের হিল্লোল তোমার। বসন্তের
যে তরুণ যাত্রিদল ক্ষুব্ধ'র-রাত্রি অবসানে
নিঃসঙ্গে বাহির হবে নব জীবনের অভিযানে
নব নব সঙ্কটের পথে পথে, তাহাদের লাগি'
অক্ষয়ের নিধিনিধী তুমি, কবি, আটাইলে জাগি'
অমলিন বিরচিয়া', রেখে গেলে গানের পাথেয়
দুর্দিনেরে পূর্ণ করি' ; অবসন্ন দুখের সংঘেও
হৃদে হৃদে মাধুরীরে বেঁধে গেলে বন্ধুত্বের ডোর,
গ্রন্থি দিলে চিরন্তন বন্ধনে, হে তরুণ বন্ধু মোর,
সত্যেন্দ্র পুলারি।

আলো যারা দেখে নাই তব চোখে,
দেখে নাই যাদের তোমারে, তুমি তাদের উদ্দেশে
দেখার অতীত বলে আপনারে অন্তরে গোপনে
ঘুমালে। কিন্তু যাঁরা পেয়েছিল প্রত্যক্ষ তোমার
অনুক্ষণ, তারা যা হারাল তার সন্ধান কোথায়,
কোথায় সান্ত্বনা ? বন্ধু মিলনের দিনে বাসরের
উৎসব-চক্রের পরে পূর্ণ তুমি করেছ আমায়
প্রাণে তব, গানে তব, প্রেমে তব, সৌহৃদে, শ্রদ্ধায়,
আনন্দের দানে ও গ্রহণে। সখা, আজ হ'তে, হায়,
আমি হায়, রূপে রসে চকিত উষীরে ভোর দিয়া
তুমি আর নাই বলে', অকস্মাৎ ঘুরিয়া ঘুরিয়া
করুণ স্মৃতির দ্বারা ম্লান করি' দিবে সন্ধ্যাতলে
আলোক আলোক হস্ত প্রহরের গভীর অতলে।
আজিকে একেলা বসি' শোকের প্রদোষ-অন্ধকারে,
মৃত্যুতমস্বিনীযামা-মুখরিত তারকের দ্বারে
তোমারে শুধাই,—আমি যাব কি গো ঘুমিতে তোমার,
ঘুমায় কি ধরা দিল আনন্দিত নন্দন-লোকের
আলোকে সম্মুখে তব, উদয়-শৈলের তলে আসি
নবসূর্যকরধারে কোথায় শুকিলে তব মসি
নব ছন্দে, নূতন আনন্দগানে ? সে গানের সুর
লাগিছে আমার কানে অশ্রুনাথে মিলিত মধুর
প্রভাত-আলোকে আজি ; আজ তারে শিখাতির বাণী,
আজে তারে নবতর আয়ুষের মরম-বারতা ;
আজে তারে ভৈরবীতে বিদায়ের বিদ্ধ দুর্জয়,
আজে ভৈরবের সুরে বিজয়ের আশার আর্তিমা।
যে খেয়ার কর্ণধার তোমারে নিয়েছে নিমন্ত্রণে
শ্যামাঙ্গের সজল ছায়ায়, তার সাথে ধীরে ধীরে
হয়েছ আমার চেনা ; তরুবার তারি লাগি-গানে
বিদায়ের নিদ্রা ভেঙে যাবার উদ্বেগে মোর প্রাণে
আনিত পথের ডাক, সূর্যাস্তপারের বর্ণরেখা
ইঙ্গিত করেছে মোরে। পুর আজ তার সাথে দেখা;
ঘরে'-পড়া অশ্রুর কেশর-ঝরাজি লিপিখানি
তব শেষ বিদায়ের। ফিরে যাব ইহার উত্তর
বিশ্ব হাতে তবে আমি, তাই খেয়াপারে করি' ভর,
না জানি সে কোন্ দেশ নিরালা-কবার তরুমূলে,
গহনের ছোলা-ভরা পাখী-ডাকা বসন্ত-প্রভাতে,
নব মল্লিকার কোন্ আমন্ত্রণ-দিনে ; প্রাণের
ঝিলিমিলি নন্দন সন্ধ্যায় ; মুখরিত প্রাণবের
অনাদি-নিশীথ রাত্রে ; প্রেমহীন বিদায় বেলায়
গুধূলি-গুণ্ঠনতলে ?

বরঞ্চ তাহে প্রাণের বেলায়
সংসারের যাত্রাপথে এসেছি তোমার বহু আগে,
দুঃখে সুখে চলেছি আপন মনে ; তুমি অনুরাগে
এসেছিলে আমার পশ্চাতে, বীণিখানি লয়ে হাতে,
মুক্ত বনে বীণ্ড ভেঙে, তারতীর বরমালা মাথে।
আজ তুমি গেলে আগে ; পরিত্রাণ রাত্রি আর দিব
তোমা হতে কেন বসি,' সর্বস্ব আবরণ করি' লীন
চিরন্তন হ'লে তুমি, মর্ত্য কবি, মুহূর্তের মাঝে।
গেলে সেই বিশ্বচিত্তলোকে, যেথা সুপর্ণীর মাঝে
অমরের বীণা, যার শব্দহীন সঙ্গীতধারায়
ছুটেছে ছন্দের বন্যা গ্রহে সূর্যে তারায় তারায়।
সেথা তুমি অগ্রজ আমার ; যদি কভু দেখা হয়,
পাব তবে সেথা তব কোন্ অপরূপ পরিচয়
কোন্ রূপে, কোন্ ছন্দে ? যেমনি অপূর্ব হোক তাহা,
তবু আশা করি যেন মরমের একটি কোণে রাখে
ধরণীর ধূলির পরশ, লাগে তবে মুখে মুখে
বিজড়িত,—আশা করি, মর্ত্যলোকে দিল তব মুখে
যে বিশ্বয় স্নিগ্ধ হাস, যে মধুর সঙ্কেত সরলতা,
সহজ সত্যের প্রভা, বিমল সংযত শান্ত কথা,
তাই দিয়ে আমরণ পাই যেন তব অভ্যর্থনা
অমর্ত্যলোকের দ্বারে,—ব্যর্থ বাঞ্ছি হোক এ ভাবনা।

(রামমোহন লাইব্রেরীতে পঠিত) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের মৃত্যু হইয়াছে। সত্যেন্দ্রনাথ চল্লিশ পার হইতে না হইতেই তরুণ বয়সে ইহলোক ত্যাগ করিয়া অমিশ্রিত নন্দনের কবি-রাজ্যে চলিয়া গিয়াছেন। প্রিয় শিষ্য, বন্ধু, অনুরাগী সত্যেন্দ্রনাথকে শ্রদ্ধার অঞ্জলি দিতে উঠিয়া কবি রবীন্দ্রনাথের কণ্ঠ অশ্রুতে রুদ্ধ হইয়া আসিতেছিল, সত্যেন্দ্রের কথায় রবীন্দ্রনাথ বলেন 'সত্যেন্দ্র কবির চেয়েও মানুষ হিসাবেই আমার হৃদয় অধিকার করিয়াছিল। কোন কবিতা লিখিয়া সত্যেন্দ্রকে না শুনাইতে পারিলে আমার কেমন অভাব বোধ হইত, সত্যেন্দ্র আমার কবিতা ভাল বলিলে ভাল লাগিত। আজ সত্যেন্দ্র আমার বহু পরে আসিয়াও অগ্রে অমিশ্রিত নন্দনের রাজ্যে চলিয়া গেলেন—সত্য সুন্দরের সাক্ষাৎ পাইলেন, সৃষ্টির আড়াল তাঁহার ঘুচিয়া গেল, আর আমি এখানে পড়িয়া রহিলাম। আশা আছে নন্দনরাজ্যেও সত্যেন্দ্র আমাকে তাহার মধুর সরল হাসি দিয়াই অভ্যর্থনা করিবে। সত্যেন্দ্রের হৃদয়ে অসাধারণ অধিকার ছিল। তেমন অধিকার আমি কোন

কবির দেখি নাই। আমার চেয়ে ছন্দের লীলা দেখাইতে তিনি অনেক বেশী দক্ষ ছিলেন। এ কথাটা বলিতে অনেকে সঙ্কোচ বোধ করিয়াছেন কিন্তু আমি অকুণ্ঠিত চিত্তে বলিতে পারি, সত্যেন্দ্র এ বিষয়ে আমার চেয়ে ঢের দক্ষ ছিল।

সত্যেন্দ্র অন্যায় অত্যাচার অবিচারের বিপক্ষে তাহার সবল সত্য সাহস ও অপূর্ব্ব কবি কথনা লইয়া সোজা হইয়া সহজেই দাঁড়াইয়াছে। কবি সত্যেন্দ্র ভবিষ্যৎ বংশীয় দিগের জন্য বিরাট দান রাখিয়া গেলেন। কিন্তু যাহারা বন্ধু হিসাবে তাঁহাকে হারাইলেন তাহারা যে কত বড় সম্পদ হারাইলেন তাহা আর বলা যায় না।

পয়সা ভাণ্ডার।—মেদিনীপুর টাউন স্কুলের ছাত্রদের প্রতিষ্ঠিত পয়সা ভাণ্ডার হইতে গত বৎসর মেদিনীপুরের ১০৯ জন, বরিশালের ১৫ জন, শিবসাগর ১০৫ জন ও চট্টগ্রামের ৩ জন দরিদ্র ও বিপন্ন ব্যক্তিকে বস্ত্র সাহায্য করা হইয়াছে। —সম্মিলনী

কলিকাতার কথা—

হিন্দুস্থানে খবর পাওয়া গেছে কলিকাতার লোকসংখ্যা হচ্ছে ১৩।০ লক্ষ—তারমধ্যে প্রায় ৮।০ লোক বাঙালী, আর বাকী ৫৮০ অ-বাঙালী।

বেহার ও উড়িষ্যা থেকে এসেছে ২।০ লক্ষের ওপর, যুক্তপ্রদেশ থেকে ১।০ লক্ষের কিছু ওপর, রাজপুতনা থেকে ৩০ হাজার, মাড়োয়ারী ৩০ হাজার, পাঞ্জাব হতে ১০ হাজার। কলিকাতায় কাবুলীর সংখ্যা হচ্ছে ৬১১।

বিদেশের লোক কলিকাতায় এসেছে ৮ হাজার, ফরাসী আছে ১৮৮, জর্মন ২৫, ৪২ গ্রীক, ৬৯ ইতালীয়, ৫১ রুশীয় ও ৫২ জন মার্কিন।

—নবশক্তি

বাংলার অভাব।

(শ্রীজ্ঞানেন্দ্র নাথ চক্রবর্ত্তী)

দেশবাসী আজ তৃষ্ণায় জল, ক্ষুধায় অন্ন ও লজ্জা ঢাকিবার জন্য বসন চাহিতেছে। এই সাধারণ অথচ জীবন ধারণের পক্ষে অতিশয় প্রয়োজনীয় বস্তুগুলি যদি দেশের লোকে সহজে পায় তবে বোধ হয় দেশের অভাবজনিত হাহাকার রোদন অনেক কমিয়া যায়। মানুষ যখন জীবন ধারণের উপযোগী অতি সাধারণ জিনিসগুলিও সহজে লাভ করিতে পারে না তখন সে বড় বড় জিনিসের মূল্য ও তত্ত্বকথা সহজেই বিস্মৃত হইয়া যায়। অন্নাভাবে পেট যখন জ্বলিতে থাকে, ক্ষুধার জ্বালায় চারিদিক যখন অন্ধকার দেখা যায়, তখন মানুষ জ্ঞান হারা হইয়া যায়—ধর্ম্মাধর্ম্ম জ্ঞান তাহার থাকে না।

প্রাণ বাঁচাইবার জন্য পরম সাধু সজ্জনও চুরি ডাকাতী করে; অতি সহজ সরল লোকও ক্ষুধাচোর বলিয়া পরিগণিত হয়। দেশের অধিকাংশ লোকই আজ তৃষ্ণায় পানীয় জল পাইতেছে না, ক্ষুধায় অন্ন পাইতেছে না, পরিধানের বস্ত্র সংগ্রহ করিতে পারিতেছে না। এ কথা সত্য যে প্রত্যেক দেশেই ধনী ও দরিদ্র দুই শ্রেণী চিরদিনই আছে, এ কথাও সত্য, যে ধনবান সে দরিদ্রের অপেক্ষা সুখে জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারে। ধনী ও দরিদ্রের এ তারতম্য চিরকাল জগতে আছে ও থাকিবে। কিন্তু কোন দেশে যখন ধনবানের সংখ্যা দরিদ্রের তুলনায় অতি অল্প হইয়া আসিতে থাকে, দারিদ্র্য যখন তাহার ভীষণ করালদাঁত মূর্ত্তি লইয়া সমগ্র দেশের জনসাধারণের উপর আধিপত্য বিস্তার করিতে আসে,—দেশবাসী যখন তাহার আক্রমণে বাধা দিতে না পারিয়া ক্রমশঃ মরণের মুখে ঝাঁপাইয়া পড়িতে থাকে—তখন সে দেশের অধিবাসীদিগের ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম জ্ঞান আর থাকে না। দেশবাসীর সমস্ত উচ্চ প্রবৃত্তিগুলি ক্রমশঃ লুপ্ত হইতে থাকে, তাহার স্থানে প্রকাশ পায় শুধু নীচতা আর লজ্জাহীনতা।

কথায় বলে যত রকম সঞ্জীবনী সুধার আবিষ্কার হইয়াছে তাহার মধ্যে সোণা সুধাই জাতির ব্যাধি নিবারণের প্রকৃষ্ট ঔষধ। আমাদের দেশে যত ম্যালেরিয়া, মহামারী, ইনফ্লুয়েঞ্জা, হুকওয়ার্ম প্রভৃতি আজ দেশের দরিদ্র অধিবাসীবৃন্দের দেহমধ্যে রাজত্ব বিস্তার করিতেছে ইহার প্রতিকার কোন ঔষধে সহজে হইবে না। জাতিকে দেশবাসীকে ইহার হাত হইতে নিষ্কৃতি দিতে হইলে, দেশে প্রচুর খাদ্যের সংস্থান করিতে হইবে,—দেশবাসীর অন্ন ও বস্ত্রের অভাব মিটাইতে হইবে।

দেশবাসীর অন্ন ও বস্ত্রের অভাব মিটিলে তাহাদের দেহ ও মনের পাষাণ ভারের চাপ বহু অংশে কমিয়া

যাইবে। ঘরজামাই হইতে অব্যাহতি পাইলেই তাহারা তখন প্রাণের স্ফূর্তি লইয়া সোজা হইয়া দাঁড়াইতে পারিবে। তখন তাহাদের মধ্যে এ সমস্ত ব্যাধি নিজের প্রকোপ আপনা হইতেই করিয়া যাইবে।

ক্ষুধিত যে সে সকল অন্যায়ই করিতে পারে। পেটের ক্ষুধায় অমন যে পশুরাজ বাঘ তাহাকেও বনের ঘাস খাইতে হয় আর মানুষ কোন ছার। তাই দেশে আজ মানুষ না খাইতে পাইয়া চুরি ডাকাতী করিতেছে, নিজেদের দুর্ভাগ্য ও দুরবস্থার জ্বালায় ঘাতিয়া ও জ্ঞানহারা হইয়া ধনবানের ধনের উপর লোভ করিতে যাইতেছে। পরদ্রব্য অপহরণ পাপ, ইহা সকলেই জানে। ধরা পড়িলে এ পাপের জন্য দণ্ডভোগ করিতে হয় তাহা জানিয়াও লোকে পাপ করিতে যায়। অভাবের জ্বালায় পেটের ক্ষুধায় তাড়নায়, পরিবার পরিজনের কষ্টে মানুষের তখন আর দণ্ডের ভয় থাকে না।

অভাবের তাড়নে সে যে দণ্ডভোগ করিতেছে সে দণ্ডের তুলনায় তাহার কাছে অন্য কোন দণ্ড,—দণ্ড বলিয়াই মনে হয় না। এই অভাবের তাড়নে যাহারা মানুষের গড়া আইন ভঙ্গ করিয়া চুরি ডাকাতির অভিযোগে শাস্তিভোগ করে তাহাদের শাস্তিতে অন্য অভাবগ্রস্থ জন বুঝিয়াও শিক্ষা লাভ করিতে পারে না। বিশ্বে শাস্তির বিধান হইয়াছে সংশোধনের জন্য। কিন্তু এ ভাবের শাস্তিতে অভাবগ্রস্থ জনের সংশোধন করিতে হইলে তাহাদিগের ক্ষুধার জ্বালা মিটাইতে হইবে, দেশে অন্ন সংস্থানের ব্যবস্থা করিতে হইবে।

আজ দেশের সর্বচেয়ে বড় অভাব—অন্ন ও বস্ত্রের অভাব। কেমন করিয়া এ অভাব রাক্ষসী দেশের সর্বশ্রেণীর জনসমাজের উপর আধিপত্য বিস্তার করিয়া লইতেছে, কেমন করিয়া অভাবের জ্বালায় মানুষ তাহার মনুষ্যত্ব দিনে দিনে হারাইয়া শুধুপশুত্ব লাভিয়া বসিতেছে দেশবাসীকে আজ তাহারই সন্ধান লইতে হইবে।

এই বিরাট শস্য শ্যামল দেশে আজ খাদ্যের অভাবে সহস্র সহস্র নর নারী অকালে প্রাণ ত্যাগ করিতেছে। এই বঙ্গভূমি,—যেখায় বিভিন্ন দেশের সহস্র সহস্র নর নারী আসিয়া কর্ম করিয়া কোটী কোটী মুদ্রা আহরণ করিয়া লইয়া যাইতেছে সেখায় বাঙ্গালার অধিবাসীগণ না খাইয়া মরিতেছে—সেখায় কর্মাভাবে দেশের নর নারী অন্নের সংস্থান করিতে পারিতেছে না।

এই অন্ন সমস্যাই আজ দেশের সব চেয়ে বড় সমস্যা, এই কর্ম সমস্যাই আজ দেশের সব চেয়ে বড় সমস্যা। দেশের অধিবাসীবৃন্দকে কর্মের পথে প্রলুব্ধ করিয়া তাহাদিগের জন্য কর্মক্ষেত্র সৃষ্টি করিতে হইবে, তাহাদিগকে কর্মের পন্থা দেখাইয়া দিতে হইবে। কি ভাবে চলিলে দেশবাসীর অভাব মিটিবে, কিভাবে চলিলে দেশবাসী দেহ ও মনের ব্যাধি হইতে মুক্ত হইয়া আবার মানুষের মত দাঁড়াইতে শিখিবে, দেশবাসীকে সেই পথ দেখাইতে হইবে।

অভাবে সমগ্র দেশটা ছাইয়া ফেলিয়াছে। দেশের যে দিকে যাইবে; যাহার কাছে জিজ্ঞাসা করিবে সেই বলিবে অভাব অভাব, সহস্র অভাব—অভাবের জ্বালায় মরিয়া যাইতেছি। আজ দেশের অভাব নিবারণ করিয়া দেশবাসীকে মরণের মুখ হইতে ফিরাইয়া আনিতে হইবে। নতুবা জাতি ও দেশ ধ্বংস প্রাপ্ত হইবে। অভাবের চিন্তায় মানুষকে যত শক্তি হীন ও মনুষ্যত্ব হীন করিয়া ফেলে এমন আর কিছুতেই পারে না। অভাবের জ্বালা বড় তীব্র বড় ভীষণ।

কে জানে কত কারণে আজ আমাদের সোণার দেশে এই অভাবের অনল বর্ষিত হইতেছে। এ অনলে সমস্ত দেশ ছারখার হইয়া গেল—দেশবাসী দগ্ধ হইয়া গেল। দেশবাসীর এ অভাব অসহ্য হইয়া উঠিয়াছে—অভাবের দহনে আজ তাহার সব লুপ্ত হইতে বসিয়াছে। কি উপায়ে দেশকে এই অভাবের হাত হইতে রক্ষা করা যায়, দেশবাসীর প্রাণ বাঁচাইয়া রাখিতে হইলে সর্বাগ্রে আমাদিগকে তাহাই ভাবিতে হইবে।

রোকশোধ

শ্রীনারায়ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

এইরূপে কলঙ্কী চন্দ্রের ন্যায় মহেন্দ্রনাথ স্তুতি ও নিন্দার মধ্যবর্ত্তী হইয়া কয়েকটী বৎসর কাটাইয়া দিলেন। অনুপমা বাদশবর্ষে পদার্পণ করিল। প্রতিপালিকা ক্ষেমঙ্করী দেবী তাহার বিবাহের জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। মহেন্দ্রনাথ কিন্তু একটুও ব্যস্ত হইলেন না, তিনি একজন বি. এ পাশ করা গৃহশিক্ষক নিযুক্ত করিয়া অনুপমাকে ইংরাজী শিক্ষায় শিক্ষিত করিতে লাগিলেন। একে মেয়ে মানুষের লেখাপড়া শেখাই অনেকে পছন্দ করে না, তাহার উপর এতবড় ধেড়ে মেয়েকে মাষ্টারের সম্মুখে বসিয়া ছেলেভাষা পড়িতে দেখিয়া অনেকেই ঘৃণায় নাসাকুঞ্চিত করিয়া, এবং অহিন্দু মহেন্দ্রনাথের বুদ্ধির উপর বিস্তর দোষারোপ করিয়া পরিশেষে 'বড় ঘরের বড় কথা' বলিয়া এই আন্দোলনের উপসংহার করিল।

ক্ষেমঙ্করী দেবীর উপসংহারটা কিন্তু একটু বিয়োগান্ত হইয়া পড়িল। অনুপমার কন্যাকাল উত্তীর্ণ হওয়ায় একেই তিনি ধর্ম্মলোপের আশঙ্কায় শঙ্কিত হইয়া পড়িয়াছিলেন, তাহার উপর ইস্তিরী পঢ়াইয়া তাহাকে মেমসাহেব তৈরী করা হইবে শুনিয়া তাঁহার ভীতি ও বিস্ময়ের সীমা রহিল না। বয়োজ্যেষ্ঠা বলিয়া মহেন্দ্রনাথ তাঁহাকে সম্মান দেখাইয়া চলিতেন, এবং তাঁহার অনেক আদেশ জ্যেষ্ঠা সহোদরার আদেশের ন্যায় শিরোধার্য্য করিয়া লইতেন। সেই সম্মানের দাবী লইয়া তিনি একপ নিন্দিত কার্য্য হইতে নিরস্ত হইবার জন্য মহেন্দ্রনাথকে উপদেশ দিতে গেলেন। মহেন্দ্রনাথ কিন্তু তাঁহার এই অন্যায় আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া লইতে পারিলেন না। ক্ষেমঙ্করী ইহাতে শুধু দুঃখিত হইলেন না, যথেষ্ট ক্রুদ্ধও হইলেন এবং উপায় থাকিলে তিনি যে কখনই মহেন্দ্রনাথের অন্ন স্পর্শ করিতেন না, বিস্তর আক্ষেপের সহিত ইহা ব্যক্ত করিতে লাগিলেন। কিন্তু সে উপায় যখন নাই, তখন অগত্যা তাঁহাকে সে অন্ন গ্রহণ করিতে হইল, কিন্তু এজন্য তিনি অদৃষ্টকে বিস্তর ধিক্কার দিতে লাগিলেন। পরিশেষে অনুপমা যেদিন ফ্লোরেন্স বসিয়া মাষ্টারের নিকট প্রথম পড়া লইল, সেদিন ক্ষেমঙ্করী একাদশী বলিয়া জলস্পর্শ করিলেন না। পরদিন হইতে তিনি নিজের স্বতন্ত্র পাকের বন্দোবস্ত করিয়া লইলেন। অবশ্য জিনিষপত্র যা কিছু তাঁহার হইতেই আসিত, কিন্তু তাঁহার হইতে বাহিরে আসিবার পর আর কাহারও তাহা স্পর্শ করিবার অধিকার ছিল না। অন্য কর্ত্তৃক স্পৃষ্ট হইলেই তাহা তৎক্ষণাৎ পরিত্যক্ত হইত। এমন কি, সেই অপবিত্র বস্তু স্পর্শ করিলে অন্তঃকরণে পুনরায় স্নান করিয়া আপনাকে পবিত্র করিয়া লইতেন। এই সময় হইতে শুধু লৌকিক কর্ত্তব্য ছাড়া সংসারের আর কোন কার্য্যেরই সংস্রবে তিনি থাকিতেন না। আপনার পূজা অর্চ্চনা তপ জপে ব্যস্ত থাকিয়া, এই পাপময় সংসার হইতে মুক্তি দিবার জন্য পাপের কাণ্ডারী শ্রীমধুসূদনকে দিনের মধ্যে শতবার আহ্বান করিতেন।

আগে অনুপমা তাঁহার কাছেই প্রায় থাকিত, কিন্তু এখন সে কাছে আসিলে তাহাকে ছুইতে নিষেধ করিয়া সতর্কভাবে দূরে সরিয়া যাইতেন। অনুপমা কিন্তু নিষিদ্ধ হইয়াও এক এক সময়ে তাঁহার সন্নিকটস্থা হইত। সে দিন পবিত্র অপবিত্রের বিচার লইয়া বাড়ীর মধ্যে এমন তুমুল কোলাহল পড়িয়া যাইত যে বাড়ীর দাস-দাসীরা পর্য্যন্ত অতিষ্ঠ হইয়া উঠিত, এবং তাহাদের মধ্যে কোন কোন স্পষ্টভাষিণী দাসী এইরূপ অতিরিক্ত শুদ্ধাচারের প্রতিবাদ না করিয়া থাকিতে পারিত না। তখন দাসী ও কর্ত্রী উভয়ের মধ্যে তুমুল কলহ বাধিয়া উঠিত। অনেক সময়ে স্বয়ং মহেন্দ্রনাথকে মধ্যস্থরূপে সেই কলহের নিষ্পত্তি করিয়া দিতে হইত। অনুপমা মধ্যে মধ্যে পিসীমার নিকট তিরস্কৃত হইয়া তাহার এই অন্যায় শুদ্ধাচারিতার জন্য পিতার নিকট অভিযোগ করিত। মহেন্দ্রনাথ হাসিয়া কন্যাকে বুঝাইয়া দিতেন যে, সংসারে সকলের রুচি সমান নয়; যাহার রুচি যেরূপ, তাহাকে সেই ভাবে চলিতে দেওয়াই কর্ত্তব্য;

তাহাতে বাধা দিয়া গোলযোগের সূচনা করা সম্পূর্ণ অনুচিত। পিতার উপদেশ অনুপমা পিসীমার নিকট হইতে দূরে দূরে থাকিবার চেষ্টা করিত।

কেবল অনুপমা কেন, বাড়ীর আর সকলেই হেমন্তরী দেবীর সান্নিধ্য হইতে দূরে থাকিতে সচেষ্ট হইত। কেবল এক জন তাঁহার খুব কাছে কাছে থাকিত—সে তারকনাথ।

তারকনাথ রাগের বশে মাতুলগৃহ ত্যাগ করিয়াছিল বটে, কিন্তু বেশীদিন থাকিতে পারিল না; মাতুলের উপর স্নেহ ভক্তি বশতঃই হউক, বা অন্য যে কোন কারণেই হউক, বিধবা বিবাহ আন্দোলনটা চাপা পড়িয়া গেলে সে পুনরায় ফিরিয়া আসিয়া মাতুল চরণে প্রণত হইল, এবং তাহাকে দেখিয়া মাতুল যখন ক্রোধ বা বিরক্তি প্রকাশ করিলেন না, তখন সে নিরুদ্বিগ্ন চিত্তে পূর্ব্ববৎ অবস্থান করিতে লাগিল।

হঠাৎ একদিন সে হেমন্তরী দেবীর কাছে গিয়া, জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি নাকি আলোচাল রেঁধে খাচ্ছো মাসী মা?"

পাছে তাহার সচিত চৌয়াড়ঁী হয়, এই আশঙ্কায় মাসী মা পরিধেয় বস্ত্র বেশ সংযত করিয়া লইয়া উত্তর করিলেন, "কি করি বাছা, বামুনের ঘরের বিধবা একটু শুদ্ধাচারে থাকা তো দরকার। ওদের যেন বাছ বিচার, ইহকাল পরকাল কিছুই নাই, কিন্তু আমাকে তো দেওলা দেখে চল্‌তে হবে। আমার ইহকালেই না হয় গিয়াছে, পরকালটা তো আছে।"

প্রশংসার স্বরে তারকনাথ বলিল, "বেশ করেছ মাসীমা। তুমি কি, ওদের ভাব গতিক দেখে আমারি ঘেন্না জন্মে গিয়েছে। রাম: রাম:, খিরিষ্টানের বাড়ীর খেয়াল হ'য়েছে। আমাকে তোমার পাতের পেসাদ একমুটো ক'রে দিও মাসীমা।"

আশ্চর্য্যভাবে মাসীমা জিজ্ঞাসা করলেন, "আমার পাতের পেসাদ খাবি? কেনরে তারু?"

তারকনাথ বলিল, "বলেছি তো মাসীমা, ওসব খিরিষ্টানী আমার আর ভাল লাগে না।"

এতগুলি বিপক্ষবাদীর মধ্যে একজনকেও সপক্ষে পাইয়া হেমন্তরী আনন্দিত হইলেন। হর্ষগদগদ কণ্ঠে বলিলেন, "বেশ বেশ, বামুনের ছেলের কথাই ত এই।"

মাথা নাড়িয়া তারকনাথ বলিল, "আমার গুরুদেব বলেন, যা তা খেলে ব্রাহ্মণের ব্রহ্মতেজ নষ্ট হ'য়ে যায়।"

মাসীমা বলিলেন, "তা যায়ই তো। তোর মেসো-বলতেন, ব্রাহ্মণকে হাঁচতে কাসতে হয় আচারের উপর। আচারের একটু ত্রুটী হ'লে ব্রাহ্মণ অব্রাহ্মণ হ'য়ে যায়। তা বাছা, আমার পেসাদ তো খাবিস্, তাতে ভাত।"

জোর গলায় তারকনাথ বলিল, সেইত চাই মায়ের কোলে মাংসের কালিয়ায় রুচি থাকলে তোমার কাছে আসবো কেন মাসীমা। গুরুদেব বলেন, শুদ্ধাচারে ভাতে ভাত খেলে যেরকম দেহের পুষ্টি হয়, অশুদ্ধাচারে পোলাও কালিয়া খেলেও সে রকম হয় না।"

মাসীমা ইহাতে সম্পূর্ণ সায় দিয়া বলিলেন, "হারে তারু, তুই গুরুদেব গুরুদেব কচ্ছিস্, তোর আবার গুরু হলো কবে?"

তারকনাথ বলিল, "কবে কি? তুমি কি মনে কর মাসীমা, আমি শুধু শুধু এতদিন বাইরে ছিলাম? হরিদ্বার পর্য্যন্ত ঘুরে এসেছি।"

বিস্ময়প্রফুল্ল দৃষ্টিতে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া মাসীমা বলিলেন, "হরিদ্বার গিয়েছিলি?"

জোরে মাথা নাড়িয়া তারকনাথ বলিলেন, "হাঁ তো। বদরিকাশ্রম পর্য্যন্ত যেতাম। তা শরীরটা খারাপ হল, গুরুদেবও বললেন এখন ফিরে যাও, সময়ে যেও। সিদ্ধপুরুষ মাসীমা; অনেক সাধু সন্ন্যাসী দেখেছি, কিন্তু এমন সাধু দেখ্‌লে মনে হয় সাক্ষাৎ মহাদেব কৈলাস ছেড়ে এসেছেন।"

ভক্তি গদগদ কণ্ঠে কথাগুলা বলিয়া তারকনাথ দুই হাত তুলিয়া গুরুর উদ্দেশে প্রণাম করিল। মাসীমা বলিলেন, "তাঁর কাছে তুই মন্ত্র নিয়েছিস্ বল্?"

তারকনাথ বলিল, "হাঁ, একেবারে সিদ্ধ মন্ত্র। একবার জপে-একলক্ষবার জপের ফল।"

মাসীমা জিজ্ঞাসা করলেন, তা তুই জপ করিস্ কখন্?"

তারকনাথ বলিল, যখন একটু সময় পাই। সিদ্ধ মন্ত্র তো স্নান ক'রে শুদ্ধ হ'য়ে কোশাকুশী নিয়ে জপ কত্তে হয় না। সে রকম কত্তে হয় যাদের মন্ত্র অসিদ্ধ। সে খেয়ে দেয়ে বিছানায় শুয়ে সিদ্ধ মন্ত্র জপ করা চলে।"

তারকনাথের কথায় মাসীমা অবাক্ হইয়া গেলেন, এবং আপনার শুদ্ধাচারিতা বিস্মৃত হইয়া তাহাকে খুব কাছে বসাইয়া সিদ্ধ মন্ত্রের গুণাগুণ, সিদ্ধপুরুষের মাহাত্ম্য শ্রবণ করিতে লাগিলেন। তারকনাথ পুস্তকে পঠিত বিষয়ের সত্য মিথ্যা মিশাইয়া নানাবিধ অলঙ্কার দিয়া এমনভাবে বর্ণনা করিল যে, তাহা শুনিয়া মাসীমা মুগ্ধ হইয়া পড়িলেন, এবং সিদ্ধ মন্ত্রে দীক্ষিত তারকনাথকে পরম প্রণয়ে শুদ্ধ অন্ন ভোজন করাইয়া আপনাকে ধন্য জ্ঞান করিতে লাগিলেন।

অনুপমা একদিন জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি পিসীমার কাছে খাও কেন দাদাবাবু?"

তারকনাথ গম্ভীরভাবে উত্তর করিল, "বামুনের ছেলে আহারটা যত শুদ্ধাচারেই হয় ততই ভাল।"

সহাস্যে অনুপমা বলিল, "হঠাৎ তোমার ব্রাহ্মণত্ব জেগে উঠলো কেন?"

কুঞ্চিত মুখে তারকনাথ বলিল, "যখন জাগে তখন হঠাৎই জাগে। দস্যু রত্নাকর হঠাৎ বাল্মিকী হ'য়ে পড়েছিল, জগাই মাধাইও উদ্ধার হ'য়েছিল হঠাৎ, সাধু বিল্বমঙ্গল—"

বাধা দিয়া অনুপমা হাসিতে হাসিতে বলিল, "আর তোমায় উদাহরণ দিতে হবে না দাদাবাবু, তুমিও যে এক দিনে সাধু হ'য়ে পড়েছ তা বুঝতে পেরেছি। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, কাঁচকলা ভাতে ভাত খেলেই কি সাধু হয়?"

গম্ভীর কণ্ঠে তারকনাথ বলিল, "সাধুরা মাছের ঝোল মাংসের কালিয়া খায় না।"

"চা খায়?"

"আগেকার তত সাধুরা খেতো না, এখনকার আমলে সাধু যারা, চা খায়। চায়ের ভিতর দূষিত কিছুই নাই, গাছের পাতা, দুধ আর চিনি—আমাদের গুরুদেব নিজে দু'বেলা চা খান।"

"বিয়ে করেছ?"

তারকনাথের মুখের দিকে চাহিয়া অনুপমা মুখ টিপিয়া হাসিল। ভ্রূকুটী করিয়া তারকনাথ বলিল, "বিয়ে আমি ক'রবো এ কথা কে বল্লে?"

তাহার ভ্রূকুটীতে অনুপমা শঙ্কিত হইয়া বলিল, "বলে নি কেউ, তবে শুনতে পাই তোমার বিয়ের সম্বন্ধ হচ্ছে।"

তারকনাথের মুখখানা এমন অস্বাভাবিক গম্ভীর হইয়া আসিল যে, তদ্দর্শনে অনুপমা ভয়ে ভয়ে তাহার সম্মুখ হইতে সরিয়া গেল।

তারকনাথ তেমনই গম্ভীর মুখে মাতুলের নিকট গিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি নাকি আমার বিয়ের উদ্যোগ কচ্ছেন?"

বাস্তবিক যে মহেন্দ্রনাথ তাহার বিবাহের উদ্যোগী হইয়াছিলেন তাহা নহে, তবে তারকনাথ ফিরিয়া আসার পর আপনা হইতেই দুই এক স্থান হইতে তাহার বিবাহের সম্বন্ধ আসিতেছিল। মহেন্দ্রনাথ তাহাতে কোনরূপ মতামত প্রকাশ করেন নাই। কিন্তু তারকনাথকে এরূপ উদ্ধতভাবে বিবাহের কথা জিজ্ঞাসা করিতে দেখিয়া মহেন্দ্রনাথ একটু ক্রুদ্ধ হইলেন; উত্তরে বলিলেন, "উদ্যোগ করা কি আমার পক্ষে অনুচিত হ'য়েছে?"

"সম্পূর্ণ অনুচিত!"

রাগটা সামলাইয়া লইয়া মহেন্দ্রনাথ জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কি বিবাহ করবে না?"

জোর গলায় তারকনাথ উত্তর দিল, "খুব সম্ভব—না।"

"কারণ?"

"কারণ, স্ত্রীর ভরণপোষণের সংস্থান না ক'রে বিবাহ করা নিতান্ত মূর্খতা।"

"সেই সংস্থান কখনও কত্তে পারবে এমন আশা তোমার আছে কি?"

"না পারি, বিবাহ করবো না।"

"চিরকুমার হ'য়ে থাকবে?"

তীব্র কণ্ঠে তারকনাথ বলিল, "অন্যের গলগ্রহ হইয়া থাকা অপেক্ষা চিরকৌমার্য্য লক্ষ গুণে ভাল।"

রাগে মহেন্দ্রনাথের মুখখানা লাল হইয়া উঠিল; তিনি তারকনাথের মুখের উপর রোষ-কঠিন দৃষ্টি স্থাপন করিয়া বলিলেন, "উত্তম, আমি তোমাকে অন্যের গলগ্রহ হ'তে অনুরোধ করি না।"

তারকনাথ গম্ভীরভাবে চলিয়া গেল। মহেন্দ্রনাথ বসিয়া ভাবিতে লাগিলেন।

ভৃত্য আসিয়া তাকের চিঠি পত্র দিয়া গেল। একখানা রেজেষ্টারী চিঠি ছিল। অনুপমার জন্য যে গৃহশিক্ষক নিযুক্ত হইয়াছিলেন, কয়েক মাস মাত্র কাজ করিয়া তিনি চলিয়া যাওয়ায় মহেন্দ্রনাথ একজন গৃহশিক্ষকের জন্য

বিজ্ঞাপন দিয়াছিলেন। রেজেষ্টারী চিঠিখানা খুলিতেই মহেন্দ্রনাথ বুঝিতে পারিলেন, ইহা সেই বিজ্ঞাপনের উত্তর—কোন গৃহশিক্ষক পদপ্রার্থীর আবেদন পত্র। মহেন্দ্র নাথ প্রথমটা একটু তাচ্ছিল্যভাবে, তারপর খুব মনোযোগের সহিত পত্রখানা পড়িতে লাগিলেন আবেদনকারী লিখিয়াছে—

"আপনি জনৈক প্রবীণ গ্রাজুয়েট গৃহশিক্ষকের জন্য 'বেঙ্গলী'তে যে বিজ্ঞাপন দিয়াছেন, উহা পাঠ করিয়া নিবেদন করিতেছি যে, আমি প্রবীণ বয়স্ক নহি, আমার বয়স বাইশ বৎসর মাত্র, এই বৎসরে আমি এফ-এ পরীক্ষায় দ্বিতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়াছি। কিন্তু অনেক মাস পূর্ব্বে পিতৃহীন হওয়ায় পড়ার আশা ত্যাগ করিয়া আমাকে অর্থার্জ্জনের চেষ্টা দেখিতে হইতেছে। সংসারে বিধবা মাতা, একটী বিধবা ও দুইটী অবিবাহিতা ভগ্নী—ইহাদের ভরণপোষণের ভার আমার উপরই নির্ভর করিতেছে। পিতা কিছুই সঞ্চয় রাখিয়া যান নাই; অধিকন্তু কিঞ্চিৎ ঋণ আছে। সুতরাং চাকরী ছাড়া আমার আর গত্যন্তর নাই। অথচ উপযুক্ত সুপারিসের অভাবে চাকরীও দুষ্প্রাপ্য। এ অবস্থায় আপনি যদি আপনার কন্যার গৃহশিক্ষকরূপে আমাকে মনোনীত করেন, তাহা হইলে আমি যারপর নাই উপকৃত হই, ইত্যাদি—

আকর
শ্রীহেমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।"

মহেন্দ্রনাথ পত্রখানা দুই তিনবার পড়িলেন, পড়িয়া অনেকক্ষণ ভাবিলেন। তারপর কাগজ কলম লইয়া উত্তর লিখিয়া দিলেন—তুমি পত্রপাঠ চলিয়া আসিয়া কার্য্যভার গ্রহণ করিবে।" (ক্রমশঃ)

ভাই-সাহেব। হিঁইয়ো মারি, হুকুমদারি, হিঁইয়ো মারি, হুকুমদারি। তুলবো, তবে ছাড়ব। চালাকী?—বটে? বিশ্ববিদ্যালয় নড়েছে, নড়েছে—মার হৈলা, হিঁইয়ো মারি.....

স্ত্রীর চিঠি

(শ্রীবিজয়রত্ন মজুমদার)

প্রিয়তম !

আসবার সময় তোমার মুখে দেখা করে আসতে পারি নি, তার জন্যে অনুশোচনায় মরে যাচ্ছি। একটু দেরী করলে হয়তো জানতাম, কিন্তু দেরী করবার সাহস হয় নি। ভয় ছিল, হয়তো হ'লে এমন করে আসা হ'বে না, যদিওবা আসা হয়ে ওঠে, আবার হয়ত ফের-বার প্রতিশ্রুতি দিতে হবে। প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে' নিজের মনে পাপ সঞ্চয় করতে চাইনে।

আমি আর ফিরব না। বাপের বাড়ীর অবস্থা অচ্ছল, এঁদের একটু আধটু কষ্ট হবে, অবিশ্যি, কিন্তু ওঁদেরও-আমারও জানা আছে যে এছাড়া অন্য আশ্রয় আমার নেই, সেই আশ্রয়েই আমাকে আমরণ থাকতে হ'বে। তাই থাকুন, হোক্ কষ্ট, হোক্-হোক্ অনাটন! এই যে তোমাদের বাড়ী থেকে চলে গেছি, সেই যাওয়াই আমার শেষ যাওয়া হ'য়েছে, তোমাদের সমর ঘাটের চৌকাঠে মাথা ঠেকিয়ে আমি শেষ বিদায় নিয়ে এসেছি। বিয়ের পর চোদ্দ বছর তাদের কোলে পিঠে বুকে মাথায় মুখ-বুক রেখে বাস করে এসেছি, ছাড়তে তাদের কি কষ্টই না হয়েছে। দু'টি চোখ ফেটে গেছে, অন্ধ হয়ে গেছি; বুকের স্পন্দন বন্ধ হ'য়ে গেছিল, তবু ছেড়ে আসতে হ'য়েছে। আর ফিরব না। জানি তোমার কষ্ট হ'বে, জানি এ বিরহ তোমার বুকে শেল-সম লাগবে কিন্তু পারব না, পারব না, আর ফিরতে পারব না।

চোদ্দ বছর তুমি যে এই অভাগিনীকে নিয়েই সুখে বাস করেছিলে, এক মুহূর্তের বেশী কাল যে এই অভাগিনী সুখে দুঃখে তোমার চিরসাথী হ'য়ে রহিল, তার বিচ্ছেদে তোমাকে যে কত খানি বাজবে, তা কি আর আমি জানি নে? জানি, আর এও জানি তোমার অভাব পূর্ণ করবার উপায় যদি কিছু তুমি সন্ধান করে বের করতে পার—আমার যা গেছে, আমি যা হারিয়েছি তা ফিরে পাবার আর কোন আশাই নেই। কোন দিন পাব, এ ভরসা স্বপ্নেও কোনদিন রাখি নে।

আজ মনে পড়ছে প্রথম যখন তোমাকে আমাকে বিয়ে হ'য়েছিল, তখন এই রমণীর পদমূলে তোমার ভালোবাসা ঢেলে দিয়েছিলে, ধন্য হ'য়ে গেছলাম। ভেবে-ছিলাম, আমার অন্তকাল ধরে এই আমি চেয়েছি, কামনা করেছি, বিধাতার বরে তা পেয়েছি। নারীজীবন তখন থেকেই মুকুলিত হ'য়ে ওঠে, যখন থেকে মাতৃ-ত্বের বাসনা বুকে-বুকে মনে-মনে সঞ্চয়ের ঘরে উঠতে থাকে! সে কি সুখের বাসা! মা হ'ব! মা! নারীর মুক্তি ঘরে—মা! দুঃখের দূর হ'বে—মা! মা'তে নারীতে যে কত তফাৎ তা প্রথম বুঝি, যখন হেমা জন্মাল। তোমাদের বাড়ীতে সে কি উল্লাস! সে কি হর্ষ! উল্লাস কি শুধু তোমাদের বাড়ীর পরিজনেরই হ'য়েছিল? মা'র হয় নি! প্রসব যন্ত্রণা আরও হ'তেই মনে হয়েছিল, শেষ হ'য়ে যাক, এই জীবনটা, সমাপ্ত হোক্ এই মাতৃত্বের আকাঙ্ক্ষা, কিন্তু—তারপর, তারপর—ক্ষুদ্র কুসুমের মত একটা রক্তমাংস পিণ্ড পাশে পড়ে হাত পা নাড়ছে, আধফোটা ফুলের পাপড়ীর মধ্যে ফুটে সেই হাসির রেখা, অস্ফুট অব্যক্ত সেই রোদন! হারে! সব ভুলে গেলাম।

তোমাদের গৃহে যেমন সুখের সমুদ্র উথলে উঠল, আমার জীবনের নদীটিতে তেমনি একটানা ভাটার স্রোত এসে গেল। একটানা—একটানা স্রোত! না তাতে নূতনত্ব আছে, না আছে তাতে স্পন্দন, না আছে অনুভূতি! বছর ফিরল, হেমার তখন নাম-ও হয় নি, আবার একটি শিশু!.....তারপর যায় বছর গেছে, দশ-বার এই কথাটা যায় বলে শেষপর্যন্ত দেহ থেকেই দশ-টি উপহার তোমাদের দিয়েছি! তোমাদের পয়সা আছে তোমরা আনন্দ ছাড়া দুঃখ কর নি, তোমার প্রতি-বেশিনীরা আমার তদারকি করত; যে-সব মেয়েদের ছেলে পুলে হয় নি, তারা আমাকে মাথায় তুলে নাচতে আরম্ভ করলে, তোমার মা ত ভেতলায় ছটি ঘরই বাড়িয়ে ফেললেন, নাতিদের বিয়ে দেবেন, ঘরের ঘর সংসার হ'বে, তাদের আবার ছেলেপুলে হ'বে ত!..হ'বে বৈ কি! হেমার বিয়ে দিয়ে তোমার মা খোকাকার ছেলে পুষ্পকে যে জামাই করে' আনবেন, ভেবেই সারা! ছোট ছেলেটা যখন হ'ল, তোমার মা এর নাম রাখি, 'আর না,'

আরা! তবে মা রেগে গেলেন! তোমার মার এমন রাগ আর দেখি নি! আমি না-কি বড় অমঙ্গলের কথা বলেছি, গৃহ দেবতা না-কি রুষ্ট হ'য়ে উঠেছেন, লক্ষ্মীদেবী এদের ছেড়ে যাবেন বলে না-কি ভয় দেখিয়েছেন! এক সঙ্গে এতগুলো অপরাধ যে করেছে, তাকে মিষ্টিমুখে কথা কয়তে পারেন, এমন লোক, মাটীর মানুষ শাশুড়ী তু-তারতে নেই! এই আমি তাঁর প্রথম বিরাগ ভাজন হলাম; এই প্রথম তাঁর রুষ্ট স্বর শুনলাম—বৌ-মা! তুমি কি মা বুদ্ধি-শুদ্ধি হারিয়েছ? অমন অলক্ষুণে কথা বল্লে কোন মুখে, বাছা?" আমি কখনও তাঁর জোর কথা শুনিনি, কাজেই উত্তর-ও দিই নি, আজই শুনলাম এবং উত্তর না দিয়েও পারলাম না। বলতে হল—না মা, আমার আজ আর কিছুই নেই, তবে এই হাড় পাঁজরার ভেতর ঐ বুদ্ধিটুকুই আছে শুধু! আর কিছু নেই।

মা কথাটা কি বুঝেছিলেন জানিনে, বুঝেছিলেন কি-না তা'ও সন্দেহ! কিন্তু কথা ক'ন নি এবং সোজা মুখ বেঁকিয়েই সারা দিনটা ছিলেন। গুরুজনের নিন্দে করছি এর শাস্তি হয় ত পাব, এবং পাবার জন্যে সব সময়েই প্রস্তুত আছি। তাঁর মাতৃত্বের নিহিত যে নিষ্করুণ পাষাণ স্বভাবটি পারা ঢাকা জলের মত আবহমান কাল ধরে ঢাকা ছিল, এই প্রথম কথার জাল পড়ে পারা সরে গিয়ে বেরিয়ে পড়ল।

সেইরাত্রে তাঁর জ্বর হয়—অশেষ যন্ত্রণায় সারারাত্রি ঘুমুচ্ছেন, আমার ছেলেপুলেগুলি তাঁরই কাছে থাকত, তাদের বুকে নিয়ে, আর চোখকে দেহে বন্ধ করে সারারাত্রি কাটিয়েছেন, কিন্তু বৌ-মাকে ডাকেন-নি! ভোরে টের পেয়ে যখন ঘরে ঢুকলাম, তখনও সেই অপ্রসন্ন মুখ! জানি-নে সে রোগে না রোষে! থাক্—তাঁর সেবা করে তাঁকে ভুললাম! তুমি জান,—তুমি সাক্ষী হ'লে!

মা উঠ্‌লেই সেই হতভাগা পড়ল! তিন দিন কাটল না, বাছা আমার রাক্ষসী-মা'র মুখের দিকে চাইতে চাইতেই শেষ নিঃশ্বাস ফেল্‌লে! তখনও বুঝতে পারিনি যে, বাছা আর হাসবে না, আর চাইবে না, আর এ শুষ্ক স্তনদুটি মুখে চেপে হাত-পা নেড়ে খেল্‌বে না, এ-সব তখন আমার মনে হোকোনি, এগার-টা ছেলে-মেয়ের মা আমি, বরাবর তা'দের আছাড়ি করে ছেড়ে এনেছি, কম দিয়েছি, একটাকেও হারাইনি, কি-রকমে যে হারায় তা জানা ছিল না,—তোমার মা-ই জানিয়ে দিলেন, রাক্ষসি! আমার খোকাকে ফিরিয়ে দে!... আয়-না, আয়-না করেই বাছাকে আমার খেয়ে ফেল্‌লি!" তখনি বুঝলাম, বাছা আমার নেই, চলে গেছে, চলে গেছে!

রোগের সেবা করে যে অপ্রসন্নতা ঘুচিয়ে তোমার মা'য়ের মনে প্রসন্নতা ফুটিয়ে দিলাম, আবার তা নিতে গেল এবং এবার একেবারে আগুন জ্বলে উঠ্‌ল! নীচে আগুন উপরে ধূম, মর্মবর্ম! উঠ্‌তে সেই 'আয়-না'! বস্‌তে সেই 'আয়-না'! ক'দিন আমার মুখুয়ে যখনই বেরিয়েছেন ঐ এক কথা! আমার অবহেলাতেই তাঁর কোল শূন্য করে' সে চলে গেছে। হায় নারী! অবহেলা! আর তা'ও মা'য়ের অবহেলা! কে তা'কে দেহের মধ্যে ধারণ করে, নিঃশ্বাস দিয়ে, বুকের রক্ত ঢেলে, স্নেহের উত্তাপে, মাতৃত্বের স্বর্ণ-সিংহাসনে বসিয়ে পৃথিবীতে এনেছিল? তার অবহেলা! অন্তে বড়ে দুঃখ ছিল না, কিন্তু নারী হ'য়ে—থাক্। আমি সহ্য করে মুখ বুজে থাকতে পারিনি, পারবও না। নারী নয় যে চুপ করে' থাকবে—এ মা!

জানি, সেই 'আয়-না'র কথা! কথাটা এতই বিশ্রী যে তোমার মা তোমার মন-টিও নষ্ট করে দিয়েছিলেন! বিশ্রীই বটে! এ দেশের সবই উল্টো! এখানে রমণীর রূপ সবাই খোঁজে, কিন্তু সে রূপ রাখবার চেষ্টা করা পাপ—মহাপাপ! মাতৃত্ব চাই-ই, লোকে বন্ধ্যা নারীর মরণ কামনা করে, কিন্তু মাতৃত্ব বিকাশ করার চেষ্টাকে বলবে উন্মত্ততা! বছর বছর সন্তানের জন্ম দিতে পারাই গর্বের, একটা দু'টোকে মানুষ করে' তোলার সার্থকতা কেউ দেখে না!

এ দেশে কোনো মেয়েরই মাতৃত্ব যে ক্ষুদ্র গৃহের সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর বাহিরে প্রকাশ হ'য়ে পৃথিবীতে মাতৃত্বের অমৃত-ধারা বর্ষণ করবে তার সুযোগ-ও নেই, এখানে কেউ তা চায়-ও না। এটা দস্তুর মত বাড়াবাড়ি বলে গণ্য; এ-কথা-ও মস্ত একটা অপরাধের মধ্যে! তা ছাড়া দৈহিক সম্বন্ধে যারা মা হয়নি, তাদের জীবন ব্যর্থ করবার জন্যে শাস্ত্রে না-কি নানা বিধান আছে, তাদের দ্বারা জগতের, সমাজের, মানুষের কোন উপকার সাধিত হ'তে পারে—এ কথা কেউ বিশ্বাসই করে না—কাজেই

এমন বিশ্বাস যেখানে, সেখানে বেশী প্রত্যাশা করবার নেই আমিও করিনে।

তবে একটা কথা সত্যি, এবং সেই সত্যি কথা বলতেই এই চিঠি লিখ্‌ছি! আমার নারীত্ব তোমরা চাও-নি; আমার রূপের কদর দেখিয়েছিলেন, তোমার সেই খুড়ো ম'শাইটি আমাকে দেখ্‌তে গিয়ে! জলখাবারের গ্লাস থেকে অঞ্জলি ভরে জল নিয়ে সে কি যন্ত্রণার ধুম! অত বলেও যখন খুঁত পেলেন না, তখন তিনি গলা ছেড়ে খুসী হ'য়ে বল্লেন, হ্যাঁ রূপবতী বটে!—সেই রূপ বিয়ের দশ দিন পরে আর তোমাদের আলোচ্য বিষয় ছিল না, না তোমার, না তোমার বাড়ীর কারো! ছিল কেবল একটা আকাঙ্খা, কবে আমি মা হ'ব! সে আশা পূর্ণ হ'তে দেরী হয় নি, হেমা যখন জন্মায়, আমার বয়স তেরো! আজ ছাব্বিশ বছর বয়সে এগারো ছেলের মা আমি! আর দশ বছর যদি তোমাদের বাড়ী থাকি—ওঃ!

তোমরা বলা-বলি করতে আমার অসুখ হ'য়েছে, তোমাদের ডাক্তারের পকেট ও ডাক্তার-খানার থলে সমভাবে পূর্ণ হ'চ্ছিল, ঠিক সেই পরিমাণে আমার শরীর শূন্য হ'চ্ছিল; তা'ও আমার অপরাধ। আমি না-কি ওষুধ খেতে অবহেলা করি, হেলোল-ঝাপড়া...!

আশ্চর্য্য যে এই দেশের লোকই জজ্ ম্যাজিষ্ট্রেট হ'চ্ছে, এই দেশের লোকই লোক শিক্ষার ভার পাচ্ছে, আরো আশ্চর্য্য যে এই হতভাগা দেশের লোকই সমাজ সংস্কারের চেষ্টায় আকাশ ফাটাচ্ছে, এরা আবার ওরাঙ্গ চেয়ে বুকে পিঠে বিল দিয়াছে! যাদের কাছে নারীর এই সম্মান তারাই আবার.....মুখ তুলে কথা কয়! লজ্জা হয় না?

নারী যদি তার কাছে সন্তান উৎপাদনী একটা কল (Machine) বিশেষ বলেই বিবেচিত হয়, তবে এটা ও তাদের জানা উচিৎ যে Machine ও চিরকাল সমান কাজ করে না, সেও বেসড়ায়, তারও মরচে আছে, তারও ভাঙবার, থামবার অধিকার আছে। এ দেশের পুরুষ তা জানে না, তারা ভাবে এ যন্ত্র ভগবানের সৃষ্টি, চিরকাল সেটাকে দিয়ে কাজ করিয়ে নেওয়া যেতে পারে, ভাঙবেও না, চুরবেও না। হ্যাঁ, নেহাৎ স্বাস্থ্যহানি হয়, ডাক্তার আছে, বড়ি আছে! পেটেণ্ট সালসা আছে; কিছুতে কিছু না-হয় হওয়া খাওয়া রীত আছে। স্বাস্থ্যহানি যেন ম্যালেরিয়া আর অন্ন-আড়ী! বছর বছর আঁতুড়ঘর যেন বিলাস-ভবন! রক্তমেহ, ক্ষীণজীবি সন্তান তবু তাদের চাই-ই চাই!

তোমার মা'র গর্ব্ব ছিল দু'টি। পুত্র-গর্ব্ব আর একটি ছিল, বংশের গরিমা! তাঁর পুত্র চরিত্রবান, পরস্ত্রী কাকে বলে জানে না; আর বংশে কবে কে-একজন ডাকাতি করে অনেক টাকা অর্জ্জন করেছিল, তা ছাড়া এ বংশে সবাই একেবারে অকলঙ্ক পুরুষ রয়েছে! সেই কারণেই ছেলের বিয়ে দেন, আঠারো বছরে আর বংশ গরিমা উজ্জ্বল রাখ্‌তে নাতিদের নাম করেছিলেন, প্রহ্লাদ, বিষ্ণু, হরিহর, মদনমোহন...ইত্যাদি, সব ধার্ম্মিক হ'বে।

যাক—তোমরা যা চাইতে, প্রাণপণে তা দিয়েছি, যতদূর পেরেছি;—তোমার মার সাধ পূর্ণ হ'য়েছে, তোমারও আকাঙ্খা যে কতক না মিটেছে তা নয়, কিন্তু আর নয়, ভগবানের তৈরী যন্ত্রও বিগড়েছে, আর সে সন্তান ধারণ করতে পারে না। তার সে শক্তি লুপ্ত হ'য়েছে, যে শক্তির বলে এতকাল সে বলবতী ছিল, তোমাদেরই অসীম অনুকম্পায় তা ধীরে ধীরে নিঃশেষিত হ'য়ে গেছে! কিন্তু এখন বল্‌তে গেলে আমার স্থান আর গর্ব্বে থাকবে না, নিশ্চিই হ'বে—নরক! আমার মুখ আর কেউ দেখ্‌বে না—কলঙ্কিনী, দুশ্চারিণী, স্ত্রী-নামের অযোগ্য!

এ কথা বলে যে পাপ আমি অর্জ্জন করলাম, তার আর খণ্ডন নেই। আমি কায়মনে আশা করি তোমার মা আর তুমি যে পাপমুখে 'মা হ'ব না' এই কলঙ্ক আমি উচ্চারণ করেছি সে পাপমুখ আর দেখ্‌তে চেয়ো না, চেয়ে কলঙ্ক কিনো না—আমার পাপ আমার থাক্, তোমাদের যেন না স্পর্শ করে, এই আমার ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা!

আজ এই চিরবিদায়ের কালে তোমাকে আমি শত শত নতি করছি! আমার সন্তানদের জনক, আমার ইহকালের সর্ব্বস্ব, তোমার পায়ে আমার শতকোটী প্রণাম! যদি পরকাল থাকে এবং সে-কালে নারী শুধু নারী না হয়, তার মাতৃত্বের গৌরব থাকে, তার একটা স্বতন্ত্র সত্তা থাকে, তবে আশা আছে—আবার আমি তোমাকেই স্বামীরূপে, আমার সন্তানের জনকরূপে চাইব!

সেদিন তোমাকে এই কথা মনে করিয়ে দেব যে নারী হ'লেও তার দেহ—দেহ! তার রূপ—রূপ, তার হৃদয়—হৃদয়—সেটা কোন কারণেই এবং কোন অবস্থাতেই তোমাদের—পুরুষদের কামের হোমানলে আহুতিই দিতে পারবে না!

বিদায়! বিদায়! তোমার—

প্রজ্ঞা।

লাউসেন

[শ্রীশিবরতন মিত্র]

তৃতীয় অধ্যায়

রাজ-সন্দেশ—গঙ্গাধর ভট্ট

দেবাসুর সংগ্রামে শতবর্ষ অতীত—প্রবল পরাক্রান্ত দৈত্যাধীশ মহিষাসুর, স্বর্গজয় করিয়া ইন্দ্রত্ব পদে প্রতিষ্ঠিত—তাহার পর মহিষাসুরমর্দ্দিনী দেবী কর্ত্তৃক তাহার নিধন—রাজা গৌড়েশ্বর, বারকুঞা, পাত্র মিত্র ও অমাত্যগণ পরিবেষ্টিত হইয়া এইরূপে দেবী-মাহাত্ম্য শ্রবণ করিতেছেন। সমগ্র রাজসভা নিস্তব্ধ—সকলেই দেবী-মাহাত্ম্যের অপূর্ব্ব কথা শ্রবণ করিবার জন্য উদ্‌গ্রীব ও উৎকর্ণ হইয়া রহিয়াছে।

এই সময় কর্ণসেন রায়,-অতি ত্রস্তভাবে রাজসভায় প্রবেশ করিয়া গৌড়েশ্বরের সমীপে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং কোনরূপ বাক্যব্যয় না করিয়া প্রণামান্তে দারুণ অভিমানভরে অবিরলধারায় অশ্রুপাত করিতে লাগিলেন। গৌড়পতি অতিশয় বিস্মিত হইয়া কর্ণসেনের এইরূপ ভাবে হঠাৎ আগমন ও অশ্রুপাতের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। কর্ণসেন, শিরে করাঘাত করিয়া দীর্ঘশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক বলিলেন—'গৌড়েশ্বর, সোমঘোষের পুত্র, আমাদের সর্ব্বনাশ করিয়াছে। সে দেবী শ্যামরূপার কৃপালাভ করিয়া প্রভূত পরাক্রমশালী হইয়াছে—সেই আমার দারুণ অপমান করিয়া ত্রিবেণীগড় হইতে বিতাড়িত করিয়া নিজের স্বাতন্ত্র্য ঘোষণা করিয়াছে।—আপনার ত্রিবেণীগড় এখন ঢেকুর নামে অভিহিত হইতেছে—আপনার মোহাই সম্ভ্রম রক্ষা হইয়াছে—সোম গোয়ালার পুত্র ইহাই গোয়ালা, রাজপাটে বসিয়া রাজা সাজিয়াছে!

গৌড়েশ্বর, কর্ণসেনের নিকট এই অপ্রত্যাশিতপূর্ব্ব ব্যাপার শ্রবণ করিয়া, অনলে ঘৃতাহুতির ন্যায় ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিলেন এবং চতুর্দ্দিকে রোষকষায়িত নেত্র সঞ্চালন করিয়া বলিলেন—"মন্ত্রি, এখনই যাবতীয় সৈন্য রণসজ্জায় সজ্জিত কর। আমি স্বয়ং ত্রিবেণীগড়ে গিয়া, আমার অনুগ্রহ-পুষ্ট সেই সোমগোয়ালার পুত্রকে, তাহার চপলতার জন্য সমুচিত শাস্তি প্রদান করিব। পাত্র মহাশয়, ধীরপদে গৌড়পতির সমীপে অগ্রসর হইয়া বলিল—'মহারাজ, এই সামান্য ব্যাপারের জন্য আপনার চঞ্চল হইবার কোন প্রয়োজন নাই। আপনি কয়েকদিন মাত্র অপেক্ষা করুন, আমি সেই দুষ্ট গোয়ালা-পুত্রকে আপনার সমক্ষে আনিয়া দিব। আমি এখনই তাহাকে গৌড়ে উপস্থিত হইবার জন্য আপনার আদেশ প্রেরণ করিতেছি, যদি সে, এই আদেশ অমান্য করিতে সাহসী হয়, তাহা হইলে, তাহার সমুচিত শাস্তি বিধানের ব্যবস্থা করা যাইবে।

পাত্র মহাশয়ের বাক্যে গৌড়পতি কথঞ্চিৎ শান্ত হইলেন এবং সোমঘোষকে এই মর্ম্মে পত্র লিখিবার আদেশ প্রদান করিলেন—'সোমঘোষ, কালে অসম্ভব সম্ভব হয়—নচেৎ, তুমি এত সত্বর তোমার বন্দীশালার কথা বিস্মৃত হইতে না। তোমার প্ররোচনায় তোমার পুত্র, কর্ণসেনকে বিতাড়িত করিয়া স্বয়ং রাজা সাজিয়াছে—এ সংবাদ সত্য মিথ্যা, তুমি স্বয়ং আমার সমক্ষে উপস্থিত হইয়া আমার সন্দেহভঞ্জন করিবে। যদি একবারে ছারে-খারে না গিয়া তোমার বাঁচিবার সাধ থাকে, তবে তিল-মাত্র বিলম্ব না করিয়া, যেমত অবস্থায় আছ, আমার নিকট স্বরায় আসিয়া উপস্থিত হও। শুনিতেছি, তোমার পুত্র ইহাই অতিশয় পরাক্রান্ত হইয়াছে—এমন কি, সে আমার শাসন-অধিকার মান্য করিতে সম্মত নহে; পরন্তু আমার সহিত বিবাদ করিতেও প্রস্তুত। সেই অর্ব্বাচীন বালককে, তাহার অবিবেচনার কথা বুঝাইয়া বলিবে। যাহাতে তুমি অত্যধিক বিপন্ন না হও, অগৌণে তাহার ব্যবস্থা করিলে সুখী হইব—অধিক লেখা বাহুল্য মাত্র। ইতি।

পাত্র মহাশয়, রাজসন্দেশবহ গঙ্গাধর ভট্টকে এই পত্র প্রদান করিয়া কহিলেন—'তুমি এই পত্রসহ দ্রুতগতি ত্রিবেণীগড়ে উপনীত হইয়া রাজকর সহ সোমঘোষকে গৌড়রাজধানীতে আনয়ন কর—পথি মধ্যে অকারণ কালক্ষেপ করিও না।' গঙ্গাধর ভট্ট প্রণামান্তে পত্রসহ অশ্বারোহণে ত্রিবেণীগড় অভিমুখে প্রস্থান করিল—তাহার সঙ্গে, অশ্বারূঢ় কতকজন ঘোড়ী ও পদাতিক সৈন্য অনুচররূপে গমন করিল। গঙ্গাধর ভট্ট, অবিরামগতি

প্রস্থান করিয়া যথাসময়ে অনুচরাদি সহ অমরনদের তীরে আসিয়া উপনীত হইল। গৌড়পতির সন্দেশসহ সাদুচর গঙ্গাধর ভট্টের আগমন সংবাদ প্রাপ্ত হইবামাত্র, সোমঘোষ অগ্রসর হইয়া তাহাকে সাদর সম্ভাষণ পূর্ব্বক যথাযোগ্য ভাবে অভিনন্দিত ও পুরস্কৃত করিল।

গঙ্গাধর, রাজ-পত্র প্রদান করিলে, সোমঘোষ প্রণাম করিয়া সসম্ভ্রমে গ্রহণ ও পাঠ করিল। তদনন্তর বিনয় সহকারে বলিতে লাগিল—'মহাশয়, আমি আমার গোঁয়ার পুত্রকে লইয়া অত্যন্ত বিপন্ন হইয়া পড়িয়াছি। সে অতিশয় দুর্জ্জন হইয়াছে—তাহার হিতাহিত বোধ বা ভক্ষাভক্ষ্য জ্ঞান নাই—গুরুজ্ঞান নাই! আপনি যে গৌড়পতির দূত বা সন্দেশবহরূপে এখানে আগমন করিয়াছেন, এ কথা সে জানিতে পারিলে, বিষম অনর্থপাত করিয়া ফেলিবে; সুতরাং যদি সে আপনার পরিচয় জিজ্ঞাসা করে, তাহা হইলে আপনি কৃপাপূর্ব্বক তাহাকে বলিবেন—যে আমার সহিত বন্ধুত্ব সূত্রে আপনি আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছেন। আপনার কার্য্যোদ্ধার সম্বন্ধে আপনি নিশ্চিন্ত রহিবেন—আমি গোপনে আপনাকে গৌড়পতির প্রাপ্য যাবতীয় কর প্রদান করিব—আপনি সেই কর সহ গুপ্তপথ দিয়া গড় পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইবেন।'

সোমঘোষের এই অসঙ্গত ও অসাধু প্রস্তাব শ্রবণ করিয়া গঙ্গাধর ভট্ট ক্রোধে অগ্নিমূর্ত্তি হইয়া উচ্চকণ্ঠে বলিল—'সোমঘোষ, তুমি কি নিতান্তই পাগল হইয়াছ? গৌড়েশ্বরের সন্দেশবহদূত কি এতই হীনবল ও কাপুরুষ যে তাহাকে তোমার পুত্রের ভয়ে এরূপ চোরের ন্যায় ব্যবহার করিতে ও ভয়ে কম্পমান হইতে হইবে? তুমি ওসব চাতুরী পরিত্যাগ কর—রাজার প্রাপ্য সমস্ত কর, এখনই সংগ্রহ করিয়া স্বয়ং আমার সহিত গৌড়ে আগমন কর, নচেৎ তোমার দুর্গতির অবধি রহিবে না। গৌড়েশ্বর তোমার কপট-ব্যবহার ও তোমার পুত্রের ঔদ্ধত্যে যে কত অসন্তুষ্ট হইয়াছেন, পত্রে তাহার কিঞ্চিত আভাষ প্রাপ্ত হইয়া থাকিবে। আমার উপদেশ গ্রহণ কর, সুপ্তসিংহকে জাগ্রত করিয়া অনর্থক বিপন্ন হইও না—রাজ-অনুগ্রহের অপব্যবহার করিয়া ধ্বংস মুখে অগ্রসর হইও না।

গঙ্গাধর ভট্টের বাক্য শেষ হইতে না হইতে, ইহাইর সমর্থে স্বীকার যাত্রা হইতে প্রত্যাবর্ত্তনের সংবাদ প্রচারিত হইল। দেখিতে দেখিতে, ইহাই গজপৃষ্ঠে আরোহণ ও মস্তকে ধবলছত্র ধারণ পূর্ব্বক বিজয়-নিশান উড্ডীন করিয়া রণ-বাদ্য সহ সসৈন্যে গড়মধ্যে প্রবেশ করিল। অনতিকাল মধ্যেই গৌড় হইতে রাজকর সংগ্রহ করিবার জন্য দূতের আগমন বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া, ইহাই একবারে জ্বলিয়া উঠিল এবং ক্রোধে কম্পান্বিত কলেবর হইয়া রাজদূতকে তাহার সমক্ষে বান্ধিয়া আনিবার জন্য আদেশ প্রদান করিল।

কোটাল, নিমেষমধ্যে রাজদূত গঙ্গাধর ভট্টকে ধরিয়া, আনিলে, ইহাই তাহাকে লক্ষ্য করিয়া বলিল—গৌড়পতি কোন ছার!—জগতে এমন কাহার সাধ্য আছে যে আমার এই'সাধের ঢেকুর বাজ্য হইতে কর সংগ্রহ করিতে সাহসী হইবে? গৌড়পতির আস্পর্দ্ধা ত কম নয়! এই কথা বলিয়া রাজদূতকে লাঞ্ছনা করিবার জন্য কোটালের প্রতি আদেশ প্রদান করিল। আজ্ঞাপ্রাপ্ত হইবামাত্র কোটাল, কেশাকর্ষণ পূর্ব্বক কীল, গুঁতাপ্রভৃতি নানাভাবে প্রহার করিয়া গঙ্গাধর ভট্টকে মর্দ্দিত ও লাঞ্ছিত করিতে লাগিল—কেশরাশি উৎপাটিত ও ছিন্ন ভিন্ন করিয়া মস্তক রক্তাপ্লুত করিয়া দিল। গঙ্গাধর ভট্ট এইরূপে যথেষ্ট রূপ প্রহৃত ও অপমানিত হইয়া প্রাণের দায়ে করজোড়ে ক্ষমাভিক্ষা করিলে, ইহাই অপমানের চরম নিদর্শন স্বরূপ, তাহার মস্তক মুণ্ডন করিয়া অব্যাহতি দিবার আদেশ প্রদান করিল—কোটাল, তাহার কেশগুচ্ছ উৎপাটিত করিয়া মস্তকে রক্তের স্রোত বহাইয়া দিল—বদনমণ্ডল ও বক্ষস্থল শোণিত ধারায় প্লাবিত হইয়া গেল।

এই সময়, সোমঘোষ দ্রুতপদে অগ্রসর হইয়া বলিল—ইহাই, ভট্টগঙ্গাধরের অপরাধ কি?—সে সন্দেশবহ মাত্র। তাহার উপর ক্রোধ করা বা তাহার লাঞ্ছনা করা নিতান্তই অসঙ্গত। গঙ্গাধর, আমার গৌড়ে অবস্থান কালের প্রতিবেশী বন্ধু। কোথায়, তোমার পিতৃবন্ধুকে পুরস্কৃত করিবে, না তৎপরিবর্ত্তে তাহাকে এরূপভাবে প্রহৃত ও লাঞ্ছিত করিতেছ—ইহা অতি লজ্জা ও কাপুরুষতার কথা'! ইহাই, পিতার এই ভৎর্সনায় লজ্জিত হইল এবং অনুতপ্ত হইয়া 'ষোড়া ষোড়া বলয় ও অনেক কণ্ঠ-হার' এবং সরবস্ত্র বা পাগড়ী উপহার প্রদান করিয়া—অব্যাহতি প্রদান করিল। গঙ্গাধর, ইহাইর কবল হইতে, মুক্তি লাভ করিয়া ঢেকুর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া আসিতে হইল।

ক্রমশঃ

রঙ্গ।

মেয়ে। মা, আমি যখন জন্মাই, তুমি তখন কোথায় ছিলে মা?

মা। আমি তোর মামার বাড়ীতে ছিলুম, হিমু।

মেয়ে। আচ্ছা, যখন শুন্‌লে যে আমি হইছি, তোমার খুব আনন্দ হ'লো? বল-না মা, খুব আনন্দ হ'লো?

উকীল। তোমার মত মক্কেল—ড্যাম্! এখানে কেন মরতে এসেছ?—জাহান্নমে যাও!

মক্কেল। আজ্ঞে, আপনাকেও ত তাহ'লে যেতে হয়—ওকালতনামা নিয়েছেন, মক্কেলের সঙ্গে যেতে হ'বে বৈ-কি!

সাহেব। তবু কিরিত্তি বের করি নি বাবা। গাছে না উঠ্‌তেই এক কাঁদি, বের কর্‌লে। আর সঙ্গে আছে—চাই কি একটা গর্ভ-নারী।

দ্বাদশ গোপাল

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পরে।)

৩

একখানা খালি ভাড়াটে গাড়ী মেলার দিকেই অগ্রসর হইতেছিল, সেখানাকে দাঁড় করাইয়া বিমান রমণীকে বলিল, উঠুন।—রমণী নিঃশব্দে উঠিয়া পড়িল; বিমান কোচবক্সে উঠিয়া আদেশ দিল—চলো, টিমান!

ভিড় হইতে কয়েকটা লোক এই পর্য্যন্ত ইহাদের অনুসরণ করিয়াছিল, ইহাদের গাড়ীতে উঠিতে দেখিয়া সুমনে ফিরিয়া যাইতে বাধ্য হইল। অনেকেই ব্যাপারটা সঠিক হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারিলেও ঐ পুরুষটির সঙ্গে রমণীর যে একটা যোগ আছে তাহা বুঝিয়া লইতে কাহারই আর একটুকু দেরি হইল না।

ওয়েটিং রুমটি খালিই ছিল, বিমান রমণীকে তাহারই মধ্যে বসিতে বলিয়া টিকিট কিনিতে গেল; ফিরিয়া জিজ্ঞাসিল—কলকাতায় আপনার বাড়ী কোথায়?

কাঠের পুরু পর্দ্দা ঘেরা কামরার মাথায় একটা গ্যাস মিট মিট করিয়া জ্বলিয়া কেমন একটা ঘোলা-ঘোলা আলো বিকীর্ণ করিতেছিল, বিমান প্রশ্ন করিয়া ভিতরের দিকে চাহিতেই বর্ষার মেঘাবৃত আকাশে চাঁদটির মত রমণীর মুখ-খানি দেখিতে পাইল। বয়স কত বুঝা গেল না, তবে বেশী নয়, নিশ্চয়। গৌরবর্ণ মুখখানি একটা স্নিগ্ধ সারল্য মণ্ডিত বলিয়াই বোধ হইল। সবার চেয়ে সুন্দর তাহার টানা টানা ভ্রূ-নিম্নে সেই বিস্তৃত নয়ন-দুটি। সে নয়ন দু'টি তুলিয়া রমণী বিহ্বল দৃষ্টিতে চাহিয়া, নিরুত্তরে বিমানকে দেখিতেছিল।

বিমান পুনশ্চ জিজ্ঞাসিল—শুনছেন? আপনার বাড়ী কোথায়।

ওঃ আপনি! তা ভেতরে আসুন-না! এখানে ত কেউ নেই।

বিমান কাঠের ঝিল-মিল আঁটা দ্বারটিতে মুখ বাড়াইয়া দাঁড়াইয়াছিল, এই কথার পরে সে কক্ষে প্রবেশ করিল, বলিল—কোথায় বাড়ী বল্লেন?

সিমলে। মধুরায়ের লেন। জানেন?

আচ্ছা...জানি সে তবে, যখন-সিমলে বল্‌ছেন, খুঁজে নিতে পারব।

যাবেন না, দাঁড়ান—বলিয়া রমণী নতমুখে উঠিয়া দাঁড়াইল; সিল্কের চাদরের প্রান্তটুকু দু'হাতের মুঠির মধ্যে জড়াইতে জড়াইতে জিজ্ঞাসিল—আপনার বাড়ী কি কলকাতাতেই?

হাঁ।

কলকাতা ফেরবার শেষ গাড়ী কখন?

শেষ গাড়ী! তা তো জানি-নে। এখনি মিনিট দশেকের মধ্যে ডাউন ব্যাণ্ডেল লোকাল আছে সেইটে-তেই যাওয়া যাবে, টিকিট ও দু'খানা কিনে এনেছি।

রমণী নীরব, নতনেত্র।

বিমান এক মিনিট অপেক্ষা করিয়া বলিল—এ-ট্রেণে যেতে আপনার আপত্তি আছে নাকি? রমণী কথা কহিল না, যেমন দু'হাতের মধ্যে চাদর খুঁটিতেছিল, তেমনি খুঁটিতে লাগিল। বিমানের বুঝিতে বাকী রহিল না যে রমণী তাহার নিরুদ্দিষ্ট সঙ্গীর প্রতীক্ষা করিতে চাহে। বলিল—আপনি শেষ ট্রেণ পর্য্যন্ত অপেক্ষা করতে চান?

এইবার সে মুখ তুলিল। ভারাক্রান্ত নেত্রদ্বয় এক নিমিষের জন্য বিমানের মুখের পরে স্থাপিত করিয়া, তখনই নমিত করিয়া লইল।

বিমান বলিল—বেশ তাই। থেকেই যান!

বিস্মিত দৃষ্টি তুলিয়া রমণী ব্যাকুল-কণ্ঠে কহিল—আপনি?

আমিও—বাধ্য হ'য়ে আছি। ইত্যবসরে আপনার সঙ্গী এসে পড়েন ভাল, নইলে অপেনাকে বাড়ী পৌঁছে দেব'খন।

রমণীর মুখে চোখে কৃতজ্ঞতা যেন উথলিয়া উঠিল।

বিমান বলিল—আচ্ছা, আপনি বসুন তবে, আমি বাইরে আছি।

সে বাহিরে যাইতেছিল, রমণী আর্ত্তস্বরে বলিল—একটু জল পাওয়া যেতে পারে?

পারে—বৈ-কি, যাবেন? একটু বসুন, আনি।

জল কোথাও পাওয়া গেল না। ষ্টেশনের কলসীতে যদিও বা জল আছে জানা গেল গেলাস মিলিল না। ষ্টেশনের ছোট-বাবু ও তাঁহার অপরিচিত ব্যক্তিকে

সেলাম ছাড়িয়া দেওয়া দূরের কথা, মুখের কথাই কহিলেন না। একটা হিন্দুস্থানী বালক বাল্‌তীতে গরম দুধ লইয়া যাত্রী-বারান্দায় ঘুরিতেছিল, বিমান তাহাকেই বখ্‌শিসের প্রলোভন দেখাইয়া ষ্টেশনে আনিল। রমণী দ্বারটি খুলিয়া প্ল্যাটফরমেই দিকেই চাহিয়া দাঁড়াইয়াছিল, বিমানকে শূন্যহস্তে ফিরিয়া আসিতে দেখিয়া শুষ্ককণ্ঠে কহিল—পেলেন না?

না। ঘুরে বেড়ে পারলে দোতা লেমনেড হয়ত পাওয়া যায়—সে পরে দেখ্‌ছি। আপনি ততক্ষণ একটু গরম দুধ খেয়ে ফেলুন।

রমণী হাসিয়া ফেলিল। মৌক্তি বিনিন্দিত শুভ্র কুসুম যেন কৌমুদী-দর্শনে প্রকাশ হইয়া পড়িল। হাসিতে হাসিতে বলিল—দুধ?

বিমান হাসির অর্থ বুঝিতে না পারিয়া আশ্চর্য্যস্বরে বলিল—কেন, দোষ কি তাতে?

না; দোষ আর কি! কথাটা বলিয়া সে গম্ভীর হইতে গেল বটে, কিন্তু উচ্ছলিত হাসিতে মুখটি তখনও রাঙাইয়া রহিল।

বিমান বলিল—দোষ নেই যদি, তবে এত হাস্‌ছেন যে! নিশ্চয়ই দুধ খেতে আপনার আপত্য আছে। কিসের আপত্য বলুন ত?

আমি কি কচি খুকী—যে ভেটা পেয়েছে বলে দুধ খেতে হবে!

এই কথা!

নয়?

তা হোক্ গে—খান্। দুধ কচি খুকীরিই খাদ্য নয়, খুকীর মা-ঠাকুমারাও খেয়ে থাকেন। না খান্—ওকে বিদেয় করে দিই। এই ছোকরা, দেখো, এই সিকিটা নেও বাবা, যাও...

রমণী বলিল—না। ফিরে বলুন।

ছোকরার বাল্‌তীর মধ্যে পিতলের গেলাস ছিল; গেলাস দুধ পূর্ণ করিয়া সে বিমানের দিকেই অগ্রসর করিয়া দিতেই, বিমান গেলাসটি রমণীর হাতে দিয়া বলিল —খেয়ে ফেলুন।

রমণী গেলাস-টি লইল বটে, কিন্তু খাইল না—ধীরে ধীরে বিমানের সামনে ধরিয়া বলিল—আপনি একটু খাবেন না?

আমি? না, না, আমি দুধ...

রমণী হাসিল, বলিল—কচি খুকীর মা ঠাকুমারা দুধ খায়, তাদের বাপ ঠাকুরদারা খান না বুঝি?...বেশ শাস্তর ত!

আচ্ছা, আচ্ছা,-আমিও না-হয় একটু...

না-হয় নয়, আগে খান্!

কয়েকটা লোক খোলা দ্বার পথে এইদিকেই শঙ্কিত দৃষ্টি ফেলিয়া দাঁড়াইয়া গিয়াছিল, হঠাৎ সেদিকে নজর পড়ায় বিমান ক্ষিপ্রহস্তে গেলাসটি লইয়া এক চুমুকে নিঃশেষ করিয়াই ছোকরাকে দিতেছিল, রমণী বলিল —আমাকে দিন...

ধুয়ে...

দিন্-না।

গাড়ী আসিয়া পড়িল, বিমান জিজ্ঞাসিল—এ ষ্টেশ তা'লে নয়?

না।

বেশ। এইবার একটু জলের চেষ্টা দেখি।

আর তার দরকার নেই।

দরকার নেই কেন?

আপনাকে আর কত কষ্ট দেব বলুন?

ও-হ্! কষ্টের ত সীমা নেই।—বলিয়া বিমান বাহির হইয়া গেল।

বাহিরে আসিতেই সত্যরঞ্জন খপ্ করিয়া তাহার হাতটি ধরিয়া বলিল—ও বাবা! ঘরের মধ্যে কি তুমিই ছিলে?

বিমান মুখে কোন উত্তর দিল না বটে, কিন্তু কথাটা সে মানিয়া লইল।

সত্যরঞ্জন ও-দিকে উঁকি মারিতে মারিতে বলিল—তুমিই তাহলে টেনে এনেছ?

তার মানে?

ভিড়ের মধ্যে থেকে একজন-কে ওর হাত ধরে টেনে এনেছিল বটে, তার মুখ আমরা তখন দেখ্‌তে পাই-নি। সে তাহ'লে তুমিই?

হ্যাঁ।—তাহাকে চলিতে উদ্যত দেখিয়া, সত্যরঞ্জন জিজ্ঞাসিল—কোথা যাচ্ছ?

একটু জলের চেষ্টায়, ভেটা পেয়েছে বল্‌ছে।

সত্যরঞ্জন দুই মুহূর্ত্ত বিস্মিত দৃষ্টিতে বিমানের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল, তারপর বলিল—চেনা শুনো?

না!—সে চলিয়া গেল।

পাঁচমিনিটের মধ্যেই গেলাস হাতে ফিরিয়া আসিল। অজিত, গদারামকে লইয়া গ্রাউণ্ডরুমের সিঁড়ির কাছেই দাঁড়াইয়াছিল, বিমানকে দেখিয়া বলিয়া উঠিল—ওতে কি দাদা?

বরফ জল রে!

.....রমণী জলের গেলাস হাতে লইয়া কৃতজ্ঞ স্বরে কহিল—আপনাকে কত কষ্ট দিলুম।

বিমান হাসিয়া বলিল—তা একটু দিলেন বৈ-কি। নিন্, একটু খেয়ে গেলাসটি আমায় দিন, দিয়ে আসি—কষ্ট করে আমিও একটু খেয়ে আসি, টাকা জমা দিয়ে তবে গেলাস এনেছি।...আপনার সঙ্গী এলো?

সঙ্গী! কৈ-না! এখন—এখন ত আপনিই আমার সঙ্গী—বলিয়া আরক্ত মুখখানি নামাইয়া লইল।

দিয়ে আসি এটা।

সত্যরঞ্জন তখনও দ্বারের পার্শ্বটিতে দাঁড়াইয়া ছিল, বিমান বাহিরে আসিতেই বলিল—কি ব্যাপার বাবা? বেশ ত জমিয়ে ফেলেছ দেখ্‌তে পাই···

তাহার মুখের বক্র হাসিতে, বিশেষ করিয়া এই কুৎসিত ব্যঙ্গ পূর্ণ কথায় ভবিষ্যৎ বিমান অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছিল, কি-একটা উত্তর দিবার জন্য হাঁ করিয়াছে, সত্যরঞ্জন পুনশ্চ বলিল—মিনিমাটে মন্দ নয়,—বে-শ!

বিমান হঠাৎ এ দিকে ফিরিয়া সত্যরঞ্জনের দিকে চাহিবে, মধ্যপথে তাহার দৃষ্টি শুদ্ধ স্থির হইয়া গেল। রমণী দ্বারটি ঈষৎ ফাঁক করিয়া এদিকে চাহিয়াই দাঁড়াইয়াছিল। সে-যে সত্যরঞ্জনের অভদ্র ইঙ্গিতটা শুনিতে পাইয়াছে, তাহার শুষ্ক পাণ্ডু মুখের ভাবে বিমানের তাহা বুঝিতে বাকী রহিল না। দৃষ্টি মিলিত হইবামাত্র রমণী দ্বার ছাড়িয়া সরিয়া গেল বটে কিন্তু বিমানের লজ্জা রাখিবার স্থান ছিল না।

সে সত্যরঞ্জনের হাতটা ছাড়াইয়া দূরে চলিয়া গেল।

সত্যরঞ্জন বলিল—অনেক রকমই দেখালে বাবা!—এ কথা বিমানের কাণে গেল না, সে তখন অনেকদূর চলিয়া গিয়াছিল।

নৌকায় যে ঘটনা আসন্ন কয়ঘণ্টা আগেই ঘটিয়া গিয়াছে, সত্যরঞ্জন তাহা ভুলিতে পারে নাই, অজিতকে এখনকার ঘটনাটি দেখাইয়া দিতে, তাহারই সন্ধানে গ্রাউণ্ডরুমের উপর ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। ক্রমশঃ

দেশ বিদেশ।

একবার একজন লোকের বাড়ী ডাকাতের চিঠি আসে। লোকটি থানায় গিয়া দারোগা বাবুর কাছে কাঁদিয়া পড়ায় দারোগা বাবু অভয় দিয়া বলেন—ডাকাত লোক্ কত আসেছে? লোকটি চিঠি দেখাইয়া বলিল আজ, হুজুর! হুজুরাদি বলিলেন—ও ঠিক হ্যায়, তোম যাও, হাম্ কাল দুপুরকো হাজির হোঙ্গে। আজ্ঞি ওরসে তয়ত হোগা।—এটা গল্প কথা হওয়াই সম্ভব, কিন্তু এমন কতকগুলি ঘটনা ঘটিতেছে যাহাতে এগুলোকে সত্য বলে করাও আশ্চর্য্য নয়। আমরা দৈনিক "অমৃতবাজার" হইতে উদ্ধৃত করিতেছি, পাঠক পাঠিকা নিজেরাই বুঝিতে পারিবেন।

• • • •

দেশ-প্রসূন স্বাস্থ্য—ব্যবস্থাপক সভার শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রলাল খাঁ প্রশ্ন করেন, শ্রীযুত দি, আর দাশের চিকিৎসক কবে তাঁহার জন্য পাখার ব্যবস্থা করেন, কবে উহা মঞ্জুর করা হয় এবং কবেই বা তাঁহার পাখার বন্দোবস্ত করা হয়? ইহার উত্তরে মাননীয় সার আবদুর রহিম বলেন যে, দেশবন্ধুর চিকিৎসক ২২শে মার্চ্চ তারিখে পাখার ব্যবস্থা করেন, ৩১শে মার্চ্চ তারিখে কর্ত্তৃপক্ষ পাখার বন্দোবস্ত করিবার জন্য আদেশ দেন, আর ১১ই এপ্রিল পাখার বন্দোবস্ত করা হয়। দেশবন্ধু হাসপাতালে আসার পরই পাখার ব্যবস্থা হয়। কিন্তু ব্যবস্থা হইবার ১১দিন পরে কর্ত্তৃপক্ষের আদেশ হয়, এবং ২২ দিন পরে পাখার বন্দোবস্ত করা হয়। কি চমৎকার ব্যবস্থা! দেশবন্ধুর ন্যায় রাজনৈতিক বন্দীর বেলায়ও যদি এইরূপ ব্যবস্থা হয় তাহা হইলে বাঙ্গালার জেলে চুনো পুঁটির পক্ষে কিরূপ ব্যবস্থা হয় তাহা সকলেই অনুমেয়।

•

পাখার দাম এবং উহা খাটাইবার যে ব্যয় তাহা দেশবন্ধুকে দিতে হইবে। তবে মুক্তির পরে পাখাখানা তিনি বাড়ীতে লইয়া যাইতে পারিবেন। অন্য কোন সভ্য দেশের জেলে এইরূপ ব্যবস্থা আছে কিনা তাহা আমাদের জানা নাই।

• • • •

কৌন্সিলে লম্বা লম্বা বক্তৃতা করিয়া যে সব মহাপুরুষ দেশবাসীর কল্যাণ সাধনে নিযুক্ত আছেন, খবর পাওয়া গেল, তাঁহাদের পাখের, ভাতা প্রভৃতিতে মোট বছরে ন্যূনাধিক দুই লক্ষ টাকা ব্যয়িত হইয়াছে। চমৎকার! এমন না হইলে কল্যাণকামনা? এমন না হইলে দেশ-হিতকারী? যাহাদের উদরে অন্ন নাই, দেহে কৌপিন সার, দুঃখের তাড়নে যাহারা জীবন্মৃত, তাহাদেরই অর্থ দ্বারা কৌন্সিলের মহামহোপাধ্যায়গণের মোটর গাড়ীর খরচা, রেলভাড়া, ষ্টীমলঞ্চের হোটেল ব্যয় সবই চলিতেছে! দরিদ্র চিরদিনই পিতৃ-মাতৃহীন, পরার্থেই জীবন তাহাদের! তাহাদের অর্থের এমন সদ্ব্যয় হইবে না ত কি হইবে?

• • • •

দুঃখ ছিল না যদি জানিতাম, মহাত্মারা মনে মনে এই যে দেশবাসীর রক্ত শোষণ করিয়া মোটর চড়িয়াছেন, হাওয়া খাইয়াছেন,—খানা খাইয়াছেন, এবং খানা দিয়াছেন—সেই দেশবাসীর কতটা কাজ কৌন্সিলে তাঁহারা করিতে পারিয়াছেন বা তাহার চেষ্টা করিয়াছেন। এই দেড় বৎসরের কার্য্য বিবরণী নিশ্চয়ই গবর্ণমেণ্টের হাতে অর্পিত আছে, তাঁহারা কি সেগুলিকে প্রকাশ করিতে পারেন? দ্বারা আমরা বুঝিতে পারি কোন্ সভ্য কতখানি কাজ করিয়াছেন। এবং দেশবাসীর বুকের রক্ত জল করা পয়সা গ্রহণ করার বাস্তবিক কাহার অধিকার কতখানি আছে। গবর্ণমেণ্ট না বলুন, সভ্যগণের মধ্যে এমন সৎ-সাহসী লোকের অভাব নাই বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস যিনি বুকে হাত দিয়া বলিতে পারেন, তাঁহার দ্বারা এতটুকু কাজ-ও, একবিন্দু উপকারও তাঁহার দেশের লোকে পাইয়াছে। এ কথা শুনিলে, কোন লোকই থাকিতে না।

এ কথা শুনিবার আশায় রহিলাম। শুনিতে চাই, এ অর্থ গ্রহণ করার অধিকার তাঁহার ছিল। ইহা অত্যাচার বা অপচয় নয়।

মহাত্মা মণিলাল শ্রেষ্ঠীয়া 'শেঠ বিহারীলাল তাঁর বাবতীয় ধন-সম্পত্তি জাতীয় শিক্ষার উন্নতিকল্পে উৎসর্গ করিয়াছেন। পণ্ডিত মালবা, হাকিম আজমল ও ডাক্তার আনসারি এই সমস্ত সম্পত্তির অছি নিযুক্ত হইয়াছেন। সম্পত্তির আয় ন্যূনাধিক একলক্ষ টাকা।

• • • •

বিলাতে একটি স্থায়ী ভারতীয় রঙ্গমঞ্চ খুলিবার চেষ্টা চলিতেছে। শ্রীযুক্ত নীরেন্দ্রনাথ দে এই রঙ্গমঞ্চ পরিচালনের ভার পাইয়াছেন।

• • • •

গত প্রবেশিকা পরীক্ষায় ১৯১৩টি ছাত্র অবতীর্ণ হইয়াছিল, তন্মধ্যে ৬৮১১ জন মুসলমান ছাত্র ছিল। এই ৬৮১১ জনের মধ্যে ৬৩৭১ জন ছেলে বাংলাকেই মাতৃভাষা-রূপে বরণ করিয়া লইয়া, বাংলাতেই পরীক্ষা দিয়াছিল; এ ছাড়া ৩৭২টি ছাত্র উর্দ্দু, ৪৮টি—আসামী ও ১টি হিব্রু ১টি গুজরাটী ভাষায় পরীক্ষা দেয়। মুসলমানদের কাছে বাংলা মাতৃভাষা কি না, ইহা হইতেই বুঝিতে পারা যাইবে।

• • • •

জুলাই মাসের ১৫ই তারিখ পর্য্যন্ত কোলার স্বর্ণ-খনি হইতে ৯০০২৯২ টাকা মূল্যের সোণা উঠিয়াছিল, সমস্তই বোম্বে ট্যাকশালে গিয়াছে।

• • • •

দুইটি রেল কোম্পানীর এক সপ্তাহের আয়ের হিসাব—

ইষ্টার্ণ বেঙ্গল রেলওয়ে—

১লা হইতে ৮ই জুলাই (১৯২২) ৮:২৯৪০৲

ঐ.....(১৯২১) ৮২৬০৩৲

ইষ্ট-ইণ্ডিয়ান রেলওয়ে—

১লা হইতে ৮ই জুলাই (১৯২২) ২৯০১৮৪৲

ঐ..... ...(১৯২১) ২৯০৪০৩৲

• • • •

খবর পাওয়া যাইতেছে, রেলেপাটার ডাকাতীর ঘুর পড়িয়া গিয়াছে। একজন মুন্সেফী বরকন্দাজ ডাকাতের হাতে মার খাইয়া হাসপাতালে প্রাণত্যাগ করিয়াছে; একটা সোণার আংটির জন্য এক বাঙ্গালী ভদ্রলোকের তিনটা আঙ্গুলই কাটিয়া লইয়াছে। এই ভদ্রলোকটীও হাসপাতালে পড়িয়া আছেন। রেলেপাটার পথিকগণকে সাবধানে থাকিতে বলাই বোধ করি সুযুক্তি, পুলিশের ভরসা—ভীরে ছুরী।

• • • •

সুবিখ্যাত কাঁচি ও অন্যান্য সিগারেট-ওলা এইচ, এইচ উইলস্-মহাশয়ের মৃত্যু হইয়াছে। ইহাদের সঞ্চিত টাকার পরিমাণ—১৯১৭৩৯২৩০৲ টাকা। সিগারেট বেচে এত পয়সা আর কারুর ভাগ্যেই হয় নি।

পৃথিবীর মধ্যে সব চেয়ে ধনী লোক হ'চ্ছেন মিঃ হেন্‌রী ফোর্ড! ইনিই 'ফোর্ড' (Ford) মোটরকারের আবিষ্কারক ও স্বত্বাধিকারী।

ভারতের এককালের ভাগ্যবিধাতা, বঙ্গচ্ছেদকারী লর্ড কর্জ্জনের অনিদ্রায় অসুখ হইয়াছে। চোখে নিদ্রা নাই। আহা, লর্ড সাহেবটি বড়ই কাতর হ'য়ে পড়েছেন। কিন্তু এমনটা যে হইবে তা তাঁর আগেই জানা উচিত ছিল। অনেকের মনের শান্তি, চোখের ঘুম তিনি এককালে ঘুচিয়েছিলেন, আজ যদি মানুষের অদৃষ্ট বিধাতা তাঁকে সেই সুখেরই একটি কণা অনুভব করাবার চেষ্টা করেন, অন্যায় হ'বে কি?

ঘোষ সাহেব। এটা কিন্তু তোমার অন্যায় হে! গরদের পাঞ্জাবী, বিলিতি ষ্টিক, পাস্‌-নে চশমা পরে এই' স্বদেশীর দিনে কি আর তোমাদের বেড়ানো ভাল দেখায় হে?

সুরেশ। আজ্ঞে না, কালই ঐ-রকম একটা স্বদেশী পোষাকের অর্ডার দিয়ে আস্‌বো। তা হ'লে আর দোষ থাক্‌বে না ত—কি বলেন?

বাসন্তীর নিয়মাবলী।

বাসন্তী প্রতি সপ্তাহের শনিবারে প্রকাশিত হয়। মোট আটচল্লিশ সংখ্যা পত্রিকায় বাসন্তীর বৎসর পূর্ণ হইবে।

মফঃস্বলের গ্রাহকগণের

পত্রিকা শনিবারের ভিতরেই ডাকে দেওয়া হয়, সুতরাং খুব দেরী হইলেও সোমবারের ভিতরেই সকলে বাসন্তী পাইবেন।

অপ্রাপ্ত সংখ্যা।

যদি কোন গ্রাহক সোমবার সন্ধ্যার ভিতরেও পত্রিকা না পান, তবে মঙ্গলবার ডাকের পূর্ব্বেই আমাদিগকে লিখিবেন। মোট কথা—বৃহস্পতিবারের ভিতরে সংবাদ না পাইলে আমরা দ্বিতীয়বার সেই সংখ্যার পত্রিকা দিতে পারিব না। যদি কেহ পরে সংবাদ দেন তাহা হইলে সেই সংখ্যা মূল্য দিয়া কিনিয়া লইতে হইবে।

পত্রোত্তর

কাহারও কোন বিষয় জিজ্ঞাস্য থাকিলে তাঁহাকে রিপ্লাই কার্ডে কিম্বা ৵০ আনার টিকিট সহ পত্র লিখিতে হইবে নচেৎ কোন পত্রেরই উত্তর দেওয়া হয় না।

গ্রাহক-নম্বর ও ঠিকানা।

গ্রাহকগণ যে কোন কারণেই পত্র লিখুন, সকল পত্রেই তাঁহাদের গ্রাহক-নম্বর ও নাম ধাম স্পষ্ট করিয়া লিখিতে হইবে। গ্রাহক-নম্বর না থাকিলে কিম্বা নাম ঠিকানা খুব স্পষ্ট করিয়া না লিখিলে সে পত্রে কোন জবাব হয় না।

লেখকগণের প্রতি

সকল লেখকের লেখাই সাদরে গৃহীত হইবে। কিন্তু প্রবন্ধ বাসন্তীর দুই পৃষ্ঠার অধিক এবং গল্প চার পৃষ্ঠার অধিক হইলে চলিবে না। এবং কোন লেখাতেই ব্যক্তিগত কুৎসা কিম্বা সাম্প্রদায়িক নিন্দাবাদ থাকিলে গৃহীত হইবে না। কেহ অন্যূন তিনমাস কাল নিয়মিত ভাবে লিখিলে প্রতি সপ্তাহে ১সংখ্যা করিয়া পত্রিকা বিনামূল্যে পাইবেন।

সংবাদ দাতাগণের প্রতি

মফঃস্বলের সংবাদ দাতাগণ নূতন এবং প্রয়োজনীয় সংবাদ পাঠাইলে বাসন্তীতে সাদরে প্রকাশিত হইবে। নিয়মিত সংবাদ দাতাগণ ১সংখ্যা করিয়া পত্রিকা বিনামূল্যে পাইবেন। তদ্ভিন্ন—সংবাদের সহিত যাঁহারা ফটোগ্রাফ পাঠাইবেন তাঁহারা অন্য প্রকারে পুরস্কৃত হইবেন।

মূল্যের কথা

বাসন্তীর বার্ষিক মূল্য ডাকমাশুল সহ ৬৲ টাকা, ষাণ্মাসিক মূল্য ৩৲ অগ্রিম দেয় দিতে হইবে। ৬মাসের কম গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত করা হয় না। বিনামূল্যে নমুনা দেওয়া হয় না, তিন আনার ডাকটিকিট পাঠাইলে নমুনা সংখ্যা পাঠান হয়।

টাকাকড়ি পরিচালকের নামে ও প্রবন্ধাদি সম্পাদকের নামে পাঠাইতে হইবে।

পরিচালক—শ্রীসতীশচন্দ্র মিত্র
লক্ষ্মীবিলাস হাউস্—১৪ নং জগন্নাথদত্তের লেন,
গড়পার, কলিকাতা।

লক্ষ্মীবিলাস কলার ষ্টুডিও
এণ্ড
প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্।

১৪ নং জগন্নাথ দত্তের লেন (গড়পার) কলিকাতা।

আমাদের হাফটোন ডিপার্টমেণ্ট হইতে রঙ্গিন, একরঙ্গা হাফটোন ব্লক, লাইন ব্লক প্রভৃতি অতি সত্বর ও সুন্দররূপে প্রস্তুত হয়। আমাদের এরূপ বন্দোবস্ত আছে যে, আবশ্যক হইলে আমরা এক দিনের মধ্যেই আপনার ইচ্ছামত ব্লক প্রস্তুত করিয়া দিতে পারি, দরও সুলভ।

আমাদের প্রেসে বাংলা, ইংরাজী, নাগরী সর্ব্বপ্রকার পুস্তক ও জবের কাজ সত্বর ও সুন্দররূপে সম্পন্ন হয়। মফঃস্বলের কাজ ঠিক নিয়মিত সময়ে সরবরাহ করিয়া থাকি। অন্যস্থানে কাজ দিবার পূর্ব্বে একবার আমাদের পরীক্ষা করিলে সত্যাসত্য বুঝিতে পারিবেন।

Printed by B. K. Das. at the Lakshmibilas Colour Studio & Printing works.
14 Jagannath Datta Street, Calcutta.

"ঘরে গুরুজন, ননদী দারুণ
বিলম্বে বাহির হৈনু
আধা মরি মরি সঙ্কেত করিয়া
কতনা যাতনা দিনু।"

শিল্পী—শ্রীভবানীচরণ লাহা

Lakshmibilas Press.

সচিত্র সাপ্তাহিক পত্রিকা

বাসন্তী

নব পর্য্যায়।

প্রথম বর্ষ] ১৩ই শ্রাবণ, শনিবার, ১৩২৯। [চতুর্থ সংখ্যা

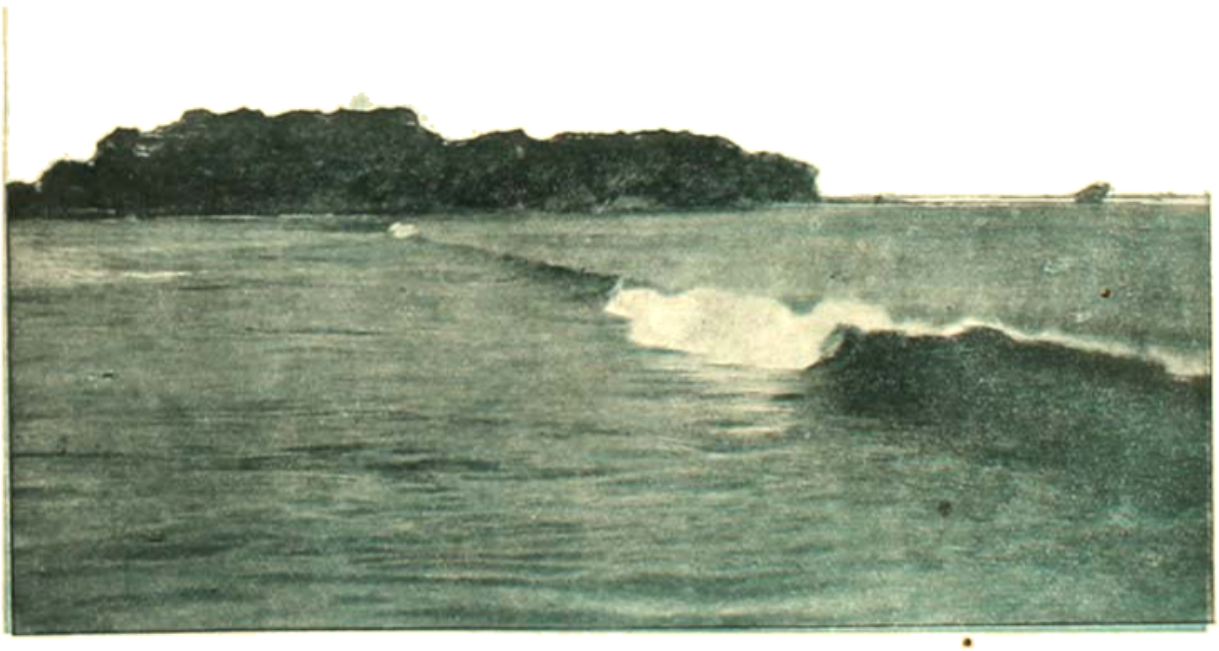

বান ডেকেছে—

Lakshmibilas Press.

মনস্কুন ! মনস্কুন !

[মনস্কক্ষুণ্ণ]

(শ্রীবিজয়রত্ন মজুমদার কল্পিত ও শ্রীবিনয়কৃষ্ণ বসু কর্তৃক চিত্রিত)

ছলাল।—বেশে কে তোর সোনা-চুরি ?
বলে চাপা কে রয়—যেই
হোকনারে অমনি।

(স্ত্রীকে) কি বল্লি, ফিরিবে ?
তোর চাবা ? তুই রোজগার
করিস্ ?

ছলাল। (আফিসের বেহারাকে) রেখো,
সাহেব ঢুক্তে যে দু' হেও, হিঁহাই ভাত।
চাষার বাঁধাকপি হাম খতো হায়...বুঝা ?

('ওলী'র দারকে) আর আর একটি
পলো ছুড় রাখব না ! আজ
শালার বেরের ওষ্টির...

(সদর্পে ঘোষণা) কলিয়াগি যাই
শালার অমুই ! সেই মোরাই গাল
গালের...

(রাস্তার কলে ক্ষুধা ও তৃষ্ণা মিটাইবার
চেষ্টা করিতেছে) ছল্-শালার কলে—
এক ফোঁটা জল-ও নেই যে !...

('ওলী'র দার সম্মুখে নতজানু হইয়া)
একটিবার, একটিবার শুধু চেয়ের
দেখা...উঃ, প্রাণ বেরিয়ে গেল...
একটিবার !...

(স্ত্রীকে) এই অড়হরে ডাল খাওয়া
যায় ? আঃ তোর মেয়েমানুষের
বিদ্যুচি করেছে...

(পরদিন প্রভাতে) দর আলা মোজোর
ফলী ! দাঁড়াও-না, শনিবার-টা
আসুক একবার, আলা R.C.T.
Co—ডুবে যে—

১৯২২ সালের জানুয়ারী মাসে ভারতে ৩২২৩৬৮৫০ টাকা মূল্যের বিদেশীয় কলকব্জা আমদানী হইয়াছে। ভারত হইতে কলকব্জার জন্য এই যে বিপুল কোটী কোটী অর্থ বিদেশে গিয়াছে ইহার মধ্যে গ্রেট বৃটেন পাইয়াছে ১৭৯৫৩৮৫৭ টাকা, জার্ম্মেনী পাইয়াছে ৩৫৯৮৯০ টাকা, আমেরিকা পাইয়াছে ৫৪০২০২৮ টাকা। ভারত হইতে নানা ভাবে বহু অর্থ বিদেশে চলিয়া যাইতেছে। ভারতে লৌহের অভাব নাই, বহু ভারতীয় যুবক বৎসর বৎসর বিদেশ হইতে নানা শিল্পশিক্ষা করিয়া আসিতেছেন। তবু ভারত এই সব কলকব্জার জন্য এত অর্থ বিদেশকে দেয় কেন?

• • • •

জার্ম্মেন যুদ্ধের ক্ষতি অবসান হইয়াছে। কিন্তু এখন জার্ম্মেন কর্ম্মকুশলতার ভিত্তিতে সমগ্র জগতের শক্তিসঙ্ঘ বিশেষ ত্রস্ত হইয়া উঠিয়াছেন। জার্ম্মেনীতে এখন বেকার নিষ্কর্ম্মা লোক একটিও নাই—সব কার্য্যে লিপ্ত। দ্রুত করিয়া জার্ম্মেন বাণিজ্য ত্রুটী জগত ছাইয়া ফেলিতেছে। কোন মতেই আর ইহাদিগকে দমন করিবার আশা নাই। তাই মিত্র শক্তিবর্গ চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছেন।

• • • •

আমেরিকার ছায়াচিত্র (বায়স্কোপ) সমিতির সম্পাদক ও থিয়েটারের মালিক মিষ্টার হুবেনস্ ইউরোপের সমগ্র প্রদেশের ফিল্ম কোম্পানীগুলি পরিদর্শন করিয়া বেড়াইতেছেন। তিনি বলিতেছেন জার্ম্মেনী ইংলণ্ড ও আমেরিকা অপেক্ষা অনেক কম খরচে ফিল্ম বাহির করিতেছে। এখনও যদি আমেরিকা ও ইংলণ্ড এ বিষয়ে সতর্ক না হয় তবে ফিল্মে তাহাদের প্রাধান্য আর বজায় থাকিবে না। জার্ম্মেনী আজকাল সব বিষয়েই উন্নতি করিয়া চলিয়াছে। কি ভাবে আমেরিকা ও ইংলণ্ড নিজ নিজ প্রাধান্য রক্ষা করিতে পারে এ সম্বন্ধে হুবেনস্ বলিতেছেন আমাদিগের সব দিক হইতে ফিল্ম প্রস্তুতের খরচ কমাইয়া ফেলিতে হইবে। ফিল্ম অভিনেতাদিগের সহিত সহযোগীতায় এই কার্য্য করিতে হইবে, তাহাদিগকে অল্প মাহিনা লওয়ার জন্য অনুরোধ করা হইবে। জার্ম্মেন ফিল্ম বলিয়া বিদেশে লোকে তাহা দেখিতে আপত্তি করিবে কি না জানিতে চাহিলে হুবেনস্ বলেন, বিন্দুমাত্রও না। যে ফিল্ম ভাল লাগিবে লোকে তাহাই দেখিবে, তাহারা আমেরিকা, ইংলণ্ড কি জার্ম্মেনী বলিয়া গ্রাহ্য করে না।

• • •

[redacted]র নারী ডাক্তার মীনা ক্রমেভিচ পি-এইচ-ডি ভারত শিল্প সম্বন্ধে কয়েকটি বক্তৃতা করিবার জন্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক হাজার টাকা সম্মান মাহিয়ানায় নিযুক্ত হইয়াছেন। ভারতশিল্প সম্বন্ধে ইনি যাহা বুঝিয়াছেন তাহাই ভারতবাসীকে শুনাইবেন, সেইজন্যই কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এই বিদেশিনীকে এই সম্মান ও অর্থদান করিতেছেন। মহিলাটি স্বদেশ হইতে আসিয়া রবীন্দ্রনাথের শান্তি নিকেতনে ডাক্তার সিলভ্যান লেভির সহিত বাস করিতেছিলেন। প্রচণ্ড অর্থাভাবে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় রিচ্, নির্য্যাতিত। এভাবে এখন ভারতীয় শিল্পকলায় বিদেশীয় ব্যাখ্যা শুনিবার জন্য বিশ্ববিদ্যালয় যে কি করিয়া এতগুলি অর্থ ব্যয় করিবেন তাহা ভাবিয়া বিস্ময় আসে। এ তত্ত্ব শুনাইবার জন্য দেশে কি কোন নর বা নারী নাই?

• • • •

বলশেভিক নেতা লেনিনের মৃত্যু সংবাদ আমরা বিলাতের তারের খবরে পূর্ব্বে বার কত পাইয়াছিলাম, কখনও বা খবর পাইলাম লেনিন মর মর—কখনও বা এই মরেন—এই মরেন,—তারপর শুনিলাম যদিও নেতা লেনিন এখনও মরেন নাই, তবে তাঁহাকে বিষপ্রয়োগ করা হইয়াছে, জীবনের আশা বিন্দু মাত্রও আশা নাই। আবার শুনিলাম অদের কোথায় তাঁর একটা গুলি বিঁধিয়াছে—সেই গুলি কাটিয়া বাহির করিতেই তাহার জীবনান্তের সম্ভাবনা আসিয়াছে,—ইত্যাদি। এইরূপ ভাবের—খবর রয়টারের মারফতে সপ্তাহে দুই তিনবার নানা রূপান্তরিত আকারে আসিতেছিল। তারপর হঠাৎ আবার সেদিন সংবাদ আসিল,—না এবার নেতা লেনিন সত্য সত্যই মরিয়াছেন। তাহাতে বাঁচা গেল। তারপর দু'দিন যাইতে না যাইতেই আবার খবর আসিল "বলশেভিক নেতা লেনিনকে বিষ প্রয়োগে হত্যা করা হইয়াছে বলিয়া যে খবর রটিয়াছে তাহা মিথ্যা!" নেতা লেনিনকে লইয়া বিলাতী খবরের কাগজগুলো এমন রঙ্গ করিতেছে কেন—এবং রয়টারের-ই বা এত বার তারে এই খবর কোন্ উদ্দেশে মাটি করিতেছেন তাহা আমরা বুঝিতে পারি না।

• • • •

কলিকাতা কর্পোরেশন নারীদের ভোট দিবার অধিকার প্রদান করিলেন। বাংলাদেশ নারীদের কর্পোরেশনে ভোট দানের অধিকার দিবার পূর্ব্বেই বোম্বাই ও মাদ্রাজ শুধাকার মেয়েদের এ অধিকার প্রদান করিয়াছে। দু'একজন কর্পোরেশনের পুরুষ সভ্যের ক্ষীণ আপত্তি

•

উঠিলেও অধিকাংশে সভ্যের মতানুসারে প্রস্তাব কর্পোরেশন সভায় গ্রাহ্য হইয়াছে। নূতন অধিকার দেশের পুরুষ বা নারী পাইলে তাহাতে দেশের উন্নতি ও দেশবাসীর যোগ্যতা বাড়ে বই কিছু কমে না। নারীরা যদি এই অধিকার বুঝিয়া সে ক্ষমতার সদ্ব্যবহার করিতে পারেন তাহা হইলে কলিকাতার নারী ও শিশুদের অকাল মৃত্যু বহু কমিতে পারিবে। যোগ্যতার পরিচয় দিয়া নারীরা দেশবাসীকে উন্নত করুন।

• • • •

কলিকাতার ট্রামওয়ে কোম্পানী যাত্রীদের ভাড়া ক্রমাগত বৃদ্ধি করিয়া যাইতেছে। পাঁচ পয়সার টিকিট এখন একেবারে লোপ পাইয়াছে। বেশ কথা। আমরা এ সম্বন্ধে কয়েকটা কথা জিজ্ঞাসা করিব। ট্রামওয়ে কোম্পানী কোন অনুপাতে উত্তরোত্তর এভাবে ভাড়া বৃদ্ধি করিয়া যাইতেছেন? ভাড়া বৃদ্ধির জন্য লোকজনের চলাফেরার কি পরিমাণ সুব্যবস্থার বিধান করিয়াছেন? বোধ হয় এ সম্বন্ধে কোম্পানীর স্বপক্ষে বলিবার বিশেষ কিছুই নাই। এ বিষয়ে স্বয়ং অসুবিধা-ভোগ এবং প্রত্যক্ষ-দর্শী এক লোক সহরে আছেন যাঁহারা স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া অসুবিধা ও অত্যাচারের সত্য কাহিনী বলিবেন, সুতরাং কোম্পানী এ সম্বন্ধে কিছু বলিলেও লোকে তাহা প্রত্যয় করিতে চাহিবে না। আর এসব কোম্পানী তাহাদের এই কার্য্যের কোন কৈফিয়ৎও দেশবাসীকে দেওয়া সঙ্গত মনে করে না। কারণ কৈফিয়ৎ দেওয়ার তাহাদের প্রয়োজন নাই।

• • • •

শুনি এসব কোম্পানীর এক চেটিয়া অধিকার বা মনোপলি আছে। কর্তৃপক্ষের নিকট হইতে তাহারা এই এক চেটিয়া রাজত্ব কলিকাতার রাজপথে চালাইবার অধিকার পাইয়াছে। রাজপথের এক চেটিয়া অধিকার ও স্বত্ব স্বামীত্ব পাইয়া ইহারা যাহা খুসী তাহাই করিয়া যাইতেছে। দেশের জন-সাধারণ এই উত্তরোত্তর যথেচ্ছ ভাড়া বৃদ্ধিতে তীব্র আপত্তি জানাইতেছে কিন্তু কোম্পানী ও কর্তৃপক্ষ তাহাতে নির্ব্বাক রহিয়াছেন। ট্রাম কোম্পানী ও টেলিফোন কোম্পানী দিব্য এক চেটিয়া ব্যবসায় চালাইতেছে। ইহারা নিজেরাও ছাড়িবে না, অপর কাহাকেও মূলাভিরিক্ত হইতে দিবে না। ভাড়া বৃদ্ধির কথা লইয়া সাধারণে আপত্তি করিলেই শোনা যায় 'মনোপোলি দেওয়া আছে।' এ বিষয়ে প্রশ্ন করিয়াও কর্তৃপক্ষের জবাব পাওয়া গিয়াছে এসব কোম্পানী নাকি বিলাতের হেড সেক্রেটারীর নিকট হইতে বন্দোবস্তী লইয়া আসিয়াছে, সুতরাং ইহাদের সম্বন্ধে কোন ব্যবস্থা করিবার অধিকার ভারতের কর্তৃপক্ষ কাহারও নাই। মনোপোলির সুখে কোম্পানী একছত্র রাজত্ব করিবে,—আর ভুগিবে সহরবাসীরা, ব্যাপার মন্দ নয়।

• • • •

এই যথেচ্ছ ভাড়া বৃদ্ধির কথা আমরা কাহাকে বলিব—কাহার কাছে ইহার প্রতিকার চাহিব। অন্যান্য সকল দেশেই—রেল ষ্টীমার, ট্রাম, পোষ্টকার্ড, টেলিগ্রাফ প্রভৃতি সাধারণের নিত্য ব্যবহার্য্য অতি প্রয়োজনীয় জিনিষ গুলির ভাড়া বা মূল্য যথা সম্ভব কমাইবার ব্যবস্থা হইয়াছে —আর আমাদের এই ভারতে উত্তরোত্তর তাহা বাড়িয়াই চলিয়াছে।

• • • •

ভারতীয় রেলগুলির ক্রমবর্দ্ধিত ভাড়ার তীব্র প্রতিবাদ দেশবাসী বহুবার করিয়াছে, ক্রমাগত করিতেছে। তবু রেল কোম্পানী ভাড়া ক্রমাগত বাড়াইয়াই চলিয়াছে। রেলের ভাড়া দিন দিন বাড়িয়া যাওয়াতে দেশবাসীরও যেমন অসুবিধা হইতেছে, ভাড়া বৃদ্ধি হওয়াতে মাল-পত্র প্রেরণ ও ব্যবসায়েরও অত্যন্ত ক্ষতি হইতেছে। ইংলণ্ড ও ওয়েলসে রেলের ভাড়া যথেষ্ট কমানো হইয়াছে। মাল প্রেরণের ভাড়া কমিলে ব্যবসায়ের যথেষ্ট উন্নতি হইবে এই তাহাদের ধারণা। যুদ্ধের পর যে হারে ভাড়া বর্দ্ধিত হইয়াছিল ঐ সময় রেলওয়েতে তাহার প্রায় পঁচিশ ভাগ কমাইয়া দেওয়া হইয়াছে, ইহাতে দেশের ব্যবসায়ের যথেষ্ট প্রসার হইবেই। পৃথিবীর অন্যান্য দেশে যখন রেলের ভাড়া ক্রমশঃ কমিতেছে আমাদের দেশে তখন সেই ভাড়া ক্রমশঃ বাড়িতেছে ইহা অত্যন্ত আশ্চর্য্যের বিষয় বটে।

• • • •

দেশের লোকের এ যুগে রেলে না চড়িলে চলে না, রেল যেন দেশের অতি আবশ্যকীয় জিনিষ হইয়া পড়িয়াছে। রেল আবশ্যক তাহাতে না চড়িলে উপায় নাই, বলিয়াই রেল কর্তৃপক্ষগণ রেলের ভাড়া দিন দিন বাড়াইতেছেন। রেলের ভাড়া যেমন বাড়িয়া যাইতেছে, যাত্রীদিগের তেমন সুবিধা কিছুই হইতেছে না। তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীদিগের দুরবস্থা চিরদিন সমানই রহিয়া যাইতেছে। বোম্বাই সহরে ইতিমধ্যে রেল কর্তৃপক্ষগণের এই ভুলুমের প্রতিবাদ করিয়া এক বিরাট সভা হইয়া গিয়াছে। সভায় মাননীয় শালুভাই ভাবল দাস বলেন, তিনি যখন কৌন্সিল অব ষ্টেটে রেল যাত্রীগণের দুরবস্থা অপনোদনের জন্য দাঁড়াইয়াছিলেন তখন তাঁহার নিজ দেশবাসী সভ্যেরাই সে প্রস্তাবের বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়াছিলেন। ইহার চেয়ে আশ্চর্য্যের বিষয় আর কি হইতে পারে!

দেশের শিক্ষা

(শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী)

ভারতে অ-সহযোগ আন্দোলন প্রথম আরম্ভ হইবার পর হইতে দেশে কথা উঠিয়াছে যে, বর্ত্তমানে দেশে যে শিক্ষা চলিত আছে তাহা দেশের উপযোগী কি না এবং তাহা আর দেশে থাকিতে পারে কি না? দেশের কর্ণধরস্থানী শ্রেষ্ঠপুরুষ মহাত্মা গান্ধী দেশচলিত এই শিক্ষাপ্রথার বিরোধী—তিনি নূতন ধরণের কোন শিক্ষাপ্রথা গড়িয়া তুলিবার পূর্ব্বেই বর্ত্তমানে চলিত এই শিক্ষা-প্রথা ভাঙ্গিয়া ফেলিতে ইচ্ছুক। অ-সহযোগ আন্দোলন প্রথম হইতেই দেশ চলিত এই শিক্ষাপ্রথার উপর বিরাট আঘাত করিয়াছে।

মহাত্মা গান্ধী উচ্চশিক্ষিত, উচ্চশিক্ষিত সভ্য সকল জাতির সহিতই মিশিয়াছিলেন। সভ্য শিক্ষিত সকল দেশেই ভ্রমণ করিয়াছেন। শিক্ষার প্রধান কার্য্য যাহা জ্ঞান ও মনুষ্যত্বের বোধ জাগ্রত হওয়া তাহাতে ও বোধ হয় মহাত্মা বহু দেশী ও বিদেশী মনীষীর বহু উর্দ্ধে অবস্থিত। এত উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত হইয়াও এমন শিক্ষিত সভ্য দেশ সমূহ ভ্রমণ করিয়াও মহাত্মা এখানকার বর্ত্তমান শিক্ষা প্রথার এমন ঘোর বিরোধী হইলেন কিরূপে?

মহাত্মার সঙ্গে বাংলার চিত্তরঞ্জন মাতিলেন, এলাহাবাদের পণ্ডিত মতিলাল মাতিলেন, বোম্বায়ের প্যাটেল মাতিলেন, দেশের শিক্ষিত কর্ম্মী অধিকাংশই মাতিয়া উঠিলেন। হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা অত বড় শিক্ষা উৎসাহী যে পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য তিনিও সে দিন বলিয়াছেন যে পর্য্যন্ত না আমরা স্বরাজ পাই সে পর্য্যন্ত আমাদের শিক্ষার কথা ভাবিবার আবশ্যক নাই।

উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত দেশাত্মবোধের প্রেরণায় সঞ্জীবিত সকলেই শিক্ষার বিরোধী কেন হইলেন তাহা ভাবিবার কথা বটে। সর্ব্বদেশে সর্ব্বকালেই শিক্ষার উদ্দেশ্য মানুষকে মানুষ করিয়া গড়িয়া তুলিবে, মানুষকে সকল বিষয়ে যথা সম্ভব বোধ আনিয়া দিবে, মানুষকে জীবন চালাইবার মত কর্ম্মদক্ষতা দিবে। শিক্ষার উদ্দেশ্য যদি কর্ম্মদক্ষতাই হয় শিক্ষার উদ্দেশ্য যদি মানুষকে মানুষ গড়াই হয় তবে আমাদের দেশের বর্ত্তমান শিক্ষা প্রথা যে তাহার কোনটারই সহায়তা আদৌ করিতেছে না এ কথা বোধ হয় জোর করিয়া বলা চলে।

সমগ্র ভারতের শিক্ষা প্রথা ছাড়িয়া দিয়া এক বাংলার শিক্ষা প্রথায় বাংলা দেশের অধিবাসীবৃন্দের কি অবস্থা আনয়ন করিয়াছে তাহার আলোচনা করিলেই চলিবে। বর্ত্তমান শিক্ষা প্রথা দেশে প্রচলিত হইবার পর ভারতের শ্রেষ্ঠ মস্তিষ্কজীবি জাতি বাঙ্গালী ইহাকে যেমন কায়মনোবাক্যে হৃদয়সিংহাসনে বরণ করিয়া লইয়াছিল এমন অপর কোন প্রদেশের কোন জাতিই বোধহয় লয় নাই। এই বাংলার মধ্যেও বাংলার মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকেই শিক্ষাকে পরম আদরের ও শ্রেষ্ঠ সম্পদ ভাবে গ্রহণ করিয়াছিল। শিক্ষার আনন্দ যতটুকু হউক বা না হউক শিক্ষাতে পেটের ভাত ও পরণের কাপড় জোটাইতে পারিবে এ ভরসা তাহারা পাইয়াছিল। শিক্ষার মাদকতা আছে, শিক্ষার উন্মাদনা আছে, শিক্ষাকে একবার পড়িলে তাহাকে মুগ্ধ অভিভূত হইতেই হইবে। বাংলার মধ্যবিত্ত সমাজ হইতে ক্রমে সমাজের উচ্চস্তরে ও নিম্নস্তরে শিক্ষার বিস্তার হইতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে দেড়শত বৎসরের মধ্যেই সমগ্র বাংলা আজ শিক্ষার কাঙ্গাল ও শিক্ষায় ভিখারী হইয়া দাঁড়াইয়াছে। শিক্ষায় আজ বাংলার যুবকদিগের জীবনের শ্রেষ্ঠ সময় অতিবাহিত হইয়া যায়। শিক্ষার পর দেশবাসীগণের জীবনে যখন কর্ম্মযুগ আরম্ভ হয়, তখন শিক্ষিত সন্তানগণ শিক্ষার সঙ্গে কর্ম্মজীবনের যোগাযোগ মোটেই সন্ধান করিয়া পায় না। চাকুরী এবং পর দাসত্ব করিবার জন্যই যে শিক্ষা লাভ হয়, জীবনের অপর কোন ক্ষেত্রে সে শিক্ষা মোটেই কোন কার্য্যকরী ক্ষমতা দেখাইতে পারে না। জগতের সকল ভাগে সকল দিকেই আজ জীবন সমস্যা প্রবল হইয়া উঠিয়াছে। মানুষ জীবনে বাঁচিয়া থাকিতে চাহে। শিক্ষা দ্বারা নিজের দেহমনকে কর্ম্মক্ষম ও উজ্জ্বল করিয়া জীবনকে সুন্দর ও আনন্দপূর্ণ করিয়া তুলিতে চাহে।

জাতি ও দেশ আজ নানা কারণে উদ্যমহীন, আশাশূন্য হইয়া পড়িয়াছে,—এই নানা কারণগুলির মধ্যে দেশের শিক্ষা প্রথাও একটি প্রধান কারণ। দেশের আশা-ভরসার স্থল সন্তানগণ যদি প্রকৃত শিক্ষালাভ করিয়া উদ্যত হইতে পারিত, তবে হয়ত আজ দেশের এ অভাব অভিযোগের কারণ অনেক কমিয়া যাইত।

দেশীয় শিক্ষাপ্রথার সহিত জাতির দৈনন্দিন জীবনের কোন যোগ সম্পর্ক নাই। দেশের যুবকগণ বিদ্যালয়ে অবস্থান কালে পিতা বা অপর কোন আত্মীয় স্বজনের বহু অর্থ ব্যয় করিয়া ডিগ্রি লাভ করে। বিদ্যালয়ে পাঠ-কালে তাহারা বিরাট মনোরম অট্টালিকায় বাস করে, বিরাট শিক্ষালয়ে বসিয়া শিক্ষা অর্জ্জন করে, সেখানে ছাত্রগণ দেশ বিদেশের ইতিহাস, ভূগোল, রাজনীতি, অর্থনীতি, কাব্য ও দর্শন আলোচনা করে। নয় বৎসর হইতে পঁচিশ বৎসর কাল পর্য্যন্ত জীবন এই কাব্য দর্শনের ভিতর দিয়া চালাইয়া তাহারা যখন সংসারে প্রবেশ করে, যখন নিত্য খরচ চালাইবার জন্য নিত্য পয়সার প্রয়োজন হয় তখন এই সব নানা অতীত বিদ্যা হইতে এই পয়সা জিনিসটির সন্ধান মেলে না। জীবন সংগ্রামে দর্শন বিজ্ঞানের জীবনের সঙ্গে সত্য প্রত্যক্ষ জীবনের ভীষণ সংঘর্ষ লাগিয়া যায়,শিক্ষিত যুবক সে সংগ্রামে অবসন্ন হইয়া পড়ে, নিরাশ হইয়া পড়ে।

বাংলা দেশের বর্ত্তমান শিক্ষা প্রথা প্রচলনের পর হইতে বাংলার অবস্থা দিন দিন হীন হইতে হীনতর হইতেছে। সমগ্র বাংলাদেশ দেশ বিদেশের লোক আসিয়া ছাইয়া ফেলিল, ঘর বাড়ী করিয়া স্থায়ীভাবে বাংলার অধিবাসী হইতে চলিল। আজ বাঙ্গালী ধনীকে প্রয়োজন হইলেই বিদেশীয়দিগের নিকট হাত পাতিতে হয়। দেশের ভূ-সম্পত্তি সকল বিদেশীয়েরা অধিকার করিতেছে, শিক্ষা অবসানে শিক্ষিত বাঙ্গালী সন্তানকে সেই বিদেশীয় ধনশালীদিগের নিকটেই হাত পাতিতে হইতেছে, মাথা অবনত করিতে হই-তেছে—তবে আর কর্ম্মক্ষেত্র শিক্ষার স্থান সম্মান রহিল কই?

কেহ বলিতে পারেন শিক্ষা শিক্ষার জন্যই, অর্থের সঙ্গে বা কর্ম্মক্ষেত্রের সহিত তাহার কোন সম্বন্ধ নাই, কিন্তু সেকথা অতি ফাঁকা কথা। কর্ম্ম জীবনের সহিত যোগ সম্পর্ক বিহীন শিক্ষার বর্ত্তমান জগতে কোন মূল্যই নাই—তাহা কানা কড়ির দামেও বিকায় না। শিক্ষা দেশের পক্ষে, জাতির পক্ষে দেশবাসী যে কোন মানুষের পক্ষেই অতি প্রয়োজনীয় অতি কল্যাণকরী তাহাতে সন্দেহ নাই; কিন্তু দেশের কর্ম্ম-ক্ষেত্রের সহিত সে শিক্ষার যোগ না থাকিলে, কর্ম্মক্ষেত্রে শিক্ষাকে বাস্তব করিয়া না খাটাইতে পারিলে, সে শিক্ষা জাতির পক্ষে উন্নতির সহায়ক না হইয়া অবনতির পথই প্রশস্ত করিয়া দেয়। দেশ ও জাতির মধ্যে শিক্ষার প্রসারে এই অবনতির লক্ষণ ভীষণ ভাবে প্রকটিত হইতে দেখিয়াই দেশের ও জাতির মঙ্গলকামীগণ এই শিক্ষা প্রথার মূলে কুঠারাঘাত করিতে চাহেন। কিন্তু দেশ ও দেশবাসীগণ যে স্রোতের মোহে মত্ত হইয়া ভাসিয়া চলিয়াছে সে স্রোতের মোহ বেগ হইতে তাহাকে ফিরিবারও বেগ পাইতে হইবে।

বাংলায় বাস করিয়া সে দেশের অধিবাসী বাঙ্গালী আজ অন্নাভাবে মরিতেছে, বস্ত্রাভাবে নগ্ন সাজিয়াছে, অথচ দেশ বিদেশের লোকে সেই বাংলা হইতেই অজস্র অর্থ উপার্জ্জন করিয়া লইয়া যাইতেছে। কর্ম্মক্ষেত্রের নানা বিভাগে কৃতিত্ব দেখাইয়া বাংলার সকল কর্ম্মক্ষেত্রগুলি নিজেদের অধিকারভুক্ত করিয়া ফেলিতেছে। আমরা আজ না খাইয়া মরিতেছি তবু শিক্ষার গর্ব্ব করিতেছি—অপর কিছু করিতে পারিতেছি না বলিয়াই জীবন একভাবে কাটাইয়া দিবার অছিলায় শিক্ষালয়ে ছাত্র সাজিয়া যাই-তেছি। কিন্তু ছাত্রজীবনই জীবনের শেষ নহে, এইখানে যদি জীবনের যবনিকা পাত হইত তবে দেশের শিক্ষিত যুবকদিগের অনেকেই শেষ নিঃশ্বাস পরম শান্তির সহিত ফেলিতে পারিতেন। ছাত্রজীবন শেষ হইবার সঙ্গে সঙ্গেই তাহাদিগকে কর্ম্মজীবনে প্রবেশ করিতে হয়, এ জীবন ছাত্র-জীবনের মত সহজ সরল কাব্য দর্শনে পূরিত নহে। ভূগোল ইতিহাস বা অর্থনীতির মতও নহে, ইহা তাহার চেয়ে অনেক ভীষণ। এই শিক্ষা প্রথায় এ জীবন সম্বন্ধে আমাদিগকে কোন সুস্পষ্ট ধারণা জন্মাইয়া দেয় না—এ জীবন কি ভাবে চলিয়া কৃতকার্য্য হইবে তাহা বলিয়া দেয় না, শুধু একটা প্রত্যক্ষ সত্য জীবনের মধ্যে নির্ম্মমভাবে স্বপ্নাঙ্কুরের মত ফেলিয়া দেয়। স্বল্প অঙ্গে জীবন বিফল মনে হয়, অশান্ত জীবন অসহ্য এবং দুর্ব্বহ করিয়া তোলে।

আজ তাই এই নিষ্ফল শিক্ষা প্রথা দেশবাসী ভাঙ্গিয়া দিতে চাহে—তাহা হইতে আপনিই আবার সময়োপযোগী কার্য্যকরী শিক্ষা প্রথা গড়িয়া উঠিবে, ইহাই বিশ্বের চিরন্তন নিয়ম। যাহা অপকারী যাহাতে জীবন অশান্তিময় হইয়া উঠে যাহার বিধি ও ব্যবস্থা অস্বাস্থ্যকর, জাতি ও জীবনের পক্ষে অমঙ্গলকর তাহা মূলে ভাল বলিয়াই তাহার শাখা প্রশাখা ছেদনে ক্ষতি নাই। নব ভাবে নূতন শিক্ষায় আজ দেশবাসী জীবন গড়িতে চাহে—শিক্ষার বিফলতায় জীবনকে আর নৈরাশ্যে মজ্জিত করিতে চাহে না।

কুচ কামকা নেহি হ্যা — না পারবে পয়সা দিতে, না পারবে বইতে!

উকীলবাবু। আহা! কি মিষ্ট এই বৃক্ষতল!

হার-জিৎ

(উপকথা)

[শ্রীসুন্দরমোহন বসু]

যাভাদ্বিপের শিল্পীর খ্যাতি তখন দেশ বিদেশে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল, সে আজ অনেক দিন পূর্ব্বের কথা। বোধ হয় কত শত হাজার বৎসর তাহার পর অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে। যাভাবাসীরা তখন অত্যন্ত ধার্ম্মিক ভাবে জীবনযাপন করিত। সে সময়ে মানুষেরা দেবতাদিগের সঙ্গে কথা বলিতে পারিত ও তাহারা এইভাবে কথা বলিয়া অত্যন্ত আনন্দলাভ করিত। সেই হাজার হাজার বৎসর আগে ভারতবাসীরা দেবতাদিগের সহিত কথা কহিয়া যেমন আনন্দ পাইত এখনও তাহারা দেবতাদিগের সহিত তেমনি কথা কহিয়া থাকে, তবে সেকালে দেবতারা তাহাদের কথা যেমন শুনিতেন এখনও তেমনি শোনেন কিনা জানি না।

সে আজ অনেককালের কথা। গ্রামবানানের নিকট তখন বিচিত্র সুন্দর কয়েকটি প্রাসাদ ছিল। যাভাদ্বীপের রাজার ছিল সে প্রাসাদগুলি। রাজার রাতু আয়ু নামে এক পরমা সুন্দরী কন্যা ছিল। চারিদিক হইতে অনেক রাজকুমার যাভার রাজকুমারীর সৌন্দর্য্যের খ্যাতি শুনিয়া তাহাকে একবার চোখের দেখা দেখিতে আসিতেন যদি রাজকুমারী তাহাদের কাহারও প্রতি শুভদৃষ্টিপাত করেন, যদি ভাগ্যগুণে কোন রাজকুমারের ভাগ্যে পরমা সুন্দরী রাজকন্যা মিলিয়া যায়!

রাজকন্যা কিন্তু কোন রাজকুমারের উপরই শুভদৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন না। বিবাহ করিতে তিনি যেমন অনিচ্ছুক—বিবাহে তাঁহার মোটেই ইচ্ছা নাই। রাজকুমারী সব সময়ে মন্দিরে থাকিতেন ও বৃদ্ধ পুরোহিতের নিকট ধর্ম্ম বিষয়ে আলোচনা শুনিতেন। রাজকুমারীর ধর্ম্মভাব ক্রমে বৃদ্ধি পাইতে লাগিল এবং ধর্ম্মভাব বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহার বিবাহের অনাসক্তি জন্মিতে লাগিল।

বিবাহ না করিবার জন্য রাজকুমারী সর্ব্বদা ছিদ্র অন্বেষণ করিতেন। রাজকুমারীর বিবাহে মত নাই জানিয়া কত পরম সুন্দর রাজার কুমার আসিয়া বোকা হইয়া ফিরিয়া যাইতে লাগিল। রাজা এতদিন কন্যার বিবাহের কোন আয়োজন করেন নাই। একদিন পাশের রাজ্যের এক মহাক্ষমতাশালী রাজার কুমার আসিয়া রাজকুমারীর পাণি প্রার্থনা করিলেন। রাজকুমার রাজাকে বলিলেন, রাজা যদি তাহার সহিত রাজকুমারীর বিবাহ দেন তবে চিরকাল তিনি রাজার সহায় হইয়া থাকিবেন। অত বড় রাজ্যের রাজকুমারের কথা শুনিয়া রাজা আর নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিলেন না। রাজা রাজকুমারীকে ডাকিয়া বিবাহের কথা বলিলেন—রাজা বলিলেন 'মা, বিবাহই নারীর ধর্ম্ম—তোমার এখন বিবাহ-যোগ্য বয়স হইয়াছে, আর বিবাহ না করিয়া থাকা ভাল দেখায় না। আমাদের পার্শ্ববর্ত্তী রাজ্যের রাজকুমার নিজে তোমার রূপ-গুণের খ্যাতি শুনিয়া তোমার বিবাহ করিতে আসিয়াছেন। এ বিবাহে তুমি ঐ রাজ্যের শ্রেষ্ঠ রাণী হইবে। আমিও প্রবল পরাক্রান্ত রাজকুমারের হাতে তোমাকে দান করিয়া পরম সুখী হইব।

রাজকুমারী কতক্ষণ নীরব থাকিয়া বলিলেন 'বাবা, এ সকল কিছুই আমার ভাল লাগে না। দেবসেবাতেই আমার আনন্দ, তাহাতেই আমার সুখ।'

রাজা বলিলেন 'মা—বিবাহ নারীর সকল ধর্ম্মের

সেবা ধর্ম্ম। পতি সেবাই তাহার দেবসেবা। আমার কথা শোন মা—বিবাহ কর।'

রাজকন্যা সম্মত হইয়া বলিলেন 'বাবা, আপনার কথায় আমি বিবাহ করিব। কিন্তু রাজকুমার যে আমায় ভালবাসেন তাহা আমি কিরূপে বুঝিব? আমি রাজকুমারকে পরীক্ষা করিয়া তবে বিবাহ করিব। বাবা রাজকুমারকে এক রাত্রের মধ্যে এখানে এক হাজার মন্দির নির্ম্মাণ করিতে হইবে। রাজকুমার যদি তাহা পারেন তবে বুঝিব তিনি আমায় ভালবাসেন—তবে আমি তাঁহাকে বিবাহ করিব।'

রাজা রাজকুমারকে তাঁহার আশ্চর্য্যিণী কন্যার পণের কথা বলিলেন। রাজকুমারের ভূতগণের উপরও আধিপত্য ছিল। সন্ধ্যা হইবামাত্র তিনি ভূতদিগকে ডাকিয়া মন্দির আরম্ভ করিয়া দিলেন। কেহ কোথাও নাই, অথচ মন্দিরের পর মন্দির নির্ম্মিত হইতে লাগিল। ত্রিতলের খোলা ছাদ হইতে রাজকন্যা রাজকুমারের মন্দির নির্ম্মাণ দেখিতেছিলেন। এইভাবে মন্দিরের পর মন্দির নির্ম্মিত হইতে দেখিয়া রাজকুমারী নিরাশ হইতে লাগিলেন। রাজকুমারী তখন মনে করিলেন যদি কোনরূপে রাজাকে বুঝাইয়া দেওয়া যায় যে রাত্রি শেষ হইয়া গিয়াছে, ভোর হইয়াছে, তাহা হইলে আর রাজপুত্র মন্দির নির্ম্মাণ করিতে পারিবেন না। তবে রাজকুমারের হার ও রাজকুমারীর জিত হইবে।

রাজকুমারী তখনই দাসীদিগকে ডাকিয়া আদেশ করিলেন যে প্রাসাদের সকলেই যেন এখনই চেঁকিতে ধান ভানিতে আরম্ভ করিয়া দেয়। দেখিতে দেখিতে প্রাসাদের শত শত চেঁকি হইতে চক্ চক্ শব্দ হইতে লাগিল। রাজকুমার ভাবিলেন "একি, এর মধ্যে ভোর হইয়া গেল। ভূতেরা ত দিনের আলো মোটেই সহ্য করিতে পারে না। ভোর হইবার পূর্ব্বে ইহাদের বিদায় না দিলে ইহারা সকলেই মরিয়া যাইবে। রাজকুমার তখনি মন্দিরের কাজ বন্ধ করিয়া দিলেন। তখন ৯৯৯ মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছে—আর একটীমাত্র বাকী—হায়। আর একটি মন্দির অভাগিনী রাজকুমারীর চাতুরীতে রাজপুত্র নির্ম্মাণ করিতে পারিলেন না।

রাজপুত্র ক্ষোভে ও দুঃখে হতাশ হইয়া বসিয়া আছেন, এমন সময় রাজকুমারী প্রভাত সূর্য্যের মত রূপের জ্যোতিঃ বিকীর্ণ করিয়া মৃদু হাসিভরা মুখে রাজকুমারের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া কি ভাবে রাজকুমারকে প্রতারিত করিয়াছেন, তাহা বলিলেন।

রাজকুমার চোখ না তুলিয়াই বলিলেন তুমি 'এত নিষ্ঠুর,—পাষাণ।' তারপর রাজকুমার যখন মুখ তুলিয়া তাহার পানে চাহিলেন তখন দেখিলেন অমন ফুলের মত কোমল দেহ ধীরে ধীরে পাথর হইয়া যাইতেছে কমনীয় সৌন্দর্য্য মণ্ডিত দেহ ক্রমে জীবন হীন হইতেছে। রাজকুমার রাজকন্যাকে ধরিতে গেলেন,—ধরিলেন তখন সে দেহ জীবনহীন—পাষাণস্তূপ।

ব্রহ্ম।

যুবক। (বিংশবর্ষীয়া নব-বধূকে) প্রিয়ে, চারুশীলে, সত্য করে বল ত, তুমি আর কাকেও ভালবাস্তে?

নব-বধূ। ভালো? না প্রিয়তম! তোমাকেই বেসেছি, প্রাণাধিক...

যুবক। কিন্তু....

নব-বধূ। ওঃ তুমি বুঝি পড়ন, হিতোপদেশ মহেশের কথা শুনেছ। তাদের কথা ঘটে ভালবাসি, সত্যি কথা বলতে কি...

(বাধা মূর্চ্ছিত)

কাকে ভালবাসা সবার চেয়ে শক্ত? এর উত্তর হচ্ছে, স্ত্রীকে। যেহেতু বেশী ভালো বেসেছে কি যেনায় অমনি টিকিটি অবধি বিকিয়ে গেছেন

"এর আর একটা উত্তর হচ্ছে—স্ত্রীকে, যেহেতু তাহলেই 'পুত্র-কন্যা আসে যেন প্রবল বন্যা।'

যুবক-যুবতীর সর্ব্বাপেক্ষা বিশ্বাসী, অনুগত ও অনুরূপের সখী কে?—যুবকের আর চিন্তা।

দেশের কথা

পেলাবাদের দুরদৃষ্ট :—শুনিতেছি মিনার্ভা থিয়েটারে অভিনীত 'পেলাবাদের স্বদেশিতা' কলিকাতা পুলিশের আদেশে বন্ধ হইয়া গেল। পেলাবাদের স্বদেশিতা বন্ধ হইবার কি কারণ থাকিতে পারে তাহা আমরা জানি না বুঝি না। তবে ইহাতে, শুনিয়াছি, বন্দেমাতরম্ আছে, চরকা আছে—দেশের বর্ত্তমান অবস্থা সম্বন্ধে এক আধটু আলোচনাও আছে। আর আছে বঙ্গের জাতীয় সঙ্গীত বন্দেমাতরম্, বঙ্গ আমার জননী, আমার ধনধান্য পুষ্প ভরা প্রভৃতি গানের দু' চারিটা লাইন। তাই কি পেলাবাদের বন্ধ হইবার কারণ? যদি সত্য এই কারণেই পেলাবাদ বন্ধ হইবার ব্যবস্থা হইয়া থাকে তবে দুরদৃষ্ট কার! পেলাবাদের না দেশবাসীর—না আর কাহারও।

• • • •

এসিয়া ধ্বংস।—ফিলাডেলফিয়ার জনৈক জ্যোতিষী বলিয়াছেন, ত্রিশ দিনের মধ্যে উত্তর ইউরোপ, দক্ষিণ আফ্রিকা ও সমগ্র এসিয়া ধ্বংস হইবে। এসিয়ার ধ্বংসের যখন সম্ভাবনা, তখন আমরা ত যাইবই।

• • • •

পিকেটিং। বিলাতী বস্ত্রাদি যাহাতে ক্রয় বিক্রয় না হয় তাহার জন্য কলিকাতায় আবার পিকেটিং আরম্ভ হইয়াছে, সঙ্গে সঙ্গে ধর পাকড়ের ধুম পড়িয়া গেছে। এদেশের সবই দুর্ভাগ্য। নহিলে পিকেটিং করিলে পুলিসের কাছে অপরাধী হইতে হয়? তাহার চেয়েও বড় দুর্ভাগ্য এই যে এখনও পিকেটিং করিয়া দেশবাসীকে বিলাতী বসন প্রীতি ত্যাগ করাইতে হইতেছে।

• • • •

বন্দর।—করাচি সুরুকর প্রভৃতি মিউনিসিপ্যালিটির কর্ম্মচারীগণের পোষাক পরিচ্ছদ এখন হইতে বন্দরে প্রস্তুত করিয়া দেওয়া হইবে বলিয়া আইন জারি হইয়া গেছে। ভারতের অন্যান্য মিউনিসিপ্যালিটির কর্ত্তৃপক্ষগণ এ কথাটা ভাবিয়া দেখিবেন বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস।

• • • • •

কলিকাতা কর্পোরেশনের অস্থায়ী চেয়ারম্যান শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্র মল্লিক অতি অল্পদিনের মধ্যে অনেক অদ্ভুত সাধন করিয়া, অনেক পরোক্ষভাবে করিয়া সহরবাসীর ধন্যবাদ ভাজন হইয়াছেন। তিনি কর্পোরেশনের আমলা-চাপরাসীদের পোষাক পরিচ্ছদে এ দেশজাত বস্ত্রাদির চলন করিয়া দিন না! তাঁহার কীর্ত্তি অক্ষয়-অমর হইবে।

• • • •

মাদুরোর গ্রেপ্তার। জনশ্রুতি পণ্ডিত মালব্যের গ্রেপ্তার অবশ্যম্ভাবী তাঁহার শেষ বক্তৃতায় সেইরূপই আভাষ পাওয়া যায়!

• • •

শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন সেন গুপ্ত কংগ্রেসের কাজ ছাড়িয়া ব্যারিষ্টারী করিবেন স্থির করিয়াছেন। এই সম্পর্কে তিনি দেশবাসীকে যে কথা বলিয়াছেন তাহার সারমর্ম্ম এই যে উপবাস করিয়া দেশের কাজ করাও সম্ভব নহে। তাঁহার আর্থিক অবস্থার শোচনীয় পরিণতি ঘটিতেছিল। দিন গুজরাণের অন্য কোন উপায় না থাকায় আবার তাঁহাকে আদালতের সীমার মধ্যে পা বাড়াইতে হইল। কিন্তু দেশের কাজ করিতে কোনদিনই পশ্চাদপদ হইবেন না—এ কথাও তাঁহার চিঠিতে উল্লেখ আছে।

•

বোম্বাইয়ের ব্যবহারজীব। শ্রীযুক্ত জয়াকারও কয়েকদিন পূর্ব্বে আদালতে যোগ দিবেন বলিয়া ঢক্কা নিনাদ করিয়াছেন। তাঁহার পত্রগুলি এবং তৎসম্বন্ধে বহু আলোচনা ইতোমধ্যেই কাগজে হইয়া গিয়াছে আমরা সে সম্বন্ধে বিশেষ কিছু বলিতে চাহি না।

• • •

কেবল এই কথাই বলি যে তাঁহারা আসিয়াছিলেনই বা কেন, গেলেনই বা কেন? স্বরাজের পথ যে রক্ত বন্যার বিপদসঙ্কুল ও অভাব অনাটনের হাহাকার পূর্ণ তাহা কি তাঁহারা কল্পনাতেও জানিতে পারেন নাই? দেশের চতুর্দ্দিকে দুঃখদারিদ্র্যের যে করাল ছায়া কৃষ্ণমূর্ত্তি বিস্তার করিয়া রহিয়াছে, এই অভাগা দেশের অধিকাংশ নর নারীই যাহার কবলে পড়িয়া ক্লিষ্ট শীর্ণ হইয়া আজীবন আর্ত্তনাদ করিতেছে, তাহাদেরই দ্বারে আপনাদের বিলাইয়া দেশের কাজ করিতে আসিয়া এমন ভাবে পলায়ন করা যে মনুষ্যোচিত নহে তাহা কি ঐ সকল মহাত্মাও বুঝিতেছেন না?

গৃহহীন

("মুকুল")

প্রথম পরিচ্ছেদ

মাঘের প্রারম্ভ। কলিকাতা নহরে শীত, পুরাদমেই বর্ত্তমান। রায় বাহাদুর কমলকৃষ্ণ মিত্র মহাশয়ের পুত্রের বিবাহ স্থির হইয়া গিয়াছে, আগামী পরশ্ব বিবাহের দিন। রায় বাহাদুর পুত্রের বিবাহে ত্রিভুবন নিমন্ত্রণ করিয়াছেন। সাহেব সুবাও বাদ পড়ে নাই।

প্রাতঃকাল। রায় বাহাদুর দ্বিতলের বৈঠকখানা গৃহে বসিয়া আল বোলায় মুখ পান করিতেছিলেন, ব্যস্তভাবে মুখহাত পুত্র সুশীল ঘরে ঢুকিয়া বলিল—দাদা, সন্দে ছোট কাকার নাম দেখছিনে কেন?

রায় বাহাদুর বাম হস্তের অঙ্গুলি মধ্যে নলটি চাপিয়া ধরিয়া জিজ্ঞাসিলেন—কে ছোট কাকা?

সুশীল এক মুহূর্ত্ত রায় বাহাদুরের মুখের পানে নীরবে চাহিয়া, বলিল—আমাদের ছোট কাকা!

ওঃ সন্দ! তাই বল—! না ও নামটা নেই বটে! সুশীল পকেট হইতে পেন্সিলটি বাহির করিতেই, রায় বাহাদুর কহিলেন—ওটা ভুল হয় নি, সুশীল।

সুশীল কথাটা বুঝিতে না পারিয়া চাহিয়া রহিল। রায় বাহাদুর নলটি মুখে দিলেন, একটি মাত্র টান দিয়াই বলিলেন—তোমার ছোট কাকার কাণ্ড শুনেছ ত?

সুশীল হাসিয়া কহিল—কি দাদা?

শোন নি? বলছি—বোস। তোমার ছোট কাকার ছেলে দু'টী.....

সুশীল বলিয়া উঠিল—তারা ত খালাস পেয়ে এসেছে।

রায় বাহাদুর বলিলেন—তা এসেছে। এবার তোমার ছোট কাকার পালা—তাকে যেতে হবে। আমি পাকা খবর জানি।

সুশীল বলিল—আশ্চর্য্য নয়। যে রকম দিন পড়েছে তা'তে আশ্চর্য্য হবার কিছু নেই।

রায় বাহাদুর কৃত্রিম হাসিতে মুখখানি ভরাইয়া বলিলেন—না, তা নেই! তবে এতেও বিশেষ আশ্চর্য্য হ'বার কিছু নেই সুশীল।

সুশীল বলিল—কিসে?

রায় বাহাদুর কহিলেন—এই তুমি যা বলছ—ঐ সন্দে নাম নেই.....

সুশীল বিস্মিতস্বরে বলিয়া উঠিল—তাকে বলা হবে না?

না।

তাদের বাড়ীর কাউকে.....

না।

সে কি দাদা?

রায় বাহাদুর অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া একান্ত মনে মুখ পান করিতে লাগিলেন।

সুশীল কিন্তু থামিতে পারিল না। সে পূর্ব্ববৎ কণ্ঠে বলিল—তিনি যে আমাদের আপনার কাকা.....

রায় বাহাদুর বিরক্ত ভাবে কহিলেন—আমি জানি।

সুশীল ষাবিংশবর্ষীয় যুবক, কিঞ্চিৎ উদ্ধত প্রকৃতির। রাগ সমন করা সিখিতে পারে নাই, তবে চেষ্টা করিতেছে। রায় বাহাদুরের বিরক্তিতে দমিবার ছেলে সুশীল নয়, তীর্য্যক দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিল—তাহলে তাঁর ছেলেরা খেলে গেছল বলে.....

ওহে অমল.....

অমল বারান্দা দিয়া কোথায় যাইতেছিল, রায় বাহাদুরের আহ্বান ঘরের মধ্যে আসিতে বন্ধ রায় বাহাদুর প্রশান্ত মুখে কহিলেন—কথা মিটল ওদের সঙ্গে?

মিটেছে,বাবা।—বলিয়া অমল একবার সুশীলের পানে চাহিয়া মুখ নত করিল।

রায় বাহাদুর জিজ্ঞাসিলেন—তাইতেই হল ত? কাকে অর্ডার দিলে? পেলিটাকে

হ্যাঁ।

সুশীল এই সময়ে আবার বলিল—কি বলছেন দাদা?

রায় বাহাদুর নলটা টেবিলের উপর ছুড়িয়া দিয়া তীব্র স্বরে বলিলেন—কতবার বলব সুশীল? হ'বে না, হ'বে না। ও রকম লোকের সঙ্গে আমি সম্পর্ক রাখি নে।

সুশীল সোজা হইয়া জিজ্ঞাসিল—তাদের অপরাধ কি? খেলে গেছেন, স্বদেশী করেন, এই?

রায় বাহাদুরের ইচ্ছা হইতেছিল, এই মূর্খ অবুঝটাকে —থাক্! বলিলেন—হ্যাঁ ঐ অপরাধ। তবে শুধু ঐ নয়—আরো আছে।

সুশীল জিজ্ঞাসিল—আর আছে?

হ্যাঁ—আছে।

অমল পিতার পানে চাহিয়া জিজ্ঞাসিল—কার কথা হচ্ছে?

রায় বাহাদুর বলিয়া উঠিলেন—তোমার ছোট কাকার। বল ত অমল, সুশীল বাবুকে বল ত.....

অমল জিজ্ঞাসিল—সুশীল কি বলতে চায়?

রায় বাহাদুর হাঁ করিবার পূর্ব্বেই সুশীল বলিল—ছোট কাকার বাড়ী নিমন্ত্রণ হ'বে না কেন তাই জানতে চাই?

অমল পিতার পানে চাহিতে, পিতা বলিলেন—জানতে চাও—ত জান! হ'বে না, কারণ তোমার ছোট কাকা মানুষ নন। তোমার ছোটোকাকার ছেলেরা খেল খেটে

এসেছে, তিনি নিজেও দু'একদিনের মধ্যেই যাবেন,তারপর স্বদেশী স্বদেশী করে তাঁর বাড়ী শুদ্ধ লোকের মাথা খারাপ হ'য়েছে—তাঁদের আমি বাড়ীতে আনতে পারি না। খুড়ো আছেন, খুড়ী আছেন, যেখানে আছেন, সেইখানেই থাকুন, আমার এখানে ও সব হ'বে না। তা সে বাবার ভাই-ই হোন, আর বাবার বাপই হোন্।

সুশীল স্তম্ভিত হইয়া গেল। তাহার কণ্ঠে শক্তি ছিল না, সে এত টুকু একটি শব্দও উচ্চারণ করিতে পারিল না।

কিন্তু রায় বাহাদুর তৎক্ষণাৎ কহিলেন—একদিন খুড়ী এসেছিলেন শুনলুম বিধবা মেয়ে দু'টিকে নিয়ে চরকা চালাবার উপদেশ দিতে—তা বড় সুবিধে পান নি। এবং বেশ কড়া কড়া শুনেও গেছেন। গিয়ে আবার কাগজে ছাপিয়ে দিয়েছেন। তবে আর কি! আমি একেবারে মরে গেলুম। বাংলা কাগজগুলোও হয়েছে যেমন...

অমল পিতার পুত্র। বলিল—অত কথার দরকার কি বাবা! আমরা ওঁদের বলব না এই যথেষ্ট। যাঁরা চরকা নিয়ে পথে পথে ভদ্রলোকের মেয়ে ছেলে হ'য়ে ঘুরে বেড়াতে পারেন তাঁদের কোন কাজকর্মে নিমন্ত্রণ করা শুধু যে অপমানকর তা নয়, বিশেষ আপত্তি জনক।

সুশীল অমলের কথাগুলি যেন গিলিয়া খাইতেছিল, শেষ হইবামাত্র বলিল—তুমি খুব সংস্কৃত শিখেছ দেখছি অমল, সাধু ভাষা ছাড়া কথাই কও না, তা বেশ! কিন্তু যত ছোট তোমরা তাঁদের মনে করছ তাঁরা ঠিক তা নন্। তোমাদের চেয়ে তাঁদের সম্মান কোথাও কম নেই, বরং বেশীই আছে।

সুশীল আরো কি বলিতে যাইতেছিল, রায় বাহাদুর হঠাৎ চেয়ার ছাড়িয়া দাঁড়াইয়া উঠিলেন, সুশীলের মুখের সম্মুখে হাত ঘুরাইয়া বলিলেন—চরকা কাট?

সুশীল উত্তরীয়খানি দেখাইয়া বলিল—নিজের হাতে বোনা।

রায় বাহাদুর বসিয়া পড়িয়া পুত্রের পানে চাহিয়া কহিলেন—তাই!

অমল কথা কহিল না। কিন্তু সে-যে পিতার কথার সমর্থন করিল, সুশীলেরও তাহা অজ্ঞাত রহিল না।

রায় বাহাদুর পুনরায় প্রশ্ন করিলেন—ভলেন্টিয়ার হও নি? জেলে যাবে না?

সুশীল স্থিরস্বরে কহিল—ভলেন্টিয়ার আজ নূতন হই নি, দাদা...

হুঁ...তা'হলে অমল, আমি বলছি কি, কর্মটা তুমিই নাও—ছোট মামাকে নিয়ে, বাবা, তোমাকেই ওটা সেরে ফেলতে হ'বে। সুশীল বাবুকে আর কষ্ট দেব না।—সুশীলের দিকে ফিরিয়া বলিলেন—তোমার মা'ও ত এসেছেন?

সুশীল বলিল—এসেছিলেন। তাঁকেও আমি নিয়ে যাচ্ছি।

রায় বাহাদুর বাঙ্গস্বরে বলিলেন—গাড়ীটা ছুতে দিতে বলব না কি?

সুশীল বলিল—আজ্ঞে না। আমার মা'কে আমি ভাড়া গাড়ী করেই নিয়ে যাচ্ছি।—বলিয়া সে বাহির হইয়া গেল।

রায় বাহাদুর পুত্রের পানে চাহিয়া বলিলেন—বিশ্বাস কা'কেও নেই, বুঝলে অমল! যাক্—আগে থাকতেই সরে পড়েছে, সে এক রকম ভালোই হ'য়েছে। তোমার একটু খাটুনি বাড়ল, বাবা, তা আর কি করবে বল? বুড়ো বাপ.....

অমল বলিল—এ আর খাটুনি কি?

রায় বাহাদুর সস্মিতমুখে কহিলেন—তাহ'লেই আমি নিশ্চিন্ত হই অমল। বাড়ীতে কত কালের পর কাজটা হ'চ্ছে, যেন কোন ত্রুটী না হয় বাবা। আর হাঁ—ব্যাঙ্কের সাহেব ক'জনকে বেশ করে' বলেছ ত? ওরা যে কত কাল ধরে বলছে তার ঠিক নেই। আর একটা কথা, তোমার বড় মামা বলছিল—কাঙালী ভোজনের কথা...

সেই বেশ ত, বাবা!

রায় বাহাদুর বলিলেন—না, না, অত তাড়াতাড়ি নয়, বেশ ভেবে চিন্তে বলতে হ'বে। অবশ্য গোটাকত কাঙালী খেতে পাবে বটে, কিন্তু তা'তে কাজ কিছু হবে না বাবা। সারা দেশের কঙ্কোলী খাওয়াবার এমন সাধ্যও কিছু আমাদের নয়, মিছে কতক মতক খাইয়ে দুনামও হ'বে না, আর গালাগালিও সইতে হ'বে। ও বেটারা খেয়ে আর কবে সুখ্যাতি করে বল? বাবার সময় সেই গাল দেবেই, পয়সাকে পয়সা গেল, বাড়ীর ভাগ গালাগাল, তার চেয়ে আমি বলি কি, ওটাকাটা—ধর এই হাজার পাঁচেক টাকা তখরচ হ'তই—দুঃস্থ ভোজন করাতে, সেইটে—আমি বলি কি, ঐ 'বেবী ক্লিনিক' না কি খুললে সেদিন লেডী রিডিং সেইটিতেই দিয়ে দিই।

অমল সোৎসাহে কহিল—সেই বেশ।

রায় বাহাদুর লঘুচিত্তে কহিলেন—তা'হলে তাই ভালো—কেমন? বেশ, কাজ কর্ম মিটে যাক্, টাকাটা বউ মা সুচারুর নামেই দেব, কি বল অমল?

অমল নতমুখে, পুলকিতকণ্ঠে বলিল—সে আপনি যা ভাল বুঝবেন, বাবা...

অমলের এক সাহিত্যিক বন্ধু অমলের অপরিসীম পিতৃভক্তির সংবাদে তাহার গলাটী জড়াইয়া ধরিয়া বলিল—তোর জীবনকাহিনী ছাপবার সময় পিতৃভক্তি বলে একটা প্রকাণ্ড অধ্যায়ই রাখতে হ'বে দেখছি।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

সুচারু ডক্টর এস্ সি সেনের কন্যা। ডক্টর এস্ সি সেন! যেহার অঞ্চলের ডাক্তার, আপাততঃ ইনি কলিকাতাবাসী হইয়াছেন; চৌরঙ্গীতে সুবৃহৎ অট্টালিকা—সেই ডক্টর এস্‌সি সেনের কন্যা সুচারু। অমলের সহিত তাহার বছর চারেক আগে প্রথম দেখা হইয়াছিল। দেখাটা অবশ্য অত্যন্ত সাধারণ রকমেই হইয়াছিল এবং ভবিষ্যতে কোন দিন যে সেই দেখাটা অন্য কোন আকার ধারণ করিতে পারে তাহা বোধ করি স্বয়ং অন্তর্যামীরও জানা ছিল না।

তবে যদি সত্য কথা বলিতে হয়, অমল প্রথম সেই দেখার দিনেই সুচারুকে দেখিয়াছিল, নির্মেঘ আকাশে একখণ্ড জ্যোৎস্নার মত! আহা!

মধুপুরে প্রথম সাক্ষাৎ!

তার পর হঠাৎ একদিন রায় বাহাদুর বলিলেন—সুচারুকে তোমার কেমন মনে হয়, অমল?—অমল অবশ্য মুখ ফুটিয়া বলে নাই কিন্তু উত্তর দিয়াছিল। মুখ না ফুটুক—তাহার আরক্ত কর্ণদ্বয় বলিয়াছিল, তাহার আঁখিই নেত্র দু'টি জানাইয়া দিয়াছিল।

ইতিমধ্যে সুচারুর সঙ্গে তাহার বেশ আলাপ হইয়া গিয়াছে। কয়দিন সেখানে নিমন্ত্রণ হইয়াছিল, সুচারু, সুচারুর মা তাহাকে খুব আদর যত্ন করিয়াছেন। সুচারু নীচে নাম সহি করিয়া নিজের একখানি ফটো উপহার দিয়াছে।

সুচারু মেয়েটি—দেখিতে অসাধারণ এমন কিছু নয়, তবে চেহারাটি বড় স্নিগ্ধ, বর্ণ শ্যাম, পরিপূর্ণ দেহ, মুখখানি চোখ দু'টি অনিন্দ্যনীয়।

অমলের শয়নকক্ষে ম্যান্টল পেলের উপর ঐ-যে বঙ্গীয় যুবতীর প্রতিকৃতিটি—সেইটিই সুচারুর। সুচারুর অঙ্গে অলঙ্কারের বাহুল্য নাই, বুঝি তাহার প্রয়োজনও ছিল না,—অলঙ্কার সে রূপের শোভা আর কি বাড়াইবে? বেশ-র চাকচিক্য নাই—কিন্তু সেই সংযম সাদাসিধা সাড়ীতেই সুচারুকে কি সুন্দর দেখাইতেছে!

উচ্চশিক্ষিতা মেয়েদের সঙ্গে অমলের কোন দিনই পরিচয়ের সৌভাগ্য ঘটে নাই; তাই বরাবরই তাহাদের সম্বন্ধে খানিকটা সঙ্কোচ, খানিকটা সম্ভ্রম আর খানিকটা প্রলোভন মিলিয়া মিশিয়া অমলের মনের মধ্যে এমনই তাল পাকাইয়াছিল যে অনেকদিন পর্য্যন্ত বেচারা ভাবিয়াই পায় নাই যে, সে সুচারুর যোগ্য হইবে কি-না! সুচারু তাহাকে প্রাণ মন দিয়া ভালোবাসিবে কি-না! অমলের সংসারে এক মা ছাড়া আর রমণী কেহই ছিলেন না; তার উপর মা কোথায় যাওয়া আসা করিতে একান্তই নারাজ থাকায় তাহাদের বাড়ীতেও কোন শিক্ষিত মহিলার গমনাগমন ছিল না। কাজেই অমলের মনের ভয় বা সঙ্কোচ বরাবরই সমানভাবে থাকিয়া গিয়াছিল। আজ সেদিন সে সুচারুর সহিত অমায়িক ব্যবহারে সন্তুষ্ট হইয়া আসিতে পারিয়াছে। অন্য মেয়েরা কি রকম, তাহারা সুচারুর মতই কি-না অমল এখনও জানিতে পারে নাই, বোধ হয় আর জানিবার প্রয়োজনও নাই তবে সুচারুকে লইয়া যে-সে সুখী হইতে পারিবে এ বিষয়ে তাহার একতিল সন্দেহও ছিল না।

পূর্ব্বকালে ওকালতী করিয়া এবং একালে তেজারতীর ছলে-বলে-কৌশলে সংসারের আসল উপাদানটি পর্য্যাপ্ত পরিমাণে সংগ্রহ করিতে রায় বাহাদুর কোন দিনই অবহেলা করেন নাই এবং কলিকাতার ধনী মহলে তাঁহার নাম-ডাকও একটু আধটু ছিল তবে সাহেব মহলে প্রতিপত্তিটা ছিল অনেকের চেয়েই বেশী। সেটা এতই বেশী হইয়া উঠিয়াছিল যে শ্যামবাজারের বাড়ীটা মনের দুঃখে বিক্রয় করিয়া কেবলমাত্র গৌরচন্দ্রের মন রক্ষার্থেই তাঁহাকে বালিগঞ্জে বাড়ী করিতে হয়। বালিগঞ্জে আসায় তাঁহার দুইটা সুবিধা হইয়াছিল। প্রথম, ফটকের পার্শ্বে নিজ নাম ফলক আঁটিয়া তাহার গায়ে 'আউই' লিখিয়া দিয়া আত্মীয় অনাত্মীয় দরিদ্র উমেদারদিগের হাত হইতে নিস্তার লাভ করিয়াছিলেন; দ্বিতীয়, সাহেবেরা যখন খুসী রায় বাহাদুরের দর্শন পাইয়া চরিতার্থ হইতেন। রায় বাহাদুর গভর্ণমেণ্টকে চাঁদা দিয়া নাম কিনিতে প্রস্তুত ছিলেন—এ অপবাদ পরম শত্রুতেও তাঁহার দিতে পারিবে না। তবে সাহেবদের উপর তাঁহার কেমন একটা আক্রম্য প্রীতি ছিল, তাই সময়ে অসময়ে কারণে-অকারণে সাহেবদের দেটা না জানাইয়া তিনি থাকিতে পারিতেন না। লিণ্টন সাহেব ত একটা কালোপাহাড় ছিল, কাশিয়ঙে যখন খুন করে তখন রায় বাহাদুর কি কম সাহায্যটা করিয়াছিলেন! পোড়াডাঙার সমাধি স্থানটি আপনারা নিশ্চয়ই দেখিয়াছেন, প্রায় বিশ পঁচিশ বিঘা জমি হইবে, কম করিয়া মূল্য ধরিলেও দশ হাজার টাকা কাঠা ত বটেই, কে নিঃস্বার্থভাবে দিতে পারে? তা'ও আবার অনাত্মীয় বিদেশী বিধর্ম্মী বিজাতীর জন্য? রায় বাহাদুর কিন্তু এতটাই পারিয়াছিলেন।

গভর্ণমেণ্টের তহবিলে খুব দিবার ইচ্ছা রায় বাহাদুরের কোনদিনই ছিল না, এখনো নাই। তবে এবার যে ঐ বেবী ক্লিনিকের জন্য টাকাটা দিবেন স্থির করিয়াছেন উহাও তিনি গভর্ণমেণ্টকে দিতেছেন না, লেডী রিডিং গভর্ণমেণ্টের তরফ হইতে ঐ সমিতি স্থাপন করেন নাই, তিনি নিজে ব্যক্তিগত হিসাবে ঐ মহৎ অনুষ্ঠানে ব্রতী

হইয়াছেন—রায় বাহাদুর সেই কারণেই পাঁচ হাজার টাকা তাঁহার হস্তে দিবেন—এইরূপ সঙ্কল্প করিয়াছেন।

ডাক্তার সেন বিবাহে যৌতুক বা কন্যার অলঙ্কার বাবদ পাঁচটি হাজারও দিতে পারিবেন না—তবু যে রায় বাহাদুর এমন একটা কাজে নামিয়াছেন তাহার উদ্দেশ্য আর কিছুই নহে, কেবলমাত্র দেশের কোন এক কন্যাদায় পীড়িত ভদ্রলোককে আশু বিপন্মুক্ত করিতে। তাঁহার পুত্র, ঐ একমাত্র পুত্র, না-ই বা পাশ করা হইল। আর নয়ই বা কেন? অমল ত পাশ করিয়াছিল, ইউনিভারসিটি গোল-মাল করিয়া নম্বর কমাইয়া, বদনাম রটাইয়া ফেল করিল বৈ ত নয়! তাহার বিবাহে যে পঁচিশ ত্রিশ হাজার আসিত—তাহাতে কি কাহারো কোন সন্দেহ থাকিতে পারে? অতি বড় হিংসক লোকও বলিতে বাধ্য হইয়াছিল যে ডাক্তার সেন যেমন ধান ধানিয়াই ফতুর হইয়াছেন, তাঁহার তেমন ঘর আছে, তেমন বর—রায় বাহাদুর তেমনি বিনা-পণে উহার মেয়েটিকে গ্রহণ করিয়া বড়ই বদান্যতা প্রকাশ করিয়াছেন! হইবে না কেন? ঈশ্বর আছেন ত! ডাক্তার সেনের মত লোক যে তাঁহার দয়া প্রাপ্ত হইবেন ইহা আর বিচিত্র কি? তাঁহার নিজের মুখেরই একদিনের কথা বলিতে পারি—তিনি কোন অন্তরঙ্গ বন্ধুকে বলিয়াছিলেন—দেখ, সুচারুর গর্ভে আমি কোনদিনই ভাবি নি। কেমন আমার বিশ্বাস ছিল, ওর বিয়েটা আমি থাকতে থাকতেই দিয়ে যাব। তবে সুলতার জন্যে সত্যিই আমার ভাবনা হয়—ভাই, ততদিন যদি না থাকি, তাই ভাবছি ওর জন্যে একটা কিছু করতে হ'বে। কিন্তু কি ক'রে যে করব—তা ত জানি নে। তুমি ত সবই জানো। দু'তিন হাজার টাকা ত কি মাসেই আসে, কিন্তু কি-যে হ'য়ে যায়—কে জানে! দেখ রমেশ, বড় গরীব দেশ এ.....তোমার দুঃখের গ্রামের দিকে চেয়ে যে কত হাজার হাজার লোক হা করে বসে আছে, তার আর সংখ্যা নেই!

বন্ধু রমেশচন্দ্র বলিয়াছিলেন, কিন্তু তুমি যে কিছুই রাখতে পার না এ বড় দুঃখের কথা, সেন। এত রোজগার করেও যে তোমার মেয়েটির বিয়েতে তুমি কিছুই দিতে পাচ্ছনা এতে রায় বাহাদুরও যে খুব সন্তুষ্টচিত্তে এ কাজ করছেন, আমার ত এমন মনে হয় না ভাই! তাঁর পূর্ব্ব ইতিহাস ত জানি, তিনি বিনা পয়সায় কাজ করছেন শুনে প্রথমটা ত বিশ্বাসই হয় নি—ইংরাজী বাংলা খবরের কাগজে পড়েও বিশ্বাস করতে পারি নি; তারপর যখন তোমার স্ত্রী আমাদের বাড়ীতে গিয়ে বলে এলেন তখন, কাজেই বিশ্বাস করতে হ'ল—কিন্তু ভাই আশ্চর্য্য!.....

নাহে রমেশ! আশ্চর্য্য হ'বার কিছু নেই। ভেতরে কথা আছে। অমল সুচারুকে খুব পছন্দ করেছে বলেই রায় বাহাদুর 'না' করতে পারেন নি। আর ও পূর্ব্ব ইতিহাস যাই হোক্—এখন কিন্তু লোকটির ব্যবহারে শত্রুরা তুমিও প্রশংসা না করে' পারবে না। সেদিন আমি বল্লাম যে আমার সংসারে সুচারুই গিন্নী, বাপ যা রোজগার করে' আনে, মেয়ে বাপের সঙ্গে দু'হাতে এমন খরচ করতে শিখেছে যে, অনেক সময় বাপ ও হার মেনে যায়! গরীব দুর্ব্বোর নাম শুনলেই মেয়ের আমার চোখ দিয়ে জল বেরিয়ে পড়ে। শুনে কি বল্লেন জান? রায় বাহাদুর সুচারুকে আশির্ব্বাদ করে' বল্লেন যে, এই ত চাই! বাপের ঘরে যতদিন ছিলে সে ঘর সার্থক করেছ, এইবার শ্বশুরের ঘর, স্বামীর ঘরও সার্থক করতে চল মা!—কি বল রমেশ?

রমেশচন্দ্র বলিয়াছিলেন, তাই ত হে! • •
কিন্তু কাগজ পত্রে এতটা হাঁকাহাঁকি করার কি দরকার ছিল বল? ক'দিন দেখছ ত...

তা'তে আর ওঁর দোষ কি বল? লোকে ত বলবেই হৈ চৈ! আর আমি ত কোন দোষই দেখিনে তাতে রমেশ। এই রকমই ত চাই! দেশের কত লোক এই থেকে শিক্ষা পেতে পারে জান?

তা হয় ত পারে, কিন্তু আমার কথা হচ্ছে এই যে রায় বাহাদুর এতটা না করলেই পারতেন!

ডাক্তার সেন সহাস্যে কহিলেন, তুমি ভাবছ কাগজে রায় বাহাদুরই লিখছেন! পাগল আর কি!

রমেশবাবু অপ্রসন্নভাবে কহিলেন—বিশ্বাস করছ না বুঝি? আমি কাল নিজে তোমার ভাবী জামাতাটিকে দেখেছি "সেবক" অফিসে। একটা কি লেখা কালীবাবুকে বোঝাচ্ছিল।

ওহো! আজকের কাগজে দেখ-নি বুঝি তুমি! অমল "সিভিল গার্ডদের" উৎসাহিত করে একটা চমৎকার চিঠি লিখেছে হে! ঐযে রাস্তায় গরু কুকুরের পিঠে পেটে সব রঙীন কালী দিয়ে সিভিল গার্ড লিখে দিয়েছে কিনা—তারই ওপর চিঠি খানা—সত্যি ওতে বড়ই নীচতা প্রকাশ পাচ্ছে, রমেশ। অবশ্য ছেলেছোকরায় করছে আমি জানি কিন্তু তাদের গার্জ্জেন বা নেতাদের ওটা প্রশ্রয় দেওয়া ভাল হ'চ্ছে না। অমল ও সেই কথাই লিখেছে যে অন্যের নীচতা দেখে তোমরা পেছিও না, তারা নীচ, তাই বলে তোমরা কেন উচ্চ হ'বে না? তোমাদের উচ্চতা দেখলে তারাই একদিন না একদিন বুঝবে যে ভাল হ'চ্ছে না।

রমেশ বাবু বলিয়াছিলেন—খুব ভালো হচ্ছে।

অল্প দু'একটি কথার পর রমেশচন্দ্র জিজ্ঞাসিলেন—তুমি সত্যই কিছু দেবে না রমেশ?

কোত্থেকে দেব ভাই! আর দেওয়া? সুচারুর চেয়ে বড় সম্পদ ত আমাদের কিছুই নেই।

কিন্তু রায় বাহাদুরের ধারণা অন্যরকম, সেন। তিনি

আশা করে আছেন যে 'দেব না' 'দেব না' করেও তুমি যা দেবে তা কোন মতেই অল্প হ'বে না।

তা ত হ'বেই না রমেশ! সুচারু একদিকে আর লক্ষ টাকার হীরা জহরৎ একদিকে—

কিন্তু তিনি তাতে ভুলবেন বলে মনে হয় না।

রমেশবাবুর দিকে গড়গড়ার নলটী অগ্রসর করিয়া দিয়া ডক্টর সেন সহাস্যে কহিলেন—তুমি অবিচার করছ রমেশ! অমল সবই জানে, তাতে সে একটুও বিচলিত নয়। অনেকদিন আগেই এ কার্য্য হয়ে যেতে পারত, তারও চেষ্টা করেছিল কেবল আমার স্ত্রীর অসুখের জন্যই হ'তে পারে নি।

রমেশ কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলেন—যাই বল ভাই, ওদের সঙ্গে কাজ না করাই উচিত ছিল তোমার! শুধু তোমাকেই বা বলি কেন, বাঙ্গালা দেশের কোন ভদ্রলোকেরই উচিত নয় যে ওদের সঙ্গে কোন সম্বন্ধ স্থাপন করে। মেয়ের বিয়ে দেওয়া ত দূরের কথা।

সেন পুনরায় হাসিয়া বলিলেন—রমেশ, মেয়ের বিয়েটাই বাঙ্গালা দেশে এক মস্ত সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে, তার মধ্যে আর রাজনীতি ঢুকিয়ো না ভাই। গরীব মেয়েদের বাপ-মা বেচারারা মারা পড়বে।—একমুহূর্ত্ত থামিয়া সুচারুর মুখের উপর স্থির দৃষ্টি রক্ষা করিয়া কহিলেন—তোমার সে সব মত কোথা গেল, রমেশ! তুমি না খুব ঈশ্বর বিশ্বাস করতে? এখন ছেড়ে দিয়েছ বুঝি! আমি কিন্তু এখনও করি।

রমেশচন্দ্র কথা বলিলেন না। ঈশ্বরে বিশ্বাস তিনি অল্প করিতেন না, কিন্তু মানুষের মন সেই বিশ্বাসকে ছাপাইয়া কখন যে যুক্তি-তর্কের বিষয়ীভূত হইয়া পড়ে তাহা অনেক মানুষই সময়ে বুঝিতে পারে না!

বিশ্বাস করিয়া যতখানি অগ্রসর হইয়াছিল, যুক্তি তর্কের প্রাবল্যে যে তার চেয়ে বেশীদূর পিছাইয়া যাইতে হয় জানিয়াও কেন যে সামলাইতে পারে না, তাহা আমরা জানি না, যা বুঝি না।

ডক্টর সেন বন্ধুর হাত ধরিয়া বলিলেন—উপরে চল। সুচারুর মাসী নিজের হাতে পশমের কাপড় বুনে পাঠিয়েছেন, তেমন আর দেখিনি, এস দেখবে। চমৎকার জিনিষ হয়েছে। কাল সেই কাপড় পরিয়েই সুচারুকে সম্প্রদান করব। এস.....

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

বিবাহের অব্যবহিত পরেই নব দম্পতীরা কি ভাবে যা কি করে তাহার একটা মোটামুটি বর্ণনা দিবার ক্ষমতাও আমার নাই, কাজেই আমি তাহা হইতে বিরত হইলাম। আর আমার বিশ্বাস সে বর্ণনা অত্যন্তই নিষ্প্রয়োজন।

সুচারু সুন্দর মুখখানি তুলিয়া সহাস দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিল—তুমি যে সত্য সত্যই রাত জাগতে আরম্ভ করলে?

অমল ম্লান মুখে কহিল—বলুন ত সুচারু, যে রাত্রেই আমাকে বাবার সঙ্গে বাহিরে যেতে হবে। যতক্ষণ আছি—ঘুমব না।

সে যথাসম্ভব তদগত ও প্রেম পূর্ণস্বরে কথা কয়টী বলিয়াছিল এবং বিচ্ছেদাশঙ্কায় কণ্ঠের নীচেই সেন খানিকটা বাষ্প জমিয়া তাহার মুখটীকেও করুণ করিয়া তুলিয়াছিল—এমত অবস্থায় আশা করা আদৌ অসঙ্গত নহে যে এই বিরহ ব্যথা, ধরিত্রীদেবীও বাজিবে! আপনা আপনি তাহার গলাটীও ভিজিয়া উঠিবে, কিন্তু হায়! সুচারু হাসিয়া ফেলিল। বলিল—আমি বলি, বাবার সঙ্গে যেতে হ'লে যখন রাত জাগতেই হ'বে এখন এখন একটু ঘুমিয়ে নাও! বুঝলে?

অমল কি বুঝিল, কে জানে! তাহার মুখ সহসা আঁধার হইয়া আসিল। বলিল—বেশ, তুমি ঘুমাও। আমি কাপড় চোপড় ঠিক করে নিই।

হ'বে এখন। কাপড় চোপড় ঠিক করার এত তাড়া পড়ল কেন?—না, না এখন ঘুমোও, আমি তোমায় ডেকে দেব'খন।

তুমি বুঝি জেগে থাকবে?

আমি ত জেগেই—আমার ঘুম যে খুব কম হয়।

অমল বলিল—সেই জন্যে বুঝি মাথার কাছে ঘড়ি রেখে দাও।

সুচারু লজ্জানম্র মুখে কহিল—না না, রাত্রে আমি পড়ি না। দেখ, কাল অবধি বাড়ীময় ঐ একটা কথাই শুনতে পাচ্ছি, চাকর বাকর অবধি বলাবলি করছে যে আমি দিনরাত বই নিয়ে থাকি। কেন বল ত? কেউ দেখেছে আমায় দিনরাত বই নিয়ে বসে থাকতে?

অমল সুচারুর ম্লান মুখের দিকে চাহিয়া ব্যথাক্লিষ্ট মুখে কহিল—ওত দোষের কথা নয় সুচারু, বলেই বা! আর বইগুলি পড়বে বলেই ত এনেছ—কেন পড়বে না, পড়বে। আমি বলছি—তুমি পড়ো।

সুচারু এক মুহূর্ত্ত নীরব রহিল; তারপর ধীরে ধীরে কহিল—আমি বই আনি নি, পড়তেও চাই নে। বাবা জোর ক'রে আমার বইগুলো সঙ্গে দিয়ে দিয়েছিলেন, আর আমার কি মাথাটা সেখানে যে রকম খারাপ থাকত সেই রকম করে, আমার মাথার কাছে সাজিয়ে রেখেছে—আমার দোষ নেই। শুনলুম বাবাও বিরক্ত হয়েছেন...

অমল তাহা জানিত। পিতা যথাসময়ে বিরক্তি প্রকাশ করিয়াছিলেন, তবে কেবলমাত্র গ্রন্থপ্রীতিহেতু নহে, অমল তাহা জানিত—কিন্তু এ বিষয়ে সে পিতার সঙ্গে এক মত হইতে পারিল না। সুচারুকে বেচারা অমল ভালবাসিয়াছিল। আর নবীন প্রেমিকের ভালবাসা, অন্ধ, সরল, জ্ঞানশূন্য।

মুখের কথাটি কাড়িয়া লইয়া অমল সুচারুর মুখের কাছে মুখ আনিয়া বলিল - তা হোন্ তুমি বই পড়ো। দায় যা অত্যাস। বরং কাল থেকে সন্ধ্যের পর আর আমি বেরুব না। তোমার কাছে থাকব। তবে পড়া শুনা আমার বড় সুবিধে নয়, তা আগেই বলে রাখছি, হ্যাঁ তবে তুমি যদি বুঝিয়ে সুঝিয়ে দাও ..

যাও—বলিয়া সুচারু দুহাতে অমলের মুখখানি একটু খানি ঠেলিয়া দিল ; তখনি আবার বুকের কাছে টানিয়া আনিয়া বলিল—কথার কথার ঠাট্টা।

এবারে অমল আর ছাড়িল না। সুচারুর সুকোমল বাহু দু'টির উপরে নিজের দু'টি হাতের বন্ধন দিয়া শুইয়া পড়িল,—এবং বাহুলগ্ন থাকিয়াই, অমল ঘুমাইবে না স্থির করিয়াও ঘুমাইয়া পড়িল।

বিদ্যুতের আলোকে সুচারু নির্নিমেষ নেত্রে স্বামীর পানে চাহিয়া রহিল। একি মাদকতা, একি উত্তেজনায় তাহার হৃদয় মন বর্ষার স্রোতস্বতী নদীর মত উত্তাল হইয়া উঠিল! সেই গৌরবর্ণ, সুপুষ্ট সুন্দর যুবার মুখের পানে চাহিয়া চাহিয়া তাহার যেন আর আশ মিটিতেছিল না,—কিন্তু বেশীক্ষণ নহে, অল্পক্ষণ পরেই অমলের হাত দুটিকে সস্নেহে সন্তর্পণে এক পাশে নামাইয়া দিল। একটি হাত বুঝি একটুখানি বাঁকিয়া পড়িয়াছিল, মমতায় সুচারু যেন সর্ব্বাঙ্গে বেদনা অনুভব করিয়া হাতটি ঠিক করিয়া ধীরে ধীরে শয্যা ত্যাগ করিয়া আলোটি নিবাইয়া বাহির হইয়া গেল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

রাত্রি কত বলা যায় না, রায় বাহাদুর সসব্যস্তে পুত্রের শয়নকক্ষের রুদ্ধদ্বারের সম্মুখে আসিয়া ডাকিলেন—অমল! অমল!

অমল ধড়ফড় করিয়া উঠিয়া বসিল, নিদ্রাজড়িতকণ্ঠে জিজ্ঞাসিল—কে?

রায় বাহাদুর অনন্য গম্ভীরকণ্ঠে বলিলেন—আমি। একবার এদিকে এস।

রায়বাহাদুরের কণ্ঠস্বরে অমলের জড়িমা কোথায় অন্তর্দ্ধান করিল। সে অন্ধকারেই, দ্বার খুলিয়া বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইতেই রায়বাহাদুর বলিলেন—ঘরজাটা টেনে বন্ধ করে দাও।...এস।

অমল নির্ব্বাক বিস্ময়ে পিতাকে অনুসরণ করিয়া তাঁহার অফিস কক্ষে ঢুকিল। রায় বাহাদুর একখানা চেয়ারে বসিয়া গম্ভীরস্বরে আর একখানা চেয়ার দেখাইয়া বলিলেন—বস।

অমল চেয়ার খানায় বসিয়া পড়িয়া উৎকণ্ঠিত ভাবে পিতার মুখের পানে চাহিল।

রায় বাহাদুর বলিলেন—ডক্টর এস, সি সেন বলতে কা'কে বোঝায়?

অমল প্রশ্নটিই সম্যক বুঝিল না তা উত্তর দিবে কি? সে অবাক হইয়া চাহিয়া রহিল।

রায়বাহাদুর উত্তেজিত স্বরে কহিলেন—কলকাতায় আর কোন ডাক্তার আছেন ঐ নামের?

অমল বলিল—কি জানি!—বোধ হয় নাই। কেন?

রায় বাহাদুর সেলফ্ নির্দ্দেশ করিয়া বলিলেন—ডিরেক্টারীখানা পেড়ে দেখ আর কোন ডাক্তার ঐ নামের আছে কি না?

অমল ডিরেক্টারীখানা পাড়িয়া আনিয়া জিজ্ঞাসিল—কি হ'য়েছে বাবা?

হ'য়েছে, বলছি। তুমি দেখ।

অমল দু'চার পাতা উল্টাইয়া কহিল—ওঁর নামে ডাক্তার আর কেউ আছেন বলে ত বোধ হয় না।

রায় বাহাদুর কহিলেন—তাহ'লে তোমার শ্বশুরই ডক্টর এস্ সি সেন!—জুয়াচোর, লোফার!

অমল আরক্তমুখে আসন ছাড়িয়া উঠিয়া বলিল,—কি বলছেন আপনি?

তোমার শ্বশুর একজন নন্ কো-অপারেটার জান? মেয়ের বিয়ে দেবার সময় এ কথা আমাদের জানায় নি, গোপন করে' সব কাজ যখন শেষ করেছে...

অমল সসঙ্কোচে কহিল—কে আপনাকে মিথ্যে খবর দিয়েছে বাবা!

রায় বাহাদুর বলিলেন - মিথ্যে নয়। তোমার শ্বশুর ডক্টর এস্ সি সেনকে আজ পুলিসে ধরে নিয়ে গেছে—এই মাত্র খবর পেলুম।

ধরে নিয়ে গেছে?

হ্যাঁ।

অসম্ভব!

না, অসম্ভব নয়, বরং খুবই সম্ভব। সকালে খবরের কাগজ এলেই বুঝতে পারবে। আর খবর যে মিথ্যে নয় এর আর একটা প্রধান এই যে, তোমার শ্বশুর ঐ ডক্টর সেনেরই রমেশ বোস্ বলে কোনো বন্ধু আমাকে টেলিফোঁ করে জানালেন—যদি আমি তাঁর মুক্তির কোন উপায় গভর্ণমেণ্টকে বলে ক'য়ে করতে পারি। কাজেই বুঝতে পারছ, মিথ্যে নয়!

অমল যুক্তিতর্ক ভুলিয়া গেল। কোথাকার এতটুকু একটি বলিন মুখ আর সজল দুটি আঁখি তাহার মনের পাতায় ভাসিয়া উঠিল, অমল বিহ্বলের মত বলিল—আপনি কি বলেন?

রায় বাহাদুর স্থিরস্বরে কহিলেন—সে কথা পরে বলছি। তুমি আগে তাঁর মেয়ের কাছে খবর নাও সে এ সম্বন্ধে কিছু জানে কি-না!

অমল বলিল—কা'কে জিজ্ঞাসা করব? সুচারুকে?

তিনি কি করে, জানবেন, কলকাতায় কি হ'য়েছে না-হয়েছে?

রায় বাহাদুর গর্জ্জিয়া উঠিলেন, বলিলেন—তা না জানেন, তাঁর বাপ্ নন্-কো-অপারেটোর কি-না তা ত বল্‌তে পারবেন। তাহলেই হ'বে।

তবুও অমল উঠিল না। সরলা বালিকাকে নিদ্রা হইতে তুলিয়া কোন রূঢ় প্রশ্ন করিতে তাহার যুবা-চিত্ত কিছুতেই যায় দিতেছিল না, সে নতমুখে বসিয়া রহিল। ঠিক সেই সময়েই, অমলের জননী কক্ষমধ্যে আসিয়া দাঁড়াইলেন।

রায় বাহাদুর বলিলেন—বসে রইলে কেন অমল? জিজ্ঞাসা করে এস……

গৃহিণী জিজ্ঞাসিলেন—কা'কে আবার জিজ্ঞাসা করবে? বউমাকে?

হ্যাঁ গো হ্যাঁ, বৌ-মাকে।

তাকে কেন? সে জানবে কেমন করে? আর, একটা রাত্রি তুমি অপেক্ষা করতে পারছ না—কাল সকালেই ত সব জানা যাবে। একটা রাত্রি বৈ ত নয়।

রায় বাহাদুর ভ্রূকুঞ্চী করিয়া কহিলেন—না, একটা রাতও নয়। যদি জান্‌তে পারি তা হ'লে ওঁকে আজই কলকাতায় পাঠিয়ে দেব। এখানে ওঁর থাকা হবে না।

অমল দীপ্তনেত্রে পিতার পানে চাহিল; কিন্তু কথা কহিতে পারিল না। তাহার জননী বলিলেন—তার অপরাধ?

রায় বাহাদুর রোষরুক্তস্বরে কহিলেন—সে তুমি বুঝবে না। পরে পুত্রের উদ্দেশে কহিলেন—বুঝতে পারছ অমল, যদি কথা সত্য হয়, বিপদ কতদূর গড়াবে। গবর্ণমেণ্ট যে শুধু তা'কে ধরেই ক্ষান্ত হ'বে—তা নয়—তার সম্পর্কে যে যেখানে আছে সব টেনে টেনে বার করবে, আর ফল কি দাঁড়াবে তা আর তোমাকে বোধ করি বল্‌তে হ'বে না। শুধু তাই নয় অমল, তোমার সেই ছোট দাগা-ঘা'য়াটির জন্য আগে থাকতেই আমাদের সন্ত্রস্ত থাকতে হ'য়েছে, জানই ত তারই জন্যে সেদিন সেই ডুমীল ছোঁড়া-কেও তাড়াতে হ'য়েছিল, তবে সে সহজে সুবিধা এই তাঁর সম্পর্কের কাউকে এ বাড়ীর ত্রিসীমানায় কেউ দেখ্‌তে পায় না। তোমার বিয়েতে যে তাঁদের বলিনি কেন, তুমি ত জান!

অমল নীরবে বসিয়া রহিল।

রায় বাহাদুর বলিলেন—এ একটা মস্ত পরীক্ষার সময় এসেছে। মাথা গরম করেছ কি মেরেছ! দেখছ ত—দিনের পর দিন সব পঙ্গপালের মত চলেছে, তাদেরে তারি কাজ করছি। আরে বাবু ওতে কি আর ওরা ভয় পায়? হরদম্ ধরবে আর পুরবে, দিনকতক বাদে তোদেরই দল শেষ হ'য়ে যাবে, তখন তোদের দলের যেখানে যার সন্ধান পাবে তা'দেরই কি অমনি অম্নে ছাড়বে ভেবেছিস্? এই রাগ সব তুল্‌বে না? অক্ষরে অক্ষরে মিলিয়ে মিলিয়ে তুল্‌বে!

রায় বাহাদুর একমুহূর্ত্ত থামিয়া পুনশ্চ কহিলেন—তাই এসময়টা বুঝে চলাই হ'চ্ছে বুদ্ধিমানের কাজ! পয়সা কড়ি বল, মান সম্ভ্রম বল, কতক্ষণ থাকবে ওদের চটিয়ে রাখলে? না থাকতে পারে? চাল নেই, তরোয়াল নেই নিধিরাম সর্দ্দার হ'লেই হ'ল! ঝাড় মার, বাস্ মার!

অমল নিরুত্তর। গৃহিণী বলিলেন—তা আমরা ত আর তাঁর সঙ্গে সম্পর্ক নূতন করে কিছুই করতে যাচ্ছি নে, আমাদের ভয়ই বা কিসের? আর বউমা আমার তেমন নন্! এই ত ক'দিন এসেছেন, দেখ্‌ছি ত, লেখাপড়া নিয়েই থাক, অন্য কোন দেমাকই নেই নে।

রায় বাহাদুর বিরক্তভাবে বলিলেন—কথা হ'ত না যদি কাজটা অনেকদিনের পুরাণো হ'য়ে যেত! এখনও যে দশ দিন হয় নি, অমলের বিয়ে দিয়েছি, এ থেকে ওদের ত সন্দেহ হ'তেই পারে—জেনে শুনে আমি রাজদ্রোহীর ঘরের মেয়ে এনেছি। একবার সন্দেহ হ'লে কি রক্ষা আছে ভেবেছ? ধরতে কতক্ষণ! এত বড় বাড়ী, এত পয়সা কড়ি, এত সম্মান, তখন কেউ আট্‌কাতে পারবে না, সব এক পাকে পুরবে!

গৃহিণী বলিলেন—হ্যাঁ গা তুমি কি বলছ? একি মগের মুলুক যে যা'কে ইচ্ছে অমনি ধরে ধরে সাজা দেবে!

মগের মুলুক ছিল না, পাঁচ বেটাতেই করে তুলেছে। সে কথা থাক্—অমল, তুমি যাবা বুঝে দেখ। আর আমি অন্যায় কথা কিছু বলছি নে,—যতদিন না এই সব হাঙ্গামা মেটে, ততদিন উনি কলকাতায় থাকুন, তারপর সব চুকে বুকে গেলে আস্‌বেন—কি বল?

অমল বিরক্তি না করিয়া উঠিল, বাহির হইতে যাইবে, মা বলিলেন—কি বল্‌বি শুনি?

তাই ত সে কি বলিবে! অমল মা'য়ের পানে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

মা বলিলেন—ধরে নিয়ে গেছে টেছে যেন বলিস নে।

না—বলিয়া অমল বাহির হইয়া গেল এবং দু'মিনিট পরেই ঊর্দ্ধশ্বাসে ফিরিয়া আসিয়া বলিল—মা ঘরে সুচাক নেই! তোমার দেওয়া এই বালা জোড়া বালিশের নীচে পড়ে…

নেই কি রে অমল?

না, মা, নেই। আমি ওদিকটা সব দেখে এসেছি, নেই।

বলিয়া অমল চেয়ারখানায় বসিয়া পড়িল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

রায় বাহাদুর স্থির গম্ভীরস্বরে কহিলেন…তা হলে তিনি লুকিয়ে আমাদের কথা সব শুনেছেন। শুনে অধীর হ'য়ে……

গৃহিণী বলিলেন—দেখ, তোমার বুদ্ধিশুদ্ধি সত্যিই লোপ পেয়েছে দেখ্‌ছি। বউমা শুনে অধীর হয়েই পালিয়েছেন—এই বুদ্ধি নিয়ে তুমি রায় বাহাদুর হ'য়েছ?

রায় বাহাদুর বলিলেন—তবে গেলেন কেন শুনি?

এ কথার উত্তর গৃহিণী তৎক্ষণাৎ দিতে পারিলেন না—পুত্রের দিকে ফিরিয়া কহিলেন—অমল, তুমি যখন উঠে এসেছিলে, বৌমা ত ঘুমোচ্ছিলেন, দেখেছিলে?

হাঁ—ব'লবাই অমল বলিল—না মা, তখন আমি অন্ধকারেই বেরিয়ে এসেছি, দেখি নি।

রায় বাহাদুর চেয়ারখানার উপর সটানভাবে শুইয়া পড়িয়া বলিলেন—যাক্—এক রকম নিশ্চিন্ত হওয়া গেল—আমাদের আর বেশী বকে' বল্‌তে হ'ল না। কি বল অমল?

এ কথায় গৃহিণী একেবারে জ্বলিয়া উঠিলেন, বলিলেন—তুমি কি মানুষ নও?...অমল, এস ত বাবা—দেখি.....

ঘরের বাহিরে আসিয়া বলিলেন—বৌ-মার কি পশ্চিমের ঘরটায় থাক্‌তো, সে ঘরটা দেখেছ? দেখ নি—চল দিকিন। সে'ও যদি না থাকে,.....

বাধা দিয়া অমল বলিল—মা এ'ও কি সম্ভব?

কি অসম্ভব অমল?

সুচারু এই রাত্রে একলা.....

হ'তে যে না পারে এমন নয়' বাবা। বাপকে পুলিসে ধরে নিয়ে গেছে শুন্‌লে কোন সন্তান স্থির থাক্‌তে পারে?

তা হ'লেও এত রাত্রে একলা যাওয়ায় লোকে কি...

অমল ইতস্ততঃ করিতেছে দেখিয়া গৃহিণী বলিলেন—লোকে নিন্দা করবে? সেটা আশ্চর্য্য নয়, অমল। তোমার বাবার মত লোকের অভাব নেই, কিন্তু আমি নিন্দা করব না।

তাঁহারা কথা কহিতে কহিতে পশ্চিমের ঘরের দ্বারের সম্মুখীন হইতেই দেখিলেন, কক্ষমধ্যে আলোক জ্বলিতেছে, দ্বারের ফাঁক দিয়া আলোকের সরু সরু রেখাগুলি বাহিরে পড়িতেছিল।

দ্বার ভেজানই ছিল, ঠেলিয়া ঢুকিতেই বাহা দৃষ্ট হইল, যেমন আশ্চর্য্যজনক, তেমনি মনোরম।

ঝি-টি বসিয়া একরাশ তুলা সাফাইয়া সাফাইয়া তুলিতেছে, আর সুচারু নিবিষ্টচিত্তে একটা চরকা ঘুরাইতেছে।

ইহাদের দেখিয়া সুচারু দাঁড়াইয়া উঠিল। অমলের উদ্বেগ থামিয়া গিয়াছিল কিন্তু এখন নূতন আশঙ্কায় তাহার বুকটি ভরিয়া উঠিল।

অমল বলিল—তোমার বাবাকে পুলিসে নিয়ে গেছে সুচারু!

সুচারু জিজ্ঞাসিল—আজ?

অমল বলিল—হ্যাঁ, তিনি নন্-কোপরেশানের দলে ছিলেন।

সুচারু বলিল—জানি।

অমল হতবুদ্ধির মত তাহার পানে চাহিয়া রহিল; প্রায় দুই মিনিট পরে কহিল—তোমায় বাবাকে ধরে নিয়ে গেছে।

সুচারু বলিল...সে ত শুন্‌লুম।

অমল বলিল—জেল হ'য়ে যায়?

জানি।

অমল নির্ব্বাক! আবার কিছুক্ষণ পরে বলিল—আর তুমি?

সুচারু কথা কহিল না। বোধ হয় প্রশ্নটা বুঝিতে পারে নাই।

অমলের মা এতক্ষণ দূরেই দাঁড়াইয়াছিলেন। এক্ষণে অগ্রসর হইয়া আসিয়া বলিলেন—তুমি ও কি করছিলে বউমা?

সুচারু স্নিগ্ধকণ্ঠে কহিল—চরকা কাট্‌ছিলুম। বাবা আমাদের দীক্ষা দিয়েছিলেন, বলেছিলেন অবসর সময়টা...

পার?

পারি মা।

বই—দেখি?

সুচারু চরকার সামনে বসিয়া পড়িল। বাম হাতে তুলার গুচ্ছটি তুলিয়া লইয়া ডান হাতে চরকা ঘুরাইতে লাগিল।

এই সময়েই রায় বাহাদুর দ্বারের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন, কিন্তু যাহা দেখিলেন, তাহাতে তাঁহার চিত্তমধ্যে ঘাউ ঘাউ করিয়া আগুন জ্বলিয়া উঠিল, আহত সৈনিকের মত টলিতে টলিতে যুদ্ধক্ষেত্র পরিত্যাগ করিলেন।

এ-ঘরে আসিয়া পুত্রকে ডাকিয়া পাঠাইয়া বলিলেন—মোটর তৈরী অমল, বৌমাকে পাঠাবার ব্যবস্থা কর।

অমল নতমুখে বলিল—আমিই ওকে নিয়ে চল্লুম বাবা!

রায় বাহাদুর হতবুদ্ধির মত দ্বার বন্ধ করিয়া শুইয়া পড়িলেন। অমল এ ঘরে আসিয়া দেখিল, মা পরমোৎসাহে সূতা কাটা শিখিয়া লইতেছেন, আর সুচারু! মুখের প্রত্যেক রেখাটি সুস্পষ্ট, প্রফুল্ল। উদ্বেগের চিহ্নটিও নাই,—তন্ময়, একাগ্র! দেখিতে দেখিতে প্রভাত হইয়া গেল।

পরদিনই কলিকাতায় একটা বাড়ী ভাড়া লইয়া রায় বাহাদুর মণি খানসামাকে একমাত্র ও অধিতীয় সঙ্গী করিয়া গৃহ ত্যাগ করিলেন।

রোকশোধ

(শ্রীনারায়ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।)

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

অল্পবয়স্ক যুবককে কন্যার শিক্ষাকার্য্যে নিযুক্ত করিয়া মহেন্দ্রনাথ প্রথমতঃ চিন্তিত হইয়া পড়িয়াছিলেন; কিন্তু হেমচন্দ্রের বিনয় ও সৌজন্যে অল্পদিনের মধ্যেই একপ মুগ্ধ হইয়া পড়িলেন যে, আপনাকে সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত মনে করিলেন। তাহার ধীর নম্র ব্যবহারই যে মহেন্দ্রনাথকে মুগ্ধ করিল তাহা নহে, তদ্ভীন্ন উদার ধর্ম্ম বিশ্বাস দর্শনে তিনি অধিকতর পুলকিত হইলেন। হিন্দুধর্ম্মে আস্থাবান্ হইলেও ধর্ম্ম সম্বন্ধে গোঁড়ামী হেমচন্দ্রের আদৌ ছিল না। জাতি বিচার ও বর্ণবৈষম্যের ফলেই যে ভারতবর্ষের এতদূর অধঃপতন হইয়াছে, এবং তীক্ষ্ণবুদ্ধি ব্রাহ্মণগণ বিবিধ পুরাণ উপপুরাণের সৃষ্টি করিয়া মূল আর্য্যধর্ম্মটাকে সম্পূর্ণ বিলুপ্ত করিয়া দিয়াছেন ইহাই তাহার দৃঢ় বিশ্বাস, এবং এই বিশ্বাস ব্যক্ত করিতে করিতে ক্ষোভে ও দুঃখে তাহার কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিত। মহেন্দ্রনাথ বিস্ময় পুলকিতচিত্তে হেমচন্দ্রের এই গভীর আক্ষেপোক্তি শ্রবণ করিতেন এবং এই বাবিংশবর্ষীয় যুবক যে শুধু নির্দ্দিষ্ট পাঠ্য পুস্তক লইয়াই ছাত্র জীবন অতিবাহিত করে নাই, সেই সঙ্গে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য বিবিধ ধর্ম্মগ্রন্থের অনুশীলন করিয়াছে ইহা হৃদয়ঙ্গম করিয়া তাহার উপর প্রীত ও অনুরক্ত হইয়া পড়িতেন।

ক্রমে হেমচন্দ্রের শিষ্ট সরল ব্যবহারে মহেন্দ্রনাথ তাহাকে পুত্রবৎ স্নেহ প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। এই তীক্ষ্ণবুদ্ধি যুবককে কেবল শিক্ষকতা কার্য্যেই নিযুক্ত না রাখিয়া তিনি অবসর সময়ে তাহাকে জমিদারী সংক্রান্ত কার্য্য শিক্ষা দিতে আরম্ভ করিলেন। তাহার শিক্ষা-দান নিষ্ফল হইল না; বৎসরখানেকের মধ্যেই সে জমিদারী কার্য্যে অনেকটা দক্ষ হইয়া উঠিল। তাহার বেতন বিশ টাকার স্থলে পঞ্চাশ টাকা নির্দ্ধারিত হইল।

ক্রমে এমন হইল যে, অনেকেই সন্দেহ করিল, এই গৃহশিক্ষক কালে মহেন্দ্রবাবুর গৃহজামাতার পদে প্রতিষ্ঠিত হইবে। তাহাদের এই সন্দেহ যে নিতান্ত অমূলক ছিল তাহা নহে, পঞ্চাশ টাকা বেতনের গৃহশিক্ষক যেরূপ যত্ন ও আদর লাভ করিতেছিল, এবং চাল চলনে বেশ ভূষায়, কথায় বার্ত্তায় যেরূপ আড়ম্বর প্রকাশ পাইতেছিল, কোন জমিদার পুত্র তদপেক্ষা অধিক আড়ম্বর প্রদর্শন করিতে পারিত কি না সন্দেহ। সুতরাং প্রায় সকলেই হেমচন্দ্রকে জমিদারের জামাতার উপযুক্ত সম্মান প্রদর্শনে ত্রুটি করিত না।

মহেন্দ্রনাথের মনের ভিতরেও ঠিক এই রকম একটা উদ্দেশ্য ছিল কিনা বলা যায় না, কিন্তু হেমচন্দ্রের সহিত অনুপমার অবাধ মেলামেশায় তিনি কোনরূপ আপত্তি প্রকাশ করিতেন না। হেম ঠিক বাড়ীর ছেলের মতই হইয়া পড়িয়াছিল। সুতরাং পড়ার সময় ছাড়াও অনুপমা তাহার সহিত গল্প বা হাস্য পরিহাস করিলে মহেন্দ্রনাথ তাহাতে কিছুমাত্র বাধা দিতেন না, এবং এই ব্যাপার লইয়া বাড়ীর মধ্যে একটা আন্দোলনের সূত্রপাত হইলেও তিনি সে আন্দোলনে কর্ণপাত করিতেন না। তাঁহাকে এই বিষয়ে কেহ কেহ বিশেষতঃ তারকনাথ দুইচারিবার অবহিত করিবার জন্য প্রয়াসী হইয়াছিল, মহেন্দ্রনাথ কিন্তু নীরবে মৃদু গম্ভীর হাস্য দ্বারাই তাহাদের সেই প্রয়াসটুকুকে উড়াইয়া দিয়াছিলেন। ইহাতে আর সকলে নিরস্ত হইলেও তারকনাথ কিন্তু নিরস্ত হইতে পারিল না; সে কাজ কর্ম্মে, আচার ব্যবহারে হেমচন্দ্রের খুঁৎ ধরিবার জন্য চেষ্টিত হইল, কিন্তু তেমন কোন ত্রুটী খুঁজিয়া পাইল না। যে এক আধটু সামান্য ত্রুটী পাইল তাহাতে হেমকে অপদস্থ বা দোষী প্রতিপন্ন করিতে পারিল না। বিশেষতঃ মাতুলকেও হেমের সে সকল ত্রুটী সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীন দেখিয়া ক্ষুণ্ণ ও চিন্তিত হইয়া পড়িল, এবং মনে মনে হেমের উপর একটা তীব্র বিদ্বেষ পোষণ করিতে লাগিল।

ক্রমে অনুপমা পঞ্চদশ বর্ষে পদার্পণ করিল। তাহার লৌন্দর্য্যের যেখানে যেটুক ত্রুটী ছিল, যৌবন আসিয়া ধীরে ধীরে সে ত্রুটী সম্পূরণ করিয়া দিতে লাগিল, বসন্ত-স্পৃষ্টা পল্লবীর ন্যায় তাহার দেহলতা লাবণ্যের মাধুর্য্যে লোচনমনোহর হইয়া উঠিল। মহেন্দ্রনাথ বাল্য বিবাহের পক্ষপাতী না হইলেও যুবতী বিবাহের প্রতি অনুরাগী ছিলেন না। সুতরাং তিনি কন্যাকে পরিণয়পাশে আবদ্ধ করিতে উদ্যোগী হইলেন। হেম ও অনুপমা পরস্পরের প্রতি অনুরক্ত ইহা বুঝিতে তাঁহার বাকী ছিল না। তথাপি তিনি হেমের মনোভাব অবগত হইবার জন্য তাহার নিকট অনুপমার বিবাহের প্রসঙ্গ উত্থাপন করিলেন এবং কথাপ্রসঙ্গে জানিতে পারিলেন যে, অনুপমাকে পাইবার জন্য হেমচন্দ্র আগ্রহান্বিত হইয়া রহিয়াছে। এমন কি, এজন্য সে গৃহজামাতারূপেও অবস্থান করিতে প্রস্তুত। মহেন্দ্রনাথ তখন সানন্দে বিবাহের উদ্যোগ আয়োজন করিতে লাগিলেন। হেমের

বিনয় মধুর ব্যবহারে প্রায় সকলেই তাহার উপর সন্তুষ্ট ছিল; সুতরাং এই বিবাহের কথায় তাহারা সম্পূর্ণ আনন্দিত হইল।

শুধু দুই একজন—যাহারা খুব ভালর মধ্যেও কিছু মন্দ আছে এই ধারণা লইয়া হেমের উপর অকারণ বিদ্বেষ পোষণ করিত, তাহারাই ইহাতে আনন্দিত হইতে পারিল না, বরং ইহাতে বাধা দিতে চেষ্টিত হইল। ইহাদের মধ্যে তারকনাথই অগ্রণী। সে নানাপ্রকারে হেমের উপর অনুপমার বিরাগ উৎপাদনের চেষ্টা করিল। কিন্তু তাহাতে যখন অকৃতকার্য্য হইল, তখন হেমের চরিত্র সম্বন্ধে কতকগুলা কুৎসিত অভিযোগ লইয়া মাতুলের সমক্ষে উপস্থিত হইল। কিন্তু সে সকল অভিযোগের সত্যতা প্রমাণ করিতে না পারিয়া অপদস্থ ও মাতুলের নিকট তিরস্কৃত হইয়া ক্রোধ ও অভিমানের বশে গৃহ পরিত্যাগ করিল।

গৃহত্যাগ করিয়াও তারকনাথ নিশ্চেষ্ট রহিল না; সে বেনামীতে হেমের মাতাকে পত্র লিখিয়া জানাইল যে, তাঁহার পুত্র ব্রাহ্ম কন্যাকে বিবাহ করিয়া কুলে কালি দিতে উদ্যত হইয়াছে।

হেম যে মাতার বিনানুমতিতেই বিবাহ করিতেছিল তাহা নহে। কিন্তু মাতা জানিতেন, হেম হিন্দু জমিদারের কন্যাকেই বিবাহ করিতেছে। কন্যার বয়সের পরিমাণ শুনিয়া তাঁহার মনে একটু সন্দেহ আসিয়াছিল বটে, কিন্তু বড় লোকের ঘরে এমন বড় মেয়ে থাকা অসম্ভব নহে বিবেচনা করিয়া তিনি মনকে প্রবোধ দিয়াছিলেন। কিন্তু এক্ষণে বেনামী পত্র পাইয়া তাঁহার সে সন্দেহ বদ্ধমূল হইল। তিনি হেমকে লিখিয়া পাঠাইলেন, সে যদি এই বিবাহ করে, তবে মাতার অতিসম্পাতভাজন হইবে এবং মাতা আত্মহত্যা করিয়া পুত্রের এই পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিবেন। নিজের পত্রের সহিত মাতা বেনামী পত্রখানাও হেমের নিকট পাঠাইয়া দিলেন। হেম পত্র পাঠ করিয়া স্তম্ভিত হইল।

তখন বিবাহের সকল উদ্যোগ আয়োজন হইয়া গিয়াছে; আর কয়েকদিন পরেই বিবাহ। জমিদার কন্যার বিবাহে গ্রামের মধ্যে আনন্দ কোলাহল পড়িয়া গিয়াছে। এমন সময় হেম পত্র দুইখানা মহেন্দ্রনাথের হাতে দিয়া বিবাহের অসম্মতি জ্ঞাপন করিল। মহেন্দ্রনাথ যেন আকাশ হইতে পড়িলেন। বেনামী পত্রখানা দেখিয়া ইহা যে তারকনাথেরই লিখিত সে সম্বন্ধে তাঁহার কিছুমাত্র সন্দেহ রহিল না। তিনি হেমকে অনেকবার বুঝাইলেন, সমগ্র সম্পত্তি তাহার নামে লিখিয়া দিবার লোভ দেখাইলেন। হেম কিন্তু কোন প্রলোভনেই মাতার নিষেধ উপেক্ষা করিতে পারিল না। সে মহেন্দ্রনাথকে গভীর নৈরাশ্যসাগরে নিমগ্ন করিয়া অবিলম্বে জমিদারগৃহ ত্যাগ করিল। মহেন্দ্রনাথ নিষ্ফল রোষে ক্ষোভে ছটফট করিতে লাগিলেন। মর্ম্মন্তুদ যাতনায় বুকের হাড়গুলা পর্য্যন্ত যেন ভাঙ্গিয়া পড়িবার উপক্রম হইল।

অনুপমা আসিয়া পিতাকে সান্ত্বনা দিতে গেল। কিন্তু কন্যার মুখের দিকে চাহিতেই মহেন্দ্রনাথ বালকের ন্যায় কাঁদিয়া উঠিলেন। অনুপমাও অশ্রুধারায় পিতার বুক ভাসাইয়া দিল।

নিদারুণ লজ্জা ও অপমানের গুরুত্ব অনুভব করিয়াই যে মহেন্দ্রনাথ কাতর হইলেন তাহা নহে, অনুপমার মর্ম্মবেদনা কতক নীরব দীর্ঘশ্বাসই তাঁহাকে অধিকতর ব্যাকুল করিয়া তুলিল। ওঃ, কি কুক্ষণেই তিনি হেমকে অনুপমার শিক্ষক পদে নিযুক্ত করিয়াছিলেন? হেম—সেই শান্ত সরল প্রকৃতির যুবক যে তাঁহার উদ্দেশ্যকে এমন নির্ম্মমভাবে ব্যর্থ করিয়া দিয়া যাইবে, উহা কে জানিত? কি অকৃতজ্ঞ সে! অথবা তাহারই বা অপরাধ কি? হেম তো বিবাহের জন্য সম্পূর্ণ প্রস্তুত হইয়াই ছিল। মাতার নিষ্ঠুর আদেশ আসিয়া তাহাকে নিবৃত্ত না করিলে বোধ হয় পৃথিবীর আর কোন বাধা-বিঘ্নই তাহাকে এই বিবাহ হইতে পশ্চাৎপদ করিতে পারিত না। অথচ মাতৃ-আজ্ঞা লঙ্ঘন করিয়া, মাতার অভিসম্পাত মাথায় লইয়া সে যদি অনুপমার পাণিগ্রহণে অগ্রসর হইত, তাহা হইলে মহেন্দ্রনাথও বোধ হয় তাহার এই মনুষ্যত্ব-হীন ব্যবহারকে ক্ষমা করিতে পারিতেন না। সুতরাং মহেন্দ্রনাথ হেমকে কিছুতেই অপরাধী করিতে পারিলেন না, সমস্ত অপরাধের বোঝাই নিজের ঘাড়েই তুলিয়া লইয়া তাহার গুরুভারে যেন অবসন্ন হইয়া পড়িতে লাগিলেন।

পিতার অবস্থা দর্শনে অনুপমা শঙ্কিত হইল; বলিল, "তোমার শরীর দিন দিন ভেঙ্গে পড়ছে বাবা, চল দিনকতক পশ্চিমে ঘুরে আসি।"

মহেন্দ্রনাথও এখান হইতে পলাইতে পারিলে যেন বাঁচিয়া যান; গৃহের রুদ্ধ উত্তপ্ত বায়ু তাঁহার পক্ষে যেন অসহ্য হইয়া উঠিয়াছিল। তা ছাড়া দুঃখে অনুতাপে তাঁহার শরীরও যেন জীর্ণ হইয়া আসিতেছিল। আহারে রুচি ছিল না, রাত্রিটা এক প্রকার অনিদ্রাতেই কাটিয়া যাইত। সুতরাং কন্যার প্রস্তাবে তিনি সহজেই সম্মতি দিলেন এবং উপযুক্ত কর্ম্মচারীর হস্তে বিষয় কার্য্যের ভার অর্পণ করিয়া পিতা-পুত্রীতে বাহির হইয়া পড়িলেন।

কিন্তু বিষয়ী লোকের বেশী দিন বাহিরে থাকা চলে

না। তাঁহার অবর্ত্তমানে জমিদারীতে অনেক বিশৃঙ্খলা ঘটিতে লাগিল। কর বৃদ্ধি লইয়া প্রজাদের সহিত মনোবিবাদের সূচনা হইল, কতকগুলা মোকদ্দমা বাধিয়া গেল, একটা মহালের নায়েব কয়েক হাজার টাকা আত্মসাৎ করিয়া পলায়ন করিল। সুতরাং মাস দুই পরেই মহেন্দ্রনাথকে ফিরিয়া আসিতে হইল। ফিরিয়া আসিয়া তিনি জমিদারীর শৃঙ্খলা স্থাপনের জন্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন। এজন্য তাঁহাকে প্রভূত পরিশ্রম করিতে হইল। বহু পরিশ্রমে সোলযোসের কতকটা নিষ্পত্তি করিয়া মহেন্দ্রনাথ কন্যার বিবাহের জন্য চেষ্টিত হইলেন। তাঁহার চেষ্টা নিষ্ফল হইত না, কিন্তু অনুপমা যখন অশ্রুসিক্ত দৃষ্টিতে তাঁহার অন্তরের গুপ্ত বেদনাকে সজাগ করিয়া দিয়া কাঁদ কাঁদ মুখে বলিল, "বিয়ে এখন থাক্ বাবা, তোমার শরীর আগে দেখ, তখন মহেন্দ্রনাথ কন্যাকে প্রবোধ দিবার মত কোন কথাই খুঁজিয়া পাইলেন না, শুধু একটা গভীর দীর্ঘশ্বাসে মর্ম্মবেদনার কতকটা উচ্ছ্বাস যেন বাহির করিয়া দিয়া বিবাহের চেষ্টা হইতে নিবৃত্ত হইলেন।

শরীর কিন্তু তাঁহার সারিল না। ডাক্তারেরা বলিল —ক্ষয়রোগ। অনুপমা বড় বড় ডাক্তার দ্বারা চিকিৎসা করাইল, কলিকাতা হইতে বহু বিজ্ঞ কবিরাজ, অনেক নামজাদা সাহেব ডাক্তার লইয়া আসিল কিন্তু ফল কিছুই হইল না। মহেন্দ্রনাথের শরীর দিন দিন জীর্ণ হইতে জীর্ণতর হইয়া অনুপমাকে বুঝাইয়া দিতে লাগিল যে, মৃত্যু মহেন্দ্রনাথের সন্নিকটবর্ত্তী, তাহার কবল হইতে মুক্তি লাভের কোনই আশা নাই। অনুপমা কাঁদিয়া দিন কাটাইতে লাগিল; আর ক্ষেমঙ্করী দেবী তেত্রিশ কোটী দেবতার উপরেও যদি দেবতা থাকেন, তাঁহাকেও পূজা মানত করিয়া মহেন্দ্রনাথের আরোগ্য কামনা করিতে লাগিলেন।

পরিশেষে ডাক্তারেরা একমত হইয়া বলিলেন, বাঁচিবার কোন আশা নাই, তবে বায়ু পরিবর্ত্তনে যদি কোন উপকার হয়। অনুপমা পিতাকে লইয়া মধুপুরে যাত্রা করিল। সঙ্গে আরও লোকজন লইতে চাহিয়াছিল, কিন্তু মহেন্দ্রনাথ নিষেধ করিয়া বলিলেন, "যদি মরতেই হয়, তোর কোলে মাথা রেখে আমাকে শান্তিতে মরতে দিস্, অনু। এই অকৃতজ্ঞ লোকগুলাকে সঙ্গে নিয়ে সেখানকার বাতাসটাকেও অশান্তিময় ক'রে তুলিস্ না।"

অগত্যা অনুপমা যাইবার সময় একজন ভৃত্য মাত্র সঙ্গে লইল। ক্ষেমঙ্করী দেবী সঙ্গে যাইতে উদ্যত হইয়াছিলেন, কিন্তু সেখানে তাঁহার শুদ্ধাচারে ব্যাঘাত হইবে এই ভয় দেখাইয়া অনুপমা তাঁহাকে নিবৃত্ত করিয়া রাখিল।

ট্রেণ খানা সকাল বেলা একটা ছোট ষ্টেশনে গিয়া দাঁড়াইলে অনুপমা গাড়ীর জানালা দিয়া মুখ বাড়াইয়া একটা লোককে দেখিয়াই চমকিয়া উঠিল। সে লোকটা তারকনাথ। অনুপমার মুখ দিয়া যেন আপনা হইতেই উচ্চারিত হইল, "দাদা বাবু!"

তারকনাথ অদূরেই দাঁড়াইয়াছিল। সে ফিরিয়া গাড়ীর দিকে চাহিতেই অনুপমা বিস্ময়জড়িত কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "তুমি এখানে দাদা বাবু?"

তারকনাথ একটু সরিয়া আসিয়া বলিল, "হাঁ, আমি এই ষ্টেশনেই কাজ করি। তোমরা কোথায় যাচ্ছো?"

গাড়ী তখন গড় গড় শব্দে প্লাটফরম ছাড়াইয়া চলিতেছিল। ঈষৎ উচ্চকণ্ঠে অনুপমা বলিল, "আমরা মধুপুর যাইব। বাবার বড্ড অসুখ।"

গাড়ী তখন প্লাটফর্ম্মের শেষ সীমায় আসিয়া পড়িয়াছিল, সুতরাং সকল কথা তারকনাথের শ্রুতি গোচর হইল না; সে ছুটিয়া গাড়ির নিকটবর্ত্তী হইবার পূর্ব্বেই গাড়ী প্লাটফর্ম্মের বাহিরে চলিয়া গেল। অনুপমা টাইম টাবল্ খুলিয়া পূর্ব্ববর্ত্তী ষ্টেশনের সহিত মিলাইয়া দেখিল, এই ষ্টেশনের নাম বোলপুর। সে সেই ষ্টেশনের নামের নীচে পেন্সিলের দাগ দিয়া রাখিল।

মধুপুরে উপস্থিত হইবার পর দিন অবস্থার একটু পরিবর্ত্তন দেখা গেল। কিন্তু সে পরিবর্ত্তন স্থায়ী হইল না, কয়েক দিন পরেই জ্বর ও কাসির সঙ্গে ব্যাধি যেন আরও প্রবল ভাব ধারণ করিল। সে সময়ে জনৈক এ্যাসিষ্টাণ্ট সার্জ্জন মধুপুরে অবস্থান করিতেছিলেন। অনুপমা তাঁহাকেই পিতার চিকিৎসায় নিযুক্ত করিল।

কখন ভাল, কখন মন্দ, এইরূপ অবস্থায় মাস খানেক কাটিল। কিন্তু তাহার পর অবস্থা একেবারে মন্দ— সাংঘাতিক হইয়া উঠিল। মহেন্দ্রনাথ যেন শয্যার সঙ্গে মিশাইয়া গেলেন, তাঁহার বাক্‌শক্তিও যেন তিরোহিত হইয়া আসিল। অনুপমা পিতাকে লইয়া চিন্তিত ও ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িল। নিকটে কোন আত্মীয় স্বজন নাই, অথচ দেশে ফিরিবারও উপায় নাই। ডাক্তার বলিলেন, এরূপ মরণাপন্ন রোগীকে লইয়া ট্রেণে যাওয়া সম্পূর্ণ বিপজ্জনক, গাড়ীর ঝাঁকানিতে 'হার্টফেল' হইয়া যাইতে পারে। কাজেই অনুপমা দেশে ফিরিতে পারিল না। শেষে ডাক্তার যখন একদিন রোগী দেখিয়া বলিলেন, আপনার কোন আত্মীয়-স্বজনের কাছে টেলিগ্রাম করুন, যে কোন মুহূর্ত্তে বিপদ্ ঘটিতে পারে, তখন

অহংমন্য যেন চারিদিক্ অন্ধকার দেখিল, কাহাকে টেলিগ্রাফ করিবে ভাবিয়া পাইল না। কোন কর্ম্মচারীর নিকট টেলিগ্রাম করিলে চলে, কিন্তু সন্তোষপুর পোষ্টাফিসে টেলিগ্রাম নাই, তিন ক্রোশ দূরে সদর পোষ্টাফিসে আছে। আজ ভোরে টেলিগ্রাফ করিলে কাল সন্ধ্যা নাগাদ তাহা পৌঁছিবার সম্ভাবনা, পরদিনেও পৌঁছিতে পারে। তারপরে সেখান হইতে লোক আসিতে যেতদিন সময় লাগিবে। সুতরাং তিন চারি দিনের কম কাহারও উপস্থিত হইবার আশা নাই।

"নিজের বয়সের চেয়ে বড় বয়সের মেয়ের সঙ্গে সচরাচর প্রেম হয় না কেন?" "মাগাল পাওয়া শক্ত বলে।"

স্ত্রীলোক সুন্দরী কখন?" "হয় যখন সে প্রেমে পড়ে, নয় যখন নিরাশ-সাগরে।"

খৌ-ভাতের নিমন্ত্রণে উপহার দিতে দিতে কদুর হ'য়ে এক বন্ধু সেদিন বলেছিলেন—আর পারি না দিতে। আমরা ওঁকে পরামর্শ দিলাম, বন্ধু! বিয়ের উপহার দেওয়ার চেয়ে দেওয়া ঢের ভালো। বিশেষতঃ এই বয়সে।

কর্ত্তা। ট্রেণ এসে পড়লো যে!...আহা ছুটে-ছুটে এস...ঐ যা...কি অধর্ম্ম। কি অধর্ম্ম! বিয়ে করা কি অধর্ম্ম। একটু লজ্জা-সরম-ও নেই, একপাল ছেলে নিয়ে...ওঃ। উঃ, ঐ স্ত্রীলোকটার মুখ দেখ্‌লে বুক শুকিয়ে যায়—এর চেয়ে একটা...আঃ তোর নিকুচি করেছে।

দ্বাদশ গোপাল

[শ্রীবিজয়রত্ন মজুমদার।]

পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর

অজিত সত্যরঞ্জনের দিকে চাহিয়া বিরক্ত ভাবে কহিল —ছিঃ সত্য বাবু।

সত্যরঞ্জন কি বলিতে যাইতেছিলেন, বিমান ফিরিয়া আসিয়া, অজিতকে লক্ষ্য করিয়াই বলিল—তুই বাড়ী যা অজিত। কেন আর মিছে কষ্ট পাস।

অজিত হাসিয়া বলিল-আপনাদের ভুলে দিয়ে যাব। কোন্ ষ্টেশে যাবেন?

সে দেরী আছে। ঐ যে মেয়েটিকে এনেছি, ও ওর সঙ্গীর অপেক্ষা করতে চায়, বল্‌ছে শেষের ষ্টেশে যাব।

সে ও বেশী দেরী নেই ত দাদা! এইবার তার-কেশ্বর, তার পরই বর্দ্ধমান লোকাল-১টা ২৭ মিনিটে। ওর সঙ্গী কোথা গেল?

কি-জানি। সে-কথা আমিও জিজ্ঞেস্ করি নি, ও-ও বলে নি।

সত্যরঞ্জন খুব জোরে সিগারেটে টান দিতে দিতে বলিল —সঙ্গী কি আর ছিল কোন কালে। সিকায়ে বেরিয়েছে, বুঝছ না?

হাঁ—বুঝেছি তুমি যাও—বলিয়া বিমান অজিতকে বাহু বদ্ধ করিয়া ঘুরে চলিয়া গেল।

দ্বিতীয় শ্রেণীর কামরা খালিই ছিল, বিমান রমণীকে তুলিয়া দিয়া নামিতে যাইতেছে, রমণী ব্যাকুলকণ্ঠে কহিল—কোথা যাচ্ছেন?

এই পাশের গাড়ীতেই...

না, না, এইখানেই থাকুন। একলা আমার কেমন—

আচ্ছা, এখানেই থাকছি।

বিমান ও-ধারের বেঞ্চে বসিয়া, গাড়ীর বাহিরে মুখ রাখিয়া অন্ধকারের দিকে চাহিয়াছিল; হঠাৎ একবার এ-দিকে চাহিতেই দেখিল, মেয়েটি হাত দুটি জড় করিয়া তারই উপর প্রান্ত মস্তকটি রাখিয়া ঘুমাইয়া গেছে, ঘুমে আবরণ মুক্ত, চক্ষু নিমীলিত, বিদ্যুৎ আলোক পড়িয়া মুখ-খানিকে সুন্দর করিয়া তুলিয়াছে, বিমান তখনি দৃষ্টি ফিরাইতে পারিল না। দেখিতে দেখিতে হঠাৎ তাহার সারা বুকখানা ভরিয়া গেল, কিসের এক বেদনায়,তাহার চোখ দুইটা বড় হইয়া আসিতে চাহিতে লাগিল। বিমান রমণীর যৌবন-শ্রী মণ্ডিত কুসুম কোমল মুখখানির দিকে চাহিয়া ভাবিতেছিল, বিধাতা উহাকে এত সুন্দর করিয়া গড়িলেন কেন? আর গড়িলেন-ই যদি তাহার সেই সৌন্দর্য্যকে এমন ধূলি ধূসরিত করিয়া দিলেন কেন? যে শুভ্র সুন্দর কুসুমে দেবপূজা হইতে পারিত, তাহাই এমন নরকে নিক্ষেপ করিলেন কেন?

রমণী এ-সবের কিছুই জানে না। সারাদিনের প্রান্ত ক্লান্ত অবসন্ন দেহটিকে সন্তাপহারিণী নিদ্রার কোলে এলাইয়া দিয়া পরম নিশ্চিন্ত মনে ঘুমাইতেছে, পরিপূর্ণ দেহটি এক কাণ্ড কুশ যষ্টিকার মত কৃষ্ণবর্ণের গদিটির উপর পড়িয়া আছে, নিশ্বাসের শব্দের তালে তালে বক্ষটি ধীরে ধীরে উঠিতেছে, নামিতেছে, মুখের উপর বিন্দু বিন্দু ঘাম ফুটিয়া বিদ্যুতালোকে চিকমিক করিয়া, ধীরে ধীরে ঝরিয়া একত্রিত হাত দুটির উপর গড়াইয়া পড়িতেছে— বিমান নিঃশব্দে দেখিতে লাগিল। তাহার মনে হইতেছিল, একসঙ্গে এতরূপ, এত লাবণ্য সে আর কোথাও দেখে নাই। যদি-ই বা দেখিয়া থাকে সে তাহার কল্পনার উদ্যানটিতে, আর কোথাও নয়। এ-যেন রূপ নদীতে রূপের তরঙ্গে বান করিয়া উঠিয়া আসিয়াছে।

হঠাৎ রমণীর নিদ্রাভঙ্গ হইল; বিমান তখনও পলক-শূন্য দৃষ্টিতে চাহিয়াছিল। রমণী তাহা দেখিতে পাইয়া ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিয়া, বেশ বাস সংযত করিয়া লইল; তাহার সুপুষ্ট নারী-দেহের দিকে চাহিয়া এতক্ষণ যে ঐ লোকটি নীরবে বসিয়াছিল বুঝিয়াই সে কিছুক্ষণ আর তাহার দিকে মুখ ফিরাইতে পারিল না—লজ্জারক্ত মুখে বৈদ্যুতি আলোকমালা শোভিত প্লাটফরমের দিকে চাহিয়া বসিয়া রহিল।

একটা ষ্টেশনে গাড়ী থামিতেই, বেল কম্পাসী তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ফেলিতে ফেলিতে টিকিট লইয়া চলিয়া গেল, রমণী বলিল—বাপ্রে! চাউনি নয়ত, বেন গিলতে আস্‌ছিল।

বিমান ভাবিল বটে, লোকটির বিশেষ দোষ নাই— এত রূপ উপেক্ষা করিয়া যাওয়া মানুষের অসাধ্য! কিন্তু কোন কথাই সে বলিতে পারিল না। এই কিছুক্ষণ পূর্ব্বে তাহার ব্যগ্র দৃষ্টি-টাও রমণী দেখিয়া ফেলিয়াছে।

রমণী বলিল—এইবার কলকাতা না?

হ্যাঁ।

যাকে গাড়ী আর কোথাও থামে নি, না?

বোধ হয় থামে-নি, ঠিক বল্‌তে পারি নে।

রমণী হাসিয়া বলিল—আপনিও ঘুমুচ্ছিলেন বুঝি, আমারই মতন।

না, আমি ঘুমুই নি, বসেই ছিলাম, তবে লক্ষ্য করি নি।

এক মিনিট পরে রমণী জিজ্ঞাসিল—আপনার দু'জন সঙ্গী ছিল না, তারা কোথা গেল?

অন্য কোন গাড়ীতে উঠেছে, বোধ হয়।

আবার উভয়েই নীরব। জানালা দিয়া হাওড়া ইয়ার্ডের আলো-গুলি দেখা যাইতে লাগিল, ট্রেণের গতি হ্রাস পাইয়াছে, দুই মিনিটের মধ্যেই হাওড়া ষ্টেশনে ঢুকিবে, বিমান দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিল—আপনার নামটি জান্তে পারি?

রমণী হাসিমুখে বলিল—পারুল।

বিমান প্রশংসমান দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিল—পারুলই বটে। অন্য কোন নামই আপনাকে মানাত না। তবে...

স্মিত হাস্যে মুখখানি রঞ্জিত করিয়া পারুল জিজ্ঞাসিল—তবে কি?

বিমান ইতঃস্তত করিতে করিতে বলিল—না।...

পারুলও দাঁড়াইয়া উঠিয়াছিল, বলিল—না কেন, বলুন না?

রাগ করবেন না?

রাগ করব! কি এমন কথা বল্‌বেন যে...

তবে থাক্।

না, রাগ টাগ করব না, বলুন।

বিমান হাসিয়া বলিল—পারুল বটে, তবে এ-দেশের নয়, চীনের পারুল!

পারুল কৃত্রিম কোপমিশ্রিত স্বরে বলিল—ও, নাক নেই বলে বুঝি?

প্লাটফরমের কুলীদের চিৎকারে আর কথা হইল না। গাড়ী থামিলে, বিমান বলিল—একখানা গাড়ী ঠিক করে' আসি, আপনি ততক্ষণ এইখানে দাঁড়ান।—তাহাকে নিরুত্তর দেখিয়া, তাহার দিকে চাহিতেই বিমান স্তব্ধ হইয়া গেল। আকুল বিস্ময়ে প্রশ্ন করিতে যাইবে, ওভারকোটধারী অনেক প্রৌঢ় ব্যক্তি গাড়ীর দ্বার খুলিয়া গম্ভীর কণ্ঠে কহিল—নেমে এস।

পারুল নিঃশব্দে তাহার অনুসরণ করিয়া নামিয়া গেল। একমিনিটের মধ্যে যেন একটা কাণ্ড হইয়া গেল। প্রভুর পারুলের সেই শুষ্ক দৃষ্টি অতোধিক তাহার করুণ মুখ-খানি বিমানের চোখের পাতায় জল্ জল্ করিয়া উঠিল—এ সকলের কোন কারণই সে নির্দ্দেশ করিতে পারিল না। কেন যে পারুল ঐ বেঁটে লোকটিকে দেখিয়া অমন ম্লান বিমর্ষ হইয়া গেল এবং কেনই বা বিদায় কালে ক্ষুদ্র একটি কথায় কৃতজ্ঞতাও জ্ঞাপন করিতে পারিল না; ইহা তাহার জ্ঞানের অতীত ছিল। হঠাৎ মনে হইল, ঐ পারুলের সঙ্গী নয় ত? 'হাঁ, তাহা হইতে পারে! হইতে পারে কেন, নিশ্চয়ই সে। লোকটি নিশ্চয় বেলায় অনেক খুঁজিয়া, তাহার দেখা না পাইয়া, ছটিয়া ছটিয়া চলিয়া আসিয়া এখানে অপেক্ষা করিতেছিল! ঠিক হইয়াছে'—নিশ্চয়ই এই।

মনের মধ্যে এইরূপ গড়িয়া লইয়া বিমান প্লাটফরমে নামিয়া পড়িতেই খাকী উর্দিপরা একটি মুসলমান "গাড়ী বাবু? গাড়ী বাবু?" করিতে করিতে তাহার সামনে আসিয়া দাঁড়াইল। সঙ্গে সঙ্গেই আর একটা লোক "কিচিন বাবু, একদম্ রবার টায়, পাঁচ মিনিটে পৌঁছে দেব"—বলিয়া যেন স্থির হইয়া গেছে, এই ভাবে বিমানের সঙ্গে চলিতে আরম্ভ করিয়া দিল।

গাড়ী কিরায় হায়?

ঐ যে হুজুর। ক্যাব-রোডমে রাখা হ্যায়! ঐ যে দেখা যাইতেছে, হুজুর।

৩ নম্বর ও ৭ নম্বর প্লাটফরমের মধ্যবর্ত্তী ক্যাবরোডে 'কিচিন' গাড়ী ছিল, লোকটির সহিত বিমান সেই দিকেই অগ্রসর হইতেছে, একখানা মোটর গাড়ীর ভিতর হইতে মুখ বাহির করিয়া পারুল ডাকিল—শুনুন।

বিমান নিকটে আসিতেই পারুল ব্যগ্রকণ্ঠে কহিল—চলুন, আপনার সঙ্গেই যাই। বলিয়া সত্য সত্যই সে গাড়ীর হাতেলটি ঘুরাইতে লাগিল।

বিমান বলিল—কেন আপনার সঙ্গী?

কোথায় সঙ্গী? আমার সঙ্গী ত আপনি, বলেছি না? চলুন।

বিমান সসঙ্কোচে কহিল—সেই লোকটি, যার সঙ্গে এলেন—

তা, সে। তার সঙ্গে বাড়ীতেই দেখা হ'বে—আপনি চলুন।

বিমান তাহাকে নামিতে উদ্যত দেখিয়া শঙ্কিত হইয়া পড়িল। সেই যে প্লাটফরমের উপর গাড়ী থামিতেই সায়াহ্নালোকের ছবির মত একটি দৃশ্য দেখিয়াছিল, তাহা সে ভুলিতে পারে নাই। মনের মধ্যে একটা সন্দেহ জাগিয়াছিল যে পাকল তাহার প্রৌঢ় বন্ধুটীকে ভয় এবং উপেক্ষা ছই-ই করিয়া থাকে। বলিল—দেখুন, আপনি আর সঙ্গে যান।

তাই যাচ্ছি—বলিয়া সে গাড়ীর ভিতরে দিয়া হইয়া বসিয়া, বলিল—কিন্তু এক্ষুণি যাবেন আমাদের বাড়ীতে?

বাড়ীতে?—স্বর অত্যন্ত বিস্ময়-পূর্ণ।

কেন? আমাদের কি একটা বাড়ী থাকতে নেই?

আমি সে-কথা বলি নি। আমি বল্‌ছি...

বলাবলি আমি শুন্তে চাই নে, বলুন একুণি যাবেন?—বিমান দক্ষিণ হস্ত দ্বারা গাড়ীর কপাট-টি ধরিয়া দাঁড়াইয়াছিল, পাকল তাহার গৌরবর্ণ পেলব হাতটি বাহির করিয়া তাহারই 'পরে রাখিয়া বলিল—বলুন?

বিমান আড়ষ্ট স্বরে বলিল—বোধ হয় সুবিধে হবে না।

তৎক্ষণাৎ হাতটি সরাইয়া লইয়া পাকল গাঢ়স্বরে কহিল—বেশ!—এক মুহূর্ত্ত থামিয়া আবার বলিল—আর আপনার দেরী করিয়ে দেব না।

বিমান হাত দুটি কপালে ঠেকাইয়া বলিল—নমস্কার!

নমস্কার!...আপনি আজ আমার যে উপকার করেছেন, তা আর এ জন্মে ভুল্‌ব না।—বলিয়া সে আলো হইতে মুখটী সরাইয়া লইল।

ফিটনওয়ালারা নিকটেই দাঁড়াইয়াছিল, বলিল—চলিয়ে হুজুর, ঐ গাড়ী...চার আনা পয়সা ঔর দেনে হোগা হুজুর...

বিমানের একদল ছাত্র ছিল, সকলেই স্কুল কলেজের পোড়ো। মধ্যাহ্ন কালটি ছাড়া সব সময়ে এই পড়ুয়ারা বিমানের সব সময়টি জুড়িয়া, বসিয়া থাকিত। সময়ে আসিত অসময়ে আসিত, ইচ্ছায় আসিত, অনিচ্ছায় যাইত। আসিতে বারণ করিলে শুনিত না, গালাগাল দিলে পিকনিক পার্টির আয়োজন করিত। ষ্টোভ জ্বালিয়া চা করিয়া খাইত, বিমানের বহিখাতাগুলির খবরদারী তাহারাই করিত, এমন কি বিমান কবে কোথায় নিমন্ত্রণ রাখিতে যাইবে, সে খবরটি রাখিত, সর্দ্দার পড়ুয়া, পটলার পকেটে পাঁসটে রঙের পকেট বুকের পাতায়। সর্দ্দার পড়ুয়ার বয়সটি একটু বেশীই হইয়াছে; খুব বেশী নয়, এই কুড়ি বাইশ, তা-ও হইবে বৈ-কি। ইনিই বিমানের অন্তর সচিবের পদ পাইয়াছিলেন।

পটল একাই বলিয়া অনর্গল বকিয়া যাইতেছে, বিমান একখানা খবরের কাগজে চোখ দিয়া নীরবে বসিয়া। পটলার কথাগুলা সমস্তই তাহার কাণের ভিতর দিয়া মরমে পশিতেছে কিন্তু সাড়া দিবার বা সহানুভূতি জানাইবার মত মনের অবস্থা তাহার ছিল না। তাহার এই প্রিয় শিষ্যটি অন্ত অনেকানেক শিষ্যের সহিত শপথ করিয়াছিল, বিলাতী দ্রব্য স্পর্শ করিবে না, বিবাহান্তে বংশবৃদ্ধির বিপুলউদ্যমে বিরত থাকিবে এবং যথাসাধ্য দেশ-সেবা যদি না-ও পারে করিতে, দেশবাসীর সেবা করিবে! কিন্তু এখন অবস্থা এমনই হইয়াছে যে সবই বিপরীতগামী। তাহার পিতা কবে কোথাকার এক বড় লোকের কি উপকার করিয়াছিলেন, তিনি তাহারই প্রত্যুপকার স্বরূপ পিতার পুত্রটিকে জামাতা করিয়া তাহাকে বিদ্যাশিক্ষার্থে বিলাতে পাঠাইয়া কৃতী করিয়া তুলিতে চান্। পটল নিজের মনস্থা দিয়া কথাটার উপসংহার করিল এইরূপ যে, পিতার আদেশ সে পালন করিবেই। এবং পালন করিবার পথে যেগুলি অন্তরায় আছে সেগুলির কথা সে ভাবিবে না।

পটল ছিল বিমানের প্রাণাধিক প্রিয়। বিমান তাহাকে ভালবাসিয়া হৃদয়ের বুভুক্ষা মিটাইত, আজ তাহার যে অসাধারণ দৃঢ়তা দেখিল, তাহাতে মুগ্ধ হইয়া গেল। কথা শেষ করিয়া পটল বিমানের মুখের পানে অনেকক্ষণ ধরিয়া চাহিয়া চাহিয়া গাঢ়স্বরে বলিল—বিমান দা!

কি বলছিস ভাই?

হুকুম কর, বাড়ী যাই।

এখনি যাবি?

আজ রাত্রে যেতে চেয়েছিল, দাদা,বাবা আমার পথ চেয়ে বসে আছেন।—বলিতে বলিতে পটলের গলাটা ধরিয়া আসিল। শ্রোতারও অন্তঃকরণটি কাঁদিয়া উঠিল, সে কম্পিত কণ্ঠে জিজ্ঞাসিল—বিলেত যাবার কিছু ঠিক হয় নি ত এখনও?

পটল নতমুখে বলিল—বিয়ের সাতদিন পরেই বেরুতে হ'বে।

বিমান স্তম্ভিত দৃষ্টিতে পটলের শুষ্ক মুখের দিকে চাহিয়াছিল, পরে বলিল—যাবার আগে দেখা হ'বে এক

যাব ?...পটল একেবারে কাঁদিয়া ফেলিয়া বলিল—এসে দেখা করে' যাব দাদা।—আজ তবে যাই।

বিমান তাহার সঙ্গে দাঁড়াইয়া উঠিল; প্রসারিত বক্ষে চাপিয়া ধরিয়া পটলের সেই মুখটি তুলিয়া ধীরে ধীরে বলিল—যাবার আগে একবার দেখা করে যাস্ ভাই!—আসব—বলিয়া সে কোঁচায় খুটে মুখ মুছিতে মুছিতে চলিয়া গেল।

বিমানের মনে হইতে লাগিল, ঐ যে আকাশ জুড়ে অপরাহ্নের রক্তাক্ত আলোর খেয়াটির মত ধীরে ধীরে ঐ যে খেয়াটি তাহার দৃষ্টির সম্মুখ হইতে সরিয়া গেল, আর অনেকদিন তাহাকে দেখিতে পাইবে না; কতদিনকে-জানে? বক্ষস্থলটি কি শূন্যই হইয়া গেল। পটল যে তাহার বুকের এতখানি স্থান অধিকার করিয়াছিল, তাহা সে এর আগে টের পায় নাই। জানিত, তাহাকে সে ভালোবাসে, তাহার অদর্শন অত্যন্ত অপ্রিয় হইবে বিমান জানিত; জানিত না শুধু যে সেই ভালোবাসাটুকু তাহার শেষ যৌবনের রক্ত স্রোতের সঙ্গে মিশিয়া রহিয়া গেছে, জানিত না যে হৃদয়ের অলিতে গলিতে কাঁকে কাঁকে সর্বত্রই বিরাজ করিতেছে, পটলের ঐ দীর্ঘ বলিষ্ঠ পুরুষোচিত দেহ-টি!

পটল বিলাত যাইবে, পটল বিবাহ করিয়া যাইতেছে; এখানে রহিল তাহার বৃদ্ধ পিতা, নবপরিণীতা পত্নী আর এই বিমান! হাঁ তাহা ছাড়া উহার আর কে আছে? আর ত কেহই নাই। ঐ মাত্র তিনটি, পিতা, পত্নী আর আর—বিমান শেষের নামটা আর সহজে উচ্চারণ করিতে পারিল না। সে যেন আপনাকে লইয়া একটা বিষাদে পড়িয়া গেল; আর যেন আপনাকে পিতা ও পত্নীর সঙ্গে এক কোঠায় বসাইতে পারিল না। কে যেন মনের মধ্যে উঁকি মারিয়া বড় গলায় বলিতে লাগিল, আর নয় গো মশাই, আর নয়। ঐ যে জীবন-বসন্ত কালে যৌবন পুষ্পটি ফুটিয়াছে, ও তোমার ভোগের জন্য নহে গো, নহে। বিমান এই অদৃশ্য বক্তার কথা হাসিয়া উড়াইয়া দিতে চাহিল, কিন্তু তাহারই অন্তরতরীণ জীবন যৌবনই যেন চোখ রাঙাইয়া ধমক্ দিয়া উঠিতেছে—বলিতেছে, সত্য' সত্য, সত্য। এই জীবন তীব্র তীক্ষ্ণ সত্য যে তাহার কাছে কতখানি অবহ অসহ, তাহার সংবাদ কে রাখে? এই চিন্তাও যে তাহার বুকটিকে বিষ হাত মাটির নীচে পুঁতিয়া দিতেছে তাই বা কে জানে?

এই অসীম শূন্য ও আলোকে বিহীন আকাশের দিকে বাহ্য আঁখি মেলিয়া বিমান শুন্যভাবে চাহিয়াছিল, অকস্মাৎ অন্ধকারের কোন্ ফাঁকে একটা উজ্জ্বল তারার সন্ধান পাইয়া হর্ষান্বিত হইয়া দাঁড়াইয়া উঠিল। কি উজ্জ্বল তারকাটি! এক প্রান্তে উঠিয়াছে সত্য, কিন্তু সারা আকাশটায় আলো ছড়াইয়া দিয়াছে—এমন তেজ, এমন দীপ্তি! জামাটা কাঁধে ফেলিয়া বিমান বাড়ীর বাহির হইয়া গেল।

মধুবাবুর গেল, ৮ নম্বর বাড়ীর সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইতেই, শুনিল—উঠে এসো।

গলির ও-মোড়ের গ্যাসটার অল্প আলোক এ-পর্য্যন্তও আসিয়া পড়িয়াছিল, বিমান সেই আলোকে উপরে দৃষ্টিপাত করিতেই পারুলের অস্পষ্ট মূর্ত্তিটি দেখিতে পাইল।

পারুল সিঁড়ির মুখেই আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল, বলিল—চার দিন পরে মনে হ'ল? আমি কিন্তু রোজই আশা করে বসে থাকতুম···

আমি ত আপনাকে বলে দিয়েছিলুম যে···

আসতে পারবে না! কিন্তু তোমাকে যে আসতেই হ'বে তা আমি তোমায় চেয়ে ঢের বেশী আগে জানত। আর আমার ধারণা যে ভুল নয়, তাও খুব ভালো করেই জানত!—একটু থামিয়া আবার বলিল—তারপর ক'দিন এলে না কেন?

তাহার এই আত্মীয়বৎ ব্যবহারে ও কথায় বিমান বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া বলিল—সময় পাই নি।

এত কাজ?

না কাজ নয়—ক'টি ছাত্র আছে, সবের, তাদের দেখতে শুনতে হয়?

সে ত সকালে?

বিস্ময়-মুগ্ধের মত বিমান বলিল—সকাল-সন্ধ্যায়।

আর দুপুরে?

নিজের লেখা-পড়া একটু আছে ত।

বিকেলে?

একটু বেড়ানো।

আর রাত্রে? বাড়ীর বার হওনা বুঝি?

হাঁ।—পারুল এক মুহূর্ত্ত পরে বলিল—বৌ দেয় না বুঝি বাড়ীর বার হ'তে?

আমার স্ত্রী নেই।

"নেই?"

"না—বিপত্নীক, দশ বৎসর!— (ক্রমশঃ)

যে সব রমণী রঙ্গমঞ্চে ও বড় অভিনেত্রী বলে' পসার জমাতে পেরেছে, ঘর সংসারে থাকতে গেলে সেখানেও পসার সমান বজায় রাখতে পারত।

যখন থেকে মেয়েরা আর উপকথায় রাজপুত্র কোটাল-পুত্রের গল্প শুনতে চায় না, বুঝতে হ'বে—প্রেম ঢুকেছে।

আত্মপ্রশংসা কর্ণার সময় গলার স্বর অনেকের কাণে পাগিয়ার ডাকের মত মিষ্টি লাগে।

বিয়ে ব্যাপারের কর্ত্তা-পক্ষীয়েরা সব কাঁদে কেন, আর বরের সাজ কুলের লোকই বা হাসে কেন—এ একটা মস্ত সমস্যা।

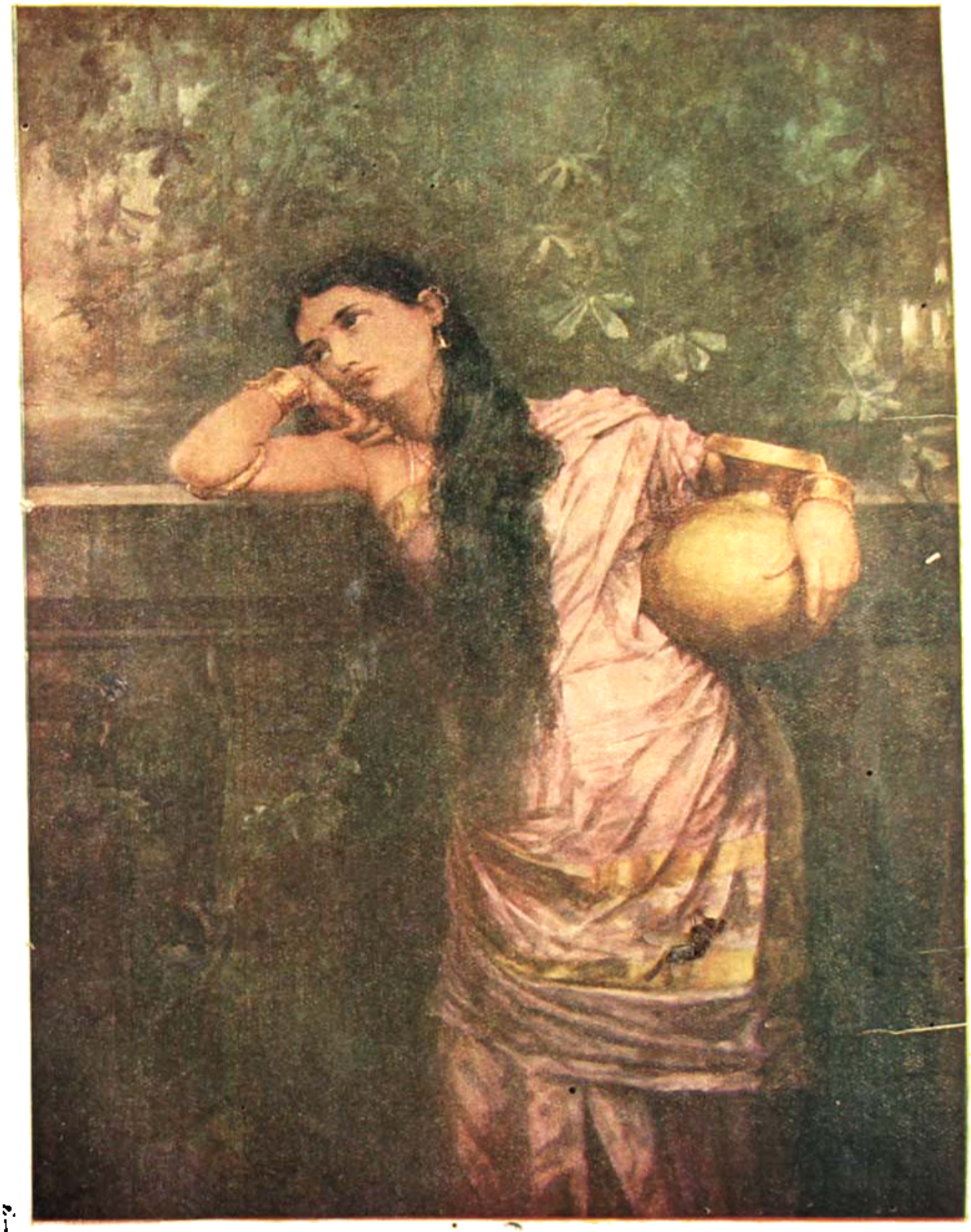

"ঐ বুঝি বাঁশী বাজে
বনমাঝে কি মনমাঝে ?"

শিল্পী—শ্রীহেমেন্দ্রনাথ মজুমদার।

Lakshmibilas Press.

সচিত্র সাপ্তাহিক

বাসন্তী

নব-পর্য্যায়।

প্রথম বর্ষ।] ২০শে শ্রাবণ শনিবার, ১৩২৯ সাল ইং ৫ই আগষ্ট। [পঞ্চম সংখ্যা।

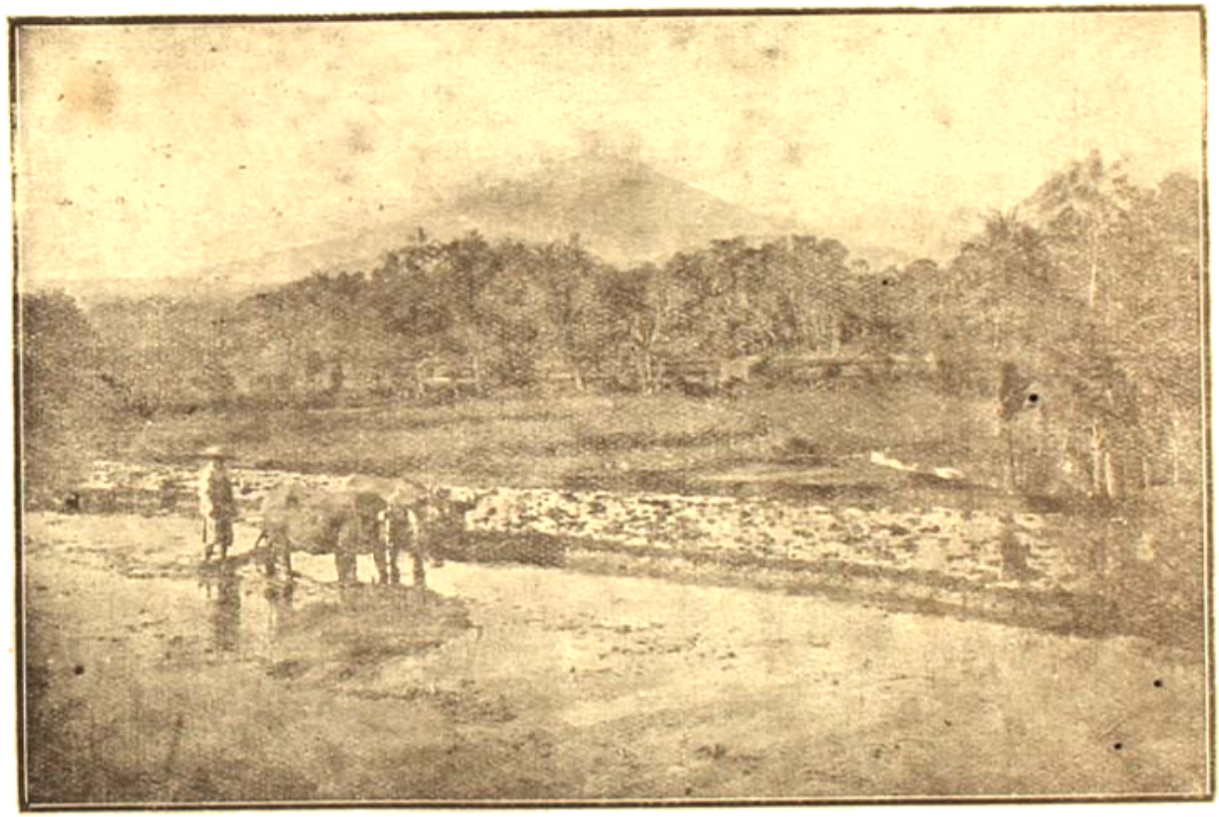

শ্যামল-ক্ষেত্র—শ্রাবণে

Lakshmibilas Press, Calcutta.

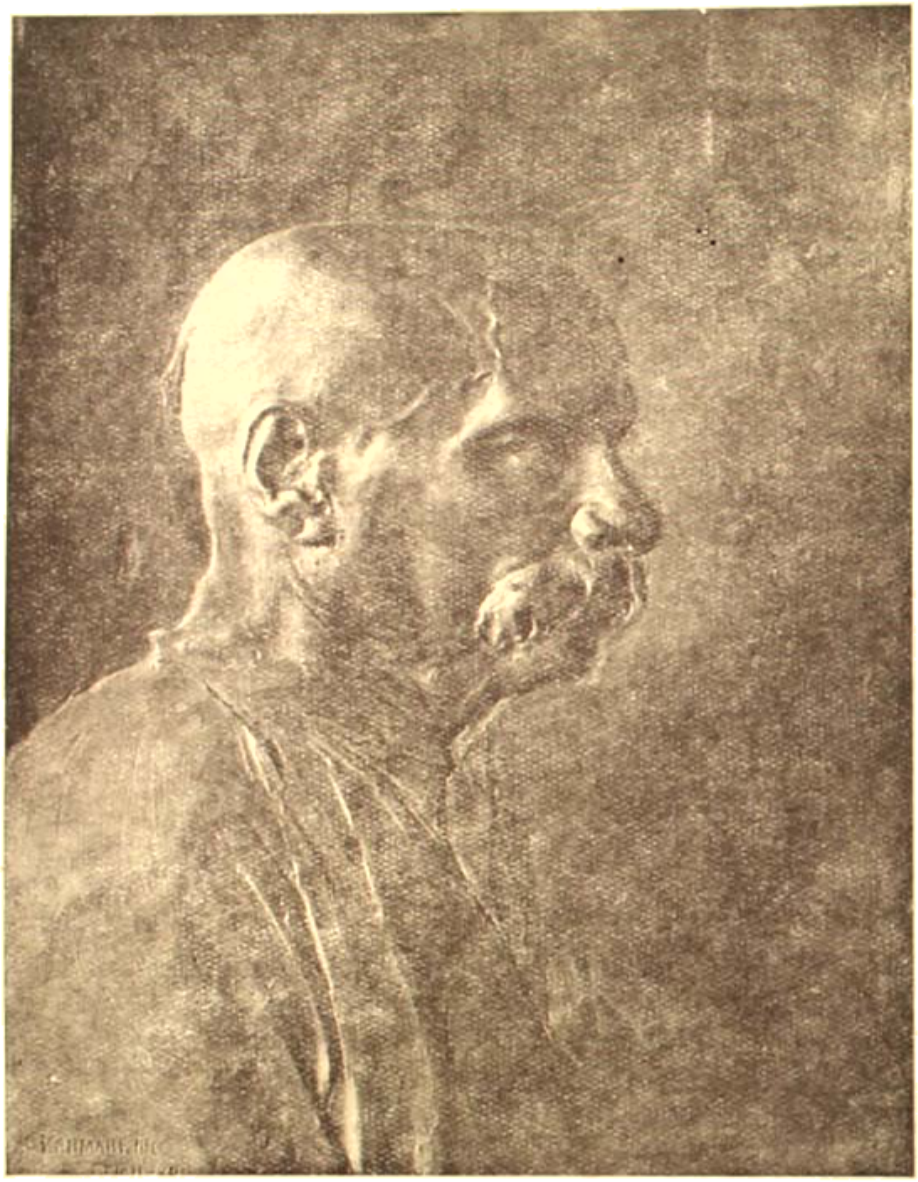

গত মঙ্গলবার লোকমান্য বাল গঙ্গাধর তিলকের দ্বিতীয় বার্ষিক তিরোধান-উৎসব সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। আজ দুই বৎসরাধিক কাল ভারতের রাজনৈতিক গগন হইতে এই অস্তাচ্ছন্ন জ্যোতিষ্কের অন্তর্দ্ধান ঘটিয়াছে। ভারতবাসী দুইবার তাঁহার স্মৃতি উৎসব করিয়া মৃতের সম্মান-পূজা করিল। কিন্তু সেই সম্মান-পূজার পূর্ব্বে, সেই কর্ম্মবীর আমরণ যে স্বরাজ-সাধনার জন্য দেহ-মন নিয়োগ করিয়াছিলেন, অন্তিম শয্যায় শায়িত অবস্থাতেই প্রিয়তম শিষ্য মহাত্মা গান্ধীকে যে স্বরাজ-সাধনায় অবতীর্ণ হইতে আদেশ দিয়াছিলেন, ভারতবাসী যদি সেই সাধন-পথে চলিয়া লোকমান্যের সম্মান রক্ষা করেন, তবেই তাঁহার প্রকৃত স্মৃতি রক্ষা করা হইবে। বন্দে মাতরম্।

ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের স্বেচ্ছাব্রতিত যে সমস্ত অ-সহযোগী মহাত্মা প্রবর্তিত অ-সহযোগ নীতি অনুসারে আইন ব্যবসায় ত্যাগ করিয়াছিলেন তাহাদের মধ্যে দু'চার জন পেট চলে না অজুহাতে পুনরায় স্ব-ব্যবসায়ে লিপ্ত হইতেছেন। যাহারা পুনরায় ব্যবসায়ে লিপ্ত হইয়াছেন বা হইবার উদ্যোগ করিয়াছেন তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ বলিয়াছেন 'আমার আর চলিবার উপায় নাই বলিয়াই পুনরায় ব্যবসায়ে লিপ্ত হইতেছি।' অজুহাত বা ওজর মানুষে তখনি দেয় বা দেখায় যখন তাহার নিজের ব্যবহারে নিজের মধ্যেই একটা খুঁত জাগিয়া উঠে। লোক লজ্জা বা জন সাধারণের অশ্রদ্ধা ঢাকিবার জন্য তাহাদের নিজের উপর যার যার আবরণ টানিয়া নিজের স্ব-মূর্তি ঢাকিয়া রাখিবার প্রয়াস করা হয়। মানুষ ভাবের বশে উত্তেজনার খেয়ালে ও স্ব-নাম প্রচার করিবার লোভে অনেক সময়ই সহজ ভরসে ভাসিয়া পড়িয়া সহজ লভ্য যশ ও নাম, খ্যাতি ও প্রতিপত্তি পাইবার জন্য মোহমুগ্ধ হয়। উহারা যদি কিছুদূর অগ্রসর হইয়া পথের ক্লেশ ও নিষ্ঠুর সাধনা সহজ নয় দেখিয়া পিছু হটিয়া পড়েন তবে তাহাদের পতন দেখিয়া মনে কষ্ট হইতে পারে বটে। কিন্তু যদি এমন লোকে সেই পতনের সমর্থনের জন্য হাস্যকর অতি অচল কোন মত বা যুক্তি দেখাইয়া কোটী কোটী জনের চক্ষুতে ধূলি মুষ্টি নিক্ষেপ করিতে চাহেন তবে তাহাতে লজ্জাও হয় ক্ষোভও হয়—আর আরও দুর্গতি ও হীনতার কথা ভাবিয়া মরমে মরিয়া থাকিতে হয়। ব্যক্তিগত দুর্বলতাকে এমন ভাবে একটা দেশ ও জাতির মধ্যে স্থাপিত করিয়া নিজের সঙ্গে দেশ ও জাতিকে এমন ভাবে জড়াইয়া ফেলার অর্থ জাতির মস্তকে চাপাইয়া জাতির হৃদয় ও মস্তককে এমন ভাবে ম্লান ও অবনমিত করিবার কোন যুক্তি ইহারা ইহাদিগের কার্য্য পদ্ধতিতে আরোপ করিয়া তাহার সমর্থন করিতে পারেন তাহা আমরা বুঝিতে অক্ষম।

• • • •

বিলাতের প্রধান মন্ত্রী লয়েডজর্জ্জ সে দিন দেশের লোককে স্বাধীনতা মন্ত্রের অমর সাধক ম্যাজিনির লেখা বার বার পড়িতে বলিয়াছেন। লয়েড জর্জ্জ বলেন ম্যাজিনি যেমন নিজের জাতির স্বাধীনতাই কামনা করিতেন না—অন্যান্য জাতির স্বাধীনতার কথাও ভাবিতেন। জগতের সকল ছোট বড় জাতিই স্বাধীন হয়—ইহাই ছিল ম্যাজিনির অন্তরের অভিলাষ। জাতি ও দেশকে বড় করিতে হইলে প্রধান মন্ত্রী লয়েডজর্জ্জের একান্ত প্রিয় বইখানি দেশের সকলেরই পাঠ করা কর্ত্তব্য।

• • • •

স্বায়ত্তশাসী সুরেন্দ্রনাথ দেশের কথায় বলিয়াছিলেন আমাদের দেশের অনেক স্থানেই এমন মৃত্যুর হার জন্মের বিগুণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ইহার বহু পূর্ব্বে ডাক্তার মুখোপাধ্যায় বাংলার হিন্দুজাতির ক্ষয়ের কথা দেশবাসীকে শুনাইয়া সময়ে সাবধান হইতে বলিয়াছিলেন। এবারকার বঙ্গের অদমশুমারীর বিবরণ পাঠ করিয়া দেখিতেছি আশঙ্কা অমূলক নহে। ১৯১১ সালে সমগ্র বাংলায় হিন্দুর সংখ্যা ছিল ২০৮০১৪৮ জন, পরবৎসরের গণনায় দেখা যায় তাহাদের মধ্যে ১৩৬১৩১ জন কমিয়াছে। গত ১০।১২ বৎসর হইতে বাংলায় হিন্দুদের মধ্যে মৃত্যুর হার এমন করিয়া ক্রমশ বাড়িয়া চলিয়াছে। আমরা এমনি অচল জীবন-প্রবাহ-হীন জাতি যে এমন জীবন মরণের কথা, এমন ধ্বংস ও প্রলয়ের কথাও আমাদিগকে আর তেমন ভাবে সাড়া দিতে পারে না। আমাদিগের মধ্যে কখন আসিবে

পারে না। আজ শুনিলাম,—সংবাদ পত্রে একটু আলোচনা হইল বাস ফুরাইয়া গেল—পর-চালিত পত্রিকাদির স্রোত চলিল—গাধার চিনি বহন আরম্ভ হইল। যথা নিয়ম সব চলিতে থাকিল। এ জাতি ও দেশের মোক্ষ সাধন হইয়া গিয়াছে। ইহারা আর এসব সামান্য বিষয়ে বিচলিত হয় না।

• • • •

বাকুড়ার জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট্ শুকসদয় দত্ত মহাশয় যখন যে জেলায় যান তখনি সেই জেলায় ও জেলাবাসী-গণের উন্নতির যথাবিধি চেষ্টা করিয়া থাকেন। ম্যাজিষ্ট্রেট্ দত্ত মহাশয় বলিয়াছেন 'দারিদ্র্য, মামলাবাজী, অদৃষ্টবাদ, অপব্যয়, স্বাস্থ্য সম্বন্ধে উদাসীনতা ও অনভিজ্ঞতা এই গুলিই আমাদের জাতীয় জীবনের ব্যাধি। এ ব্যাধির যে কোন একটাই একটা বিরাট দেশ ও জাতিকে একেবারে ছারখার করিয়া দিতে পারে, আর এতগুলি শুভ সংযোগ যেখায় ঘটিয়াছে সে দেশ ও সে জাতি যে জগতের মধ্যে কত মূল্যবান তাহা সহজেই অনুমেয়!

• • • •

সহযোগী 'আনন্দ বাজার' বলিতেছেন "মাননীয়গণের কিরূপ মামলা ভোগের জন্য বাহির হইয়াছে—সকলেই তাহা লইয়া আলোচনা করিয়াছেন। কিন্তু মন্ত্রীমহাশয়েরা গত বছরে ৬৪০০০৲ হাজারের অতিরিক্ত কত T. A. বা যাতায়াতের খরচা লইয়াছেন, তাহার হিসাব দেখিয়াছি বলিয়া ত মনে হয় না! কোন মাননী অনুগ্রহ করিয়া এই খবরটি সংগ্রহ করিয়া ছাপাইলে অনেক রহস্য প্রকাশ পাইবে।"

• • • •

'হিন্দুস্থান' সম্পাদক শ্রীযুক্ত নলিনী মোহন গুপ্ত শিক্ষা-মন্ত্রী প্রভাস চন্দ্র মিত্রের সম্বর্দ্ধনা করিয়াছেন, এই সম্বর্দ্ধনা লইয়া সহযোগী আনন্দ বাজার জিজ্ঞাসা করিয়াছেন প্রীতি সম্মিলনে প্রীতিভোজের আয়োজন থাকবে ত? টাকাটা খরচ করবেন কে? ললিতবাবু—না প্রভাসবাবু? সহযোগীর প্রশ্নটা সরস হইলেও রহস্যজনক। আমরা ত চিরদিনই জানিতাম যিনি নিমন্ত্রণ করেন তিনিই খাওয়াইয়া থাকেন। নিমন্ত্রিতকে খরচ দিয়া পরের নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিতে হয়—কথাটি যেন এ দেশে নূতন।

• • • •

দেশপ্রিয় কবি সত্যেন্দ্রনাথের প্রশ্রাদসভায় জগৎ কবি রবীন্দ্রনাথ সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। ছন্দোবন্ধে অনুরাগী সত্যেন্দ্রনাথকে শ্রদ্ধা ও স্নেহের পুষ্পাঞ্জলি দিয়াছিলেন। কিন্তু সে সভায়, সত্যেন্দ্রনাথের সে শ্রদ্ধাসভায় বিদেশী মোহের চিকণ সৌন্দর্য্য দেখিয়া আমরা প্রাণে বড় দুঃখ অনুভব করিয়াছিলাম। যে সত্যেন্দ্র কবিতায় ও বাস্তব জীবনে দেশ-প্রীতির, দেশ-মঙ্গলের সহস্র গান প্রাণ খুলিয়া গাহিয়া গিয়াছেন, তাঁহারই শ্রদ্ধাসভায় স্বদেশী ছাড়িয়া বিদেশী বসন-ভূষণে সজ্জিত সভাপতি ও সভার জন-সঙ্ঘকে দেশকবি সত্যেন্দ্রনাথকে শ্রদ্ধা অর্ঘ দান করিতে দেখিয়া আমরা বিস্মিত ও লজ্জিত হইয়াছিলাম স্বর্গগত কবিও বোধ হয় স্বর্গে থাকিয়া দেশবাসী দেশ কবির প্রতি শ্রদ্ধার নমুনা দেখিয়া মরমে মরিয়া রহিয়াছেন। তারপর রবীন্দ্রনাথ বিশ্ব-ভারতীর সভা করিলেন, বিশ্বকে ভারতের বাণী শুনাইতেছেন। কিন্তু সে পর-বাস পরিয়া। বসনে ভূষণে যাহার দীনতা সহস্র ভাবে ফুটিয়া বাহির হইতেছে, নিজ দেশীয় বসনে যাহার লজ্জা নিবারণের ক্ষমতা নাই, সে কি করিয়া অপরকে আপন গৌরব মহিমায় আপাইবে? বিশ্ব বেশী ব্যাপক—দেশ একটু কম ব্যাপক—আপনি দেশের সম্মান না করিয়া, পরকে, বিশ্বকে সেই দেশের উপর শ্রদ্ধাশীল করিবার চেষ্টা হাস্যকর নয় কি? আর তেমন চেষ্টা জগতের লোকেই কি সুজন চিত্তে বরণ করিয়া লইবে?

• • • • •

গোরক্ষপুরে ম্যাজিষ্ট্রেটের আদেশ আইন অমান্য করিয়া ভূতপূর্ব্ব বড়লাট কৌন্সিলের সভ্য, ভারতের বিচক্ষণ নেতা, ভারতের বড়লাটের বন্ধু, মহাত্মা গান্ধী ও ভারতগবর্ণমেণ্টের মধ্যে গোল টেবিলের আপোষ নিষ্পত্তির প্রধান উদ্যোক্তা, কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা, পণ্ডিত মদন মোহন মালব্যের আর কোনও সংবাদ পাওয়া যাইতেছিল না। আইন অমান্য করিয়া এভাবে বক্তৃতা দিবার সাহসী, এ পর্য্যন্ত আর কাহারও বোধ হয় হয় নাই। যদিও বা কেহ হইয়া থাকে, তাহাকে আইনানুসারে দণ্ডিত হইতে হইয়াছে; কিন্তু পণ্ডিত মালব্য পাঁচ পাঁচ বার আদেশ আইন অমান্য করিয়া একাধিক সভায় বক্তৃতা করিয়াও কি ভাবে এতদিন আইন বাঁচাইয়া নিষ্কৃতি পাইয়াছেন তাহাই ভাবিয়া আমরা বিস্মিত হইতেছিলাম। সম্প্রতি এলাহাবাদের অভ্যুদয় পত্র নাকি

একটা গুজব শুনিয়াছেন যে লালজীকে বন্দী না করিলে বঙ্গলাট পরিষদের শাসন বিভাগের একটি সদস্য পদত্যাগ করিবেন বলিয়া ভয় দেখাইয়াছেন এবং তদনুসারে লালজীর বক্তৃতায় রাজদ্রোহের বীজ বাহির করিবার জন্য একজন অতিরিক্ত সওয়াল নাকি নিযুক্ত হইয়াছেন। অনুমান অবশ্য এ গুজব পূর্ণ ভাবে বিশ্বাস করিতেছেন না—কিন্তু একেবারে অসম্ভবও মনে করিতেছেন না।

• • • •

হাকিম আজমল খাঁ পুণা সহরে গিয়া মহাত্মার সহিত সাক্ষাতের অনুমতি চাহিয়াছিলেন। হাকিম সাহেব, পণ্ডিত মতিলাল নেহেরু ও ডাক্তার আনসারীও জেলে মহাত্মার সহিত সাক্ষাতের অনুমতি চাহিয়াছিলেন এবং জেল সমূহের ইনস্পেক্টর জেনারেলকে ইহাও জানাইয়াছিলেন যে তাঁহারা তিনজনই বন্ধুভাবে মহাত্মাকে শুধু দেখিতে বাসনা করেন। রাজনীতি চর্চ্চা বা রাজনীতির কোন আলোচনা এ সাক্ষাতে হইবে না। কিন্তু হাকিম সাহেবের প্রার্থনা বিফল হইয়াছে। জেল সমূহের ইনস্পেক্টর জেনারেল জানাইয়াছেন তিনি প্রার্থনা রক্ষা করিতে পারিবেন না বলিয়া দুঃখিত, কারণ কংগ্রেস কিছুদিন পূর্ব্বেই অপর একজনের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছেন সুতরাং এখন আবার কাহারও দেখা করিবার অনুমতি দেওয়া যাইতে পারে না।

• • • •

বিলেতী ডাইভোর্স কেস বা স্বামী স্ত্রীর মধ্যে যে বিচ্ছেদের মোকর্দ্দমা হয় তাহাতে অনেক সময় খবর পাওয়া যায়। সংবাদ পত্রে এই সব মোকর্দ্দমার খবর গুলি বাহির হয় এবং অনেকেই তাহা বিশেষ আগ্রহ সহকারে পাঠ করিয়া থাকেন। সম্প্রতি ইংলণ্ডে একটা কথা চলিতেছে যে, এই সব বিবাহচ্ছেদ ঘটিত মোকর্দ্দমা গুলির খবর সংবাদ পত্রের মারফতে সাধারণে আর হইতে দেওয়া হইবে না। অন্তত ইহার মধ্যে উত্তেজক বা নষ্টামীর মত যে ঘটনাগুলি তাহার প্রকাশ বন্ধ করিতেই হইবে। কিছুদিন পূর্ব্বে বিদেশ হইতে যে ব্যাভোপের ফিল্মগুলি এদেশে আসে তাহার উপরও পরীক্ষক নিযুক্ত হইয়াছেন। এই সব ফিল্মে নাকি বিলেতী অনেক কেলেঙ্কারীর ব্যাপার থাকে, সুতরাং তাহা এ দেশী সাধারণে দেখিবে কেন? আর আবার বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটিত মজার মোকর্দ্দমা গুলির খবরও বুঝি বা বন্ধ হইয়া যায়!

• • • •

পেলারামের দুরদৃষ্ট:—মিনার্ভা থিয়েটারে 'পেলারামের স্বদেশিতা' নামে একখানি তিন অঙ্কের সমযোপযোগী নাট্যের অভিনয় চলিতেছিল। দেশের আধুনিক অবস্থা, খদ্দর, চরকা, দেশবাসীর প্রাণহীনতা, চাকুরীর মোহ, সমবেদনে বিলাসিতার লোভ প্রভৃতি বহু কথাই এই নাটক খানিতে আলোচিত হইয়াছে। সমাজ, দেশ, ও দেশের অবস্থা লইয়াই সর্ব্ব-দেশে সর্ব্ব-কালে নাটক, উপন্যাস ও সাহিত্য প্রভৃতি রচিত হইয়া থাকে। নানা কারণে তেমন ধরণের নাটক উপন্যাস প্রভৃতি রচিত হওয়া নাকি আমাদের দেশে সম্ভবপর নহে। ইহার মধ্যে এক কারণ হইতে পারে, গ্রন্থকার নাটকারদের দেশের সত্য অবস্থা লইয়া গ্রন্থ প্রণয়নে অক্ষমতা, অপর হইতে পারে দেশের আবহাওয়া তেমন নয় যাহাতে গ্রন্থকারেরা এ সকল রচনায় হাত দিয়া দেশের ও দশের উন্নতি সাধন করিতে পারেন; দেশবাসীর প্রাণে সত্য মনুষ্যত্বের বোধ জাগ্রত করিতে পারেন। আমরা ইতিপূর্ব্বে পেলারামের সমালোচনা কালে বলিয়াছিলাম 'গ্রন্থের নায়ক পেলারাম খদ্দর পরিত, অপরকে পরিবার পরামর্শ দিত, কেরাণীদিগকে পর-দাসত্ব ছাড়িয়া দিয়া পল্লীর কর্ম্ম ক্ষেত্রে গিয়া দেশের সত্য অশন বসনের অভাব মিটাইবার পরামর্শ দিত।

এই সব ব্যাপারের মধ্যে আমরা সিডিসান বা রাজদ্রোহের কোন গন্ধ পাই নাই। সরকারের প্রতি অসন্তোষ উৎপাদিত হইতে পারে কিম্বা দেশবাসীর মনেও কোনরূপ অসন্তোষের বীজ বপন করিবার চেষ্টা এই নাট্য খানির কোন চরিত্রের কথায় বা ভাবে প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছে বলিয়া আমাদের মনে হয় না। বোধ হয় তেমন কোন রাজদ্রোহের ভাব পেলারামের স্বদেশীতায় নাইও। তবে স্বদেশীতা মানেই যদি রাজদ্রোহ হয়—তবে নাচার। তবে যে দেশে অমর বঙ্কিম চন্দ্রের দীনবন্ধুর, ও দ্বিজেন্দ্র লালের বহির মত বহি সিডিসনিষ্টের গায়ে লোকচক্ষুর অন্তরাল করান যাইতে পারে, সে দেশে ক্ষীণপ্রাণ পেলারাম অন্তর্ধান করিবে এ তেমন আশ্চর্য্যের কিছু নয়। তবুও কর্ত্তব্য হিসাবে জিজ্ঞাসা করিতে চাই যে বাংলা সরকার এই বইখানি বন্ধ করিবার আদেশ জারী

করিয়াছেন, তাঁহাদের জিজ্ঞাসা করি—নইখানি রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হওয়ার জন্য অনুমতি দিয়াছিলেন কে? যখন অনুমতি দেওয়া হয়, তখন ইহাতে সিডিসান ছিল নাকি? না থাকিলে কয় রাত্রি অভিনয়ের পর সহসা পুনরায় সিডিসানের গন্ধ পাইলেন কিরূপে? এই ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ড নাট্য পেলারামের সিডিসান বা অসন্তোষ বহ্নি আবিষ্কার করিবার জন্য বড় ভায়ার অভিজ্ঞ কোন কোন মহারথীর 'ফুপরামর্শ সহকার বাহাদুর পাইয়াছেন? সরকারের অসীম ক্ষমতাপ্রাপ্ত কেহ নিজ চক্ষে ও কর্ণে পেলারামের স্বদেশিতা দেখিয়াছেন কি? যদি বন্ধ করিবার অধিকার প্রাপ্ত মুলাহিজ গবর্ণর বাহাদুরের কৌন্সিলের কেহই নাট্যখানির অভিনয় দর্শন করিয়া না থাকেন তবে কি করিয়া ওঁহারা অসন্তোষ বহ্নিকুণ্ড মনে করিয়া পেলারামের স্বদেশিতা বন্ধ করিলেন!

বাংলা সরকারের আদেশপত্রে আরও প্রকাশ যে, গ্রন্থখানি Scandalous, সরকার পক্ষীয় কোন মহারথী এই Scandalous শব্দের অর্থ আমাদের বুঝাইয়া দিতে পারেন কি?

যাক্ সরকার যাহা খুসী করিতে পারেন, ইচ্ছা করিলে পেলারামের স্বদেশিতা বন্ধ ও রাখিতে পারেন, পুনঃ রঙ্গমঞ্চে বাহির করিবার অনুমতিও দিতে পারেন, কিন্তু দেশীয় নাট্য উপন্যাস, সাহিত্য ক্ষেত্রও যদি এ ভাবে পদে পদে সিডিসানের জ্বালায় আঘাত প্রাপ্ত হয় তবে দেশের আর যাহা গিয়াছে তাহা ত গিয়াছেই —জাতির সম্ভ্রম মর্য্যাদা ও মর্ম্মের ক্ষেত্র যে সাহিত্য তাহাও মরমে মরিয়া জাতির হৃদয় কুঞ্জ হইতে চিরতরে অন্তর্ধান হইবে। ইহা দেশ-শাসকদের পক্ষে গৌরবের ও মর্য্যাদার কথা নহে।

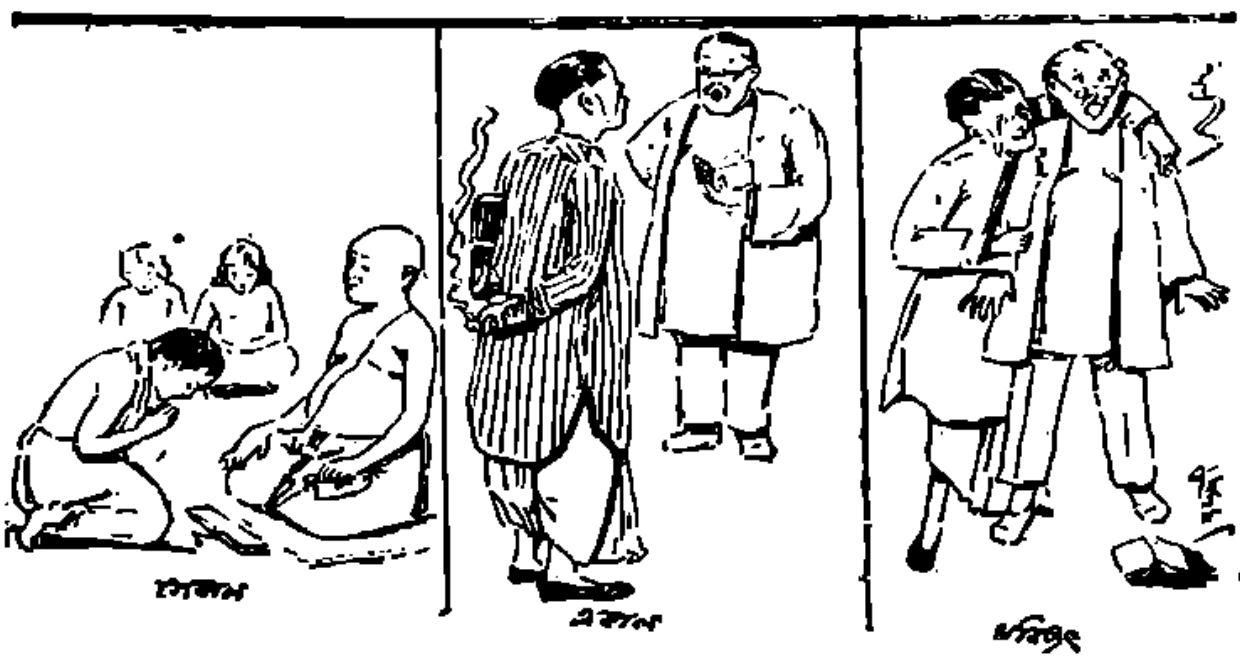

ছাত্র-জীবন।

নিরস্ত্র দেশ।

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী

সমগ্র বিশ্বে এমন কোন দেশ আর নাই যে দেশ ভারতবর্ষের মত সম্পূর্ণ অস্ত্রহীন হইয়াছে। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে সিপাহী বিদ্রোহের পর হইতে বৃটিশ রাজ ভারতকে এইরূপ ভাবে নিরস্ত্র করিবার সঙ্কল্প করেন, তাহার সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইয়াছে।

বিরাট ভারতের সমগ্র প্রদেশের সমস্ত জাতিকে এই ভাবে নিরস্ত্র করাতে দেশবাসীদিগের মনুষ্যত্ব, আশা উদ্যমকে সকল দিক হইতে কি ভাবে আঘাত করা হইয়াছে তাহা যে কোন ভারতীয়ের কার্য্য কলাপ, মানসিক এবং দৈহিক অবনতি দেখিলেই হৃদয়ঙ্গম হইবে। অবনত মস্তক, ব্যথিত নির্য্যাতিত ভারতীয়েরা আজ ব্যক্তিগত অপমান ও জাতীয় অপমান স্বচ্ছন্দে পকেটস্থ করিবার কৌশল শিক্ষা করিয়াছে। আজ ভারতীয়েরা নিজেদের মাতা, ভগিনী ও গৃহের সম্মান রক্ষা করিবার জন্যও অপরের অনুগ্রহ—প্রার্থী, পরানুগ্রহের ভিখারী।

বৃটিশ ভারতকে বিশ্বাস করে না বলিয়াই ভারতকে নিরস্ত্র করিয়া রাখিবার উপায় সে অবলম্বন করিয়াছে। ভারত অধিকার করিবার পর প্রথম প্রথম এ নীতির উপকারীতা ও সার্থকতা হয়ত ছিল কিন্তু আজ দেড়শত বৎসর পরেও এ নীতি তেমনি একই ভাবে চালাইয়া লইবার কি আবশ্যকতা আছে তাহা বোঝা যায় না। এ ভাবে এত বড় একটা বিরাট দেশের সমগ্র অধিবাসীকে অস্ত্রহীন করিয়া রাখিবার নীতি যে খুব বিচক্ষণ নীতি নহে সে বিষয় মহাযুদ্ধের সময় প্রমাণিত হইয়া গিয়াছে।

পাশ্চাত্যের বিশ্ব বিখ্যাত কূট রাজনীতিক ম্যাকিয়াভেলি একদিন বলিয়াছিলেন "কোন বুদ্ধিমান রাজাই কখনও তাহার প্রজাদের নিরস্ত্র করিয়া যাবেন না, বরঞ্চ প্রজাদের হাতে অস্ত্র না থাকিলে তিনি তাহাদের অস্ত্রে সজ্জিত করেন। কারণ তাহাদিগকে অস্ত্রে সজ্জিত করিলে এবং যোদ্ধার ক্রীড়া করিতে দিলে সে তোমারই থাকিবে যে তোমার উপর বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারিবে—সে সব সময়ই তোমার পক্ষে থাকিবে। বিশাল জনসঙ্ঘের সকলেই অবশ্য অস্ত্রধারী হইতে পারে না, যাহারা সাহসী তাহাদিগকেই অস্ত্রধারণক্ষম হয়।—এই ভাবে রাজা দেশের সাহসী ও কার্য্যক্ষম লোকের সাহায্য সব সময়ই প্রাপ্ত হন। কিন্তু যখন তুমি তাহাদের নিরস্ত্র করিয়া রাখ তখন তুমি আপনা হইতেই তাহাদের সঙ্গে একটা বিরাট অবিশ্বাসের ব্যবধান সৃষ্টি করিয়া লও, ইহাতে সে তোমাকে স্বচ্ছন্দে ঘৃণার চক্ষে দেখিতে পারে।" পাশ্চাত্যের একজন শ্রেষ্ঠ কূট রাজনীতিকের যদি এই মত হয় তবে ভারত শাসকদিগের ভারতকে নিরস্ত্র করিয়া রাখিবার এই যে নীতি ইহাকে আমরা শাসকদিগের পক্ষেই আত্মঘাতী নীতি বলিতে পারি।

ভারতীয়দিগকে এ ভাবে অস্ত্রহীন করিয়া রাখাতে তাহাদের জাতীয়তার উপর একটা ঘোরতর অন্যায় ও অপমান ভার চাপাইয়া রাখা হইয়াছে। মানুষের জন্মগত অধিকার হইতে তাহাকে বঞ্চিত করিয়া রাখিবার যে নীতি সে নীতিকে কখনও প্রশংসার চোখে দেখা যায় না।

প্রত্যেক সভ্য গবর্ণমেণ্টই তাহাদিগের যুবকদিগকে অস্ত্র বিদ্যায় শিক্ষিত করিয়া তোলা একটা কর্ত্তব্য বলিয়া জ্ঞান করেন। সভ্যতা ও জ্ঞান গর্ব্বিত কোন গবর্ণমেণ্টই তাহার প্রজাদিগকে অস্ত্র রাখিতে নিষেধ প্রচারিত করেন না। আফগান ও চীনেরাও তাহাদের প্রজাদিগকে অস্ত্র বিদ্যায় শিক্ষিত করিয়া তুলিতেছেন। এমন কি নিগ্রোরা এবং আমেরিকার আদিম অধিবাসীরাও অস্ত্র রাখিতে এবং সৈনিকদের শিক্ষা পাইবার অধিকার হইতে বঞ্চিত নহে। কিন্তু ভারতকে এই সব অধিকার হইতে বঞ্চিত রাখা হইয়াছে।

ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদে শ্রীযুক্ত খাপার্দে ভারতের ঘোর অপমানজনক এই অস্ত্র আইন প্রথা তুলিয়া দিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। লর্ড সিংহ ও স্যার কৃষ্ণগোবিন্দ গুপ্তও ভারতীয়দিগকে অস্ত্রবিদ্যায় শিক্ষিত করিয়া তুলিবার অভিলাষী। বিচক্ষণ পণ্ডিত গোখলে বলিয়াছিলেন সমগ্র দেশবাসীকে নিরস্ত্র করিয়া রাখিয়াও যেন ইহাদের তৃপ্তি হয় নাই, সুদূরবর্ত্তী বহির্দেশ আক্রমণ হইতে ভারতীয়দিগের ঘর রক্ষার জন্য

ইহারা অপর একটি প্রাচ্য জাতির সহিত সখ্যতা বন্ধনে বদ্ধ হইয়াছেন।

ভারতীয় সৈন্য সভায় সাক্ষ্য দিতে গিয়া পণ্ডিত মদন মোহন মালব্য বলিয়াছেন 'সৈন্য বিভাগ একমাত্র ভারতীয়দের হস্তে থাকা আবশ্যক।' বহু বিচক্ষণ পাশ্চাত্য মনীষী বিশেষ করিয়া কোন কোন খ্যাতনামা ইংরেজ মনীষীও বলিয়াছেন আত্মরক্ষার ক্ষমতা না জন্মিলে আমাদিগের আত্মশাসন করিবার ক্ষমতা জন্মিবে না।

প্রসিদ্ধ ইংরেজ কর্ণেল টড্ বলিয়াছিলেন 'জাতীয় এই ধর্ম্ম যদি লোকে বিসর্জ্জন দেয়, তবে জাতি নিজের সম্মান-জ্ঞান সহজেই বিস্মৃত হইয়া যাইবে। জাতি ক্রমে আইন-জালে বদ্ধ এবং নীচমনা হইয়া উঠিবে। যে জাতির হস্তে নিজেকে রক্ষা করিবার ক্ষমতা নাই সে জাতি কখনও নিজ চরিত্র রক্ষা করিতে পারে না। বড় হইতে হইলে স্বাধীন হইতে হইলে জাতির যুদ্ধ প্রবৃত্তিকে সর্ব্বদা উৎসাহ দিতে হইবে।

চোর ডাকাত একটি পিস্তল কিম্বা বন্দুক লইয়া আসিয়া দশ বার খানা গ্রামের অধিবাসিদিগকে ভীত চকিত করিয়া তাহাদের সর্ব্বস্ব অপহরণ করিয়া লইয়া যাইতেছে, সক্ষম যুবক গ্রামবাসীদের সম্মুখে বন্দুক পিস্তল উদ্যত করিয়া তাহাদিগের নারীদিগের উপর অত্যাচার করিতেছে, নিরস্ত্র জাতি, ভীত মনুষ্যত্ব হীন ক্লীবের মত এই সব অত্যাচার সহ করিয়া ব্যথিত, ক্ষুব্ধ চিত্তে ঘরের মরিয়া যাইতেছে। দেশবাসী নিরস্ত্র বলিয়া এ অপমান সহ করিতেছে, নতুবা তাহাকে এ লাঞ্ছনা সহ করিতে হইত না। আজ দেশ জাগরণের এই শুভ মুহূর্ত্তে জাতি তাহার এ কলঙ্ক মোচন করিতে চাহিতেছে।

জাতির বুদ্ধি বিবেচনা, সম্ভ্রম, মর্য্যাদা, আজ অস্ত্রধারীর নিকট লাঞ্ছিত অপমানিত হইতেছে। লিঙ্গ-অব-রেপাসে যাকি ভারতের স্থান হইয়াছিল, অথচ ভারত নির্দ্দীব নিষ্পেষের মত, অস্ত্রহীন অবস্থায় এই অপমান সহ করিতেছে ইহার কি প্রতিকার নাই?

আজ যদি ইংরেজরাজ কোন কারণে ভারত ছাড়িয়া চলিয়া যান তবে কোটী কোটী দেশবাসী নিরস্ত্র অবস্থায় কি করিয়া অস্ত্রশালীর পীড়ন সহ করিবে, সভ্য জাতি ভারতকে সভ্য করিবার ভার লইয়াছেন কিন্তু এই কি সভ্যতার নমুনা? নিজের বেলায় যা অপরাপর সভ্য দেশের বেলায় যে আইন তাহারা চালাইতেছেন সে সভ্য আইন ভারতবর্ষে ত চলিতেছে না। ভারত আজ সর্ব্ব-বিষয়ে আত্মমর্য্যাদা ও আত্মরক্ষার ক্ষমতা হারাইয়া জগতে জগত ছাড়া এক নূতন সভ্যতা সৃষ্টি করিতেছে।

ভারতকে আবার আত্ম-মর্য্যাদা আত্মক্ষমতায় সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে চাহিলে তাহার আত্মরক্ষার ব্যবস্থা সর্ব্বাগ্রে করিয়া লইতে হইবে।

হাস্য।

শিক্ষক। টাকায় দু'মন করলা বিক্রী হচ্ছে—হরু তোমার বাবা, ধর, দোকানে দশটাকা পাঠিয়ে দিলেন, কত মন করলা তারা দিবে বল দিকিন্?

হরু। আজ্ঞে, বার মন মশাই।

শিক্ষক। বার মন! হ'ল না ত হরু!

হরু। কোত্থেকে আর হ'বে মশাই! দোকানদার গুলো যে চোর ঠিক কি আর হ'বার যো আছে!

হাসিমুখের দান এক আধলা সিনি মোহরের সমান।

নেমন্তন্ন যাবার সময় মেয়েরা কাল কি পরবে, ভাবে না।

সবুরে মেওয়া ফলে বটে, কিন্তু মেওয়া যখন ফলে, তখন আম-কাঠও কাটা হ'য়ে থাকে। বিবি বড় হ'তে হ'তে সাহেব গোরে যায় এই হচ্ছে বক্তব্য।

গত বর্ষের অনুশোচনার চেয়ে মূর্খামি আর নেই।

জাপানের নারী।

(শ্রীমতী খুরসিদ আঁহা বেগম)

জাপানের নারীর মত এমন সুন্দরী নারী জগতে আর নাই। ইহার প্রতি কার্য্যে আর্ট বা কলাকুশলতা পূর্ণ মাত্রায় বজায় থাকে। সত্যই জাপানী নারীর মত কলা কুশলী মহিলা জগতে বিরল। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকা ইহাদিগের স্বভাব হইয়া গিয়াছে। জাপানী নারীরা সদা সুখী ও আনন্দিত। মোহিনী শক্তিই তাহাদের প্রধান বিশেষত্ব। ইহাদিগের স্বাভাবিক মাধুর্য্য ও সহৃদয়তার সঙ্গে চেহারা ও চিন্তার মিলনে ইহাদিগকে অপূর্ব্ব সুন্দর করিয়া তুলিয়াছে।

ছয় বৎসরের সময় হইতে ইহারা সরকার পোষিত প্রাথমিক বাধ্যতামূলক বিদ্যালয়ে ছয় বৎসরের জন্য প্রাথমিক শিক্ষা লাভার্থে প্রেরিত হয়। এখানে ইহারা প্রাথমিক নীতি, যে কোন একটি পাশ্চাত্য ভাষা, ব্যায়াম এবং গার্হস্থ শিক্ষা লাভ করে। প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত হইলে পিতা মাতার ইচ্ছা থাকিলে পরে ইহারা উচ্চ শিক্ষার জন্য উচ্চ বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি হইতে পারে।

খেলা, নাচা, ফুল সজ্জা, চা সজ্জা এগুলি তাহাদের শিক্ষার মধ্যে পরিগণিত ও ইহাতে দক্ষ হওয়া বিশেষ গুণের পরিচায়ক। ভঙ্গী, চলা-ফেরা, ভাষা ও কলা সম্বন্ধে ইহারা বিশেষ জ্ঞানলাভ করে। দেখিতে দেখিতে অতি সাধারণ খাবার আয়োজনকে ইহারা একটি ভোজের আয়োজন করিয়া ফেলিতে পারে। জাপানে কোর্টশিপ প্রথার বিশেষ কোন আড়ম্বর নাই। কারণ বিবাহ স্থির করা আত্মীয় অভিভাবক দিগেরই কার্য্য, যাহারা বিবাহ করিবে তাহাদের বিশেষ কিছু নহে। পিতা মাতা বা মধ্যস্থদিগের ইচ্ছানুসারেই এ কার্য্য হয় এবং মিলনের সুখ দুঃখের জন্য অংশতঃ তাঁহারাই দায়ী।

নারীরা তথাকার সংসারের শান্তি দেবী। প্রাচ্যের অন্যান্য দেশ অপেক্ষা জাপানে পত্নীর স্থান অনেক উচ্চে। জাপানে পত্নীকে অকুনাই মাদে অভিহিত করা হয়,—ইহার অর্থ সংসারের মাননীয়া মহিলা। ধর্ম্ম গুরু কনফিউসান যে ভাবে বক্তৃতা শিখাইয়াছেন সেই ভাবের বক্তৃতা জাপানী মহিলাদিগকে শিক্ষা দেওয়া হয়। জাপানের বিবাহ প্রায় খুব সুখেরই হয়, কারণ নারী ও পুরুষ উভয়েই একে অপরের ব্যবহারের সামাজস্য করিয়া লইয়া চলিতে পারে। স্বামী পত্নীর নারীত্বের কাছে অবনমিত হইতে দ্বিধা বোধ করে না, পত্নীও পুরুষের পৌরুষ ক্ষমতাকে শ্রদ্ধা করিতে পারে।

বাল্য বিবাহ জাপানের প্রায় সর্ব্বত্রই প্রচলিত রহিয়াছে। নারীরা প্রায়ই কেহ স্বতন্ত্র ভাবে কোন ব্যবসায় অবলম্বন করেন না, তবে তাঁহারা স্বামীর ব্যবসায় কার্য্যের সহায় হন বটে। দু'জনের মিলনে তাহারা জগতে প্রভূত উন্নতি করেন। জাপানে আজ মাডাম সুজুকির মত বড় ব্যাঙ্কার নারী ও আশা হিকতার মত নারীও ব্যবসায় ক্ষেত্রে রহিয়াছেন। ইহারা ব্যবসায় ক্ষেত্রে প্রচুর অর্থ ও প্রভূত সম্মান অর্জ্জন করিয়াছেন। হিকতা বংশের একটি ছেলে একজন বণিকের কন্যাকে বিবাহ করেন। তাঁহারা টাকা লেন দেনের ব্যবসায় করিতেন। পরে বৃদ্ধ ও বিনয়ে যখন ব্যবসায় মাটি হইয়া যায় তখন হিকতারা তেল, চাল, এবং নীলের কাপড়ের ব্যবসায়ে ভাগ্য ফিরাইবার চেষ্টা করে কিন্তু তাহাদের প্রতি উদ্যমই ব্যর্থ হইয়া যায়।

পরে মাডাম হিকতা ব্যাঙ্কিং ব্যবসায় দ্বারা ভাগ্য ফিরাইবার চেষ্টা করেন, এবং ব্যাঙ্ক বণ্ড বিক্রয় করিয়া প্রভূত অর্থ অর্জ্জন করেন। পরে ইহার কয়লার খনির মালিক হইবার ইচ্ছা হয়, এই উদ্দেশে তিনি মোজি পর্ব্বতে গমন করেন। দুইটি মাত্র অনুচর লইয়া তিনি ঐস্থানে গমন করেন, তথায় বাস করিবার কিছু ছিল না, একখানি কুঁড়ে নির্ম্মাণ করিয়া সেখায় বাস করিতে থাকেন। তাঁহার অর্থও বেশী ছিল না, কিন্তু ইহা দ্বারাই তিনি একটি খনি ক্রয় করিয়া তাহা চালাইবার ব্যবস্থা করেন। এই ভাবে ক্রমে তিনি বহু খনির মালিক হন এবং ভাগ্য ফিরাইয়া ফেলেন। পরে তাঁহার সকল খনি বিক্রয় করিয়া দিয়া সেই অর্থ একটি বড় ব্যাঙ্কিং কারবারে

নিয়োজিত করেন। আজ জাপানের ব্যাপ্তি জগতে এই মহিলার নাম প্রসিদ্ধ। কর্ম্ম জগতে নিজ প্রতিভা ও কর্ম্ম দক্ষতার পরিচয় দিতেও জাপানী মহিলারা বিশেষ দক্ষ।

ইহা ভিন্ন ইহারা দেশের পুরুষের সত্য সঙ্গিনী হইয়া চরিত্র মাধুর্য্যে, অন্তরের সারল্যে ও মোহিনী ক্ষমতার প্রভাবে যে কার্য্যে যান তাহাতেই বিজয়িনী হয়েন।

থিয়েটারে গেলেই যে ভালো-ভালো সুলক্ষ অভিনেত্রী দেখ্‌তে পাওয়া যায়, এ ধারণা ভুল। অনেকের বাড়ী খুঁজলে.....

যে যত বুড়ো, মরবার ভয় তারই বেশী, পৃথিবীতে বেশীদিন বাস করলে ছাড়বার ভাবনার কষ্ট দাদেক।

——

কাকে ভালোবাসা সবার চেয়ে সহজ?—যাকে দেখ-নি!

——

"দাড়ী রাখায় বাস্তবিক কোন উপকার হয় কি না?"

"উপকার ত নেই-ই বরং অপকার যথেষ্ট! পাওনাদার কাছা ধরে তত ধমক করতে পারে না, যত পারে দাড়ী থাকলে। উপরন্তু কাছা ত্যাগ করা তখনি সম্ভব, দাড়ী ত্যাগ করতে হ'লে দেহ রক্ষা করতে হয়।"

একমাত্র যোগ্য সম্পাদক।

সুপ্রসিদ্ধ নাট্য-শিল্পী

শ্রীযুক্ত কার্ত্তিকচন্দ্র দে।

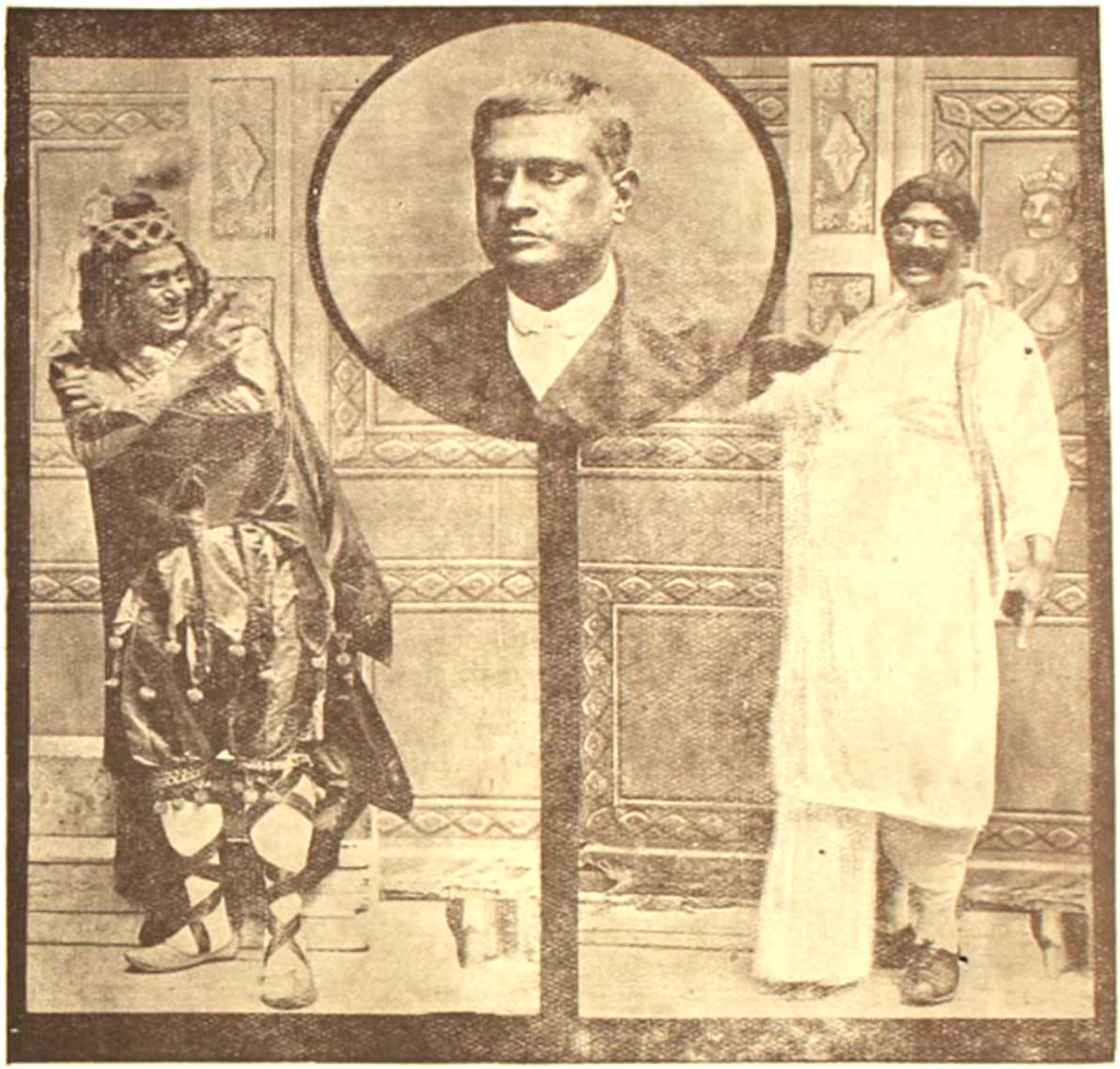

শয়তান-মন্ত্র-দীক্ষিত নাবিকের অবসাদে
শয়তানের আনন্দ।
নাবিকবেশে শয়তানের ভূমিকায়
শ্রীযুক্ত কার্ত্তিকচন্দ্র দে।

"আমাকে চেন-না? আমি বড় বাবু!
এই সাহেবদের ঠিক নীচেই……"
পেলারামের স্বদেশিতায়
কস্মোক্রাস্ অশাই (বড় বাবু)-এর
ভূমিকায় শ্রীযুক্ত কার্ত্তিকচন্দ্র দে।

বর্ত্তমান রঙ্গমঞ্চের অভিনয়ের সহিত যাঁহাদের জানাশুনা আছে, তাঁহাদের নিকট জনপ্রিয় অভিনেতা কার্ত্তিক-বাবুর পরিচয় দেওয়া একেবারেই বাহুল্য। হাস্য-রস, বীর-রস ও কূটনীতির অভিনয়ে কার্ত্তিকবাবুর মত দক্ষ অভিনেতা বঙ্গ-রঙ্গমঞ্চে বিরল।

যেতোর ঠুঁটি বন্ধ করতে পারে নি। যে মেয়েটি একে আলো দেখেছিল, সে ওকে দেখে বলছে ওঠে। ওরে, পাখী কথা কয়, বাবলে ও-মুখে...আ-খো। কিন্তু কথাবার উপায় নেই। তাই একটি বাংলাদেশ ছোকরীকে 'ওরার মানুষ' সাজতেন—এক্রিমেন্ট ছিল। ওরাংওটাং ছোকরী বলে, খবর্দার! মেয়েটি নাক সিঁটকে বলে, আ-খো!

দুই মুখো মাছ। একটা মুখ চোখের নীচে, আর একটা ঠিক মুখের পরে। আশ্চর্য কথা বটে!

ভিসুভিয়াস আগ্নেয়গিরিটি ১৯০৬ সাল থেকে এক রকম চুপ-চাপই ছিল। গত কয়েক মাস হইতে আবার তাহার সাড়া শব্দ পাওয়া যাইতেছে।

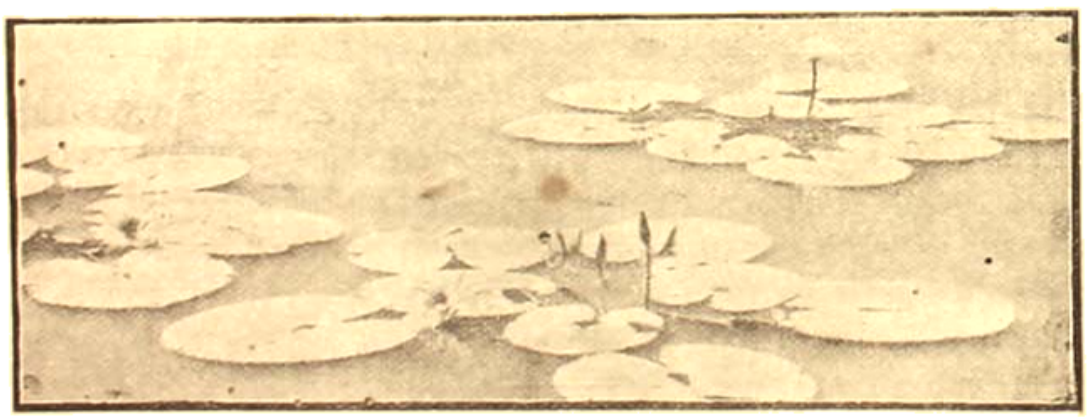

পদ্মের আবাসস্থল।

হতাশ্বাস

(শ্রীবিজনপ্রভা দেবী)

১

প্রেমে পড়িবার কোন সম্ভাবনা না থাকিলেও শোভাময়কে প্রেমে পড়িয়া যাইতে হইল। সম্ভাবনা ছিল না এই হেতু যে তাহার নামটির সঙ্গে চেহারার সামঞ্জস্য আদৌ ছিল না এবং সত্য কথা বলিতে হইলে, অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে প্রেমে পড়ার ইচ্ছাও শোভাময়ের কোনদিন ছিল না—ছিল না, কারণ সময়াভাব। শোভাময় অত্যন্ত কর্মঠ, লেখাপড়া করিয়া, সংসারে দেখা-শুনা করিয়া, অন্য কিছুরই অবসর তাহার ছিল না।

শোভাময়ের দাদা প্রভাময় এম্‌এ পাশ দিয়া দেশ-ভ্রমণে গেল। তাহার পিসিমা থাকেন এলাহাবাদে, প্রভাময় এলাহাবাদে গিয়া দিনকত সাহিত্য চর্চ্চা করিবে, খানকত রাইটিং প্যাড, একটা সোয়ান পেন লইয়া যেদিন সে গৃহত্যাগ করিল, সেইদিনই তাহাদের ছোটমাসী, অর্থাৎ ছাড়ার মা,—ছাড়া ও ছাড়ার দু'টি ভাই-বোন্‌কে লইয়া কিছুদিনের জন্য হাওয়া বদলাইতে ইহাদের বাড়ীতেই আসিয়া উপস্থিত হইলেন। অন্তঃপুরে মাত্র দুইটি শয়ন-কক্ষ,—শোভাময়ের বোন্ হিরণ্ময়ী তাহার দুইটি কাচ্চা-বাচ্চা লইয়া পূর্ব্ব হইতেই একটি ঘর দখল করিয়া বসিয়া গিয়াছিল,—অন্যটি মাসিমার বেটের বাছা বাছা বাক্স দ্বারে ভরিয়া গেল,—শোভাময় বেচারা তাহার জরুল কাঠের জীর্ণ টেবিল, ছেঁড়া বেতের কেদারা, ছিট্‌মারের ঝুলের ল্যাম্প ও বহিগুলি লইয়া প্রভাময়ের সদ্যঃ পরিত্যক্ত বাহিরের ঘরটিতে নিজ আসন বিস্তার করিল।

সেদিন আকাশ ছিল, মেঘলা, দিনের আলো ছিল অল্প, আর শোভাময়ের মনটা ছিল ভারি উড়ু উড়ু! এমন ধারা মনের গতি তাহার কোনদিনই হয় নাই। কাপড়ে-ঢাকা খাঁচার পাখীটাকে কে-যেন খোলা বারান্দায় টাঙাইয়া তাহার বহুদিনের ঢাকাটি খুলিয়া দেছে। শোভাময় দরজা জানালা খুলিয়া দিয়া, জানালাটায় মুখ বাড়াইয়া পড়া মুখস্থ করিতেছিল। পড়া মুখস্থ কেমন হইল, কে জানে! রাস্তায় সে অনেকানেক নূতন দৃশ্য দেখিল এবং সেগুলি হইতে যথেষ্ট এক্‌সপিরিয়েন্স সঞ্চিতও হইতেছিল। প্রথমেই দেখিল, খাকী উর্দ্দীর উপরে পিতলের 'সরকার' তক্‌মা আঁটা একটা লোক ষাঁড়-ধারগণের উপর খুব এক চোটে প্রভুত্ব দেখাইল; তারপর আপাদ কণ্ঠ খাকী পোষকাবৃত একটি লোক বাইসিক্‌ল হাতে চোখ-মুখ লাল করিয়া 'সরকারকে' যাচ্ছেতাই করিল এবং মটর বিহারী একব্যক্তি খাকী পোষাক পরা লোকটিকে একেবারে 'অপদার্থ' বলিয়া চলিয়া গেল। তারপর দেখিল, ছোট-ছোট দুইটি মেয়ের হাত হইতে না বলা না কওয়া চিন্‌টা ছোঁ মারিয়া ঝিলিপি কাড়িয়া কালী মিত্তির-দের ছাদে গিয়া বসিল; ফুটপাতের উপর বেসাতী নামাইয়া আধা-বয়সী এক ঝি—গলায় আবার মোটা মোটা তুলসীর মালা—পয়সার হিসাব নিকাশ করিয়া উদ্বৃত্ত কিছু পেট-কাপড়ে গুঁজিয়া মনিব গৃহের উদ্দেশ চলিয়া গেল; স্কুলের ছেলেরা বহি বগলে অপ্রসন্ন মুখে পিতা মাতার মস্তক ভক্ষণ করিতে করিতে মন্থর গমনে চলিতে লাগিল—শোভাময় ভাবিল, তাইত এতদিন ত এসব দেখিবার সুযোগ হয় নাই। অথচ সংসার যাত্রার পক্ষে এগুলি এতই আবশ্যকীয় তথ্য যে না জানা থাকিলে উত্তরকালে ঠকিবার বিশেষ সম্ভাবনা। শোভাময় এমএ পাশ করিবে নিশ্চিত জানিত বলিয়াই সে আপাম কিছু পড়াও করিতেছিল, স্কুল-কলেজের তাড়া ছিল না—তাহার এই যা।

শোভাময় জানালার ধারে বসিয়া নানান দৃশ্য দেখিতেছে আর ভাবিতেছে, প্রভাময় তিন বৎসর এই ঘরটিতে শুইয়া বসিয়া কত জিনিষই না দেখিয়াছে, শিখিয়াছে! সঙ্গে সঙ্গে লেখা-পড়াও করিয়াছে—হ্যাঁ, করিয়াছে বৈ-কি! তবে পাশ করিতে পারে নাই, সে অবশ্য বরাত! কিন্তু সে কত বিদ্বান, রবি ঠাকুরই তাহার গলার মধ্যে সর্ব্বদা বিরাজমান। ঘানী বাবুর জেন্‌চারপসচার, অমৃত বোসের চং চাং ঘাদের একেবারে করায়ত্ত! তারপর বারনার্ড স, মেরী করেলি এদের লেখার সমালোচনা-ও মুখে-মুখে; বক্তৃতা কালে সুরেন্দ্র বন্দ্যোর কি-কি মুদ্রাদোষ প্রকাশ হইয়া পড়ে, গান্ধী লোকটা প্লাটফরমে উঠিয়া চোখের কি-এক তেজ বলে সমস্ত প্যাণ্ডেলটাকে মুগ্ধ বশীভূত করিয়া ফেলে, এসব প্রভাময় এমনই সুন্দর ভাবে দেখাইতে পারে, সে আর বলিবার নয়। কবে হইতে নিজের চুল-চুক সারিয়া লইয়া, ডি, এল, রায় মহাশয় নাটক-রচনায় হাত দেখাইতে সুরু করিয়াছিলেন, না মরিলে তিনি যে বাঙ্গালা দেশের নাটকগুলিকে বিশ্ব-জগতের নাটকের পার্শ্বে স্থাপিত করিতেও অকৃতকার্য্য হইতেন না, প্রভাময় তাহারই উজ্জ্বল কাহিনী বলিয়া শ্রোতৃগণকে মুগ্ধ করিয়া ফেলিত।—শোভাময় ভাবিতেছিল, দাদা এই ঘরে

বসিয়াই বিশ্ব-জগতের সহিত আনা-শুনা করিয়া ফেলিয়াছে, অতঃপর সে'ও করিবে।

হঠাৎ প্রবল শব্দে রাস্তা কাঁপাইয়া অগণিত যুবা-বৃদ্ধের হৃদয় পঞ্জরে ধাক্কা দিয়া যেমন কলেজের গাড়ীখানা দেখা দিল। একটি মেয়ে দরজার ঠিক পাশটিতে বসিয়া, দুই কুসুমের নীচে বহিগুলি, দুটি করতলের উপরে পদ্মফুলটির মত মুখখানি রক্ষিত, আর কৃষ্ণ দেহ ভ্রমরের মত চোখ-দুটিতে এদিকে চাহিয়া চাহিয়া অদৃশ্য হইয়া গেল।

সেটি ঠিক মেয়ে নয়, যুবতী। অর্থাৎ সেই বয়সই তাহার, যে বয়সের সুস্থ মেয়েকে দেখিলে আকাশের মেঘ উড়িয়া যায়, বাতাস চমকিয়া চায়, এবং পুরুষজাতির বুকের মধ্যে একটা আনচান, একটা কি-জানি-কি ভাব একটা পাই-পাই—এখনই ব্যাকুলতা জাগিয়া উঠে! তার উপর সে যদি আবার চাহে, চাহিয়া দেখে, ওঃ.....

কোথায় কোন্ অন্তরীক্ষে বসিয়া ছোট্ট একটি প্রণয় দেবতা তাঁর ক্ষুদ্র ধনুকটিতে পুষ্পশর যোজনা করিয়া কখন যে কাহাকে বিদ্ধ করিয়া ফেলেন, তাহার কি কোন স্থিরতা আছে! তাঁহাকে কেহ কখনো চর্ম-চক্ষে দেখে নাই সত্য কিন্তু তাঁহার অপ্রতিহত প্রভাব মর্মে মর্মে না অনুভব করিয়াছে, এমন নরনারী ত আমরা কল্পনাও করিতে পারি না। শোভাময়ের সঙ্গে সেই অদৃশ্য প্রণয় দেবতাটির সাক্ষাৎ হইল না, কিন্তু তাঁহার অব্যর্থ-মুক্ত তীক্ষ্ণ শরটি বিঁধিল, শোভাময়ের এমন একস্থানে, যে স্থানটি না-কি সর্বদেহের মধ্যে কোমল এবং যাহার উত্থান-পতনেই না-কি মানুষের জীবন-মরণ নির্ভর করিয়া থাকে!

তবে দেবতাটি 'একচক্ষু' ছিলেন না, সেই একটি শুভ-গ্রহ! তিনি যে এক ঢিলে দুই পাখী মারিয়াছিলেন, অর্থাৎ তাঁহার সুতীক্ষ্ণ বাণটি যে সেই মেয়েটিকেও বিদ্ধ করিয়াছিল, তাহা একেবারে সুনিশ্চিৎ! শোভাময় পরের দিন বেলা দশটার সময়ই তাহা জানিতে পারিল। কেমন করিয়া জানিল, এইবার সে কথাই বলিতেছি।

প্রভাময়-দাদার ঘরের এমনি আব-হাওয়া যে শোভাময় পড়িবে বলিয়া বহি খুলিল, দেখিল বহির পাতায় একটি অক্ষরও নাই, সেই মেয়েটির মুখখানি আঁকা রহিয়াছে; আর সেই মুখের চারিপার্শ্বে রাজ্যের কবিতা আর গান—বাহিরে প্রকৃতির পানে চাহিতে গেল, সেই সৌরাঙ্গী তরুণীর মুখ! তাহারই সেই ভাসা-ভাসা কালো-কালো চোখ-দু'টি! এ ত বড় মুস্কিল! কিন্তু সুবিধা এই, পড়া হইল না বলিয়া মনের মধ্যে একবিন্দু আপসোষ আসিল না, একটুকু দুঃখও হইল না—শোভাময় স্বপ্ন দেখিতে লাগিল।

দশটা বাজিল! সে গাড়ীর এমনই শব্দ আর এ কাণ দু'টি এমন সতর্ক যে শোভাময় একেবারে খাঁ করিয়া পড়িল। সেই ক্ষুরধার অক্ষযুগল, তারপরই সেই গাড়ী—তারপরই সেই আধখোলা দ্বারটি আর দ্বারের পার্শ্বে হরিণী-নয়না, গৌরী-কিশোরী—চক্ষু এদিকেই! যতক্ষণ গাড়ীটি না অদৃশ্য হইল, চক্ষের দৃষ্টি পলক-শূন্য; হৃদয় স্থির এবং মুখভাব অতীব প্রেম-গম্ভীর!

শোভাময় ভাবিল, কাব্য লিখিয়া ফেলে, কিন্তু কবিতা লেখার কায়দা জানা না থাকায় আপাততঃ দুই চারিবার 'হৃদয়ের' সঙ্গে 'সকলের' ও 'কিশোরীর' সঙ্গে 'মনোচুরীর' মিল ঘটাইয়া, সেলফে রক্ষিত প্রভাময়ের সম্পত্তি 'কাব্য-গ্রন্থাবলী' খুলিয়া বসিল। আর যাব কোথায়? প্রথমেই চোখে পড়িল, গান গেয়ে তরী বেয়ে কে আসে পারে—দেখে যেন মনে হয় চিনি উহারে.....শোভাময় ভাবিল, এই ত ঠিক হইয়াছে—দুই চারিটা কথা বদলাইয়া লইলে সুন্দর কবিতা হইতে পারে ত।—সে পড়িল—চেয়ে চেয়ে গাড়ী চড়ে কে আসে···না হইল না, এটা সুবিধা নয় আর একটা পড়িল—তুমি সন্ধ্যার মেঘ শান্ত সুদূর, তুমি আমার নিভৃত সাধনা—হইয়াছে, হইয়াছে, নিভৃত সাধনাই বটে—শোভাময় টেবিল বাজাইয়া প্রবল উৎসাহে নিভৃত সাধনায় মন দিল।

কিন্তু সাধন পথের অন্তরায় স্বরূপ মাসীমার ফৌজ বিপক্ষের অতর্কিত নৈশ আক্রমণের মত হুড় মুড় করিয়া ঘরে ঢুকিয়া কেহ শোভাময়ের বহি, কেহ খাতা, কেহ পেন্সিল এবং সর্ব কনিষ্ঠটি শোভাময়ের কেশ-গুচ্ছ আক্রমণ করিয়া ফেলিল।

শোভাময় মা'কে বলিল—মাসীমা যদি তাহার এই স্বাধীনতা গোরার দলকে সংযত শাসিত না করেন ত তাহার যে ক্ষতিটা হইবে, সে শুধু এ জীবনে নয়, পরজীবনেও সে তাহা পূরণ করিতে পারিবে কি-না ভীষণ সন্দেহ!

অর্বাচীন ব্যক্তি বলিবেন, ছোকরাটা মরেছে! আমি বলিব, মহাশয়, তাহা হইলে দুঁড়ীও মরেছে! শোভাময়কে ঐ জানালার দ্বারে বসিয়া গাড়ীর শব্দ শুনিতে দেখিয়া যদি এমন ধারণা আপনার জন্মিয়া থাকে, যে সে মরিয়াছে,—তবে শুনুন মহাশয় সত্য কথাটি বলি, আমি স্বয়ং সেই ৪নং গাড়ীর বালক সহিস দু'টাকে নগদ আট আনা বখশিস্ দিয়া, জানিয়া লইয়াছি মেয়েটি ঐ দ্বারের পার্শ্বে বসিতে না পাইলে সহযাত্রীগণের সহিত মতবিরোধ

কলহ করিয়া ফেলিত! কেমন, শুনিলেন ত? এখন কি বলিতে চান, বলুন!

পাঁচদিন অতিবাহিত হইয়া গেছে। রোজই চারি চক্ষু মিলিয়াছে, হৃদয়ে হৃদয়ে বিদ্যুৎ খেলিয়াছে এবং সেবাসেবি শোভাময় কাঁদিয়া ফেলিয়াছে! কাঁদিয়াছে, পোড়া অদৃষ্টের কথা ভাবিয়া। কাঁদিয়াছে নিজের কাপুরুষতায়; আর কাঁদিয়াছে, আহা, সেই মেয়েটির দুঃখের কথা স্মরিয়া! শোভাময় পুরুষ মানুষ, তাহারই বুকটি যখন এমন ভাঙ্গিয়া চুরিয়া পড়িতেছে, তাহার কঠিন হৃদি ভেদ করিয়া যখন বর্ষার ধারার মত জল করিয়া পড়িতেছে, তখন সেই পুষ্প সম কোমল বুকখানি, সেই নবনীতোপম হৃদয়টি কি ভাঙ্গিয়া চুরিয়া শতখান হইয়া যাইতেছে না! নিশ্চয়ই যাইতেছে কিন্তু কি আর করিবে? বুকের ব্যথা বুকে চাপিয়া, নয়নজল নয়নে শুকাইয়া নীরবে সকল যন্ত্রণাই সহিয়া যাইতেছে!

আজ শোভাময় মেয়েটিকে ভালো করিয়াই দেখিয়াছে এবং আজিকার দেখার মধ্যে একটু বেশ বৈচিত্র্যও ছিল। ১০টা বাজিবার কয়েক মিনিট পূর্ব্বেই সেই গাড়ী-খানার আওয়াজ শুনিতে পাইয়া শোভাময় জানালা হইতে একটুখানি সরিয়া গিয়া, আড়ালে দাঁড়াইয়া লক্ষ্য করিতেছিল, মেয়েটী তাহাকে দেখিতে না পাইয়া কি করে! শোভাময় স্পষ্টই তাহাকে দেখিতে পাইল, তাহার চোখে-মুখে কি তীব্র ব্যাকুলতাই না ফুটিয়া উঠিল! আঁখি পাখী দুইটা কিসের সন্ধানে যে বার-বার এই জানালাটির দিকেই ধাইয়া আসিতে লাগিল, আর কেহ না বুঝুক, শোভাময় বুঝিল—এবং বুঝিয়াই গাড়ী অদৃশ্য হয় দেখিয়া আর সে থাকিতে পারিল না, জানালার গরাদে ধরিয়া দাঁড়াইল আর সঙ্গে সঙ্গেই সেই হতাশ নয়নদু'টিতে কি আভাই না প্রকাশ হইয়া পড়িল। শোভাময় যেন মেয়েটির একটি প্রবল মুক্তির নিঃশ্বাস শুনিতে পাইল!

তাই শোভাময় আজ জাগিয়াছে। এতদিন যে যেন এই বিষয়ব্রহ্মাণ্ডে সুপ্ত অচেতন ছিল, আজ সুপ্তিভঙ্গে জাগিয়া উঠিয়াছে। এবং জাগিয়া উঠিয়াই সে শপথ করিয়াছে, কাপুরুষ হইবে না। এই প্রেম তাহার জ্ঞাপন করিতেই হইবে। দোষ কি! চুরী নয়, ছুঁচ্চুরি নয়, ডাকাতি নয়,—শুধু প্রেম।

কিন্তু কি উপায়ে শোভাময় সেই সুদূরের প্রণয়িনীকে তাহার প্রেম জানায়?—শোভাময় চিন্তা করিতে বসিল।

৪

একটা চলিত কথা আছে, ইচ্ছার অনুকূল পথ আছেই। শোভাময়-ও প্রেম জানাইবার উপায় স্থির করিয়া ফেলিয়াছে। প্রথমতঃ সে খানকত ইট দিয়া চেয়ার-খানা উঁচু করিয়া লইবে; তাহার উপর বসিয়া গালে হাতটি দিয়া চিন্তাকুল মুখে তাহার দিকে চাহিয়া থাকিবে! এমনই ভাবে চাহিবে যাহাতে মেয়েটি তখনই বুঝিতে পারে যে সেই দৃষ্টির মধ্য হইতে কি আকুলতা কি ব্যাকুলতা না ঝরিয়া পড়িতেছে। তারপর—একদিন দুইটা চুম্বন ছুড়িয়া মারিবে! হাতে করিয়া চুম্বন লইয়া তাহার দিকে নিক্ষেপ করিবে! এই পর্য্যন্ত স্থির আছে।

শোভাময় ইট আনিল, চেয়ারে বসিয়া গালে হাত দিয়া ভাবিতে যাইবে, সামনে আর্শীও আছে, আর গাড়ীর শব্দও শুনা যাইতেছে, শোভাময় যেন ফোটো দিতে বসিয়াছে—মাসিমা, ঢুকিয়া পড়িলেন ও শোভা, শোভা, কৈ বাবা খোকার এরাকট এনে দিলি নে?—গাড়ী আসিয়া পড়িল, চলিয়া গেল, শোভাময় মনে মনে কিড়মিড় করিয়া বলিল—আমি পারব না, যাও! মাসিমা চলিয়া গেলেন বটে, কিন্তু কটু কথা বলার দরুণ মাসিমার তখনী মধ্যাহ্নে আহারের সময় বক্ষো-বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বুদ্ধি হ্রাসের সম্ভাবনা দেখিয়া বিষম ভৎর্সনা করিলেন।

পরদিন, অন্তঃপুর দ্বারটি বন্ধ করিয়া দিয়া শোভাময় আর্শীর সামনে দাঁড়াইয়া বারকতক চুম্বন ছোঁড়ার রিহার্সাল দিল, আর নিজ মনেই বলিল—প্র্যাক্টিস হইয়াছে। ক্রমে গাড়ীর সেই শব্দ শুনা গেল। দেখিতে দেখিতে ঘোড়ার মুখও দেখা গেল, শোভাময় প্রথম চুম্বনটি ছুড়িবে, দ্বিতীয়বের নিশি গরাদে গলাইয়া তাহার হাতটা ধরিয়া ফেলিয়া বলিয়া উঠিল, কি বাবা ঘরের মধ্যে জিম্-ন্যাষ্টিং হচ্ছে?—গাড়ী চলিয়া গেল। শোভাময় বলিল—তোর ভাঁটির পিণ্ডি হ'চ্ছে।

নিশি দুঃখিতস্বরে বলিল—রাগ করলি ভাই? দূর পাগলা, হাস্‌তে হাস্‌তে……

শোভাময় বলিল—হাস্‌তে হাস্‌তে!!

নিশি ভয় পাইয়া বলিল—আচ্ছা ভাই, কর তুই জিমন্যাষ্টিং-ই-কর—আমি চল্লুম!

শোভাময় ঘড়ি ধরিয়া আধটি ঘণ্টা হাঁ করিয়া বসিয়া রহিল। ইচ্ছা হইতেছিল, নিশিটাকে সামনে এক চড়

বাহিরা বদনটি বিপড়াইয়া দেয়! কিন্তু তখন নিশি ত বহুদূরে! দুই দুইটা দিন এমন বিরহে যাওয়ায় শোভাময়ের দুঃখের অবধি ছিল না। সে নিজের জন্য ততটা দুঃখ নহে, যতটা মেয়েটির কথা ভাবিয়া তাহার হৃদয়মন অবশ হইয়া যাইতেছে! না-জানি এই দুইদিন তাহার অদর্শনে সে কি ভাবিতেছে! শোভাময়ের প্রেমে সে হতাশ হইয়া গেল না ত!.....

অতঃপর স্থির করিল, কাল সে পুসি কুকুরটিকে বুকে তুলিয়া ধরিয়া চুম্বন করিবে এবং সেই সময়ে নিশি-টিশি কেহ আসিয়া পড়িলে পুসিকে তাহার ঘাড়ের উপর ফেলিয়া দিয়া, কেবলমাত্র আজ্ঞা দিবে—লেঃ! বাস্ যেমন তার তেমনি। মজাটা টের পাইবে' খন!

কিন্তু মজাটা তাহাকেই টের পাইতে হইল—কুকুর শাবক চুম্বনে অভ্যস্ত ছিল না, তার উপর এতখানি আদরে বেচারা ভড়কাইয়া গিয়া, নাকের উপর এমনই দুটি নখ্ বসাইয়া দিল যে গাড়ীর দিকে দৃষ্টিপাত ত বহুদূরের কথা—ঝর ঝর ঝর—রক্ত ঝরিয়া শোভাময়ের টুইল সার্টটি রাঙা হইয়া গেল।

•

উপল খণ্ডে বাধা প্রাপ্ত হইলে জলের গর্জ্জন বর্দ্ধিত হয়; প্রেমে বাধা পাইলে প্রেমের বেগ রেলের এঞ্জিনের মত সতেজ হইয়া উঠে—শোভাময় আর দিগ্বিদিক মানিবে না, জানাইবে জানাইবে, জানাইবে! যেমন করিয়া পারে, যবে পারে, যখন পারে—তবে যত শীঘ্র হয়—সে কি আর বলিতে!

শোভাময় অনেক ভাবিয়া-চিন্তিয়া উপায় বাহির করিয়া ফেলিয়াছে। সে একখানি পত্র রচনা করিবে এবং গাড়ীটা যখন ছুটিয়া যাইবে, তখন লাফাইয়া পাদানে উঠিয়া চিঠিখানি তাহার কোলের উপর ফেলিয়া দিবে! পত্রে নাম, ঠিকানা সব থাকিবে, আর থাকিবে, প্রেম, প্রেম, গাঢ় প্রেম!

কিন্তু আজ আর পত্র লেখা হইয়া উঠিল না। কি পাঠ লিখিবে, কি বলিয়া সম্ভাষণ জানাইবে? রবীন্দ্র গ্রন্থাবলী হইতে কবিতা ছাঁকিয়া উঠাইয়া দিবে না কমলাকান্তের প্রেম-ব্যাখ্যা তুলিয়া দিবে, ভাবিতে ভাবিতেই দশটা বাজিয়া গেল। শোভাময়ের বক্ষে ঝড় তুলিয়া, পিচ্ ঢালা বিতল ষ্ট্রীট কাঁপাইয়া গাড়ী দেখা দিল। ওঃ হরি সে গাড়ী ত নয়—এ যে অশ্ব ঘোড়া! না, না—ঐ ত! ঐ ত! ঐ যে তাহার প্রেমময়ী!

ওকি! ওকি! গাড়ী কাৎ হয় কেন? ঘোড়া ক্ষেপিল? তাই ত! তাই ত! ওঃ—শোভাময়ের চক্ষের সম্মুখে বিশ্ব জগৎ লুপ্ত হইল! গেল, গেল, সব গেল! তাহার বুকের মধ্যে রক্ত আনচান করিয়া উঠিল—শোভাময় ছুটিল,—এখনি গিয়া যার খুলিয়া প্রেয়াকে আশু বিপন্মুক্ত করিতে পারিবে ভাবিয়া শোভাময় ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিল, ছুটিল!

সহিসদ্বয় দুইটা ঘোড়ার মুখ ধরিয়া হিইয়ো হিইয়ো করিয়া টান দিতেছিল, আর মোটা-মোটা অনেকগুলি ছোকরা যুবা অশ্বদ্বয়কে বশে আনিবার প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছে, দেখিতে দেখিতে এই ধর্ম্ম কার্য্যে অগণিত লোক-সমাগম হইয়া গেল; শোভাময় কিন্তু কোনদিকে চাহিল না—সে এক লাফে পা-দানে উঠিয়া পড়িল।

আর কে-জানে—কে—"কোচুয়ান কোচুয়ান" শব্দে রাস্তা কাঁপাইয়া তুলিল। শোভাময়ের কাণে শব্দটা গেল বটে, কিন্তু গেল মাত্র—সে কি আর তখন তাহাতে ছিল, সে যার গলাইয়া, মুখ বাড়াইয়া শুধু বলিতেছিল—নেমে এস, নেমে এস.....

সপাং!

পিঠ জ্বলিয়া গেল শোভাময়ের দেহ ধূলায় লুণ্ঠিত হইল।

এবং ধূলা কাদা মাখিয়া,ছল ছল চোখে উঠিয়া দাঁড়াইতেই দেখিল, দ্বারের পাশে সেই মেয়েটি বসিয়া, খুব হাসিতেছে। হো হো হাসি, একেবারে ঢলিয়া ঢলিয়া পাশের মেয়েটির ঘাড়ে পড়িতেছে; আর হাসিতে তাহার মুখখানা বিশ্রী একটা বোয়াল মাছের মত হইয়া গেছে।

শোভাময় বাড়ী আসিয়া সেইদিনই মেওয়ালে লিখিল —স্ত্রীলোককে বিশ্বাস করিও না!

যাত্রী। এ টাকাটা বদলে দিন ম'শাই, এটা অচল!

বুকিং ক্লার্ক। অচল তা আমি করব কি বাবু!

যাত্রী। আজ্ঞে, আপনিই যে দিলেন মশাই.....

বুকিং ক্লার্ক। (মুখ বিকৃত করিয়া) আপনিই যে দিলেন মশাই! এতক্ষণ ছিলে কোথায় বাবু? যাও, যাও, ভিড় করো না—আগে বলতে পার নি।

যাত্রী। ওঃ আমারই ভুল হ'য়েছে। একখানা পাঁচ টাকার নোট বেশী দিয়ে ফেলেছেন যে!

বুকিং ক্লার্ক। তাই না-কি। তা ওরকম হয় মশাই—ভুল-চুক··· (যাত্রী অদৃশ্য)

রোকশোধ

(শ্রীনারায়ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।)

অথচ ডাক্তার বলিতেছেন, কাল আড়াই প্রহর পর্য্যন্ত টিঁকে কি না সন্দেহ। অনুপমা আকুল হইয়া পড়িল।

এই সময়ে হঠাৎ তারকনাথের কথা তাহার মনে হইল। সে তো এই নিকটেই আছে বলিলে হয়। যতই রাগ তাপ হউক, এ সংবাদ পাইলে সে না আসিয়া কখনই থাকিতে পারিবে না। অনুপমা তাড়াতাড়ি টাইম টেবল খুলিয়া দেওয়ানের নামটা দেখিয়া লইল এবং তারকনাথের নামে টেলিগ্রাম করিবার জন্য ডাক্তারবাবুকে অনুরোধ রক্ষা করিতে স্বীকৃত হইলেন। তিনি যথা সময়ে টেলিগ্রাম করিলেন, কিন্তু তারকনাথ গাঙ্গুলীর পরিবর্ত্তে তারা নাথ গাঙ্গুলীর নামে টেলিগ্রাম করিয়া যে একটা ভুল করিলেন, সে ভুলের সংশোধন করিতে শুধু অনুপমাকে নয়, তারানাথকে পর্য্যন্ত জীবন সংগ্রামে অনেকটা ক্ষতি সহ্য করিতে হইল।

অষ্ট পরিচ্ছেদ

তারানাথ বলিল, "আপনি কি তারকবাবুকে টেলিগ্রাম কত্তে চান?"

অনুপমা বলিল, "তিনি এলেই আমাদের যাওয়ার সুবিধা হয়।"

তারানাথ বলিল, "কিন্তু তাঁর ঠিকানাটা আমি ঠিক জানি না,। ভাল, পলাশপুরেই টেলিগ্রাম ক'রে দেখি।"

তাহাই হইল; তারানাথ পলাশপুর ষ্টেসনেই টেলিগ্রাম করিয়া সেই সঙ্গে উত্তর আসিবারও খরচ দেওয়া হইল। পরদিন উত্তর আসিল, পলাশপুর ষ্টেসনে তারকনাথ গাঙ্গুলী নামে কেহই নাই।

তারানাথ তখন অতঃপর কি করা আবশ্যক তাহা অনুপমাকে জিজ্ঞাসা করিল। অনুপমা একটু কুণ্ঠিতভাবে বলিল, "আপনি অনর্থক অনেক কষ্ট ভোগ কর্লেন। কিন্তু আপনি না এসে পড়লে আমার কি হ'তো তাই ভাবি।"

তারানাথ বলিল, "সে জন্য আপনি এতটা কুণ্ঠিত হচ্ছেন কেন? ঈশ্বর যা করেন মঙ্গলের জন্য, নয় তো ডাক্তারবাবু একজন বিচক্ষণ লোক হ'য়ে এমন ভুল কেন করবেন! কিম্বা যদি তারকবাবুর নামেই টেলিগ্রাম যেতো তা হইলে তিনিও সংবাদ পেতেন না, আমিও আসতাম না।".

অনুপমা নীরবে মস্তক আন্দোলন দ্বারা ইহা স্বীকার করিয়া লইল। তারানাথ বলিল, "তা হ'লে কি বাড়ীতে টেলিগ্রাম করবেন? কিন্তু সেখান থেকে লোক চলে আসতে তো ঠিক চার দিন দেরী হবে?"

অনুপমা বলিল, "তা হবে। কিন্তু এ ছাড়া কি আছে?"

একটু ভাবিয়া তারানাথ বলিল, "তিন চার দিন থাকতে হবে। তার চাইতে—কিন্তু আমার সঙ্গে আপনি যেতে পারেন না কি?"

বলিয়া সে অনুপমার দিকে জিজ্ঞাসাপূর্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল। বাস্তভাবে অনুপমা বলিল, "আপনার সঙ্গে যেতে আমার একটুও আপত্তি নাই। তবে আপনাকে এতটা কষ্ট দিতে আমার যথেষ্ট আপত্তি আছে।"

তারানাথ হাসিয়া উঠিল; বলিল, "তা হইলে অন্ততঃ আপনাকে সঙ্গে নিয়েও আমাকে আপত্তির খণ্ডন কত্তে হবে।"

অনুপমাও মৃদু হাসিল। তারানাথ বলিল, হলে বাড়ীতে টেলিগ্রাফ করা হবে কি?"

অনুপমা বলিল, "দরকার নাই, ততদিন এখানে অপেক্ষা কত্তে-ও পারবো না। কালই আমি চলে যেতে চাই।"

একটু উন্মাদের হাসি হাসিয়া তারানাথ বলিল, "তাহলে আমাকে কষ্টটা নেহাৎ ভোগ কত্তেই হবে দেখছি।"

পরদিন অনুপমাকে লইয়া তারানাথ মধুপুর ত্যাগ করিল।

বাড়ীতে পৌঁছিলে ক্ষেমঙ্করী দেবীর ক্রন্দনের নিবৃত্তি হইতেই একটা দিন রাত লাগিল। তার পর অনুপমা উপযুক্ত সমারোহের সহিত পিতার চতুর্থী-শ্রাদ্ধ সম্পন্ন করিল। সে ব্যাপারের নিষ্পত্তি হইতে তিন চারিদিন কাটিয়া গেল। শ্রাদ্ধ-শান্তি শেষে উইল বাহির হইল। মধুপুরে যাইবার পূর্ব্বে মহেন্দ্রনাথ উইল করিয়া গিয়াছিলেন। উইলে তিনি কন্যাকেই আপনার ত্যক্ত সম্পত্তির একমাত্র উত্তরাধিকারী নির্দ্দিষ্ট করিয়াছিলেন। সুতরাং অনুপমাই সমস্ত সম্পত্তির একমাত্র মালিক হইল।

সম্পত্তির মালিক হইল বটে, কিন্তু অনুপমা তখনও

নাবালিকা; আইন অনুসারে নাবালিকার বিষয়কর্ম্ম পরিচালনায় অধিকার নাই। মহেন্দ্র বাবু যদি উপযুক্ত অভিভাবক (একজিকিউটর) নির্দ্দেশ করিয়া যাইতেন, তাহা হইলে কোনই গোল থাকিত না কিন্তু তিনি সেরূপ কোন নির্দ্দেশ করিয়া যান নাই। কাজেই কার্য্য পরিচালনা লইয়া একটু গোল বাধিল।

গোল তেমন কিছু বাধিত না, যদি মহেন্দ্র বাবুর নিয়োজিত ম্যানেজার এই সুযোগে বিশ্বাসঘাতকতা করিতে উদ্যত না হইতেন। মহেন্দ্র বাবু কাজকর্ম্ম নিজেই দেখিতেন, সুতরাং ম্যানেজার এতদিন কাঠের পুতুলের মত খাড়া থাকিয়া প্রভুর ইঙ্গিতে পরিচালিত হইতেন মাত্র। তেমন পাকা লোকও তিনি ছিলেন না। সুতরাং কাঁচা লোকের যেরূপ রীতি—সুযোগ বুঝিয়া এই সময়ে তিনি কিছু হাত করিয়া লইতে চেষ্টিত হইলেন, এবং তাহা গুপ্তভাবে সম্পন্ন করিতে ইচ্ছুক হইলেও তেমন দক্ষতা না থাকায় স্বীয় চেষ্টাটাকে গোপনে রাখিতে পারিলেন না। সুতরাং ম্যানেজারকে স্বার্থসিদ্ধির জন্য হাত বাড়াইতে দেখিয়া অপরাপর কর্ম্মচারীরাও নিশ্চেষ্ট রহিল না, তাহারাও সাধ্যমত হাত বাড়াইবার উপক্রম করিল। ইহার ফলে কাজকর্ম্মে একটা ভয়ানক বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইল।

অনুপমা পিতার সঙ্গে সঙ্গে থাকিয়া বিষয়-কর্ম্মে অনেকটা অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিল। সুতরাং এই বিশৃঙ্খলতা লক্ষ্য করিতে তাহার অধিক বিলম্ব হইল না, এবং কি উপায়ে ইহা দূর করিয়া মৃত কর্ম্মচারীদের কবল হইতে সম্পত্তি রক্ষা করা যায় তাহাই ভাবিতে লাগিল। অনেক ভাবিয়া স্থির করিল, উইল প্রবেট লইবার সঙ্গে সঙ্গে আমমোক্তার নামা দিয়া যদি কোন উপযুক্ত বিশ্বাসী লোককে ম্যানেজার রূপে নিযুক্ত করা যায়, তাহা হইলে সকল গোলযোগ মিটিয়া যাইতে পারে। কিন্তু সেই বিশ্বাসী লোকটীকেই সহসা খুঁজিয়া পাইল না। অনেক চিন্তার পর পরিশেষে তারানাথকেই উপযুক্ত পাত্র বলিয়া স্থির করিল।

যদিও অল্পদিনের ব্যবহারে তারানাথের স্বভাব-চরিত্র সম্যকরূপে বুঝিয়া লইবার সুযোগ অনুপমা পায় নাই, তথাপি একদণ্ডের আলাপে লোকের চরিত্র সম্বন্ধে যতটা ধারণা করা যায়, মাসাধিক কালের আলাপ পরিচয়ে তারানাথের প্রকৃতি সম্বন্ধে তদপেক্ষা অনেকটা বেশী অভিজ্ঞতা লাভ অনুপমার হইয়াছিল, এবং সেই অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করিয়াই সে আপাততঃ তারানাথকেই উপযুক্ত বলিয়া স্থির করিয়া লইল। তারানাথ ছাড়া আর কাহাকেও সে খুঁজিয়া পাইল না।

তারানাথও তখন একটা বিষম সঙ্কটাপন্ন অবস্থার মধ্যে পতিত হইয়াছিল। শুনা যায়, পূর্ব্বকালে কামরূপের ডাকিনীরা যাদুবিদ্যার প্রভাবে মানুষকে মেষবৎ অবস্থা করিয়া রাখিত। অনুপমার যে বিদ্যার অভিজ্ঞতা লাভের কিছুমাত্র সম্ভাবনা না থাকিলেও এক এক সময়ে তারানাথের যেন মনে হইত, সে কোন কুহকের মধ্যে পড়িয়াছে কি না। নতুবা মাসাধিক কাল গত হইলেও এবং এখানে আসিবার মত কোন প্রয়োজন দেখিতে না পাইলেও সে এ স্থান ত্যাগ করিতে পারিতেছে না কেন? কিন্তু এইস্থানটা ত্যাগ করিবার জন্য বাস্তবিক তাহার যে এমন বেশী আগ্রহ ছিল, এবং কাহারও সনির্ব্বন্ধ অনুরোধে সে আগ্রহকে দমন করিয়া তাহাকে থাকিতে হইয়াছিল তাহা নহে। অনুপমার সহিত একত্র বসিয়া যাইবার বা গল্প গুজব করিবার সময় কোন কোন দিন কথাচ্ছলে যাইবার প্রসঙ্গটা উত্থাপন করিতে যাইত বটে, কিন্তু কথাটা না তুলিতেই অনুপমা যখন ব্যস্ততার সহিত জিজ্ঞাসা করিত, "এখানে আপনার বড্ড বেশী কষ্ট হচ্ছে না তারানাথ বাবু?" তখন তারানাথ কিছুতেই আর যাইবার প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়া অভদ্রতা প্রকাশে সাহসী হইত না।

আবার এক এক সময়ে পিতৃশোকাকুল বালিকা পিতার শোকে অধীর হইয়া পড়িলে তারানাথ সান্ত্বনা বাক্য প্রয়োগে তাহাকে প্রকৃতিস্থ করিতে যত্নবান্ হইত, এবং নানা গল্প গুজব আনিয়া ফেলিত, তখন অনুপমা কৃতজ্ঞতাপূর্ণ কণ্ঠে বলিত, "বাস্তবিক তারানাথ বাবু, এই শোক দুঃখের ভীষণ দুর্য্যোগের সময়ে ভগবান্ যেন আপনাকে আমার জন্য একটা শক্ত আশ্রয় করে পাঠিয়েছেন! কিন্তু আপনি চলে গেলে যে আমার কি হবে তাই ভাবি।"

সেই ভাবী বিচ্ছেদের আশঙ্কায় অনুপমার মুখখানা যখন ম্লান হইয়া আসিত, তখন তারানাথের এ স্থান ত্যাগ করিবার ইচ্ছাটা যেন সম্পূর্ণ অনিচ্ছায় পরিণত হইয়া আসিত, এবং তেমন নিষ্ঠুর ইচ্ছাটাকে মন হইতে একেবারে দূর করিয়া দিতে চাহিত।

কিন্তু এমন শুধু শুধু পরের অন্নধ্বংস করিয়া দিন কাটাইয়া দেওয়াকেও তারানাথ সব সময়ে ভাল বলিয়া মনে করিতে পারিত না। লোকে কি বলিবে, অনুপমাই বা কি মনে করিবে? না, এইবার বিদায় লওয়াই শ্রেয়স্কর। যাক খানিক পরে তারানাথ এইরূপ সঙ্কল্প করিল, কিন্তু বলি বলি করিয়াও বিদায়ের কথাটা বলিতে পারিল না; আজ কাল করিয়া পক্ষাধিক কাল গত হইল। পরিশেষে কথাটা বলিবার জন্য সে যখন উন্মুখ হইয়া

উঠিল—ঠিক সেই সময়েই অনুপমা তাহার নিকট প্রস্তাব করিল যে, তাহাকে আমমোক্তার নামা দিয়া ম্যানেজারের পদে বরণ করিবার জন্য অনুপমা আগ্রহান্বিত হইয়াছে। প্রস্তাবটা অপ্রীতিকর না হইলেও পদের দায়িত্ব স্মরণ করিয়া তারানাথ শিহরিয়া উঠিল; বলিল, "সর্ব্বনাশ! আমি ম্যানেজারী করবো?"

অনুপমা তাহাকে বুঝাইয়া দিল যে, ম্যানেজারের কাজটা বাস্তবিক খুব ভয়ানক সর্ব্বনাশের কাজ নহে, যে কোন বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিই এই কার্য্য সম্পন্ন করিতে সক্ষম। অনুপমা যদি স্ত্রীলোক ও বালিকা না হইত, তাহা হইলে সে নিজেই অনায়াসে এই কাজটা চালাইয়া দিতে পারিত। কিন্তু তাহার সকল দিকেই বাধা। অগত্যা সে তারানাথকেই এই পদে প্রতিষ্ঠিত করিতে যাইতেছে, তারানাথ ভিন্ন এমন দায়িত্ব পদে নিযুক্ত করিবার উপযুক্ত বিশ্বাসী লোক সে আর খুঁজিয়া পায় নাই। তিনি এই ভার গ্রহণে অস্বীকৃত হইলে অল্পদিনের মধ্যেই সমস্ত সম্পত্তি বিশ্বাসঘাতক কর্ম্মচারীদের কবলিত হইবে।

ইহা শুনিয়া তারানাথ দুঃখিত ও চিন্তিত হইল, এবং এই কার্য্যে, অভিজ্ঞ হইয়া সে কিরূপে সুশৃঙ্খলার কার্য্য নির্ব্বাহ করিবে তাহাই জানিতে চাহিল। অনুপমা তাহাকে বুঝাইল যে, তাঁহার যেমন বিদ্যা আছে, বুদ্ধি আছে, তখন অভিজ্ঞ হইতেই বা কয়দিন লাগিবে? কর্ম্মনা বাধ্যনে বুদ্ধি'—কাজ করিতে করিতেই তাহাতে অভিজ্ঞতা লাভ করা যায়। বিশেষ অনুপমা যখন তাঁহার পশ্চাতে থাকিবে, এবং প্রয়োজন মত পরামর্শ করিতে পারিবে, তখন তাঁহার আর চিন্তার বিষয় কি আছে?

অনুপমার অনুরোধ এড়াইতে না পারিয়া তারানাথকে সম্মতি দিতে হইল এবং উইল প্রবেটের সঙ্গে সঙ্গে আমমোক্তার নামা লইয়া ম্যানেজারের পদ অধিকার করিয়া বসিল। প্রথম দিন কতক বড় গোলমাল ঠেকিল; ক্রমে কাজ সহজ হইয়া আসিতে লাগিল। যেখানে গোলমাল ঠেকিত, সেই কাজেই অনুপমার পরামর্শ গ্রহণ করিত। এইরূপে তারানাথ যতই অনুপমার নিকটবর্ত্তী হইয়া পড়িতে লাগিল, ততই সে জীবনটাকে নবীন ও সরস দেখিয়া পুরাতনটাকে বিস্মৃত হইতে থাকিল।

(ক্রমশঃ)

পূজারিণী।

(শ্রীসরসীবালা বসু)

দেব মন্দিরে পূজার যাত্রী তুমি?
দাঁড়াও দাঁড়াও, আমি ওগো পূজারিণী,
পূজা উপচার সামান্য যাহা কিছু
সাজায়ে এনেছি তাতেই অর্ঘ্য খানি,
নাহি জানি পথ দেবতার দেউলের,
সাথী লও মোরে দয়া করি সঙ্গের।
নাই, নাই, নাই সময় তোমার নাই,
বেলা বহে যায় নাহি তিল অবসর,
বারেক সুধাই উত্তর দাও ওগো,
তোমার দেবতা আমারি কি তিনি পর?
তাঁহার চরণে আমিও যেতে যে চাই,
পথের পথিক, পথ বলে দাও ভাই।
কোথা যাও ওগো? দেব মন্দির দ্বারে?
লও মোরে লও, আমিও যে পথ হারা
সঙ্গী জোটাতে নাই তব অবসর?
যাহারে সুধাই উত্তর একধারা।
পূজা আয়োজন নিষ্ফল হ'লো তবে,
আঁখি নীরে ভাসি হতাশে ফিরিতে হবে?
এ কেমন কথা? সে কি হয়, সে কি হয়,
পূজার অর্ঘ্য নামাতে হবেই মোরে,—
দেবতার পায়, ফিরে যাওয়া কভু নয়,
রে অবোধ মন পথে এসে কেন ফিরে?
মুছনে হতাশ, মুছে ফেল্ আঁখি জল্,
আপনার পথ আপনি খুঁজে নে চল্।
পথ ভুল হয়, বিপথে পড়িস্ যদি,
চরণ মন্দিরে হয় কণ্টক ক্ষত,
সে বেদনা তোর পরিপাক করা চাই,
পথ খুঁজে নিতে হোস্ না কো আনা হত।
থাকে যদি তোর, সেই সাধনার বল,
পূজা আয়োজন হবে না কো নিষ্ফল।

বিভ্রম

(শ্রীঅজয়কুমার সেন)

শিল্পী—সে তরুণ যুবক।

যে স্থান পাহাড়ের কোল ঘেঁসিয়া নৃত্য-লীলা ক্ষুদ্র পার্ব্বত্য-নদী নিপুণ নর্ত্তকীর মত উপলখণ্ড মুখরিত ও চকিত করিয়া চলিয়া গিয়াছে—তাহারই তট-প্রান্তে শিল্পীর আশ্রম।

সে প্রতিদিন নক্ষত্র-খচিত উন্মুক্ত আকাশ তলে, নদীর বিচিত্র কলতানে তাহার মানসী-মূর্ত্তিকে আপন-মনে ধ্যান করিত। ধ্যানে আপন-ভোলা হইয়া, কত বিনিদ্র রজনী নীরবে কাটিয়া যাইত; তথাপি শিল্পীর সে ধ্যান ভাঙ্গিত না।

শিল্পীর এক নূতন বন্ধু, নাম তার চিত্রা। সে পাহাড়ীয়া রমণী, লাজ-সঙ্কোচ-ভয়-হীনা। নিটোল দেহলতা দুলাইয়া দুলাইয়া পাহাড়ের ঢাল ভাঙ্গিয়া সে চলিত; কোথাও বা গতি মন্দ এবং কোথাও বা দ্রুত।

চিত্রার রক্ত গোলাপ-সদৃশ ঠোঁটের দুইপাশে সর্ব্বদাই হাসি বিরাজিত। মুখে তাহার কোন প্রকার চিহ্ন মাত্র নাই—যেন সবই উৎসন্ন। মুক্ত-প্রকৃতি অজস্র ধারায় বিপুল সৌন্দর্য্যরাশি তাহার উপর বর্ষণ করিতে দ্বিধা বোধ করে নাই। তাহাকে একবার দেখিলে নয়ন ধাঁধিয়া যায় না বরং চক্ষু শীতল হয়।

প্রতি সন্ধ্যায় চিত্রা তাহাদের গৃহ-পালিত গরু লইয়া সেই দুরারোহ বন্ধুর ও অসমতল পার্ব্বত্য-পথ দিয়া মন্থর গতিতে ও স্বচ্ছন্দ-চিত্তে গৃহে ফিরিত এবং শ্রমে শরীর ক্লান্ত হইয়া পড়িলে, শিল্পীর কুটীর-দ্বারে আসিয়া একবার বসিত এবং তাহার কুশল জিজ্ঞাসা না করিয়া সেখান ত্যাগ করিত না।

শিল্পী একদিন তাহার কার্য্যে নিবিষ্ট আছে, এমন সময় হঠাৎ চিত্রা আসিয়া চাহিতে কহিল,

"ওখানা কার ছবি?"

শিল্পীর কোন উত্তর না পাইয়া চিত্রা পুনরায় বলিল, "ওখানা কার ছবি?"

শিল্পী চমকিত হইয়া ফিরিয়া দেখিল—হাস্য-মুখী চিত্রা, সারা অঙ্গে যৌবনকে মাতাল।

'কখন এলে—তোমার গরু কোথায়—আজ বুঝি আর পাহাড়ে পাহাড়ে গরুর খোঁজে যাওয়া হবে না' ইত্যাদি প্রশ্নে তাহাকে বিব্রত করিয়া তুলিল।

চিত্রা প্রশ্নের ভাবে কণ্টকিত হইয়া কহিল, 'মা, আজ আর পাহাড়ে যাব না—এইজন্য পালিয়ে এসেছি তোমার কাছে।' বলিয়া হাসিয়া ফেলিল এবং অর্দ্ধসমাপ্ত ছবি-খানার উপর চপল দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল।

"কেন আজ যাবে না—ভাল লাগে না বুঝি?" বলিয়া শিল্পী তাহার মুখের দিকে তাকাইল।

চিত্রা তাহার স্বভাব-কোমল-স্বরে কহিল, 'রোজ ত যাই—আজ আর নাই বা গেলাম। আমার ভাই বলিয়া আজ যাবে।" বলিয়া কাপড়ে মুখ ঢাকিল।

'তা বেশ—আর কোন কথা আছে।' বলিয়া শিল্পী কাজে মন দিল।

পুনরায় চিত্রা মৃদুস্বরে কহিল, "আমাকে আঁকা শেখাবে—আমার বড় ভাল লাগে।"

কিছুকাল নীরব থাকিয়া শিল্পী উত্তর দিল—'শেখাব তুমি এস।"

* * * * *

কয়দিন হইল চিত্রার কোন সন্ধান নাই। তাহার বাপ ও অন্যান্য পাহাড়ীয়া পাহাড়কে তোলপাড় করিয়া তুলিয়াছে—কিন্তু কোথাও তাহার চিহ্ন পর্য্যন্তও নাই।

শিল্পীর মন আজ যেন কিসের ভারে ভারাক্রান্ত। কিছুতেই মন স্থির হইয়া বসিতেছে না। উন্নত কপাল চিন্তায় ঘন রেখায় খচিত, কুঞ্চিত কেশ-কলাপ ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত; দৃষ্টি প্রসন্ন কিন্তু আপন-হারা যেন সুদূর ভবিষ্যতে কাহার সন্ধানে ফিরিয়া ফিরিয়া বেড়াইতেছে।

অবশেষে সন্ধান করিয়া চিত্রার বাপ ও অন্যান্য আত্মীয়েরা উপস্থিত হইল—শিল্পীর আশ্রমে।

শিল্পীকে চিত্রার অনুরূপ মূর্ত্তি আঁকিতে দেখিয়া, তাহারা স্থির করিল—এই লোকটা চিত্রাকে পাহাড়ের কোন নিভৃত স্থানে লুকাইয়া রাখিয়া এই মূর্ত্তি আঁকিয়াছে।

শিল্পীকে চক্ষু তাড়াইয়া তাহারা কহিল, 'চিত্রা কোথায়?"

সে মাথা নাড়িয়া কহিল, "তাই ত—চিত্রা কোথায়।" বলিয়া নিবিষ্ট মনে নিজ অঙ্কিত চিত্রটি দেখিতে লাগিল। তারপর চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল, "এই ত আমার চিত্রা!"

লোকটাকে পাগল মনে করিয়া, তাহারা বিষণ্ণ মনে যে যাহার স্থানে চলিয়া গেল।

অনতিবিলম্বে কোথা হইতে মত্ত হরিণীর মত নিমিষের মধ্যে চিত্রা আসিয়া শিল্পীর পাদমূলে পড়িয়া কহিল—'এই ত তোমার চিত্রা।" বলিয়া ঝড়ের মতন ঘরের বাহির হইয়া চলিয়া গেল।

শিল্পী ত অবাক্।

* * * * *

কিয়ৎক্ষণ-পরে শিল্পী সংজ্ঞা লাভ করিয়া আপন মনে বলিতে লাগিল, তাই ত, চিত্রা—চিত্রা—চিত্রা। বলিয়া ডাক দিতে দিতে তাহার সন্ধানে বাহির হইয়া পড়িল।

উচ্চ একটি শিলাখণ্ডের উপর দাঁড়াইয়া কানন-গিরি মুখর করিয়া অতি গম্ভীর-স্বরে শিল্পী ডাকিল, "চিত্রা—চিত্রা—চিত্রা।"

গ্রাম নিরত গিরিশ্রেণী গম্ভীর ভাবে উত্তর দিল—'চিত্রা—চিত্রা—চিত্রা।'

তারপর হাস্য-মুখরা নদীর জলে হীরকের টুকরা ছিটাইয়া শব্দ হইল—ঝপ্। প্রত্যুত্তর হইল—ঝপ্।

তারপর সব নীরব, নিথর, নিঝুম।

দ্বাদশ গোপাল

(শ্রীবিজয়রত্ন মজুমদার)

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

পাকল এক মুহূর্ত বিমানের মুখের পানে স্থির দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল, তারপর বলিল—আর বিয়ে কর নি ?

বিমান নতমুখে বলিল—না।

পাকল সরিয়া আসিয়া বিমানের একটা হাত নিজের হাতের মধ্যে তুলিয়া লইল, স্নিগ্ধ কণ্ঠে বলিল—দশ বছর আগে বলছ, তখন তোমার বয়েস আর কত ?

বিমান উত্তর দিল না।

পাকল উত্তরের অপেক্ষায় কিছুক্ষণ নীরব রহিল, আবার বলিল—ছেলে-মেয়ে আছে ?

না।

ওঃ.....

বাধা দিয়া বিমান বলিল—ও-সব কথা থাক্। এই সামান্য কথা কয়টির মধ্যেই বিমানের কণ্ঠস্বর যেন কি এক রকম হইয়া গেল, পাকল তাহা বুঝিল—বুঝিয়াই বলিল—থাক।

কি কথা ?

বলুন, রাগ করবেন না ?

বলছি ত—বলুন।

বিমান বলিল—আপনারা ত এত সৌখীন লোক, এমন সুন্দর ভাবে থাকেন.....

পাকল ঈষৎ হাসিয়া বলিল—থামলেন কেন ?

ভয় হচ্ছে বলতে ?

পাকল কৃত্রিম কোপের সহিত বলিল, তবে তাই হোক্ আপনার। বলে আর কাজ নেই।

না, না, বলছি। আচ্ছা, আপনি ত এমন কিটু কাট্ থাকেন, এমন সুন্দর বাড়ী-ঘর আপনার, সেদিন বেলায় আপনাকে অমন ভাবে দেখলুম কেন ?

কেমন ভাবে ?

তাহার এই গম্ভীর স্বরে বিমান কেমন যেন একটু লজ্জা পাইল, বলিল—আগেই ত বলেছিলুম, আপনি রাগ করবেন।

আমি রাগ করি নি মশাই। আপনি বলুন ? কেমন ভাবে দেখেছিলেন ?

একলা। আর সেই লক্ষ লোকের মাঝখানে...বিমান আবার থামিল। এবার যেন তাহার স্পষ্ট নিশ্বাস হইল, এই প্রশ্ন করিবার অধিকার তাহার নাই।

পাকল কিন্তু যতখানি শুনিতে পাইয়াছিল, বাকীটুকু নিজের মনেই কল্পনা করিয়া লইয়া বলিল—লক্ষ লোকের মাঝখানে যে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছিলেন, সে দোষ আমার না, আপনাদের ? আর একলা, আমার—যার সঙ্গে আমি গেছলুম, বলি নি ভিড়ের মাঝে সে হারিয়ে গেছল—বলি নি ?

বলেছিলেন।

তবে ?

বিমান বলিল—সেই জন্যেই আরো আশ্চর্য্য হয়ে গেলুম যে আপনি এমন লোকের সঙ্গে গেলেন যে সে লোক ভিড়ের মধ্যে একেবারে হারিয়ে গেল। শুধু তাই-ই নয়, এমনই তার ছঁস যে সে ফিরে আপনাকে ফেলে একেবারে হাওড়ায় এসে.....

সে আবার কখন হাওড়ায় এল ! ওঃ—সে নয় ?

বিমান মুহূর্ত নীরব থাকিয়া বলিল—সে নয় ?

না।

বিমান নীরব।

পাকল তাহার মুখের পানে চাহিয়া মৃদু মৃদু হাসিতেছিল, বিমান পূর্বে দেখে নাই, হঠাৎ কি একটা প্রশ্ন করিতে গিয়া মুখ তুলিবামাত্র পাকলের হাসি-ভরা মুখটি তাহার চোখে পড়িয়া গেল। যে কথা বলিবার জন্য সে হাঁ করিয়াছিল, না বলিয়া মুখ নত করিয়া লইল।

পাকল মধুস্বরে জিজ্ঞাসিল—কি বলছিলে ?

বিমান বলিল—না।

পাকল আবার বিমানের একটা হাত ধরিল ; তীক্ষ্ণ কটাক্ষে তাহার মুখ নিরীক্ষণ করিয়া বলিল—না কেন, কি বলতে যাচ্ছিলে যে ?

বিমান তথাপি বলিল—না।

পারুল হাতটা ছাড়িয়া দিয়া হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল; হাসিয়া বলিল—আচ্ছা, তোমাকে আর এত কষ্ট করে বল্‌তে হ'বে না, আমিই বল্‌ছি শোন।.....হাওড়া ষ্টেশনে তুমি যাকে দেখেছিলে, সেই আমার বাবু। গোকুল সেনের নাম শুনেছ? বোড়াসাঁকোর নাবাল সেনের নাতি, শোন-নি? ঐ সেই গোকুল সেন—উনিই আমাকে রেখেছেন। আর যার সঙ্গে বাদল গোপাল দেখ্‌তে গেছলুম—সে কে জান?

বিমান 'না' বলিতে গিয়া আবার যেন চাহিয়াছে, আবার পারুলের হাস্যরঞ্জিত উজ্জ্বল মুখ তাহার চোখে পড়িয়া গেল; একাক্ষরের একটা কথাও সে আর উচ্চারণ করিতে পারিল না।

পারুল বলিল—ভালোবাসার লোক!—লজ্জায়।

ভালোবাসার লোক?

হাঁ, ভালোবাসার লোক।

খুব ভালোই বেসেছিল বটে! সেদিনের কথা মনে আছে কি?

পারুল দু'হাত তুলিয়া বিমানের গ্রীবা স্পর্শ করিয়া বলিল—তা আর নেই!

বিমান অত্যন্ত সঙ্কুচিত হইয়া সরিয়া গেল, পারুল যেন তাহা লক্ষ্যই করে নাই, বলিল—সে-দিনের কথা মনে না থাক্‌লে যে তোমাকেও ভুলতে হয়! সে-কি পারি?

কথাগুলির মধ্যে স্বরের এমনই একটা তীক্ষ্ণতা ছিল যে বিমান অত্যন্ত অস্বস্তি বোধ করিতেছিল, কিন্তু কি-যে বলিবে বা কি-যে করিবে তাহাও ছিল তাহার অজ্ঞাত।

পারুল বলিল নেশা যদি করেছে, হতভাগার আর জ্ঞান-গম্যি নেই! আমাকে বল্লে, একটু দাঁড়াও, একটা গাড়ী ডাকি—সেই যে যাওয়া, একেবারেই যাওয়া—আর দেখা নেই।

অত্যন্ত কৌতূহলের বশেই বিমান জিজ্ঞাসিল—আর খোঁজ নি?

কিসবে না কেন? কিসল বড়া একেবারে ওঁর পয়মন্তি। বল্লে পুলিসে নিয়ে গেছল। আর একবার অমনি চন্দননগরে ডুব্‌ দিয়েছিল।

বিমান বুঝিল না যে কিরূপ সম্বন্ধটা ঠিক তাহার সহিত, যে মুখে ভালোবাসার লোকও বলিতেছে, আবার গালি-গালাজ করিতেও সে মুখে ইহার কিছুমাত্র বাধিতেছে না—কিন্তু সে আর একটা কথাও বলিবার দুষ্টা রাখে না এবং লজ্জা কথা বলিতে কি তাহার মনের মধ্যে কেমন একটা অশ্রদ্ধার ভাব জমিয়া উঠিয়াছিল।

পারুল বাঙ্গালী রকমের একখানা আর্শীর সামনে দাঁড়াইয়া বার-কতক এদিক ওদিক করিয়া চেহারাটি দেখিয়া লইয়া বলিতে লাগিল—মুখপোড়াকে খুব ঘেঁসছি। সেদিন যে বিপদে পড়েছিলাম, ভাগ্যিস্ তুমি ছিলে, নইলে অনেকেই দুঃখ তোগের সীমা থাকৃত না। বল্‌তে হতচ্ছাড়া কি বল্লে জান?

বিমান সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে চাহিল।

পারুল আর একবার আর্শীতে মুখখানি দেখিয়া লইয়া বলিল—বললে তোমার মত সুন্দরী মেয়ে মানুষকে সঙ্গে করে আন্‌তে পারা ভাগ্যের কথা। বলিয়া পারুল হাসিয়া একবার এক কটাক্ষে বিমানকে দেখিয়া লইয়া আর্শীর দিকে মুখ করিয়া দাঁড়াইল।

বিমানের কাণ দুইটা জ্বালা করিয়া উঠিল। যে কথা কয়টা বলিয়া হাসিয়া আত্ম-গর্ব্বে পারুল আর্শীতে সেই গর্ব্ব-দীপ্ত চেহারা পরীক্ষা করিতেছিল, সেদিকে চাহিতে বিমানের আপাদ মস্তক ঘৃণায় ভরিয়া গেল। কয়েক মুহূর্ত্ত তাহার মুখ দিয়া বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না। তাহার পর ধীরে ধীরে বলিল—একা, অসহায়া রমণী বলেই এগিয়ে গেছলুম, অন্য ভাগ্যের—বলিতে বলিতে সে দাঁড়াইয়া উঠিল।

পারুল বলিল—সে কি আর আমি জানি নে। ওকি, উঠ্‌লে যে।

যা, আমি চল্লুম।

রাগ করলে? মাতালের কথায় রাগ হয়?

রাগ নয়—ঘৃণা হ'য়ে গেছে—বলিয়া সে দ্বারের বাহিরে আসিতেই পারুল পিছু পিছু আসিয়া ডাকিল—একটু দাঁড়াও।

বিমানের পদশব্দ সিঁড়িতে থামিয়া গেল, পারুল বারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইয়া বলিল—দাঁড়াও, আলো জেলে দিই। সিঁড়িটা বড় অন্ধকার।

বিমান বলিল— আলোর দরকার নেই।

নাঃ দরকার নেই। পড়ে যাও—আর কি।

(ক্রমশঃ)

মসি যুদ্ধ।

সম্পাদকে সম্পাদকে মসি যুদ্ধ, কথা কাটা-কাটি জগতের অনেক দেশেই হইয়া থাকে। সম্পাদকে সম্পাদকে মান-হানির মামলাও অনেক দেশেই চলিয়া থাকে। টাইমস্‌এ মর্ণিংপোষ্টের কথা কাটাকাটি হয়, মসি যুদ্ধ হয়। বিলাতের সংবাদ পত্রে সম্রাট্ লর্ড নর্থক্লিফের নামেও অপর সংবাদ পত্র মানহানির নালিশ রুজু করে, আবার লর্ড নর্থক্লিফ অসুস্থ বলিয়া সে নালিস উঠাইয়া লয়। আমাদের দেশে ইংলিশম্যান ও ষ্টেটস্‌ম্যান পত্রের মধ্যেও মাঝে মাঝে মসি যুদ্ধ হয়, বেজায় কথা কাটাকাটি হয়। অমৃতবাজার ও বেঙ্গলীর মসি যুদ্ধ প্রসিদ্ধ ছিল, সম্প্রতি অমৃতবাজার ও সার্ভেন্টের মধ্যে মসি যুদ্ধও উপেক্ষার বস্তু নহে। তাহাদের কথা কাটাকাটি মাঝে মাঝে মাত্রা ছাড়াইয়া পাঠকদিগের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। সম্প্রতি তার সুরেন্দ্রনাথ অমৃতবাজার পত্রিকার নামে মানহানির দায়ে নালিস রুজু করিয়াছেন। তার সুরেন্দ্রনাথের নালিসকে আমরা বেঙ্গলীর নালিস বলিয়াই ধরিয়া লই—কারণ তার সুরেন্দ্রনাথ এখনও বেঙ্গলীর সহিত তেমন ভাবে সংশ্লিষ্ট আছেন কিনা তাহা না জানিলেও আমরা বেঙ্গলী ছাড়া সুরেন্দ্রনাথকে এখনও স্বতন্ত্র ভাবে ভাবিতে অভ্যস্ত হই নাই। তারপর বাংলা সংবাদপত্রগুলির মধ্যে মসিযুদ্ধ ও কথাকাটাকাটি প্রায়ই দেখা যায়। এগুলি সময় সময় উপভোগের বস্তু হইলেও প্রায়ই ইহা বাংলা সংবাদ পত্রের মসি ব্যবহারের অযোগ্যতার এমন কলঙ্কের ছাপ লইয়া বাজারে বাহির হয় যাহা দেখিয়া লোককে বাধ্য হইয়াই বলিতে হয় Indecent: রস ও রসিকতা ছড়ান বা উত্তোর পাওয়া এ ততক্ষণই ভাল যতক্ষণ তাহা অশ্লীলতার সীমা অতিক্রম করিয়া ইতরতার সীমায় গিয়া না পৌঁছে।

• • • •

সম্প্রতি হিন্দুস্থান সম্পাদক শ্রীযুক্ত ললিতমোহন গুপ্ত ব্যক্তিগত হিসাবে বাংলার শিক্ষা সচিব শ্রীযুক্ত প্রভাসচন্দ্র মিত্রের একটী সমর্দ্ধনার আয়োজন করেন। ললিতবাবুর সেই সমর্দ্ধনার কথা শুনিয়া 'নায়ক' সম্পাদক বলিতেছেন 'যাহারা সোডায় ছিল বুটিশভক্ত বিকায় না বলিয়া হইল গান্ধীভক্ত, শেষে সিদিসালের আলে পড়িয়া তোষা করিয়া যাহারা কতকটা বাড়ুয্য হইয়াছে, সেই ভূতের মুখে প্রভাসচন্দ্র রায় নাম ছুটাইয়াছেন। আশীর্ব্বাদ করি প্রভাসচন্দ্রের বহুমানের পরমায়ু হউক—তিনি অমর হউন।' পাঠক-পাঠিকা নায়ক সম্পাদকের রসিকতা লক্ষ্য করিবেন। ভূত ও হনুমান শব্দের প্রয়োগের কৌশল দেখিবেন।

• • • •

তারপর হিন্দুস্থান সম্পাদকের নিমন্ত্রণ পত্রে ছিল 'বিনয় সম্ভাষণ পূর্ব্বক নিবেদন' আর ছিল 'আমাদের আনন্দ বর্দ্ধিত হইবে'। ভাষাবিদ্ নায়ক সম্পাদক হিন্দুস্থান সম্পাদকের পত্রের ভাষা ও প্রয়োগের ভুল দেখাইয়া বলিতেছেন ভাষাটাও ছাই ঘোরস্ত নহে! 'বিনয় সম্ভাষণ পূর্ব্বক নিবেদন' এ যে কেমন অবস্থা তাহা ও ভাবিয়া পাই না। 'বিনয়' ও 'সম্ভাষণ' এই দুইটা শব্দের অর্থবোধ লেখকের নাই। তাহার পর নীচের নিমন্ত্রণকারী এক-জন—শ্রীযুক্ত ললিতমোহন গুপ্ত। অথচ লেখা আছে 'আমাদের আনন্দ বর্দ্ধিত হইবে। আমাদের পদটা কি Editorial we? তাহা হইলে ও নামের নীচে 'হিন্দুস্থান সম্পাদক' এইটুকু লিখিত হইত। 'আনন্দ বর্দ্ধিত' কেমন প্রয়োগ? কাহার দ্বারা এ বর্দ্ধন সাধন হইবে।

এক সম্পাদক অপর সম্পাদককে, পণ্ডিতের আসনে উপবিষ্ট হইয়া ভাষার ভুল দেখাইয়া ধমকাইয়া তারপর ক্ষমতা দিলেন 'যাউক, ভাষা লইয়া আর নাড়া চাড়া করিব না। ভাষা ভাসিয়া গিয়াছে।' ব্যস্ আর কোন কথা নাই। ভাষা ভাসিয়া গেল কোথায়? স্কুলের ছেলেরা যে নায়ক সম্পাদকের ভাষার জ্ঞান হইতে প্রশ্ন পত্রের ভুল সংশোধন করিতে পারিত। কিন্তু সম্পাদক মহাশয় তাহার সে ভাষা-জ্ঞানের পরিচয় আর দিলেন না!

নায়ক সম্পাদক বসুমতী সম্পাদককে বলিতেছেন 'দাদা তার সুরেন্দ্রনাথ বসুমতীর বর্ম্মনষ্ট করিয়াছেন। বসুমতীর যুগ্মস্বত্ব সম্পাদক হেমেন্দ্রপ্রসাদ বারাকপুরে যাতায়াত করিতেন এবং তার সুরেন্দ্রনাথকে 'অন্নদা ভবানী' বলিয়া স্তব করিয়াছেন, সুরেন্দ্রনাথের গাটছড়ায় বসুমতী বাঁধা—. এইবার হিন্দুস্থানের প্রভাত মিলন ঘটিল।.....

• • • •

নায়ক সম্পাদকের উত্তরে হিন্দুস্থান সম্পাদক বলিতেছেন 'নায়ক তাহার বাংলা বিদ্যার পরিচয় দিয়াছেন—

'বিনয় সম্ভাষণ পূর্ব্বক নিবেদন'—এটি বাংলা ভাষা নয়; বেজায় ভুল। কিন্তু এ ভাষা রবীন্দ্রনাথের, রবীন্দ্রনাথ পত্রে এ ভাষা ব্যবহার করেন। রবীন্দ্রনাথ যাহা লিখেন, তাহা যদি বাংলা ভাষা না হয়, তাহা হইলে সূর্য্যের তাপ অতঃপর বাংলা ভাষা হইবে—এমন সম্ভাবনা আছে না কি?'

•

'তুমিও খবরের কাগজের সম্পাদক, আমিও খবরের কাগজের সম্পাদক। তুমি রক্ষণশীল আমি উন্নতিশীল। কিন্তু তাই বলিয়া তোমাতে আমাতে যে শিষ্টাচার সৌজন্য চলিবে না, সামাজিকতা লৌকিকতা চলিবে না ইহা কখনও মনে করিতে পারি না। খবরের কাগজের সম্পাদক হইতে গেলে একটা হীন হইতে হয়, তাহা কখনও কল্পনাও করি নাই।' বাংলা সংবাদ পত্রের সেবাব্রত গ্রহণ করিয়া অনেক অ-কল্পনাকেও সত্য জীবনে প্রত্যক্ষ দেখিতে হয়—হিন্দুস্থান সম্পাদক কি এতদিনও তাহা অনুভব করিতে পারেন নাই?

• •

হিন্দুস্থানের মাথার উপর রাজদ্রোহের মামলা ঝুলিতেছে, নায়কে অভিযুক্ত প্রবন্ধটির সদ্ব্যাখ্যা করিয়া গবর্ণমেণ্টের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার চেষ্টা হইয়াছে,—সেই সময়েও হিন্দুস্থানের সম্পাদক নায়ক সম্পাদক পাঁচকড়িবাবুকে আতিথেয়তা দেখাইয়াছিলেন। দেখাইয়াছিলেন নায়কের সম্পাদক বলিয়া নয়, বিপক্ষতাবলম্বী বলিয়াও নয়—পরিচিত বন্ধু ও ভদ্রলোক বলিয়া। কাগজে মতবিরোধের জন্য দেখায় লড়াই হইলে পরস্পরের মধ্যে সামাজিকতা লোপ পাইবে না কি?' আমরা ব্যক্তিগত বিদ্বেষকেই সর্ব্বকার্য্যে সর্ব্বপ্রথম ও সর্ব্বপ্রধান স্থান বরাবর দিয়া আসিতেছি, আমাদের জাতীয় অধঃপতনের ইহাও একটি বড় কারণ। এরূপ নীচতা দেশবাসীর মধ্যে তখনই খুব বেশী পরিমাণে আসে যখন দেশ অধঃপতনের চরম সীমায় আসিয়া দাঁড়ায়। দেশের অপর কেহ এ দোষে কলঙ্কিত হওয়ার চেয়ে দেশের লোক-শিক্ষার পুরোহিত, দেশের জনসাধারণের শিক্ষা-দীক্ষা চরিত্র গঠনের অগ্রদূত সংবাদ পত্রগুলিও যদি এই-ভাবে দেশের কলঙ্ক ও বিদ্বেষের পসরা মাথায় বহিয়া সহস্র সহস্র দেশবাসীর হস্তে প্রতি সন্ধ্যায় কলঙ্ক বিষ উপহার করিয়া দেয় তবে তার চেয়ে দুর্ভাগ্য আর নাই।

বুঝি লড়াই বাধে গো!

লাউসেন।

শ্রীনিবারণ মিত্র।

চতুর্থ অধ্যায়।

ঢেকুর অভিযান—রাজসৈন্যের পরাজয়।

গন্ধাধর ভট্ট, যথাসময়ে গৌড়েশ্বর সমীপে উপস্থিত হইয়া, উষ্ণীষ উন্মোচন পূর্ব্বক দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া একান্তে দণ্ডায়মান হইল। রাজা, গন্ধাধরের বহু ক্ষত-চিহ্ন-সাহিত মুণ্ডিত মস্তক এবং অশ্রুভারাক্রান্ত নয়নযুগল ও বিষণ্ণ বদন লক্ষ্য করিয়া সাশ্চর্য্যে জিজ্ঞাসা করিলেন—"কি ভট্ট, সংবাদ কি? তোমায় যে একক দেখিতেছি—সোম ঘোষ কৈ? আমার ত্রিবর্ত্তীগড়ের কর কৈ?' তুমিই বা এরূপ বিষণ্ণ কেন?—তোমার মস্তকে এত ক্ষত চিহ্নের কারণ কি?' গন্ধাধর ভট্ট, রাজার কোনও প্রশ্নের উত্তর প্রদান করিতে না পারিয়া, উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিয়া উঠিল।

ক্রন্দনের বেগ সংযত করিয়া গন্ধাধর ভট্ট করযোড়ে বলিল—"মহারাজ, সোমঘোষ আপনার অনুগত বটে এবং কর দিতেও অসম্মত নহে। কিন্তু মহারাজ, কি দুরন্ত তাহার পুত্র ইছাই! তাহার কথা মনে হইলে, মহা-রাজার সম্মুখে নির্ভিয়ে দাঁড়াইয়াও যেন হৃৎকম্প উপস্থিত হইতেছে! তাহার আকৃতি ইন্দ্রতুল্য—সে ভাষাকপা মার প্রসাদ লাভ করিয়া ত্রিবর্ত্তীগড়ের একচ্ছত্র অধিপতি হইয়াছে। সোমঘোষ তাহার অজ্ঞাতে গোপনে আপনার কর দিতে সম্মত ছিল। কিন্তু ইছাই, হটাৎ শীকার যাত্রা হইতে প্রত্যাগমন করিয়া আমার নাম শুনিবামাত্র, একবারে জ্বলিয়া উঠিল। সে ত্রিবর্ত্তীগড়ের স্বাধীন রাজা—সে আমার কর দিবে কাহাকে? কাহার এত দুরাকাঙ্ক্ষা যে তাহার নিকট কর চাহিবে?—এইরূপ আস্ফালন করিয়া, সে সর্ব্বজন সমক্ষে, মহারাজার দূত বলিয়া আমার যে অপমান ও লাঞ্ছনা করিয়াছে, তাহা বর্ণন করা অসম্ভব। কিল, চড়, লাথি, জুতা—আমার সর্ব্বাঙ্গে অজস্র বর্ষণ করিয়াও ক্ষান্ত হয় নাই—মুঠা মুঠা কাঁচা চুল উপাড়িয়াও তাহার ক্রোধ নিবৃত্ত হয় নাই! মাথা মুড়াইয়া নখনের দ্বারা চিরিয়া, নখনের জল দিয়াছে—আমার ছিটকট করিতেছি, সর্ব্বাঙ্গে তপ্ত রক্তের ধারা বহিতেছে—তথাপি নিবৃত্তি নাই—আরও কিল, আরও চড়, আরও লাথি! মহারাজ, প্রাণ যায় আর কি! এমন সময় তাহার পিতা সোমঘোষ আসিয়া তাহাকে বুঝাইয়া বলিল যে তাহার গুরুবন্ধুকে পুরস্কৃত করা উচিত, অপমান লাঞ্ছনা করা ত দূরের কথা! সোমঘোষ, এই ভাবে বুঝাইলে সে নিরস্ত হইল—আমিও তাহার কবল হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া উর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়া আসিতেছি! মহারাজ, আমি গরীব—আমাদের শরীরে সকলি সয়। কিন্তু আমি রাজদূত—এ অপমান, এ লাঞ্ছনা আমার নয়। মহারাজ এখন যাহা হয়, উচিত ব্যবস্থা করুন'।

গন্ধাধর ভট্টের কথা শুনিয়া, রাজার বিস্ময়-বিস্ফারিত চক্ষু, ক্রোধে রক্তবর্ণ হইল।—তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ কম্পিত হইয়া উঠিল—ক্রোধ, লজ্জা, অপমান, ঘৃণা—তাঁহার জ্ঞানবুদ্ধিকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল—অগ্নিশিখার প্রবল তরঙ্গ যেন তাঁহার সর্ব্বশরীরে ছুটাছুটি করিতে লাগিল—তিনি একবারে অভিভূত হইয়া নির্ব্বাক্ ও নিস্তব্ধ রহিলেন।

এইভাবে কিছুক্ষণ অতিবাহিত হইলে রাজা গৌড়েশ্বর, অঙ্গুলে ঘন ঘন অঙ্গুলি সঞ্চালন করিতে করিতে গর্জ্জিয়া উঠিলেন—'সোম গোয়ালার পুত্রের এত অহঙ্কার, এত আস্পর্দ্ধা! অকৃতজ্ঞ পশু, আমার অন্নে প্রতিপালিত হইয়া, আমারই প্রতি বিদ্রূপ প্রকাশ! দুগ্ধ দিয়া বিষধরকে পুষ্ট করিয়াছি—কিন্তু তাহার স্বভাব যাইবে কোথা? লগুড়াঘাতে এখনই তাহার মস্তক চূর্ণ করা আবশ্যক'। এই বলিয়া তিনি ইছাইএর বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিবার জন্য, যমের অবতার স্বরূপ, বাছা বাছা নবলক্ষ সেনা সুসজ্জিত করিতে আদেশ প্রদান করিলেন।

রাজাদেশ প্রাপ্ত হইবামাত্র, নিস্তব্ধ সেনানিবাস মুখরিত এবং অলস সৈন্যদল কর্ম্ম-চঞ্চল হইয়া উঠিল। দূর-দূরান্তে অবস্থিত সৈন্যদল, রাজাদেশ প্রাপ্ত হইবামাত্র, রাজধানী অভিমুখে ছুটিয়া আসিল। রাবেয়ারী, বার-ভূঞা, মীরমিঞা প্রভৃতি সামন্তবর্গ, রাজসেনার সহিত মিলিত হইল। তিনলক্ষ তুরঙ্গী ঘোড়া উনলক্ষ পারসীক জুঙ্গাক হাতী, বিবিধ বর্ণের আরবী টাঙ্গন ও টাটুঘোড়া, উট প্রভৃতি রণসজ্জায় সুসজ্জিত হইল। ধানুকী, বন্দুকী ঢালী, পাইক পদাতিক প্রভৃতি বিবিধ সৈন্য যুদ্ধযাত্রার জন্য প্রস্তুত হইল। গৌড়েশ্বর, এই বিপুল চতুরঙ্গ সেনাদল লইয়া রণবাদ্যে ধরণী তোলপাড় করিতে করিতে ত্রিবর্ত্তীগড় অভিমুখে যুদ্ধযাত্রা করিলেন। অগ্রে অগ্রে দশ হাজার লোক, সৈন্য আগমনের জন্য পথঘাট পরিষ্কার ও উঁচুনীচু পথ সমান করিয়া চলিল। রাজা স্বয়ং, বার-ভূঞাগণ কর্ত্তৃক পরিবেষ্টিত হইয়া, এক অতিকায় গজপৃষ্ঠে গমন করিতেছেন। অপর এক হণ্ডী, তাঁহার অগ্রে অগ্রে রাজার নিশান ও নাগরা লইয়া, ধীরপদে অগ্রসর হইতেছে। কত চৌহান্ রাজপুত সৈন্য কত ধানুকী, কত

বন্দুকী, বিজয় গৌরবে আজ আকাশায় উদ্দীপ্ত হইয়া, আস্ফালন করিতে করিতে ছুটিয়া চলিতেছে। বন্দুকের শব্দ, অশ্বের হ্রেষা, হস্তীর বৃংহণ ও পদাতিকের জয়-ধ্বনীতে মেদিনী কম্পমানা হইয়া উঠিল। সাহুচর নবলক্ষ সেনার পদধূলিতে, দিবাভাগেই আকাশ আচ্ছন্ন ও অন্ধকারময় হইয়া উঠিল।

ক্রমে ক্রমে গৌড়গড়, ভগবতী নদী ও বহুদেশ অতিক্রম করিয়া, গৌড়েশ্বরের নবলক্ষ সৈন্যদল, অজয় নদের তীরে আসিয়া উপস্থিত হইল। অজয় নদের অপর পারে ত্রিখণ্ডীগড়। অজয় নদে তখন জল কম দেখিয়া গৌড়েশ্বর, আর তথায় অপেক্ষা না করিয়া, একেবারে বিপুল সেনাদল সহ নদীগর্ভে অবতরণ করিলেন। কিন্তু দৈববলে, নিমেষ মধ্যে অজয় নদ কানায় কানায় ভরিয়া উঠিল—প্রচণ্ড স্রোতে সৈন্য, কত হাতীঘোড়া ভাসিয়া গেল—কত পদাতিক, কত বাহুকী জলমগ্ন হইয়া প্রাণত্যাগ করিল! রাজা, রবে ঠেকিয়া, তাড়াতাড়ি অবশিষ্ট সৈন্য সহ, প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া তীরে শিবির সংস্থাপন করিলেন।

এদিকে ইছাই ঘোষালা, গৌড়েশ্বরের ত্রিখণ্ডীগড় আক্রমণ করিতে আসিবার সংবাদ পাইবা মাত্র, নিভৃতে শ্যামারূপা মা'র শরণাগত হইয়া, বিবিধ স্তবস্তুতি দ্বারা তাঁহার সন্তোষ বিধান করিল। শ্যামারূপা মহামায়া, তাহাকে অভয় দান করিয়া বলিলেন—'কাহাকেও তোমার ভয় করিবার আবশ্যক নাই—এ তুচ্ছ ব্যাপারে কেন তুমি স্বয়ং যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইবার কল্পনা করিতেছ? ধর্ম্ম অধিনের নাথ—তার ভক্ত কঙ্কণ-নন্দন যখন জন্মগ্রহণ করিবে, তখন তোমার দৈব ঘটনাবশে, তাহার সহিত যুদ্ধ করিতে হইবে। এখন তুমি, সহর-কোটাল লোহাটা-বজ্জরকে গৌড়েশ্বরের সহিত যুদ্ধ করিতে প্রেরণ কর। তবে যদি রাজা যথার্থ সমর-কুশল হন, তাহাতেও তোমার আশঙ্কা করিবার কারণ নাই। লোহাটা বজ্জর উপলক্ষ্য মাত্র রহিবে—আমার কুটিল কটাক্ষের নিকট নব লক্ষ সৈন্য কিছুই নহে'। ইছাই, শ্যামারূপার অভয়বাণী প্রাপ্ত হইয়া আশ্বস্ত হইল এবং সহর কোটাল লোহাটা বজ্জরকে রণসজ্জায় সুসজ্জিত হইয়া, বিবিধ বাদ্যভাণ্ড সহ মার্ মার্ শব্দ করিতে করিতে সন্ধ্যার সময় নদী পার হইয়া রাজ-সৈন্য আক্রমণ করিল।

খড়্গধারী যমের ন্যায় লোহাটা কোটালের সৈন্যদল, রাজ সৈন্যকে অতর্কিতে আক্রমণ করিয়া, একেবারে ছিন্ন ভিন্ন করিয়া দিল। পাত্র মহামদ, প্রাণ লইয়া যুদ্ধ ক্ষেত্র হইতে সর্ব্বাগ্রে পলায়ন করিল। লোহাটা বজ্জর, কর্ণসেনের ছয় পুত্রকে নিহত করিল। রাজসৈন্য, কোটাল সৈন্যের প্রতাপ সহ্য করিতে পারিল না—তাহারা প্রাণ লইয়া যে যেদিকে পারিল পলায়ন করিল। লোহাটা বজ্জর, বিজয়-গৌরবে, ঢেকুর ত্রিখণ্ডীগড়ে প্রত্যাবর্ত্তন করিল।

রাজা পরাজিত হইয়া ক্ষুণ্ণমনে গৌড়ে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। কর্ণসেন, ছয়পুত্র হারাইয়া, বাড়ী আসিবা-মাত্র, ছয় পুত্রবধূ চিতানলে প্রাণ বিসর্জ্জন করিল—সেন-পত্নী ও পুত্রশোকে গরল সেবন করিয়া প্রাণত্যাগ করিল। কর্ণসেন, ইতিপূর্ব্বে ঢেকুরে রাজার হাতে ছিলেন—এখন তাঁহার সংসারের সর্ব্ববিধ মায়ার বন্ধন ছিন্ন হইয়া গেল—তিনি রাজবেশ পট্টাম্বর পরিত্যাগ করিয়া কৌপীন ধারণ করিলেন—তিনি সংসারভোগে জলাঞ্জলি দিয়া সন্ন্যাসী হইলেন।

রাজা কর্ণসেনকে কত বুঝাইলেন—সংসারের সুখ দুঃখ দুই সমান—পক্ষভেদে চন্দ্রের হ্রাসবৃদ্ধির ন্যায়, সুখ দুঃখেরও হ্রাসবৃদ্ধি হয়। মানুষের অদৃষ্টে কখনও সুখ, কখনও দুঃখ—এই রূপই ঘটিয়া থাকে। কর্ণসেন, কেহবা পথের ভিখারী, কেহবা লক্ষপতি। আমার কথা শুন—তুমি দুঃখিত হইও না—আমি তোমার বিবাহ দিয়া তোমায় সংসারে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিয়া দিব।

কর্ণসেন, রাজার কথায় ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন—'আমি ভিখারী, তায় বৃদ্ধ হইয়াছি। আমায় আবার কে কন্যা দান করিবে? রাজা বলিলেন—'সে ভাবনা তোমার নাই—আমি কালই তোমার বিবাহ দিব। তোমার দশা প্রসন্ন হইলে আপনা হইতে সকল দিকেই সুবিধা হইবে। তুমি আমার পরম বন্ধু—আমার কথায় নির্ভর কর। এই কথা বলিয়া রাজা কর্ণসেনকে নানা-বিধ বসন ভূষণ ও অলঙ্কারাদি উপহার প্রদান করিলেন।

কর্ণসেন, রাজার কথায় আশ্বস্ত হইয়া, শুভদিনের আগমন প্রতীক্ষায়, তাঁহারই আশ্রয়ে মহানন্দাদরে অবস্থান করিতে লাগিলেন। (ক্রমশঃ)

আজকালকার স্ত্রীদের বেশী ঘরে' মিষ্টি খেতে দেওয়া উচিত। খরচ কিছু বাড়ে বটে, খতিয়ে দেখ্‌লে সেটা কিন্তু লাভেরই।

বিক্‌সন্‌র যদি স্ত্রীলোক সঙ্গিনী থাকে, তার চেয়ে সুখের স্থান আর নেই।

সৈনিকদলে নাম লেখানো বরং ভালো, বহু জালক-জালিকা পরিশোভিত শ্বশুরালয়ে বাস সুযুক্তি নয়। যুদ্ধে তবু লড়াই করবার একটা সুযোগ পাবারও আশা থাকে, এখানে টুঁ-ফ্যাঁ করবার যো' টি নেই।

দেশ বিদেশ

মহাত্মা গান্ধী ও অরবিন্দ :—শ্রীযুক্ত অরবিন্দ ঘোষ বাণী প্রকাশ করিয়াছেন 'তিলকের তিরোধানের পর যখন গান্ধী কার্য্য ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন তখন আমি স্পষ্ট দেখিতে পাইলাম যে তাঁহারই সময় উপস্থিত হইয়াছে—আমার নহে। গান্ধী যাহা সম্পন্ন করিতে আসিয়াছেন তিনি তাহা করিবেন। উহার প্রতিরোধ করিতে কেহই সমর্থ হইবে না তিনি যাহা বুঝিয়াছেন তাহাতে তাহার অবিচলিত বিশ্বাস বর্ত্তমান। যদি তাঁহার প্রচেষ্টা সাফল্য-মণ্ডিত নাও হয়, তথাপি তিনি দেশকে যাহা দান করিয়া যাইবেন তাহাতে জাতির ভাগ্য পরিবর্ত্তিত হইয়া যাইবে।

—•—

জাপান ও মহাত্মা :—প্রাচ্যের জাপান নাকি মহাত্মার সাহায্য উপলব্ধি করিতে পারিয়াছে। জাপানের বহু মনীষী মহাত্মার গুণগান করিতেছেন। প্রাচ্য প্রতিচ্য সকলেই যুগের শ্রেষ্ঠ মানব মহাত্মাকে বুঝিতেছে। এক ভারতীয়েরাই ভারতের এই শ্রেষ্ঠ পুরুষের মাহাত্ম্য যেন এখনও বুঝিতে পারিল না।

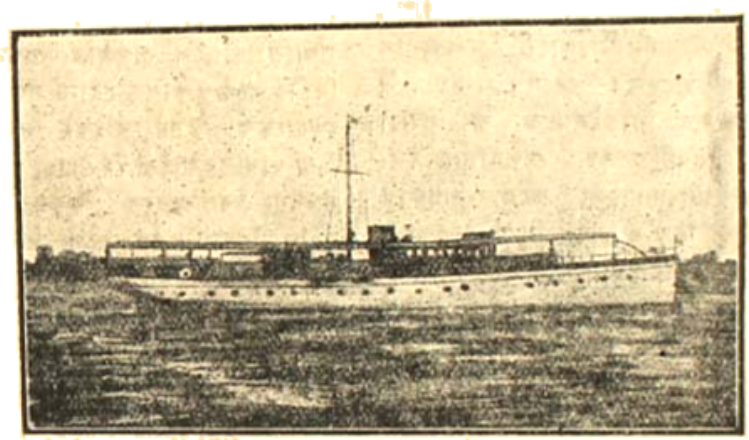

এই যে মটর ডিঙ্গিটি—এইটিতে চড়িয়া মার্কিন যুবকের মধুচন্দ্রের মিঃ ও মিসেস্ ঘাটোর পৃথিবী পরিভ্রমণ করিতেছেন। মিঃ ঘাটোর সম্প্রতি কলিকাতায় আসিয়াছেন।

—•—

স্বামী সচ্চিদানন্দ ও অন্য কয়েকটি সন্ন্যাসী কয়েকদিন হইতে এলাহাবাদে বসিয়াছিলেন। বিলাতী বস্ত্র আমদানী কারকগণ বিলাতী বস্ত্র আমদানি বন্ধ না করিলে তাঁহারা অনশনে জীবন ত্যাগ করিবেন, সঙ্কল্প করিয়াছিলেন। আপাততঃ কয়েকজন স্বদেশ-সেবকের অনুরোধে তাঁহারা খাদ্য গ্রহণ করিয়াছেন। শুনা যাইতেছে সন্ন্যাসী-গণ সহ স্বামী সচ্চিদানন্দ বড়বাজারে পিকেটিং কার্য্য আরম্ভ করিবেন। শারদীয়া আসন্ন, মা'র আগমন দিনে বিলাতী বস্ত্র না কিনিয়া সন্তানগণ যাহাতে স্বদেশী বস্ত্র ক্রয় করেন সেই উদ্দেশ্যেই এই পিকেটিং।

ইউরোপ-আকাশে আবার মেঘ সঞ্চার হইতেছে—বুঝি আবার লড়াই বাধে। তুরস্কের বিরুদ্ধে গ্রীসের চোখ-রাঙানি সুরু হইয়াছে, ত্রিশক্তি-ও যেরূপ বোলচাল সুরু করিয়াছেন, তাহাতে চারিদিকে বেশ একটা ভীতির ভাব ঘনিয়া উঠিয়াছে।

—•—

কবি সত্যেন্দ্রনাথের দান :—কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের মাতা শ্রীযুক্তা হরিমোহিনী দত্ত ও পত্নী শ্রীযুক্তা কমলকামিনী দত্ত স্বর্গীয় কবি সত্যেন্দ্রনাথের সমগ্র পুস্তকাগারটি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎকে দান করিবেন বলিয়া পরিষদের নিকট এক প্রস্তাব পত্র পাঠাইয়াছেন, দানের তালিকা পুস্তক সমেত ১টি আলমারী, পুস্তক সমেত ২টা র‍্যাক।

দেশ কবির মূল্যবান পাঠাগার উপহার লাভ করিয়া পরিষদের গৌরব বৃদ্ধি হইল।

—•—

মালব্যজীর কথা :—বহুদিন পরে বম্বাই সহরে পণ্ডিতজী একটি বক্তৃতা দিয়াছেন। বক্তৃতায় মালব্যজী সরকারী কর্ম্মচারীদের লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন :—বিবেকানুমোদিত হইলে আপনারা নিজেদের কর্ত্তব্য পালন করিবেন। আপনারা মনে রাখিবেন গবর্ণমেণ্ট প্রজাদের ভৃত্য এবং আপনারাও তাহাই। পুলিশ দিগকেও আমি এই উপদেশই দিতেছি। ধর্ম্ম ও আইনের বিরুদ্ধে কোন আদেশ হইলে তোমরা তাহা মানিও না। স্পষ্ট তোমরা সরকারকে বলিও আমরা অন্যায় আদেশ মানিব না। দেশের জন সাধারণের চাকুরী ও ভগবানের চাকুরী একই কথা। প্রকৃত দোষীকে তোমরা শাস্তি দিও। কিন্তু ধর্ম্মের আশ্রয় যে পর্য্যন্ত না তোমরা গ্রহণ করিতেছ সে পর্য্যন্ত স্বরাজ লাভের আশা বৃথা।

—•—

পুস্তক আলোচনা।

বন্দীর ডায়েরী। শ্রীহেমন্তকুমার সরকার প্রণীত। কলেজষ্ট্রীট মার্কেট ইণ্ডিয়ান বুক ক্লাব হইতে প্রকাশিত, মূল্য এক টাকা। গত ডিসেম্বর মাসে পিকেটিং করিতে গিয়া গ্রন্থকার গ্রেপ্তার হন ও ১৯২১ সালের ডিসেম্বর হইতে ১৯২২ সালের জুনমাস পর্য্যন্ত ছয় মাসের কারাদণ্ড ভোগ করেন। দেশের ও দেশবাসীর কিরূপ অবস্থা হইতে এই পিকেটিংয়ের উদ্ভব হয়, কিভাবে ক্রমে মহাত্মা প্রবর্ত্তিত অ-সহযোগ আন্দোলন সমগ্র ভারতব্যাপী হইয়া পড়ে—কিভাবে দেশবাসী দেশ চলিত আইনের প্রতি শ্রদ্ধা হারাইতে থাকে সুকৌশলে উচ্ছ্বাস বর্জ্জিত ভাষায় সত্য প্রত্যক্ষ ঘটনা কলিত করিয়া গ্রন্থকার তাহাই বন্দীর ডায়েরীতে দেশবাসীর সম্মুখে ধরিয়াছেন। দেশের বর্ত্তমান অবস্থা, দেশবাসীর মতি গতি গ্রন্থকার অমর কবি দ্বিজেন্দ্র লালের কল্পিত নন্দলালকে উপস্থিত করিয়া তাহারই অতুলনীয় বর্ণন ভঙ্গীতে দেশবাসীর মনের ও চক্ষের সম্মুখে ধরিয়াছেন। দেশের অ-সহযোগী বহু নেতার চরিত্র, দেশের রাজনৈতিক আবহাওয়া কি ভাবে কেমন করিয়া পরিবর্ত্তিত হয়, দেশবাসীর মনস্তত্ত্ব এই পরিবর্ত্তনের কতটা সহায়তা করে গ্রন্থকার বিচক্ষণতার সহিত তাহার নিখুঁত ছবিখানি দিবার চেষ্টা করিয়াছেন। 'বন্দীর ডায়েরী' গ্রন্থখানির 'ব্রিটিশ জষ্টিস' 'জেলের সাধারণ অবস্থা,' 'নন্দলালের কাহিনী' 'কংগ্রেসের সপ্তাহ' 'দেশবন্ধুর কাহিনী,' 'ফরিদপুর জেলের কাহিনী' গুলি যেমন বর্ণন ভঙ্গীতে মনোরম তেমনি দেশের নানা অবস্থার আলোচনায় সমৃদ্ধ। গ্রন্থখানি পড়িয়া আমরা সব চেয়ে মুগ্ধ হইয়াছি ইহার একটি গুণে—সে গুণটি এই—গ্রন্থকার গ্রন্থের সকল ব্যাপারই বেশ Sportsman like আলোচনা করিয়াছেন, এরূপ আলোচনা সম্বলিত পুস্তক বাংলা ভাষায় বোধ হয় অধিক নাই। স্বাধীন দেশের মুক্ত জীবগণই এমন দক্ষ খেলোয়াড়ের মত আলোচনা করিতে পারেন। অপরাপর দেশের রাজনীতি-কেরাই ও দেশ-সেবীরাই এমন ভাবে আলোচনা করিতে পারেন। আমাদের জীবন-হীন দেশে এ সমস্ত আলোচনাও তেমন জীবন-হীন মন-গড়া হয়, তাই তাহাতে দেশবাসী তেমন সাড়া দিতে পারে না। তাই খেলার অঙ্গনে নামিয়া খেলোয়াড় আই খেলা সমাপ্ত হইতে না হইতেই কোমরে বেদনা অনুভব করিয়া ব্যস্ত অনুহাত দেখাইয়া বিদায় পরিত্যক্ত আইসের বীরা গৎ আওড়াইয়া স্তোক বাক্যে দেশবাসীকে ভুলাইবার প্রয়াস পান, ও দেশবাসীর উপর ও নিজের উপর কলঙ্কের পসরা স্বচ্ছন্দে চাপাইয়া মহিলার মত পিছু হটিবার পথ পান না। আজ তাই একজন Sportsman লেখক পাইয়া আমরা যথেষ্ট আনন্দ লাভ করিয়াছি। 'বন্দীর ডায়েরী' সব দিকেই সুন্দর। ইহার বহু অধ্যায়ই উঠাইয়া দেখাইবার যোগ্য; আমরা সুবিধা মত ইহার দু'একটি বিচিত্র অধ্যায় রসজ্ঞ পাঠক পাঠিকা-দিগকে উপহার দিব।

* * * * * *

এক বেলায় সুতাকাটা ও কাপড় বোনা শেখা। ১ম খণ্ড ।০ আনা ও দ্বিতীয় খণ্ড ।৵০ আনা শ্রীবিনয় কৃষ্ণ রায় প্রণীত। চন্দন নগর, সরকার সেন পুস্তকালয় হইতে বীরেন্দ্রচন্দ্র সেন কর্ত্তৃক প্রকাশিত। ১ম খণ্ডে সুতা কাটার কল কৌশল বর্ণিত হইয়াছে। তুলার চাষ হইতে কি ভাবে সুতা পাটাইয়া তুলিতে হয় এই সমস্ত বিষয়ই পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে গ্রন্থকার প্রথম খণ্ডে বর্ণনা করিয়াছেন। দ্বিতীয় খণ্ডে কাপড় বোনা সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য বিষয় লিপিবদ্ধ হইয়াছে। উহার বহিরই ভাষা অতি সরল। আবার চিত্র দ্বারা বুঝাইয়া দেওয়ায়, যে কেহ উহা পড়িয়া অন্যের সাহায্য ব্যতিরেকে কাজ শিক্ষা করিতে পারেন। নবীন শিক্ষার্থীদের পক্ষে এই বহি নিতান্ত প্রয়োজনীয়। প্রবীনেরাও ইহাতে বিবিধ্যের অনেক বিষয় পাইবেন। আধুনিক নিরাবাস ধারণ ও পরবাস বর্জ্জনের যুগে এ গ্রন্থের আদর নিশ্চয়ই হইবে।

চিত্র পরিচয়।

প্রিয় সমাগম-উৎকণ্ঠিতা পরমা সুন্দরী যুবতী প্রবাসী প্রিয়তমের আগমন সম্ভাবনায় ঘরে আর ধৈর্য্য ধরিয়া স্থির থাকিতে না পারিয়া কুম্ভকক্ষে পুষ্করিণীতে বারি আনিবার অছিলায় যাইতেছে। সেই পথ—সেই পথেই প্রিয়তম তাহার আসিবেন। যুবতী চলিয়া যাইতে ফিরিয়া চাহে—সঙ্কোচ,—আর কেহ আসিতেছে না ত! দূর—দূর কত দূর, দৃষ্টির সীমা ছাড়িয়া দৃষ্টি তাহার চলিয়া গিয়াছে। নাই—নাই,—প্রিয়তমের তাহার সন্ধান নাই। অবশ হৃদয়ে, শূন্য দৃষ্টিতে, শূন্য কলস কক্ষে নারী পথের বাগানের প্রাচীরে নিজ দেহ ভার এলাইয়া দিয়াছে। অন্তরের নিরাশ কাতরতা তাহার চোখে মুখে ফুটিয়া উঠিয়াছে। কে যেন দূরে বহু দূরে বাঁশী বাজাইতেছে, সুরাগত বংশীধ্বনি যুবতীকে মন্ত্র-মুগ্ধ করিয়া রাখিয়াছে। সুপ্রসিদ্ধ চিত্র শিল্পী তাঁহার অতুলনীয় তুলিকায় রংয়ের ফলনে প্রিয় সমাগম-উৎকণ্ঠিতা যুবতীর এই অপূর্ব্ব চিত্রটি আঁকিয়াছেন।

কুবের পুত্রদ্বয়ের শাপ-বিমোচন।

সচিত্র সাপ্তাহিক

বাসন্তী

নব-পর্য্যায়।

প্রথম বর্ষ।] ২৭শে শ্রাবণ শনিবার, ১৩২৯ সাল ইং ১২ই আগষ্ট

শ্রাবণে—নদীবক্ষে—সন্ধ্যায়

সুস্বাগতম্

হে দেশপ্রাণ চিত্তরঞ্জন—স্বাগতম্! হে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন—সুস্বাগতম্। বহুদিনের অদর্শনের পর আবার আমরা তোমাকে আমাদের মধ্যে পাইয়াছি, হৃদয় শত বাহু তুলিয়া আনন্দধ্বনি করিতেছে—স্বাগতম্! হে বীর, হে মহাপ্রাণ! হে স্বদেশবৎসল! তোমাকে আমরা দেশের ধর্ম্মে, দেশের মর্ম্মে, জাতির কল্যাণে, জাতির জীবনে বরণ করিয়া লইতে আসিয়াছি, ভারতপূজ্য হে মনস্বি! সমগ্র ভারত তোমার আশা পথ চাহিয়া আছে—তুমি এস! তোমার আগমনে নিরীর্য্য জাতির প্রাণ বীর-গর্ব্বে ভরিয়া উঠুক্, তোমার [illegible] জাতির অন্তস্তল পুনঃ সঞ্জীবিত হোক্, তোমার [illegible] চরিয়া ভারতবাসী তাহার চলা [illegible] জাতির মঙ্গল নির্ভর করিতেছে—তোমার মঙ্গল হোক্!—বন্দেমাতরম্!

ত্যাগে, আত্মদানে ভারতের যে সমস্ত নেতৃবর্গ আজ জগত বরেণ্য হইয়াছেন যাঁহাদের মহত্ব ও নির্মল মনুষ্যত্ব স্বভাবে প্রাণহীন মনুষ্যত্বহীন ভারতেও প্রাণ শক্তি ও মনুষ্যত্ব জাগাইয়া তুলিবার একটা সাড়া পড়িয়া গিয়াছে ভারতমাতার সেই বরপুত্রগণ আজ বাংলার দ্বারে অতিথির বেশে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। হাকিম আজমল খাঁ পণ্ডিত মতিলাল, মহাত্মা প্যাটেল, রাজাগোপাল আচারিয়ার, বসিত আলি, মংস্থম মোহাম্মদ, সেরওয়ানী, জাহুর আলেম, আলফেক আলী, আমদারী, মুক্তারী মদ আলেকার, হায়াত, মেহমাত্রা, প্রভৃতি নেতৃবর্গ আজ বাঙ্গালীর প্রাণের স্পন্দন অনুভব করিতে, বাঙ্গালী স্বরাজ লাভের জন্য কতটা যোগ্যতা অর্জ্জন করিয়াছে তাহাই দেখিবার জন্য চিত্তরঞ্জন বাংলায় আসিয়াছেন। সুদূর দেশ, পারাভের দেশ, সমুদ্রের উপকূল পরিভ্রমণ করিয়া, প্রাণের সন্ধানে ফিরিয়া, আজ বড় আশা লইয়া ইহারা তাদের দেশ বাংলায় আসিয়াছেন। বাংলার ভ্রাতা ভগিনীরা এই দেশপূজ্য সর্ব্ব ত্যাগী ছাত্রব্রতী নেতৃবৃন্দকে বাংলার দিক হইতে কোন ভরসা দিতে পারেন কি?

• • • •

দেশের পক্ষ হইতে, দেশবাসীর পক্ষ হইতে আমরা এই দেবোপম মহামান্য অতিথি বৃন্দকে আগত অভ্যর্থনা করিতেছি। ইহাদিগের প্রাণের আশা যাহাতে সাফল্য মণ্ডিত হয়—ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের অধিবাসীবৃন্দ মানুষ হিসাবে, জাতি হিসাবে, দেশের সন্তান হিসাবে নিজ নিজ গৌরব মান রক্ষা করিয়া উন্নত শিরে ইহাদিগের সম্মুখে দাঁড়াইয়া যাহাতে নিজ মনুষ্যত্বের পরিচয় দিয়া নিজ মুখ ও ইহাদিগের মুখ উজ্জ্বল করিতে পারেন আমরা সেই কামনা লইয়া পরম শক্তিমান ভগবানের নিকট আমাদিগের প্রার্থনা নিবেদন করিতেছি।

• • • •

আজ বাংলার দেশের বন্ধু চিত্তরঞ্জন নাই, আজাদ, আকরম, জামসুদ্দিন নাই। দেশের প্রিয় সন্তান মানুষের মত মানুষ যাঁহারা তাঁহারা আজ কারাবন্দী। মানুষের মত অটল অটল ভাবে ইহাদিগের সাহায্য করিবে তেমন মানুষ বাংলায় নাই ভাবিয়া আমরা মরমে মরিয়া যাইতেছি।

• • • •

দেশবন্ধু সর্ব্বজন প্রিয় মনীষী চিত্তরঞ্জনের বাণী শুনিবার জন্য তাহার উপদেশ পাইবার জন্য আজ সমগ্র ভারত উন্মুখ, আগ্রহান্বিত। নিখিল ভারত রাষ্ট্র সম্মেলনে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের ইচ্ছানুসারে আগামী সম্মেলনের সভার অধিবেশনে বোধ হয় দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনই সভাপতির আসন অধিকার করিবেন। মনীষী ত্যাগী আইন পণ্ডিত মতিলাল ও অন্যান্য নেতৃবর্গও বাংলার চিত্তরঞ্জনের সাহায্য পাইবার জন্য উৎকণ্ঠিত হইয়া আছেন। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের বরপুত্রগণ বাংলায় থাকিতে থাকিতে যদি দেশবন্ধু মুক্ত হন তবে অনেক দিক হইতেই এই মহামান্য অতিথিদের আগমন সার্থক হইবে। বাংলায় আবার একটা নূতন প্রেরণা ও প্রাণের বান বহিবে সন্দেহ নাই।

• • • •

সিভিলিয়ান, ভারতীয় স্বরাজ ক্ষেত্রের কর্ম্মী শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু ছয় মাস কাল কারাগারে কারারুদ্ধ মুক্তিলাভ করিয়াছেন। তরুণ কর্ম্মী সুভাষচন্দ্রের বিচিত্র জীবনের কর্ম্ম পদ্ধতি দেখিবার জন্য অনেকেই তাঁহার দিকে চাহিয়া আছেন। বাংলাদেশে সুভাষচন্দ্রের মত প্রাণশক্তি সম্পন্ন যুবক বোধ হয় অতি অল্পই আছে—তাই তাঁহার জীবন দেখিবার মত জীবন, সন্দেহ নাই।

• • • •

বাংলাদেশে বাঙ্গালীর ছেলেও ছ'মাস কাল অনশনে থাকিতে পারে। বরিশাল জেলে স্বরাজকামী সতীন্দ্রনাথ সেন ছ'মাস এমনি অনশনে আছেন। যুবকের মনে স্বরাজের জন্য এমনি উগ্র আকাঙ্খা জাগিয়াছে যাহাতে তাহার ক্ষুধা তৃষ্ণা সব ভুলাইয়া দিয়াছে। এদেশে এখন

এমন অনেক জাতই খুঁজিলে পাওয়া যাইবে যারা কিছুদিন পূর্ব্বে দেশবাসী বলে ও কল্পনায় আনিতে পারিত না।

• • • •

ভারতবাসী দিন দিন অভাবের পেষণে যতই বেশী পিষ্ট হইতেছে তাহাদের উপর নিত্য নূতন করভারও তেমনি চাপিয়া বসিতেছে। অন্যান্য দেশের শাসন যন্ত্রের ব্যয় বাহুল্য কমাইয়া দিবার জন্য যেমন চেষ্টা ও দৃশ্য অবস্থা হইতেছে ভারতীয় শাসনযন্ত্রের ব্যয় বাহুল্য তেমনি অধিক গতিতে হু-হু করিয়া বাড়িয়া যাইতেছে। নূতন বিকেন্দ্রীকরণ আইন বা সংস্কার আইন অনুসারে ভারত শাসন যন্ত্রের ব্যয় ভার অর্দ্ধ কোটী মুদ্রা বাড়িয়া গিয়াছে। পূর্ব্বে যাহা ছিল তাহা ত আছেই এই যে অর্দ্ধকোটী মুদ্রা ব্যয় ভার বাড়িয়াছে তা অনাদায়ে ক্লিষ্ট ভারতীয়দিগের ঘাড়ে চাপিয়াছে এগুলি সবই উপরী হিসাবে। প্রাণ থাকিলেও বোঝার উপর শাকের আঁটি নয়, আর এ তো প্রাণহীন দেশ—এখানে আর বোঝার উপর শকমাদন চাপাইতে ক্ষতি কি?

• • • •

নূতন সংস্কার আইনে অন্যান্য প্রদেশের কথা ছাড়িয়া দিয়া খাস বাংলার ঘাড়ে যে ব্যয়ভার বাড়িয়াছে তাহারই তালিকা নিম্নে দেওয়া গেল—

একজন একজিকিউটিভ কাউন্সিলের মেম্বর	৫০০০৲
মন্ত্রী তিনজন	১৪২০০০৲
প্রেসিডেন্ট	৩৬০০০৲
ডেঃ প্রেসিডেন্ট	৫০০০৲
সেক্রেটারী	৩০০০০৲
ডেঃ সেক্রেটারী	২৩৪০০৲
দুইজন এ্যাঃ সেক্রেটারী	১০৪৩০৲
অঃ ডেঃ সেক্রেটারী	১০৩২০৲

এই যে অঙ্কগুলি এগুলি এই সব মহামান্য পদের অধিকারীদিগকে মাহিয়ানা হিসাবে দিতে হয়। ইহা ব্যতীত ইঁহাদিগের চলাফেরা ভ্রমণ ব্যয় বাবদও ভারত শাসন যন্ত্র বহু অর্থ ব্যয় করিয়া থাকেন। তাহার খসড়া তালিকাও নিম্নে দেওয়া গেল।

•

ভারত সরকার	
পাহাড়ে ভ্রমণ খরচ	১৫১০০০৲
মাদ্রাজ সরকার	১৫১০০০৲
বোম্বাই সরকার	৬৮৫১৲
বাংলা সরকার	১১৪০০০৲
যুক্তপ্রদেশ	২০০০০৲
পঞ্জাব	৫১,৫০০৲

ব্যয় বাহুল্যের ত্রুটি এ দেশে কোন দিকেই নাই। শুধু দেশের লোকের অন্নের অভাবে, বস্ত্রের অভাবে, ব্যাধির প্রাবল্যে, অশিক্ষার পাপে দিন দিন ধ্বংসের পথে যাইতেছে দেশের এই যা দুঃখ—এই যা অভাব!

• • • •

বিগত জার্ম্মেন মহাসমরের সময় মিত্র শক্তিবর্গ যথা ইংলণ্ড, আমেরিকা, ফ্রান্স, ইটালী, বেলজিয়ম প্রভৃতি দেশ মিতালী করিয়া একে অপরের সাহায্যের জন্য বহু মুদ্রা ধার দিয়াছিলেন। ইহার মধ্যে ধনী আমেরিকাই সব চেয়ে বড় মহাজন। আমেরিকা ইংলণ্ডকে ৮৪০০ লক্ষ পাউণ্ড ধার দিয়াছিল, আমেরিকা এখন ইংলণ্ডকে তাহার ধার শুধিতে বলিতেছে। এদিকে ইংলণ্ড আবার বেলজিয়ম, ফ্রান্স ইটালী প্রভৃতিকে ১০৯৮০ লক্ষ পাউণ্ড ধার দিয়াছিল। এই সব মিত্রশক্তিবর্গের নিকট ইংলণ্ড এখন তাহার টাকা ফিরিয়া চাহিতেছে। এত টাকা ইংলণ্ডের বাজারে পড়িয়া রহিয়াছে সে কি করিয়া আমেরিকার ধার শুধিবে। এ দিকে মিত্রশক্তি সকলেরই হাত শূন্য—পরিত্রাণের জন্য পাইশোধের একমাত্র উপায় এখন স্বর্ণের মোহর, কিন্তু সেও যোর হয় যেখানে এ অবস্থায় উপায় কি? অর্থশালী আমেরিকাই দেখিতেছি এখন ইওরোপের কল কাঠি নাড়িতেছেন।

• • • • •

আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় 'অস্পৃশ্যতা জাতিগঠনের অন্তরায়' নামক প্রবন্ধে আমাদের ফাঁকা মিথ্যা জাতীয়তা দেশের কত সর্ব্বনাশ করিয়াছে সেই সম্পর্কে বলিয়াছেন 'বৃটিশ উপনিবেশে আমরা ভারতবাসীও সেতাঙ্গদের মধ্যে সাম্যনীতির দাবী করি, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আমাদের নিজেদের ভাইদের প্রতি তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত ব্যবহার করি।...যখন আমরা আমাদের স্বজাতী ও স্বধর্ম্মী লোককে শৃগাল কুক্কুর অপেক্ষা ও অধম জ্ঞান করি তখন কোন মুখে আমরা জাতীয়তার দাবী করি, বুঝিতে পারি না। এই পাপের ফলেই কি আমরা জাতীয়তার দাবী করিবার সকল অধিকার হইতে

বঞ্চিত হই নাই।' বঞ্চিত যে দেশ সর্ব্বপ্রকারে হইয়া আছে যাহার আত্ম অক্ষমতা ও দৌর্ব্বল্য নিজের প্রাণশক্তিকে পর্য্যন্ত লোপ করিয়া দিয়াছে সে জাতি ও দেশবাসী আপনিই আপনার প্রাণশক্তি হরণ করিয়া এখন অন্যের বিকাই সুধা মিটাইতেছে; আত্মহারা পরবশ জাতির এখন ইহাই ধর্ম্ম ও আত্মকৃত্যের কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

• • • •

আচার্য্য রায় মহাশয় বলিতেছেন 'দেশের ভাবী আশা শিক্ষাভিমানী যুবকদের প্রতি যখন তাকাই তখন মন নৈরাশ্যে পূর্ণ হয়।.. চরিত্রগত দুর্ব্বলতাই 'হিন্দুসমাজের অধঃপতনের প্রধান কারণ' যে দেশের শিক্ষা পদ্ধতির সহিত কর্ম্ম জীবনের কোনরূপ যোগ সম্পর্ক নাই, যে দেশের শিক্ষা গ্লানি এবং পরবশতা হজম করিয়া লইবারই একটা উপাদান মাত্র সে দেশের শিক্ষাভিমানীদের দিকে চাহিলে মন নৈরাশ্যে পূর্ণ হইবে ইহাতে আশ্চর্য্যের কিছু নাই। শিক্ষাই যাহার ব্যবসা, শিক্ষাই যাহার জীবনের আনন্দ ও তৃপ্তি সেই আচার্য্যদেবের দেশের শিক্ষা পদ্ধতির উপর এই বীতরাগ দেখিয়া আমরা আশ্চর্য্য মোটেই হই নাই।

• • • •

জাতিগঠন সম্বন্ধে আচার্য্যদেব বলিতেছেন 'তোমরা যে আর্য্যশোণিতের গর্ব্ব কর, কতটুকু আর্য্যশোণিত তোমাদের দেহে আছে বলিতে পার? যদি এক ডজন নমঃশূদ্রের ছেলে ও এক ডজন ব্রাহ্মণ কায়স্থের ছেলে মিশাইয়া দেওয়া যায়, তবে আকার ইঙ্গিতেও অবয়ব সৌষ্ঠবে তাহাদের মধ্যে কোন পার্থক্য দেখা যায় কি? এই শত শত বৎসর ধরিয়া রক্ত মিশ্রনের ফলে, বাঙ্গালীর ধমনীতে 'বিশুদ্ধ আর্য্যরক্ত অনুবীক্ষণ দিয়াও খুঁজিয়া পাওয়া কঠিন। অতএব আর্য্য অনার্য্য এই সব বৃথা গর্ব্বমূলকতার পরিত্যাগ করিয়া উচ্চ বর্ণ নিম্ন বর্ণ সকলে মিলিয়া এক বাঙ্গালী জাতি গঠিত হোক, তবেই জাতির কল্যাণ হইবে।' আচার্য্যের ইচ্ছানুযায়ী জাতীয় কল্যাণ কামনায় দেশবাসী কবে উচ্চ নিম্ন বর্ণের গর্ব্ব বিস্মৃত হইবে জানি না। তবে ঘরে বসিয়া নিজেদের গর্ব্ব পাথা গাহিবার লোভ সম্বরণ করিয়া প্রকৃত কার্য্যক্ষেত্রে যে আমরা শীঘ্র নামিয়া নিজেদের আর্য্যত্বের পরিচয় দিতে পারিব সে সম্ভাবনা দেখিতেছি না। আর্য্যেরা নদ নদী গিরি পর্ব্বত বন বনানী অতিক্রম করিয়া নিজেদের সভ্যতা, জ্ঞান, বিজ্ঞান, বল অমরত্ব জগতে প্রচার করিয়া অমর হইয়া গিয়াছেন। সেই এক মহাগৌরবময় আর্য্য সভ্যতার ধারায় তাহারা জগতকে প্লাবিত করিয়া দিয়া আপনার মধ্যে জগত মিশাইয়া আপনার অমরত্ব পূর্ণ করিতে চাহিয়াছিলেন। আমাদের মধ্যে হয়ত বা কোটী বিন্দুর এক বিন্দু আর্য্য রক্ত থাকিতেও পারে কিন্তু আর্য্যের সে উদার ভাব—সে বল বিক্রম কিছুই যে নাই। আছে শুধু ঘরে বসিয়া সর্ব্বের কাহিনী গাহিবার প্রবৃত্তি ও শক্তি। গর্ব্ব চিরদিন আমরা করিয়াছি—এখনও কিছুদিন করিব তারপর সময় হইলে ভেকের মত পেট ফাটিয়া হয়তো বিশ্বে শেষ নিঃশ্বাস মিলাইয়া দিব। পরিণতি বোধ হয় ইহাই হইবে।

• • • •

বাংলার নবীনের দল নাকি বড়ই উদ্ধত হইয়া উঠিয়াছে। ইহারা ব্যক্তিচারী, সমাজ মানে না, অস্পৃশ্যতা মানে না—প্যাটেলের ব্যাবেক বিলে হিন্দুর জাতীয়তা নষ্ট করিতে চায়, সহবাস সম্মতি আইনের বয়স বাড়াইতে আন্দোলন করে—নবীন সমাজের এই সব অনাচার নিবারণের জন্য জনকয়েক হিন্দু সভাও সংস্কারক প্রাণ দিয়া শুদ্ধ সভায় বক্তৃতা করিতেছেন। শুদ্ধ সভায় বক্তৃতা দিতেও নাকি জন কয়েক নব্য ছোকরা ইহাদিগকে বাধা দেয়। দেশ এমন হিন্দু ধর্ম্মের ব্যাখ্যান শুনিতেও আগ্রহ প্রকাশ করে না—দেশের দুর্ভাগ্য, হিন্দু ধর্ম্মের ব্যাখ্যাতাগণের দুর্ভাগ্য। 'বেল পাতার বল খাও,' 'পরমকালে হবি জপ,' 'ছুঁয়ো না জাত যাবে' এ সব কথা দেশ তো খুব খুসীর শুনিতে শুনিতে এই মরণের অবস্থায় আসিয়াছে—নূতন কিছুবাণী হিন্দুধর্ম্মের তত্ত্ব ব্যাখ্যাতা গণের শুনাইবার ছিল কি?

• • • •

বাজারে জোর গুজব রটিয়াছিল পণ্ডিত মালব্যজীকে গ্রেপ্তার করা হইবে, সম্প্রতি এলাহাবাদের লীডার পত্র বলিতেছেন এ গুজব ভিত্তিহীন। পণ্ডিত মদন মোহন মালবা বলিতেছেন 'অ-সহযোগ আন্দোলন মরে নাই—মরিতে পারে না। যাঁহারা ইহার মৃত্যু আকাঙ্ক্ষা করিতেছেন তাহারা ভুলই করিতেছেন। ভারত জননীর মুকুট যদি যতদিন বন্দী থাকিবেন, যতদিন গবর্ণমেণ্ট অনুতপ্ত হইবেন ততদিন আমাদের উৎসাহ কমিবে না। আমার দেহে শেষ নিঃশ্বাস থাকা পর্য্যন্ত আমার উৎসাহ কমিবে না।' দেশ বিখ্যাত পণ্ডিত মালব্যজীর, বোধ হয় এ কথা বলিবার অধিকার আছে।

• • • •

বাংলার কারাগার সমূহ বাংলার শাসন পরিষদের মন্ত্রী সার আবার রহিমের হস্তগত বিভাগ ছিল। শুনিয়া ছিলাম ভার প্রাপ্ত দেশীয় মন্ত্রীর সহিত বাংলার কারা সমূহের ইন্‌স্পেক্টর জেনারেলের তেমন বনি বনাও চলিতেছে না। তাই সার আবার রহিম পদত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন। দেখা গেল যাহা রটে তাহা বটে। ভারপ্রাপ্ত দেশীয় মন্ত্রী সার আবার রহিম ও তাঁহার অধীনস্থ ইন্‌স্পেক্টর জেনারেল দুই জনেই গেলেন সিমলায়, তাহার পর কারা সমূহের ভার গ্রহণ করিলেন শাসন পরিষদের সাহেব মন্ত্রী। এই ব্যাপারটার প্রকৃত রহস্য দেশবাসী অনুমান করিয়া লইতে পারিবে বলিয়াই হয়তো কারা সমূহের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী কিম্বা বাংলা সরকার এ বিষয়ে সাধারণের অবগতির জন্য কিছু জানান কর্ত্তব্য বোধ হয় মনে করেন নাই। তাই অনুমানই দেশবাসীর সম্বল হইয়া আছে।

বঙ্গীয় কারাগার সমূহের ইন্‌স্পেক্টর জেনারেল টমসন সাহেবের সঙ্গে পরিচয় হওয়ার সৌভাগ্য ইতঃপূর্ব্বে অ-কারাবাসী দেশবাসীর ভাগ্যে ঘটে নাই। কারাবাসী যাঁহারা হইয়াছেন তাঁহাদের সঙ্গেও হইবার সুযোগ অল্প। কারণ এক এক বিভাগের হর্ত্তা কর্ত্তা বিধাতা পুরুষদের সহিত সাক্ষাৎ সকলের ভাগ্যে ঘটে না! তবে সম্প্রতি বরিশাল জেল দর্শনে যখন ইনি গমন করিয়াছিলেন তখন জনকত উকীল ইঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া কথোপকথনের সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিলেন। আমরা নিম্নে সেই কথোপকথনের কিয়দংশ উদ্ধৃত করিলাম।

উকীল :—বরিশালের রাজনৈতিক বন্দীদিগের প্রতি সাধারণ কয়েদীর মত ব্যবহার করা হইতেছে?

সাহেব :—ইংলণ্ডের জেল সম্বন্ধে আপনাদের কোন অভিজ্ঞতাই নাই। ইংলণ্ডে চিত্তরঞ্জন দাশ ও ওয়াজেদ আলি খাঁ পনির মত পদস্থ ব্যক্তি ছাড়া আর কেহই বিশেষ শ্রেণীর বন্দী নামের যোগ্য হয় না।

উকীল :—বন্দী নবেন্দ্র দাস কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের তখন এম-এ, তিনি কি বিশেষ শ্রেণীর কয়েদী নহেন?

সাহেব :—শিক্ষা সম্বন্ধীয় গুণের দ্বারা কেহ বিশেষ শ্রেণীভুক্ত হইতে পারেন না। কাহার কিরূপ সামাজিক মর্য্যাদা সুপারিনটেণ্ডেণ্ট তাহা বিবেচনা করিয়া কয়েদী শ্রেণী বিভাগ করেন।...সরকার যে ভাবেই হোক অসহযোগীদের শান্তি দিয়া পথে আনিবেন।

উকীল :—যদি অত্যাচারই অসহযোগ দমন করিবার একমাত্র পথ বলিয়া মনে করিয়া থাকেন তবে তাহাতে সুফল ফলিবে না।

সাহেব :—.....আপনি অসহযোগী বলিয়া সেইরূপ মনে করেন।

উকীল :—আমি অসহযোগী কেমন করিয়া এ কথা মনে করিলেন?—...আমি অসহযোগী নই। আপনাদিগের কাছে কেহ দুরবস্থার কথা জানাইতে আসিলেই আপনারা তাহাকে অসহযোগী বলেন। এরূপ মন লইয়া আপনারা যখন কার্য্য করিতে আসেন, তখন আপনাদের নিকট সাধারণের কোন দুরবস্থা জ্ঞাপন করা বৃথা।—

বাঙ্গলার কারাগার সমূহের ইনেস্পেক্টর জেনারেল বাহাদুর বরিশালের দর্শনপ্রার্থী উকীল দিগকে আরও বলিয়াছেন 'তোমাদের চিত্তরঞ্জন দাসও জেলের বাহিরে আসিয়া পুনরায় ব্যবসায় লিপ্ত হইলেন কারণ অ-সহযোগ কি-সহযোগ কিছু নয় তিনি উহা বুঝিতে পারিয়াছেন।' কারাগার সমূহের ইনস্পেক্টর জেনারেল বাহাদুরের সঙ্গে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের এ সম্বন্ধে বোধ হয় গভীর আলোচনা হইয়াছিল।

• • • •

কর্ম্মক্ষেত্রে কথোপকথনে বাংলার জেল বিভাগের সর্ব্বময় কর্ণধারী টমসন সাহেবের আমরা এই পরিচয় পাইলাম। এমন তেজী স্পষ্টবাদী লোক কি দেশীয় লোকের অধীনে কর্ম্ম করিয়া তৃপ্ত হইতে—পারেন? তা সে সাহেব-ই হউন, আর দেশীই হউন!

• • • •

বিলাতের প্রধান মন্ত্রী লয়েড জর্জ্জ সম্প্রতি একটী জোর বক্তৃতায় ভারতশাসন তত্ত্বের ব্যাখ্যা করিয়াছেন। এই ধরণের বক্তৃতা আমরা বিলাতের মর্নিং পোষ্টের মারফতেও কিছুদিন পূর্ব্বে পাইয়াছিলাম। 'বৃটিশ সাম্রাজ্য ভারতকে রক্ষা করিবার পবিত্র দায়িত্ব চিরকাল অব্যাহত রাখিবে।' এ দায়িত্বের অব্যাহত রাখিতে গেলে সিভিলিয়ানের নেতৃত্ব অক্ষুণ্ণ অটুট রাখিতে হইবে। মণ্টেগু মাকাল মার্কি এই অব্যাহত ক্ষমতায় একটু প্রখরতা আনিয়া দিতে পারে তাই পূর্ব্বাহ্নেই ভারতীয়দের তাহাদের প্রকৃত অবস্থা জ্ঞাপন করা হইয়াছে। আমরা ত দেখিতেছি সবই অব্যাহত অক্ষুণ্ণ অটুট আছে—তবে আর ভারতের কথা লইয়া বিলাতের প্রধান প্রধান রাজনীতিকদের এ চাঞ্চল্য কেন? সাম্রাজ্যিক সুখ শান্তির বড় বড় কথা—প্রধান মন্ত্রীর ১৯১৭ খৃষ্টাব্দের ঘোষণা এগুলি সব এ বক্তৃতায় বাতিল হইয়া গেল। সামন্তক দেখি জগতে কেউ রাখে না।

• • • •

দেশ সেবী সাময়িক সুবিধা বাদী অ-সহযোগী অন্নাকর, সত্যমূর্ত্তি, ঘতীন্দ্রমোহন প্রভৃতি পরিত্যক্ত আইন ব্যবসায়ে পুনরায় যোগদান করায় অপর একদল সুবিধাবাদী সহযোগী নিজেদের সাময়িক সুবিধার দিকে লক্ষ্য রাখিয়া দেশ ও দলের পক্ষে অমঙ্গল জনক নিরাশযোগ প্রচারিত করিতেছেন। এই সুবিধাবাদী নিরাশ গায়ক লেখক ও বক্তাদিগকে লক্ষ্য করিয়া সহযোগী আনন্দবাজার বলিতেছেন '..... জাতি যখন জাগে, তখন কি দু'চার জনের ভুল-ভ্রান্তি দুর্ব্বলতায় আবার ঢলে পড়ে? অমন যে মুকুটহীন রাজা, জাতীয়তা কংগ্রেসের স্রষ্টা, বয়কটমন্ত্রের প্রচারক, স্বাধীনতার শাসন পদ্ধতির তীব্র প্রতিবাদের মুখরতা—তিনি যখন চোগা চাপকান পরে লাট স্মৃতির কণ্ঠ প্রতিষ্ঠা করে, বিদেশী বর্জ্জনের নিন্দা গেয়ে চৌষট্টি হাজারের মন্ত্রী হলেন, তখনও কি জাতি প্রাণহীন হয়েছিল? বিপিনচন্দ্র বক্তৃতায় বিলেত কাঁপিয়ে বোম্বাইতে এসে যখন বলেন 'অলমাইটির' হাতের দান হলেও তিনি পূর্ণ স্বাধীনতা ফেলে কলোনিয়াল স্বরাজই 'ক্লেম' করেন তখনি কি দেশ মজেছিল? আর এই সেদিনও নায়কের পাঁচকড়িবাবু বীর্জ্জাপুর পার্কে অসহযোগের মহিমা কীর্ত্তন করায় পরই যে গা ঢাকা দিলেন তাতেই কি দেশ অতল জলে ডুবে গিয়েছিল?.....কিন্তু এদের কথায়, এদের কাজে দেশের কিছু এসে যায় না। এরকম অনেক বুদ্‌বুদ্ রামধনুর রং নিয়ে উঠবে আবার কাটবেও। কিন্তু দেশের সত্যি কার মানুষ যে জেগেছে, সে খবরটা যারা রাখে না তারাই গোলামীর দীর্ঘ জীবন লাভের দুরাশায় মত্ত হয়ে মিথ্যে লোকের পতন দেখে উল্লাসে আকুল হচ্ছে।'

নারী বিদ্রোহ

(শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী)

বিদ্রোহ—এমন শুনিলে আমরা ভীত হই, শিহরিয়া উঠি। সমাজ জীবনে বা জাতীয় জীবনে কেহই বিদ্রোহের আকাঙ্ক্ষা করেন না। সমাজ জীবন, ক্রম জীবন ও জাতীয় জীবন ক্রমাগত একই ভাবে এক পথে চলিতে চলিতে গতানুগতিক হইয়া দাঁড়ায়। জীবন প্রবাহ নিত্য পরিবর্ত্তনশীল, সে চাহে জীবনের ক্রম বিকাশ, ক্রম উন্নতি। একই ভাবে এক পথে চলিয়া বহুদিন সে তৃপ্ত থাকিতে পারে না। অথচ অভ্যাস এমন একটা অদ্ভুত জিনিষ যাহা প্রাণবান জীবের মধ্যে একবার নিজ আধিপত্য বিস্তার করিয়া লইতে পারিলে আর তাহা হইতে সহজে নিষ্কৃতি পাইবার উপায় থাকে না। তাই অভ্যাস বশে মানুষের জীবনের গতানুগতিকতা যখন অতি মলিন ও পঙ্কিল হইয়া দাঁড়ায় তখন চিরাচরিত সেই অভ্যাসের মোহ—পাশ কাটাইবার জন্যই মানুষ একবার সবলে সেই অভ্যাস-বন্ধন ছিন্ন করিয়া লইতে চাহে, সহজ কথায় তাহারই নাম বিপ্লব, তাহারই নাম বিদ্রোহ।

আজ বাংলার জন-জীবন ও সমাজ-জীবনের সর্ব্বস্তরে এমনি বিদ্রোহ ও বিপ্লবের সূচনা দেখা দিয়াছে। আজ বাংলার কেহই আর তাহার গতানুগতিক চলিত জীবন লইয়া সুখী নহে, তৃপ্ত নহে। অভ্যাসের মোহে তাহারা আজ জীবনের যে স্থানে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে উহা ধ্বংসেরই সীমারেখা। এই ধ্বংসের সীমারেখায় আসিয়া দাঁড়াইয়া জন ও সমাজ যদি এখনও তাহাদের অবস্থা বুঝিয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিতে না পারে, তবে ইহাদিগের ধ্বংস অবশ্যম্ভাবী।

পরাধীন জাতির জীবনে নানা দিক হইতে হীনতা ও নীচতা এমন ভাবে ঘিরিয়া ফেলে যে তাহাতে তাহাদের মনুষ্যত্ব মোটেই বিকশিত হওয়ার সুযোগ লাভ করিতে পারে না। চারিদিকের নানা ঘটনায় তাহার পূর্ব্বের মনুষ্যত্ব যাহা থাকে তাহাও ক্রমে লুপ্ত হইয়া আইসে। এ অবস্থায় জাতি, হীনতায় এমনি নিম্ন সীমায় আসিয়া উপস্থিত হয়, যখন ক্ষমতাশালী অপর কাহারও বিরুদ্ধে তাহার দাঁড়াইবার ক্ষমতা না থাকায়, নিজেদের মধ্যেই যাহারা দুর্ব্বল তাহাদের উপরেই অত্যাচারের লেলুপ জিহ্বা বিস্তার করিয়া দিয়া নিজ নীচতা ও দুর্ব্বলতার পরিচয় শতভাবে দিতে উদ্‌গ্রীব হইয়া উঠে।

ভারত,—বিশেষ করিয়া বাংলা আজ এই অবস্থায়ই আসিয়া উপনীত হইয়াছে। নতুবা বাংলার পুরুষগণ আজ এমন করিয়া তাহাদের মাতা, ভগিনী ও পত্নীর উপর অত্যাচার ও নির্য্যাতন করিতে সঙ্কোচ বোধ করিত। বাংলার ঘরে ঘরে আজ নারীর মরম হইতে যে দীর্ঘনিশ্বাস উত্থিত সমস্ত বাংলাকে পুড়াইয়া মারিতেছে, হীন-চিত্ত বাঙ্গালীর আজ সে দিকে দৃষ্টি দিবার অবকাশ নাই। পুরুষের যোগ্য অপর কোন কার্য্য করিবার ক্ষমতা বা সুযোগ বাংলার পুরুষগণ হারাইয়া ফেলিয়াছে বলিয়াই দুর্ব্বল নারীর উপর পীড়ন করিয়াই তাহারা পুরুষত্বের পরিচয় দিয়া থাকে।

বাংলার নারীরা জানে, সহিবার ও ভুলিবার জন্যই তাহাদের নারী জন্ম। মাতৃ ক্রোড় হইতে ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর হইতেই তাহাদের জীবনের দুর্ভাগ্যের আরম্ভ—এ দুর্ভাগ্য দুঃখ নির্য্যাতনের শেষ হয় একেবারে মরণের কোলে গিয়া। গরু, ঘোড়া, গহনা, আসবাব পত্রেরও বাংলার সংসারে যে মূল্য, নারীর মূল্য বাংলার সংসারে তাহা অপেক্ষা বিন্দুমাত্রও অধিক নহে। তবে মূল্য হিসাবেও এগুলির মধ্যেও বাংলার নারীদের মধ্যে একটা বিশেষ পার্থক্য রহিয়া গিয়াছে। গরু, ঘোড়া বা আসবাব পত্র যাহাই হউক না কেন এগুলিকে আমাদের মূল্য দিয়া কিনিতে হয়। এগুলির কোন লোকসান হইলে বা খোয়া গেলে পুনরায় অর্থের বিনিময়ে ইহাদিগকে সংগ্রহ করিতে হয়, কিন্তু বাংলার নারী এমন মূল্য হীন জিনিষ যে ইহারা মূল্য দিয়াও বাংলার হতভাগ্য পুরুষত্বহীন পুরুষের সংগ্রহ হইতে চাহে। এই সংগ্রহ হওয়াই যেন বাংলার নারীদিগের নারীত্ব, বাংলার নারীদিগের ধর্ম্ম।

বাংলার নারী সমাজকে এই হীন সামাজিক সংগ্রহের দুরবস্থায় ফেলিবার পাপেই আজ বাংলায় লক্ষ লক্ষ পুরুষত্বহীন পুরুষের আবির্ভাব হইতেছে। তাই বাংলার মানুষের মত মানুষ এত বিরল, এবং পুরুষ নামের কলঙ্ক যাহারা, তাহারাই সমাজে গৌরব স্ফীত-বক্ষে পদচারণ করিতেছে।

বাংলার পুরুষ ও নারীর সম্বন্ধ আজ এত হীন, ঘৃণিত, লজ্জাজনক হইয়া উঠিয়াছে যাহা দেখিলে সমাজ ও জাতির

দুর্দশার কথা স্মরণ করিয়া আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিতে হয়, —জাতির ভবিষ্যৎ ভাবিয়া আশাহীন হইতে হয়। বাংলার নারীদিগের বিবাহের পরবর্ত্তী জীবনে তাহাদিগের প্রতি পুরুষেরা যেরূপ ব্যবহার করিয়া আসিতেছে তাহা সমাজের পক্ষে জাতির পক্ষে এত লজ্জাকর হইয়া দাঁড়াইয়াছে যে বাঙ্গালী যদি মানুষ হইত তবে এ লজ্জিত মুখ সে আর সূর্য্যালোকে দেখাইতে সাহসী হইত না।

জীবনের সকল পথে আজ আমরা আত্মবোধ সঞ্চার করিয়া লইতে চাহিতেছি। আত্মবোধ সজাগ হইলে জন ও সমাজের আত্ম-সম্ভ্রম জাগিয়া উঠে। এই আত্মবোধ-জ্ঞানি আত্মসম্ভ্রম জাগরিত হইলে তখন কেহ আর কাহারও উপর সহজে অত্যাচার করিতে সাহসী হয় না। তাই ভারতের শ্রেষ্ঠ পুরুষ মহাত্মা গান্ধী জন ও সমাজের আত্ম-বোধ প্রবুদ্ধ করিতে বলিয়াছেন। আত্মবোধ যাহার নাই, সে মনুষ্যাকৃতি হইলেও বিশিষ্ট জীব বিশেষ,—মানুষ নহে।

আজ আত্মবোধ সাধনার এই যুগে যদি বাংলার মহিলা সমাজের আত্মবোধ সত্যই জাগিয়া উঠে, তবে বাংলার মহিলা সমাজের উপর বাংলার পুরুষহীন পুরুষেরা যে হৃদয়হীন অত্যাচার করিয়াছে তাহার প্রতিবিধান করিবার জন্য বাংলার মহিলাগণ কোন পন্থা অবলম্বন করিতে পারেন?

আত্মবোধ সম্পন্ন নারীরা যদি এইসব পুরুষদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন তবে বাংলার পুরুষ সমাজ সেই বিদ্রোহকে নিন্দনীয় মনে করিতে পারিবে কি! এই তথাকথিত পুরুষদিগের সেই বিদ্রোহের প্রতিরোধ করিবার ক্ষমতা আছে কি! নারীদিগকে এই অবস্থায় দাঁড়াইয়া প্রতিপদে তাহাদিগকে হীন অপমানিত করিবার জন্য বাংলার পুরুষগণই যে একমাত্র দায়ী তাহাতে সন্দেহ নাই। এই পাপের জন্য এই নারী-নিগ্রহের জন্যই জীবনে আমরা এত দুর্ভোগ সহিতেছি—এমন ভাবে জমিয়া পুড়িয়া মরিতেছি।

বাংলার নারী-সমাজকে আজ নিজেদের এ হীন অবস্থার প্রতিকার সাধনের ভার নিজ হস্তে গ্রহণ করিতে হইবে। সহস্র সহস্র নির্য্যাতিতা নারীর লাঞ্ছনা ও অপমানের কথা বাংলার হৃদয়হীন পুরুষ সমাজের কর্ণে না পশিতে পারে, কিন্তু মহিলার এ ক্রন্দনে মহিলার হৃদয় বিচলিত হওয়া অবশ্যই প্রয়োজন। নারীরা মানুষ নহে—কাঠের পুতুল, প্রাণ থাকিতেও তাহারা প্রাণহীন জীবের মত ব্যবহার পায়, বাংলার নারীদিগের এ অবস্থা হইতে মুক্তি পাইতে হইবে।

মাতৃজাতির এ সম্ভ্রম জ্ঞান না জন্মিলে দেশের হীনমতি সন্তানগণের পরিত্রাণের আর উপায় নাই। জীবনের পরতে পরতে আজ নারীদিগকে প্রাণের স্পন্দন অনুভব করিতে হইবে, পুরুষের হৃদয়হীন বর্ব্বরতার বিরুদ্ধে সগর্ব্বে মাথা উঁচু করিয়া দাঁড়াইতে হইবে। শক্তিময়ীর শক্তিদর্পে পুরুষত্বহীন পুরুষের অক্ষম আক্রমণকে প্রতিহত,—চূর্ণ করিয়া দিতে হইবে, শক্তিময়ী নারীকে আর লজ্জা ও মোহের আবরণ দূরে ঠেলিয়া নারী নামের মহিমা গৌরব রক্ষা করিতে হইবে। শক্তির তেজ বিদ্রোহ আখ্যা পায় ভাল—এ বিদ্রোহের প্রয়োজন আজ দেশে হইয়াছে। কুণ্ঠিত লজ্জায় দেশের মনুষ্যত্ব আজ মরিতে বসিয়াছে—এ মোহ নারীকেই বিদূরিত করিতে হইবে।

চুম্বনের প্রতিদান আর কিছু না—চুম্বন!

প্রেমে পড়া ভারি সহজ, পড়ে থাকা ভারি শক্ত! পারা যায় না বলেই হয়!

শত্রুকে চিরদিন মনে থাকে! বন্ধুকে ভুল হওয়া স্বাভাবিক।

ছয় বছরের ছেলে—থিয়েটার দেখ্‌ছে। হঠাৎ মাঝখানে ছেলে মা'কে জিজ্ঞাসা করলে—মা! মা! ও-লোকটা ঐ মেয়েটিকে ছড়ি দিয়ে অত মারছে কেন?

মা। না, না, মারে নি।

ছেলে। ও মারবে বলে ভয় দেখাচ্ছে, তাইতেই কাঁদছে বুঝি! অত বড় মেয়ে—কি বোকা! কি বোকা! এই ত বাবা কেবলই ভয় দেখায়—আমি কাঁদি বুঝি?

অন্যান্য স্ত্রীলোক। থাম, ছেলে থাম।

ছোট কথা

(শ্রীশৈলবালা ঘোষজায়া)

সময় ফাঁক পেলেই ফাঁকি দিয়ে চলে যায়। যাঁরা সময়ের সদ্ব্যবহার শেখেন নি, সময় তাঁদের বিশেষ কিছু উপকার করতে পারে না। তেল, বাতি, দেশলাই হাতের কাছে মজুত থাকলে, আঁধার ঘোচে না। হাত বাড়িয়ে আলোটা জ্বালা চাই,—তবে অন্ধকার দূর হয়!

• • • •

মরতে ভয় না পাওয়া এক কথা, আর হিংস্র পশুর আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষা ও আর্ত্তরক্ষায় উদাসীন থাকা আর এক কথা!

• • • •

তুমি যা নও, তাই বলে কেউ যদি তোমার নিন্দা করে, ক্ষুব্ধ হোয়ো না। নিষ্কম্পভাবে নিজের মধ্যে লক্ষ্য ঠিক রেখে,—কাজ করে চল। মিথ্যাবাদী তার নিজের ভুল একদিন বুঝবেই,—যদি তার বুদ্ধিটা একান্ত পশুপক্ষী না হয়!

• • • •

বাচালতা আর রসিকতা এক জিনিস নয়। রসিকতা অবসর মুহূর্ত্তকে আনন্দিত করে,—বাচালতা আনে শুধু ক্লান্তি আর গ্লানি। কারণ তার মধ্যে দেখবার জিনিস কিছুই নাই—নীচতা ছাড়া।

• • • •

অশ্লীলতা আর ইতরামো হাস্যরসের প্রাণ নয়। ও দুটো বস্তুর সাহায্যে পরকে হাসাবার চেষ্টা করলে, শুধু নিজের নীচতাই প্রকাশ হয়। আর বিচার শক্তি-হীন নির্ব্বোধের ছুটিকে বিকৃত করে,—মনুষ্য সমাজের প্রতি অত্যাচার করাও হয়।

গায়কে পিটিয়ে ঘোড়ার মত চৌড় করানো যেতে পারে, কিন্তু তার গায়ক একেবারে ঘোচানো যায় না।

• • •

পরশ্রীকাতর হয়ে বিদ্বেষভরে পরকে দাঁত খিঁচালেই নিজের মুখের শোভা বাড়ে না।—

মন বুদ্ধির পবিত্রতা রক্ষায় তত্ত্ব সর্ব্বদা সতর্ক হয়ে থাকলে,—মন বুদ্ধি আপনা থেকেই পবিত্র ভাবাপন্ন হতে অভ্যাস করে।

• •

প্রভুত্ব ও দাসত্বের মধ্যে যতটা ব্যবধান,—নিজেকে ভালবাসা আর নিজের মন্দ অভ্যাসকে ভালবাসার মধ্যে ব্যবধান—ঠিক ততটা!

• •

বুদ্ধিমান মানুষ আর কারুর কাছে হার মানতে বাধ্য না হলেও,—মূর্খতার কাছে হার মানতে সর্ব্বদাই বাধ্য হয়। সে মূর্খতা নিজের মনের-ই হোক্ চাই পরের বুদ্ধির-ই হোক্!

• •

সমস্ত দিনের মধ্যে একটা নির্দ্দিষ্ট সময় রাখা দরকার—আত্ম পরীক্ষার জন্য।

ছুটি।

স্কুলের বেঞ্চে কাঁটা থাকে, ছেলেরা বসতে বড় ভালো বাসে না। হয়-না-হয় তোমার ছেলেদের জিজ্ঞাসা করো।

যেদিন বিয়ে করবে সেই দিনই একটা এমেচার থিয়েটারের আখড়া (Club) ঠিক করে রেখো, নইলে প্রাণটি বেরিয়ে যাবে।

মুক্তি

(শ্রীকালিদাস রায় বি এ)

(১)

ওপিঠের সমাধির করে বন্ধনে
ছিন্নেক গুপ্তক তার সব হতে বেশী।
অন্তে করে সমাধির মুখের বচনে
মর্ম্মে মর্ম্মে উপলব্ধি করে যেবা যেমী।

(২)

আপনারে পাইবারা মনে করে যারা
সব হতে তারা থাকে মোহান্ধ অজ্ঞান।
বিশ্বাস নিষ্ঠার বিনা ভাবে সদা তারা
একান্ত অশান্ত বেন বাক্যের সন্ধান।

(৩)

আগে পাপ তার পরে প্রায়শ্চিত্ত আসে,
তোমো একদিন, এই রীতি চিরন্তন।
ছিন্নো পাপে প্রায়শ্চিত্ত চলে পাশে পাশে
পাপ আর প্রায়শ্চিত্ত অভিন্ন একদ।

(৪)

অমর্য্যাদা গতি দিতা হতেছ হতাশে
সমাজে সমাজে ফেরে আমার এযাবে
তব অহিংসা এতে পায় পরাভব
প্রত্যাশো করবে বহু আর-অভিযাবে।

যে জ্ঞান তোমার রহে সে জ্ঞান অসার
যে জ্ঞান ও পিয়ে পরে নিলামের ভার,
আত্মাহুতে যাহি হয় যেই জ্ঞান ধারা
সে তো পড়িল হস্ত ওচীমীর পারা।

হা হতোস্মি। এত কাল পরে বল্লি কি-না Experiment! হায় Reform!

প্রত্যাবর্ত্তন।

গল্প।

(শ্রীমতী খুরসিদ জাঁহা বেগম।)

সুস্নিগ্ধ শরতের পরিপূর্ণ জ্যোৎস্নায় আগ্রার জগৎ-বিখ্যাত তাজের দৃশ্য কত মনোহর তাহা যিনি দেখেছেন ভোগ করেছেন তিনিই বুঝবেন। শ্বেত প্রস্তরের প্রকাণ্ড অট্টালিকার চরণ ধৌত করিয়া যমুনা আপন-মনে কুলু কুলু রবে বেয়ে চলেছে। শরতের চাঁদকে বুকে পেয়ে যমুনা আনন্দে উদ্বেলিতা, ঠিক যেন মিলনোন্মুখী-বিরহিণী সুন্দরী। দেউড়ীর নিকট থেকে তাজের সিঁড়ী পর্য্যন্ত বড় বড় গাছগুলি দু'ধারে অতীতের মত সুখ দুঃখের স্মৃতি বুকে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তারি মধ্যে দিয়ে নহর। তাহাতে চাঁদের আলো পড়ে মাছ-গুলি আনন্দে খেলা করছে। বাহিরে চন্দন গাছের মিষ্টি সৌরভ টুকু নিয়ে পবন খেলা করছে। এমনি মধুর রজনীতে দু'টী যুবক যুবতী একখানি শ্বেত পাথরের চৌকীতে বসে প্রেমিক শ্রেষ্ঠ সম্রাট সাজাহানের অপূর্ব্ব প্রেমের ও স্বামী সোহাগে সোহাগিনী জগতে অতুলনীয়া আত্মহারা মমতাজের জীবন কথা নিয়ে আলোচনা করছে। সংসারে প্রত্যেক রমণীই তাদের সৌভাগ্য কামনা করে। আমাদের রেণু বালাও কায়মনে তাই কামনা করছে। গল্প করতে করতে হঠাৎ রেণু যুবকের মুখের দিকে চেয়ে বল্‌লে, "আজ আমাকে বল্‌তেই হবে তোমার জীবন কাহিনী; কেন তুমি এমন ক'রে লুকোও? আজ ৫।৬ বৎসর তোমাকে আমরা পেয়েছি কিন্তু এক দিনের তরেও তোমার জীবন বৃত্তান্ত জানলুম না!

রেণু, তুমি রাগ কর না, সত্যি বল্‌ছি একদিন বল্‌ব পরে। রেণু।' "না পরে কেন? আজই বল, আমার কাছে তোমার সঙ্কোচ কেন? আমি ত তোমার স্ত্রী।"

যুবক। "না সঙ্কোচ নয়, তবে বল্‌তে বল্‌তে অনেক দুঃখের কথা বল্‌তে হবে তাই তোমার কাছে সুখের সময়টুকু দুঃখের কথায় নষ্ট করতে চাইনে।"

রেণু। "আমি তা শুন্‌বো না, আমি তোমার অর্দ্ধাঙ্গিনী—সুখ দুঃখের সমান ভাগিণী।"

যুবকের নাম সুনীল চন্দ্র বে,- ইনি আগ্রার অ্যাটর্ণী ভুবন বাবুর জামাতা, ভুবনবাবু বাঙ্গালী হলেও বহুকাল যাবত দেশত্যাগী। জামাতাটীও ভাগ্য বশে দেশছাড়া মিলিয়াছে। ভুবনবাবু মেয়েকে সব রকমে সুশিক্ষা দিয়েছেন। যেমন লেখা পড়া সেলাই ইত্যাদী শিখায়েছেন, তেমনি গৃহকর্ম্মও সুচারু রূপে শিক্ষা দিয়াছেন। রেণু যেমন রূপসী তেমনি ও গুণবতী। সুনীল এরূপ স্ত্রী পেয়ে ধন্য হয়েছে সন্দেহ নাই।

শরৎকাল, দিনের বেলায় অসহ্য গরম। তবে রাত্রে তাদের উঠানে বেড়াতে আস্‌লে বেশ একটু মিষ্টি মিষ্টি হাওয়া পাওয়া যায়। ইহারা প্রায়ই জ্যোৎস্না রাত্রে এই মনমুগ্ধকর স্থানে স্নিগ্ধ মধুর ঠাণ্ডাটুকুর লোভে বেড়াতে আসেন। সুনীল রেণুর কথার কোন উত্তর না দিয়ে তার শুভ্র কপোলের উপর বিস্তস্ত ছোট ছোট চুলগুলি নাড়তে নাড়তে হাসি মুখে বল্‌ল 'সত্যি বলত রেণু, এখানে কেমন ঠাণ্ডা, আর বাড়ীতে এ সময় কি ভীষণ গরম? সঙ্গে সঙ্গে তুমিও আমার উপর যেমন গরম হ'য়ে ওঠো, ঠিক না?"

রেণু। 'যাও আমি তোমার কোন কথাই আর শুন্‌বো না। তুমি আমাকে রাগিয়ে কথা ভুলাতে চাও, আমি তা আজ ভুলছি না।"

সুনীল প্রিয়তমার সঙ্গে এঁটে উঠ্‌তে না পেরে অবশেষে বল্‌ল "আচ্ছা আজ ঠিক্ বলছি কিন্তু এখানেই শুন্‌বে না—বাড়ী গিয়ে শুন্‌বে?"

"এখানেই শুন্‌ব।"

"যো হুকুম মহারাণীর" এই বলে সুনীল বল্‌তে লাগ্‌ল। রেণু ধীরে ধীরে সুনীলের কোলের উপর মাথা রেখে তার মুখে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে চুপটী ক'রে শুন্‌তে লাগ্‌ল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

আমার বাবারা দুই ভাই, তার মধ্যে বাবাই বড়। তাদের পৈত্রিক সম্পত্তি ও কিছু ছিল। বাবা তাঁর ছোট ভাইকে খুব স্নেহ করতেন। এবং অনেক দেখে শুনে প্রায়েরই একটী সুরূপা ধনী কন্যার সঙ্গে কাকার বিয়ে দেন্। বিয়ের বৎসর দুই পরেই কালের নিষ্ঠুর গ্রাস বাবাকে অন্যের মত আমাদের কাছ থেকে কেড়ে নিল। আমি তখন ১০ বৎসরের, ছোট ভাই মোহিত সাত বৎসরের। কাজেই বুঝ্‌তে পার যে আমরা উভয়েই অল্পবুদ্ধি বালক। মাতাঠাকুরাণী আমাদের দু ভাইকে নিয়ে কাকার উপরে নির্ভর করে পড়ে! কাকার সঙ্গে সংসারের কোন সম্বন্ধ ছিল না। কাকীই সংসারের হর্ত্তা কর্ত্তা। বাবার মৃত্যুর কিছুদিন পর্য্যন্ত কেন জানি না আমাদের সঙ্গে কেমন সদয় ব্যবহারই

করলেন। কিন্তু আমাদের নিতান্ত দুর্ভাগ্য যে ধীরে ধীরে আমরা বিশেষতঃ আমি তাঁর বিষনয়নে পড়লুম।

কাকার ছেলেরা ও আমি একসঙ্গেই স্কুলে যেতুম। আমি ক্লাসে ভালো ছেলে বলে মাষ্টারেরা সকলে একটু বেশী স্নেহ করতেন। সুধীররা সর্ব্বদাই এসে কাকীমার কাছে বলত সুনীলদা' আমাদের রোজ মা'র খাওয়ায়, আমরা এত ভাল করে পড়ি তবুও মাষ্টার মশাই শুধু শুধু মারে, আর ও ভাই দেখে দেখে হাসে।" কাকীমা ত শুনে রেগে আগুন। আমাকে ত দূরে থাক মা'কে পর্য্যন্ত যা তা শুনিয়ে দিতেন। আর ছেলেদের শিখিয়ে দিতেন তোরাও ওকে খুব করে মারিস, এত বড় আস্পর্দ্ধা আমার অন্ন ধ্বংস করে আমারই ছেলেদের মার খাওয়ায়।"

সুধীর ছোড়াই বেশী হিংসুটে ও দুর্দ্দান্ত, তার ওপর কাকীমার আদরে আদরে তার মাথা আরও বিগড়ে গিয়েছিল। সে সময় পেলেই আমাদের বিষম প্রহার করত। মিছামিছি ঝগড়া বাধিয়ে মায়ের প্রাণটা বে'র করত। আমি মায়ের প্রাণে দুঃখ হবে বলে কখনও তাকে কিছু বলতুম না। যদি মোহিত কখনও বলত, মা শুধু দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে সস্নেহে আমাদের বুকে টেনে নিয়ে বলতেন "ভাই একটু মেরেছেই বা তা'তে কি রাগ করতে আছে?" যদিও আমি বেশ বুঝতুম যে আমাদের এই অন্যায় লাঞ্ছনায় তাঁর ভারা বুক আরও ভেঙ্গে যে'ত।

একদিনের ঘটনা মনে হলে আজও আমার বুক ফেটে যায়, আমরা দু'ভাই একদিন স্কুলে ইন্‌স্পেক্টর আসবেন ব'লে তাড়াতাড়ি না খেয়েই স্কুলে যাই। সুধীররা কিন্তু খেয়েই গেল। ফিরে আসতে আমাদের সকলের বেলা ৪টা বাজে। মোহিত বেচারা খিদের ছট্‌ফট্ করে প্রায় কাঁদ কাঁদ হ'য়ে গেল। কাকীমা তাঁর ছেলেদের তাড়াতাড়ি মুখ হাত ধোওয়াইয়ে ভাত খেতে দিলেন। আমরা পেটের খিদায় অস্থির হ'য়ে বেড়াচ্ছি দেখে স্নেহময়ী মা আমাদের স্নেহবাৎসল্যে অধীর হ'য়ে শুধু একবার মিনতিপূর্ণ বচনে কাকীকে বললেন "বৌ, ছেলে দু'টী না খে'য়ে গিয়েছিল এত বেলা হ'য়েছে ওদের যদি দু'টী খেতে দেও!" বাস্, আর যাবে কোথায় রণচণ্ডীর মূর্ত্তি ধরে কাকীমা চীৎকার করে উঠ্‌লেন, "ও আমার ছেলেরা খে'য়ে গিয়েছিল ব'লে সকলের বুক চড়্‌চড়িয়ে গেছে, সকলে সেই হিংসেয় মরে। আমিও আর কারও রোজগার খেতে দিই না। আমার ছেলেরা'ত কারও বুকের উপর বসে খায় না। যারা পরের অনুগ্রহে জীবননির্ব্বাহ করে তাদের আবার এত রাগ কেন?" তাঁর মুখের সাম্‌নে দাঁড়ায় কে? মা আর কিছু না ব'লে আমাদের দু'ভাইকে চাট্টি চিঁড়া গুড় ও জল খাও বলে—নিঃশব্দে কাঁদতে লাগ্‌লেন।

ভূতীয় পরিচ্ছেদ

সত্যি রেণু সেদিন আমার বড়ই দুঃখ হয়েছিল, আমি মা'কে জিজ্ঞাসা করলাম "মা, আমার বাবার কি কিছুই নাই? যদি কিছু না থাকে তাহ'লে চ'ল, পরের দো'রে ভিক্ষা ক'রে খাব, তবুও আর যন্ত্রণা সহ্য হয় না।" আমার ধৈর্য্যশীলা জননী আমাকে শান্ত করবার মানসে বললেন "ছিঃ বাবা অমন কথা কি বলতে হয়, তোমার বাবার যা আছে তা'তে কি আর আমাদের খাওয়া পরা চলে? তোমার কাকীমার কথায় কিছু মনে ক'র না, গুরুজন তিনি, একটু বকলেনই বা: তাতে দুঃখ করতে নেই।" আমি কিন্তু ঠিক জানতুম, রেণু, যে আমার বাবার যা সম্পত্তি ছিল তা'ও আমাদের তিনজনের ভরণ পোষণের জন্য যথেষ্ট। তবুও মা যে শুধু ধৈর্য্যবশেই এটা বললেন তা খুব বুঝলুম, না বুঝেই বা করি কি?

এম্‌নি ক'রে আরও দু' বৎসর কেটে গেল। কাকীর যন্ত্রণা অত্যাচার দিন দিন বেড়ে চলতে লাগ্‌ল। কাকা সম্পত্তি সংক্রান্ত কাজকর্ম্ম নিয়েই ব্যস্ত থাকতেন। কখনও কখনও গোলমাল শুনলে বা কাকীমা নালিশ করলে একটু আধটু ধমক দিয়ে চুপ্ করে থাকতেন।

আমাদের দেশে নিয়ম, বাড়ীর গিন্নীরাই রান্নার কাজ করেন, রাঁধুনীর বড় প্রচলন মধ্যবিত্ত ঘরে নেই। আগে আগে মা একদিন, কাকীমা একদিন রাঁধতেন। ক্রমে ক্রমে কাকীমার মাথা ঘোরে শরীরে সয় না বলে মা একাই সে কাজের ভার তুলে নিলেন। রেণু অনেকক্ষণ নিজের দুঃখ কাহিনী বললুম, তোমার শুনতে বিরক্ত লাগছে?

রেণু ছলছল নেত্রে স্বামীর বুকে মাথাটী গুঁজে বললে "তোমার জীবনে এত দুঃখ লাঞ্ছনা ভোগ করেছ আর আমি তা শুনতে বিরক্ত হ'ব? আমি যে তোমার সুখ দুঃখের সমান ভাগিনী তা ভুলে যাচ্ছ কেন প্রিয়তম? বরং এতদিন বলনি বলেই দুঃখ হচ্ছে।"

সুনীল। "তোমার কোমল প্রাণে ব্যথা লাগ্‌বে বলেই এতদিন বলি নি, লক্ষীটি রাগ করো না।" এই বলে রেণুর জ্যোৎস্নাপ্লাবিত গাল দু'টী টিপে দিয়ে পুনরায় বলতে লাগল। "আমি বড় হয়েছিলুম বলে বাজার আমাকেই করতে হত, সকালে উঠে নিজের স্কুলের পড়া যত শীঘ্র সম্ভব শেষ ক'রে বাজার নিয়ে আস্‌লে মা তাড়াতাড়ি রেঁধে দিতেন। আমরা খেয়ে স্কুলে

যেতুম। সেবার আমার প্রবেশিকা পরীক্ষার বৎসর। আমি সকালে কাকীমাকে বললুম "আমি কদিন বাজার করতে পারবো না আমার পরীক্ষা আছে, সকালে সকালে যেতে হবে; আমার অনেক পড়া করতে হবে।" কাকীমা বললেন "আমি পরীক্ষা টরীক্ষা কিছু বুঝি না, সুধীর বাজার করতে পারবে না, তুমিই তাড়াতাড়ি এনে দিয়ে খেয়ে যেও।" আমার সেদিন কেন জানি না বড্ড রাগ হ'ল; আমি কিছু না ব'লে বাজার নিয়ে আঙ্গিনায় ফেলে দিয়ে না খেয়েই অমনি চ'লে যেতে উদ্যত হলে, মা জিজ্ঞাসা করলেন "তুই কিছু খেয়ে যাবিনে বাবা?" আমি কোন উত্তর না দিয়ে পথে বেরিয়ে গেলুম, যেতে যেতে শুনলুম কাকীমা মা'কে বলছেন "বাবুর রাগ হয়েছে তাই তেজ ক'রে চ'লে গেলেন। আমি তেজ দেখে ভয় করবার মেয়েই নই। আসুক, আজ একটু তেজ ভাঙ্গতে হবে।"

বিকালে বাড়ী এসে দেখি কাকা বাড়ীর দরজায় দাঁড়িয়ে, আমাকে দেখেই বললেন 'কি হে বাপু দিন দিন যে দেখ্‌ছি বড় বীর হ'য়ে উঠেছ! তুমি নাকি আজ রাগ ক'রে না খেয়েই পরীক্ষা দিতে গিয়েছ?" আমারও মেজাজ গরম ছিল, বললুম "হ্যাঁ তাতে কি হয়েছে বরং ভালোই'ত আমার একবেলার খাওয়া খরচ বেঁচেছে! এরি মধ্যে কাকীমা এসে বললেন "শুনেছ ছেলের আস্পর্দ্ধার কথা?" আমি বললুম—যদি আস্পর্দ্ধাই করতুম তা'হলে আর দিন রাত এমন লাথি ঝাঁটা খেয়ে প'ড়ে থাকতুম না।"

"বেশ'ত কে তোমাদিগকে মাথার দিব্যি দিয়েছে পড়ে থাকতে, যাও না কোথায় লাট সাহেব হবে গিয়ে যাও-না। "আবার ফিরে আসতেই হবে, এক পয়সার মুরদ নেই, লম্বা লম্বা কথা আছে, বেরোও এখুনি আমার বাড়ী থেকে।" আমিও "আচ্ছা তাই" বলে সোজা গ্রাম সম্পর্কে একটী দয়ালু লোক আমাদের দাদা হ'তেন তাঁর কাছে গেয়ে বললুম 'দাদা এখুনি আমাকে পাঁচটী টাকা দেও, যা চান আবার শীঘ্রই দিয়ে দিবেন।' বলা মাত্র দাদা আমাকে চারটি টাকা দিলেন, আমি তাই নিয়ে কাকেও কিছু না ব'লে ভগ্নপ্রাণে অসহ যন্ত্রণা বুকে নিয়ে ষ্টেশন অভিমুখে রওনা হ'লেম।

দুঃখিনী জননী ও ছোট্ট ভাই দুটীকে ওই দুঃখের আবরণের মধ্যে রেখে যখন পল্লীপথ দিয়ে রওয়ানা হলেম তখন সূর্য্য ধীরে ধীরে নদীর ওপারে বিলিয়ে যাচ্ছে। তারই সহস্র কিরণচ্ছটায় মণ্ডিত হ'য়ে আকাশ নানা রংএর সৃষ্টি করছে। প্রতিবাসী কত লোক নানা কাজে নানাদিক্ দিয়ে চলেছে। সেই সব দেখে নানা চিন্তার উদয় হল। এই চিরপরিচিত চিরমধুর জন্মভূমি ছেড়ে কোথায় অজানা অচেনা দেশে চলেছি? কাহাকেও চিনিনা কলকাতায় কি করবো? আমার দুঃখিনী মায়ের প্রাণ কি রকম করবে, কোথায় আমি উপযুক্ত হ'য়ে তাঁর দুঃখ মোচন করবো, না নিজেই কাপুরুষের মত ভীরু স্বার্থপরের ন্যায় তাকে ফেলে চ'লে যাচ্ছি। আবার মনে হল, নাছোড়েই বা উপায় কি আছে, তার চেয়ে কল্‌কেতায় যদি একটী চাকরী পাই তাহ'লে দুঃখ ঘুচবে। কিন্তু তখন আমার কল্পনাও ছিল না যে কলকেতা কি রকম জনাকীর্ণ জায়গা।

যাক তারপর যথা সময়ে অশ্রুভারাক্রান্ত নয়নে ট্রেণে উঠ্‌লুম। ট্রেণ দিগ্‌বিদিগ্ বিকম্পিত ক'রে ছুটলো।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

মেইল ট্রেণ কোথাও বেশী থামে না, হু হু শব্দে কত গ্রাম বিল বন জঙ্গল অতিক্রম ক'রে চল্‌লো। চিরপরিচিত পল্লী, যার প্রত্যেকটী স্থান কতস্মৃতি মণ্ডিত, প্রত্যেকটী বালুকা কণা পর্য্যন্ত শত স্নেহে আগুলিয়া ধরত, চিরমধুর মহিমময়ী জন্মভূমি ছেড়ে চল্‌লুম। আজও রেণু সেই দিনটী মনে হলে আমার প্রাণ আকুল হ'য়ে ওঠে। চারিদিকে উদ্ভাসিত জ্যোৎস্না, জ্যোৎস্নায় বিভূষিত পাখীর দল, মাঝে মাঝে তারস্বরে আনন্দ চীৎকার ক'রে উঠ্‌ছে। থাক রেণু আজ বাড়ী চলো যাই, কাল আবার শুনো, রাত অনেক হয়েছে, "বাবা হয়ত উদ্‌গ্রীব হয়েছেন।"

রেণু। তোমার সঙ্গে আছি, বাবা কিছুই হবেন না, কিন্তু সত্যি অনেক রাত হয়েছে চল যাই।" তারপর তারা দু'জনে সুষুপ্তিপূর্ণ শুভ্র রজনীতে বাড়ী অভিমুখে নিঝুম রাস্তা দিয়ে রওয়ানা হ'ল। নিকটেই বাসা, কাজেই হেঁটে যেতে কোন কষ্ট হয় না। রেণু রাত্রে স্বামীকে মিষ্টি ভৎর্সনা করলে—"অমন ক'রে মা, ভাইকে ফেলে পালিয়ে এলে আমার মন্দ?" সুনীল হাসিমুখে "তখন যদি না আসতুম তাহ'লে—"রেণুকে বলে লোহাগভরে বুকে টেনে নিল।

পরদিন রেণুর শরীর ভালো না থাকায় তারা বেড়াতে গেল না। ঘরের মধ্যেই সুনীল রেণুর বিছানার পাশে বসল। সুনীল রেণুর তাড়নায় আবার নিজের কাহিনী আরম্ভ করলে।

"আমি যথাসময়ে হাওড়ায় পৌঁছলুম, কিন্তু আজ মনে হ'লে হাসি পায় যে সেই বহু জনাকীর্ণ বিস্তৃত ষ্টেশনে নেমে আমি কেমন ভ্যাবা চাকা হয়েছিলুম। কি করি কোথায় যাই, ঠিক করতে না পেরে বিষণ্ণ মলিন মুখে একধারে চুপ করে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সেই জনসমুদ্র দেখ্‌তে লাগলুম।

আমার সেই অসহায় অবস্থা দেখে একটী ভদ্রলোক, আমায় তাঁর সঙ্গে যে'তে বল্‌লেন। আমিও অকূল সমুদ্রে কূল পেয়ে অনতিবিলম্বে তাঁর সঙ্গে রওয়ানা হলেম, তাঁর বাড়ী অভিমুখে চেয়ে দেখি প্রকাণ্ড অট্টালিকা, চাকর বামুন দাসীতে বাড়ী ভরপুর। আমি ত তখন সে সব দেখে অবাক। সৌভাগ্যবশতঃ গিন্নী ঠাকরুণ ও আমাকে স্নেহের দৃষ্টিতেই দেখলেন। তাঁর দু'টী ছোট ছোট ছেলে।

৩।৪ দিন পর একদিন কর্ত্তা আমায় বল্‌লেন—'সুনীল তুমি যে ভদ্র সন্তান, এটা বলাই বাহুল্য। তোমার বাড়ী কোথায় কেন এমন করে ঘুরে বেড়াচ্ছ আমাকে বল্‌লে আমি পাঠিয়ে দেব।' আমি তাঁর কথায় সজল নয়নে বললুম "আপনার দয়ার সীমা নাই, কিন্তু একটী মিনতি যে আমার বাড়ীর কথা জিজ্ঞাসা কর্‌বেন না, ভিক্ষে ক'রে খে'তে রাজী আছি, তবুও বাড়ী আর যাব না।"

ভদ্রলোকের নাম গোকুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি আমার মাথায় হাত বুলিয়ে বল্‌লেন "পাগল ছেলে ভিক্ষে কর্‌বে কেন, আমার কাছেই থাক। অজয় বিজয়কে একটু একটু পড়িও, নিজেও পড়াশুনা কর।" আমি নিতান্ত আনন্দ ও উৎসাহের সঙ্গে নিজে পড়া শুনা আরম্ভ করলুম। ছেলে দু'টী বেশ শান্ত শিষ্ট ছিল, তাদের পড়া'তে আমাকে কোনই বেগ পে'তে হ'ত না। বেশ ভালোই দিন কাটতে লাগল। কিন্তু মাঝে মাঝে দুখিনী মা ও ভাই দুটীর জন্যে মন কেমন কর্‌ত! কিন্তু বেশীক্ষণ তা মনে স্থান দিতুম না।

আমি যখন বি, এ, পড়ি হঠাৎ গোকুলবাবু সাংঘাতিক পীড়িত হলেন। " জীবনের আশা নাই বুঝে উইল করবার জন্যে তাঁর পুরাতন বন্ধু তোমার বাবাকে টেলিগ্রাফ করেন। তোমার বাবা গেলে মৃত্যু সময়ে আমার ঠিক অভিভাবকের আশ্রয়দাতা পিতৃতুল্য দয়ালু গোকুলবাবু তোমার বাবাকে আমার কথা ব'লে যান, আমাকেও এঁর কাছে আস্‌তে উপদেশ দেন্। তারপরেও কি আবার বল্‌তে হবে রেণু?" সুনীল তার দীর্ঘজীবন কাহিনী সমাপ্ত কর্‌লে! রেণু একটী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বল্‌ল "যা ভুল হবার হয়েছে এতদিন তাঁদের কোন খবর না নেওয়া। এখন আমার সর্ব্বপ্রথম কর্ত্তব্য মা'র ও ঠাকুরপোর সংবাদ নেওয়া। তাঁরা কেমন আছেন।"

সুনীল। "আমিও তোমার মতে সর্ব্বান্তকরণে রাজী আছি, বল কি কর্‌তে হবে হুকুম কর।"

রেণু। "আমার হুকুম যে প্রথমে বাবাকে সব বল্‌তে হবে, তারপর তুমি ঠাকুরপোকে চিঠি লিখ; আমরা তাঁর চিঠি পে'লেই বর্দ্ধমান যাব।"

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

"যা শুনেচ, এমন খবর আজ তোমাকে দিব যে তুমি অবাক আশ্চর্য্য হবে।"

মা। "কি বাবা শীঘ্র বল্ নিশ্চয়ই আমার সুনীলের খবর পেয়েছিস্! আহা বাছা আমার অভিমানে আজ কত দিন নিরুদ্দেশ। 'বল্ বাপ্ কোথায় সে?"

মোহিত। "আজ হঠাৎ আগ্রা থেকে দাদার এক চিঠি পেলুম, দাদা আমার চিঠী পেলেই এখানে আস্‌বেন।"

মা। "আহা না জানি বাছা আমার কত দুঃখ পেয়েছে! লিখে দে বাবা তুই তাকে দেখার জন্যে আমি পাগলিনী হ'য়ে আছি।"

কথা সময়ে বর্দ্ধমানে টেলিগ্রাম—এল। সুনীল তার বৌ নিয়ে আস্‌ছে। কি আনন্দ সেদিন বৃদ্ধা মায়ের অন্তরে। এই দীর্ঘকাল পরে নিরুদ্দিষ্ট পুত্রকে বুকে পুনঃ ফিরে পাবেন, কি ক'রে গ্রহণ কর্‌বেন এই চিন্তায় তিনি ব্যস্ত। তাঁর স্নেহময় হৃদয় আজ ছেলের আগমনের আহ্লাদে ব্যাকুল।

মোহিত ও আজ বড় খুসী। সেই ছোট বেলার স্নেহময় দাদার আদর যত্ন কীর রেখার ন্যায় তার হৃদয়ে অঙ্কিত আছে। সেই দাদাকে এতদিন পর ফিরে পাবে, আবার সেই সঙ্গে একটী বৌ ও আস্‌বে এই আনন্দেই সে অস্থির।

সন্ধ্যা সাতটায় দিল্লী এক্সপ্রেস্ বর্দ্ধমানে এল, মোহিত ব্যস্ত ভাবে চারিদিক্ দেখ্‌ছে বল্লে হঠাৎ এক প্রকোষ্ঠ হ'তে সুনীল অবতরণ ক'রে! "এই যে মোহিত আমি এখানে, পালকী এনেছিস্?" ব'লে সাদরে সস্নেহে ভাইকে বুকে জড়িয়ে ধরলে।

ষ্টেসন থেকে বাড়ী মাইল দু'য়ের রাস্তা, রেণুকে পাল-কীতে বসিয়ে দু'ভায়ে একখানি ঘোড়ার গাড়ী ভাড়া ক'রে বাড়ী রওনা হ'ল। সুনীলের প্রাণের ভিতর তোলপাড় আরম্ভ হয়েছে। আজ কত দিন পর সেই রাস্তা দিয়ে বাড়ী চলেছে। পথি পার্শ্বের সেই সব বাড়ী ঘর তার চির পরিচিত। এত দীর্ঘ দিনে অনেক পরিবর্ত্তন হয়েছে। বিদেশে শত সুখে থাকলেও চির জন্মভূমি শৈশবের ক্রীড়াভূমি যত প্রিয়—যত শান্তিময় এমন আর কিছু না। সুনীল আনন্দে বিস্ফারিত নয়নে এসব দেখ্‌ছে আর অতীতের স্মৃতিতে তার হৃদয় ভ'রে যাচ্ছে।

গাড়ী পালকী বাড়ীর দরজায় আসা মাত্র স্নেহময়ী বৃদ্ধা জননী দৌড়ে এসে প্রথমে আদরের দুলালকে হারানো ধনকে, পরে—নূতন বধূমাতাকে বুকে জড়িয়ে ধরে তাদের মস্তকে অসংখ্য আশীর্ব্বাদ সহ স্নেহাশ্রু বর্ষণ

কর্‌লেন। সুনীলও এতদিন পর মা'কে দেখে নিজ অন্তর সাম্‌লাতে পারল না। অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে বল্লে "মা আজ আমরা কত সুখী! আবার যে এমন ক'রে আমাদের মিলন হবে এটা স্বপ্নেও ভাবি নি। কাকা কাকীমা ওঁরা সকলে কই?" মা। "চল্ বাবা আগে সুস্থীর হ', তার পর সব বল্‌ব। ওঁরা এখানে নাই।"

হাজার হলেও রক্তের টান, সুনীলের প্রাণ অমঙ্গল আশঙ্কায় কাঁপিয়া উঠিল। সে অধীরভাবে জিজ্ঞাসা করলে—

"কেন মা ওঁরা ভালো আছেন'ত? ছেলেরা কোথায়?" "কি আর বল্‌ব বাবা, কিছুদিন হ'ল বাবা, সুধীর আমাদেরকে কাঁদিয়ে ইহলোক ছেড়ে চ'লে গেছে। ঠাকুরপো ও বৌ একেবারে আকুল হ'য়ে ভেঙ্গে পেড়েছেন। আহা বৌ যে ঐ ছেলেটাকেই বেশী ভালবাস্‌ত।"

সুনীল। "হায় মা আমি যে স্বপ্নেও এটা ভাবি নি। আমি কালই কাকীমার বাপের বাড়ী যেয়ে ওঁদের নিয়ে আস্‌ব। আমি গেলে আস্‌বেন না কি?"

মা। "নিশ্চয়ই আস্‌বেন। দেখিস্ বাবা তোকে দেখ্‌লে ওঁরা কত সুখী হবেন। আহা সুধীর যে তোরই বয়সী ছিল। তার মৃত্যুর পর তোর কাকীমা তোর জন্যে কত আক্ষেপ করেছেন।"

সুধীরের অকাল মৃত্যুর সংবাদ পেয়ে সুনীলের হৃদয়ে বিষাদ হ'ল। এক রক্তের ভাই তারা।

ওদিকে মোহিত বেণুর সঙ্গে খুব বন্ধুত্ব জমাইয়া লইল। অল্প সময়ের মধ্যে মোহিত বৌদিকে রাজী' ক'রে ফেলল যে আর তাঁরা শীঘ্র আগ্রা ফিরে যেতে পারবেন না। যদি যান্ তাহ'লে মোহিতকে নিয়ে যেতে হবে। বেণুর ও ভাই নাই। এই সরল স্নেহে মেয়েটীকে তার ভাইএর শূন্য আসনে সাদরে স্নেহাসনী দিয়ে বরণ ক'রে নিল। শাশুড়ী ঠাকুরাণীরও এই সুজনলিনীর্ষৎ পরমা-সুন্দরী নম্র মধুর স্বভাবা হাসি মাখা বধূটী বড় পছন্দ হল।

সস্নেহে বধূর চিবুকে হাত দিয়া বললেন "আমি স্বপ্নেও কখনও ভাবি নি—মা, যে আমার এমন কপাল হবে আর আমি এমন সোনার চাঁদ মুখের মত বৌ পাব, মা আমার ঘরের লক্ষ্মী, তোমার শুভাগমনে দুঃখিনীর ঘর সংসার যেন আনন্দের সম্ভারে ভ'রে ওঠে। সিঁথীর সিন্দুর মা'র আমার আরও উজ্জ্বল হো'ক। চির সৌভাগ্যবতী হ'য়ে জন্ম জন্ম এম্‌নি আমার ভাঙ্গা ঘরে থাক।"

সুনীল একদিন তার মাকে হাসতে হাসতে বল্লে মা! তোমার বৌমার সঙ্গে বিয়ে হওয়াবধি একটা ভয় আমার বরাবরই ছিল যে বড় লোকের মেয়ে ও সহরেই চিরদিন বাস যদি না আসতে চাও তা ঐ-ই আমাকে ফিরিয়ে আন্‌লে, তবেই দেখে...

মা বল্লেন তবে আমার ঘরের লক্ষ্মী সুনীল ও ঘরের ছেলেকে ঘরে আনবে না!

সেকালের পিতা-পুত্র। পুত্র। (পিতাকে) এলোটা শুধুমুখ দিন রাত খেলিয়ে বেড়াচ্ছ,ঘরেই ত থাক দিন রাত একটু দেখতে শুনতে পার না? একটু বই নিয়ে বসালেই ত পার!

পুত্র। (পিতাকে) মো. মো. আইটেম্ ইজ্, এখানে তোমার আয় হবিবে হ'বে না। ঐ চ্যারিটেবল সোসাইটিতে আমি একজন ডোনার, আমার সহিধর্ম্মী বলে তাদের কাছে বলবে যাও, একটু বাড়িয়া যেন 'খন।

রোকশোধ

(শ্রীনারায়ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।)

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

গোল বাধাইলেন ক্ষেমঙ্করী দেবী। মহেন্দ্র নাথ যে অহিন্দু ছিলেন ইহা তিনি জানিতেন কিন্তু উপায়ান্তাভাবে তাহার সে অহিন্দু আচরণ চোখ কাণ বুজিয়া সহ্য করিতে হইত। কিন্তু এই একরত্তি মেয়ে অনুপমা যে অহিন্দু আচরণ দ্বারা হিন্দু নারীর মর্য্যাদা উল্লঙ্ঘন করিবে, যাহার তাহার সম্মুখে যাইবে, পর পুরুষের সহিত একত্র বসিয়া চা খাইবে, হাসি তামাসা করিবে, ক্ষেমঙ্করী দেবী ইহা সহ্য করিতে পারিলেন না। কোন বর্ষীয়সী গৃহিণী সতেরো বছরের মেয়ের এরূপ স্বেচ্ছাচার সহ্য করিতে পারে? অনুপমার এই স্বেচ্ছাচার নিবারণের জন্য ক্ষেমঙ্করী যথেষ্ট চেষ্টিত হইলেন। তিনি প্রথমতঃ সস্নেহ অনুযোগ ও উপদেশ দ্বারা তাহাকে এই নিন্দিত আচরণ হইতে নিবৃত্ত করিতে প্রয়াসী হইলেন, কিন্তু তাহাতে কিছুমাত্র ফল হইল না দেখিয়া কঠোরতা অবলম্বন করিতে বাধ্য হইলেন। তিনি মধ্যে মধ্যে কঠোর তিরস্কারের সহিত সামাজিক নিন্দার ভীতি প্রদর্শন পূর্ব্বক অনুপমাকে বুঝাইয়া দিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন যে, তাহার এরূপ আচরণ আদৌ সঙ্গত নহে, মেয়ে মানুষের পক্ষে এরূপ নির্লজ্জ আচরণ শুধু যে সমাজ ধর্ম্মের বিরোধী তাহা নহে, ইহাতে অনেক বিপদ্ ঘটিতে পারে। নানা লোকে নানা কথা কহিয়া বেড়াইলে শেষে বিবাহ হওয়াও দুর্ঘট হইয়া উঠিবে। মহেন্দ্র গিয়াছে, কিন্তু তিনি এখনও বর্ত্তমান, এবং অনুপমার সুখ দুঃখের জন্য তিনিই প্রধানতঃ দায়ী। তাহাকে পরিণয় বন্ধনে আবদ্ধ করিয়া, স্বামীপুত্রের সৌভাগ্যে সৌভাগ্যবতী হইতে দেখিয়া সুখে চক্ষু মুদ্রিত করেন ইহাই তাঁহার আন্তরিক কামনা। কিন্তু অনুপমা যদি তাঁহার কথার বাধ্য না হয়, তাহা হইলে তিনি আর কি করিবেন? আর কিছু করিতে না পারিলেও চোখের উপর এমন অনাচার অবিচার চুপ করিয়া দেখিতে পারিবেন না; বাধ্য হইয়া তাঁহাকে এস্থান ত্যাগ করিতে হইবে।

স্বীয় সুখ সৌভাগ্যের আশায় না হউক, পিসীমার মনঃকষ্টের ভয়ে অনুপমা যতটা পারিল সাবধান হইয়া চলিতে লাগিল। তারানাথের সম্মুখে গেলেও এবং তাঁহার সম্মুখে বসিয়া চা খাইলেও এখন আর গল্প গুজব, এতটা চলিত না, বিশেষ প্রয়োজনীয় কথা ছাড়া কথা-বার্ত্তাও তেমন বেশী হইত না; পিসীমার উপদিষ্ট লজ্জাটার কোনই মূল্য নাই বুঝিলেও অনুপমার যতটা সম্ভব, সেই নিষ্ফল লজ্জার অনিশ্চিত ভাণ দেখাইয়া চলিতে লাগিল। এই কপটতার জন্য অন্তরে যথেষ্ট ক্লেশ অনুভব করিলেও পিসীমার মান রক্ষার জন্য সে কষ্ট টুকুকে সে সহ্য করিতেই প্রস্তুত হইল।

পিসীমার মন কিন্তু ইহাতে উঠিল না। তিনি অনুপমাকে ঠিক অন্তঃপুরবদ্ধা গৃহস্থ কন্যার ন্যায় দেখিতে ইচ্ছুক, সুতরাং অনুপমার এই সামান্য সতর্কতায় তিনি সন্তুষ্ট হইতে পারিলেন না; তাঁহার অনুযোগ ও উপদেশের স্রোত সমান ভাবে চলিতে লাগিল। পরিশেষে অনুপমা অসহিষ্ণু হইয়া একদিন স্পষ্ট ভাবে যখন তাঁহাকে জানাইয়া দিল যে, অহিন্দু আচরণে তাহার বিন্দুমাত্র স্পৃহা না থাকিলেও সে কিছুতেই অবরোধবদ্ধ ব্যর্থ লজ্জার নিষ্ফল অভিনয় করিতে পারিবে না, তখন অগত্যা পিসীমাকে সে চেষ্টা ত্যাগ করিতে হইল। অনুপমাও যেন হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল।

কিন্তু ইহার কয়েক দিন পরেই ক্ষেমঙ্করী দেবী যখন মোট-ঘাট বাঁধিয়া গঙ্গাস্নানের উদ্দেশ্যে কলিকাতা যাত্রা করিলেন, তখন অনুপমার বুঝিতে বিলম্ব হইল না যে, তাহার কঠোর ব্যবহারে মর্ম্মাহত হইয়াই পিসীমা এ স্থান ত্যাগ করিয়াছেন। প্রকৃতপক্ষে তাহার ব্যবহারে একটু অসহিষ্ণুতা ছাড়া তেমন কঠোরতা কিছু না থাকিলেও অনুপমা যেন সেই অসহিষ্ণুতাটুকুকেই খুব কঠোর বলিয়া দেখিতে লাগিল, এবং সেই কঠোরতার জন্য অন্তরে অন্তরে লজ্জা ও অনুতাপের কষাঘাত পাইতে থাকিল। ছি ছি, পিসীমা—স্নেহময়ী প্রতিপালিকা—রূঢ় ব্যবহারে তাঁহার অন্তরে আঘাত দিয়া তাঁহাকে গৃহত্যাগিনী করিল! এই কি তাঁহার স্নেহময়তার প্রতিদান! এই কি তাঁহার সহিষ্ণুতা, সংযম! এতদিন পিতার পদপ্রান্তে বসিয়া সে কি এই সংযম সহিষ্ণুতা শিক্ষা করিয়াছে? তাহার এই অসহিষ্ণুতা দর্শনে পিতা কি স্বর্গে বসিয়াও তাহার দিকে তিরস্কার-পূর্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিবেন না? অনুপমার ইচ্ছা হইল, সে ছুটিয়া গিয়া পিসীমাকে ফিরাইয়া আনে। সে মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিল, জীবনে আর কখন সে এমন রূঢ়তার পরিচয় দিয়া গুরুজনের অন্তরকে ব্যথিত করিবে না, তজ্জন্য তাহাকে যত কষ্ট, যত বিড়ম্বনা সহ্য করিতে হয়, নিঃশব্দে সকলই সহিয়া যাইবে।

যে মহেন্দ্রনাথ গুরুজনের আদেশে হৃদয়কে পর্য্যন্ত বলি দিয়াছিলেন, অনুপমা তাঁহারই কন্যা। শুধু কন্যা নহে, তাঁহার ছাত্রী, শিষ্যা,—আপনার অনুরূপ আদর্শে

গঠিতা। সুতরাং পিসীমার ক্রোধ বা অভিমানটাকে অন্যায় ও অসঙ্গত বলিয়া বুঝিলেও তজ্জন্য সে পিসীমাকে দোষী না করিয়া নিজের ঘাড়েই দোষের বোঝা চাপাইয়া লইবে, এবং স্বীয় ত্রুটীর জন্য এতটা ক্ষুব্ধ—বিচলিত হইবে তাহাতে বিচিত্রতা নাই, বরং ইহাই স্বাভাবিক। পিতৃ-আদর্শে গঠিতা অনুপমা পরের ত্রুটী অপেক্ষা নিজের ত্রুটীকেই বড় করিয়া দেখিত, এবং এইরূপ দেখিবার শিক্ষাই সে পিতার নিকট পাইয়া আসিয়াছে।

পিসীমার গৃহত্যাগের পর হইতে অনুপমা যেন তারানাথের নিকট হইতে একটু দূরে দূরে থাকিবার চেষ্টা করিত এবং সেটাকে জীবনের একটা মস্ত বিড়ম্বনা বলিয়া বুঝিলেও সেই বিড়ম্বনাটাকেই ভোগ করিবার জন্য হৃদয়কে প্রস্তুত করিয়া লইত।

এতটা লজ্জা ও বিড়ম্বনা নীরবে সহ্য করিয়া যাইতেছিল, তাহার একমাত্র কারণ—তাহার প্রকৃতির স্বভাবসিদ্ধ নম্রতা। সেই স্বাভাবিক নম্রতা-টুকুই তাহাকে গুরুজনের নিকট ঔদ্ধত্য প্রকাশ হইতে সম্পূর্ণ বিরত করিয়া রাখিয়াছিল। পাছে পিসীমা মনে মনে কষ্ট অনুভব করেন, পাছে সে কর্ত্রী হইয়াছে এই অহঙ্কারে গুরুজনদিগকে পর্য্যন্ত উপেক্ষা করিয়া চলিতে চায় এই সন্দেহ কাহারও মনে বদ্ধমূল হয়, এই আশঙ্কাতেই সে নিজে সকল বিড়ম্বনা সহিয়া লইতে প্রস্তুত হইয়া পিসীমার আদেশটাকে শিরোধার্য্য করিয়া লইয়াছিল। শৈশব হইতেই সে পিতার নিকট এইরূপ শিক্ষাই পাইয়া আসিয়াছিল, সুতরাং আজ সে চিরাভ্যস্ত শিক্ষাকে অতিক্রম করিয়া আপনার মতটাকেই সকলের উপরে স্থান দিতে সক্ষম হইল না; আপনাকে দুর্ব্বল প্রতিপন্ন করিয়াও পিতৃদত্ত শিক্ষাটাকেই প্রবল করিয়া রাখিল।

তারানাথের সহিত অনুপমার যে একবারেই সাক্ষাৎ হইত না তাহা নহে। প্রয়োজন হইলেই তারানাথ অনুপমার কাছে আসিত, এবং যতটা সম্ভব সংক্ষেপে প্রয়োজন সেরে করিয়া চলিয়া যাইত; বিশেষ প্রয়োজন ব্যতিত প্রায় আর আসিত না। প্রয়োজনও বেহাই পাইবার জন্য প্রার্থনা করিয়াছে, কোন কন্যাদায়-গ্রস্ত ব্যক্তি দায় উদ্ধারের আশায় ধরণা দিয়াছে, কোন্ গ্রামের ম্যালেরিয়া বা মহামারী পীড়িত লোকেরা ঔষধ ও ডাক্তার পাইবার জন্য আবেদন করিয়াছে, কোন্ মহালে বাঁধ বাঁধা বা খাল কাটার দরকার, কোন্ অনাথা বিধবা অন্নবস্ত্রের জন্য সাহায্য চাহিতেছে, ইত্যাদি অনেক বিষয়ে অনুপমার সম্মতি লইবার প্রয়োজন হইত। ইহার মধ্যে এমন অনেক ব্যাপার ছিল, যাহাতে অনুপমার সম্মতি না লইয়াও তারানাথ নিজের বিবেচনা অনুসারেই কার্য্য করিতে পারে। কিন্তু তারানাথ তাহা করিত না, সেই সকল সামান্য বিষয়েও সম্মতি লইবার জন্য অনুপমার সম্মুখে উপস্থিত হইত। কিন্তু এই সকল সামান্য ব্যাপারে তাহার সম্মতি লওয়া নিতান্ত নিষ্প্রয়োজন—তারানাথ নিজের বুদ্ধি বিবেচনা দ্বারাই অনায়াসে ইহার নিষ্পত্তি করিয়া দিতে পারেন বলিয়া অনুপমা যখন মত প্রকাশ করিত, তখন সেটা তিরস্কারের মতই কাণে বাজিয়া এই অহেতুক সাক্ষাৎকারের জন্য তারানাথকে যেন লজ্জায় জড়সড় করিয়া তুলিত; সে আর কখন এরূপ খুঁটি-নাটি ব্যাপার লইয়া অনুপমার সম্মুখবর্ত্তী হইবে না একটা সঙ্কল্প করিয়া ফেলিত। কিন্তু উপর্য্যুপরি দুই তিন দিন সাক্ষাৎকার না হইলে অনুপমা যখন তাহাকে ভিতরে ডাকিয়া পাঠাইত এবং কতকগুলা নিতান্ত অপ্রয়োজনীয় কথা লইয়া তারানাথকে দুই তিন ঘণ্টা বসাইয়া রাখিত, তখন তারানাথ আপনার সঙ্কল্প বিস্মৃত হইয়া, পাচক ঠাকুর যে ইদানীং রন্ধন কার্য্যে সম্পূর্ণ শৈথিল্য প্রকাশ করিতেছে এই অভিযোগ লইয়াও অনুপমার কাছে আসিতে কুণ্ঠিত হইত না।

সেদিন তারানাথ জনৈক কন্যাদায়গ্রস্ত ব্রাহ্মণের আবেদন লইয়া অনুপমার নিকট উপস্থিত হইয়াছিল। ব্রাহ্মণকে বিশ পঁচিশ টাকা দিলেই তিনি সন্তুষ্টচিত্তে চলিয়া যাইতে পারেন; কিন্তু অনুপমা সে দিন এমনই বাঁকিয়া বসিয়াছিল যে, এই সামান্য কয়টা টাকা দিতেও ঘোরতর আপত্তি উপস্থিত করিয়াছিল, এবং এই দানটা যে নিতান্ত বাজে খরচ, ভবিষ্যতে আর কখনও এরূপ বাজে খরচ করা হইবে না এবম্বিধ মন্তব্য প্রকাশ করিতেছিল। তারানাথ তাহাকে কিছুতেই বুঝাইতে পারিতেছিল না যে, কন্যাদায়ের সাহায্য করে দান আদৌ বাজে খরচ নহে, বরং এইটাই সর্ব্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় খরচ। কেন না আজকাল সমাজের যেরূপ অবস্থা তাহাতে কন্যাদায়ের মত ভয়ানক দায় আর নাই।

অনুপমা কিন্তু দায়ের ভয়ানকত্ব আদৌ স্বীকার করিতে চাহিল না। সে তর্ক উত্থাপন করিয়া বলিল, "আচ্ছা, আমাকে আগে বুঝিয়ে দিন, কন্যাদায় যে কি ভয়ানক দায়। মেয়ের বিয়ে দিতে কন্যাদায় হয়, তবে ছেলের বিয়েও পুত্রদায় হবে না কেন?"

তারানাথ বলিল, "তার কারণ—মেয়ের বিয়ের একটা নির্দ্দিষ্ট বয়স আছে, কিন্তু ছেলের তা নাই। কাজেই নির্দ্দিষ্ট বয়সে বিয়ে দিতে না পারলে সেটা কন্যাদায় হ'য়ে উঠে।"

অনুপমা বলিল, "সেটা হয় শুধু সমাজের বিচারে বৈষম্যে। মেয়ের মত ছেলেরও বিবাহের বয়সের নির্দ্দেশ থাকতো, কিম্বা ছেলের মত মেয়েরও বয়স নির্দ্দিষ্ট হ'তো, তা হ'লে কোন দায়ই থাকতো না।"

ঈষৎ হাস্যসহকারে তারানাথ বলিল, "আপনি তা হ'লে মেয়েদের পুরুষের সমান অধিকার দিতে চান।"

জোর গলায় অনুপমা বলিল, "নিশ্চয়ই চাঁই। মেয়েরা বিধাতার অভিশপ্ত সন্তান নয়।"

তারা। কিন্তু তা'তে বাধা অনেক। অনেক পুরুষ আজীবন অবিবাহিত থাকে।

অনু। অনেক মেয়েও তা থাকতে পারে। আগেকার কুলীনদের ঘরে আইবুড় বুড়ী থাকে শুনেছেন বোধ হয়।

তারা। আগেকার কথা ছেড়ে দিন। আগে এক একজন কুলীন ব্রাহ্মণ বিশ পঁচিশটা বিয়ে করতো।

সহাস্যে অনুপমা বলিল, বিশ পঁচিশ হাজার করুক, কিন্তু তার দ্বারা এমন প্রমাণিত হয় না যে, বারো বছরের মধ্যে মেয়ের বিয়ে না দিলেই নয়।"

তারানাথ বলিল, "বারো বছরের না হোক, চোদ্দ বছরের তো দিতে হবে।

অনুপমা বলিল, "বিশ বছরে দিলেও কোন ক্ষতি নাই। লাভের মধ্যে কন্যাদায় কন্যাদায় ক'রে দোরে দোরে ঘুরতে হয় না।"

তারানাথ বলিল, "আপনার এ আইন ইউরোপীয় সমাজে খাটে, কিন্তু যে দেশে মেয়েরা কুড়ি বছরে বুড়ী হয়, সে দেশের পক্ষে এ আইন সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত।"

অনুপমার ভ্রূযুগল কুঞ্চিত হইল; রোষ-রুদ্ধকণ্ঠে বলিল, "মেয়েরা কুড়ি বছরে বুড়ি হয় না, মা বাপ দশ বছরে বিয়ে দিয়ে তাদের বুড়ী সাজায়।"

কথাটা যে সত্য ইহা তারানাথ অস্বীকার করিতে পারিল না। তথাপি সে সমাজ, শাস্ত্র দেশাচার প্রভৃতির দোহাই দিয়া অনুপমার নিকট বাল্য বিবাহের উপযোগিতা প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টিত হইল। অনুপমা কিন্তু যুক্তি দ্বারা নিজের মত বজায় রাখিয়া যাইতে লাগিল।

ঠিক এই সময়ে জুতার মস্ মস্ শব্দে তাহাদিগকে চমকিত করিয়া, তাহাদের ঘরের সম্মুখ দিয়া এক হাল ফ্যাসানের তেড়ী কাটা নব্য যুবক গর্ব্ব পদক্ষেপে ভিতর দিকে চলিয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে ক্ষেমঙ্করী দেবীর অভ্যর্থনা ধ্বনিতে ও দাসদাসীদের উপর আদেশের পর আদেশে বাড়ীখানা যেন কোলাহলময় হইয়া উঠিল। তারানাথ ও অনুপমা যেন একটা অদৃষ্টপূর্ব্ব বস্তু দর্শনে বিস্ময়ে নির্ব্বাক্ হইয়া রহিল।

কিয়ৎক্ষণ পরে অনুপমার মুখের দিকে চাহিয়া তারানাথ জিজ্ঞাসা করিল, "কে ইনি?"

ম্লানমুখে অনুপমা উত্তর দিল, "বোধ হয় পিসীমার আত্মীয় হবে।"

তর্কটা প্রান্ত আগেই বন্ধ হইয়া গিয়াছিল, এক্ষণে কথা-বার্ত্তা বন্ধ হইল। যেন কি একটা অজ্ঞাত আশঙ্কা আসিয়া উভয়ের মনের উপর চাপিয়া বসিল।

কিছুক্ষণ পরে তারানাথ উঠিয়া দাঁড়াইল, এবং নীরবে ধীরে ধীরে ঘরের বাহির হইয়া গেল। অনুপমা যেমন বসিয়াছিল, সেই ভাবেই বসিয়া রহিল। (ক্রমশঃ)

হাস্য।

মোটর অধিকারী। (চাপা-পাড়া লোকটাকে) কি রকম অসাবধানী তুমি বাপু। সহরের রাস্তায় অমন আনাড়ীর মত চলে? হিঃ হিঃ—আমি বাপু সাত সাত বছর মোটর চড়ে বেড়াচ্ছি—এমন আনাড়ি দেখি নি।

আহত ব্যক্তি। আজ্ঞে, আনাড়ী আমি—না আনাড়ী আপনি। আপনি সাত বছর মোটর চড়ছেন, আর আমিও সাতাশ বছর পায়ে হেঁটে বেড়াচ্ছি।

নাট্যকার (পার্শ্বোপবিষ্ট ম্যানেজারকে)। ঐতিহাসিক নিখুঁত, নিলে না; সামাজিক নাটক নিখুঁত, তাতেও এত গণ্ডগোল। বেটারা চায় কি?

ম্যানেজার। টাকা কেয়ৎ।

"বিয়ের পর মেয়েদের একটু সময়ে চলতে হয়—বুঝে না চলে সংসারে অনাটন, অভাব বেড়ে যায়।"—এই উপদেশ শুনে এসে এক যুবতী কিছুতেই স্বামীকে চুম্বন করবে না, বলে, এখন এত অপব্যয় করলে ভবিষ্যতে দুঃখ অভাব বাড়বে যে।

"এ কি শুধু জল 'নিতে' আসা ?
এই আনাগোনা কিসের লাগি যে
কি কব, কি আছে ভাষা।"

ভগবৎপ্রেম-বিভোরা।

পাশ্চাত্য মহিলা সমাজ

(শ্রীমতী মৃণালিনী দেবী)

[শ্রীযুক্তা ওয়াং একজন চীন মহিলা এবং সংবাদ পত্রের সহিত সংশ্লিষ্টা রমণী। ইওরোপ ও আমেরিকার সকল প্রদেশই ভ্রমণ করিয়াছেন। পাশ্চাত্য মহিলা সমাজ নামক প্রবন্ধে শ্রীযুক্তা ওয়াং ইংরেজ, ফরাসী, জার্মেন মার্কী এবং আমেরিকাবাসিনী সম্বন্ধে কি ধারণা পোষণ করেন তাহারই পরিচয় পাওয়া যাইবে। লেখিকা]

আমেরিকাবাসিনীগণ পুরুষের মতই কঠোর পরিশ্রম করিতে পারেন। প্রায় প্রতি গৃহস্থ সংসারেই কোন চাকর চাকরাণী নাই। নারীরা নিজ হস্তে গৃহকার্য্য সম্পন্ন করেন। ঘর পেয়ারাদীর কাজ ছাড়া ইহারা দরিদ্র অনাথদিগের সাহায্যের জন্যও প্রত্যহ কিছু কিছু কার্য্য করিয়া থাকেন, তাঁহাদের অনেক ক্লাব বা সম্মিলন স্থান আছে। বিশেষ করিয়া ছাত্রীরা এইসব কার্য্যে এখানে সেখানে যাওয়া আসা লইয়া অত্যন্ত ব্যস্ত থাকে। তাঁহারা সামাজিক জীবনে মেলা মেশা অত্যন্ত ভালবাসেন। নিয়ম রক্ষা করিতে তাঁহারা সর্ব্বদাই প্রস্তুত এবং এজন্য সময়ও করিয়া লন। সকল সময়ই তাঁহাদের কার্য্যে লিপ্ত থাকিতে দেখা যায়—কোন সময়ই অলস কর্ম্মহীন অবস্থায় দেখিতে পাওয়া যায় না। ইহারা প্রায় সকলেই সুশিক্ষিতা, অন্যান্য দেশের নারীদিগের অপেক্ষা ইহারা উচ্চ জ্ঞানের অধিকারিণী। ইতিহাস, রাজনীতি, সাহিত্য বা কোনরূপ প্রশ্ন করিলে ইহারা অতি সহজ ভাবে বিশেষ না ভাবিয়া চিন্তিয়াই তাহার উত্তর দিতে পারেন। সর্ব্বদাই তাঁহাদিগকে অত্যন্ত সুখী ও আমন্দিত দেখা যায়। হাসিভরা মুখে সকল সময়েই ইহারা তোমার সম্মুখে উপস্থিত হইবেন,—ইহাদিগকে দেখিলেই আনন্দের প্রতিমূর্ত্তি বলিয়া মনে হয়—মনে হয় জীবনে যেন ইহারা কোন দুঃখ বেদনা ভোগ করেন নাই।

জার্মেন এবং অষ্ট্রীয়ান মহিলারা অত্যন্ত ধৈর্য্যশীল, মিতব্যয়ী এবং বাধ্য। টাকা পয়সা খরচ করিতে ইহারা অত্যন্ত সাবধান। জার্মেন নারীদের ভাল পোষাক বড় নাই। তাহারা নিজেদের ব্যবহারের জিনিস প্রায় নিজেরাই প্রস্তুত করিয়া লয়। বার্লীনে থাকা কালে এক গৃহস্থ সংসারে একটি সুন্দর চা পাত্র দেখিয়াছিলাম, পাত্রটি ঠিক একটি মেয়ে পোষাকে সজ্জিত পুতুলের মত। এই সুন্দর জিনিসটি দেখিয়া ভাবিলাম ইহা নিশ্চয়ই ঘরের তৈরী নয়, পরে শুনিলাম উহা ঘরের তৈরী।

অষ্ট্রীয়ান মহিলারা নিজেদের জীবিকা অর্জ্জনের জন্য ঘরে বেড়াল, কুকুর, এবং অন্যান্য প্রাণী তৈরী করে। তাহারা হাতের কাজও সুন্দর করিতে পারে। বিছানার চাদর, টেবিলক্লথ, জানালার পর্দ্দা এসবগুলিনিয়ে তাহারা সুন্দর তৈরী করে। সুবিধার দিন তাহারা পর্ব্বতে বা পল্লীতে সুবিধামত জিনিষ ক্রয় করিবার জন্য পিঠে ব্যাগ ঝুলাইয়া ভ্রমন করেন। তাহারা তাহাদের পিতামাতা ও স্বামীর আদেশ পালন করেন এবং বহু সন্তান পাইবার আকাঙ্খা করেন।

ফরাসী এবং বেলজীয়ান নারীরা বিলাসী বাবু এবং তরল চিত্ত। তাঁহারা অনেকেই এক চোখে চশমা লাগাইয়া চলেন, নানা ভঙ্গীতে ইহারা সেই চশমা চোখে লাগাইয়া জিনিস দেখিবার চেষ্টা করেন। আমেরিকার ছাত্রীরা যে ভাবে চশমা পরেন ইহারা সে ভাবে চশমা পরিতে ঘৃণা হন, কারণ তাঁহারা মনে করেন তাঁহাদের সৌন্দর্য্য মাটি হইয়া যাইবে।

প্যারীর মহিলারা ক্যাসান বড় ভালবাসেন। যখন কাহারও সঙ্গে সাক্ষাৎ হয় তখনি তাঁহারা ক্যাসানের আলাপ আলোচনা করেন। শিক্ষার চেয়ে ক্যাসানকেই তাহারা অধিক মূল্যবান মনে করেন। ফরাসী মহিলারা অত্যন্ত খরচে, তাঁহারা পোষাক পরিচ্ছদ, জুতা টুপি প্রভৃতি কিনিতে বহু অর্থ ব্যয় করিয়া থাকেন। এই সমস্ত বিলাস সামগ্রী ক্রয় করিয়া দু'একবার ব্যবহার করিয়াই ঘুরে নিক্ষেপ করেন। আমেরিকান মহিলারা ভাল জিনিসই চান, দু'দিন ব্যবহার করিতে না করিতেই নষ্ট হইয়া যাইবে এমন জিনিস তাহারা চাহেন না। ফরাসী নারীরা নাচ, বায়স্কোপ, পান, থিয়েটারের অত্যন্ত পক্ষপাতী। এমন কি বাড়ীর দাসীরা পর্য্যন্ত যে সংসারে কার্য্য করে তথায় রাত্রিকালে থাকিতে চাহে না।

আমেরিকান ও ইংরেজ মহিলাগণ পুরুষের সহ-সাথী হইবার সম্পূর্ণ উপযুক্ত, কারণ তাঁহারা বেশ উচ্চশিক্ষা পাইয়াছেন এবং পুরুষের ভাবে যথেষ্ট শিক্ষিতা হইয়াছেন। জার্মেন এবং অষ্ট্রীয়ান নারীরা বেশ সুগৃহী হইতে পারেন কারণ তাঁহারা সামঞ্জস্য রাখিয়া চলিতে জানেন এবং স্বামীর একান্ত বাধ্য। অপর একটি কারণেই ইহাদিগের স্থান অত্যন্ত উচ্চে কারণ ইহারা সুমাতা। বিবাহের পর ফরাসী ও বেলজিয়ান নারীদের অত্যন্ত পরিবর্ত্তন ঘটে।

আমেরিকান এবং ইংরেজ মহিলারা পদ্ম ফুলের মত ধব ধবে পবিত্র, তাঁহারা সমাজ ও সাধারণের জন্য সব ত্যাগ করিতে পারেন। অষ্ট্রীয়ান ও জার্মেন নারীরাও ফুলের কুলা, শরতের শেফালীর মত ইহাদের পুত্র, কন্যাগুলি দেখিলে সত্যই আনন্দ হয়, সংসারের সুখ বিধানের জন্য ইহারা যথেষ্ট আত্মত্যাগ করিতে পারেন। ফরাসীও বেল্জিয়মের নারীরা গোলাপ ফুলের মত, কারণ ইহারা তেমন ভাবে মনোহরণ করিতে পারেন, ক্যাসানের জন্য আপনাদের বলি পর্য্যন্ত দিতে পারেন। কিন্তু আমার মনে হয় ইহারা সকলেই সমাজের জন্য ও দেশের জন্য নিজের সর্ব্বস্ব বলি দিতেও বিন্দুমাত্র কুণ্ঠিত নহেন।

দ্বাদশ গোপাল

(শ্রীবিজয়রত্ন মজুমদার)

[পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর]

কিপ্রহস্তে সুইচটা টিপিয়া দিয়া, পাকল সিঁড়ির মুখে আসিয়া দাঁড়াইল, স্নিগ্ধকণ্ঠে বলিল—দাঁড়াও একটা কথা বলব।

বিমান নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল। কিন্তু ইহার আকস্মিক আত্মীয়বৎ ব্যবহারে সে যথেষ্ট বিস্মিত ও বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছিল। মুখে ও ব্যবহারে প্রকাশ করা চলে না, সে তাহার বক্তব্যটি শুনিবার আশায় চুপটি করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। পাকল নিকটে আসিয়া হাসিমুখে বলিল—কবে আসছ তা বল?

আর আসব না।

বটে!—বলিয়া সে হাসিয়া ফেলিল। হাসিতে হাসিতে ঈষৎ অগ্রসর হইয়া বিমানের সামনে আসিয়া বলিল—কেন আসবে না, কেন?

বিমান বলিতেছিল—দেখুন...

পাকল পরিহাসের সুরে বলিল—দেখ্‌ছি বৈ কি! কিন্তু আসবে না কেন তাই বল আগে? জাত যাবে?

না।

তবে? আচ্ছা থাক্ বলতে হ'বে না।—বলিয়া সে পথ ছাড়িয়া সরিয়া দাঁড়াইল। আবার কি ভাবিয়া ঠিক পূর্ব্বস্থানটিতে আসিয়া, হাসি-হাসি মুখে বলিল, সে—দিনও ত বলেছিলে, আসবে না।...বলেছিলে না?

তাহার হাসিতে বিমানের মুখ আরক্ত হইয়া উঠিল; একটা নিরাকরণ দুর্ব্বলতা ও লজ্জার চাপে পড়িয়া তাহার দেহ মন সঙ্কুচিত হইয়া গিয়াছিল কিন্তু সে মুহূর্ত্তের জন্য। বিমান তখনই আত্ম সংযমন করিয়া কহিল—ঐ কথাটাই আজ এসেছিলাম, নইলে এ বাড়ীর চৌকাঠ মাড়াবার আগে...

পাকল কথাটাকে শেষ করিতে দিল না, অকাল মুখে কঠিনস্বরে জিজ্ঞাসিল—কোন্ কথা?

বিমান বলিতে গেল, সেই যে সেদিন কার সঙ্গে—

পাকল বলিল, হুঁ...

বিমান পূর্ব্বের মতই বলিল নইলে...

অসীম অনুগ্রহ আপনার!

তীব্র কটাক্ষে সচকিত হইয়া বিমান একবার উদ্‌ভ্রান্তের মত পাকলের মুখের দিকে চাহিল। কি দেখিল কে জানে, আর একটি কথা উচ্চারণ করিবার সাধ্যও তাহার রহিল না, সে নতমস্তকে ক্ষুব্ধ একটি কথা বলিয়া নীচের সিঁড়িতে পা বাড়াইল—চল্লাম।

পাকল কথা কহিল না।

৭

সিঁড়ির দরজায় পাকল অনেকক্ষণ নিশ্চল প্রতিমূর্ত্তির মত দাঁড়াইয়া রহিল। সিঁড়ির যে ইট কয়টির উপর পা ফেলিয়া সেই লোকটা নির্লিপ্ত উদাসীনের মত এই যে চলিয়া গেল, সেই স্থানটির দিকে চাহিতে চাহিতে তাহার রমণীহৃদয়ের কোমলতা যেন ধীরে ধীরে নিঃশেষ হইয়া আসিতেছিল। তাহার মনে হইতে এই কিছুক্ষণ আগে ঐ প্রাণহীন ইটের সিঁড়ির উপর দিয়া কঠিন পায়ে যে প্রাণহীন লোকটা চলিয়া গেল, সে যেন সেই কঠিন পদস্পর্শের দায়েই তাহার বুকখানিকে দলিয়া চলিয়া গেছে। ইটের উপর জুতা শুদ্ধ সেই পায়ের দাগ পড়ে নাই, অচেতন ইটগুলি অতি সহজেই সেই দলন পীড়ন সহিয়াছে, সহিতে পারে নাই—সে-ই; পায়ের দাগ পড়িয়াছে—তাহার সুন্দর বুকখানির উপরে! কি নির্দ্দয়, নিষ্করুণ সেই দাগ-গুলি, কোথাও একতিল করুণা নাই, একবিন্দু কোমলতা নাই—কেবল ঘৃণা! অসহ, অসহ ঘৃণা আর উপেক্ষা! যে পায়ের শব্দ বহুক্ষণ হইল সুদূরে বিলীন হইয়া গেছে, অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত পাকলের বুকের স্পন্দনের তালে তালে সেই শব্দ প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল—কে-যেন তখনও বুকের মধ্যে চেঁকির পাড় দিতেছিল!

বৃদ্ধা একটি ক্ষুদ্র ডালার বাটি হাতে সিঁড়িতে উঠিতে উঠিতে বলিল—চলিয়ে, দিদি—

এনিহিল্?—বলিয়া সে চমকিয়া একটা চকিত দৃষ্টি ফেলিয়া সিঁড়িটা দেখিয়া লইল; বলিল—উপরে নিয়ে যা।—সে নিজেও উপরে উঠিয়া সেই সুসজ্জিত কক্ষটির মধ্যস্থলে আসিয়া দাঁড়াইল। কক্ষ প্রাচীর বিলম্বিত মুকুরগুলির মধ্যে নিজের চেহারা প্রতিবিম্বিত হইতে দেখিয়া পাকল যেন বড়ই আশ্চর্য্য হইয়া গেল—ধীর পা ফেলিয়া আস্তে আস্তে সে একখানা মুকুরের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইয়া,

বস্ত্রাঞ্চল তুলিয়া স্বেদসিক্ত মুখ খানি মুছিয়া, অবিন্যস্ত দু'একটি কেশের গুচ্ছ চম্পক সদৃশ দুইটি অঙ্গুলির দ্বারা সাজাইয়া স্নিগ্ধনেত্রে চাহিল। চাহিতে চাহিতে সেই স্নিগ্ধ দু'টি চক্ষে কি যেন কি একটা বিষাক্ত পদার্থ পড়ায় চোখ দুটা জ্বালা করিয়া উঠিল। সূক্ষ্ম শুভ্র বসনের একাংশ পুনরায় একটি অঙ্গুলে জড়াইয়া আর একবার সে চোখের চতুঃপার্শ্ব, নাসিকার প্রান্ত মুছিয়া ফেলিল—কিন্তু জ্বালা কমিল না, বরং বাড়িয়াই গেল।

তাহার কারণও ছিল। তাহার এই এত খানি বয়সের মধ্যে আজ যে বিস্ময়কর দৃশ্য সে দেখিয়াছে, যে কথা শুনিয়াছে, এমন সে আর কখনো দেখে নাই। অতি বাল্যকাল হইতে ঘরে-পরে তাহার সৌন্দর্য্যের প্রশংসাই শুনিয়াছে; বাল্যদোষে কৈশোরে সে যদি কোথাও গিয়াছে যে একবার তাহার মুখের দিকে চাহিয়াছে—আর সে চোখ ফিরাইয়া লইতে পারে নাই—এ যেমন সে নিজে বুঝিত, তাহার সঙ্গিনীরাও বুঝিত। তাহারাই অনেক সময় বুঝাইয়া দিত যে, মাগো লোকগুলো যেন কি! মেয়েটাকে খেতে আসে। তারপর সেই কৈশোরেই সেই রূপের সৌরভ তাহাদের ক্ষুদ্র পল্লী ছাপাইয়া অত বড় সহরটার কত স্থানে কত লোকের কাণে ছড়াইয়া পড়িল। দিন কতক এমনই অবস্থা তাহার গর্ভধারিণীর হইয়াছিল যে স্নানাহারের সময়টুকুও বেচারার মিলিত না। সৌন্দর্য্য সুধার লোভে কত শত লোকের যে আমদানি হইতে লাগিল তাহার আর স্থিরতা নাই। অতুলনীয় রূপের মূল্য যাহাতে সমুচিতরূপে আদায় হয়, মায়ের সে চেষ্টার বিন্দুমাত্র অন্যথা ছিল না। তখন পর্য্যন্ত কন্যা ছিল সম্পূর্ণ উদাসীন।

তারপর কৈশোরকে বিদায় দিয়া ধীরে ধীরে যৌবন আসিয়া দেখা দিল। তপ্ত কাঞ্চনের মত বর্ণটিকে নিজের রঙে মিশাইয়া অপূর্ব্ব করিয়া তুলিল, দেহের যেখানে যেটুকু অপূর্ণতা ছিল, পূর্ণমাত্রায় তাহা পূর্ণ করিয়া দিল—সেদিন পর্য্যন্ত প্রকৃতি তাহাকে যতখানি সুষমা দান করিয়াছিল, সকলই সার্থক হইয়া উঠিল।

যৌবন অকুণ্ঠ হস্তে তাহাকে দান করে নাই, যতখানি পারিয়াছিল, যতটুকু সম্ভব—সব দিয়াছিল এবং সেই যৌবনই অতি ধীরে তাহার কাণে কাণে বলিয়া দিয়াছিল, মাথা তুলিয়া তাহার সামনে দাঁড়াইতে পারে এমন পুরুষ জন্মে নাই।—এ কথাটা বাস্তবিক কেহ তাহাকে বলিয়াছিল কি না, অথবা কোনদিন সুপ্তাবস্থায় স্বপ্নে শুনিতে পায়, তাহার ঠিক নাই কিন্তু যেদিনই যৌবন তাহাকে তাহার শেষ সম্পদগুলি দিয়া অন্তরালে অবস্থান করিতে লাগিল, সেইদিন সেই মুহূর্ত্ত হইতেই ঐ পুরুষজাতির পরাজয়ের চিত্রটা পারুল স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিতে লাগিল।

কোন্ দেবতার বরে এত বড় কর্কশ, শক্তিমান পুরুষজাতি রমণীর পদতলে অসহায় আর্ত্তের মত লুটাইয়া পড়িয়া সর্ব্বস্ব অর্পণ করিয়া নিঃস্ব হইয়া যায়—এ সমস্যার সমাধান আজ পর্য্যন্ত কেহই করিতে পারে নাই বলিয়াই পারুল শুনিয়াছিল। জ্ঞান বিজ্ঞানের কোন বহি পড়িয়া নয়, এই সমস্যাটা সেই পুরুষজাতিরই অনেকে তাহার সম্মুখে উত্থাপিত করিয়া বাতাহত কদলীবৃক্ষের মত আছড়াইয়া পড়িয়া পারুলের করুণা চাহিত, বলিত—রক্ষা কর, রক্ষা কর, আমি মরি!—পারুল অতি সহজেই এই সমস্যার মীমাংসা করিয়া ফেলিয়াছিল, আততায়ী আর কেহ নহে—যৌবন! যৌবন! যৌবন! আর যে সে যৌবন, যার তার যৌবন নয়, নারীর যৌবন!

যৌবন নদীটার পরিপূর্ণ বক্ষের উপর দিয়া যে তরণী খানি এতদিন পর্য্যন্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তরঙ্গগুলিকে আঘাতিত ও ভঙ্গ করিয়া তর তর শব্দে আপনার সৌরবে, আপনার পথ বহিয়া চলিয়া আসিয়াছিল, কোন বাধা, কোন বিঘ্নই এত দিন তাহার গমন পথে এতটুকুও অনুভব করিতে পারে নাই—আজই প্রথম এমন এক শিলাখণ্ডে তাহার সংঘাত হইয়াছে যে তরণী ভাঙ্গিয়া চুরিয়া, কাপায় কাপায় তাহার বারি উঠিয়া পড়িয়াছে। আজ সকল গর্ব্ব চূর্ণ হইয়া গেছে, আজ সেই চিরন্তন সত্যকে আমূল মিথ্যা করিয়া দিয়া সেই চির পুরাতন জাতিরই একজন তাহাকে বলিয়া গিয়াছে। তাহার তীব্র তিক্ত উপেক্ষার পদতলে পড়িয়া তাহার এই বাইশ-বছরের যৌবন কাঁদিয়া মরিয়াছে!

পারুলের চক্ষু জ্বলিয়া উঠিয়াছিল। জ্বলিতে জ্বলিতে কখন্ নয়নপ্রান্ত ভিজিয়া গেছে, কখন সব জ্বালা শীতল করিতে আপনিই জল আসিয়া কোল দু'টি ভরাইয়া ফেলিয়াছে, তাহা সে জানিতেই পারে নাই, হঠাৎ এক ফোঁটা জল তাহার শুভ্র হাত খানার উপর ঝরিয়া পড়িতেই আশ্চর্য্য হইয়া চাহিয়া দেখিল-একি! এ-যে জল।

হায় নারী। কোথায় গেল যৌবন গর্ব্ব! কোথায়

যহিল যৌবনের তেজ। যে যৌবনের অনায়াস বলে বলবান পুরুষজাতিকেও আপন করলে আনিতে পারিয়া কত সুখই না পাইয়াছিলে—আজ কোথায় রহিল সেই যৌবন! তবুও দুঃখ এই যে ঐ মুকুর সেই যৌবনের ছাপই বুকে লইয়া তেমনই স্থির ধীর ভাবে দাঁড়াইয়া আছে। আজ যৌবন তাহার সহিত প্রতারণা করিয়াছে, যে দেবতার বরে এতদিন যৌবন-গর্ব্ব তাহার হিমালয়ের মতই উচ্চশির করিয়া রাখিয়াছিল, আজ সে দেবতার বর নিষ্ফল হইয়া গেছে, পরিপূর্ণ যৌবনকে উপহাস করিয়া উপেক্ষা করিয়া চলিয়া গেছে—কেবল ঐ দর্পনটাই এখনো সেই অতীতের মূর্ত্তিটাই আঁকড়াইয়া ধরিয়া আছে! এতদিন সম্বরে-অসম্বরে দর্পনগুলিই ছিল তার সব সময়ের বিশ্বাসী ও অনুক্ষণের সঙ্গী—আজ মনে হইল—তবে কি চিরদিনই ওগুলা তাহাকে প্রতারণা করিয়া আসিয়াছে? এতদিন সে ঐ আর্শির গায়ে যে চেহারা দেখিয়া নিজেই বিভোল নেত্রে, অপলক দৃষ্টিতে চাহিয়া চাহিয়া বিভোর হইয়া গেছে—সে কি সত্যই তাহার স্বরূপ নয়?

কিন্তু এ-কথাও বিশ্বাস করা শক্ত। আজ পর্য্যন্ত যাহারা আসিয়াছে, তাহারাও ত মুকুরের ভাব ও ভাষার সমর্থন করিয়াছে। কৈ কোনদিন ত কেহ এমন কথা বলে নাই যে—এযাত্রীর চৌকাঠে বাড়ানো পাপ; পারুলের মুখ দেখা পাপ; তাহার সঙ্গে বাক্যালাপ করা আরো পাপ!

হঠাৎ মনে হইল, তবে কি আজিকার আগে কোন পুরুষই তাহার কাছে আসে নাই? অথবা যদিও আসিয়া থাকে, পুরুষত্বের গর্ব্ব তাহাদের ছিল না, পুরুষত্ব-বর্জ্জিত অন্ধ ইন্দ্রিয় দাসগুলি যৌবন লোলুপের মত আসিয়াছে, গিয়াছে: সত্যিকারের পুরুষ আর আসে নাই কি?—এ কথাই বা সে বিশ্বাস করে কেমন করিয়া? কিন্তু বিশ্বাস না করিয়াই বা উপায় কি? কে যেন হৃদয়কন্দরে থাকিয়া অতলগভীর স্বরে তাহাকে সতর্ক করিতেছিল, কেমন, গর্ব্ব টুটিয়াছে ত! পুরুষের কাছে নারীর গর্ব্ব!—কে-জানে কে এই কথা বলিয়া তাহাকে ভয় দেখাইতেছিল, পারুল কিন্তু তাহার কথা না শুনিয়া পারিল না; পাছে সেই অদৃশ্য বক্তার কথাগুলি সে স্পষ্ট শুনিতে না পায়, সহসা দ্বারটি বন্ধ করিয়া দিয়া, আলো নিবাইয়া সে বালিশের উপর মাথা দিয়া শুইয়া পড়িয়া ভাবিতে লাগিল—এই পুরুষ! সত্যিকারের পুরুষ! রূপের আকর্ষণ নাই; যৌবনের আসক্তিহীন—সেই লোক, যাহার নাম জানে না, ধাম অজ্ঞাত—সেই পুরুষ! একমাত্র পুরুষ, আজই প্রথম তাহার দৃষ্টি গোচর হইল! আশ্চর্য্য ত!

(ক্রমশঃ)

লাউসেন

দ্বিতীয় খণ্ড—লাউসেনের জন্ম

(শ্রীশিবরতন মিত্র)

পঞ্চম অধ্যায়

রঞ্জাবতী—পূর্ব্বকথা।

স্বর্গে, দেবরাজ ইন্দ্রের সভায় যাবতীয় দেবতাবৃন্দ সমাগত হইয়াছেন। ছয় রাগ ছত্রিশ রাগিণীর সুমধুর ঝঙ্কারে, সভাগৃহ মুখরিত হইতেছে। প্রফুল্ল মন্দার কুসুমের গন্ধ-মদিরা চারিদিক্ প্রমত্ত করিয়া তুলিতেছে। সকলেই, উল্লসিত মনে, দেব-নর্ত্তকীর 'তাণ্ডব'-নৃত্য দেখিবার জন্য, সাগ্রহে প্রতীক্ষা করিতেছেন। কিন্তু, এখনও কোন নর্ত্তকী সভাগৃহে প্রবেশ করিল না!

দেবরাজ তখন তাড়াতাড়ি, অন্যতমা প্রধানা নর্ত্তী অম্বুবতীকে, সত্বর সভাগৃহে উপস্থিত হইয়া, তান লয় সুসঙ্গত সুমধুর নৃত্য দ্বারা, সমাগত দেবতাবৃন্দের তুষ্টি-বিধান করিতে, আদেশ প্রদান করিলেন। অম্বুবতী, হঠাৎ দেব সভায় উপস্থিত হইবার আদেশ প্রাপ্ত হইয়া, বেশ-বিন্যাসে প্রবৃত্ত হইল।

বেশ-রচনার পূর্ব্বে অম্বুবতী, সুরতরঙ্গিণী মন্দাকিনী জলে স্নান করিয়া, পূর্ণ-যৌবনের গর্ব্বোল্লাসে, ক্ষিপ্র অথচ গজেন্দ্র গতিতে বাটী প্রত্যাগমন করিতেছে। এমন সময় দেখিল, এক অতি বৃদ্ধা স্নান-ঘাটের রাস্তা আগলিয়া বসিয়া আছে। বৃদ্ধা অতি জীর্ণা—তাহার সমস্ত কেশ রাশি ও পরিধানের বস্ত্র একবারে নিষ্কলঙ্ক শুভ্রবর্ণ—তাহার হাতে নড়ী—কক্ষে ঝুড়ি। তাহার উপর

যেন অন্নাভাবে শুষ্ক—বদন একবারে রক্তহীন। জরাগ্রস্ত হইলেও, অঙ্গে যেন এখনও তাহার সুবর্ণকান্তি ফুটিয়া উঠিয়াছে। বৃদ্ধা পদদ্বয় প্রসারিত করিয়া সর্ব্বদাই কাঁদিতেছে।

ইন্দ্রের সভার প্রধানা নর্ত্তকী—তার যৌবনোন্মত্তা—রূপের গরবে ঢল ঢল করিতেছে। এখন আবার স্বয়ং দেব-সভায় উপস্থিত হইবার জন্য আহ্বান আসিয়াছে। সুতরাং, অম্বুবতী উন্মনা হইয়া, ত্বরিত গতিতে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছে। পথিমধ্যে বৃদ্ধা কর্ত্তৃক বাধা প্রাপ্ত হইলে অতিশয় চঞ্চল ও বিরক্ত হইয়া বৃদ্ধাকে লক্ষ্য করিয়া বলিল—'বুড়ি পথ ছাড়, আমার নৃত্য দেখিবার জন্য, সমস্ত দেবতাবৃন্দ অপেক্ষা করিতেছেন।' বুড়ি বলিল—'বেটি, তুই এত ঠেঁটা কেন? রূপ যৌবনের গরবে যে চো'খে দেখিস্ না!—এ গরব কতদিন? মন্দাকিনীর ঘাটে, এত লোক স্নান করে চলে যাচ্ছে,—তুই আর রাস্তা খুঁজে পাচ্ছিস্ না?'

অম্বুবতী, বুড়ির এই কথা শুনিয়া, রাগে জ্বলিয়া উঠিল, বলিল—'রাক্ষসী, আর কতদিন বাঁচবি, যে তুই অত জোরে কথা ক'স্। তুই এইখানে মর—আমি তোর সঙ্গে ঝগড়া করিয়া সময় নষ্ট করিতে পারি না' এই কথা বলিয়া, অম্বুবতী বুড়ির গায়ে পা' মাড়াইয়া, জল ছিটাইয়া গরব ভরে চলিয়া গেল। বুড়ি, তখন অম্বুবতীকে লক্ষ্য করিয়া অভিসম্পাত দিল—'বেটি, তুই যেমন আমার গায়ে পায়ের জল দিলি, এই পাপে তুই স্বর্গচ্যুত হয়ে মর্ত্তে মানবী হবি। তুই যে তান লয়ের জ্ঞান গৌরব নিয়ে দেব সভায় নৃত্য করতে যাচ্ছিস্, তোর সেই গরব চূর্ণ হবে—তোর তান তাল ভঙ্গ হবে—তখন দেবতার অভিসম্পাতে তুই মর্ত্তে মানবী হয়ে জন্মাবি। আমায় যেমন তুই বুড়ি বলে উপহাস করি আমি অভিসম্পাত দিচ্ছি, তোকে তেমনি বারমাস বুড়া স্বামীর সেবা করতে হবে। তবে, তুই এক জন্ম মরে পুত্রমুখ দর্শন করতে পাবি'। এই কথা বলিয়া বৃদ্ধা অদৃশ্য হইয়া গেল।

অম্বুবতী, বৃদ্ধার অভিসম্পাত বাণী শেষ হইবামাত্র তাহাকে অদৃশ্য হইতে দেখিয়া, অতিশয় চঞ্চল হইয়া উঠিল। নানারূপ অনর্থ আশঙ্কা করিয়া, অম্বুবতী উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিতে লাগিল। তাহার সহচরীবৃন্দ, তাহাকে নানারূপ বুঝাইয়া, কান্ত করিল। দেব সভায় দেবতাবৃন্দ তাহার প্রতীক্ষায় বসিয়া আছেন, এমন সময়ে বৃথা অনুশোচনায় কালক্ষেপ করা অনুচিত ভাবিয়া অম্বুবতী তাড়াতাড়ি গৃহপ্রত্যাগমন করিল এবং বিবিধ বেশভূষায় সুসজ্জিত হইয়া দেবসভায় উপস্থিত হইল।

বীণানিন্দিত কণ্ঠে, বিবিধ মূর্চ্ছনা সংযোগে সঙ্গীত নানারূপ বিলাসভাবের সহিত তাল লয় সুসঙ্গত নৃত্য দ্বারা অম্বুবতী দেবসভাকে মন্ত্রমুগ্ধ করিয়া ফেলিল। তাঁহারা অন্তমনে অম্বুবতীর অপূর্ব্ব সঙ্গীত ও নৃত্য উপভোগ করিতেছেন—অম্বুবতীও, আজ মন প্রাণ ঢালিয়া দিয়া নৃত্যাভিনয়ে প্রমত্তা হইয়া উঠিয়াছে। যখন অতীত হইলে পর, নৃত্য করিতে করিতে অম্বুবতীর চরণগতি অসংযত হইয়া গেল—কলাপটিয়সীর তাল ভঙ্গ হইল। অম্বুবতী তদ্দণ্ডেই নৃত্য বন্ধ করিয়া লজ্জা, ঘৃণা ও মনস্তাপে মৃতপ্রায় হইয়া অধোমুখে একান্তে উপবেশন করিল।

কিয়ৎক্ষণ আত্ম-সম্বরণ করিয়া, অম্বুবতী গলদশ্রীকৃতবাস হইয়া করযোড়ে বলিল—আপনাদের কিছুই অগোচর নাই—আমার পাপ পুণ্য আপনারা সকলেই অবগত আছেন। আমি এতকাল দেবসভায় নৃত্যাভিনয় করিতেছি কখনও তাল ভঙ্গ হয় নাই। কিন্তু আজ আমি তাল ভঙ্গ হইয়া, আপনাদের নিকট যে অপরাধী হইলাম, তাহার কারণ নিবেদন করিলেই, আমি অপরাধী কি না প্রতীয়মান হইবে। সভায় আসিবার পূর্ব্বে স্নান করিয়া প্রত্যাগমনের সময় দেখিলাম বৃদ্ধ ব্রাহ্মণী, ঘাটের পথ আগলিয়া বসিয়া আছে। আমি তাড়াতাড়ি আসিবার কালে তাহাকে অবহেলা করিয়াছিলাম; তজ্জন্য সে আমায় অভিসম্পাত প্রদান করিয়াছে 'মর্ত্তে মানবী হইয়া জন্মগ্রহণ কর এক জন্ম মরিলে পুত্র মুখ দর্শন করিবে'—বুঝি বা এই অভিসম্পাত সঙ্গে সঙ্গে ফলিল। ধর্ম্মরাজ! আপনি রক্ষা করুন, আপনি ভিন্ন আমায় আর কে রক্ষা করিবে—এই বলিয়া অম্বুবতী ধড়াগড়ি দিয়া কাঁদিতে লাগিল।

ধর্ম্মরাজ বলিলেন—'বৃদ্ধা সামান্যা ব্রাহ্মণী নহেন। তিনি স্বয়ং ঈশ্বরী—শিবজায়া ভবানী। তিনি আমার অভিপ্রায় মতই তোমায় অভিসম্পাত করিয়াছেন। তুমি অবিলম্বে, তাঁহার নিকট গিয়া তাঁহাকে স্তব স্তুতি দ্বারা প্রসন্ন কর। তাহা হইলে ভবিষ্যতে এই অভিসম্পাত হইতে অব্যাহতি পাইবে।

ধর্ম্মরাজের উপদেশ শুনিয়া, অম্বুবতী আনুথালু বেশে কান্দিতে কান্দিতে কৈলাস-ভবনে গিয়া উপস্থিত হইল। অভিসম্পাতে অম্বুবতীর সুবর্ণকান্তি মসীমলিন হইয়া গিয়াছে—সে করযোড়ে, নানাবিধ স্তবস্তুতি দ্বারা মহামায়া ভবানীর প্রসন্নতা লাভ করিল। ভবানী তখন অম্বুবতীকে বলিলেন—'দুঃখ করিয়া কি করিবে? এ সকল দৈবের কাজ—ইহা অতিক্রম করিবার কাহারও সাধ্য নাই—আমি যাহা বলিয়াছি তাহা পাষাণে লেখার ন্যায়, সহজে বিলুপ্ত হইবার নহে। তবে তুমি নিরাশ হইও না—পরিণামে সকলেই পরিত্রাণ পাইয়াছে; তুমিও পাইবে। ধর্ম্ম-পূজা প্রকাশিত করিবার জন্য তোমায় মর্ত্তে যাইতেই হইবে। যেখানে গিয়া তুমি গৌড়ে রমতি নগরে বেহুরায়ের ঔরসে ও মন্বরার গর্ভে জন্মগ্রহণ করিবে; তোমার নাম হইবে—রঞ্জাবতী, মূর্ত্তিমন্ত কলি মহামন্ত্র পাত্র, তোমার ভ্রাতারূপে জন্মগ্রহণ করিবে: কপলেন তোমার পতি হইবেন। তুমি চম্পানগরে শালে ভর দিয়া তপস্যা করিলে, কমল-তনয়কে পুত্ররূপে প্রাপ্ত হইবে। বেলা দুই প্রহরের সময়, তোমার পুত্র হাবন্ধ নামক স্থানে ধর্ম্মপূজার জন্য আপন শরীরকে নয় খণ্ডে কাটিয়া ফেলিবে—তাহার তপস্যা প্রভাবে—পশ্চিম দিকে সূর্য্যোদয় হইবে।'

ভবানীর বাক্য শেষ হইবামাত্র, স্বর্গের অপ্সরা অম্বুবতী দেহত্যাগ করিল এবং মর্ত্তে রমতি নগরে বেহুরায়ের পত্নী মন্বরার গর্ভে আশ্রয় গ্রহণ করিল। যথাকালে ভূমিষ্ঠা হইয়া নবজাত কন্যা সকলের চিত্তরঞ্জন করিল—এই নিমিত্ত বেহুরায়, আদর করিয়া তাহার নাম রাখিল—রঞ্জাবতী।

(ক্রমশঃ)

পেগের বড়াই।

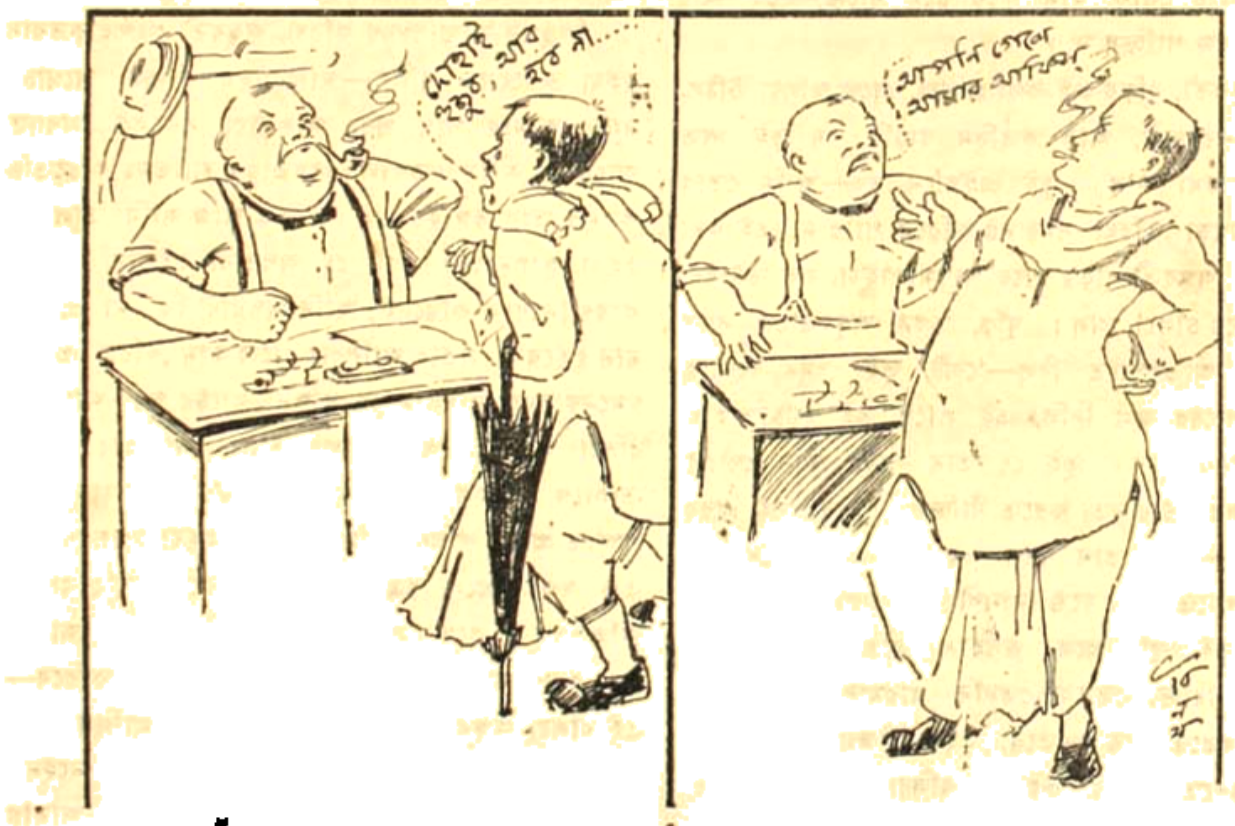

যাহা ঘটিয়াছিল।

সাহেব। রোজ তোমার দেরী হয়। তুমি দূর হও...

ভয়ার্ত্ত কেরাণীবাবু। দোহাই হুজুর, আর হবে না, আপনার পায়ে ধরছি...

যাহা ঘটিয়াছে বলিয়া বর্ণিত হইল।

বাবু। বজ্জাত ব্যাটাকে, নিকুচি করেছে তোমার আফিসের। আর আমি থাকব না তোমার আফিসে। শুনে ই ঠক্ ঠক্ করে কাঁপতে কাঁপতে বল্লে, আপনি গেলে আমার আফিস কাণা হয়ে

দেশ-বিদেশ

ব্রিটেনের দেনা। আমেরিকার কাছে বিগত যুদ্ধের সময় ইংলণ্ডের ১২৭৫০০০০০০৲ দেনা আছে। আমেরিকা দেনা পরিশোধের তাগাদা দেওয়ায় ইংরেজ আমার মিত্রশক্তির কাছে তাহার প্রাপ্য মিটাইবার চিঠি দিয়াছে। মিত্র-শক্তির নিকট ১৬৪৭০০০০০০৲ টাকা ইংরেজের পাওনা।

• • • •

ষ্টেলিকোঁর আবিষ্কর্ত্তা ডোকার গ্রেহাম বেল সম্প্রতি দেহ রক্ষা করিয়াছেন।

গ্রেহাম বেল্।

লর্ড নর্থ ক্লিফের বাঁচিবার সম্ভাবনা অতি অল্প। দিনে দিনে তিনি মৃত্যুর দিকে অগ্রসর হইতেছেন।

• • • •

একটি সন্তের বয়সের বোবা-কালা মেয়ে স্পর্শ অনুভূতির দ্বারা দেখতে শুনতে পাচ্ছে। খবরের কাগজের লাইন গুলির উপর আঙুল বুলিয়ে বুলিয়ে সে বিদ্যি পড়ে যায়। কার কথা শুনবার জন্যে সে আর একটি উপায় বার করে ফেলেছে। যে তার সঙ্গে কথা কইতে আসে, মেয়েটি বক্তার গালে হাত দিয়ে বেশ বুঝতে পারে—সে কি বলছে। গন্ধ শুঁকে সে জিনিষের রঙ ও বলে দিচ্ছে।

চীন দেশের সাংহাতে ভীষণ ঘূর্ণি ঝড় হইয়া গিয়াছে। প্রায় আটশ হাজার লোক হত ও কয়েকখানি জাহাজ বন্দরে প্রাপ্ত হইয়াছে। ফিলাডেলফিয়ার জ্যোতিষী ৩০ দিনের মধ্যে আসিয়া জগতের সম্ভাবণা জানাইয়াছিলেন, এ কি তারই পূর্ব্বাভাষ?

• • • •

কলিকাতা সহরের মৃত্যু সংখ্যা দিন দিন বাড়িয়া চলিতেছে। জন্মের সংখ্যা যত, মৃত্যু তাহার চেয়ে প্রায় শতকরা ৫০টি বেশী। অনেকে সন্দেহ করিয়াছেন মফঃস্বল হইতে যে সকল রোগী চিকিৎসার্থে সহরে আসেন, তাঁহারাই সহরের মৃত্যু সংখ্যার হার বাড়াইতেছেন! বাস্তবিক ইহাই কি ঠিক?

গত ২৯শে জুলাইয়ে যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে, কলিকাতায় সেই সপ্তাহে ৪৭৫ জন লোক মরিয়াছে; ইহার পূর্ব্ব পূর্ব্ব সপ্তাহে ৪২৭ ও ৪৪১ জন লোক মৃত্যুমুখে পতিত হয়। পাঁচ বৎসরের গড় পড়তা হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে মৃত্যু সংখ্যা ক্রমশঃই বাড়িয়া চলিতেছে।

• • • •

বড়বাজারে পিকেটিং চলিতেছে। ধড়পাকড়ও বন্ধ নাই। তবে বিচারক এখন ধমক ধামক দিয়া পিকেটারদের ছাড়িয়া দিতেছেন—ফিরিঙ্গি কাগজ এক-আধখানা এ পথের ম্যাজিষ্ট্রেটের মাথা হাতে কাটিবে, বলিতেছে।

• • • •

আর্ল উইনটার্টন আগামী মাসে আকাশ উড়িবেন। উড়িয়া ভারতে আসিবেন। যদিও এই আগমন রাজ্য-সংক্রান্ত নহে তবে তিনি যে আসিয়া কতকগুলি অত্যাবশ্যকীয় কার্য্য করিবেনই—তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই।

• •

রেলওয়ে কোম্পানীর আয় :—

২২শে হইতে ২৮শে জুলাই ১৯২২ এবং
গত বৎসরের ঐ সপ্তাহের আয়

ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলওয়ে	২৮০০৮০	
	৫৭১০০২২	
ইষ্টার্ণ বেঙ্গল রেলওয়ে	৭৮০১৩	
	৯৭৪০২৯	
বেঙ্গল নাগপুর রেলওয়ে	১৯৩৫০০০	
	২৪৮০০০	

বিলাতে বন্যা। ইংলণ্ডের বন্যা ও উত্তর বিভাগের ৬-৭টি রেলা ভীষণ বন্যায় ডুবিয়া গিয়াছে; বহু গ্রামে বহু প্রাণী অতি কষ্টে মৃত্যুমুখ হইতে রক্ষা পাইয়াছে।

বর্ম্মার নূতন লাট:—সার হাজেকোট বটলার বর্ম্মার নূতন লাট হইলেন।

আইন সম্বন্ধে ভারত কমিটির মাননীয় সভ্যগণ শুক্রবার ১১ই আগষ্ট কলিকাতায় আসিয়া সেইদিনই সভার কার্য্য আরম্ভ করিবেন স্থির আছে।

মিঃ চিতরঞ্জন দোস্ত ও তাঁর ভগিনী মিস এলিজাবেথ দত্ত ও তাঁর দুই ভগ্নীকে বিবাহ করেছেন।

"বেণের চাক" প্রণেতা নরেন্দ্রনারায়ণ চক্রবর্ত্তী ১৮ মাস সশ্রম কারাবাসের আদেশ হয়েছে। নরেন্দ্রনারায়ণ ম্যাজিষ্ট্রেটকে ধন্যবাদ দিয়ে কারাকক্ষে প্রবেশ করেন।

খিলাফৎ ও আইন অমান্য তদন্ত সমিতি।

বামদিকের চিত্র।

(দণ্ডায়মান বামদিক হইতে) আসফক্ আলি, বারিষ্টার আলি, মহম্মদ মোয়াজ্জাম। (উপবিষ্ট) মোয়াজ্জাম আলি, টি, এ, কে, সারওয়ানী ও জহুর আহম্মদ।

দক্ষিণদিকের চিত্র।

(দণ্ডায়মান বামদিক হইতে) এম-এ, বারিষ্টার, সি. রাজা গোপালাচারি, এম-এ আনসারি, এইচ, এম, হাবাৎ, লালজী নেরহোত্রা। (উপবিষ্ট) ভি, জে, প্যাটেল, হাকিম আজমল খাঁ, পণ্ডিত মতিলাল ও এস্ কস্তুরিরঙ্গ আয়াঙ্গার।

বন্যা। বন্যা! বন্যা! আর কথা নাই! চারিদিক হইতে কেবল বন্যার খবরই আসিতেছে। বাঙ্গালায় ভীষণ বন্যা—একদানার কুটীর জলে ডুবিয়াছে, একদানের কুটীরের অধিবাসী, কত বালক, কত বৃদ্ধ, কত যাত্রা, কত শিশু মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে!

আসামের ভীষণ বন্যা! শিলংপাহাড়ের বন্যা, বর্ম্মার ভীষণ বন্যা! দেখে বন্যার খবর ছাড়া আর খবর নাই।

পেশু মার্কিনের রেলের একখানি ফ্রিম্বস ট্রেণ বড়ে উল্টাইয়া যাওয়ায় বহু লোক আহত ও ৩ জন হত হইয়াছে।

ইংলিশম্যানের 'Wild Politician' মিঃ গ্রাণ্ট মহাত্মা গন্ধীর প্রশংসা করিয়াছেন ও বলিয়াছেন অসির মুখে রাজভক্তি আদায় করা যায় না—তাহাকে শাসন করিতে হইলে লোকমতের উপরই সে শাসনের ভিত্তি স্থাপন করিতে হইবে। তাঁহার—একদলে কলার ছীতি ইউরোপীয় জাতির মধ্যে প্রচলিত নাই, সেইজন্য গ্রাণ্ট সাহেবের খোলা আপিত্ত খণ্ড করিতে সাধারণ পাঠকের মাথাব্যথার একটুও বিশেষ করিবে না।

খত ৩১শে জুলাই হইতে তিব্বতের সাদা সহরের সহিত ভারতের তারযোগে বার্ত্তা প্রেরণের ব্যবস্থা হইয়াছে। এখন হইতে টেলিগ্রাফে তিব্বত ও ভারতের মধ্যে খবরের আদান প্রদান চলিবে।

আচার্য্য রমণের ভাগ্নি বাণী:—এরোপ্লেনে ভ্রমণ মাইল চলিবার এই বালীকে যে-এইচ মেসন বলী হইয়াছেন। ৩৭ মিনিটে ইনি বায়ুপথে ভ্রমণ মাইল গিয়াছিলেন।

আমেরিকাতে রেল কর্ম্মচারীদিগের মোট ধর্ম্মঘট চলিতেছে। প্রেসিডেণ্ট হার্ডিং নিজে একটা মিটমাটের ব্যবস্থা করিতেছেন।

লিলুয়ার সহরে পয়ঃপ্রণালী সম্বন্ধে নূতন আইন হওয়ায় এবং পাছে ম্যালেরিয়া পুনঃ আক্রমণ বৃদ্ধি পাওয়ায় লোকজন সব মাটি-ফট করিয়া রোজার পাট বন্ধ করিয়া দিয়াছে, ব্যবসায় বাণিজ্য সব বন্ধ। কর্তৃপক্ষ শান্তি রক্ষা করিবার ব্যবস্থা করিতেছেন।

কলিকাতা সহরে ওলার উপদ্রব অত্যন্ত বাড়িয়া গিয়াছে। তাই বাঙ্গালা সরকার সহর হইতে ওলা বহিষ্কারের জন্য স্থির করিয়াছেন যে এইটা নূতন ব্যবস্থা করিবেন।

কলিকাতার সকল প্রদেশেই এবার শস্য ভাল হওয়ার সংবাদ পাওয়া যাইতেছে। কলিকাতার জীবন দুর্ভিক্ষ এইবার বোধ হয় উপশম হইবে।

ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলওয়ে ও ইষ্টার্ণ বেঙ্গল রেলওয়ে 'ওয়াচ এণ্ড ওয়ার্ড' ডিপার্টমেণ্ট নামে একটি নূতন বিভাগ খুলিয়াছেন। রেলে মাল একস্থান হইতে অন্যস্থানে যাইতে দেরীর চুরী হয়, এই চুরী নিবারণের জন্য এ বিভাগ খোলা হইল। এ বিভাগ একজন ডেপুটী-ইন্সপেক্টর রেলওয়েলের হাতে থাকিবে, তাঁহার অধীনে, ইন্সপেক্টর, সব-ইন্সপেক্টর, হেডকিয়ার প্রভৃতি থাকিবে।

পৃথিবীতে ইংরেজ জাতিকে সবার অধিক টেক্স দিতে হয়। মাথা পিছু মুটেক্স রেট, ৫০০৲ ফ্রান্স ১০০৲ আমেরিকা ১০০৲ জার্মেণী ৮৫৲

সমবেত সেবক সুভাষচন্দ্র ৬মাস কারাবাসের পর মুক্তি পাইয়াছেন। শুনা, তিনি একখানি নূতন সৈনিক সংবাদপত্র সম্পাদনা করিবেন।

শ্রীযুক্ত শালবনও কারামুক্ত হইয়াছেন। মুক্তির সময় তাঁহার ওজন ১০৪ পাউণ্ড ছিল।

শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন দাস বলিয়াছেন, তিনি প্র্যাক্টীস্ করিবেন এরূপ কল্পনা করাও হাস্যকর। টেলিগ্রাফ সাহেব কি বলেন?

নিভৃতে-আলাপ।

Lakshmibilas Press, Calcutta.

সচিত্র সাপ্তাহিক

বাসন্তী

১ম বর্ষ] ২রা ভাদ্র শনিবার, ১৩২৯ ইং ১৯শে আগষ্ট। [৭ম সংখ্যা

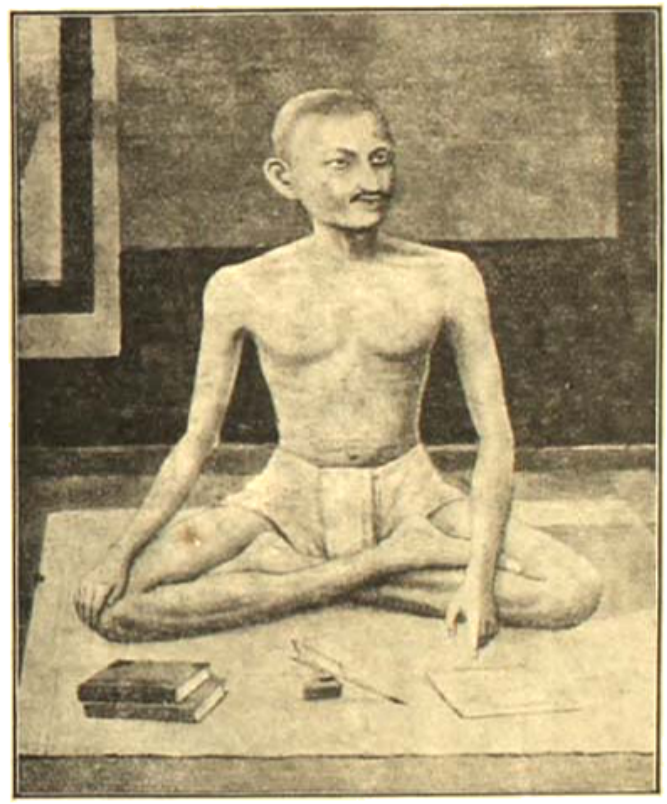

যুগাবতার মহাপুরুষ মহাত্মা গান্ধী। দেশ বিদেশের বহু লোকে ইঁহাকেই বর্ত্তমান জগতের শ্রেষ্ঠ পুরুষ আখ্যা দিয়া থাকেন। জ্ঞান, কর্ম্ম ও ভক্তির সংযোগে পাশ্চাত্য জয় করিয়া আসিয়া মহাত্মা নিজ জন্মভূমি ভারতে এই ত্রয়ীর সম্মিলন ঘটাইতে গিয়া আজ দেশের কারাকক্ষে বন্দী অবস্থায় রহিয়াছেন। দশ দীর্ঘ ছয় বৎসর—পাঁচ মাস তাহার অতীত হইয়া গেল। আরো কতদিন—কতমাস —কত দীর্ঘ বৎসর চলিয়া যাইবে - ভারতের শ্রেষ্ঠ সন্তান জগতের শ্রেষ্ঠ পুরুষ মহাত্মা দেশের কারায় বন্দী রহিবেন কে জানে? আপনার গৌরব-মান আপনি এমন ভাবে কারা-বন্দী করিয়া রাখিয়া ভারত আর কত কাল নিজ মস্তক ধূলায় লুণ্ঠিত রাখিবে?—যাহার জিনিস তাহার বোধ নাই—এ আত্ম বোধ তাহার কে আনিয়া দিবে?—মহাত্মার মুক্তি বাণী—'পরবশতা বর্জ্জন কর, আত্ম-ক্ষমতা জাগাইয়া তোল।' ভারতবাসী কবে মহাত্মার এ বাণী সার্থক করিবে কে জানে?

বিশ্রাম-সময়ে।

(আলোক-চিত্র হইতে)

ভারত গৌরব দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের কারামুক্তি উপলক্ষে দেশের সকলেই তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিতেছে। দেশবাসী আজ চলিবার গতি ও বলিবার ভাষা হারাইয়া অবসন্ন ও ম্রিয়মান। মহাত্মার অনুপ্রেরণায় দেশ আজ প্রাণের প্রেরণা পাইয়াছে—প্রাণশক্তিকে জাগাইয়া রাখিবার জন্য অন্তরের যে উল্লাস ও আনন্দ প্রয়োজন যে আলো, জল বায়ুর প্রয়োজন দেশবাসী এখন তাহাই চাহে। আত্ম-নির্ভরতা হারাইয়া পরবশতায় আপনার সর্ব্বস্ব সমর্পণ করিয়া দেশ এমন নিরবলম্ব শক্তিহীন হইয়া পড়িয়াছে যে দেশবাসী জনে জনের—স্ব স্ব চেষ্টায় যে পথ চিনিয়া অগ্রসর হইয়া যাইতে পারিবে সে সম্ভাবনা সুদূরপরাহত। এ যে কেবল আমাদের এই হতভাগা দেশেই অসম্ভব তাহা নহে জগতের কোন দেশের জন সমাজই চালাইয়া লইবার লোক না থাকিলে সহজ স্বাভাবিক ভাবে কষ্টসাধ্য দুরতিক্রমনীয় পথ অতিক্রম করিয়া যাইতে পারে নাই। দেশব্যাপী ঘোর অমানিশার এই ভীষণ অন্ধকার ও অমঙ্গলের মধ্যেও আজ যে আর বিজলী ক্ষণে ক্ষণে ঝলসিয়া যাইতেছে—যে অপূর্ব্ব ভাব তরঙ্গে দেশবাসীর চিত্ত তালে তালে নাচিয়া উঠিতেছে, অলস স্বপন ও নিদ্রার মোহ কাটাইয়া দেশ যে আজ বহুকর প্রত্যক্ষ সত্য জাগরণের মধ্যে ঝাঁপাইয়া পড়িবার জন্য উদ্‌গ্রীব উন্মুখিত হইয়া উঠিয়াছে, ইহাতে দেশ ও দেশবাসীর প্রাণের স্পন্দনই ধ্বনিত হইয়া উঠিতেছে। আজ কোটী কোটী দেশবাসীর এই জাগরণকে সার্থক সুন্দর ও কার্য্যকরী করিয়া তুলিতে হইলে জাগরণের এই আনন্দকে সুপথে চালিত করিয়া লইবার জন্য দেশে যোগ্য পুরুষ কর্ম্মী চাই। কষ্টসহনে, ত্যাগে, আত্মদানে এই পুরুষকে সত্য পুরুষ হইতে হইবে। তেমন ত্যাগী, কর্ম্মী, পুরুষ সিংহ জানিয়াই দেশ আজ দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনকে সাদর অভ্যর্থনা করিতেছে—হৃদয়ের দেবতা জানিয়া তাঁহাকে দেখিবার ও তাঁহার বাণী শুনিবার জন্য সারা দেশ উদ্‌গ্রীব আকাঙ্ক্ষা লইয়া রহিয়াছে।

• • • •

অপূর্ব্ব সত্য নিষ্ঠায়, দানে, দয়ায়, মনীষায়, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন বাংলার পুরুষসমাজকে উজ্জল করিয়া আজ ভারতের দিক্‌বিদিগন্তে তোমার খ্যাতি পরিব্যাপ্ত করিয়া তুলিয়াছে। জগতের কর্ম্মী মনীষী বৃন্দ বাংলার এই পুরুষ সিংহের অপূর্ব্ব কর্ম্মনিষ্ঠা, ভাবাবেগের বিচিত্রতা ও আতিশয্য ও কর্ম্মক্ষেত্রের গৌরব কঠোরতা বিস্ময় চকিত নেত্রে নিরীক্ষণ করিতেছে। বন্যার-প্লাবনে, বাত্যার ধ্বংসে, অনশন ক্লিষ্টের দুর্দ্দশায়, যে চিত্তরঞ্জন নিজের সর্ব্বস্ব দিয়াও ব্যথিতের ব্যথা নিবারণ করিবার জন্য আকুল আগ্রহভরে আপনহারা হইয়া তাদের আতিশয্য দেখাইয়াছেন সেই চিত্তরঞ্জনই আবার ধর্ম্মাধিকরণে দাঁড়াইয়া ভারতের বরেণ্য মস্তিষ্কজীবী আইন-ব্যবসায়ীরূপে আইন ক্ষেত্রে প্রতিদ্বন্দ্বীহীন সম্রাট রূপে আপনার যশ বিঘোষিত করিয়াছেন। অর্থ, মান, সম্ভ্রম, খ্যাতি—ভোগ বিলাস তুচ্ছাতি তুচ্ছ করিয়া দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন—ভাবময় পুরুষ প্রধান চিত্তরঞ্জন আজ দেশের জন্য দুঃখ বরণ করিয়া লইয়া নিজে ধন্য হইয়াছেন। ভাবের দেশে বৈষ্ণব কবি চিত্তরঞ্জন আজ ভাবের বান বহাইয়া দিয়াছেন। এইবার চিত্তরঞ্জনকে ভাব ও কর্ম্মের সংযোগ ঘটাইতে হইবে। ভাবের সঙ্গে কর্ম্মের সংমিশ্রনে—দেশের জাগরণ পূর্ণ হইবে। আজ চিত্তরঞ্জনের দেশের বেদনা বোধের অনুভূতি ও আইন ক্ষেত্রের কঠোর বাস্তব মনীষার একত্র সংমিশ্রনে যে বিচিত্র দেশ চালন নীতি ফুটিয়া উঠিবে সেই নীতি দেখিবার জন্য সেই নীতি অনুসারে কর্ম্মক্ষেত্রে চলিয়া জীবনকে সার্থক সুন্দর করিবার জন্য দেশবাসী দেশবন্ধুর বাণী শুনিবার জন্য আগ্রহান্বিত। আসমুদ্র হিমাচল নিখিল ভারতের অধিবাসী বৃন্দ তাই দেশবন্ধুর মুক্তিদিনে তাঁহাকে স্বাগত অভিনন্দন করিতেছে।

• • • •

দেশবন্ধুর মুক্তিদিনে মহাত্মাপত্নী শ্রীযুক্তা কস্তুরী বাই গান্ধী তাঁহাকে জানাইয়াছেন,—দেশের এই সঙ্কট কালে দেশকে চালিত করিবার জন্য(সবরমতী) সঙ্ঘ প্রধাপ্রধ আপনাকে অভিনন্দিত করিতেছে। মহাত্মাপত্নী নিখিল ভারতের নর নারীর হৃদয়ের আকাঙ্ক্ষাই ব্যক্ত করিয়াছেন।

• • • •

দেখিতেছি দেশে এখনও এমন বিচক্ষণ লোক আছেন যাঁহারা দেশ নীতি হইতে রাজনীতিকে দূরে সরাইয়া রাখিয়া দেশসেবী হইতে চাহেন। ভবানীপুর হরিশ পার্কে সেদিন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনকে অভিনন্দিত করিবার জন্য একটি সভা হইয়াছিল। সভায় উদ্যোক্তাগণ প্রচার

করিয়াছিলেন—সভাটি হইবে নন-পালিটিকেল, অর্থাৎ রাজনীতি বর্জ্জিত। উত্তম!

• • • •

দেশ বন্ধুর সেই অভিনন্দন সভায় দাঁড়াইয়া দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন বলিয়াছেন :—কংগ্রেস যে পর্য্যন্ত শুধু রাজনীতিই চর্চ্চা করিতেন সে পর্য্যন্ত আমি উহাতে যোগ দেই নাই। রাজনীতি বলিয়া স্বতন্ত্র একটা কিছু আছে ইহা আমি স্বীকার করি না। মানুষের জীবন এরূপ যে উহা রাজনীতি সমাজনীতি, ধর্ম্ম নীতি প্রভৃতি নানা খণ্ড ভাবে ভাগ করিয়া যাহারা সমাজ সেবায় যোগ দিতে বলে তাহারা পুলিশের অথেই ওরূপ বলিয়া থাকে।

• • • •

দেশবন্ধুর অভ্যর্থনা সভায় সভাপতি কলিকাতা কার্পো-রেশনের চেয়ারম্যান শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ মল্লিক বলেন :—চিত্তরঞ্জন ও তিনি উভয়েই বাল্যবন্ধু। প্রায় কুড়ি বৎসর পূর্ব্বেকার একটি ঘটনার উল্লেখে সুরেন্দ্রবাবু বলেন ঐ সময়ে একদিন চিত্তরঞ্জনের নিকট হইতে তিনি একখানি চেক পান। সঙ্গে একখানি চিঠি—চিঠিতে লেখাছিল চিত্তরঞ্জনের পিতা সুরেন্দ্র বাবুর পিতার নিকট হইতে অর্থ ঋণ করিয়াছিলেন, সেই ঋণ চেকে পরিশোধ করা হইয়াছে। এই ভাবে চিত্তরঞ্জন তাঁহার পিতার ৬৯ হাজার টাকা ঋণ পরিশোধ করেন। ইচ্ছা করিলে তিনি ও পিতৃ-ঋণ পরিশোধ না করিতেও পারিতেন। কারণ ঋণের দলিল পত্র কিছুই ছিল না। বাল্যকাল হইতে দুই জন বন্ধু হইলেও একজন মানুষই রহিয়া গিয়াছেন, অপর জন দেবত্বে গিয়াছেন। জীবনে আমি যদি চিত্তরঞ্জনের পদাঙ্ক অনুসরণ করিতে পারিতাম তবে অনেক কাজই করিতে পারিতাম।

• • • •

দেশবন্ধুর অভ্যর্থনা সভায় শ্রীযুক্ত রাজগোপাল আচারিয়ার মহোদয় বলেন :—ছাব্বিশদিন অবস্থায় কারাগারে দেশবন্ধু অথেই সুখেই দিনাতিপাত করিতেছিলেন। মহাত্মাজী এখন কারাগারে—তাঁহার স্থানে দেশবন্ধু এখন নিখিল ভারতের ভার গ্রহণ করিবেন। দেশবন্ধু মুক্ত হইয়া আসাতে সকলের মনে আজ আশার সঞ্চার হইয়াছে। দেশের সকলে যদি দেশবন্ধুর ত্যাগব্রতের অনুগামী হন তবে দেশ-বাসীকে তিনি সাফল্যের পথে পরিচালিত করিতে পারিবেন সন্দেহ নাই।

• • • •

সে দিনের সেই স্মরণীয় সভায়, কারামুক্ত দেশবন্ধুর প্রথম অভিনন্দন সভায়—দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন বলিয়াছেন :—আমরা বড় ভাবপ্রবণ। এ অভিযোগ অনেক অংশে সত্য বটে, কিন্তু ভাবপ্রবণতাই বাঙ্গালী জীবনের বিশেষত্ব। দোষ গুণে মানুষের চরিত্র গঠিত। ভাববশে কার্য্য করিয়া অনেক সময় আমরা অপরের অসাধ্য কার্য্যও সাধন করিতে পারি। সব সময়ে যাহারা সুস্থ হিসাব নিকাশ করিয়া কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন ভগবানের করুণা তাহারা সব সময়ে লাভ করিতে পারেন না। জীবনে যাহা সত্য বলিয়া বুঝিয়াছি তাহাই যেন অনুসরণ করিতে পারি।

• • • •

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন নিজের অবস্থা বিস্মৃতিকালে বলেন :—আমি যে কত শক্তিহীন প্রতি মুহূর্ত্তেই তাহা আমি অনুভব করিতে পারি, অ-সহযোগ আন্দোলনে যে দিন আমি যোগ দিলাম সেই দিনই প্রাণের দেবতা যেন আমার প্রাণে প্রাণে জানাইলেন—এ ক্ষমতা তোমার নিজের নহে মূর্খ, মাতৃভূমির কার্য্যে যদি এ ক্ষমতা পূর্ণভাবে নিয়োজিত না কর তবে সব তোমার ব্যর্থ হইয়া যাইবে।

• • • •

স্বদেশী—ও বিদেশী সম্পর্কে দেশবন্ধু বলেন :—আমি বিদেশীগণকে কখনও ঘৃণার চোখে দেখি না। কিন্তু তাহারা ও আমরা যে সম্পূর্ণ বিভিন্ন ইহা আমি সব সময়ই বুঝিতে পারি।

এ জন্য আমি বিদেশীদিগের সহিত কলহ করিতে চাহি না,—তাহাদিগকে শুধু এই কথা বলিতে চাহি, তোমরা এ দেশে থাক, আমাদিগকেও থাকিবার একটু স্থান দাও। নিজের জাতীয় বৈশিষ্ট ত্যাগ করিয়া অপর জাতীয় আচার ব্যবহার আমরা কখনও গ্রহণ করিতে পারিব না।

• • • •

জাতীয় জীবনে সত্যের প্রভাব সম্বন্ধে দেশবন্ধু বলেন :—জাতির মরমে আজ সত্য তাহার প্রভাব বিস্তার করিয়া লইয়াছে। সত্যাগ্রহের আদর্শরূপে মহাত্মা গান্ধী আজ দেশের সমক্ষে উপস্থিত হইয়াছেন। আমাদের সকল ইচ্ছা সকল চেষ্টা সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত হইবে মহাত্মা ইহাই বলিয়াছেন। আমাদের সকল আশা ভরসা বিসর্জ্জন দিয়াও সত্যের পূজা করিতে হইবে। একদিন ছিল, যখন আমি মানুষের অধিকারের উপর খুব বিশ্বাস স্থাপন করিতাম—আজ দেখিতেছি মানুষের অধিকার বলিয়া কিছু নাই। কর্ত্তব্যকেই আমাদের একমাত্র ধর্ম্ম জানিয়া ভারতবাসীগণ শুধু সত্যকেই ভরসা রাখিয়া আপনারা বলীয়ান হউন—সত্যের জন্য বিপদ, এখন কি মৃত্যুকে বরণ করিতে আপনারা সঙ্কুচিত হইবেন না। সত্য বিস্মৃত হইলে সে জাতির স্থান ইতিহাসে কোন দিন হইবে না।

• • • •

গত ২৮ শে শ্রাবণ রবিবার নিখিল ভারত নিরুপদ্রব

প্রতিরোধ কমিটির নেতৃবৃন্দকে বাংলার পক্ষ হইতে অভিনন্দিত করিবার জন্য মিজাপুর পার্কে একটী সভার আয়োজন করা হয় সে দিনকার সভায় বিরাট লোক সমাগম দেখিয়া মনে হইয়াছিল না দেশবাসীর প্রাণে এখনও যেন আশা আছে, এখনও যেন উৎসাহ আছে। মহৎকে দেখিবার জন্য মানবের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিবার জন্য এখনও যেন দেশবাসীর চিত্ত তেমনি আকুল হইয়া উঠে। অসংখ্য অগণিত নরমুণ্ড একমনপ্রাণ হইয়া আশাভরা চিত্তে দেশের বরপুত্রগণের উজ্জ্বল দীপ্তি বিভাসিত মুখমণ্ডল দেখিয়া নয়ন মন সার্থক করিতে আসিয়াছিল তাহাদের মুখের একটী বাণী শুনিয়া ঘরে ফিরিয়া যাইবে বলিয়া আসিয়াছিল।

অভ্যর্থনা সভার নেতৃবর্গের মস্তকে মহিলাগণ খৈ ও পুষ্প বর্ষণ করেন। কপালে চন্দন অনুলেপন করিয়া দিয়াছিলেন। অ-সহযোগী কর্মী ডাক্তার প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ নেতৃবর্গকে নিজহস্তে প্রস্তুত খদ্দর উপহার দেন।

• • • •

সভাপতি কুমার কৃষ্ণ দত্ত মহাশয় বাংলার পক্ষ হইতে বলেন 'শ্রদ্ধাস্পদ নেতাগণ! আমি অভিনন্দন পত্রটি বাংলা ভাষায় প্রদান করিব। আমাদের অর্থবিত্ত কিছুই নাই—বাংলার স্বাস্থ্যও নাই। বর্ত্তমানে আমরা মাত্র আমাদের ভাষারই গৌরব করিতে পারি। কারণ এই ভাষাকে জগতের মধ্যে একটি শ্রেষ্ঠ ভাষা বলিয়া আমরা মনে করিয়া থাকি।'

• • • •

কলিকাতাবাসিগণের পক্ষ হইতে নিরুপদ্রব প্রতিরোধ অনুসন্ধান সমিতির সভ্য মহোদয়গণের শ্রীকরকমলে নিম্নলিখিত অভিনন্দন পত্রখানি দেওয়া হয় :—

শ্রদ্ধেয় নেতৃবৃন্দ!

মহাত্মা গান্ধী ও তাঁহার সহকর্ম্মীগণের অধিকাংশ কারারুদ্ধ হইয়াছেন। এক অনিশ্চিত আশঙ্কার কৃষ্ণছায়াতলে দাঁড়াইয়া ৩৩ কোটী হিন্দু-মুসলমান গভীর দুঃখ নিঃশব্দে বহন করিয়া চলিয়াছে। জাতীয় জীবনের এই দুর্য্যোগময় অন্ধ-তমসাচ্ছন্ন শ্রাবণ নিশীথে আপনারা ভারতবর্ষের পথে পথে ভ্রমণ করিতেছেন। এই পরাধীন জাতিকে স্বরাজের পথে পরিচালিত করিবার জন্য সুমহান সঙ্কল্প লইয়া, উদ্ধত আমলাতন্ত্রের রোষ রক্তিম কটাক্ষ উপেক্ষা করিয়া আপনারা নগরে নগরে গিয়া দেশের প্রকৃত অবস্থা অবগত হইতেছেন এবং তদুপলক্ষে কলিকাতা নগরীতে পদার্পণ করিয়াছেন। এতগুলি দেশনেতার পুণ্যদর্শন সৌভাগ্য লাভ করিয়া, কলিকাতা সহরের অ-সহযোগী এবং অ-সহযোগ আদর্শের প্রতি শ্রদ্ধা ও সহানুভূতি সম্পন্ন অধিবাসী বৃন্দের পক্ষ হইতে আমরা সসম্ভ্রমে কৃতজ্ঞচিত্তে আপনাদিগকে অভ্যর্থনা করিতেছি।

অপমান ও অত্যাচারের অবসানকল্পে ভারতবাসী মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে স্বরাজ লাভের জন্য কৃতসঙ্কল্প হইয়া এক বিরাট বহুল দুর্গম পথের যাত্রী হইয়াছে। মহাত্মা গান্ধী ও অন্যান্য শ্রদ্ধেয় নেতাগণের অদর্শন কালে আপনাদেরই স্কন্ধে নেতৃত্বের গুরু দায়িত্ব অর্পিত। আমরা ভরসা করি আপনারা সংযত সৌর্য্যে ও নির্ভীক ধৈর্য্যে জাতীয় জীবনকে প্রকৃত কল্যাণের পথে পরিচালনা করিবেন। আপনারা তথাকথিত পদগৌরবের মোহ প্রলোভন পদদলিত করিয়া, প্রভূত স্বার্থত্যাগ করিয়া, নিশ্চিত ও অনিশ্চিত প্রচুর দুঃখ বরণ করিয়া প্রশান্ত দৃঢ়তায় এই হতভাগ্য জাতির নেতারূপে এক দুরূহ উদ্যমের মধ্য দিয়া মহিমান্বিত ভবিষ্যৎ ভারতবর্ষ গঠন করিবার ব্রত গ্রহণ করিয়াছেন। যেখানে চেষ্টা সাধু ও সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত, সেখানে ভগবান সাফল্য বর্ষণ করিবেনই। বর্ত্তমানের ক্ষণস্থায়ী ব্যর্থতা, পরাজয়, গ্লানির বেদনা, অদূর ভবিষ্যতের সিদ্ধিকে অধিকতর জয় গৌরবে মণ্ডিত করিয়া তুলিবে। আপনাদের ত্যাগ ও দুঃখ ভোগ সার্থক হউক, আপনাদের সাধনা সিদ্ধ হউক—আমরা আপনাদের পথাঙ্ক অনুসরণ করিয়া ধন্য হই।

কলিকাতা— ভবদীয় গুণমুগ্ধ
২৮শে শ্রাবণ, ১৩২৯ বঙ্গাব্দ। কলিকাতাবাসিগণ।

• • • •

আমাদের এ দেশ বড় মজার দেশ! গ্রীষ্মে এ দেশে অনাবৃষ্টিতে জলাভাবে লোকে শুষ্ককণ্ঠে মৃত্যুমুখে পতিত হয়, বর্ষায় এ দেশে প্লাবনে সব ভাসাইয়া লইয়া যায়। গ্রীষ্মেও দেশব্যাপী হাহাকার, বর্ষায়ও হাহাকার, শরৎ, বসন্ত, শীতেও দরিদ্রের তীব্র হাহাকারে কর্ণ বধির করিয়া ফেলে। দেশের কোন দিকের কোন অবস্থাই চোখ মেলিয়া দেখিবার সাহস ও শক্তি আমাদের নাই। এ এক বর্ষা বা এক গ্রীষ্ম শীত নয়, যুগ যুগান্ত, কত বারমাস, কত দিন কত পল বাংলার আকাশ বাতাস ধ্বনিত করিয়া দেশবাসীর এই প্রাণের তীব্র হাহাকার দেশকে বিষাক্ত করিয়া দেশের জীবনী শক্তি নষ্ট করিয়া ফেলিতেছে কে তাহার ইয়ত্তা রাখে। এ দেশে জন্মিয়া যে মরে সেই বাঁচিয়া যায়—যে বেচারী বাঁচিয়া থাকে সেই মৃত—সেই মরিয়া দেশের দুর্ভাগ্য ও দুঃখ সহস্রগুণ বেড়ে গেছে।

• • • •

প্রধান মন্ত্রী লয়েড জর্জ্জ মহোদয় অনেক ফন্দিফিকিরেই বিলাতের অধিবাসীগণের উপর নিজের প্রাধান্য বজায় রাখিবার চেষ্টা করিয়াছেন। আন্তর্জ্জাতিক বৈঠকে যে এ পর্য্যন্ত কত দেশের কত অর্থ ব্যয় হইল, তাহার হিসাব বাহির হইলে সে এক সুন্দর পদার্থ হইবে সন্দেহ নাই। কিন্তু সম্প্রতি প্রধান মন্ত্রী মহাশয় আই, সি, এস, সম্বন্ধে যে সুন্দর বক্তৃতা দ্বারা ভারতবাসীর তথা বিলাতের অধিবাসীর চিত্তে একটা আলোড়নের সৃষ্টি করিয়াছেন, এত বড় আই-

বেচনা এবং অবিমৃষ্যকারীতার পরিচয় প্রধান মন্ত্রী মহাশয় এতাবৎ আর কখনও দিয়াছেন কিনা সন্দেহ। মনে হয়, এই লোকটির কেবল একটি বিষয়ে মতস্থিরতা আছে এবং তাহা এই, যে যখন যে দিকে বাতাস বহিবে সেই বাতাসের গতির সহিত আপনার মুখ হাসি মিলাইয়া দিবেন। কিন্তু রাজনীতির এই ধারাই কি এখনও—এই গণ তন্ত্রের দিনেও অনুসৃত থাকিবে?

• • • •

যাহা হউক, প্রধান মন্ত্রী মহাশয়ের সে দিনকার এই বক্তৃতা লইয়া নরম-দলের ভিতর একটু ছুঁস ফুসানি এবং অভিমানের সৃষ্টি হইয়াছে। ইহা ভাল। কারণ, আমরা শিশু সময় হইতেই দেখি, মান অভিমান প্রেমের একটা প্রধান অঙ্গ। নরম মহাশয়গণ যদিই বা রাগ করিয়া কোট ছেড়েন,—আমরা বলিতে চাই, তাঁহারা কি অভিনিবেশ সহকারে সেই বক্তৃতা, পড়েন নাই বা হাতে লণ্ডারেট এবং রাজস্ব বৃদ্ধের সাহায্যে ইংরেজ ভারত শাসন করিবেন এই প্রকার মত আহির করা হইয়াছে? এ অভিমান ভঞ্জন করিতে হইলে সম্ভবতঃ আরও কয়েকটি উচ্চ বেতনের চাকরীর সৃষ্টি করিতে হইবে। কিন্তু কৈ? নরম মহাশয় গণ তেমন জোরের সঙ্গে অভিমানের অভিব্যক্তি দেখাইতেছেন না? আমরা কেন উহা বুদ্ধি হউক না,—আমরা চাই নরমের চাকরী লিপ্সার পরিবৃত্তি, অথবা, তাহাতরে,—"চাকরীর ভারতী কারণ"।

• • • •

প্রধান মন্ত্রী মহাশয়ের বিরাট প্রেস-নিনাদ-ঘোষিত আন্তর্জাতিক বৈঠকের কথা সকলেরই নিকট সুপরিচিত। কেমন করিয়া এই ওয়েল্‌স্ জাতীয় ঐন্দ্রজালিক একের পর আর চকটি সুর ঘুরিয়া বিলাতের জনমতকে নিয়ন্ত্রিত করিতেছে, এবং কি ভাবে এইসব বৈঠক এবং সুরের ধ্বনি হাওয়ায় বিলীন হইতেছে তাহাও আজকাল বলা নিষ্প্রয়োজন। জার্মান কৈসরের ফাঁসীকাষ্ঠে প্রাণ যায় যায়,—নাঃ—বাচা গেল। সেটা হইল না। তারপর ক্ষতি পূরণের টাকা—ইংলণ্ড কিন্তু সেই টাকা হইতেই সকলের কার্য্য ক্ষমতা দূর করিবেন। নাঃ—তাহাও করা হইল না। অতঃপর, আর যে কত কাহিনী এই সম্পর্কে তাহা এখানে বলিবার প্রয়োজন নাই—কারণ, সে সব আমাদের পাঠক পাঠিকাগণের নিকট পুরাতন খবর সন্দেহ নাই।

অপর দিকে, উপাধি বিতরণের কাজ লইয়া কিন্তু বিলাতে একটা বেশ বড় রকমের তোলপাড়া চলিতেছে। যাহা শুনিতেছি এবং খবরের কাগজে দেখিতেছি যদি তাহাই ঠিক হয়, তবে বলিতে হইবে—এই লয়েড জর্জ্জ মহাশয়ই আপনার মন্ত্রীত্ব বজায় রাখিবার জন্য ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের মূলে কুঠারাঘাত করিবার উপক্রম করিয়াছেন। বিলাতে চিরকালই কার্য্য-গুণে জন বিশেষকে উপাধি বিভূষিত করা হয়। বস্তুতঃ ১৮৮০ সন হইতে ১৯০৮ পর্য্যন্ত গড়ে বৎসরে সাতটি করিয়া লর্ড হইয়াছেন। মিঃ আস্কুইথের আমলে গড়ে ১১টি করিয়া লর্ডের সৃষ্টি প্রতি বৎসরে হইত। লয়েড জর্জ্জের আমলে ১৪টি করিয়া বৎসরে হইতেছে। নিম্নলিখিত হিসাবটি দেখিলে আস্কুইথ এবং লয়েড জর্জ্জের লর্ড-সৃষ্টির প্রভেদ বেশ্ সুন্দর প্রতীয়মান হইবে।

•

টাইটেল বিতরণ কারণ	রাজনৈতিক	শ্রমিক	শিক্ষা ও সাহিত্য	সৈন্য বিভাগ	নৌবিভাগ	ব্যবসা বাণিজ্য	বিবিধ	মোট
লয়েডজর্জ্জ	৩২	১২	২৩	৩	১	০	৭	১১
আস্কুইথ	১৬	২৯	১০	১০	৫	৩	৪	১৩

লয়েড জর্জ্জ আমলের প্রধান বিশেষত্ব এই যে, তাঁহার আমলে ব্যবসা এবং সংবাদপত্রাদির কার্য্যের একটু বেশী প্রাধান্য দেখা যায়। আস্কুইথের আমলে অনেক লর্ড সৃষ্টি হইয়াছে। কিন্তু তাহার মধ্যে অধিক সংখ্যকই মন্ত্রীত্ব অথবা অন্য কোনও রাজকার্য্যের যোগাতা-নিবন্ধন উপাধি লাভ করিয়াছেন। তাহাতে কাহারও কিছু বলিবার নাই। কিন্তু লয়েড জর্জ্জের উপাধি-বিতরণ সমস্যা সম্পূর্ণ হৃদয়ঙ্গম করিতে হইলে অন্যান্য উপাধির প্রতিও দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে হইবে। যথা, বারোনেট। ইহাতেও আস্কুইথিয়া এবং লয়েড জর্জ্জিয়ান আমলের প্রাধান্য পূর্ণ প্রকারেই প্রকটিত হইতেছে। তারপর নাইটহুডের বেলায়ও তাহাই। আমরা আর কোন প্রকার উদাহরণ না দিয়া কেবল ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে উপাধিবর্ষণের প্রাবল্যের প্রতি পাঠক-পাঠিকাগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিব।

	বারোনেট—	নাইট
	(কারণ—ব্যবসা ও বাণিজ্যে অর্থাগম)	
আস্কুইথ	১০	১৫৮
লয়েডজর্জ্জ	১৩০	৪৮১

এই নাইট উপাধি বর্ষণের কারণ নির্ণয় করা বড়ই সুকঠিন। অনেক নাইট এখন মৃত—এবং তাহাদের বিষয় অনুসন্ধান করা সুকঠিন। কিন্তু উপাধিধারী হুজুগে যোগাতার জন্য অথবা ব্যবসায় জন্য উপাধি অর্জ্জন করিল, ইহা ঠিক করা আদৌ সমস্যাজনক। ইহার ভিতর, বড় বড় ডাক্তার এবং অন্যান্য ব্যবসাদারগণ আছেন, অন্যদিকে ভারতীয় রাজন্য-বৃন্দ এবং অন্যান্য বৃহৎ বৃহৎ ব্যক্তিও আছেন। কাজেই কি ভাবে কে উপাধি পাইলেন বলা সুসম নহে। তারপর, ও, বি, ই নামক নূতন টাইটেলও এই মহাপুরুষের সৃষ্টি। ইহা যে কাহার জন্য—কে জানে, জানিলে জানে এক সেই উপাধির সৃষ্টিকর্ত্তা—ভেভিড লয়েড জর্জ্জ।

বিলাতের লোকে পূর্ব্বেও এই উপাধি গ্রহণ করিত এবং মন্ত্রীগণও পূর্ব্বে উপাধি বিতরণ করিতেন। কিন্তু, লর্ড মর্লী সাহেব গ্লাডষ্টোন সম্বন্ধে যাহা বলেন,—সেই মতানুসারেই এই কাজ করা হইত। উপাধি বিতরণে অত্যন্ত তীক্ষ্ণ ভাবে অনুসন্ধান করা হইলে, তবে যে উপাধি পাইবে তাহা ঠিক হইত। কিন্তু এমন সময় ছিল,—যখন সার রবার্ট ওয়াল পোলো,—যখন বিলাতে উপাধি বিক্রয় হইত অথবা উপাধি দানের দ্বারা দল ভারী করা হইত। লয়েড জর্জ্জ তাহাই আরম্ভ করিয়াছেন। কিন্তু লয়েড জর্জ্জের সময় ব্রিটিশ সাম্রাজ্য একটি বিশাল ব্যাপার,—কাজেই তাঁহার উপাধি বিতরণও একটি মহান ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইয়াছে। আমরা ভারতবাসীও এই উপাধি মোহে বিহ্বল হইয়া আছি। সকল রকমেই তবে বিলাত আজ অগ্রসর হইতেছে। কিন্তু, ঐ যে প্রতিধ্বনি জিজ্ঞাসা করিতেছে কোন পথে—তাহার উত্তর কি শীঘ্রই পাওয়া যাইবে না?'

• • • •

সংবাদ পত্র এবং সাময়িক সাহিত্যের একজন অগ্রণী নায়ক সংসারের কাজ শেষ করিয়া চলিয়া গিয়াছেন। সুবিখ্যাত টাইমস্ পত্রের অধিনায়ক, বিলাতের মন্ত্রীগঠন ও নিরাকরণের এজানিয়ন প্রধান চক্রী, আন্তর্জ্জাতিক ব্যাপারে ব্রিটনের শ্রেষ্ঠ বন্ধু লর্ড নর্থক্লিফের মৃত্যু সংবাদ গত রবিবার দিন আমরা প্রথম পাইলাম। ভারতের সহিত তাঁহার সম্বন্ধ অথবা ভারতের সম্বন্ধে তাঁহার মতামত নির্দ্ধারণ করা উচিত অথবা সময়োপযোগী কিনা তাহা বিবেচনা সাপেক্ষ। কিন্তু মৃত ব্যক্তির কর্ত্তব্য কার্য্য কুশলতা, অসাধারণ বৈষয়িক বুদ্ধি এবং অত্যাশ্চার্য্য উপায়োদ্ভাবন শক্তির সহিত আমাদের পাঠক পাঠিকা গণকে পরিচিত করা প্রয়োজনীয়।

• • • •

প্রথম উদ্যমে বালক আলফ্রেড চার্লস্ হার্মস্ওয়ার্থ তাহার ভ্রাতৃদ্বয়ের সহিত 'আনসার' (Answer) নামক যে কাগজ বাহির করেন, তাহাতেই এই অপরিণত বয়স্ক বালকের তীক্ষ্ণবুদ্ধির পরিচয় পাওয়া যায়। লণ্ডনের অধিবাসীগণ যাহা চাহিতেছিল এইবার তাহারা সেই জিনিষের সাক্ষাৎ পাইল। সাধারণের ভাব লইয়া ভাবগ্রাহী ভাবে জন সমুদ্রের চিত্তাবিনোদন করাই অতঃপর তাহার সাময়িক সাহিত্যের দ্বারা বলিয়া ধরা যাইতে পারে। এবং এই মতানুবর্ত্তিতা এবং ভাবগ্রাহীতাই তাহার শ্রেষ্ঠত্বের সোপান স্বরূপ বলা যাইতে পারে। টাইমস্, ডেলিমেল ইত্যাদি কাগজের স্বত্বাধিকারী বলিয়াই তিনি জগতে বিদিত ছিলেন কিন্তু বহু সংবাদ পত্র এবং সাময়িকের পরিচালন ভারও তিনি গ্রহণ করিয়াছিলেন। ব্যবসা-বিষয়ে ইনি এত বেশী উৎসাহী ছিলেন, যে নিউজিলাণ্ডে একটি কাগজ প্রস্তুতের কল স্থাপনা করিয়াছেন।

ব্রিটেনের আকাশবাহিনীর বর্ত্তমান অবস্থার আলোচনা করিতে গেলেও এই কর্ম্মবীরের সম্পর্ক ইহার সহিত ঘনিষ্ট-ভাবে বিজড়িত দেখা যায়। বিমানপোতের উন্নতির জন্য তিনি অনেকবার প্রভূত পুরস্কার প্রদান করিয়াছেন, এবং জনমতকে ইহার স্বপক্ষে আনয়ন করিবার পক্ষে যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছেন। লর্ড নর্থক্লিফ্ মাতৃভূমির পরম ভক্ত ছিলেন। জার্ম্মানীর যুদ্ধের সময় বিলাতের সংবাদপত্র সমূহের দ্বারা মিত্রশক্তির জয়লাভের জন্য সহায়তা লর্ড নর্থ ক্লিফ করিয়াছিল তাহা জার্ম্মানীর লর্ড নর্থক্লিফ সম্বন্ধে নিতান্ত বিদ্বেষ ভাব-জ্ঞাপক মতামত হইতে স্পষ্টই অনুমিত হয়।

• • • •

আয়র্লণ্ডের দেশ সাধক সিনফিন দলের নায়ক ও প্রতিষ্ঠাতা মিষ্টার আর্থার গ্রিফিথ আর ইহলোকে নাই। একাগ্র দেশ প্রেম ও স্থির তীক্ষ্ণবুদ্ধি প্রভাবে ইনি দেশ-বাসীকে বহু বন্ধুর বিপদের মধ্য দিয়াও দেশ সাধনার সিদ্ধির পথে লইয়া যাইতেছিলেন। দেশ প্রেমিক বলিয়া ইনি সমগ্র জগতের শ্রদ্ধা ও সম্মানভাজন হইয়াছিলেন। মৃত্যুর পূর্ব্বকালে ইনি সাধারণ তন্ত্রীদিগের সহিত সম্বন্ধ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। বৃটিশের সাম্রাজ্যবাদের একজন প্রবল প্রতিদ্বন্দী হইয়াও হীন অস্ত্র দ্বারা নিজ জয় বাঞ্ছা করেন নাই—পাশ্চাত্য দেশ প্রেমিকদিগের সহিত ঐখানে গ্রিফিথের পার্থক্য ছিল। পার্লিয়ামেণ্টে তিনি মন্ত্রী সমাজের সহিত যখন তীব্রভাবে দেশের পক্ষ অবলম্বন করিয়া লড়িয়াছেন সেই সময়েই তিনি স্বদেশী বিপ্লববাদীদিগকে প্রশমিত করিবার চেষ্টাও করিয়াছেন। তাই যোধপুর সাধারণতন্ত্রী বিপ্লবপন্থীদিগের সহিত তাঁহার সম্বন্ধ এত ক্ষণস্থায়ী হইয়াছিল। আজ গ্রিফিথের মৃত্যুতে আয়র্লণ্ড তাহার একজন শ্রেষ্ঠ রাজনীতিক কর্ম্মী হারাইল।

• • • •

'গান্ধী ও বিপ্লববাদ' নামক গ্রন্থে সার শঙ্করণ নায়ার ভূতপূর্ব্ব পঞ্জাব ভাগ্য বিধাতা সার মাইকেল ও ডায়ারকে কি ঘৃণাব্যঞ্জক কথা বলিয়াছেন তাই মানের দায়ে ও ডায়ার সার শঙ্করণের নামে নালিশ রুজু করিয়াছেন। পঞ্জাবের অত্যাচার দর্শনে ও তাহার ঘটনাবলী পর্য্যালোচনায় সার শঙ্করণ ব্যথিত চিত্তে সে অত্যাচারকে নির্ম্মম হৃদয় হীন বলিয়াছিলেন এবং তজ্জন্য পঞ্জাব ভাগ্য বিধাতা-কেও নাকি অপমান, দোষী করিয়াছিলেন। এই সার শঙ্করণের অপরাধ। 'গান্ধী ও বিপ্লববাদে' সার শঙ্করণ নির্ম্মম ভাবে মহাত্মাকে আক্রমণ করিয়াছেন তাঁহার নিন্দা তিন্ন স্তুতি বিন্দুমাত্রও করেন নাই—মহাত্মা না হইলে তাঁহাকে বোকা বা চালবাজ বলিতেন এ কথা বলিতেও সঙ্কোচ অনুভব করেন নাই—এত করিবার পরও ওডায়ার ছুটো সত্য কথনের খোঁচা সহিতে পারিলেন না, একেবারে মানের দায়ে নালিশ ঠুকিয়া দিলেন। এই মান-মামলায়

সার শঙ্করণ আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য কংগ্রেস নেতাদের সাহায্য চাহিয়াছেন। কংগ্রেসের বহুবিচক্ষণ নেতাই পাঞ্জাবের মিঠুন কাণ্ডের পরিবর্তন করিতে পিরাছিলেন, সার শঙ্করণ নাকি তাহাদের অপেক্ষাও সে অত্যাচারকাহিনী বিশদ জানেন। এ মোকদ্দমা বিলাতের বিচারালয়ে উঠিলে ভারত শাসন নীতির আরও এক পর্দ্দা খোল হয় উদ্‌ঘাটিত হইবে। শুনি এমোকদ্দমায় মহাত্মা গান্ধীকেও সাক্ষ্য দান করা হইবে। ভারতীয় সাক্ষীদিগের সাক্ষ্য বোধ হয় কমিশনে হইবে। এই বিরাট অপূর্ব্ব মোকর্দ্দমার ঘটনা বিপর্য্যয় দেখিবার জন্য আমরা উৎসুক রহিলাম?

• • • •

বর্ম্মিংহাম এ্যাডভারটাইজার সংবাদ দিতেছেন বঙ্গীয় লিবারেল কনফারেন্সের অধিবেশন আগামী ২রা সেপ্টেম্বর হইতে আরম্ভ হইবে। এ্যাডভারটাইজার এই প্রসঙ্গে বলিতেছেন জাতি গঠন বিভাগের ভার গবর্ণমেণ্ট এই মডারেট দলের উপরেই দিয়াছেন কিন্তু এই স্বর্ণ সুযোগের প্রকৃত সদ্ব্যবহার মডারেটগণ করিতেছেন কি? মডারেটরা শুধু সুবিধাবাদী মডারেট সাজিয়া থাকিবেন অথচ দেশের লোকের সম্মুখে বাহির হইয়া তাহাদের পক্ষে কি ভাল এ কথা বলিবার সাহস পর্য্যন্ত তাহাদের নাই। এ্যাডভারটাইজারের মতে এবার নাকি এই জন কত লিবারেল নামধারী সরকারী কর্ম্মচারীবৃন্দের সভায় বহু কার্য্যকারী ও প্রয়োজনীয় দেশ সমস্যার আলোচনা হইবে—আমরা বাংলার মডারেট বা লিবারেলদিগের অপূর্ব্ব মনস্তত্ত্বের বিকাশ দেখিবার আশায় রহিলাম।

• • • •

কিছুদিন হইল বাংলাদেশে অনেক তরুণ, অদ্ভুত সাহসী উচ্চশিক্ষিত যুবক বাংলা দেশে নাট্যশালায় অভিনেতা হিসাবে প্রবেশ করিয়াছেন। ইহার মধ্যে শ্রীযুক্ত শিশির কুমার ভাদুড়ী এম এ, মহাশয় শ্রেষ্ঠ ও প্রথম অগ্রণী। শিশির বাবু কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজী সাহিত্যের এম এ উপাধিধারী এবং ইনি কলিকাতার প্রথম শ্রেণীর কলেজের ইংরেজী সাহিত্যের জনপ্রিয় অধ্যাপক ছিলেন। অধ্যাপকের সম্মান ও আরামের কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া শিশির বাবু বঙ্গীয় রঙ্গালয়ের অভিনয় প্রণালীর একঘেয়ে একটানা স্রোতে একটা পরিবর্ত্তন আনিবার জন্য রঙ্গালয়ে প্রবেশ করিয়াছিলেন। কলিকাতা ইউনিভারসিটি ইনষ্টিট্যুট ওল্ড ক্লাব প্রভৃতির অভিনয় কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়া শিশিরবাবু ছাত্রকাল হইতেই অভিনেতা হিসাবে অত্যধিক খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছিলেন। কি ইংরেজী চরিত্র অভিনয়ে কি বাংলা চরিত্র অভিনয়ে শিশিরবাবু নিজ কৃতিত্বে দেশবাসীকে মুগ্ধ আকর্ষণ করেন। তারপর ছাত্রজীবন ছাড়িয়া কর্ম্মজীবনে কিছুকাল অতিবাহিত করিবার পর শিশিরবাবু ষ্যাডান কোম্পানীর নব অভিষ্ঠিত বাংলা থিয়েটারে অধ্যক্ষ হিসাবে যোগদান করেন। তাঁহারা এই থিয়েটারে শিশির বাবুর রমুণীর, আলমগীর প্রভৃতির ভূমিকায় অভিনয় দেখিয়াছেন তাঁহারাই বুঝিয়াছেন বাংলার নাট্যশালায় অভিনয় জানিতে ও সম্প্রদায়ের শিক্ষায় শিশিরবাবু কতটা নূতন জিনিষ সে নাট্যশালায় আনিয়াছিলেন। উচ্চাঙ্গের অভিনয় প্রণালীতে শিশিরবাবু বঙ্গীয় দর্শকগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে সমর্থ হইয়া নাট্যজগতে নিজেকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। সম্প্রতি শিশিরবাবু ষ্যাডান থিয়েটার ত্যাগ করিয়া তাজমহল ফিল্মস কোম্পানীতে যোগ দিয়া বাংলার উচ্চশ্রেণীর ফিল্মস কোম্পানী গঠন করিবার ব্যবস্থা করিতেছেন।

আমাদের বিশ্বাস আছে শিশিরবাবুর নেতৃত্বে এ ফিল্মস কোম্পানী সাফল্য লাভ করিবে ও বাংলার উৎকৃষ্ট ফিল্ম চিত্র দেখাইয়া বিদেশের পয়সাও স্বদেশে আনিতে পারিবেন। তবে একটা কথা—শিশিরবাবুর সঙ্গীব অভিনয় রঙ্গালয়ে দেখিবার লোভ দেশবাসী এত শীঘ্র সম্বরণ করিতে পারিবে না, আর বাংলা রঙ্গমঞ্চকে বর্ত্তমান অবস্থা হইতে ইহাকে উন্নত পর্য্যায়ে দাঁড় করাইবার জন্য শিশিরবাবুর কৃতিত্ব ও কর্ম্মকুশলতা অনেক সহায়তা করিতে পারিবে দেশবাসী ইহাই আশা ও আকাঙ্ক্ষা করে। যেমন ভাবের একটি উন্নত পর্য্যায়ের রঙ্গমঞ্চ বাংলায় প্রতিষ্ঠা করিয়া চালান শিশিরবাবুর পক্ষে সম্ভবপর, তাই তাহার দেশবাসী তাঁহার নিকট এ আশা করিতে পারে।

• • • •

আমরা বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম সম্পাদিত ধূমকেতু উপহার পাইয়াছি। ধূমকেতু জাতিরও দেশের বাধা বিঘ্ন জড়তা ধ্বংস করিয়া দেশে নূতন প্রাণের উৎস আনয়ন করুক আমরা এই প্রার্থনা করি। চারণ কবির দেশ-মাতান সঙ্গীত ধূমকেতুর আড়ালে উজ্জ্বল হইয়া ফুটিয়া উঠুক।

• • • •

স্বরাজ কলেজের চরিত্র চাকচক্যে এম-এল-সি ফজলুল হক সাহেব স্বরাজ পত্রের নামে মানের দাবে নালিস রুজু করেন। স্বরাজ সম্পাদক তখন সম্পাদক হিসাবে নিজের দায়িত্ব অপসারিত করিয়া লেখককে বরাইয়া দেন। স্বরাজ সম্পাদকের সম্পাদকীয় দায়িত্ব অপসারনের সঙ্গে সঙ্গে দেখা গেল যান হানিকর লেখার দায়ে ধরা পড়িয়া গেলেন নায়ক সম্পাদক শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়। কি লিখিবার দায়ে পাঁচকড়িবাবু মামলায় পড়িয়াছেন আমরা সঠিক জানি না, তবে শুনিয়াছি তিনি ফজলুল হক সাহেবও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সম্বন্ধীয় আলোচনা প্রসঙ্গে হক সাহেবের পিতামহকে কুযান জাতীয় একটা কথা বলিয়াছেন। সে যাহাই হউক—কোর্টে সে বিষয়ের বিচার হইবে। কিন্তু স্বরাজ সম্পাদক এ কি কাণ্ড করিলেন, নিজে বাঁচিবার জন্য লেখককে ধরাইয়া দিলেন—এ পরিত্রান নীতি যে সম্পাদকের পক্ষে শ্লাঘনীয় নহে।

স্বরাজ-সাধনা।

(শ্রীহেমন্তকুমার সরকার)

দেশ স্বরাজ চায় না ব'লে অভিমান ক'রে অনেকে অনেক কথা বলছেন। এমন কি দু-একজন নিরুৎসাহ হ'য়ে কর্ম্মক্ষেত্র থেকে স'রে দাঁড়িয়েছেন। স্বরাজ যদি লোকে না-ই চায়—তাহ'লে কি হাল ছেড়ে দিয়ে ব'সে থাকতে হবে, না দেশের লোককে গা'ল দিলেই তারা স্বরাজ লাভের উপযুক্ত হবে? স্বরাজের আকাঙ্ক্ষা সবার প্রাণে আগলে তো স্বরাজ হয়েই যেতো। তা আগেনি ব'লেই তো আমাদের আজ এই দুর্দ্দশা।

এ-তো একটা চুক্তির ব্যাপার নয়। চুক্তি শেষ হ'য়ে গেলেই কাজ ফুরোলো। যাঁরা সত্যিই দেশকে ভালবাসেন এবং দেশের জন্য সর্ব্বস্ব দান ক'রতে রাজি আছেন—তাঁদের স'রে দাঁড়াবার কথাই নাই। যতদিন কার্য্যোদ্ধার না হচ্ছে, ততদিন লড়তে হবে। তবে যাঁরা দুদিনের বেয়াল বা সখ মিটাবার জন্য স্বদেশ প্রেমিক হ'ন—তাঁদের সরতেই হবে। আর সে সরাতে তাঁদেরও মঙ্গল, দেশেরও মঙ্গল। তাঁরা যেটুকু দেন, তার জন্যই দেশ কৃতজ্ঞ।

ডাক্তার যে তিতো ওষুধটা খেতে বলেছিলেন রোগী—সেটা খায় নি—তাতে সময় মত অসুখ সারল না। এখন তাই ব'লে কি রোগীকে মারবো, না তাকে ফেলে রেখে চ'লে যাবো। সে যে আমারই রক্তমাংসের ভাই—রাগ অভিমান ক'রে না হয় বড় জোর দুটো কথা বললাম—কিন্তু ছেড়ে তো যেতে পারি না। তাকে বাঁচাতে হবে—তার সেবা-শুশ্রূষা করতে হবে। কথা শোনে না ব'লেই আরও তাকে চোখে চোখে রাখতে হবে। কথাই যদি শুনবে তো তার অসুখই বা করবে কেন—বুদ্ধিই যদি থাকবে তবে ওষুধ খেতে নারাজ হবে কেন?

যাঁরা ত্যাগ দ্বারা এবং দুঃখ বরণ করে দেশের সামনে একটা আদর্শ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন—তাঁদের মনে করতে হবে যে—সে সাধনা দেশের সর্ব্বাঙ্গীণ পাপতাপ তুলে ফেলে দেওয়ার মত শক্তি তাঁদের দিতে পারে নি। তাই নীরবে অপেক্ষা ক'রে সাধনার দ্বারা শক্তি সঞ্চয় করাই তাঁদের কর্ত্তব্য। সে সাধনা যেদিন সম্পূর্ণ হবে—সেদিন ডাকার মত ডাক দিতে পারা যাবে! সে ডাকে কেউ-না বেরিয়ে থাকতে পারে কি? আমাদের পাপের বোঝা হিমালয় প্রমাণ—তাকে ঠেলে ফেলার শক্তি কত সাধনা করলে তবে হবে। অবশ্য, যাঁরা কর্ম্মক্ষেত্রে নেমেছেন—তাঁদের সাধ্যমত চেষ্টা করলেই—তাঁরা খালাস। দশের দেশ—দশজনে মিলে চেষ্টা করলে হবে। তা করলে কাজ তো হ'য়েই যেতো।

দেশ যে এই একবৎসরের সাধনায় কতটা এগিয়ে গেছে—তা একটু ভেবে দেখলেই বোঝা যায়। ২৫ হাজার লোক হাসতে হাসতে জেলে গেছে—রাজনীতি চর্চ্চা খেলার সামগ্রী হ'তে জীবনের অপূর্ব্ব সাধনায় বদ্ধ হয়েছে। যে আদর্শ রাজনৈতিক জীবনে আজ স্থাপিত হয়েছে—তাতে আত্মশুদ্ধি ও ধর্ম্মভাবের প্রতিষ্ঠা হয়েছে। কত অসম্ভব সম্ভবে পরিণত হ'ল—আমীর ফকির হয়েছে, চোপী যোপী হয়েছে। অন্য সব সার্থকতার কথা বাদ দিলেও কেবল এত বড় এক একটা আদর্শ সিদ্ধি জাতির জীবনের পরম সম্পদ। এ অতুল সম্পদ চিরদিনের জন্য জাতির জীবনকে অলোকিত ও গৌরব গরিমায় মণ্ডিত ক'রে রাখবে।

কারাগারের শাসনের ভিতর দিয়ে দেশ-সেবকগণের জীবন পবিত্র হয়েছে। তাঁরা বেশ ক'রে অতীত বর্ত্তমান ও ভবিষ্যতের কথা ভেবে নেবার সুযোগ পেয়েছেন। ঘুমঘোর ভয় ভেঙে গেছে। অন্তত কতক লোকও নিজেদের অন্তরে অন্তরে স্বাধীনতার স্বাদ অনুভব করতে পেরেছেন। জাতির পক্ষে এটা কম আশার কথা নয়।

কত শতাব্দীর পরাধীনতা কত অন্ধকারের সৃজন করেছে। সে আঁধারের গায়ে গায়ে পুরুষ দিয়ে যিনি এক একটি ক'রে আশার তারা ফোটাচ্ছেন—তিনিই শুধু জানেন এ দীর্ঘ যামিনী কবে প্রভাত হবে। তবে রাত্রির গভীরতম অন্ধকারেই আলোকের সূচনা। সে সূচনা আরম্ভ হ'য়ে গেছে—এটা আমরা বেশ অনুভব করতে পারছি। যাঁরা জীবনের হিমালয়শৃঙ্গে তপস্যা করিছিলেন—তাঁরা আগেই সে আলোকের সন্ধান পেয়ে চারিদিকে আনন্দের বার্ত্তা ঘোষণা ক'রে দিয়েছেন। ঘুমের ঘোরে অবসন্ন আমরা নীচে থেকে সে কথায় সকলে বিশ্বাস করতে পারিনি। কেউ স্বপন ব'লে সন্দেহ করছে, কেউ চোখ মুছছে, অনেকে অসাড় হ'য়ে এখনও নিদ্রা দিচ্ছে—কিন্তু যেদিন মুক্তির প্রভাতীর সঙ্গে স্বাধীনতা সূর্য্যের আলো এসে পড়বে, তখন তো আর অবিশ্বাস করা চলবে না—তখন যে ঘুম ভেঙে যাবেই—স্বরাজ সাধনার ফল প্রত্যক্ষ হ'য়ে উঠবে—তখন দশের পুণ্যে একের পাপও ক্ষয় হয়ে যাবে। যে চায় নাই—সেও পাবে। আমাদিগকে সেই শুভ-দিনের জন্য সাধনায় ব্রতী হ'তে হবে।

দেশ-বিদেশ

মধ্যে মাদ্রাজের পুলিস সুপারিনটেণ্ডেণ্ট "হিন্দু" পত্র, শ্রীযুক্ত প্রকাশম্, এবং যেসেফ্ প্রকৃতির বলে যে অতি সুন্দরের বাণীর অবতারণা করিয়াছিলেন, তাহার বিচার শেষ হইয়া গিয়াছে। শ্রীযুক্ত প্রকাশমের ৯ হাজার ও "হিন্দু" পত্রের ১ হাজার টাকা জরিমানা হইয়াছে।

বিলাতের প্রসিদ্ধ সংবাদ পত্র পরিচালক লর্ড নর্থক্লিফের মৃত্যু হইয়াছে। মৃত্যুকালে তিনি বেশ শান্তিপূর্ণ অবস্থাতেই ছিলেন।

লক্ষ্ণৌর সেক্রেটারী সার্ আর্ থি, টমসন্ ব্রিটিশ গায়নার গবর্ণর নিযুক্ত হইয়াছেন।

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনকে দেশবাসীর পক্ষ হইতে একটি অভিনন্দন দেওয়া হইবে। সম্ভবতঃ আগামী রবিবার বিজয়াপুর পার্কে এই সভা হইবে।

বেঙ্গল ফ্রেণ্ডের সি-রেম খানি ২০০৲ টাকা মূল্যে বিক্রয়ার্থ ব্রাহ্মণের তরফ হইতে মিঃ আর-এস পর্দ্দা ক্রয় করিয়াছেন।

প্রবীণ বয়সী মিঃ লয়েড জর্জ্জ যৌবনের ঔদার্য্য জীবন-স্মৃতি লিখিতেছেন। বিলাতের সংবাদ পত্র মহলে ইহা লইয়া ভীষণ হৈ-চৈ পড়িয়া গেছে। অনেকের মতেই প্রবীণ বয়সে যত ঘটনাপূর্ণ কথা করিতে করিতে জীবনস্মৃতি প্রকাশ করা অন্যায়।

জীবন-স্মৃতি কি মূলকথাই রবীন্দ্রবাবু প্রকাশ করিয়াছিলেন। তিনি যদি সে পথ না দেখাইতেন তবে আজ রায় বাহাদুর যতীন্দ্রনাথ সেন গুপ্তের 'কয়ের কথা ও সুর সাহিত্য' প্রকাশকরিবার দুইতা করিতেন না।

কলিকাতা সহরের বাড়ী ভাড়ার আইনটির সময়াবধি যাহাতে আরো দুই বৎসর বৃদ্ধি পায়—তাহার জন্য বিশেষ চেষ্টা চলিতেছে। বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার আগামী অধিবেশনে ইহার আলোচনা হইবে।

ভারত সম্রাট পঞ্চম জর্জ্জ রাজ পরিবারের এবং নিজ খরচের হ্রাস করিবার চেষ্টা করিতেছেন। এক বৎসরে ১০০০০ পাউণ্ড টাকা কম খরচ করিতে পারিবেন বলিয়াই তিনি আশা করেন।

বঙ্গ বিজয় সম্পাদক পাঁচকড়ি বাবু সাময়িক অসুস্থতা নিবন্ধন কর্ম্ম হইতে অবসর গ্রহণ করিতেছেন। পাঁচকড়ি বাবুর সহিত বাঙ্গালা দেশের অনেক কাগজেরই যোগ না থাকিতে পারে কিন্তু তাঁহার প্রতিভা, তাঁহার ক্ষমতাকে কি বিশেষ করিয়া তাঁহার বন্ধু-মণ্ডলীর মধ্যে বন্ধু ভাবনেশী এমন লোক আছেন কি-না সন্দেহ। আমরা ভগবানের নিকট প্রার্থনা করি তিনি সুস্থশরীর লাভ করিয়া আবার তাঁহার তেজঃপূর্ণ লেখনী তুলিয়া লউন।

আয়ার লণ্ডের সিনফিন দলের প্রতিষ্ঠাতা আর্থার গ্রিফিথের মৃত্যু হইয়াছে।

আর্ ষ্টেড্‌মটারলিঙ্ক জাহাজে উঠিয়া ভারতবর্ষে আসিবেন এ সংবাদ রয়টার বলিতেছেন, সত্য নহে।

"ভারত-টনিক"

সেবনের—পূর্ব্বাবস্থা।

সেবনের—পরের অবস্থা।

আর এক অভাগিনী

(শ্রীবিজয়রত্ন মজুমদার)

বিবাহের প্রায় বেড় বৎসর পরে শ্বশুর বাড়ী এসে দেখ্‌লাম, সুখের সংসারটি। বিবাহের সময় সাতদিন সেখানে ছিলাম, কিন্তু তাঁদের সংসারের প্রকৃত পরিচয় পাবার সুযোগ তখন হয়-নি। দ্বিরাগমনের সময় এসে দেখি, শাশুড়ীর স্বভাবটি ঠিক আমার জননীর মতই। তাঁর ছেলে দু'টিও বেশ। বড় ছেলে এম্‌-এ পাশ করে জি-পি-ও-তে একটা তিনশ' টাকা মাইনের চাকরী করছেন, ছোট-টি আইন পাশ করে' তখন কি করি-না করি ভাবতে ভাবতে পাদা পাদা ইংরেজী নবেল পড়ছেন। শাশুড়ীর মেয়ে তিনটিরই বড় ঘরে-বরে বিয়ে হ'য়েছে, তাঁরা বেশ সুখে আছেন, শুন্‌লাম। আমি বড় বৌ, বাড়ীর ঝি-চাকর আমাকে একবারে যেন ঠিক রাণীর মত মান-সম্ভ্রম দেখাতে লাগল; আমার শাশুড়ী বৌ-মার আহার বিহার সুখ-সম্পদের দিকে তীক্ষ্ণদৃষ্টি না রেখে জল গ্রহণ করতেন না। দেওর যখন বাড়ীর মধ্যে আসতেন, সেই সময়টিই ছিল কেবল আমার ভয় ও ভাবনার। প্রায়ই চাবীর খোলো আঁচল থেকে অদৃশ্য হ'ত; মাথার চিরুণী ইঁদুরের গর্ত্তে, এবং ইঁদুরের গর্ত্তের ইট-মাটী প্রায়ই আঁচলের কোণে গ্রন্থির মধ্যে জমে থাকত। যেদিন তাঁকে জানালাম যে এ-সব রসিকতা নেহাৎ পুরাণো ও একঘেয়ে—সেদিন থেকে তাঁর রসিকতা বন্ধ হ'ল বটে কিন্তু এক নূতন বিপদ এসে হাজির! তিনি যে সব ইংরেজী বই পড়ছেন, মধ্যাহ্নকালটা সেগুলোর আলোচনা করবার জন্যে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে তিনি একটি লোকের সন্ধান পেয়েছেন বলে অভিমত প্রকাশ করলেন এবং আমায় বললেন যে সে উপযুক্ত ব্যক্তি—আমিই। আমার শাশুড়ীও এমনি মানুষ, অথবা পুত্র স্নেহে তিনি এমনি নির্ব্বিচার হ'য়ে গেছলেন যে তখনি অম্লান প্রফুল্লমুখে কোলের ছেলেটিকে উৎসাহিত করে বল্লেন—বেশ ত বৌ-মা, দুপুরবেলা দেবুর সঙ্গে একটু লেখাপড়ারই আলোচনা করো-না।" এ সবের বিপক্ষে কত যুক্তি, কত তর্ক না করেছিলাম, কিন্তু সেই যে কবে আমার অজ্ঞাতে আমার বাবা এঁদের বাড়ীতে এসে' আমার বাক্স ভরা সোনারূপার মেডেল ক'খানার গল্প আর সেই মেম-মাষ্টারের আশীর্ব্বাদগুলি মুখস্থ বলে গেছেন, এঁরা এখন আমার কথা বিশ্বাস করবেন কেন।

আশা ছিল, স্বামী বিপদমুক্ত করবেন কিন্তু তিনি এর চেয়েও অনেক গুরুতর সমস্যাগুলি পকেটে (!) করে' বাড়ী আনতেন, আমার সামনে সেগুলিকে আবরণ মুক্ত করে' আমার মতামত জান্‌তে চাইতেন। কোথাকার কোন্ একটা সব-আফিসের পোষ্টমাষ্টার বাবু ক্রমাগত মাসিকপত্র চুরি করেন, গ্রাহকেরা অপ্রাপ্তির খবর দিয়ে মাসিক-গুলোর ব্যতিব্যস্ত করে তোলে, কোন্ পোষ্ট-পিওন চিঠি থেকে ক্রমাগত দু'আনা টিকিট খুলে খুলে বেচে মেরে দিয়েছে—আরও কত কি। বাড়ীতে অমন সব আইন পাশ করা ভাই থাকতে আমার কাছে পরামর্শ চাইতে আসাটা যে কোনমতেই তাঁর মত বিদ্বান বুদ্ধিমান লোকের পক্ষে উচিৎ হ'চ্ছে না বলায়, স্বামী হেসে বল্লেন—আহা! একে কি আর পরামর্শ বলে। এ সব হ'চ্ছে Co-operation.

বোশেখ মাসের ১৩ই আমি শ্বশুর বাড়ীতে ঘর করতে আসি। পৌঁছেই, সেদিন সান্ধ্যবেলা বাড়ীর হেড্-ঝি খোনার মা'কে পুজো করবার ফুলের কথা জিজ্ঞাসা করছি, শাশুড়ী পাশের ঘরটায় বসে আহ্নিক করছিলেন, শুনতে পেয়ে ঠক্ করে' পঞ্চপাত্রের একটা শব্দ করে বলে উঠ্‌লেন—ফুলের ছড়ু কি মা! তোমার বাপ-মার আশীর্ব্বাদে...র আবার কিসের অভাব। পুজো করবে, বেশ ত মা, কালই ভোরে ছখীকে পাঠিয়ে দেব বাগানের রাণীকে বলে আন্‌বে। ক'টার সময় চাই বলে দিও।"—তারপর সে কতকথা। কি-কি পুজো করি, এত অল্প বয়সেই দীক্ষা নিয়েছি কি না, আরও কত প্রশ্নই-না করলেন এবং আমি স্পষ্টই বুঝতে পারলাম, আমার উত্তর শুনে মা'র আমার মুখখানি বেশ আনন্দোজ্জ্বল হ'য়ে উঠ্‌ল। প্রাণ-ঢালো বহু আশীর্ব্বাদ করে মা আমার বুকের মধ্যে চেপে ধরে' আমাকে চুম্বন করলেন।

ঘণ্টার পরেই পুজো আর্চ্চার কাজ আমি করতাম। কারণ বাড়ীটা তখনই একটু নির্জ্জন ও নীরব হ'ত। স্বামী আফিস বেরিয়ে গেছেন, কি-চাকরেরা বাজারের হিসেব চুকিয়ে যে-যার ঠাঁই নিজের তবিল মেলাতে গেছে, ঠাকুর অনেকক্ষণ পরিশ্রমের পর চাকরদের ঘরে বসে একটুখানি বিশ্রাম করে নিচ্ছে· আর সেই আইন-পাশ করা উকীলটি নিজের ঘরে বহির মধ্যে মগ্ন—সেই সুযোগ! প্রথম দিন দুই-তিন উকীলটি বোধ করি আসতে পারেন নি—হঠাৎ একদিন পকেথেকে কার একখানা মস্ত চওড়া লালপাড় ধরণের সাড়ী পরে' গলবস্ত্রকৃতবাসে কৃতাঞ্জলিপুটে আমার সামনে এসে বল্লেন—দীক্ষা দাও।" মা দিলে স্বর্ণ-বিগ্রহ নিয়ে গিয়ে অ্যাসেচার থিয়েটারের ছায়াকে মেডেল গড়িয়ে দেবার ভার-ও দেখালেন।

বল্লাম, আইন পাশ করলে কি এমনি নাস্তিক হয়?

উত্তর হ'ল, আঠারো উনিশ বছর বয়সেই বাঙ্গালীর মেয়ে এত বুড়ী হয়?

যা'হোক, দীক্ষা দেবার মত শিক্ষা আমার নেই শুনে বিরক্ত হ'লেন কিন্তু তখনই আমায় পরীক্ষা নেবেন বলে বৈঠকখানা থেকে তাঁর স্বর্গীয় পিতৃদেবের সঞ্চিত 'পুরোহিত দর্পন' খুঁজতে গেলেন। আমিও সেই ফাঁকে একেবারে ঠাকুর নিয়ে শাশুড়ীর ঘরে ঢুকে পড়লাম। শাশুড়ী হাসি-মুখেই ছেলেকে ধমক ধামক দিয়ে বাহিরে পাঠিয়ে দিলেন। ছেলে যাবার সময় আমায় ঠাকুরের মেয়ের সোনা যদি মনি স্যাকরার হাপরে পুড়ে ছাড়ার সময় ছেড়ে না হয়—ত খুড়ি খাক্—বলে গেলেন।

—•—

২

সুখ-শশি যে কার অদৃষ্টে কতক্ষণ কোন্ গগনে উজ্জ্বল থাকেন, কে জানে। আমার অদৃষ্টে তাঁকে এত শীঘ্রই ডুবে যেতে হ'ল যে আমার মনে হয় তার জন্যে তিনিই দুঃখিত!

বেশী দিন নয়, বাইশটি দিন আমার সুখের দিন, সুখের রাত্রি ছিল। তার পরই এত সুখ সব অসুখে পরিণত হ'য়ে গেল। সে কথা বলবার নয়—জগতের কোন রমণীরই সে কথা উচ্চারণ করে' জিহ্বা কলঙ্কিত করা উচিৎ নয়—এ শিক্ষা, শালীনতায় এই বাপকাটি যে আজিও না জানি তা নয়, কিন্তু না বলে, দুঃখের আগুণ বুকে চেপে—সংসার-টাকে ছারখার করতে চাই নে। গোপন করবার বস্তু এ নয়; এ লজ্জার বস্তু কিন্তু লজ্জা তখন শোভা পায় না যখন তার সর্ব্বনাশ সমুপস্থিত। দু-কলমের সময় অসূর্য্য-স্পর্শ নারীকে লক্ষ লোকের সাম্মুখানে দাঁড়াতেও সঙ্কুচিত দেখি নি। আমি যে কথা বলতে যাচ্ছি শুনে অনেক স্ত্রীই আমার মৃত্যু কামনা করবেন, করুন। কিন্তু সে আমার মৃত্যু নয়। রমণীর মৃত্যু যা, তা আমার জীবনে ঘটে গিয়েছে আর যদি কিছু বাকী থাকে, তা'কে আমি ডরাই নে। যদি কেউ আমার মৃত্যু কামনা করেন আমি তাঁকে শুভার্থিনী জেনে আগে থেকেই মিতি করছি। সেই সঙ্গে এ-কথাও তাঁকে আমি বলতে বাধ্য যে আমার জীবনের যে গোপন দৃশ্যের যবনিকা আমি আজ সরিয়ে দিচ্ছি—তিনি যেন নিভৃতে, নির্জ্জনে নিজের কাছে তাঁর জীবনের কোন-না-কোন একটি দিনের পাতা উল্টে দেখেন, মেলে কি-না; এর সঙ্গে তারও যোগ আছে কি-না!

রাত বোধকরি বারোটা হ'বে—সোনার মা'র ঘরে একখানা লাহোরী কম্বলের উপর চাদর পেতে শুয়ে আছি, সোনার মা পায়ের দিকে তার আদ্যিকালের সতরঞ্চ ও মিউড়ে খেরোর বালিশটা মাথায় দিয়ে বিস্তর বদনে ঘুমুচ্ছে—হঠাৎ আলো জ্বলে উঠ্‌ল। চেয়ে দেখি, স্বামী! তখনো দুইচ-টি ধরে! তারপরই আমার নজর পড়ল, সোনার মা'র মরপ্রায় অঙ্গের দিকে! বল্লাম, আলো নিবিয়ে যাও।

স্বামী আলো নেবালেন, অন্ধকার ঘরে তাঁর দৃপ্তস্বর বাজের মত কেঁপে উঠ্‌ল—এখানে শুয়ে কেন?...উঠে এসো।

বুঝতে পারলাম, আমার উত্তরের প্রতীক্ষায় তিনি দাঁড়িয়ে নেই, আমারই অপেক্ষা করছেন, তবুও বল্লাম—তুমি শোওগে-না।

স্বামী বল্লেন—কেন? তুমি!

তিন দিন—আমাকে মাপ কর।

স্বামী এক মুহূর্ত্ত দাঁড়ি বসে উঠ্‌লেন—মাপ-জোপের দরকার নেই, উঠে এসো।

এবার তাঁর কণ্ঠস্বরটি হাসি-ভরা কল্পনা করে' অন্তর পেয়ে বল্লাম—শোও-গে-না!

উত্তর হল—বিদ্যুৎ, উঠে এসো।

হাসি যে তাঁর কণ্ঠে বহুক্ষণ অবধিই ছিল না, এবার-কার উত্তরে তা বুঝতে পারলাম। আমার একটা কথাও আর ঠোঁটের আগে জোগাল না। কেবল শুয়ে শুয়ে

কাঁপতে লাগলাম। স্বামী আমার বল্লেন—আসবে না?—আমার আগেই যোনার মা বলে উঠ্‌ল—যাও-না গা বৌ-মা। শুনে কি আর তোমার 'ভাগত' অশুদ্ধি হ'য়ে যাবে!—তার কথা শেষ হ'তেই পায়ের শব্দ এবং তখনি দরজা বন্ধ করার শব্দও শুন্‌তে পেলাম।

যোনার মা প্রথমটা মুরুব্বিয়ানার সুরে রেখে রসিকতার মিষ্টি আবরণ দিয়ে স্পষ্টই বুঝিয়ে দিলে যে পুরুষ মানুষকে অমন করে' হেনস্থা করলে শাপগ্রস্থ হ'তে হয়।

যোনার মা'কে আমার হিতাকাঙ্ক্ষা না করে, নিন্দার আরাধনা করবার পরামর্শ দিলাম এবং সে-যে আমার অত্যন্ত অনুগত—পাঁচ মিনিটের মধ্যেই প্রবল নাসিকাগর্জ্জনের দ্বারা তা আমায় গোচর করিয়ে দিলে—কিন্তু আমার চোখের ঘুম হ'রে গেল।

মনে পড়তে লাগল, কৈশোর জীবনের সেই দিনগুলি। যখন পিতার সামনে বসে বেশ-বিদেশের সাহিত্য বিজ্ঞানের গল্প শুন্‌তাম আর যখন মার কোলে মাথা রেখে নারীর কর্ত্তব্য শিখে নেবার চেষ্টায় হাঁ করে তার মুখের কথাগুলি গ্রাস করতাম! ঘটনার পর ঘটনা, দিনের পর দিন—প্রত্যেক বড় ছোট জীবনের সব কাজ আলোচনা করে দেখেছি, মা'র আদেশ জীবনে ভুল করেও কোনদিন অবহেলা করি নি। বাবা কোনদিন আমাকে কোনো উপদেশই দেন নি; নিজে তিনি চিরদিন জ্ঞান সাগরের কূলে দাঁড়িয়ে উপলখণ্ড কুড়িয়েছেন। ঘরে বাইরে সবাই তাকে বিদ্বান বল্‌ত, তিনিই কেবল তা অস্বীকার করে' বলতেন, কেবল টিলই কুড়িয়েছি, আসল জিনিষ আর কই পেলাম। আর মা ছিলেন, ঠিক তাঁর বিপরীত। জ্ঞান সাগরটি তাঁর মতে ছিল ভীষণ এক কর্ম্মনাশা; আর যে সব লোক তারই কূলে দাঁড়িয়ে ঢেউ গোণে—তাদের চেয়ে উন্মাদ তিনি আর কাউকে খুঁজে পেতেন না। তাই সংসারের সমস্ত কাজ কর্ম্মের মধ্যে একটু খানি ফাঁক পেলেই তিনি আমাকে নিয়ে-পড়তেন। কে জানে সে দিবা দ্বিপ্রহর আর কে জানে সে রাত্রি চতুর্থ-যাম। বেশ মনে আছে এমনই শিক্ষক-শিক্ষিকার শিক্ষাধীনে আমাকে পুরোপুরি চারটি বৎসর থাকতে হ'য়েছিল আজ সেই সব কথা মনে পড়ে গেল। মা'র মুখের সেই কথা মনে পড়ে গেল, বন্ধু, সখা, মিত্র সচিব হলেন স্বামী দেবতা; স্বামীসুহৃদ দেব-মন্দির। যত কাছেই পাও, যত প্রিয়ই হোন্ দেবতায় অসম্মান নারী হ'য়ে কোন দিনই যেন করো না!...আরও কত কথা মনে পড়ে গেল! মনে পড়ে গেল বলি কেন, মনেই ছিল, ঠিক সময় দেখে তারা সামনে ছুটে উঠে পথ নির্দ্দেশ করে দিলে।

কিন্তু কান্না এলো। চোখে অন্ধকার দেখ্‌লুম। মাথার কাছের খোলা জানালাটা দিয়ে নীল রঙের খানিকটা আলো ঘরের মেঝের পড়ে ঘুমুচ্ছিল, অনেকক্ষণ চেয়ে চেয়ে তবে বুঝতে পারলুম সে-টা জোৎস্না। এবং বুঝতে পেরেই অবশ হাতটি বাড়িয়ে জানালাটা বন্ধ করে দিলাম—আলো দেখে ভয় হ'ছিল। হৃদয় যোগে যে অন্ধকার জমে উঠেছে, তার মাঝ থেকে পালাতেও যেমন ভয় হ'ছিল, আলো সহ্য করতে তার বেশী কষ্টকল্প হ'ল! পাছে সেই আলোকে চেয়ে দেখি—আবার তিনি দাঁড়িয়ে তেমনি করে ডাক্‌ছেন; দেবতা আদেশ করছেন—উঠে এসো!—দেবতার আজ্ঞা লঙ্ঘন করেছি, মন যেন শাস্তির ভয়ে কেঁপে কেঁপে উঠ্‌ছিল।

সে রাত্রে ঘুমুইনি বলেই আমার বিশ্বাস ছিল কিন্তু চোখ মেল্‌তেই ভুল ধারণা ভেঙ্গে গেল। রাত্রের ঘটনাটা আর কেউ জান্‌তে পারবে না বলেই জান্‌তাম। যোনার মা হঠাৎ যে কি করে জেগে উঠ্‌ল, তা জানি-নে। সে ত বুক ফুলিয়ে ক'দিন ধরে এই গল্পটাই করে বেড়াচ্ছিল যে হাতীর মত ছোট খাট জানোয়ারও যদি তার বুকের ওপর দিয়ে হেঁটে যায়, বড় জোর মশা কামড়াচ্ছে বলে নড়তে চড়তে পারে সে, ঘুম তার এমন পলকা নয় যে ভেঙ্গে যাবে।—তবুও যে আমার পোড়া কপালে তার ঘুম নষ্ট হ'য়ে গিয়ে একটা নিদারুণ লজ্জাকর দৃশ্য তাকে দেখ্‌তে হো'ল এর জন্যে বাকী রাতটা বড়ই অশান্তিতে কাটিয়েছিলাম—ভেবে ভেবে তার প্রতিকারের উপায়ও একটা বের করে ফেলেছিলাম। তার ছেলের আফিসের চাকরে হ'বার তারী সখ, বাবাকে বলব এ অজুহাত দিলে যোনার মা'র মুখ বন্ধ হ'তে দেরী হ'বে না কিন্তু সকালে যখন চোখ চাইলাম, দেখি, সামনেই দাঁড়িয়ে শাশুড়ী। কাঁধে গামছা, বাম হাতের তালুতে তেল-ভাঁড়া আর সর্ব্বাঙ্গ থেকে তেল যেন ঝরে পড়ছে। বল্লেন—এখানে শুয়েছিলে কেন বৌ-মা?

মাথা নীচু করে যে উত্তর আমি পূজনীয় ব্যক্তিকে দিয়েছিলাম, সন্তই হওয়া দূরের কথা, শাশুড়ী পরিষ্কার বিরক্তির ভাষায় বল্লেন—তোমার যে শাশুর-অন্তর মুখোও দেখি বাছা!

তার বিরক্তির অন্ত নয়—বয়স্কা, সংসারজিজ্ঞা নারী বলেই তাঁর মুখের দিকে সাশ্চর্য্যে চোখ তুলেছি, শুনতে পেলাম—অত বাড়াবাড়ি ও ভালো নয় বৌ-মা। যা হয় সয়, তাই করতে হয়!

সে রাত্রে স্বামীর ঘরে ঢুকে, খাটের নীচে একটা মাদুর পেতে শুলাম; ঘুমুই নি, বেশ জানি কিন্তু কখন্ যে তিনি ঘরে ঢুকেছেন, খাটে শুয়েছেন কিছুই টের পাই নি, ভোরে ঘুম ভাঙতে দেখি অকাতরে নিদ্রা যাচ্ছেন। মনে মনে বল্লাম, ঠাকুর যা করেন মঙ্গলের জন্যই।

শব্দ করে সোটা দুই জানালা খুলতেই ধড়মড়িয়ে উঠে, কোনদিকে না চেয়ে—গম্ভীরভাবে বেরিয়ে গেলেন, সারা-দিন কোন্ একটা এ্যাম্বেচার পার্টির ছোঁড়াদের নিয়ে রিহার্সাল দিচ্ছেন, সন্ধ্যেবেলা দেওর এসে বল্লেন!

আমার স্বামী! আমার স্বামী যে বিদ্বান, বুদ্ধিমান! তাই এ ক'দিন বাইরে-বাইরেই কাটাচ্ছেন ভেবে কত না দুঃখ পেয়েছিলাম। আজ রাত্রে মনের কথা বলে তাঁর কাছে চাইব ভাবছি আর থেকে থেকে ঘড়ির কাঁটা লক্ষ্য করছি, সোনার মা বেজায় হ'য়ে বলে গেল—ওগো বাছা, দরজা বন্ধ করে শোও। সেউড়ীর দরওয়ান বলে গেল, সেই মুখ-পোড়া খ্যাটারের ছোঁড়াদের র‍্যাশ্‌ভাল হ'বে—(ড্রেস রিহার্সাল) বাবু আসতে পারবে নি। তুমি শোওনি বৌ-মা, আমি বাছা তোমার এই চৌকাঠের গোড়াতেই পড়ে রইনু।

৩

দিন সাতেকের মধ্যেই শুনতে পেলাম, স্বামী বদলি হয়েছেন। অতঃপর তাঁকে দিনাজপুর ডিভিসনের ভার দেওয়া হ'য়েছে, বাড়ীতে সাজ্ সাজ্ রব পড়ে গেল। খবর আমি তাঁর মুখ থেকে পাই নি—বাড়ীর স্ত্রী-পুরুষ যাকে সেরেস্টা বলত, সেই সোনার মা'ই আমাকে খবর দিয়ে গেল। এই সাতদিনের সাতটি রাতই স্বামী রাত্রে এসেছেন এবং আমাকে না জানিয়ে, না জাগিয়ে শুয়েছেন ও উঠে গেছেন—এতে দুঃখ হ'লেও আমার সান্ত্বনা ছিল; আর সত্যি কথা বলতে হ'লে মনে বেশ একটা গর্ব্ব বোধ করছিলাম যে—হাঁ, এই ত পুরুষ!

সাত দুঃখের মধ্যেও সুখের যে একটী সূক্ষ্ম রশ্মি ধরেই চলে ফিরে সুখাস্বেষণ করছিলাম, সেটাও ছিঁড়ে দিলেন, দেওরটি! একদিন কোত্থেকে ঘুরে ফিরে এসে বল্লেন জি-পি-ওর অমুক ডিপার্টমেণ্টের বাবুরা বড়ই আক্ষেপ করছে, এমন মনিষ মানুষ তারা অনেক দিন পায় নি! তবে স্বেচ্ছায় কেন যে তিনি এমন করে বন্দী হ'য়ে যাচ্ছেন, তা জানি নে!...বড় সাহেব ত বদলী করতেই চায় নি, দাদা শুনলুম একেবারে ঘরে পড়লেন! ভালোই হ'ল গো তোমার বৌদি, খুব বেশ বেড়াবে। প্রথম দফা ত ঐ দাঁড়ায় পুল দেখবে, তারপর দিনাজপুরের হিহি চাল, কুমড়ো আর কাটোয়ার তরমুজ খাবে।

দেওর বক্তব্য শেষ করে এবং নিত্য নিয়মিত ফল মাকড়ের ভাগ জানিয়ে চলে যেতেই চোখের সামনে আমার ব্রহ্মাণ্ডটা ঘুরে গেল। যেটাকে আমি তাঁর চেষ্টাকৃত সংযম ভেবে অন্তরে কত না হর্ষ অনুভব করেছি সেটার স্বরূপ দেখেই কেঁদে উঠ্‌লাম—সে, সংযম না ত্যাগ!

রাত্রে তাঁর পা ধরে কেঁদে ফেলাম, বল্লেন—সাহেব তাঁর হাত-ধরা নয়।

ঠাকুরপো'র কথাগুলো বলতে চটে উঠে বল্লেন—ও এ-সবের জানে কি! সাহেবের সঙ্গে কখনো কথা করেছে, সাহেব কি চীজ্ তা জানে—ইট্ পিড্ কোথাকার!

কাঁদতে কাঁদতে বল্লাম—একান্তই যদি যাবে, আমাকে নিয়ে চল।

তোমার যেমন একটা শাশুর আছে, আমারও তেমনি একটা শাশুর আছে—তা'তে লেখে পথি নারী বিবর্জ্জিতাঃ।

এক মুহূর্ত্তের জন্য রসনা উদ্যত হ'য়ে উঠেছিল, একটি-বার, একটিবারের জন্য আমি জানবারা হয়ে পড়েছিলাম, তখনি আমার সংযত হ'য়ে বল্লাম—আমার আবার শাশুর কিসের! আমার শাশুর ত তুমি!

বটে! কবে থেকে?—বলে তিনি আমার করতলেই চটিজুতা দু'পাটি ছেড়ে দিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। সেদিন আর মান-অভিমান ছিল না, রাত্রে আবার বল্লাম, পথেই যদি নারী বর্জ্জন করা বিধি, তবু হুকুম দিয়ে যাও, আমি ছোটঠাকুরপোকে সঙ্গে নিয়ে চলে যাব।

বল্লেন—আমি তা'কে বলে যাব, রেখে আসতে।

কবে?

যবে যেতে চাও! বল ত আজই রেখে আসুক।

কোথায়?

বাপের বাড়ী।

কাঁপতে কাঁপতে বসে পড়লাম।

আগেই বলেছি, অঙ্কে তবু দুখটাকে কিছুদিনও লোপ করতে পার, আমার বরাতে যেমন উদয় তেমনই অস্ত! মাত্র বাইশ দিন পেয়েছিলাম, কিন্তু বাইশ দিনের পাওয়াই মনে হ'য়েছিল বাইশ বছরের পাওয়া!

স্বামী চলে গেলেন। তার পরদিনই শাশুড়ী বল্লেন—বেবু বলছিল, কাল পরশু অনেক কাজ, তুমি কি আজই যাবে?—আমার উত্তর পাবার অপেক্ষা না করেই আবার বল্লেন, আজকালকার মেয়েদের সবই বাড়াবাড়ি—স্বামী বিদেশ গেল ও শ্বশুরবাড়ীতে আর মন বসে না। তা মা সে তোমার দোষ নয়, যেমন দিনকাল পড়েছে—তেমনি হ'বে ত!

আমি বল্লাম—আমি যাব না মা।

কেন গো? যেতে চেয়েছ শুনলুম...বলে গেল।

যেতে চাই-নি বলে ওঁকে মিথ্যাবাদী প্রতিপন্ন করতে পারলাম না, শুধু বল্লাম, মা, আমি আপনার কাছেই থাকব। আর কোথাও যাব না মা।

শাশুড়ী রাজী হ'লেন।

আমার স্বামী যে বিদেশে এবং বিনের পর দিন, সপ্তাহের পর সপ্তাহ গত হ'লেও তাঁর চিঠি পত্র আমি পাই না—এসব দুঃখ বেদনা কদাচিৎ কোন দিন আমার মনে পড়ত, যদি গভীর রাত্রে কখনও ঘুম ভেঙ্গে যেত, তবেই! অত বড় বাট-খানার এক কোণে আমি, আর কোথায় কিছু নেই—খানিকটে সাদা, খালি জমি। ওদিকের ছোট খাটে শাশুড়ী শুয়ে—অমনি মনে পড়ে যেত—চিঠি আসেনি, অমনি বুক ভেঙ্গে যেত, আমাকে তাঁর মনে নেই, অমনি সর্ব্বাঙ্গ অবশ হ'য়ে যেত—বুঝি আমি আর কেউ নই!

দেবর বাইরের ঘর ছেড়ে অন্দরের দালানে তাঁর পড়ার স্থান নির্দ্দেশ করলেন। শাশুড়ী বলিলেন, এই সোলমালে পড়া-শুনো.....ছেলে বল্লেন—তা হোক্-গে! তবু ও-বেচারার সঙ্গে একটু গল্প করা যাবে। একলা ওর দিন কাটে কেমন করে?

সত্যি। এর পর থেকে ১২৯ দিন যে কেমন করে বা কোথা দিয়ে কেটে গেছল, আমি তা টের পাই-নি! দেবরের সঙ্গে আলোচনার সময় আমি আবার সেই বহুদূর কৈশোর-কাল ফিরে পেতাম। এঁরও জ্ঞানের ভাণ্ডার পরিপূর্ণ, বাবার মতই মেহশিক্ত সুমিষ্ট কণ্ঠস্বর, তাঁরই মত অসীম ধৈর্য্য, তেমনি অনন্তসাধারণ বাক্‌পটুতা! কেন যে তিনি ওকালতী না করে' বসে আছেন, আগে জানি-নি, পরে জেনেছি। তিনি আদালত বয়কট করেছেন, শুধু আদালত নয়—সমাজকেও বয়কট করেছেন। বিয়ে-টা নাকি পরকালে হবে; দিন ক্ষণ স্থির হ'য়ে গেছে!

১৩০ দিনের দিন এক টেলিগ্রাম এল, ক্ষত অস্ত্র করিয়ে স্বামী হাঁসপাতালে। শাশুড়ী আমাকে দিয়ে তার পড়িয়ে সেই যে আমার মুখ থেকে চোখ্ ফিরিয়ে নিলেন, অনেকক্ষণ আর চাইলেন না। ঠাকুরপো বল্লেন—যাবে বৌ-দি?

আমি 'যাব' বলতেই টাইম-টেবল এসে গেল; সেখানে তার-ও চলে গেল—রাত্রেই রওনা। পরের দিন তিনটের সময় হাঁসপাতালে পৌঁছে শুনলাম যা,.....শাশুড়ী আমায় দেখেই করে চেয়ে উঠলেন, বুঝিয়ে দিলেন, তাঁর জন্যে স্বামী আমিই! একটা শ্যামবর্ণ মেম্ ক'দিন তাঁর পরিচর্য্যা করেছে, আমাদের পৌঁছাবার খানিক পরেই সে এসেছিল, কিন্তু কি-জানি কেন, আমাদের দেখেই পালিয়ে গেল।

ডাক্তারবাবু হেসে হেসে বল্লেন—এই খানেই টিকিট কালেকটরী চাকরী করে।

স্বামী সেরে উঠ্‌তেই শাশুড়ী তাঁকে বাড়ী নিয়ে যাবার জন্যে ধরাধরি আরম্ভ করলেন, শেষে কলকাতার হেড্-অফিসে তারখাত করিয়ে, লোক আনিয়ে চার্জ্জ বুঝিয়ে দিয়ে স্বামী আমাদের সঙ্গেই কলকাতা এলেন। সেই কাল মেমটি ষ্টেশনে ছিল, আমার ইচ্ছা হ'য়েছিল আলাপ করি, আমার শাশুড়ী মেম্ছ ছুঁড়ীর দিকে চেয়েই জ্বলে উঠ্‌লেন।

দেবর তাঁর মা'কে বল্লেন—ঐ মেমটি তোমাদের টিকিট চেক্ করতে আস্‌ছে মা!

ঝাঁটা মারব না?—বলে সত্যি সত্যিই কামরায় ঝাঁটা আছে কি-না শাশুড়ী তারই সন্ধান করতে লাগলেন।

স্বামী সেই ঘরেই ছিলেন, এক সময়ে ঠাকুরপো রিফ্রেস্‌মেণ্ট রুম্‌সে বরফ আনতে গেছেন, স্বামী কর্কশস্বরে বল্লেন—দেবা যাচ্ছে দাচ্ছে আর পেঁড়োয় বোষের মত ঘুরে বেড়াচ্ছে ও?

—

মানুষের মনটাকে অনেকে কাচের সঙ্গে তুলনা করে থাকেন। কাচ যেমন ভাঙলে বড়ই জোড়ো, একটা দাগ যায় না, মন-ও তেমনি একটিবার চিড় খেলে সে দাগ আর ঘোচে না—আমি কিন্তু সম্পূর্ণ মিলে যেতে দেখেছি! কোথাও এতটুকু দাগ ছিল না। তার পর দেড় বছর কেটে গেছে।

সন্ধ্যাবেলায় আমার বাবার নিধু খানসামা একগাল হেসে খবর দিলে,জামাইবাবু এসেছেন।

শুনেই মা আনন্দ গদগদ হ'য়ে বল্লেন—বাইরে কেন? ডেকে আন্, ডেকে আন...

আমার বুক কিন্তু কেঁপে উঠ্‌লো এবং সঙ্গে সঙ্গেই সাতদিনের শিশুর জন্যে সমস্ত বুকখানা চিড় চিড় করে উঠ্‌লো! মনে হতে লাগলো, হৃদয়ের ভাষে হৃদয়টা যেন ভেঙে পড়েছে, এবং সেই দশমাস দশদিনের সম্পর্কটা সারা অঙ্গে এমনই বেদনা জানিয়ে দিলে যে মাথাটা আর সোজা থাকতে পারল না, লুটিয়ে পড়ল—কোথা ছিল সেই সাতদিনের বুকে করা সন্তানের জন্যে এত মায়া, এত মমতা! যার অস্ফুট মুখটিও স্পষ্ট মনে নেই তারই জন্যে বুক যে এত টন-টনিয়ে উঠ্‌বে—তা কে জান্‌ত!

স্বামী এলেন, কোলের 'পরে টেনে নিয়ে কত আদরের কথা বল্লেন,—যে গেছে তার জন্যে শোক করতে বারণ করলেন, বল্লেন—সাত দিনের বই ত নয়! হায় পুরুষ! সে কি সাত দিনের? সে যে এই মেয়ে তিনশ' দিনেরও ওপর বাস করেছে! স্বামী বল্লেন,প্রথম সন্তান অনেকেরই অমন...আমার মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল, তারা তোমারই মত কাণ্ড জ্ঞানহীন!...পাঁচ মাসের সময় মা ও আমাকে আস্তে চেয়েছিলেন, পাঠাও নি কেন?...কথাগুলো বলে, বাঁধ উপরে ফেলেই নির্জীব হ'য়ে পড়লাম—পাছে আবার ও কথা উঠে পড়ে তাঁর কোলে মাথা রেখে শুয়ে শুয়ে বলতে লাগলাম, কেমন সুন্দর হ'য়েছিল, মুখখানি যেন তার বাপের মুখ বসানো—আর গড়ন-পেটন—শুন্‌তে শুন্‌তে তিনি এতই একাগ্রচিত্ত হ'য়ে গেছলেন, যে মাথার উপরকার ঘড়িটায় কখন যে ১০টা বেজে গেছে তা জান্‌তেও পারেন নি। বাহির বাইরে থেকে মা আমাকে ডেকে বল্লেন—দশটা ত বেজে গেছে, জামাই যাবেন না?—আমি 'কি জানি' বলে আবার ঘরে ঢুকেছি, মা নিজেই বল্লেন—বাবা,দশটা ত বেজে গেল, এইখানেই যা হয় কিছু খেয়ে যাবে কি?

তিনি হাত ঘড়িটা দেখে আমার মুখের দিকে চাইতে, আমি বল্লাম—এখানেই খাবে, না, বাড়ী দিয়ে...

বাড়ী আর যাব না।

শুনেই সেই বিবাগমনের পরের তেইস দিনের রাতটার কথা মনে পড়ে গেলো, শিউরে উঠ্‌লাম।

মা বল্লেন—বাড়ীতে কি খাবার করতে বলা আছে?

উত্তর দিলেন, না, এমন কিছু...

মা বল্লেন—এইখানেই খাও আর আমি রামবাবুকে মোটর ঠিক রাখতে বলেছি—পৌঁছে দেবেনখ'ন।

আহারের পর বল্লেন, কবে যাচ্ছ?

বল্লাম, মা বল্‌ছেন, কিছুদিন থাক্।

গেছে ত! মা এ মাসের শেষেই দিন করেছেন—যেতে হ'বে।

শরীরটা একটু না সারলে—

স্বামী একবার আমার সর্ব্বাঙ্গে দৃষ্টিপাত করে' বলে উঠ্‌লেন—সেখানেও চিকিৎসা দরকার বলে পাওয়া যাবে।

আমি বল্লাম, মা'র ইচ্ছে একটু সেরে···

তবে সার—বলে তিনি বেরিয়ে গেলেন। রামবাবু একটু পরেই যাকে এসে বল্লেন—জামাইবাবু হেঁটেই চলে গেলেন।

বাবা বল্লেন—কুশিক্ষার ফল।

মা এবার বেশ জোর দিয়েই বল্লেন—রাগই করুক আর যাই করুক, দু' মাস না গেলে পাঠাব না।

আমার শাশুড়ী একথা অবশ্য শোনেন নি, বোধ হয় অনুমান করে নিয়েছিলেন, নিশ্চে পাঠালেম, এতো বড় লোকের বাড়ীতে ছেলের বিয়ে দিয়ে তিনি বড় ভুল করেছেন। আমরা সেই ভুলের জন্যেই তাঁকে এমন চরণে ঠেলেছি।

আমার মা তাতেও টললেন না, তিনি লিখলেন, দিদি আমার মেয়ে বটে, কিন্তু তোমারও ত বৌ সে! তার মঙ্গল অমঙ্গল যে তোমার আমার দু'জনেরই মঙ্গল অমঙ্গল। এমনটা হ'য়ে গেল, কিছুদিন না গেলে আমার তাকে স্বামীর কাছে পাঠাতে সাহস করি নে।

মা'কে বোঝাতে গেলাম যে স্বামী যেরূপ অসন্তুষ্ট হ'ন এবং তাঁকে ভুল করাই যখন এই স্বামীদেবতাটির এক মাত্র উদ্দেশ্য তখন আর কি হ'বে মা,—যাই!

মা বল্লেন—তুই তুই ত খুব করছিস! যা, তারপর দু'দিন না যেতেই আবার একটাকে পেটে ধর, তারপর প্রাণ নিয়ে টানাটানি চলুক তাহলেই খুব তুষ্ট হবে, খুব সুখী করবি! সেই পাঁচ মাসের বেলায় দশখানা চিঠি লিখলুম আসতে, আসিস্ যদি এমনটা হয় না—অমন সোনার চাঁদ হারাতে হ'ত না।

মা গম্ভীরভাবে আরো বল্লেন—দু'টি বাদ পাঠাচ্ছি সে। পাঁচটা নয়, সাতটা নয়, আমার ত ঐ একটা। আর বেঁচে থাই নি ত।

হায় মা! বিবাহিতা মেয়ের এত শুভ চিন্তা তুমি কেন করছিলে! মা আমার! এত স্নেহবতী মা হ'লে ত তোমার আজ এমন অসময়ে পুড়ে থাক্ হ'তে হ'ত না!

দু' মাস কেটে গেলে, পুরুত ঠাকুর শুভ দিন খুঁজে দিয়ে নগদ-চারটে টাকা নিয়ে যেতেই বৃন্দাবন বস্ত্র-সহকারে আবার শাশুড়ীকে চিঠি লিখে দিলেন।

কলকাতা থেকে কলকাতা! উত্তর আর কি আসবে! যথাদিনে মোটরে চড়ে বাড়ি—দূরে থেকেই মনে হ'ল বাড়ীটায় কিসের একটা সমারোহ চলছে: কাছে আসতে উৎসব আয়োজন বলেই বুঝতে পারলাম। মেয়েদের বিয়ে নয় ত? কিন্তু সে কি করে হ'বে? তাঁর প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হওয়াটা বিচিত্র নয়, কিন্তু আমাকে না জানিয়েই?

মোটর ও থেমেছে—ঠাকুরপো ম্লানমুখে বেরিয়ে আস্‌ছিলেন; হঠাৎ চোখ তুলে আমাকে দেখেই আবার চিনি ভেতরে ঢুকে গেলেন।

রায়বাবু একটা চাকরকে ডেকে কি জিজ্ঞেস পড়া করছিলেন, আমি তার একবর্ণও শুনতে পাই নি, আমার দৃষ্টি, শ্রবণ—থাক্!

বাড়ী এসে শুনলাম। • • •

যোন-প্রভাব দুঃখে আমার ভাঙা বুক আরো ভেঙে গেল, আমার মত অভাগিনী পৃথিবীতে আরো আছে।

সাপের লেজ ধরে ঘোরানো বরং নিরাপদ, একজন স্ত্রীলোকের সামনে আর একজন স্ত্রীলোকের রূপের প্রশংসা করার চেয়ে অবিবেচনার কাজ আর ত্রিভুবনে নেই।

স্বামীর সামনে অন্য পুরুষের রূপ বা গুণের কথাই তুলবে না। সে মুহূর্ত্তে তুলেছ, অমনি তীক্ষ্ণ ও সতর্ক দৃষ্টি পড়তে থাকবে।

একবার একটা ইংরাজি থিয়েটার দেখতে গিয়ে গল্পটি শুনে এসেছিলাম।

এক ভদ্রলোক (সাহেব) আফিস থেকে বাড়ী এসে শুনলেন তাঁর স্ত্রী আর এক সাহেবের সঙ্গে থিয়েটার দেখতে গেছে। সাহেব চটে ঘটে লাল হ'য়ে সেই থিয়েটারে এসে ম্যানেজারের শরণ নিয়ে সাহায্য প্রার্থনা করায় ম্যানেজার ষ্টেজের উপর এসে বল্লেন, এক ভদ্রলোকের স্ত্রীকে নিয়ে আর একটা লোক থিয়েটারে এসেছে। এ বড় অন্যায়—এতে পুলিস কেস্ হ'তে পারে। আমি কিন্তু তা করতে চাইনে। আমি বলি কি আমরা সব আলো নিবিয়ে দিচ্ছি—তারা যেন এখনি থিয়েটার ত্যাগ করে।" এই বলে আলো নিবিয়ে দেওয়া হ'ল। পাঁচমিনিট পরে আলো জ্বলে উঠতে দেখা গেল প্রায় ২০ জোড়া লোক নেই; ৪০ খানা চেয়ার খালি।

I. C. S এর উক্তি :—আর ত যাব না লো সই—ভারতেরি কূলে।

রোকশোধ

(শ্রীনারায়ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।)

অষ্টম পরিচ্ছেদ

অনুপমার অনুমান মিথ্যা নহে. আগন্তুক যথার্থই লিলীমার আত্মীয়—খুব নিকট-আত্মীয়, দেবরের ছেলে, এবং লিলীমা কর্ত্তৃক নির্দ্ধারিত অনুপমার ভাবী স্বামী শ্রীমান ভূপতিনাথ ঘোষাল।

শুধু নিষ্কর কুলীনের সন্তান বলিয়াই যে ভূপতি নাথের গর্ব্ব ছিল তাহা নহে, ইংরাজী শিক্ষায় শিক্ষিত বলিয়াও সে যথেষ্ট আত্মশ্লাঘা অনুভব করিত। ক্ষুদ্র নিতাইগঞ্জ গ্রাম খানির মধ্যে প্রথম গোবর্দ্ধন ঘোষালের ছেলে ভূপতিনাথ যখন ইংরাজি বিদ্যা শিক্ষার জন্য কলিকাতা যাত্রা করিল এবং গোবর্দ্ধনের শিষ্য বাড়ীতে থাকিয়া এ বি সি ডি পড়িতে থাকিল, তখন গোবর্দ্ধন দাদাঠাকুরের ছেলে হইতে এক সময়ে যে বনমালী সমাজের নিতাইগঞ্জ গ্রামখানা আলোকিত হইয়া উঠিবে এমন আশা গ্রামের আবাল বৃদ্ধ বনিতা সকলেই অন্তরে পোষণ করিতে লাগিল। তাহাদের আশা অপূর্ণ রহিল না; বছর দুই পরে ভূপতিনাথ গ্রামে ফিরিল. ছোট বড় চুলে বাঁকা তেরী কাটিয়া যখন তাহাকে রাইস্ বাগ মাকে কামার মাদায়, এবং জলকে ওয়াটার বলিতে আরম্ভ করিল, তখন দেশ আলোকিত হইবার পক্ষে গ্রামের লোকের বিন্দুমাত্র সন্দেহ রহিল না।

বছর পাঁচ ছয় পরে দ্বিতীয় শ্রেণীর দুর্ভেদ্য গণ্ডী অতিক্রম করিয়া ভূপতিনাথ যখন কিছুতেই প্রথম শ্রেণীতে উপস্থিত হইতে পারিল না এবং শিক্ষকগণের সহিত তদীয় অন্নদাতা কেনারাম দত্তও হতাশ হইয়া তাহাকে চাকুরীর চেষ্টা দেখিতে পরামর্শ দিল, তখন ভূপতিনাথ শিক্ষকগণের বিদ্যা বুদ্ধি ও কেনারাম দত্তের উদারতা সম্বন্ধে সন্দিহান হইয়া মার্জ্জিত ইংরাজী বুলি প্রভৃতি পরিমাণে সহরে চং করিয়া দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিল। দেশে ফিরিয়া সে প্রচার করিল যে, শিক্ষা তাহার সম্পূর্ণ হইয়াছে, তাহাকে পড়িবার মত বিদ্যা কোন শিক্ষকের নাই। এমন কি কলিকাতার লাটসাহেব পর্য্যন্ত তাহার বিদ্যাবুদ্ধি দর্শনে চমৎকৃত হইয়া তাহাকে নিজের কাছে রাখিতে চাহিয়াছিলেন। কিন্তু কুলীন ব্রাহ্মণের সন্তান—ইংরেজের কাছে থাকিলে পাছে নাকি ধর্ম্ম নষ্ট হয় এই আশঙ্কায় সে কলিকাতা ছাড়িয়া দেশে পালাইয়া আসিয়াছে। দেশের লোক বড় বড় করিতে লাগিল; পুত্রের অসাধারণ বিদ্যাবত্তা ও ধর্ম্মনিষ্ঠায় গোবর্দ্ধনের আহ্লাদের সীমা রহিল না; তিনি সত্যনারায়ণের সিন্নী দিয়া গ্রামের ইতর ভদ্র নির্ব্বিশেষে সমগ্র পাঁচসিকার বাতাসা বিতরণ করিয়া দিলেন।

ভূপতিনাথ মহোৎসাহে গ্রামের মধ্যে আপনার বিদ্যা প্রচার করিয়া বেড়াইতে লাগিল। কার্ট বুকের 'ওয়ান্ বর্ণ, আই মেট এ লেম্ ম্যান্' হইতে যেমন বীডাবের দম-বেশে'র গল্প পর্য্যন্ত বক্তৃতার আকারে গ্রামের লোকদিগকে শুনাইয়াছিল। সে বক্তৃতার মর্ম্ম কেহ বুঝুক আর না বুঝুক, ভূপতিনাথের মত পণ্ডিত যে জগতে আর নাই ইহা সকলেই বেশ বুঝিতে পারিল। ধর্ম্মপ্রাণ তত্ত্বনিধি মহাশয় স্বীয় মূর্খ পুত্রের জন্য আক্ষেপ প্রকাশ পূর্ব্বক গোবর্দ্ধনকে বুঝাইয়া দিলেন, বহু তপস্যা না থাকিলে ভূপতিনাথের ন্যায় সৎপুত্র জন্মগ্রহণ করে না; 'সৎপুত্রঃ কুলদীপকঃ।'

পুত্রের পাণ্ডিত্যে কুল যতই উজ্জ্বল হউক, গোবর্দ্ধনের অভাব কিন্তু একটুও দূরীভূত হইল না, বরং পণ্ডিত পুত্রের পাণ্ডিত্যের উপযোগী সুভোজ্য আহরণ করিতে এবং রাজকক্রিয়ালব্ধ মোটা কাপড় বেচিয়া সূক্ষ্ম পরিচ্ছদ যোগাইতে সে অন্ধকার যেন আরও একটু গাঢ় হইয়া আসিল। অনেকেই তাঁহাকে ভবিষ্যতে একটা উজ্জ্বল আলোক দেখিতে পাইবে বলিয়া আশা দিল বটে, কিন্তু সে আলো দেখিবার আগেই অন্ধকারে অন্ধকারেই গোবর্দ্ধন ঘোষাল আর এক মহান্ধকারের রাজ্যে চলিয়া গেলেন।

তাঁহার মৃত্যুর পর যজমান শিষ্যেরা ভূপতি নাথকে যাজন ক্রিয়া সম্পন্ন করিতে অনুরোধ করিল। কিন্তু টেড়ী ছাড়িয়া শিখা রাখিতে, এবং পাঞ্জাবী ফেলিয়া নামাবলী স্কন্ধে লইতে ভূপতিনাথের প্রবৃত্তি হইল না। কাজেই সংসার অচল হইয়া আসিল। বিধবা জেঠাইমা কেমঙ্করী দেবী মাস দুইটার বেশী একাদশীর সঙ্কল্প দেখিয়া সম্পর্ক ভটাইয়া পিতৃতোতাই মহেন্দ্রনাথের নিকট আশ্রয় লইলেন। ভূপতিনাথও দেশে ম্যালেরিয়ার প্রাদুর্ভাব দর্শনে ভীত হইয়া কলিকাতা যাত্রা করিল। দশ বারো বছরের ছোট ভাইটি যজমান বাড়ী ঘুরিয়া কোনরূপে বিধবা মাতার ও নিজের অন্নসংস্থান করিতে লাগিল।

কলিকাতা গিয়া ভূপতিনাথ দিনকতক কেনারাম দত্তের অন্ন ধ্বংস করিল। তার পর গুরুপুত্রের উপর শিষ্যগণের ভক্তির অভাব দর্শনে মর্ম্মাহত হইয়া ভূপতিনাথকে অন্যত্র চেষ্টা দেখিতে হইল। অনেক চেষ্টার পর একটী পনেরো টাকার মাহিনার চাকরীর যোগাড় করিল। কিন্তু

চা বিস্কুট পানে সিগারেটেই পাঁচ সাত টাকা খরচ হইতে লাগিল; কাজেই ভূপতিনাথকে হোটেলে খাইয়া শিবুর দোকানের এক পাশেই পড়িয়া থাকিতে হইল।

এইরূপ বছর খানেক কষ্টভোগ করিবার পর কষ্টটা যখন নিতান্ত অসহ্য হইয়া উঠিল, তখন ভূপতিনাথ চাকরী ছাড়িয়া এক যাত্রার দলে ঢুকিয়া পড়িল। মাস কতক বেশ আমোদেই কাটিল; তার পর আমোদ অপেক্ষা একবার অনাহার, অনিদ্রা প্রভৃতি কষ্টগুলা যখন প্রবল বলিয়া অনুভূত হইল, তখন সে যাত্রা ছাড়িয়া পুনরায় চাকরীর অন্বেষণে প্রবৃত্ত হইল।

চাকরী মিলিল, কিন্তু মাহিনা সেই পনরো টাকার বেশী হইল না। কাজেই ভূপতিনাথকে আর কিছু বেশী টাকার চেষ্টা দেখিতে হইল। অনেক চেষ্টার পর থিয়েটারে ঢুকিতে পাইল এবং ছয়মাস মাস এগ্রেটিস খাটিবার পর দশ টাকা তলবিয়ী মাহিনা পাইতে লাগিল। ভূপতিনাথ ভাবিল পনরো টাকার উপর এই দশটা টাকার অবায় অঙ্কে পড়িয়া তাহার আর্থিক অবস্থাকে কিঞ্চিৎ সচ্ছল করিয়া দিবে। কিন্তু অবস্থার সচ্ছলতা দূরে থাকুক, থিয়েটারে আসিবার উপযোগী পোষাক পরিচ্ছদ এবং পান সিগারেট ইত্যাদির খরচে দশটা টাকায় কুলাইয়া উঠিল না, বরং চাকরীর পনরো টাকাতে ও টান পড়িল; দিনে চাকরীর খাটুনির উপর রাত্রিতে থিয়েটারের জাগরণ জনিত কষ্ট, ইহাই ভূপতিনাথের লাভ হইল। চাকরীও ত্যাগ করা চলে না। অগত্যা ভূপতিনাথকে দুইটা কষ্টই সমানভাবে ভোগ করিতে হইল।

কিছুদিন পরে কষ্টটা যখন ক্রমেই দুঃসহ হইয়া উঠিল, সন্ন্যাস ধর্ম্ম গ্রহণ করিলে এই দুঃসহ কষ্টের হাত হইতে অব্যাহতি পাওয়া যায় কি না ইহাই ভূপতিনাথের প্রধান চিন্তনীয় বিষয় হইয়া পড়িল। হঠাৎ একদিন সে সংবাদ পাইল, জেঠাই মা সদাশয়ার্থে কলিকাতায় আসিয়া শিবুবাড়ীতে অবস্থান করিতেছেন। ভূপতিনাথ গিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিল, এবং কথা প্রসঙ্গে জেঠাইমার নিকট দুঃখ কাহিনী সবিস্তারে বিবৃত করিল। ক্ষেমঙ্করী দেবী তাহার দুঃখের কাহিনী শুনিয়া ব্যথিত হইলেন এবং তাহাকে জমীদারী সেরেস্তার একটা বড় কাজে লাগাইয়া দিবার অভিপ্রায় দিয়া সঙ্গে যাইবার জন্য অনুরোধ করিলেন। দেবী অনুরোধ করিতে হইল না; কলিকাতার ভাতে ভূপতিনাথের তখন অরুচি জন্মিয়া গিয়াছিল। সুতরাং জেঠাইমার প্রস্তাবে সহজেই সে সম্মতি দিল। এবং একটা শুভদিন দেখিয়া জেঠাইমার সহিত সন্তোষপুরে উপস্থিত হইল।

দশম পরিচ্ছেদ

পিসীমা অনুপমার সহিত ভূপতির পরিণয় দিলেন। অবশ্য তাহার যাত্রা থিয়েটার প্রভৃতি বৃত্তান্তগুলা গোপন করিয়া সে যে লেখাপড়ায় একজন বিদ্যাগজ এবং কলিকাতায় ১৫৲ মাহিনায় চাকরী করিলেও শুধু অনুপমার মঙ্গলের জন্যই তাহার অভিভাবক রূপে বিষয় সম্পত্তি তত্ত্বাবধারণের নিমিত্ত বিস্তর অনুরোধ উপরোধ করিয়া এখানে লইয়া আসিয়াছেন, সত্যের উপর অসাধারণ নিষ্ঠাবতী হইলেও পিসীমা ইহা বিনয়ভাবে অনুপমাকে বুঝাইয়া দিলেন। অনুপমা স্বীয় মঙ্গলাকাঙ্ক্ষিণী পিসীমার নিকট কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিয়া ধন্য হইল।

কিন্তু ভূপতিনাথের বিদ্যাবুদ্ধির পরিচয় পাইতে অধিক বিলম্ব হইল না, দুই-চারিদিনের মধ্যেই তাহার বিদ্যার পরিমান কতটুকু তাহা অনুপমা বেশ বুঝিয়া লইল। বুঝিলেও সে কিন্তু কিছু বলিল না; পিসীমার আত্মীয় বলিয়া তাহার উপর যতটুকু শ্রদ্ধা ভক্তি প্রদর্শন করা আবশ্যক তাহা সামান্যভাবেই দেখাইয়া আসিতে লাগিল। তবে তাহাকে স্বীয় অভিভাবক পদে বরণ করিয়া তাহার উপর বিষয় সম্পত্তির ভার অর্পণ করিবে কি না সে সম্বন্ধে ইতস্ততঃ করিতে লাগিল।

ক্রমশঃ।

আলোক বধূ

(শ্রীকালীদাস রায়)

চিনেছি চিনেছি তোমায় তুমি যে মোদের দিনের আলো
হয়েছ অন্তঃপুরিকা সহসা নবরূপে আজি সেজেছ ভালো।
মধুর অরুণ গোধূলি লগনে
শঙ্খ বাজিল ভবনে ভবনে
শুভ পরিণয় যাত্রা সরণে দিগ্‌বিদিকে বুঝি পাঠালো।
ঝিলী নূপুর বাজায় শোভনে
পশিলে এখন পতির ভবনে,
বাতায়নে মুখ চন্দ্রে তোমায় তারপর হতে কিরণ ঢালো।
তোমার গায়ের দীপ্তি সোণা মোতি
ছুটাইল কিবা তারকায় জ্যোতি
গৃহ-দেউলের ছায়াপথে পতি সেই হ'তে ধৃত প্রদীপ আলো।

দ্বাদশ গোপাল

[পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর]

যে বিস্ময়কর বস্তু দর্শনে তাহার সমস্ত দেহ-মন এমন অভাবনীয়, অচিন্তনীয়রূপে বিস্ফারিত হইয়া গিয়াছে, পূর্ব্বাপর আলোচনা করিয়া দেখিতে দেখিতে সেই জিনিষটা কত না সহজ স্বাভাবিক হইয়া গেল। তাহার মনে পড়িল, মেলার শেষে সঙ্গীহারা হইয়া সে যখন অগণিত কুৎসিৎ ও কৌতূহলী দৃষ্টির সম্মুখে দাঁড়াইয়া মরমে মরিয়া যাইতেছিল, তখনকার কথা। তখন কেমন করিয়া সেই লোকটি একেবারে তাহার দক্ষিণ করতল তুলিয়া একান্ত পরিচিতের মত ডাকিয়া লইয়াছিল। তাহার মনে পড়িল, অসংখ্য লোকে ও তাহাকে কত রকমে কতবার ডাকা-ডাকি করিতেছিল, কত প্রলোভন দেখাইতেছিল, কিন্তু সেই লোকটি! কোথা হইতে একটা ধমকা হাওয়ার মত সকলকে ঠেলিয়া দিয়া, সকলের সম্মুখ হইতে ছিনাইয়া লইয়া গিয়াছিল! সে-কি কম সাহসের পরিচয়? সেই মুহূর্ত্তেই কি সেই লোকটার পুরুষত্বের তলে অগণিত দর্শক যারা নত হয়ে নাই? ঠিক তদ্মুহূর্ত্তেই কি পাল্কিকেও তাহার আজ্ঞা অবনত শিরে বহন করিতে হয় নাই?—সেই জলদ মন্দ্র স্বর, সেই নির্ভিক তেজোদীপ্ত পাদক্ষেপ এখনও যে পাল্কির কাণে বাজিতেছে, এখনও যে সমস্বরে তাহারা বলিতেছে—হাজার হাজার দর্শকের মধ্যে সেই অসিয়াছিল একটি পুরুষ! যাহার কাছে সকলকেই ম্লান, নিষ্প্রভ হইতে হইয়াছিল এবং সেই সঙ্গে আরো। বলিতেছে, মিথ্যা বৃথা—পুরুষের কাছে নারীর গর্ব্ব বৃথা, বৃথা, বৃথা।

অথচ এ চিন্তাও দুঃখের। যে গর্ব্বটুকু রহিয়া রাখিতে, আটুট অক্ষুণ্ণ রাখিতে এত চেষ্টা করিয়াছে—গিয়াছে জানিয়াও সে টুকুর মায়া ত্যাগ করা তাহার পক্ষে দুঃসাধ্য ছিল। যদি গর্ব্বই গেল তাহার, তবে আর রহিল কি। তাহার মনে হইতেছিল যুগ যুগান্ত ধরিয়া বিশ্বজগতের নারীরা যে পুরুষের উপর আধিপত্য করিয়া আসিতেছে, এত কাব্যে এত উপন্যাসে সেই নারীরই জয়-সংবাদ ঘোষিত হইতেছে—সে সকল কি নিছক কবি-কল্পনাই!—তাহার মধ্যে কোথাও এতটুকু সত্যের গন্ধ নাই, আভাস নাই? সব মিথ্যা?

না, না, তাই বা কেমন করিয়া হয়? তাহার যৌবনেতিহাসে যে উহারই বিরুদ্ধে সাক্ষ্য স্বরূপ দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। তাহার বিগত দিনের প্রত্যেক ক্ষুদ্র বৃহৎ ঘটনাগুলি যে সেই বিজয়গর্ব্বটাই বিঘোষিত করিতেছে। তবে মিথ্যা হয় কেমন করিয়া? না, মিথ্যা নয়—তারস্বরে সর্ব্বেন্দ্রিয় বলিতেছে—মিথ্যা নয়, মিথ্যা হইতে পারে না। পুরুষ চিরদিনই নারীর কাছে পরাজিত; প্রকৃতিই এই বিশ্ব-সৃষ্টিকে চালাইতেছে, পুরুষ সেখানে অকর্ম্মণ্য স্থবির নির্জ্জীব।

বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের যে চিরন্তন নিয়মে এই সংসার চলিতেছে—আজ কি সেই একটা লোকের জন্য তাহার এমন পরিবর্ত্তন হইয়া যাইবে! আজ কি প্রকৃতি এমনই পরাভব মানিয়া নিষ্ফল গর্জ্জনে মাথা খুঁড়িয়া মরিবে! তাহার চেয়ে যে মৃত্যু ভাল, চের কাম্য।

তাহার সারা অঙ্গে উষ্ণ শোণিত-প্রবাহ ছুটিল। অনেকদিনের পর তাহার শরীর মধ্যে সেই তরঙ্গ উৎক্ষিপ্ত হইতে লাগিল, যাহা তাহার প্রথম যৌবনের মধুময় প্রথম দিনগুলিতে সে ক্ষণে ক্ষণে অনুভব করিত! এতদিন তাহারা যেন সেজ গুটাইয়া আপন বিবরে মুখ লুকাইয়া পড়িয়াছিল, পরে ফণিনীর মত মাথা তুলিয়া দাঁড়াইল। হঠাৎ এক সঙ্গে শত ফণা বিস্তার করিয়া বিষাক্ত জিহ্বার অগ্র দিতে লাগিল—কোন ভয় নাই, কোন ভয় নাই।

পাল্কি কাণ পাতিয়া সে কথা শুনিল; এতদিন পরে অন্তরবাণী শুনিয়া তাহার হৃদয় আনন্দ অনুভব করিল; নাচিতে লাগিল, একবার, একবার, আর একবার যদি দেখা পায়...

৮

বিমান বাসায় ফিরিতেই দেখিল, তাহার নির্দ্দিষ্ট কক্ষটির খোলা জানালা দিয়া খানিকটা আলো বাহির হইয়া চৌবাচ্চাটির উপর পড়িয়াছে। মধুর মায়াবরের বাহিরে একখানা চৌকির উপর সটানভাবে শুইয়া নিদ্রা দিতেছিল, বিমান কম্বরে তাহাকে ডাকিয়া তুলিল। মধুর অসময়ে এমন অরসিকের মত আহ্বানে অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া একেবারে রক্ত চক্ষে মায়াবরের ঠাকুরের উদ্দেশ্যে কি খানিকটা গরলোদ্গারের চেষ্টা করিতেছে, এমন সময় বিমান ডাকিল—মধুর!

মধুর ফিরিয়া দেখিয়াই দাঁড়াইয়া উঠিল। বিমান ঘিতলের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া বলিল—বেটা কুঁড়ের সর্দ্দার! ঘর পরিষ্কার করেছ, আলোটা নেবাতে পার নি? বড় পয়সা সস্তা দেখেছ—না?

মধুর বলিতে যাইতেছিল, আজ্ঞে...

আর আজ্ঞেতে কাজ নেই, খুব হ'য়েছে। এই তিন ঘণ্টা না হয়, আলো জলছে, তার বদলে চার আনা আর কাইন্

আট আনা, মাইনে থেকে বাদ দিলেই হ'ল্ হ'বেখন।—বলিয়া সে সিঁড়ির উদ্দেশে চলিল।

মধুর বলিল—আমি বুঝি আলো জেলে রেখেছি। সেই বাবু ত এসেছিলো, যাবার সময় হবে জেলে রেখে গেছে।

কে বাবু?

আমি চিনিনে আজ্ঞে। সাহেব সাজা!

সাহেব সাজা! নাম জিজ্ঞাসা করনি কেন?

মধুর বলিল, সেরূপ সেধে'স ব্যক্তির সে নহে। জিজ্ঞাসা সে ঠিকই করিয়াছিল, বাবু উপরের ঘরে লিখিয়া রাখিয়া যাইবেন বলিয়াছিলেন।

কে সাহেব সাজা লোক আসিতে পারে, ভাবিতে ভাবিতে বিমান উপরে উঠিল। যার সমীপে আসিয়া যাহা দেখিল, তাহাতে বিস্ময়ের ও আনন্দের সীমা রহিল না। পায়ের জুতাটা কোন মতে ছুড়িয়া ফেলিয়া ঘরে ঢুকিয়া একেবারে তাহাকে বুকের মধ্যে জড়াইয়া ধরিয়া বলিয়া উঠিল—কখন এলি ভাই পটল?

অনেকক্ষণ এসেছি। তোমার আর এক বন্ধু এসেছিলেন, এই তাঁর কার্ড!

বিমান বলিল, আজ্ঞে! অজিতকে তুই জানিস্‌নে বুঝি? সে যে ডাক্তার,—মেডিকাল কলেজে কাজ করে।

তা হ'বে। তিনি টেবিলে বসে চিঠি লিখ্‌ছিলেন—এমন সময়ে আমি এলুম। আমাকে বল্লেন, কার্ডখানা তোমাকে দিতে, আর বল্‌তে, আস্‌তে হপ্তা থেকে তিনি সেম রায় কোম্পানীর ডাক্তারখানায় বস্‌বেন।

বিমান কয়টী অঙ্গুলির মধ্যে কার্ডখানিকে ঘুরাইতে ঘুরাইতে জিজ্ঞাসিল, তোর বুঝি আজ যেতে যাওয়া হ'ল না পটল?

পটল বলিল, না।

বিমান এক মিনিট পরে বলিল, কেন গেলি নে যে?

গেলুম না!—বলিয়া পটল মুখটি নমিত করিয়া লইল।

বিমান নীরবে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া বসিয়া রহিল। তারপর ধীরে ধীরে উঠিয়া জামাটি খুলিয়া আলনায় ছড়াইয়া দিতে দিতে বলিল—বাড়ীতে খবর দেওয়া আছে না কি?

দেওয়া ছিল, টেলিগ্রাম করে দিয়ে এলুম।

বিমান বস্ত্র পরিবর্ত্তন করিল, বারান্দায় গিয়া পা ধুইয়া আসিল, প্রতি মুহূর্ত্তেই আশা হইতেছিল, পটল আরো কিছু বলিবে, সমস্ত স্থির থাকা সত্ত্বেও না যাইবার কারণটি ব্যক্ত করিবে—কিন্তু পটল সেই যে মন টেবিলের উপর হাত রাখিয়া একখানা ইংরেজী কেতাবের উপর ঝুঁকিয়া বসিয়াছিল, ঠিক তেমনই রহিল।

বিমান ঘরটি ভেজাইয়া দিয়া চৌকীতে আসিয়া বসিতেই পটল বলিল—বিমানদা যাবে?—তাহার গলার মধ্যে স্বর যেন কাঁদিয়া উঠিল।

বিমানের অন্তরও হাহাকার করিতেছিল, কিন্তু অতি কষ্টে সে ভাব গোপন করিল, একটুখানি হাসির ভাণ করিয়া বলিল—কোথা যাব রে—বিলেত?

পটল ব্যথা-ক্ষুব্ধ দৃষ্টি তুলিয়া বিমানের দিকে চাহিল; চোখ দু'টা তাহার ছল ছল করিয়া উঠিল; অধর ওষ্ঠ বার দুই নড়িয়া উঠিল; কণ্ঠের শিরাগুলি স্ফীত হইয়া তখনি স্থির হইয়া গেল, কোন কথা না বলিয়াই সে আবার মুখ নত করিল।

বিমান সস্নেহে তাহাকে কাছে টানিতে টানিতে বলিল—কোথা যাব পটল?

আমাদের বাড়ী?

তোদের বাড়ী?

হাঁ।

কেন রে? ওঃ!

পটল নিরুত্তরে কহিল—যাবে না?

বিমান কি উত্তর দিবে যেন ভাবিয়াই পাইতেছিল না, শেষে জড়িতকণ্ঠে কহিল—তুই যেতে বলিস্?

পটল বলিল—তোমাকে তখন বল্‌তে পারি নি বলেই আজ আমি বাড়ী যেতে পারলুম না। বিমান দা!

বিমান তাহার কণ্ঠের স্বরেই বুঝিল, সে যেন অতি কষ্টে অশ্রু দমন করিতেছে। যদিও পটলের বিবাহে যাইবে না, ইহা একরূপ স্থিরীকৃতই হইয়াছিল, যেহেতু এই বিবাহ সম্পূর্ণই তাহার অমতে ঘটিতেছে—তবুও তাহার এই আর্ত্তস্বরে, তাহার এই বাষ্পাকুল দৃষ্টিতে বিমানের সঙ্কল্প, প্রোতের মুখে কেণাগুলির মত উবাও হইয়া গেল। পটলের হাত দুটা তুলিয়া লইয়া চাপিয়া বলিয়া উঠিল—কেন যাব না পটল। যাব!

পটল কথা কহিল না; বুঝা গেল না এই সংবাদে সে আনন্দিত বা দুঃখিত হইল। তাহার প্রয়োজনও ছিল না, কি তাহার সঙ্কল্প, কিসের ভয়ে তাহার এত চিন্তা? প্রিয়বর সুখী হইবে—ইহাই কি যথেষ্ট নয়?

বিমান বলিল—তুই ত কালই যাচ্ছিস্! চল্‌না, তোর সঙ্গেই যাই।

ক্রমশঃ

ভারতীয় বাদ্যযন্ত্র

(শ্রীশরচ্চন্দ্র ঘোষাল, এম-এ, বি, এল,)

ভারতীয় বাদ্যযন্ত্র গুলি ধীরে ধীরে বিলুপ্ত হইয়া যাইতেছে। কি কারণে ইহা ঘটিতেছে তাহা ভাবিতে গেলে অনেক কথা বলিতে হয়। ভারতবর্ষে সাধারণতঃ কোন জিনিষেরই ক্রমোন্নতি সাধিত হয় না। বহু প্রাচীন কালে যে উপাদানে ও যে অবয়বে যন্ত্র গঠিত হইত, তাহাই অনুকৃত হইয়া আসিতেছে। উপাদানে বা গঠনে কিছু কিছু পরিবর্ত্তন করিয়া উন্নতি সাধনের চেষ্টা আদৌ পরিলক্ষিত হয় না। ইহাতে একটি সুবিধা হইয়াছে বটে যে, এখনকার যন্ত্রগুলি দেখিয়াই আমরা প্রাচীন যন্ত্রগুলির আকার ও অবয়বাদি অনুমান করিতে পারি কিন্তু এই উপকার ছাড়া ক্রমোন্নতির জন্য অত্যাবশ্যক পরিবর্ত্তনাদির কোন সুবিধা না থাকায়, যন্ত্রাদির উপাদানে বা অবয়বে ঘটিত যে দোষ সৃষ্টির সময় হইতে রহিয়াছে, তাহার সংশোধনের আর কোন ব্যবস্থাই হয় নাই।

ভারতীয় বাদ্যযন্ত্র নির্ম্মাতার সংখ্যা ও অনেক হ্রাস প্রাপ্ত হইয়াছে। ভারতের সর্ব্বত্রই কলের সাহায্য না লইয়া হাতের দ্বারাই সমস্ত বাদ্যযন্ত্র গঠিত হয়। অধুনা সেতার, এস্রাজ প্রভৃতিতে দু বিশিষ্ট কাণ সংযোজিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে, কিন্তু তাহাতে তারগুলির সঙ্কোচ ও প্রসারণ নিয়মিত করা ভিন্ন, যন্ত্রের প্রকৃতির কোন পরিবর্ত্তন হয় নাই। অন্যান্য অবয়বাদি প্রাচীন কালের মতই আছে। দুই চারিটি যন্ত্র ভিন্ন অন্য প্রকারের যন্ত্র এখন কিনিতে ও পাওয়া যায়ই না, কয়মাস দিয়া তৈয়ার করিবার অভিপ্রায় করিলেও, উপযুক্ত শিল্পী খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। ইহার প্রধান কারণ এই যে শিল্পীগণ যে পরিশ্রম করিয়া একটি বাদ্যযন্ত্র নির্ম্মাণ করিবে, ঠিক সেই পরিশ্রমে অন্যবিধ কার্য্য করিলে তাহাদের আয় অধিক হয়। দুই চারজন ধনী ব্যক্তি ভিন্ন অধিক অর্থ ব্যয় করিয়া কয়মাস দিয়া কেহ বাদ্যযন্ত্র প্রস্তুত করান না। কাজেই শিল্পীগণ কাঠের নক্‌সার কাজ, বাক্স, আলমারি প্রভৃতি প্রস্তুত করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে। অনভ্যাস হেতু এখন কয়মাস দিলেও ইহাদের আর ভাল যন্ত্র তৈয়ার করান যায় না। এই কারণে পুরাতন বাদ্যযন্ত্র সংগ্রহ করিতে কালোয়াৎ গণের আগ্রহ দেখিতে পাওয়া যায়। পুরাতন যন্ত্রের অবশ্য আরও গুণ আছে। ইহার সুর সুস্থির হয়। কিন্তু এইসব কারণ ছাড়াও অপেক্ষাকৃত নির্দ্দোষভাবে গঠিত যন্ত্র পাইবার আগ্রহেই পুরাতন যন্ত্রের আদর হইয়া থাকে।

সাধারণ ভদ্রশ্রেণীর মধ্যে সঙ্গীতের যেরূপ আদরও নাই। আমাদের দেশে এক কথা প্রচলিত আছে "গান বাজনা এক আপীসের, আর এক কবিরেজের।" এই বিশ্বাস সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক। বহু প্রাচীনকালে প্রত্যেক নাগরিকের সঙ্গীত শাস্ত্রে অভিজ্ঞতা থাকিত। বাৎস্যায়নের কামসূত্রে নাগরিকের গৃহ বর্ণনায় নাগরকাবসথে বীণার কথা পাওয়া যায়। সংস্কৃত কাব্য নাটকাবলীতে ভারতীয় বিবিধ বাদ্যযন্ত্রের বহু উল্লেখ পরিদৃষ্ট হয়। আজকাল ভারতীয় বাদ্যযন্ত্রের উপেক্ষার প্রধান কারণ, ইহা সুলভ ও সহজ প্রাপ্য নহে। ইহা শিক্ষা করিবার সহজ প্রণালী সঙ্কলিত প্রথাদি নাই। বৈজ্ঞানিক প্রণালিতে শিক্ষা দিতে পারেন, এমন লোকও দুর্লভ। এবং ভারতীয় বাদ্যযন্ত্রে সুর বাঁধা এক কঠিন ব্যাপার।

শেষোক্ত কারণটিই অনেকের পক্ষে ভারতীয় বাদ্যযন্ত্রে শিক্ষালাভের প্রধান বাধা। আমরা কোন মজ্‌লিসে গেলেই দেখিতে পাই, সঙ্গীত অনভিজ্ঞ ভদ্রমহোদয়গণ, ওস্তাদ্‌গণের যন্ত্রাদির সুর বাঁধার প্রয়াসে যে সময় অতিবাহিত হয়, তাহাতে মহা বিরক্ত ও ধৈর্য্যচ্যুত হইয়া পড়েন। আগে হইতে একটি যন্ত্রের সুর অবশ্য বাঁধিয়া রাখিতে পারা যায়, কিন্তু দুই তিনটি যন্ত্র একসঙ্গে সুর মিলাইয়া বাজাইতে হইলে (বিশেষতঃ বাদকগণ যদি মজ্‌লিসেই প্রথম মিলিত হন) আগে হইতে সুর ঠিক করা অসম্ভব। এই সুর বাঁধা ব্যাপারটিও কঠিন। নূতন শিক্ষার্থীর সুরের কোন জ্ঞানই সাধারণতঃ থাকে না, কাজেই তাহার হাতে কোন যন্ত্র পড়িলে, বিনা সাহায্যে সুর বাঁধা অসম্ভব হইয়া পড়ে। ভালরূপ সুর বাঁধা না থাকিলে যন্ত্রের আওয়াজও ভাল হয় না। কাজেই অল্প কয়েকদিন চেষ্টার পরই সাধারণতঃ এখন শিক্ষার্থী ভারতীয় বাদ্যযন্ত্র বাদন প্রয়াস হইতে নিবৃত্ত হয়।

বিলাতী হার্ম্মোনিয়মে সুর বাঁধাই আছে। চাবি টিপিলেই সুর বাহির হয়। গ্লাডিওলেট প্রভৃতি চাবির সাহায্যে নির্দ্দিষ্ট সুর বাহির করিতে পারা যায়। কাজেই হারমনিয়ম এখন সকল যন্ত্রকে পরাজিত করিয়া গৃহে গৃহে স্থান পাইয়াছে। ইহা শিক্ষা করিতে বেশী সময় ও পরিশ্রমের দরকার হয় না। কিছু শিখিয়া স্বরলিপির সাহায্যে গান বাজনা বা গানে সঙ্গীত করা চলিতে পারে।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি ভারতীয় যন্ত্রাদি সুলভ ও সহজ লভ্য নহে। বিলাতী বাদ্যযন্ত্র যেরূপ নির্দ্দিষ্ট মূল্য দিলেই সহজে পাওয়া যায়, দেশীয় যন্ত্র সেরূপ পাইবার উপায় নাই। বিলাতী যন্ত্রের প্রত্যেক অবয়ব নির্দ্দিষ্ট মাপে প্রস্তুত ও বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে সন্নিবিষ্ট থাকে। উপাদান, গঠন-রীতি ও প্রণালীর উপর নির্ম্মাতার বিশেষ লক্ষ্য থাকে, দেশীয় যন্ত্রে উপাদানের উপর প্রায়ই লক্ষ্য থাকে না। যেমন তেমন কাঠে নির্ম্মাণ করিয়া উপরে ভাল বার্ণিস দিয়া সুদৃশ্য করিবার প্রয়াসই বেশী দেখিতে পাওয়া যায়। অবয়বগত দোষ বাহ্যিক কারুকার্য্য (হস্তিদন্তের উপর নকসা কাটা পাত বসান) প্রভৃতি দ্বারা ঢাকা হয়। বাদ্যযন্ত্র স্বর্ণ, রৌপ্য বা হস্তিদন্ত মণ্ডিত হইলে তাহার মূল্য

বাজিতে পারে, কিন্তু বাদ্যযন্ত্র হিসাবে সাধারণ সুগঠিত কাঠের যন্ত্রের যেরূপ আদর কারুকার্য্য যুক্ত মোষবিশিষ্ট যন্ত্রের সেরূপ আদর কিছুতেই হইতে পারে না। কোন উপাদানে কিরূপ আকারের অবয়বাদিতে ভাল মন্দ সুর হয়, তাহা প্রায় কেহই জানেন না। এবিষয়ে আমাদের দেশে কখনও কোন চেষ্টা হয় নাই। সাধারণ শিল্পীদের দোষ দিলে কি হইবে? এ কার্য্য তাহাদের সাধ্যায়ত্ত নহে।

বিলাতী যন্ত্র গুলির আর এক সুবিধা, তাহাদের প্রত্যেক অবয়বাদি পৃথক্ কিনিতে পাওয়া যায়। ঠিক এক মাপে গঠিত বলিয়া, কোনও অংশ ভাঙ্গিয়া গেলে, নূতন একটি অবয়ব ক্রয় করিয়া সংযোজন করা যাইতে পারে, কিন্তু দেশীয় বাদ্যযন্ত্রে তাহা করা অতি কঠিন। কোন যন্ত্রই নির্দ্দিষ্ট আকারে প্রস্তুত হয় না। পৃথক্ অবয়বাদিও কিনিতে পাওয়া যায় না। কাজেই কোন যন্ত্র মেরামত করিতে হইলে জোড়া তালি ভিন্ন উপায় নাই। অবশ্য ভাল শিল্পীর হাতে এই জোড়াতালি ধরিবার উপায় নাই, কিন্তু এইরূপ মেরামতে যে খরচ পড়ে, তাহাতে প্রায়ই একটি নূতন যন্ত্র কিনিতে পাওয়া যায়।

দেশীয় যন্ত্র গুলির আর এক বিশেষ অসুবিধা এই যে ইহা সহজে শিক্ষা করিবার উপদেশ সম্বলিত কোন গ্রন্থ নাই। বিদেশীয় প্রায় সকল যন্ত্রেরই প্রথম শিক্ষার্থীর উপযোগী উপদেশ সম্বলিত পুস্তকাদি আছে। নানা প্রকার বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে গঠিত সহায়ক যন্ত্রাদিও কিনিতে পাওয়া যায়। পিচ্-পাইপ্, টিউনিং ফর্ক প্রভৃতি সুর নির্দ্ধারণ করিবার যন্ত্র। বেহালা বাজাইবার জন্য নূতন শিক্ষার্থীকে বিশেষ অসুবিধায় পড়িতে হয়, কারণ বেহালার কোন পর্দ্দা নাই। আঙ্গুলের টিপের দ্বারাই তার চাপিয়া সুর বাহির করিতে হয়। কোন্ কোন্ জায়গায় আঙ্গুল পড়িবে তাহা বাহির করিতে পারে নূতন শিক্ষার্থীর অসুবিধা হয় এজন্য ছাপান একপ্রকার কাগজ কিনিতে পাওয়া যায়, তাহা বেহালার উপর আঁটিয়া লইলে, কোথায় কোথায় আঙ্গুল পড়িবে তাহা ঐ কাগজের উপর অঙ্কিত বৃত্তাকার চিহ্নদ্বারা বুঝিতে পারা যায়। অবশ্য বালকের এরূপ সাহায্য যাচিতই অভ্যাস করা ভাল, কিন্তু এ কথাটার উল্লেখ এই কারণে করিলাম যে বিদেশীয় যন্ত্র শিক্ষা করিবার যে প্রকার সুবিধা আছে, দেশীয় যন্ত্র শিক্ষার তাহার কিছুই নাই।

কিন্তু এই সকল অসুবিধা আছে বলিয়া দেশীয় যন্ত্র গুলিকে একেবারে বিলুপ্ত হইতে দিয়া কেবল হার্ম্মোনিয়মকেই অবলম্বন করা আমাদের উচিত নহে। হার্ম্মোনিয়ম সম্বন্ধে নিম্নোদ্ধৃত বক্তব্য সকলের প্রণিধানযোগ্য :—

"সঙ্গীতবিষয়ে অনভিজ্ঞতা প্রযুক্ত অনেকে জানেন না যে, হার্ম্মোনিয়মে হিন্দুসঙ্গীত বিশুদ্ধরূপে বাদিত হইতে পারে না। হিন্দুসঙ্গীত 'মিড়-গমক' প্রধান সঙ্গীত।.....

হার্ম্মোনিয়মে হিন্দুসঙ্গীত বাজাইলে তাহার পনের আনা মধুরতা তিরোহিত হয়। আমাদের মধ্যে যাঁহারা হিন্দু সঙ্গীতের বিশেষত্ব বুঝেন না, তাঁহারা হার্ম্মোনিয়মের আওয়াজের মধুরতায় প্রতারিত হন এবং উহাতে যা কিছু বাজান যায় তাহাই ভাল লাগে মনে করিয়া ঐ যন্ত্র বাজাইবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করেন। যাঁহারা হিন্দু সঙ্গীতের বিশেষ গুণ বুঝিয়া উক্ত মিড় গমকের অনুপম সৌন্দর্য্যের পক্ষপাতী হইয়াছেন, তাঁহারা হার্ম্মোনিয়মের প্রতি দৃক্‌পাতও করেন না। তবে কণ্ঠের সহিত সুর দিবার পক্ষে ঐ যন্ত্র কতক উপকারী হইতে পারে। কতক, সম্পূর্ণ নয় এই জন্য বলি যে উহার স্বর প্রকৃত হিন্দু সঙ্গীত মতে অশুদ্ধ। এরূপ অবস্থায় ঐ যন্ত্রে হিন্দু সঙ্গীত বাজান বিড়ম্বনা মাত্র। আমাদের মধ্যে জাতীয়তা সংরক্ষণের জন্য মধ্যে মধ্যে যে আড়ম্বর উঠে, তাহা অন্যান্য বিষয়ে তত দেখা না যাউক সঙ্গীত বিষয়ে বেশী দেখিতে পাওয়া যায়। আমাদের জাতীয় সঙ্গীত 'স্বর্গীয় আর্য্য সঙ্গীত' এমন আর কোন দেশে নাই, এইরূপ অনেক কথা শুনা যায়। কিন্তু হার্ম্মোনিয়মে হিন্দু সঙ্গীত বাজাইলে, হিন্দু সঙ্গীতের স্বকীয় রূপ যে বিনষ্ট হয়, তাহা কেহ মনে করেন না। আসল কথা এই যে হিন্দু সঙ্গীত বজায় থাকুক বা না থাকুক তাহাতে কাহারও ক্ষতিবৃদ্ধি নাই, হার্ম্মোনিয়ম কোনমতে বাজাইতে পারিলেই বাসনা পূর্ণ হয়। এইরূপ ভাবে হার্ম্মোনিয়ম বাদ্যের প্রচলন দেশময় ব্যাপৃত হইলে, হিন্দু সঙ্গীত শীঘ্রই দেশ হইতে অন্তর্হিত হইবে, তাহার কোন সন্দেহ নাই।"

(কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায়—হার্ম্মোনিয়ম ভূমিকা)

হার্ম্মোনিয়মের বিরুদ্ধে যাহা বলা হইল, তাহা হইতে এরূপ কেহ মনে না করেন, যে হার্ম্মোনিয়মের বাদ্যযন্ত্র হিসাবে কোন মূল্য নাই। "মিড় গমক বিহীন হইলে, সঙ্গীতের মনোহারিতা যে একেবারে তিরোহিত হয়, এমন নহে। ইউরোপীয়সঙ্গীতে প্রায়ই মিড় নাই।...ইউরোপীয় সঙ্গীতের সৌন্দর্য্য সুরের বিন্যাস ও ছন্দের উপর নির্ভর করে। তথাচ্চ সেই স্বর বিন্যাসে 'হারমনি' (পরের এক এক সুরের সহিত বিভিন্ন সুরের যে মিল; যাহা একত্রে ধ্বনিত হইলে অতি মধুর শুনায়) প্রযুক্ত হইলে, তাহার যে অতুল সৌন্দর্য্য ও হার্ম্মনির জন্যই হারমোনিয়মের আদর। মধুরতা বৃদ্ধি হয়, তাহা আমাদের হিন্দু সঙ্গীতেও দুর্লভ। ...হার্ম্মোনিয়ম যন্ত্রে সেই ছন্দে ও হার্ম্মনি অতি সুন্দররূপে বাহির হয়। এ বিষয়ে, বন্ধু হার্ম্মোনিয়ম' নামক ক্ষুদ্র হার্ম্মনি ফ্লুট একেবারে অকর্ম্মণ্য। বন্ধু হার্ম্মোনিয়মকে বালকের খেলনা বলা যাইতে পারে তাহার সম্মতি হইবে তিনি যেন বড় পাঁচ অষ্টক বিশিষ্ট টেবিল হারমোনিয়ম কিনিয়া গাওনা।"

(কৃষ্ণধন বন্দ্যো—হার্ম্মোনিয়ম শিক্ষা ভূমিকা)

কাজেই হার্ম্মোনিয়ম বাজাইতে হইলে হিন্দু সঙ্গীতের

রাগ রাগিণী মিড় গমক বিহীন করিয়া, তাহাতে ছন্দ ও হাল্কানি যোগ করিয়া বাজাইলে তবে সুশ্রাব্য হইবে। "ক্রপদ বা খেয়ালের সুরের গান হার্ম্মোনিয়মে বাজাইতে চেষ্টা করা বিড়ম্বনা মাত্র। যাহারা তাহা বাজান, তাঁহারা বোধ হয় জানেন না যে, সে বাদ্য কেবল তাঁহারাই শুনেন, অপরে তাহা কখনই বুঝিতে পারে না।" (কৃষ্ণধন বন্দ্যো- হার্ম্মোনিয়ম শিক্ষা। ভূমিকা)

সুতরাং যাঁহারা ভারতীয় সঙ্গীত অভ্যাস করিতে চান, তাঁহাদের দেশীয় যন্ত্রের শরণ লওয়া ভিন্ন গত্যন্তর নাই। দেশীয় যন্ত্রের বহু দোষ ত্রুটি থাকিতে পারে, কিন্তু চেষ্টা করিয়া সেগুলি দূর করিতে হইবে। অবহেলা করিয়া, যন্ত্রগুলি একেবারে পরিত্যাগ করিলে চলিবে না।

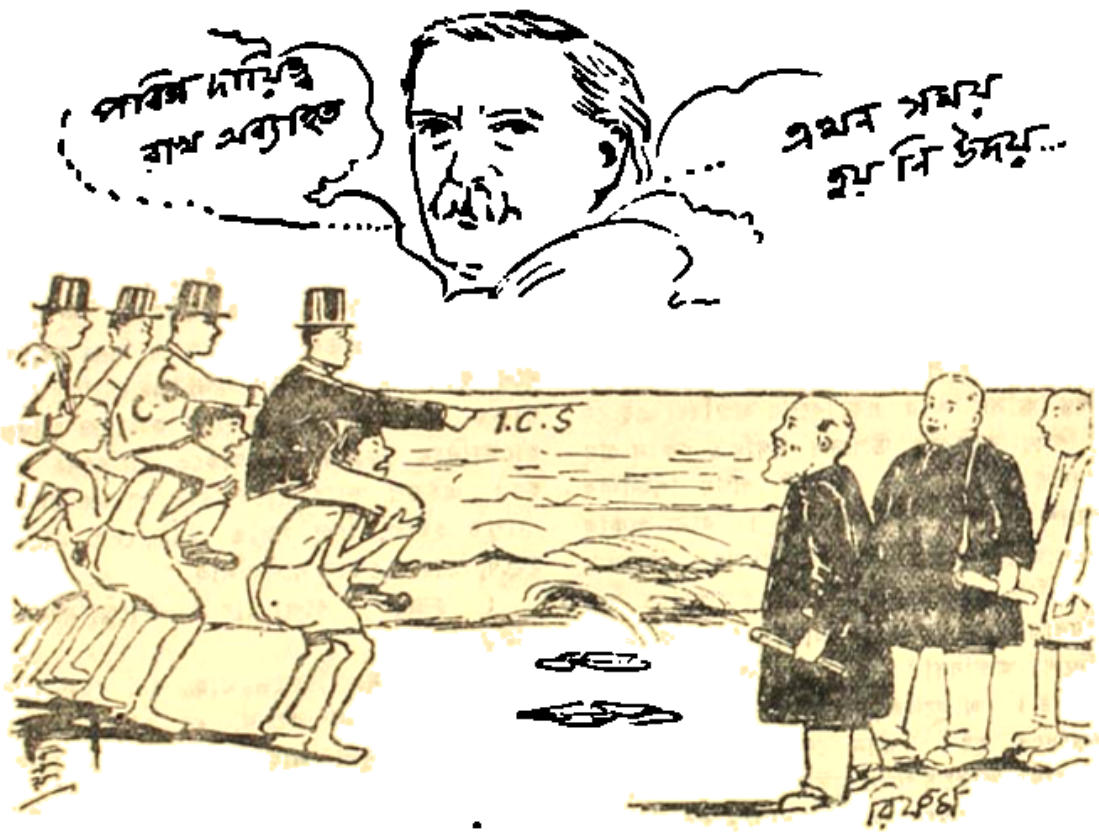

ভবী ভুলিবার নয়।

সাধু।

আজকাল দেখা যায়, অনেক চাকর-বাকর, মালী-মজুর চাকরী খুঁজতে আসে একরাশ প্রশংসা-পত্র নিয়ে। আমার কাছে একবার এমনি একটা লোক এসেছিল। কি কি কাজ সে করতে পারে জানতে চাইলে ফর্দ্দ যা একটি দাখিল করলে—এই এতো খানি। ভারি সাধু। জুতো ঝাড়া, বিছানা করা, গা-টেপা মায় হিসেব লেখা! বল্লুম—কি বাপু! তুমি লেখাপড়াও জান?

তা আর জানি নে আজ্ঞে। ঐ যে প্রশংসাপত্র দেখ্‌ছেন, ও-সব ত আমারই.....ইস্, ভুল মশাই ভুল, মাথার একটু ছিট আছে—

লাউসেন

(শ্রীশিবরতন মিত্র)

ষষ্ঠ অধ্যায়

কর্ণসেন—রঞ্জাবতী

গৌড়েশ্বর, কর্ণসেন রায়কে প্রবোধবাক্যে আশ্বস্ত করিয়া অন্তঃপুর মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন—রাণী তাম্বুলবীর পার্শ্বে, এক পরমাসুন্দরী কিশোরী বসিয়া আছে। রাজা, ব্যগ্র-ভাবে কন্যার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে রাণী বলিলেন—'এটি আমার ছোট ভগ্নী রঞ্জাবতী,—আপনি উহাকে দেখেন নাই—ও একটু আগে এখানে আসিয়াছে। অপর কোন্ অনূঢ়া বয়স্থা কন্যা রাজ-অন্তঃপুরে আসিবে?' রাণীর এই কথা শেষ হইতে না হইতে রঞ্জাবতী, অগ্রসর হইয়া গৌড়েশ্বরকে প্রণাম করিল। রাজা, তাহাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া দুই একটি রহস্যালাপের পর বিদায় দিলেন।

রঞ্জাবতী সেই স্থান হইতে চলিয়া গেলে গৌড়েশ্বর রাণীকে বলিলেন—'শ্বশুর মহাশয় না হয় বৃদ্ধ হইয়াছেন—কিন্তু তোমার ভাই মহামদ পাত্র এত বড় কন্যা অবিবাহিত রাখিয়া কেমন করিয়া রাত্রে নিশ্চিন্ত ভাবে নিদ্রা যাইতেছে? সে যাই হোক্, যদি তোমার আপত্তি না থাকে, তবে আমিই কর্ণসেন রায়ের সহিত রঞ্জাবতীর বিবাহ দিতে পারি।' রাণী বলিলেন—'আপনি সকলেরই অভিভাবক, আপনি যাহা উচিত বিবেচনা করেন, তাহাই করিবেন—ইহাতে পরম সুখের কথা, ইহাতে আবার কাহার আপত্তি থাকিতে পারে? কিন্তু আমি এবিষয়ে তালমন্দ কিছুই বলিতে পারিতেছি না—বিশেষতঃ, কর্ণসেন বৃদ্ধ হইয়াছেন। রঞ্জাবতীকে, মহামদ প্রাণের চেয়ে ভাল বাসেন, তাঁহার অভিমত নিলে ভাল হয়।'

কর্ণসেন বৃদ্ধ বলিয়া রাণী এ বিবাহে সম্মত নহেন বুঝিয়া বলিলেন—'দেখ, কর্ণসেন অতি ধর্ম্মশীল ব্যক্তি, মহাকুলীন এবং অশেষ সদ্‌গুণের আধার—তাঁহার তুল্য গুণবান্ ব্যক্তি বাস্তবিক নিতান্তই দুর্লভ। তাঁহাকে তুমি বৃদ্ধ মনে করিতেছ? তিনি কিন্তু, তত বৃদ্ধ নন—শোকতাপে তাঁহার বর্ণ মলিন হইয়াছে—শরীর জীর্ণ ও লোল হইয়াছে। সেবা শুশ্রূষার গুণে তিনি আবার তাঁহার পূর্ব্ব লাবণ্য ফিরিয়া পাইবেন—তাঁহার শরীর যৌবনশ্রী-মণ্ডিত হইয়া উঠিবে। অবশ্য তাঁহার বয়স কিছু অধিক হইয়াছে—তাহাতে কি আসে যায়?—তিনি সাধারণ যুবক অপেক্ষা হীন-বল-সহেন। আমিও ত বৃদ্ধা হইয়াছি—তা বলিয়া কি তুমি আমার অশ্রদ্ধা কর?' রাণী ভাগ্যবতী রাজার শেষ বাক্যের কোন উত্তর না দিয়া লজ্জানত মুখে দণ্ডায়মান রহিলেন। তখন রাজা পুনরায় বলিলেন—'রাণী, বহুত খাব্—একটা কথা শুন। কর্ণসেন রায় পত্নী পুত্র শোকে বিরাগী হইলে, আমি বিবাহ দিয়া তাঁহাকে সংসারে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিব বলিয়া আশ্বাস দিয়াছি। অবশ্য, আমি কর্ণসেনের জন্য নানা দেশ হইতে বহু বয়স্থা কন্যা সংগ্রহ করিয়া দিতে পারি। কিন্তু আমার একান্ত ইচ্ছা, কর্ণসেনের মত পাত্রকে হাতিতে নাই—তাঁহার সহিত রঞ্জাবতীর বিবাহ দিলে, সকল দিকে সুপ্রতুল হইবে।'

কর্ণসেনের সহিত রঞ্জাবতীর বিবাহ দিবার রাজার একান্ত অভিপ্রায় জানিয়া রাণী ভাগ্যবতী বলিলেন—'আমি আপনার অভিপ্রায়, আদেশ জানে শিরোধার্য্য করিলাম। কিন্তু আমার বিশেষ আপত্তি হইতেছে মহামদ এ প্রস্তাবে সম্মত ত হইবেই না—উপরন্তু, বিশেষ হাঙ্গামা বাধাইবার চেষ্টা করিবে।' রাজা বলিলেন—'তাহার জন্য কোন চিন্তা নাই—আমি তাহাকে কোন ছল করিয়া কামরূপ বা অপর কোন সুদূরবর্ত্তী দেশে পাঠাইয়া দিব। ইতিমধ্যে বিবাহ হইয়া যাইবে। তাহার পর সে আসিয়া যাহা করে, দেখা যাইবে—তজ্জন্য চিন্তা নাই।' রাণী বলিলেন—'আপনার যাহা মনে হয় করুন।'

পরদিন প্রভাত হইবামাত্র গৌড়েশ্বর, মহামদ পাত্রকে আহ্বান করিয়া বলিলেন—'মন্ত্রি, কামরূপের সামন্তরাজ স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়াছে—তুমি এইমাত্র যথেষ্ট সৈন্য লইয়া কামরূপের বিদ্রোহীকে গৌড়ে বন্দী করিয়া লইয়া আইস।' মহামদ পাত্র, পাঁচলক্ষ সৈন্য লইয়া কামরূপ অভিমুখে যুদ্ধ যাত্রা করিল এবং প্রবল বন্যার জন্য অতিক্রম করিতে না পারিয়া, ব্রহ্মপুত্র নদের তীরে আসিয়া শিবির সংস্থাপন করিল।

রাজা, তাড়াতাড়ি রমতিনগর হইতে শ্বশুর বেহুলার ও শাশুড়ী মনুকাকে গৌড়ে আনয়ন করাইলেন। তাহারা উপস্থিত হইলে, কর্ণসেনের সহিত রঞ্জাবতীর বিবাহ হইয়া গেল। বেহুলার ও মনুকা, কর্ণসেনের ন্যায় গুণবান্ জামাতা প্রাপ্ত হইয়া বড়ই আনন্দিত হইল।

বিবাহ হইয়া গেলে, রাজা গৌড়েশ্বর কর্ণসেনকে সম্বোধন করিয়া বলিল—'ভাই কর্ণসেন, আজ হইতে আমি, অবশ্য বিশেষভাবেই তোমার হিতকামী হইলাম। পাত্র মহামদের অগোচরে ও অজ্ঞাতে, তাহার প্রিয়তমা ভগিনীর সহিত, আমি তোমার বিবাহ দিলাম। সে যে বড় বিষম লোক, তাহা তোমার অজ্ঞাত নহে—কি জানি যদি এই সম্বন্ধ তাহার মনঃপুত না হয়, তাহা হইলে সে বিষম অনর্থের সৃষ্টি করিবেই করিবে। সুতরাং আমার ইচ্ছা, পাত্র মহামদ আসিবার পূর্ব্বেই তুমি সত্বর গৌড় রাজধানী পরিত্যাগ

করিয়া দক্ষিণ ময়নাভূমে গিয়া তথায় স্থায়ীভাবে বসতি স্থাপন কর।' এই বলিয়া রাজা ময়নাভূমের অধিপতি মণ্ডলের নামে এই মর্ম্মে এক পত্রলেখা লিখিয়া দিলেন—'রায় কর্ণসেনকে তুমি আমারই তুল্য জ্ঞান করিবে—ইনি আজ হইতে ময়নার অধিপতি হইলেন। তুমি তাড়াতাড়ি ইহাঁর বাসোপযোগী গৃহাদি প্রস্তুত করিয়া দিবে।'

কর্ণসেন, গৌড়েশ্বরের পত্রখানা গ্রহণ করিয়া বলিলেন—'আপনার আদেশ মত, আমি এই দণ্ডেই ময়নাগড় অভিমুখে যাত্রা করিতেছি। কিন্তু, আমার সানুনয় প্রার্থনা—আমি দূরে রহিলেও যেন আপনার অন্তর হইতে দূরীভূত না হই'। রাজা বলিলেন—'তুমি আমার প্রাচীন বন্ধু; বিশেষতঃ এখন তুমি রত্নাবতীর পাণিগ্রহণ করিলে, সুতরাং আমার মন যে সদাই ময়নাভিমুখী হইয়া রহিবে, ইহাতে আর সন্দেহ নাই। লক্ষ যোজন দূরে রহিয়াও কি চন্দ্র কুমুদ বা দিনকর কমলের পরস্পর প্রতি প্রীতি-প্রকাশের বাধা জন্মাইতে পারে'? এই সময় রত্নাবতী, রাজার নিকট অগ্রসর হইয়া ছল ছল নেত্রে বলিল—'মহারাজ, এই অভাগীকে বিস্মৃত হইবেন না। আপনি যাঁহার করে আমায় সমর্পণ করিলেন, আমায় এখনই তাঁহার অনুগমন করিয়া দূরদেশে প্রস্থান করিতে হইতেছে। এদিকে পিতা-মাতা বৃদ্ধ—দাদাও স্থানান্তরে রহিয়াছেন—আপনি দয়া করিয়া ইহাঁদের প্রতি কৃপাদৃষ্টি রাখিবেন'। এই বলিয়া রত্নাবতী, গৌড়েশ্বরের পদতলে লুটাইয়া পড়িল। রাজা, তাহাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিলেন—'ঈশ্বর তোমার সর্ব্ব বিষয়ে ভাল করিবেন—ঠাকুর, তোমার প্রতি সর্ব্বদা সদয় রহিবেন'।

অনন্তর রত্নাবতী, পিতা ও মাতার চরণে বিদায় গ্রহণ পূর্ব্বক, জ্যেষ্ঠা ভগ্নী রাণী আদুমতীকে আলিঙ্গন প্রদান করিয়া বলিল—'দিদি' যে অবস্থায় আমার বিবাহ হইল এবং যে অবস্থায় আমি আপনাদের নিকট বিদায় গ্রহণ করিতেছি,—প্রার্থনা করি ইহা স্মরণ করিয়া, আপনি আমায় কখন বিস্মৃত হইবেন না'। রাণী, রত্নাবতীকে কোলে টানিয়া লইয়া স্নেহস্বরে বলিল—'রত্নাবতী, তুই আমার বড়ই স্নেহের ভগ্নী, তোকে আমি কখনই এক মুহূর্ত্তের জন্যও ভুলিতে পারিব না। ভগবান সকল বিষয়ের কর্ত্তা—তিনি তোর সকল বিষয়েই মঙ্গল করিবেন। তাঁহার প্রসাদে তুই অচিরেই পুত্রবতী ও রাজেশ্বরী হইবি'।

পিতা, মাতা, ভগ্নী—ইহাঁদের সকলেরই মঙ্গলাশীষ লাভ করিয়া রত্নাবতী, স্বামীর সহিত ময়নাভূম অভিমুখে যাত্রা করিবার জন্য বিদায় গ্রহণ করিল। মালিকী ও কল্যাণী নামে দুইজন দাসী সহচরীরূপে তাহার অনুগমন করিল।

(ক্রমশঃ)

যৎসামান্য দাবী।

(শ্রীমনোকুমার গুপ্ত)

রাগিণী—খেমটা

নগদ নব্বো হাজার ছয়েক এক চাই সোনা আসী ভরি
ছোকরা ইয়ারে পড়ছে ছেলে বি-এ পাশ করবে যে বিগ্‌গিরি।
রিষ্ট ওয়াচ আর হিরের বোতাম আংটি চস্‌মা টি
গার্ড চেন আর একটি ওয়াচ পামহু আর চটি
তুমি "নটবরের" পায় দিও না হয় "কে এম্ ঘোষেরি"
দান সামিগ্রি রূপোর দিও নয়ত গাড়ি একটি
মধুর ছাড়া কার্ত্তিক সে যে ছেলেটি আমার
ভুল হয়েছে ধর্ত্তে কর্ত্তে বাড়ি আছে আর
বারনলী জোর দু-এক জোড়া খাট বিছানা বসারি
জামাই হবে নম্বা পাবে খাস ভিটে বিক্‌কিরি।
তোমার জামাই তারে মেরে ধর এসব কিছুই নয়
ক্যাস বাক্সে আর কিছু ক্যাস দিলেই ভাল হয়
এগার হাতি কাঁচি কাপড় পিতর আই ভরির ছড়ি
বুক কেস সেল্‌ফ টেবিল চেয়ার জামাইয়ের নামে একবাড়ী
বিশেষত ছেলের বিয়ে আজ-কালের বাজারে
এত কমে ছেড়ে দেবে পড়ব কি কাঁপরে
মেয়ে তোমার কর্সা বটে, নয় জানাকাটা পরী
দেখি যদি এর বেশী পাই মাস দুএক কর দেরি।
অনেক দেনা করে ফেলেছি আশাতে ছেলের
মাছের ভেলে ভাজ্‌বো গো মাছ নিয়ে গো বাজারে
আমি মাইনে পাই ৩০টাকা পাঁচটি নিয়ে ঘর করি
আমার চারটি মেয়ে বিয়ের যুগ্‌গি ১২, ১৩, ১৬, কুড়ি।

দৈত্য-জায়া।

আমাদের এখান হইতে প্রকাশিতব্য "আরোগ্য-উপন্যাসের" একখানি ছবির নমুনা।

Lakshmibilas Press, Calcutta.

সচিত্র সাপ্তাহিক

বাসন্তী

১ম বর্ষ] ৯ই ভাদ্র শনিবার, ১৩২৯ ইং ২৬শে আগষ্ট। ৮ম সংখ্যা

ভাদ্রে—নদীপথে।

প্রতীক্ষায়।
(আলোক চিত্র হইতে)

দেশবন্ধুর দেশবাসিগণ গত ৪ঠা ভাদ্র শ্রীযুত চিত্তরঞ্জন দাস মহাশয়ের সম্বর্দ্ধনা করিয়াছিলেন। অমল প্রীতি ও ভক্তির ভারে প্রণতমস্তিত মস্তকে সহস্র সহস্র দেশবাসী দেশবন্ধুকে প্রীতি নিবেদন করিতে শ্রদ্ধা অর্ঘ্য অর্পণ করিতে, সঙ্কটকালে দেশবন্ধুর বাণী শুনিতে সভাস্থলে সমাগত হইয়াছিল। সভাপতি আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র দেশবন্ধুর প্রসঙ্গে বলেন—দেশবন্ধু যে কেন আজ আমাদের সকলের হৃদয়-রাজ্য অধিকার করে আছেন—তা বোধ হয় আপনাদের কাছে' বলবার দরকার নেই। যখন পঞ্জাবে বীভৎস, নৃশংস, হত্যাকাণ্ড অভিনীত হইবার পর পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য, মহাত্মাগান্ধী, পণ্ডিত মতিলাল প্রভৃতি তাঁহার প্রকৃত তথ্য সাধারণের পক্ষ হইতে সংগ্রহ করিতে গিয়াছিলেন, তখন তাঁহারা সকলে সঙ্কল্পনয়নে বাংলার দিকে চেয়েছিলেন, তখন আমাদের দেশবন্ধু আর স্থির থাকতে পারেন নি; ব্যবসায় ছেড়ে দিয়ে তিনি পঞ্জাবে গিয়ে হত্যা দিয়ে পড়লেন। তারপর যখন রাজশক্তি অন্যায় করে ন্যায় নীতি ও আইন পদদলিত করে প্রজাশক্তিকে নিষ্পেষিত করছিল তখন আমরা ভাবিলাম—বাংলা কি সত্য সত্যই জাহান্নমে গিয়াছে, বাংলায় কি আর একজনও নেতা পাওয়া যাইবে না—তখন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন 'মাভৈঃ' ধ্বনিতে আমাদের সকলকে অভয় প্রদান করলেন। তখন যদি দেশবন্ধুকে আমাদের মধ্যে না পাওয়া যেত তা হলে বাংলার যে কি হোত তা' বলা যায় না। দেশবন্ধুর প্রেরণায় অনুপ্রাণিত হয়ে বাংলার শত শত যুবক আজ তাঁর প্রদর্শিত পথ অবলম্বন করেছে।'

• • • •

দেশবাসীগণ দেশবন্ধুকে যে অভিনন্দন পত্র দিয়াছেন, আমরা তাহার কতকাংশ উদ্ধৃত করিলাম।

অভিনন্দন

শ্রদ্ধাস্পদ দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস মহাশয়ের শ্রীকরকমলে—

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন!

হে বন্ধু, তোমার স্বদেশবাসী আমরা তোমাকে অভিবাদন করি। মুক্তি-পথ-যাত্রী যত নর-নারী যে যেখানে যত লাঞ্ছনা, যত দুঃখ, যত নির্য্যাতন ভোগ করিয়াছে, হে প্রিয়, তোমার মাঝে আজ আমরা তাহাদের সমস্ত মহিমা প্রত্যক্ষ করিয়া সগৌরবে, সবিনয়ে নমস্কার করি।

একদিন দেশের লোক তোমাকে ক্ষুব্ধিত ও পীড়িতের আশ্রয় বলিয়া জানিয়াছিল, সেদিন সে ভুল করে নাই। কিন্তু, যে কথা তুমি নিজে চিরদিন গোপন করিয়াছ,—মাতা ও প্রতীতার সেই নিভৃত কক্ষের সম্বন্ধ—আজও সে তেমনি গোপনে শুধু তোমাদের জন্যই থাক্। কিন্তু, আর একদিন এই বাঙ্‌লাদেশ তোমাকে ভাবুক বলিয়া, কবি বলিয়া বরণ করিয়াছিল, সেদিনও সে ভুল করে নাই। সেদিন এই বাঙ্‌লার নিগূঢ় মর্ম্মস্থানটি উদ্‌ঘাটিত করিয়া দেখিতে, তাহার একান্ত সঞ্চিত অন্তর বাণীটি নিবন্তর কাণ পাতিয়া শুনিতে, তাহাকে সমস্ত হৃদয় দিয়া উপলব্ধি করিয়া লইতে তোমার একাগ্র সাধনার অবধি ছিল না। তখন হয়ত, তোমার সকল কথা বঙ্গের ঘরে গিয়া পৌঁছায় নাই, হয়ত কাহারও রুদ্ধ দ্বারে, বা খাইয়া সে ফিরিয়াছে, কিন্তু পথ যেখানে তাহার মুক্ত ছিল, সেখানে সে কিছুতেই ব্যর্থ হইতে পায় নাই।

আপনার বলিয়া, স্বার্থ বলিয়া কিছু তোমার নাই, সমস্ত স্বদেশ, তাই ত আজ তোমার করতলে। তাই ত, তোমার ত্যাগ আজ শুধু তোমার নয়, আমাদের। শুধু বাঙালীকে নয়, তোমার প্রায়শ্চিত্ত আজ বিহারী, পঞ্জাবী, মারহাট্টি, গুজরাটি যে যেখানে আছে, সকলকে নিষ্পাপ করিয়াছে।

তোমার দান আমাদের জাতীয় সম্পত্তি,—এ ঐশ্বর্য্য বিশ্বের ভাণ্ডারে আজ সমস্ত মানবজাতির জন্য অক্ষয় হইয়া রহিল। এম্‌নি করিয়াই মানব-জীবনের দেনা-পাওনার পরিশোধ হয়, এম্‌নি করিয়াই যুগে যুগে মানবাত্মা পশুশক্তি অতিক্রম করিয়া চলে।

একদিন নশ্বর দেহ তোমার পঞ্চভূতে মিলাইবে, কিন্তু, যতদিন সংসারে অধর্ম্মের বিরুদ্ধে ধর্ম্মের, সবলের বিরুদ্ধে দুর্ব্বলের, অধীনতার বিরুদ্ধে মুক্তির বিরোধ শান্ত হইয়া না আসিবে, ততদিন, অবমানিত, উপদ্রুত, মানব-জাতি সর্ব্বদেশে, সর্ব্বকালে, অন্যায়ের বিরুদ্ধে তোমার এই দুষ্কৃতির প্রতিবাদ মাথায় করিয়া বহিবে। এবং কোন-

মতে কেবলমাত্র বাঁচিয়া থাকাটা যে অমুক্ষণ শুধু বাঁচাকেই ধিক্কার দেওয়া এ সত্য কোনদিন বিস্মৃত হইতে পারিবে না।

জীবন-তত্ত্বের এই অমোঘ বাণী স্বদেশে-বিদেশে, দিকে-দিকে, উদ্ভাসিত করিবার গুরুভার বিধাতা যাহাকে অর্পণ করিয়াছেন, তাঁহার কায়াবলেশের তুচ্ছতাকে উপলক্ষ সৃষ্টি করিয়া আমরা উল্লাস করিতে আসি নাই। হে চিত্তরঞ্জন, তুমি আমাদের ভাই, তুমি আমাদের সুহৃৎ, তুমি আমাদের প্রিয়,—অনেকদিন পরে তোমাকে কাছে পাইয়াছি। তোমার সকল গর্ব্বের বড় গর্ব্ব বাঙালী তুমি; তাই ত, সমস্ত বাঙলার হৃদয় তোমার কাছে আজ বহিয়া আনিয়াছি,—আজ আনিয়াছি, বঙ্গজননীর একান্ত মনের আশীর্ব্বাদ,—তুমি চিরজীবী হও! তুমি অমর হও!

কলিকাতা
৩রা ভাদ্র—১৩২৯ বঙ্গাব্দ।

তোমার গুণ-মুগ্ধ
স্বদেশবাসিগণ

• • • •

দেশবাসীর অভ্যর্থনার উত্তরে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন সত্যকেই সর্ব্বোপরি স্থান দিয়া দেশবাসীকে সত্য লক্ষ্য করিয়া চলিতে বলেন। দেশবন্ধু বলেন:—'সমগ্র জগতের দৃষ্টি ভারতের উপর নিবদ্ধ। উঠ, জাগ, স্বরাজের পতাকা উড্ডীন কর। সত্যের উপর স্বরাজ প্রতিষ্ঠিত, হিংসার উপর নহে, পাশব শক্তির উপর নহে। এ পর্য্যন্ত আমি কাহাকেও পাশব বলের সাহায্যে স্বরাজ লাভ করিতে দেখি নাই। ক্রমওয়েলের পাশব বলের পূজা ইংলণ্ডের স্বরাজ আনিয়া দিতে পারে নাই। ফরাসী বিপ্লবে ফরাসীর স্বরাজ হয় নাই। ম্যাজিনীর বিপ্লব পন্থা ইটালীকে স্বাধীন করে নাই। কারণ যাহারা পাশব বলের সাহায্যে জয় লাভ করে, তাহারা নিজেরাই অত্যাচারী হইয়া উঠে, জাতি তাহাতে মুক্তি পায় না। ভুল পথে চলিও না, উহা স্বাধীনতা নহে। মনে করিও না, যদি ইংলণ্ড আজ ভারত পরিত্যাগ করে এবং আমাদের হাতে শক্তি আসিয়া পড়ে, তাহা হইলে ভারত স্বাধীন হইবে। যদি কংগ্রেস ও খিলাফৎ রাজনৈতিক শক্তির অধিকারী হয়, তাহা হইলে তাহারাই আমলা তন্ত্র হইয়া উঠিবে এবং অন্যান্য আমলা তন্ত্রের ন্যায় প্রজাদের উপর নিজের ক্ষমতা জাহির করিতে চাহিবে এবং বলিবে যে, লোকের উপকারার্থেই তাহারা ঐ কাজ করিতেছে। উহা আমরা চাই না। যখন স্বাধীনতার সৌরভ গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে এবং সমগ্র দেশে বিস্তৃত হইবে, তখনই আমরা স্বাধীনতার সাক্ষাৎ লাভ করিব।

• • • •

আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় সার উপাধিধারী—তিনি ডাক্তার। তিনি বিশ্ববিখ্যাত রাসায়নিক; ভারতের নব্য-তন্ত্রের রাসায়ন বিদ্যাপীঠের প্রতিষ্ঠাতা। দেশের দুঃখ নিবারণের জন্য—দেশের আত্মক্ষমতা জাগাইয়া তুলিবার জন্য তিনি দেশবাসীকে পরবশতা বর্জ্জন করিয়া পরবাস পরিত্যাগ করিতে বলিতেছেন। দেশ চরকা ও খদ্দরে ছাইয়া ফেলিতে বলিতেছেন। আচার্য্য রায় মহাশয় সার উপাধি ত্যাগ করেন নাই, সার-ই যেন তাহাকে ত্যাগ করিয়া এখন দূরে সরিয়া পড়িতেছে। বাংলা দেশের বাঙালী পরিচালিত কোন সংবাদ পত্রও আচার্য্য রায়কে সার বলেন না,—ইংরেজ পরিচালিত কোন কাগজও তাঁহাকে সার বলেন না। সার ত্যাগের পদ্ধতিটা নূতন ধরণের বটে।

• • • •

ভারত রিফর্ম বা নূতন শাসন সংস্কার আইনের স্বরূপ ব্যাখ্যা এতকাল পরে বৃটিশ সাম্রাজ্যের সব চেয়ে যোগ্য লোকের মুখ হইতে বাহির হইয়াছে। বর্ত্তমান বৃটিশ সাম্রাজ্যের কর্ণধার প্রধান মন্ত্রী লয়েড জর্জ্জ ভারত শাসন সংস্কার সম্বন্ধে সম্প্রতি সাম্রাজ্যের রাজধানী হইতে হইতে যে গর্ব্বপূর্ণ বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন তাহাতে সংস্কার আইনের বীভৎস কঙ্কালসার মূর্ত্তি দর্শনে কোন কোন ভারতীয় দল ক্ষুব্ধ ব্যথিত হইয়াছেন। এই সব ব্যথিত দলের ব্যথা নিবারণের জন্য ভারতের একচ্ছত্র শাসক লর্ড রেডিং প্রধান মন্ত্রী লয়েড জর্জ্জের বক্তৃতার একটা সামঞ্জস্য বিধান করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন। প্রধানমন্ত্রী মহাশয় নাকি ঝোঁকের মাথায় ভারতীয়দিগের পক্ষে নিরাশজনক কথা গুলি বলিয়া ফেলিয়াছিলেন, যাহা বলিয়াছিলেন তাহা বলা নাকি তাঁহার অভিপ্রেত ছিল না ইত্যাদি কথায় প্রধান মন্ত্রীর বক্তৃতাকে আবরণ দিয়া ভারতীয় নরমপন্থী-দিগকে বুঝ দিবার ব্যবস্থা হইয়াছে। বক্তৃতায় ইংরেজী ভাষার অর্থ ও তাহার মর্ম্ম পরিগ্রহ করিতে না পারিয়াই অমন সব ইংরেজী-নবিশ মডারেটগণ বক্তৃলাটের শরণাপন্ন হইয়াছিলেন নাকি? যুদ্ধের সময় অত বড় বড় রাজ্যের সঙ্গে রাজনীতিক চালের কথোপকথন ও ভারতীয়েরা বুঝিতে পারিয়াছিল, ভারত সম্পর্কীয় তখনকার দিনের কথোপকথন ও আমাদিগের কাছে সহজ সরলই বোধ হইয়াছিল আর যত দুর্ব্বোধ্য হইয়া উঠিল কি এ বক্তৃতা এখনই? যাহা হইবার তাহা হইবে, কল কাটি যেমন চলিবার তেমনি চলিবে, ভারতীয়দিগের পক্ষে তাহা আশায় কি নিরাশায় হইল তাহা বিবেচনা করিবার জন্য কোন সাম্রাজ্যিক নীতিই আটকাইয়া থাকিবে না।

• • • •

'কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মহুমি আড়াই লাখ টাকা বাংলা সরকার নাকি এখনও দিতে পারেন নাই। এদিকে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা অধ্যাপকগণ কেহ

কেহ তিন চারি মাসের মাহিয়ানা না পাওয়ায় বরঞ্চ এ বিশ্ববিদ্যালয় ত্যাগ করিয়া অপর কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে বেশী মাহিয়ানায় কর্ম্ম লইয়া চলিয়া যাইতেছেন। এ বিশ্ববিদ্যালয়ে যে অধ্যাপক পূর্ব্বে ২০০৲ মাহিয়ানায় কর্ম্ম করিতেন তাহারাই অপর বিশ্ববিদ্যালয়ে ৫০০৲ মাহিয়ানায় কর্ম্ম লইয়া যাইতেছেন। পেটে না খাইয়া কি ভাবে আর অধ্যাপকগণ শিক্ষাদানের বিমল আনন্দ উপভোগ করিবেন? তাই অল্প মাহিয়ানায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে থাকিবার ইচ্ছা থাকিলেও ইহারা থাকিতে পারিতেছেন না। অর্থ ভিন্ন কোন কার্য্যই চলিতে পারে না—ইহা জানিয়াও বাংলা সরকার শিক্ষার জন্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এই যৎসামান্য অর্থ দিতে অনাবশ্যক বিলম্ব করিতেছেন কেন বোঝা যায় না।

• • • •

আমাদের দেশের মেয়েরা বিবাহের বয়স হইলে বা বাপের ও আত্মীয় স্বজনের দুঃখ দুর্দ্দশা দেখিয়া ও আপনার প্রাণের ব্যথায় ও অপমানে কেরোসিনে জ্বলিয়া বা বিষপানে আত্মহত্যা করিয়া থাকে। ছেলেরাও পরীক্ষায় ফেল হইলে বা কাজের উমেদারীতে ঘুরিয়া ঘুরিয়া একেবারে হয়রান নিরাশ হইয়া গেলে মাঝে মাঝে আত্মহত্যা করিয়া থাকে। এই আত্মহত্যার ব্যাধিটা যে আমাদের নিয়ন্ন দুর্ভাগ্য দেশেই প্রবল তাহা নহে এ ব্যাধির প্রাবল্যে পাশ্চাত্যের অনেক অর্থশালী দেশের জন সমাজও মাঝে মাঝে উদ্‌বাস্ত হইয়া ওঠে। রুসিয়ায় এক সময়ে এই ব্যাধির এমন প্রাবল্য ঘটিয়াছিল যে তাহাতে রুসিয়ার একটি প্রদেশ একেবারে জনশূন্য হইয়া যায়। এবং তাহা লইয়া 'Breaking Point' নামক সুপ্রসিদ্ধ রুস উপন্যাস রচিত হয়। আজকাল জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধনী দেশ আমেরিকায় ও আত্মহত্যা ব্যাধির ভীষণ প্রাবল্য দেখা দিয়াছে। গত বৎসর আমেরিকায় ১৪ হইতে ১৬ বৎসর বয়স্ক আটশত আটান্ন জন বালক বালিকা জীবনে বীতরাগ হইয়া আত্মহত্যা করিয়াছে। পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরে আত্মহত্যার মৃত্যুর সংখ্যা ইহা অপেক্ষা অনেক কম ছিল। এ বৎসরে আত্মহত্যার সংখ্যা প্রায় দ্বিগুণ হইয়া গিয়াছে। শোনা যায় স্কুলের পরীক্ষায় ভীতি এবং অকালের কুরূপ প্রেম ব্যাপার হইতেই এই ব্যাধির উৎপত্তি হইয়া থাকে। এ ব্যাধির নিরাকরণ কি উপায়ে হইতে পারে?

• • • •

সহযোগিনী 'বিজলী' 'আমার দেশ' শিরোনামা দিয়া প্রশ্ন করিয়াছেন—দেশটা কার? আমার দেশ বাংলার যে সমস্ত কল কারখানা আছে তাহাতে আমার দেশের অধিবাসী বাঙ্গালী ভ্রাতৃবৃন্দের অধিকার আছে এইরূপ।—বাংলার তুলার কল আছে মোট তেরটা, তেরটা কলের মধ্যে আটটার মালিক ইংরেজ, তিনটার মালিক মাড়োয়ারী—আমার দেশের ভাইদের অধিকারে আছে মোটে দুটো। ইংরাজের দু'টা কলের মূলধন ১,৪৫,০০,০০০৲ দুটোর অজ্ঞাত। মাড়োয়ারীর একটা কলের মূলধন ৮০,০০,০০০৲ দুটোর অজ্ঞাত। বাঙ্গালীর দুটো কলের মূলধন মোটে তেত্রিশলক্ষ টাকা। বাংলাদেশে—আমার দেশে পাটের কল আছে মোট একাত্তরটা। এই একাত্তরটির মধ্যে একটি কলও আমার দেশের অধিবাসী বাঙ্গালীর নাই, মাড়োয়ারীরও নাই। এই একাত্তরটি পাটের কলের সব গুলিরই মালিক হইতেছেন, ইংরেজ। এই একাত্তরটি কলে মোট মূলধন খাটিতেছে প্রায় তেরকোটী উননব্বই লক্ষ ছাব্বিশ হাজার টাকা। ব্যাপার এই—তাই প্রশ্ন 'দেশটা কার?'

• • • •

উপন্যাসিক সার জেমস ব্যারি সেণ্ট এণ্ড্রুস্ বিশ্ববিদ্যালয়ের রেকটর রূপে দেশের যুবকদিগকে যৌবন বজায় রাখিয়া সাহসী হইবার জন্য একটি অতি সুন্দর সারগর্ভ বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন। যৌবনের উল্লাস বজায় রাখিয়া সাহসী হইতে পারিলে কোন অভাব অভিযোগই মানুষকে টলাইতে পারে না। নিজের কথায় উপন্যাসিক ব্যারি বলিতেছেন ইনি যখন প্রথম লণ্ডন সহরে আসেন তখন ইহার কোন সহায় সম্পদ বা এক কপর্দ্দকও সম্বল ছিল না। এমন কি দেশের ভাষা পর্য্যন্ত ভাল করিয়া জানিতেন না। তাই কাহাকেও এক গ্লাস জল আনিতে বলিলে সে হয়ত এক জোড়া জুতো আনিয়া উপস্থিত করিত। তাই কাহারও উপর কোন ভরসা না রাখিয়া ইহাকে সর্ব্ব বিষয়েই নিজের পায়ের উপর নিজেকে দাঁড়াইতে হইয়াছিল। সাহসিকতার উদাহরণে ইনি হেনলি, ষ্টিভেনসন, হার্ডি, মেরিডিথ, কাপ্তেন স্কট প্রভৃতির নাম উল্লেখ করেন। সাহসিকতাই জগতে সকল বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া মানুষকে জীবন পথে চালাইয়া লইয়া যাইতে পারে। তবে শুধু সাহসী হইলেই চলিবে না। হৃদয় বেশ স্ফূর্ত্তি ও আনন্দে পূর্ণ রাখিতে হইবে। জাতীয় জীবনে উন্নতি লাভ করিতে হইলে মানুষকে মানুষ বলিয়া পরিচিত হইতে হইলে দুর্জ্জয় সাহস অর্জ্জন করা সর্ব্বাগ্রে আবশ্যক'।

•

জগতে যাঁহারা বড় হইয়াছেন, স্মরণীয় হইয়াছেন তাঁহারা সকলেই কঠিন শ্রম ও অসাধারণ অধ্যবসায় সহকারে জগতে নিজের স্থান করিয়া লইয়াছেন—সৌভাগ্যের পথ আপন শ্রম ও সহিষ্ণুতা দ্বারা পরিষ্কার করিয়া লইয়াছেন। লর্ড ইরকেপ যিনি সম্প্রতি ভারতের ব্যয় সঙ্কোচ কমিটির সভাপতি হইয়া ভারতে আগমন করিতেছেন তিনি পঞ্চাশ বৎসর কাল প্রতিদিন ১৪ঘণ্টা করিয়া পরিশ্রম করিয়াছেন। আপন ক্ষমতায় যে সমস্ত ব্যবসায়ী ধনে মানে খ্যাতি লাভ করিয়াছেন তাঁহারা সকলেই জীবনে এইরূপ পরিশ্রম করিয়াছেন। কেবল ব্যবসায় ক্ষেত্রেই নহে, জীবনের যে কোন ক্ষেত্রে পরিশ্রম ভিন্ন কেহই উন্নতি লাভ করিতে পারে নাই। উদ্যোগি ও পরিশ্রমী জন ও জাতির কাছেই লক্ষ্মী আপনা হইতে আসিয়া ধরা দেন। আমাদের দেশে আজ উদ্যোগ ও শ্রমের একান্ত অভাব হইয়াছে বলিয়াই কি দেশের এত দুর্ভিক্ষ, এত হাহাকার এত অভাব অনাটন নহে?

* * * *

ইউরোপে পুরুষের চেয়ে নারীর সংখ্যা ক্রমেই অধিক হইতেছে। বেলজিয়াম, ফ্রান্স, ইংলণ্ড, জার্ম্মেনী প্রভৃতি যে সমস্ত দেশ বিগত মহাযুদ্ধে বিশেষ ভাবে লিপ্ত হইয়াছিল সেই জন্য সমস্ত দেশেই পুরুষের সংখ্যা একেবারে কমিয়া গিয়াছে। জাতি রক্ষার জন্য নষ্ট নারীর মিলন বন্ধন ঘটাইবার জন্য ইউরোপীয় জাতিগণ বড় ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছে—এবং এজন্য নানা পন্থা অবলম্বন করিতেছে। বেলজিয়াম অবিবাহিতা মহিলা-দিগের স্বামী যোগাইবার জন্য আশ্চর্য্য পন্থা আবিষ্কার করিয়াছে। তথায় একটি সুন্দর মেলার মত আনন্দের স্থান করা হইয়াছে এবং সেই স্থানের নাম দেওয়া হইয়াছে বিবাহ উৎসব আলয়, এই বিবাহ উৎসবে যোগ দিবার জন্য দেশের সকলকেই নিমন্ত্রণ করা হইয়াছে। সেই উৎসবে সমাগত পুরুষ ও নারীদের মধ্যে কাহার উপর কাহার টান পড়িয়াছে তাহা বুঝিয়া পুরুষের নারী জোটাইয়া দেওয়া হইবে। প্রার্থীদিগকে পূর্ব্বাহ্নেই নাম জানাইতে হইবে; তাহাদিগকে বহু তাল তাল বেলজিয়াম নারীর সহিত পরিচিত করিয়া দেওয়া হইবে। বেলজিয়ামের এই বিবাহ উৎসব সমিতি প্রায় কুড়ি বৎসর পূর্ব্বে স্থাপিত হয়। এই সমিতি হইতে এ পর্য্যন্ত প্রায় ২০০০০নারীর বিবাহ এ পর্য্যন্ত দেওয়া হইয়াছে।

বাঙ্গলার বন্যা

আজ কাল বাঙ্গালা দেশে বন্যার খবর ছাড়া খবর নাই। বৈষ্ণব কবিতায় যেমন কানু ছাড়া গীত নাই—বর্ত্তমানেও তেমনি আর কোনও খবর নাই—কেবল—বন্যা! বন্যা! বন্যা!

সহস্র সহস্র দেশবাসী গৃহহীন, অন্নহীন, সন্তান-সন্ততি-হীন হইয়া পড়িয়াছে, বন্যায় কাহারও গৃহ ভাসিয়া গিয়াছে, কাহারও, একমাত্র উপজীবিকা ধান্য-ক্ষেত্র ভাসিয়া গিয়াছে, গরু বাছুর কোথায় চলিয়া গিয়াছে, অঙ্গে বসন নাই, উদরে অন্ন নাই—গাছের পাখায়, চালের মটকায়, অনাহারে অর্দ্ধনগ্ন অবস্থায় প্রাণটুকু ধুক্ ধুক্ করিতেছে—কোথায় বা সেই টুকুতেও টান পড়িয়াছে—যায় যায় হইয়াছে! কিন্তু ইহাদের রক্ষা করিতে, ইহাদের সুখ সচ্ছন্দে রাখিবার 'পলিসি বাক্যি' লইয়া, ইহাদের মাথায় কাঁঠাল ভাঙ্গিয়া যাঁহারা উপবিষ্ট আছেন, তাঁহারা কিন্তু হিমাচলের মতই অচল, অটল, অপ্রমেয়ী হইয়া রহিয়াছেন এবং পবিত্রতা রক্ষা করিতেছেন। কাঁঠাল ভাঙ্গা পর্য্যন্তই তাহাদের মাথার দরকার, তারপর মাথা থাকুক বা না থাকুক, তাঁহাদের কি? অবস্থাটা সত্যই এমন পাকা কি না তাহারই একটু আলোচনা করা যাইতেছে।

এই যে দেশব্যাপী বন্যা—নদীর বাঁধ ভাঙ্গিয়া, গ্রামের পর গ্রাম ভাসাইয়া—গৃহস্থের ঘর গুলিকে স্রোতের মুখে কুটার মত এবং গৃহপালিত জীবজন্তু গুলিকে জলচরের মত ভাসাইয়া লইয়া যাইতেছে, আর এ সকলের অভাবে তাহাদের অধিবাসীদের হাড়ীর হাল হইতেছে,—ইহার কোন প্রতিকার বাস্তবিক আছে কি না? এমন কোন উপায় করা যাইতে পারে কি না, যাহাতে ইহাদিগকে এই বিপদ হইতে রক্ষা করা যায়? বেশীর ভাগ, নদীর বাঁধ ভাঙ্গিয়া জল উপছাইয়াই এই দশা হয়। বেশ, নদীতে বাঁধ বাঁধিলে

কোন উপকার হয় কি? সম্ভবতঃ তাহাতেই প্রতিকার হইতে পারে। কিন্তু কি দিয়া দেওয়া হইবে, সেই হইতেছে কথা! বালি দিয়া? বালি দিয়া বাঁধা সেতু হয়ই। কিন্তু তাহাতে জল রোধ হয় না। সে যে বড়র পীরিতি, বালির বাঁধ,—আদিয়া তাদিয়া যাইবেই। অন্য কোন উপায়ে অন্য কোন উপাদানে চলিতে পারে কিনা? ইহারও সহজ উত্তর হইতেছে—পারে। ইহার মধ্যেও একটা 'কিন্তু' আছে। 'কিন্তু'টা হইতেছে এই যে, তাহা করিতে হইলে অর্থের আবশ্যক। কোথায় অর্থ? চারিদিকে যে হা অর্থ হা অর্থ—ধ্বনি। গবর্ণমেণ্টের কাছে কথা পাড়িতে গেলেই উত্তর হইবে—অর্থ কোথায়? আমরা স্বীকার করি যে, অর্থের অনটন হইয়াছে, কিন্তু তাহা বলিয়া এই কথা স্বীকার করিতে পারিব না যে, অর্থ সংস্থান করিবার উপায় নাই। চৌষট্টি হাজার দিয়া অপগণ্ডের দল পুষিতে অর্থের অভাব হয় না, লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করিয়া পর্ব্বত ভ্রমণ করিতে কোথায় শূন্য হয় না, সেখানে পুলিশকে ঘোড়া কিনিয়া দিয়া বাগানের ধারে সং সাজাইয়া ঘাড় করাইতে পয়সা খরচ হয় না— পয়সা খরচ হয় হতভাগা লোকদিগের প্রতি নেক্ নজরে চাহিতে হইলে। বিলাত-ভারতে উল্কা আহাজ চালাইলেই অর্থের সংস্থান হইবে, আর অর্থের অপব্যয় হইবে এই দুর্ভাগ্য দেশবাসীকে বিনষ্ট হইতে, মৃত্যু হইতে বাঁচাইবার চেষ্টা করিলেই। তোমরা 'রিফর্ম' করিতেছ কর, টাকের উপর তেল চালিতেছ চাল,—সঙ্গে সঙ্গে তেলের খরচ যোগাইবার জন্য যে পঙ্গপালেরা না খাইয়া না পরিয়া অর্দ্ধমৃত অবস্থায় বাঁচিয়া আছে, তাহাদের সত্য সত্য বাঁচিবার একটু উপায় কর। মন্ত্রীর মন্ত্রণা লইবার মত সঙ্গীন অবস্থা তোমাদের হয় নাই, তোমরা নিজেই তাহা ভাল জান, তবে কেন আর নির্জ্জলা জুয়াচুরি দোহাই দিয়া, দেউলিয়া সাজিয়া গরীবদের প্রাণে মার? পুলিশকে অত হাওয়া খাওয়াইও না, তাহার চেয়ে আর্ত্ত অসহায়দিগের প্রতি ফিরিয়া চাও। তোমাদের মঙ্গল হইবে। জাতির মঙ্গল মঙ্গলের প্রতি দৃক্‌পাত না করিয়া, কতিপয় তোষামুদের উদর পূর্ণ করিয়া তোমাদের মঙ্গল হইবে না, হইতে পারে না।

'রিফর্মে'র দোহাই পাড়িয়া—নিজেদের জ্ঞানবিবেকের টুঁটি চাপিয়া ধরিয়া, সত্যই কি তোমরা সুখ পাইতেছ? মিথ্যা কথা! তোমাদের বিবেক কখনই তোমাদিগকে প্রবঞ্চনা করিবে না। তোমাদের বিবেক সত্যই বলিবে যে, এই গৃহহীন, বস্ত্রাভাব লোকদিগের প্রতি দয়া কর। বস্ত্রাভাব ও দৈবদুর্ব্বিপাকে নিরাশ্রয় ব্যক্তিদের সাহায্য করিবার পর, রিফর্ম সম্বন্ধে যাহা করিতে হয়, তাহাই করিও। যতক্ষণ না ইহাদের একটা কিছু বিহিত করিতে পার, ততক্ষণ আর 'পবিত্র দায়িত্ব' বলিয়া চেঁচাইও না, রিফর্ম রিফর্ম করিয়া আকাশ কাটাইও না, দয়া ভিক্ষা দাও,—দেশ বাঁচাও।

কংগ্রেসের "প্রোগ্রাম।"

(শ্রীহেমন্ত কুমার সরকার)

কংগ্রেসের কার্য্যতালিকা বদলানো হইবে কিনা—তাহা লইয়া দেশে বেশ একটু আন্দোলন উঠিয়াছে। শুধু কাগজে কলমে লেখা নয়, কথার তর্ক নয়—কংগ্রেসকে বাঁচাইয়া রাখিতে হইলে যে কার্য্য প্রণালীর পরিবর্ত্তন বিশেষ আবশ্যক তাহা পল্লীর কর্ম্মীগণ হাড়ে হাড়ে অনুভব করিতেছেন। যাঁহারা কলিকাতায় বসিয়া শুধু অহিংস অসহযোগের দার্শনিক ব্যাখ্যা করেন, কিম্বা তাহার আধ্যাত্মিকতা বজায় রাখা লইয়া লম্বা লম্বা প্রবন্ধ লেখেন, তাঁহাদের পক্ষে এ সমস্যা কিছুই নয়। কিন্তু অনাহারে, লাঞ্ছনা অপমান সহিয়া অলক্ষ্যায় যাঁহাদিগকে ঘুরিয়া ঘুরিয়া কাজ করিতে হয়—আজ তাঁহাদিগকেই দেশের কাছে এ প্রশ্নের জবাব দিহি করিতে হইতেছে। একটা পয়সার অভাবে যাহার ভাতের সঙ্গে লবণ জোটে না—সে চারিআনা পয়সা গান্ধী মহারাজের লোকের হাতে দিয়াছিল, তাহার কি হইল—জানিতে চায়। সারাদিন উপবাস করিয়া অসহযোগের চারিটি পয়সা হইতে যে দুইটি পয়সা সভায় আসিয়া তিলক ভাণ্ডারে দিয়া গিয়াছিল—সে জানিতে চায় তাহার কি হইল। ইহার উত্তর সে দেশের বড় বড় নেতাগণের কাছে পায় না—সে গিয়া ধরে সেই দারিদ্র্যব্রতধারী ভিক্ষা মাত্র সম্বল কংগ্রেসের সেবককে।

লোকের ব্যবস্থা হইয়াছে এই সকল লোকগুলা ইস্কুল কলেজ ছাড়িয়া নিষ্কর্ম্মার মত বসিয়া বসিয়া দেশের অন্নধ্বংস করিতেছে। তাহাদের অপূর্ব্ব নীরব ত্যাগের এই যোগ্য পুরস্কার বটে। আজ জীবনের সকল দিকের সকল পথ রুদ্ধ হইয়াছে—রাজ-রোষ, সমাজের অভিশাপ তাহাদের জীবনের ধ্রুবক হইয়াছে। সকল পথ ছাড়িয়া একটি পথ সবল করিয়াছিল—দেশ সেবার সেই চটকদার পথে চলা আজ তাহাদের বন্ধ হইবার উপক্রম হইয়াছে। যাহার জন্য এই সর্ব্বস্ব ছাড়িয়া চলা, সেই যদি চলার পথে আসিয়া বাঁকা হইয়া দাঁড়ায় তাহার উপায় কি?

এই শোচনীয় অবস্থা পরিবর্ত্তন করিতে হইলে কংগ্রেসের কার্য্য প্রণালী বদলাইতে হইবে। শুধু "গঠন কার্য্য" লইয়া চলিবে না। গঠন কার্য্যের জন্যও বেশী কর্ম্মী এবং অর্থ আবশ্যক। ভাব-প্রবণ বাঙালী শুধু শুষ্ক প্রোগ্রামে মাতিবে না। তাহার উপযুক্ত কাজ না পাইলে সে সরিয়া দাঁড়াইবে। আজ আমাদের অর্থ নাই, কর্ম্মী নাই। হাজার চেষ্টা করিলেও আমরা বর্ত্তমান কার্য্য তালিকা লইয়া কিছুতেই দেশের মন ফিরাইতে পারিব না। স্বরাজকে দূরভবিষ্যতের লক্ষ্য রাখিয়া আপাততঃ সামনে একটা কিছু রাখিয়া আবেগ-তন্ত্রের সহিত আমাদিগকে যুঝিতে হইবে। সেই "একটা কিছু" কি, তাহা ঠিক করাই পরবর্ত্তী কংগ্রেসের কার্য্য।

* *

নিরপত্র প্রতিরোধ সমিতির রিপোর্ট দেখা হইতেছে। তার কি বাহির হইবে সমিতি বসিবার পূর্ব্ব হইতেই আমাদের তাহা জানা আছে। তবে সাক্ষিগণের কথা হইতে দেশের মনোভাব অনেকটা বোঝা যাইতে পারিবে। বিবাদ বাধিয়াছে Triple boycott লইয়া—কাউন্সিল, আদালত ও ইস্কুল-কলেজ লইয়াই মতভেদ। জাতীয় বিদ্যালয় ও সালিসী আদালত গঠনের দিকে এখন ঝোঁক দেওয়া উচিত—তাহার জন্য চেষ্টা যথেষ্ট হইয়াছে। আর কাউন্সিলে যাওয়া লইয়া চারিটি মতের সৃষ্টি হইয়াছে—একদল একেবারে না করিয়াছেন, দ্বিতীয় দল অসহযোগের কার্য্য কাউন্সিলে চালাইবার কথা বলিতেছেন, তৃতীয় দল বলিতেছেন, আর কিছুর কাউন্সিলে সহযোগ করা এবং চতুর্থ দল বলেন কাউন্সিলের ভিতর দিয়া যতটুকু অধিকার পাওয়া যায় তাই ভাল। এই চারিদলের মধ্যে সকলেই কংগ্রেসে সংখ্যায় নিতান্ত কম নহেন। এখন কাহাদের জয় হয়, সেইটিই দেখা যাক। কিন্তু একদলের জয় হইলে অন্যান্য সকলে সেই মত মানিয়া লইয়া একযোগে কার্য্য করিতেরাজি হইবেন কি? সেই জন্য আমাদের সর্ব্ব প্রধান কর্ত্তব্য এখন প্রোগ্রাম ঠিক করা, যাহাতে কংগ্রেসের একতা বজায় রাখিয়া সকলে কাজ করিতে পারেন।

* * *

গ্রন্থ পরিচয়।

হিমানী স্নো

মুখখানি সুন্দর করিয়া বাহিরে বাহির হইবার কিম্বা ঘরেই মুখখানি সুন্দর করিয়া রাখিবার সাধ সকলেরই হয়। পুরুষেরও এ সাধ হয়, মেয়েদেরও এ সাধ হয়। সৌন্দর্য্যের সাধ সকলেরই আছে। এই সৌন্দর্য্যের উপর ব্যবসা চালাইয়া ইউরোপের ও আমেরিকার বহু প্রসাধন দ্রব্যের ব্যবসায়ী কোটী কোটী মুদ্রার মালিক হইয়াছেন। তাহাদের পক্ক দ্রব্য ভারতের বাজার ছাইয়া ফেলিয়াছে। পিয়ার্স সোপ, হেজেলিনস্নো, ক্রিম, কেয়ুটা প্রভৃতি প্রসাধন প্রচারকগণ ভারতের নয়নাথীকে সৌন্দর্য্যের ও প্রসাধনের দ্রব্যাদি উপহার দিয়া বৎসর বৎসর বহু অর্থ ভারত হইতে লইয়া যাইতেছে। ভারতীয়দিগের সুন্দর হইবার সাধ আছে—অথচ নিজেদের প্রসাধনের সে সব দ্রব্যাদি প্রস্তুত করিবার উৎসাহ নাই। ভারতের নবযুগে ভারতীয় ব্যবসায়ীগণের মধ্যে এই সমস্ত দ্রব্যাদি প্রস্তুতে উৎসাহ দেখা যাইতেছে। ভারত প্রস্তুত প্রসাধন দ্রব্য গুলির মধ্যে যে গুলি আমরা উপহার পাইয়াছি কিম্বা ব্যবহার করিয়াছি তাহার মধ্যে 'হিমানী' নামক মুখ সৌন্দর্য্য বৃদ্ধির ক্রীমটি আমাদিগের বেশ ভাল বোধ হইয়াছে। হিমানীর প্রস্তুতকারকগণ উদ্যোগী ব্যবসায়ী, গুণে ও মূল্যে জিনিষগুলি মনোরঞ্জন করিয়া জনসাধারণের অভাব পূরণ করিয়া অর্থ গ্রহণই তাহাদের অভিপ্রায়। হিমানী ক্রয় করিয়া পয়সা জলে গেল বলিয়া কাহাকেও আক্ষেপ করিতে হইবে না। সুন্দরীরা ইহা ব্যবহারে প্রীত হইবেন—দেশীয় জিনিস ব্যবহারের আনন্দও উপভোগ করিতে পারিবেন। অদূর ভবিষ্যতে হিমানী যদি হেজেলিনস্নো ও ক্রিমকে ভারতের বাজার হইতে ক্রমে দূরে সরাইতে পারে তবে আমরা সুখী হইব। হিমানীর এজেন্ট—

শর্ম্মা ব্যানার্জ্জি এণ্ড কোং—৪৩ নং ষ্ট্রাণ্ড রোড, কলিকাতা।

গ্রন্থ পরিচয়।

চিত্রে শ্রীকৃষ্ণ।

সুদৃশ্য সুরঞ্জিত, মনমুগ্ধকর চিত্রের মধ্য দিয়া শ্রীকৃষ্ণের ব্রহ্মলীলার সম্যক পরিচয় প্রদত্ত হইয়াছে। ছবিগুলি দেখিলে নয়ন ফিরান যায় না, আবার সেই ছবিগুলির পরিচয় লিখিয়াছেন, শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয়—সুতরাং বেশী বলা নিষ্প্রয়োজন। পাতায় পর পাতা উল্টাইতে উল্টাইতে শ্রীকৃষ্ণরূপী শ্রীভগবানের অপূর্ব্ব লীলা মনশ্চক্ষে লীলায়িত হইয়া উঠিবে। ধর্ম্মপ্রাণ হিন্দু নরনারীর কাছে এই গ্রন্থ বিশেষ আদর পাইবে—আশা করি। গ্রন্থখানিতে সর্ব্বশুদ্ধ ৪২ খানি ছবি আছে, সবগুলিই বহু বর্ণে রঞ্জিত, সিল্কে সুরমা বাঁধাই—মূল্য মাত্র চারি টাকা। এই চিত্র গ্রন্থখানি যেখানে রক্ষিত হইবে সেখানকার শোভা বর্দ্ধিত হইবে।

প্রকাশক.....ভারত চিত্র মন্দির, হাওড়া।

প্রাপ্তিস্থান—গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স, কলিকাতা।

প্রকাশ সুপ্রসিদ্ধা গায়িকা শ্রীমতী মেলবা ভারতে আসিতেছেন এবং এখানে আসিয়া তিনি ভারতের বড়-লাটবাহাদুরের অতিথি হইবেন। শ্রীমতী মেলবা ভারতে কি উদ্দেশ্যে আসিতেছেন—মুজরা গাইতে না তার ত পরিভ্রমণ করিতে তাহা এখনও প্রকাশ হয় নাই। শ্রীমতী মেলবা যেমন সুন্দরী তেমনি শিক্ষিতা সঙ্গীতজ্ঞা। পাশ্চাত্যের নানা খ্যাতনামা সংবাদ পত্রে ইহার জীবন কথা, সঙ্গীত পরিচয় প্রভৃতি বাহির হইয়াছে। গায়িকা হিসাবে ও স্ব-রচিত ধারাবাহিক আত্ম জীবনী নানা প্রসিদ্ধ সাময়িক পত্রে বাহির হইয়াছে। ইতি পূর্ব্বে ভারতে বহু পাশ্চাত্য নর্ত্তকী ও গায়িকা আসিয়াছেন। মড্‌এ্যালেনের মত ভুবন-বিদিতা নর্ত্তকীও আসিয়া গিয়াছেন। কিন্তু কোন গায়িকা বা নর্ত্তকীই বোধ হয় এ পর্য্যন্ত ভারতের বড় লাটসাহেবের অতিথি হইবার সৌভাগ্য লাভ করেন নাই। ইনি কি ষ্টেট্-গেষ্ট রূপে ভারতে আসিতেছেন?

• • • •

পাশ্চাত্য গুণের আদর করিতে জানে, গুণীর সম্মান দিতে জানে। তাই তাহাদের দেশে নানা বিভাগেই জ্ঞানী ও গুণী জনের আবির্ভাব হয় ও তাহাদের খ্যাতি জগদ্ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে। প্রকৃত অর্থ মান, যশ, সম্ভ্রম অর্জ্জন করিয়া ইহারা নিজ দেশের মুখ দেশ বিদেশে উজ্জ্বল করিয়া থাকেন। ইতিহাসে ইহাদের নাম স্বর্ণাক্ষরে লিখিত হয়।

• • • •

প্রসিদ্ধ ফরাসী অভিনেত্রীরাণী সারাবার্ণাড্‌কে ফরাসী পরিষদ হইতে শ্রেষ্ঠ সম্মানদান 'লিজিয়ন অব অনর' দিবার কালে ফরাসী মনীষী মণ্ডলি বলিয়াছিলেন 'সারা ফরাসী সাহিত্য, ফরাসী ভাষাকে অতুলনীয় অভিনয় ভঙ্গী দ্বারা জগতকরেণ্য করিয়াছেন তাই সারাকে ফ্রান্সের বরেণ্য যুব মণ্ডলের এই চির আকাঙ্ক্ষনীয় এই সম্মান অর্পন করা গেল। অভিনেত্রী রাণী সারা বার্ণার্ড সঙ্গীত রাণী জেনি লিণ্ড, মেলবা, ষ্টোন, প্রভৃতি দেশীয় রাজভক্ত ও খ্যাত-নামা লোক দিগের নিকট হইতে তেমনি সম্মান পাইয়াছেন। সেদিন মিস্ এলেন টেরিকে সেণ্ট এ্যাণ্ড্রু বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ডি-লিট উপাধি দেওয়া হইয়াছে। আমাদের দেশীয় সর্ব্বাংশে যোগ্যা অভিনেত্রী রাণী, গত বিজ্ঞানের মূর্ত্তিমতী দেবী সদৃশা শ্রীমতী তারাসুন্দরীকে তেমন উপাধি বা সম্মান দানের কথা যদি উত্থাপন করা যায় তবে আমাদের দেশের গুণ-গ্রাহী মনীষী মণ্ডল, অপূর্ব্ব সৃষ্টি বায়ু প্রভৃতি নীতিবাগীশ বোধ হয় ঘৃণায় নাসা কুঞ্চিত করিবেন। কলার সম্মান, বিদ্যা ও জ্ঞানের সম্মান দিতে আমরা এত নীচ কেন?

• • • •

মাডাম মেলবা—গায়িকা মেলবা আজ ভারতের রাজ-প্রতিনিধির মাননীয় অতিথি হইবেন—নীতিবাগীশগণ কই নাসা কুঞ্চন করিয়া ত নিজ নীতি জ্ঞানের পরিচয় দিতে পারেন না?

শ্রীমতী মেলবা।

নীতিজ্ঞানের এমন অপূর্ব্ব বিকাশ বাংলাদেশে নিজ প্রভায় বিস্তার করিয়া না বসিলে বাংলার অধিষ্ঠাত্রী প্রতিভা সম্পন্ন নাট্যকার গিরিশ-প্রভব কলা কুশল নাট্য ও অভিনয়ে আরও বেশী ফুটিতে পারিত। যে গুণে পাশ্চাত্যে সাহিত্য ও নাট্যক্ষেত্র লোকে সার নাইট্ প্রভৃতি উপাধি ভূষিত হইয়াছেন, গিরিশচন্দ্র সে গুণে কাহারও অপেক্ষা ন্যূনতর ছিলেন না। অথচ এই দুর্ভাগা দেশ বলিয়াই তিনি যথোচিত সম্মান লাভে তাহার প্রতিভার ধারাকে আরও সতেজ সজীব করিয়া তুলিতে পারেন নাই। কর্ম্ম ক্ষেত্রের নানা বিভাগে দেশবাসীর এই কুণ্ঠিত লজ্জিত আত্মবোধকে স্বাধীন স্বচ্ছন্দ করিতে না পারিলে দেশের শিল্প-কলা কোন বিষয়েরই উন্নতি হওয়া সম্ভবপর নহে।

• • • •

যে ঘটনা প্রবণে স্ফূর্ত্তি দেয়, সজীবতা আনে, আনন্দের উৎস যাহা তাহাই আমাদের পক্ষে আজ লোকতঃ অশ্লীল অশ্রাব্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে। তাই লোকে মুখে চাকি ছাপি ছাপি করিয়া এই প্রাণের স্বতঃ স্ফূর্ত্তির জিনিস গুলিকে গোপন অন্ধকারের কোঠায় ফেলিয়া নিজেকেও কুণ্ঠিত নীচ করে। প্রাণের স্ফূর্ত্তি প্রেরণা উৎসাহকেও ম্লান হীন করিয়া ফেলে। এই কুণ্ঠা, এ আত্মঘাতী লজ্জা,

সবলে দাঁড়াইয়া ফেলিবার মত স্বাধীন মত ও ক্ষমতা অর্জ্জন দেশবাসীকে করিতে হইবে।

• • • •

বাংলার রঙ্গমঞ্চে শ্রীযুক্ত নিশিরকুমার তাহড়ীর সহযোগী অভিনেতা হিসাবে নামিয়াছিলেন—শ্রীযুক্ত নরেশচন্দ্র মিত্র বি-এল, ও শ্রীযুক্ত রাধিকানন্দ মুখোপাধ্যায়। ইঁহারা মিনার্ভা রঙ্গমঞ্চে অভিনয় করিতেছিলেন। শুনিলাম, সম্প্রতি ইঁহারাও নিশির বাবুর সহিত আধুনিক বঙ্গীয় রঙ্গমঞ্চের সংস্রব ত্যাগ করিয়া ফিল্মকোম্পানীতে যোগ দান করিলেন। ফিল্মকোম্পানীর সঙ্গে সঙ্গে এইবার এই তরুণ যোগ্য কর্ম্মীদের দ্বারায় বাংলায় যদি একটি তেমন রঙ্গমঞ্চ গঠিত হইয়া উঠে, তবে আমরা পরম সুখী হইব।

• • • •

ভাবের অভিব্যক্তি প্রণেতা বিবাহের অভিনেতা, নানা ফিল্মের নায়ক শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় সম্প্রতি হায়দরাবাদের নোটান্ ফিল্মকোম্পানীর ডিরেক্টর ও প্রধান অভিনেতা রূপে ছয়খানা নূতন ফিল্ম প্রকাশ করিয়াছেন। ফিল্মের দিকে বাঙ্গালির এই প্রচেষ্টা প্রশংসনীয়। আমরা ধীরেন বাবুর সাফল্য কামনা করি।

• • • •

আমরা গত শনিবার রাত্রে ষ্টার থিয়েটারে প্রবীন নাট্যরথী শ্রীযুক্ত অমরেন্দ্র চন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রণীত "অমরা" পৌরাণিক নাটকের অভিনয় দেখিয়া আসিলাম। অর্জ্জুন-উর্ব্বশী উপাখ্যানটুকুই এই নাটিকাটির প্রাণ। উর্ব্বশীর প্রেম প্রত্যাখ্যান করায় অর্জ্জুনকে উর্ব্বশীর অভিশাপে ক্লীবত্ব লাভ করিতে হইয়াছিল। নাটিকাটিতে প্রচুর নাচ গান আছে, মনোহর দৃশ্যপটের বাহার আছে, রংবেরঙ্গের সাজ-সরঞ্জাম আছে একঘণ্টা দেড়ঘণ্টা সময় আনন্দেই কাটিয়া গেল।

•

কেন যে, তুমি ও বেশ বড় লোকের বাড়ীতেই বিয়ে করেছিলে। তোমার স্ত্রীর বাপের অবস্থা ত খুব ভালোই ছিল—আজে সে কথা আর বলতে। ভালো ছিল বলেই স্ত্রীটি এখনও বিদ্যমান, তাছাড়া আর যা কিছু এসেছিলেন—সব গেছে। বল কি হে?

আজ্ঞে আর বল্‌বেন না, পাঁচটি টাকা দিন, কিরে বাড়ীতেই শোব করব। নইলে আপনি আমার পিতৃবন্ধু, আপনার সামনে আত্মহত্যে হব,—ঘোড়ার পায়ের তলায় পড়ব—বুকের ওপর দিয়ে চাটুয়েরে চলে যাবে—আপনি আমার পিতৃবন্ধু।...

চুম্বনে।

(শ্রীউমা দেবী—পুরুলিয়া।)

দু'বারের বার যখন জেলের কটক পার হয়ে সে ঢুকল, তখন জেলখানার লোকেরা এমনি একটা তীব্র উদ্বেগের দৃষ্টি ফেলে তার আপাদ মস্তক নিরীক্ষণ করতে লাগল যে হাত কড়া-পরা হাত দু'টি সর্দারের মুষ্টিবদ্ধ এবং দাঁতে দাঁতে ঘষিত হতে লেগেছিল। যাদের ফেলে সে চলে গেছল, তারা যেমন ভয় পেল, তার পরে যারা এসে তার কথা শুনেছিল তারাও কিছুমাত্র কম ভয় পায় নি। যেহেতু গতবার জেলের বেশ উঁচুদরের সাহেব একটির মাথাটা সে এমনি নির্মম ভাবে ভাঙতে গিয়েছিল যে সহবন্দী দশ-বিশজন লোকও তাকে থামাতে পারে নি —সাহেবের সৌভাগ্য ছিল ভাল, পাশেই ছিল একটা বকুল গাছ, সেইটাতে উঠে প্রাণটা বাঁচাতে পেরেছিলেন। এবং সেইদিন থেকেই হুকুম দিয়েছিলেন, সর্দারকে কেউ যাতে না ঘাঁটায়; কাজ না করলেও রিপোর্ট করা মানা হ'য়ে গেল এবং তার খানা পিনার সুবন্দোবস্ত করার জন্যে জেলারের ওপর একটা কড়া হুকুম দিয়ে দিয়েছিলেন। সেইক্ষণ থেকে সর্দারের সহ-বন্দী থেকে জেলের ছোট বড় কর্তারা অবধি সর্দারকে মান্য করে চলতেন। সর্দারের অদৃষ্ট দোষে সেই সাহেব বদলি হ'য়ে যেতেই তারই এক সম্বন্ধীর পিসতুতো ভাই না এলে সর্দারের জন্যে সকালে দশ এবং বিকালে বিশ কোড়ার ব্যবস্থা করে বলেছিলেন—ব্যাটা! সাহেব মারা। এ সাহেবটি খুব সতর্ক আর হুঁসিয়ার ছিলেন। যখনই আসতেন, সর্দার হাত কিড় কিড় করত আর মনে মনে সাহেবকে কবে একলা পাবে—তারই হিসাব করত!

দাতব্বারের বার সর্দার একেবারে মরিয়া হ'য়েই জেলখানায় ঢুকল। প্রথম দিনেই যে তার মেট্ নির্দ্ধারিত হ'ল তার হাতটা অকস্মাৎ সর্দারের হাতের ঝাঁকানিতে বেঁকে গেল; ওয়ার্ডারটির মাথার টুপি সহসা উর্দ্ধে উঠে পাঁচিল টপকে স্কুলের নিচে অদৃশ্য হ'ল আর জেলখানার একখানা দশ-সেরি পাথর কি-জানি-কি-করে ছুটকে এসে গঙ্গার উপরে এক নৌকা বিহারীর মাথাটাকে রক্তারক্তি করে ফেলে!

এবারে জেলের কর্ত্তা ছিলেন, একটি বৃদ্ধ বাঙালী। সব-কথা শুনে এবং পূর্ব্ব ইতিহাস সম্বলিত খাতা-পত্র দেখে কোড়ার ব্যবস্থা করতে তাঁর বাঙালীবুদ্ধিতে সাহস হ'ল না। তিনি ঠিক করলেন, লোকটাকে খানিতে ছুড়ে দেওয়া থাক্—আটচালার মধ্যে বন্ধ থাকবে আর বাইরের লোকের কোন অনিষ্ট করবার সুযোগ পাবে না —তাও বটে; ভিতরের লোকগুলিকে সাবধান করে দিলেই চলবে!

যথেষ্ট সাবধান হওয়া সত্ত্বেও দ্বিতীয় দিনে একটি খানি-গাছ দেহরক্ষা করলে এবং তার যে অধিকারী—সে বেচারাকে ষ্ট্রেচারে উঠিয়ে হাসপাতালে পাঠাতে হ'ল। শুধু তাই নয়, সরকারের তেল মাখার দু'টো পিপে ছেদা হ'য়ে কি-করে যে সব তেল নর্দ্দমা দিয়ে গড়িয়ে গিয়ে মা গঙ্গার বুকে রামধনু রচনা করলে, তা দশজন সশস্ত্র প্রহরীতেও হদিস্ করতে পারে নি।

তারপর পড়ল, বাগানের কাজ। তিনটি দিন না যেতেই অবাঙ্গালীসাহেবটি নিজের অভিজ্ঞতার ফল হাতে হাতে পেয়ে আঙুল কামড়াতে লাগলেন। গাছের গোড়ায় জল দিতে হ'লে গাছ গুলাকে উপড়ে উপড়ে শিকড়ের দৈর্ঘ্য নিরূপন করে' যে জল দিতে হয়—তাঁর দাতার বছরের অভিজ্ঞতায় তিনি তা জান্তেন না। সর্দারের কৈফিয়ৎ, উপড়ে শেকড় দেখ্‌লে বোঝা যায়—কতখানি জলের দরকার আছে, সেই পরিমানে দেওয়া যেতে পারে, অপব্যয় হ'বার এক-তিল সম্ভাবনা নেই।

দু'টো গরুতে বোলায় টেনে যাতা সমান করত। গরু দু'টাকে ছুটি দিয়ে সর্দারের কোমরে দড়ি বেঁধে সেই বোলারটাতেই জুড়ে দেওয়া হ'ল। এবারে সর্দার নিজেই জব্দ। সকাল থেকে সন্ধ্যে পর্য্যন্ত একবার পূব, আর একবার পশ্চিম—এই করতে করতে জান্ হাজরাণ হ'য়ে উঠ্‌লো। দিন আষ্টেক—বই নয়। তার পরেই বেচারা

মাতার ধারে বসে ঝিমিয়ে ঝিমিয়ে লায় বন্ধী যে সব জাত গোয়েরা বাঘা ভেঙে পাহাড় করত—এমনি ছক্ক মুক্ক করে রোলার শুদ্ধ তাদের ঘাড়ে এসে পড়ল যে তার মধ্যে তিনটে লোক একেবারে ভবলীলা সম্বরণ করে বস্‌ল।

জেলের অধ্যক্ষ বাঙ্গালী সাহেবটি সেইদিনই তা'কে ট্রান্সফার করবার জন্ত তার পাঠালেন। তার বন্ত করেদীকে নিয়ে যে তাঁকে সদা সশঙ্কিত থাকতে হ'য়েছে—সে কথাও আলাদা একটা অফিসিয়াল চিঠি লিখে কর্তৃপক্ষের গোচর করলেন। কর্তৃপক্ষের কি বল-না! তারের জবাব ত এলই না, ক'দিন বাদে চিঠি এল—অত বড় জেলের কর্তৃত্বটা সাহেবের হাতেই থাকা উচিৎ—অতঃপর যদি তিনি সেই স্কাউণ্ড্রেলটাকে বশে না রাখতে পারেন—তবে একজন উপযুক্ত লোককে ওখানে পাঠানো হবে!—রায় উল্টা বুঝিতেই, বাঙ্গালী অধ্যক্ষের চোখের তারা স্থির!

সর্দারকে বশে আন্তে না পারলেই যা ঘটবে মনশ্চক্ষে তা দেখ্‌তে পেয়ে বশে আনবার জন্তে মন এবং প্রাণ নিয়োগ করলেন। বল্লেন, থাক্, দাক্, ঘুরে বেড়াক, সর্দারকে কাজকর্ম দিয়ো না। এতে হ'লো কি, ভেতরের উপদ্রব দৌরাত্ম্য বন্ধ হ'ল কিন্তু বাইরের লোক ঘুম-জ্বরম হ'তে লাগল। একদিন খবরের কাগজে প্রকাশ, পুলের উপর দিয়ে যখন এইট্-টি-থ্রি আপ্ পাস্ করছিল, বোঁ করে এতবড় একখানা ইট এসে ড্রাইভারের চোখ উপড়ে দিয়েছে! আর একদিন, একখানা বালাই ট্রেণের মুসলমান গার্ড সাহেব ট্রাকের উপর দাঁড়িয়ে ঝাণ্ডি নাড়ছিলেন, হঠাৎ তাঁর দাড়ীটা উড়ে গিয়ে বেরিয়ে পড়ল খানিক মাংস আর লালসা-মালসা রক্ত। পুলিস 'সরজমিনে' তদন্ত করতে এসে লাইনের ধারে উলু বন থেকে পেলেন সেই পবিত্র দাড়ীসমলিত চিবুকটি। সনাক্ত করতে পারলেন, যে গার্ড সাহেবেরই সম্পত্তি বটে—গার্ড সাহেবও হাসপাতালে শুয়ে শুয়ে চোখের জলে ভাসতে ভাসতে তা স্বীকার করলেন। পুলিস বিজয়ী বীরের মত রিপোর্ট দিলেন, খোওয়া সম্পত্তি পাওয়া গিয়াছে, কিন্তু আসামী নিরুদ্দেশ।

জেলের অধ্যক্ষ পুলিসকে বহুৎ বহুৎ ধন্যবাদ দিয়ে বলে পাঠালেন, থাক্, জিনিষ যখন পাওয়া গেছে.....

কাজকর্ম করতে হয় না, বিকেলের দিকে ওহার পথে ফিরছে, একটি সাত বছরের মেয়ে করুণ কণ্ঠে বলে উঠ্‌ল, আমার পা দিয়ে রক্ত রক্ত পড়ছে, হাঁটতে পারছি নে, আমাকে পৌঁছে দিয়ে এস-না গো।

সর্দার মেয়েটির মুখের দিকে চেয়ে থম্‌কে দাঁড়াল। কারু উপকার করা তার কোষ্ঠিতে লেখে না, আবার তখনি চল্‌তে আরম্ভ করলে।

মেয়েটি বলে উঠ্‌ল—ওগো...এই দু'অক্ষরের কথাটা বল্‌তে গিয়ে মেয়েটি যে পায়ের ক্ষত থেকে বিপুল বেদনা বোধ করছিল, তারই খানিকটা তার মুখে প্রকাশ হ'য়ে পড়ল। সে-যেন কঁকিয়ে কেঁদে উঠ্‌ল।

সর্দার ফিরে দাঁড়িয়ে বল্লে—কি হ'য়েছে?

বড্ড পড়ে গেছি—এই দেখ-না—বলে মেয়েটি ডান হাতে ডান পায়ের পাতাটি তুলে দেখালে। রক্ত পড়ছিল।

সর্দার কাছে এসে বল্লে—কোথায় যাবে? কার বাড়ী?

আমাদের বাড়ী।

তা ত জানি। আমাদেরটা কে? কার মেয়ে তুমি?

আমার বাবার।—মেয়েটি বসে পড়ল। তার ক্ষতস্থানে যেন সিঠী মাছে কাঁটা মারছিল।

সর্দার তা'কে কোলে তুলে নিলে। নিয়ে বল্লে—খুকি, তোমার বাবার নাম কি?

বাবা। বলে সে সর্দারের কাঁধে মাথা রেখে যন্ত্রণার বেগ সহ্য করতে লাগ্‌ল।

বেশ বলেছ, বলে' একটু হেসে সর্দার আবার জিজ্ঞাসা করলে—জেলখানার ভেতরই তোমাদের বাড়ী ত?

হ্যাঁ—বলে মেয়েটি চুপ করল।

সর্দার খানিকক্ষণ সে'খানেই চুপ করে দাঁড়িয়ে ভাবতে লাগ্‌ল—এ কার মেয়ে কি বৃত্তান্ত! মাথার উপর থেকে দিনের আলো লুকিয়ে পড়ছে; আস্তে আস্তে আলোকে ঠেকে ঠেলে অন্ধকার ছড়িয়ে পড়ি পড়ি করছে—এমন অবস্থায় এই মেয়েটিকে কাঁধে করে নেতে দেখ্‌লে আসল ব্যাপারটা যে কেউ-ই বিশ্বাস করবে না, তাই বুঝেই দুর্দান্ত সর্দারের ভয়-লেশশূন্য মন-ও একটু ভয় পেয়ে উঠ্‌ল। চিন্তিত মুখে আবার জিজ্ঞাসা করলে—খুকি, তোমার বাবা কি-রকম দেখ্‌তে বল দিকিন?

উত্তর নেই। সর্দার ঘাড় কাৎ করে' দেখ্‌লে, মেয়েটি তার কাঁধের'পরে মাথা রেখে ঘুমুচ্ছে।—সন্ধ্যার ঠিক

পূর্ব্বাকাশের একটা রক্তাভ আলো মেয়েটির মুখ খানিকে পড়ে চিক্ চিক্ করছে। তার সেই গাল দু'টি সেই আলোয় যেন ফুলে উঠেছে, একটু আগেই যে-সে কাঁদছিল, ঘুমন্ত চোখের ফাঁকে জলের ফোঁটা দু'একটা তখনও টল-টল করছিল—এত কাছে, এমন করে' সর্দ্দার কোন মেয়েকেই পায় নি, কোন মেয়েকেই দেখে নি। এই যে দেখেনি, এই যে কাছে পায় নি, তারই যে এত অভাব, এত বৈরক্ত কোন দিন যে কখনো মনের মধ্যে জমতে পারে, তা'ও সে জান্ত না। সেই ছোট্ট, মেয়েটির মধ্যে যেন সমস্ত নারীত্ব ফুটেছিল, রমণীর সারভূত সৌন্দর্য্য যেন তারই দেহের উপরে ছড়িয়েছিল, সর্দ্দার দেখ্‌তে লাগল আর ভাবতে লাগল, কি সুন্দর এই মুখ-টি, কি নিখুঁত পরিপাটি গড়নটি। স্ত্রীলোক নইলে এত সুন্দর সৃষ্টি হয়? হঠাৎ মনে হ'ল, এই সেই স্ত্রীলোক—এই সেই নারী যার জন্তে পৃথিবীর লোক পাগল! চুরী করতে গিয়ে যে রমণীর কোমল হাত কত বিকৃত করে গহনা কেড়ে নিয়েছে, তবুও রমণীমুখ দেখে নাই; ডাকাতি করতে গিয়ে মাথা কাটিয়েছে, গলায় ছোরা বসিয়েছে—তবুও সে সুন্দর কি দুঃসহিত—দেখবার লোভ যার হয় নাই—তার এ কি চিত্তবিভ্রম! মেয়েটার মুখ হ'তে চোখ যে আর ফেরে না।

সর্দ্দার চকল-চোখে চারিদিক একবার বেশ করে দেখে নিলে; নিয়ে মেয়েটির ফুটন্ত ফুলের পাপড়ীর মত ঠোঁটের উপর ঠোঁট মিলিয়ে খানিকটা মদ খেয়ে ফেল্লে। আর মদের নেশা, নেশার পিপাসাটাকে যেমন বাড়িয়ে তোলে, নারীর অধর দু'টোর নেশা তাকে তেমনি উদ্‌ভ্রান্ত করে ফেল্লে। আবার—বেশ করে' মুখটা নত করে—আবার চুম্বন করলে।

এবারে মেয়েটি জেগে উঠ্‌ল। ডান হাতের তালু দিয়ে ঠোঁট দু'খানাকে মুছে বল্লে—আমায় বাড়ী রেখে এস।

এই সময়েই মোঁজ মোঁজ করতে ক'টা লোক সেখানেই এসে হাজির! ইলাকে দেখে তারি ফুর্ত্তি হ'ল তাদের—বেশী খুঁজতে হয় নি।

মেয়েটি তাদের কোলে গেল না; সর্দ্দারের গলা জড়িয়ে বল্লে—তুমি রেখে আস্‌বে চল।

লোকগুলো আগে আগে, সর্দ্দার পেছনে ইলাকে বুকে নিয়ে চল্‌ছে। খানিকদূর এসেই ইলা বলে উঠ্‌ল—ঐ বাড়ী!

সর্দ্দার চোখ্ কপালে তুলে বল্লে—নাবো!—সেটা সুপারিণটেনডেণ্টের বাড়ী!

ইলা বল্লে—এস-না তুমি!

না, তুমি যাও।

মেয়েটি চোখে যেন যাদু এনে তার দিকে চেয়ে রইল; তার রমণীয়, রমণীগণ-সুলভ কোমলত্ব আবার তার মুখে ফুটে উঠ্‌ল। আবার সে মুখ এত কাছে—আর অন্ধকার—সর্দ্দার আস্তে আস্তে টেনে তাকে মুখের কাছে এনে···

সুপারিনটেণ্ডেণ্ট পরদিন থেকে ইলা যাতে কোনমতেই বেরিয়ে পড়ে সর্দ্দারের কোলে না উঠ্‌তে পারে, কড়া প্রহরী লাগিয়ে দিলেন। সর্দ্দার তা জানে না, রোজই সে একটি স্ত্রীলোকের আগমন প্রতীক্ষা করে আর ভাবে—স্ত্রীলোক নইলে জীবনটা এমন ফাঁকা ফাঁকা ঠেকে কেন? অনেকদিন কেটে যায়, তখনও তেমনি শান্ত-শিষ্টের মত থাকে আর ভাবে, স্ত্রীলোক ভিন্ন পুরুষ এত কষ্ট পায়, আর পুরুষদের জন্তে স্ত্রীলোকটা ভাবে না কেন? ভাবে যদি—ত আসে না কেন?

মেয়াদ ফুরুলো। বেরুবে, সুপারিনটেণ্ডেণ্ট থেকে ছোট করেদী পর্য্যন্ত সবাই বল্লে—আবার কবে আসছ?

সর্দ্দার বল্লে—আর আসব না।

এত বৈরাগ্য? কেন হে?

আজ্ঞে—এবার একটি মেয়েমানুষ বিয়ে করব।

ফরাসীরা ঘোড়া খাইতে বড়ই ভালবাসে। প্যারিস সহরে প্রতি বৎসর মাংসের জন্ত প্রায় ৩০ হাজার অশ্ব হত্যা করা হইয়া থাকে।

সম্রাট পঞ্চম জর্জ্জের বিলাতে রাজ্যাভিষেকের সময় একজন বাদি ৪৫ হাজার টাকায় পোষাক ফুল বোনাইবার অর্ডার পাইয়াছিল। অবশ্য অন্যান্য ফুলের জন্ত আরও অনেক মালী অর্ডার পাইয়া থাকিবে সন্দেহ নাই।

হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে যে, ১৯০৪ খৃষ্টাব্দে গ্রেট ব্রিটেনের লোকের মদ্যপানের জন্ত ২৩০ কোটী টাকা খরচ হইয়াছিল।

লণ্ডনের ক্রিষ্টাল প্যালেসে এক লক্ষ লোক একসঙ্গে বসিতে পারে। পৃথিবীতে এত বড় গৃহ আর কোথাও নাই।

(শ্রীনারায়ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।)

এরূপ ইতস্ততঃ ভাবে অধিক দিন চলিত না, যদি ভূপতিনাথ সে ভার লইবার জন্য আগ্রহান্বিত হইত। কিন্তু একটা সুবিধা এই হইল যে, সে সম্বন্ধে ভূপতিনাথের কিছুমাত্র আগ্রহ দেখা গেল না। তাহার এই ঔদাসীন্যে অনুপমা যেন কতকটা নিশ্চিন্ত হইল।

ভূপতিনাথ চাকরীর উদ্দেশ্যে আসিয়াছিল বটে, কিন্তু দুই একদিন দপ্তরখানায় বসিয়া যখন চিঠা, খতিয়ান, সেহা প্রভৃতির বড় বড় খাতাগুলি দেখিতে পাইল, এবং কাক, কড়া, ক্রান্তির লম্বা লম্বা নিখুঁৎ হিসাব সকল শুনিল, তখন সে জমিদারী সেরেস্তার চাকরীর ইচ্ছা সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ করিতে বাধ্য হইল, দপ্তরখানার দিক্ দিয়া আর গেল না। ইহা অপেক্ষা কাপড়ের দোকানে কেনা-বেচা এবং থিয়েটারে রাত্রি জাগরণ শ্রেয়স্কর বোধ করিল।

তবে কাপড়ের দোকানে বা থিয়েটারে ফিরিয়া যাইবার কোন প্রয়োজনও সে দেখিল না। সকালে উঠিতেই অনুপমা যখন চায়ের কাপ্ তাহার দিকে আগাইয়া দিত, এবং চায়ের কাপ্ মুখে না তুলিতেই বুড়া চাকর জগা তামাক প্রস্তুত করিয়া গড়গড়ার নল হাতে তুলিয়া দিত, তখন ভূপতিনাথ কাপড়ের দোকান, থিয়েটার, দপ্তরখানা সব বিস্মৃত হইয়া তন্ময়চিত্তে অনুপমার স্বহস্তে প্রস্তুত চায়ের সহিত তামকূটের সুগন্ধি ধূম গলাধঃ করিতে থাকিত। তারপর মধ্যাহ্নের পূর্ব্বেই চর্ব্বচোষ্যরূপে আহার শেষ হইলে জগন্নাথের হস্তে পদসংবাহন সুখ উপভোগ করিতে করিতে অপূর্ব্ব স্বপ্নরাজ্যে উপস্থিত হইত। অপরাহ্নে তাস পাশা বা বন্ধুর শিকারের গল্প চা পান ও অনুপমার সহিত গল্প করিতেই সন্ধ্যা অতিবাহিত হইয়া যাইত। রাত্রিতে দিবসের উপভুক্ত সুখস্বাচ্ছন্দ্যগুলির কথা ভাবিতে ভাবিতেই হঠাৎ এক সময়ে ঘুমাইয়া পড়িত। সুতরাং দিন রাত্রির মধ্যে চাকরীর কথা ভাবিবার অবসর তাহার একটু ও ছিল না। আর মোটা মাহিনায় চাকরী করিলেও সুখস্বাচ্ছন্দ্যটা যে ইহার অপেক্ষা কিছু অধিক হইতে পারে ইহা ভূপতিনাথ মনেও আনিতে পারিত না।

ভূপতিনাথ চাকরী বিষয়ে উদাসীন থাকিলেও হেমন্তরী দেবী কিন্তু নিশ্চিন্ত ছিলেন না। তিনি মধ্যে মধ্যে ভূপতিকে জিজ্ঞাসা করিতেন, "হাঁ রে ভূপি, কাজকর্ম্ম সব দেখছিস্ তো।"

ভূপতিনাথ উত্তর দিত, "দেখচি বৈ কি জেঠাই মা, দিন রাত কাজকর্ম্ম নিয়ে রয়েছি।"

জেঠাইমা হর্ষপ্রফুল্লমুখে বলিতেন, "বেশ বেশ, এদ্দিন তো টো টো ক'রে ঘুরে বেড়িয়েছিস্, এবার নিজের একটা হিল্লে ক'রে নে।"

ভূপতিনাথ কিন্তু পাঁচ সাত মাসেও আপনার 'হিল্লে' করিয়া লইতে পারিল না; সে খাইয়া পরিয়া নিশ্চিন্তচিত্তে দিন কাটাইয়া দিতে লাগিল। এই কয় মাসে তাহার বাবুগিরিটা খুবই বাড়িয়া গিয়াছিল। এখন সে আর নিজে তেল মাখিতে পারে না, স্নান করিয়া আসিলে চাকরকে কোঁচান কাপড়খানি হাতে তুলিয়া দিতে হয়। চাকরে জুতা ঝাড়িয়া না রাখিলে তাহার রক্ষা থাকে না। মুহুর্মুহু তামাকের তাগাদায় চাকরেরা ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়ে, আদেশমাত্র হুকুম তামিল না হইলে তাহাদিগকে গালাগালি খাইতে হয়। তাহার প্রভুত্ব দর্শনে শুধু চাকরেরা নয়, এক এক সময়ে অনুপমাও বিরক্ত হইয়া উঠিত। কিন্তু সে বিরক্তিটুকু অনুপমা মুখে কখন প্রকাশ করিত না, মনের বিরক্তি মনের মধ্যেই চাপিয়া রাখিত। কিন্তু ভূপতিনাথ যখন অত্যধিক ঘনিষ্ঠতা দ্বারা তাহার অনুরাগ আকর্ষণের চেষ্টা করিত, তখন আন্তরিক অনুরাগটুকু অন্তরে চাপিয়া রাখা তাহার পক্ষে যেন দুঃসাধ্য হইয়া উঠিত; একটা না একটা ছল করিয়া সে ভূপতিনাথের সান্নিধ্য ত্যাগ করিত। গল্প করিতে করিতে ভূপতিনাথ যখন আপনার লালসাপূর্ণ দৃষ্টিটা অনুপমার মুখের উপর নিবদ্ধ করিতে চেষ্টিত হইত, তখন অনুপমা হয় অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া লইত, নয় তিরস্কারপূর্ণ কঠোর দৃষ্টি দ্বারা তাহার আগ্রহপূর্ণ দৃষ্টিকে লজ্জামত করিয়া দিত। কিন্তু এ লজ্জাটা ভূপতিনাথের স্থায়ী হইত না, অনুপমার অনুরাগ দৃষ্টি লাভের আশা তাহার সকল লজ্জা সঙ্কোচকে দূরে ঠেলিয়া রাখিত। ভূপতিনাথ জানিত, তাহার এই সুপুরুষকে অনুপমা বেশী দিন ঠেলিয়া রাখিতে পারিবে না, একদিন না একদিন তাহার অনুগ্রহ লাভ করিয়া ভূপতিনাথ কৃতার্থ হইবেই হইবে।

এই অনুগ্রহ লাভ খুব সহজসাধ্য হইত, যদি মধ্যে তারানাথ না থাকিত। এই সংসারের মধ্যে ভূপতিনাথ একমাত্র তারানাথকেই আপনার সৌভাগ্য পথের প্রধান কণ্টক স্বরূপ জ্ঞান করিত। এবং এই কণ্টককে কোন উপায়ে উন্মূলিত করা যায় কি-না এক এক সময়ে তাহাও যে না ভাবিত এমন নয়, কিন্তু অনেক ভাবিয়াও কোন উপায়ই স্থির করিতে পারিত না। শুধু নিতান্ত নিরুপায় ভাবে অন্তরের মধ্যে তারানাথের উপর তীব্র বিদ্বেষ পোষণ করিত। এক এক দিন নির্জ্জন গৃহমধ্যে অনুপমার সহিত তারানাথকে কথাবার্ত্তা কহিতে দেখিলে রাগে যেন তাহার সর্ব্বাঙ্গ জ্বলিয়া যাইত; মনে হইত, সে ছুটিয়া ঘরের ভিতর ঢুকিয়া পড়ে, এবং উভয়ের মধ্যে পড়িয়া তাহাদের রহস্যালাপের সূত্রটাকে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করিয়া দেয়। কিন্তু সাহসে কুলাইত না; তারানাথের সহিত পরামর্শ করিলে অপর কাহারও তথায় উপস্থিত হইবার নিষেধাজ্ঞা ছিল। অগত্যা ভূপতিনাথকে বাহিরে থাকিয়াই নিষ্ফল ক্রোধে মনে মনে তর্জ্জন গর্জ্জন করিতে হইত।

অথচ পকেট খরচের জন্য এই তারানাথের নিকটেই মধ্যে মধ্যে ভূপতিনাথকে হাত পাতিতে হইত। তারানাথও যে টাকাটা সিকিটা না দিত এমন নহে, কিন্তু যাহা দিত তাহাতে ভূপতিনাথের মন উঠিত না। তাহার মনে হইত, তারানাথ চেষ্টা করিলেই আরও বেশী দিতে পারে, কিন্তু শত্রুতা প্রযুক্তই তাহা দিতেছে না। একদিন সে পকেট খরচের জন্য দশ টাকা চাহিয়া বসিল। তারানাথ বলিল, এত টাকা কর্ত্রীর বিনা হুকুমে দিতে পারে না। ভূপতিনাথ ইহাতে আপনাকে অবমানিত জ্ঞানে অনুপমার নিকট আসিয়া অভিযোগ করিল। অনুপমা তাহার অভিযোগের উত্তরে বলিল, তারানাথ বাবুর সহিত পরামর্শ করিয়া যাহা হয় করা যাইবে। এ বিচার ভূপতিনাথের মনঃপূত হইল না; সে জেঠাইমার কাছে অনুযোগ করিতে লাগিল। জেঠাই-মা তাহাকে আশ্বাস দিয়া কুটুম্বের ছেলের অপমান জন্য অনুপমার নিকট অনেক অনুযোগ করিলেন। অগত্যা অনুপমা তারানাথকে ডাকাইয়া ভূপতি বাবুকে এই টাকা কয়টা ফেলিয়া দিতে বলিলেন। তারানাথ বলিল, "এর চাইতে মাসে মাসে ওঁর পকেট খরচের একটা বন্দোবস্ত ক'রে দিলে ভাল হয়।"

অনুপমা বলিল, "বেশ, ওঁকে মাসে দশ টাকা ক'রে দেবেন।"

তারানাথ জিজ্ঞাসা করিল, "খরচটা তা হ'লে ওঁর নামেই লিখ্‌বো তো?"

অনুপমা বলিল, "না, খরচ আমার নামেই লিখে রাখবেন।"

তারানাথ বাহিরে গিয়াই ভূপতিনাথকে ডাকাইয়া তাহার হাতে দশ টাকা দিল। ভূপতিনাথ বিজয়সূচক গর্ব্বে বক্ষ উন্নত করিয়া টাকা লইয়া প্রস্থান করিল।

এইরূপে আরও দুই চারি মাস কাটিয়া গেলে একদিন ভূপতিনাথ জেঠাইমার কাছে গিয়া বলিল, "আচ্ছা জেঠাই মা, অনুপমার কি বিয়ে হবে না?"

জেঠাইমা ভূতপূর্ব্ব বিবাহ সম্বন্ধের ইতিহাস কীর্ত্তন করিয়া বলিলেন, "ওর এই খিরিস্টানী ধরণ-ধারণ দেখে কেউ ওকে বিয়ে কত্তে চায় না।"

আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া ভূপতিনাথ বলিল, "বল কি জেঠাইমা কেউ ওকে বিয়ে কত্তে চায় না?"

জেঠাইমা বলিলেন, "খিরিস্টানীকে বিয়ে ক'রে কে কুলে কালি দেবে বে?"

উদ্ধত ভাবে ভূপতিনাথ বলিল, "বোং তোর কুলে কালি! আচ্ছা, কেউ না করে, আমি করবো।"

সস্নেহে জেঠাইমা বলিলেন, "বলিস্ কিরে ভূপি, তুই বিয়ে ক'রে কুল নষ্ট করবি?"

উপেক্ষাসূচক ভঙ্গী করিয়া ভূপতিনাথ বলিল, "রেখে দাও তোমার কুল! এমন মেয়ে,—এত বিষয়—কুল নিয়ে কি ধুয়ে খাব?"

জেঠাইমা বলিলেন, "তা হ'লে বিষয়ের লোভেই তুই বিয়ে করবি বল্?"

জোরে মাথা নাড়িয়া ভূপতিনাথ বলিল, "নিশ্চয়। একি তোমার শ্বশুরের বিষয়—সাড়ে তিন কাঠা জিটে। লাখ দু'লাখ টাকার সম্পত্তি—বিয়ে হ'য়ে গেলে আমিই তো এর মালিক।"

জেঠাইমাও ইহা বুঝিলেন এবং দেবর পুত্র এই সম্পত্তির মালিক হইলেও তিনি যে সংসারের কর্ত্রী সর্ব্বেসর্ব্বা হইয়া বসিবেন সে সম্বন্ধে তাঁহার কোন সন্দেহ রহিল না। তবে অনুপমা এই বিবাহে রাজি হইবে—কি না এ বিষয়ে সন্দেহ রহিল। সুতরাং ভূপতির মতে মত দিলেও তিনি অনুপমার নিকট প্রস্তাবটা তুলিতে পারিলেন না। এদিকে ভূপতিনাথ তাড়া দিতে লাগিল। কিন্তু স্নেহময়ী দেবী কিরূপে প্রস্তাবটা তুলিবেন তাহাই ভাবিয়া অস্থির হইলেন।

এই সময়ে হঠাৎ একদিন তারকনাথ আসিয়া উপস্থিত হইলে তিনি যেন অকূলে কূল পাইলেন।

(ক্রমশঃ)

স্বামী বিবেকানন্দ

মানব এবং দেবতা

(শ্রীবলাইদেব শর্মা)

ভারতবর্ষে মানবের মূল্য তাহার ভাগবৎজীবন লইয়া। যাহার মধ্যে যতখানি ঐশীশক্তির স্ফূর্তি হইয়াছে সে ততখানি বড় সে তেমনি পূজ্য তাহার গরিমা ততখানি অধিক। এখানে ঐহিকতার তেমন আদর নাই; তাই কবি শিল্পী সাহিত্যিক যোদ্ধার আসন তেমন উচ্চে নহে; প্রতিভার এখানে তেমন সম্মান নাই। ভারতের বরণীয় মানব ত্যাগী?

ভারত যাহাকে সম্মান করিয়াছে মনীষীকে শ্রদ্ধা করিয়াছে শক্তিমানকে সম্ভ্রম করিয়াছে কিন্তু অন্তরের কনক সিংহাসনে বসাইয়া পূজা করিয়াছে তাঁহাকে যিনি শুদ্ধ সত্ত্ব, যিনি ত্যাগী সন্ন্যাসী যাঁহার মধ্যে ঐশ্বরিক শক্তির অধিক বিকাশ?

বর্ণভেদ ও কর্মভেদের ভারত বটে কেবল এইখানেই ভেদ বিষমতার সমাপ্তি। আত্মস্থ শক্তিমান অতীত ভারতের ইতিহাসও যেমন, আর বর্তমানের পতিত অবনত ভারতেও তেমনি; এখানে নর দেবতার পূজা সেই একই প্রকার চলিয়া আসিতেছে। এখানে স্পৃশ্য অস্পৃশ্য নাই বর্ণ বিচার নাই বংশ প্রভৃতি কিছুরই বাধা নাই, যিনি ভগবৎভক্ত তিনিই পূজ্য। অতীত ভারতে, নারদ বেদব্যাস ছিলেন জাতির মধ্যে গরিষ্ঠ পুরুষ, আজিও কবীর প্রভৃতি সাধু সন্ত আমাদের গুরুস্থানীয়, ইহাদের ধর্ম বলকে আশ্রয় করিয়া জীবনযাত্রায় অগ্রসর হই। ইহা মানব পূজা নহে, শ্রদ্ধের কাছে অবনমিত হওয়া নহে; ইহা নর নারায়ণের পূজা মানবীয় আধারে ভগবানের আরাধনা।

"পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্ম সংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥"

জীবন ধর্মের সাধারণ নিয়মে যিনি পরিচালিত তিনি নিতান্ত সাধারণ মানুষ। কিন্তু যিনি সমাজ সংহতির কল্যাণের নিমিত্ত "বহুজনহিতায় বহুজন সুখায়" অবতরণ করেন, তিনি অবতার, তিনি ঈশ্বর নিরঞ্জন সৃষ্টিকর্তার বিভূতি:

বিবেকানন্দ বর্তমান ভারতের পুরুষোত্তম—তিনি অবতার।

ইংরাজ অধিকারের পর বাংলার তথা ভারতে একটা দাস্যভাব আসিয়াছিল। দেশ যে রাষ্ট্রক্ষেত্রেই পরতন্ত্র হইয়াছিল তাহা নহে, জাতীয় চিত্তটিও ইউরোপের জড়সভ্যতার কাছে আত্ম বিক্রয় করিয়াছিল। ভারতের সনাতন ধর্ম প্রণেতা তাহার আধ্যাত্মিকতাও ত্যাগের মাহাত্ম্য সকলই ইহসর্বস্বতার মোহজালে আবরিত হইয়া পড়িয়াছিল। দেশের নীতি নাই ধর্ম নাই শক্তি নাই, আছে মাত্র দাসত্বের নিবিড় মোহ মালিন্য। এই দুর্দিনেই বিবেকানন্দের আবির্ভাব।

বিবেকানন্দকে জানিতে হইলে আর একজনকে চিনিতে হইবে—তিনি ঠাকুর রামকৃষ্ণ।

স্বামিজীর জীবন ব্রতের একটা বিশেষ সাধনা ছিল তাহা ভারতকে আত্মস্থ করা। ভারতের সনাতন ধর্মকে পুনঃ প্রতিষ্ঠা করা, তাহার ত্যাগপন্থী সভ্যতার পুনঃ প্রবর্তন করা।

এই সত্যকে মূর্তীকৃত করিবার জন্যই রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দের জীবনলীলা।

ভারতের আধ্যাত্মিকতা সনাতন ব্রহ্মবিদ্যায় জাতির জীবন ধারা হইতে বিচ্যুত হইয়া কেবল শাস্ত্রের মধ্যেই আবদ্ধ ছিল। এবং তাহা ছিল একটা পুরা অন্ধের বিধীভূত হইয়া পণ্ডিতের মানসিক বিলাসের উপকরণ হইয়া। জাতি চলিতেছিল স্বতন্ত্র পন্থায়। পাশ্চাত্যের প্রত্যক্ষ বিজ্ঞান জাতিকে আকর্ষণ করিতেছিল তাহার মোহ আবর্তে। সেইজন্য জাতি একদিকে যেমন প্রবৃত্তি পরায়ণ হইয়া উঠিতেছিল, তেমনি সঙ্গে সঙ্গে স্বধর্ম ভ্রষ্টও হইয়াছিল। ঐ সময়ে ভারতের আধ্যাত্মিকতা, যে কেবল অনাচরণীয়ই ছিল, তাহা নহে, উহা নিতান্ত অবজ্ঞার বস্তুই ছিল; ভক্ত-বিজ্ঞান উহার সূক্ষ্মতত্ত্ব খুঁজিয়া পাইত না বলিয়া অধ্যাত্ম বিজ্ঞান হইয়াছিল "বুজরুকি।"

বহুদিন হইতে ভারতের রাষ্ট্রীয় পরাধীনতা চলিতেছিল সত্য, কিন্তু তাহাতেও জাতীয় স্বতন্ত্র অক্ষুণ্ণ ছিল। অধীনতা ছিল নামে মাত্র। কিন্তু জাতি প্রকৃত বাঁধা হইয়া পড়িল, যখন তাহার স্বকে স্বধর্মকে পরধর্মে বিসর্জন করিল। স্বাধীনতা পরাধীনতা বহিরঙ্গের কোন অবস্থার উপর নির্ভর করে না। স্বভাবটাই মুক্তির অবস্থা। আমার সর্বস্ব লইয়াই আমি। মহৎ হউক, তুচ্ছ হউক, আমি আমিই, অন্য কিছু নহি। এই আত্মমহিমা বোধই

স্বাধীনতা। "যে গতিটি মাজতে" ইহাই মুক্তির ভাব। অন্যের কিছু বিশাল হইতে পারে, তাহা বলিয়া আমার "আমিত্ব" টুকুও ক্ষুদ্র নহে ইহাও মহিমান্বিত।

দেশের জাতির ব্যক্তির এই আত্মবোধের বিলুপ্তিই ধ্বংসের, জাতীয় অবনতির কারণ। জাতীয় অধীনতার ক্রম আছে; স্বাধীনতা ফিরিয়া আসিবার সম্ভাবনা থাকে, কিন্তু আত্মবিস্মৃত জাতি এককালে বিনষ্ট হইয়া যায়।

ভারতের এই দৈনন্দিন বিস্মৃতির দিনেই ঠাকুর রামকৃষ্ণের আবির্ভাব। রামকৃষ্ণ কেবল মাত্র সাধু নহেন ঈশ্বর ভক্ত যোগী নহেন; তাঁহার জীবনে ধর্ম্মের একটি বিশেষ উদ্দেশ্য আছে। যদিও ভক্ত সাধুর প্রভাব সমাজ সংসারকে নিয়ন্ত্রিত করে, কিন্তু তাহার প্রমাণ সর্ব্বত্র সমান ভাবে পরিলক্ষিত হয় না; কোথাও তাহা বিশেষ বিকাশ প্রাপ্ত হয়, কোথাও বা তেমনভাবে স্ফূর্ত্তি পায় না। সাধু জীবনের বিশেষ বিকশিত অবস্থাই অবতার; ইহার একটা বিধি নির্দ্দিষ্ট লক্ষ্য থাকে। ইহা কোথাও "পরিত্রাণায় সাধুনাং" কোথাও "ধর্ম্ম সংস্থাপনার্থায়।"

ভগবান রামকৃষ্ণের আবির্ভাব ভারতের লুপ্তপ্রায় সনাতন ধর্ম্মের পুনঃ প্রতিষ্ঠা করে। ত্যাগ যে কালে দুর্ব্বলতা হইয়াছিল, ভক্তি যে সময়ে গার্হস্থিক দৌর্ব্বল্য হইয়াছিল ঐশ্বরিকতা যখন কুসংস্কারে পরিণত হইয়াছিল, যখন মানুষের অন্তর্যামী মানবের অন্তর বেদী হইতে দূরে পড়িয়া ছিলেন; পাশব প্রবৃত্তি যেকালে মানুষের একমাত্র সাধ্য হইয়াছিল, লোকে যখন সুখের আশায় গরলে ঝাঁপ দিতেছিল, যখন জড়বুদ্ধি জড়চিন্তা মানব জাতিকে অমৃতত্ব হইতে পৃথক করিতেছিল সেই দুর্দ্দিনেই ভগবান রামকৃষ্ণ দেবের আবির্ভাব।

পত্রিকাধ্যক্ষগণ। হে বিরাট, হে বিশাল, তোমার জয় হৌক, তোমার জয় হৌক।.....

বাসন্তীর উক্তি। অত অল্পে হয়? কি বল দাদা পত্রিকা? ঢালো, ঢালো আরো ঢালো—কিছু ভাবনা নেই, আমরা কেনেস্তারা নিয়ে হাজির আছি।

লাউসেন

(শ্রীশিবরতন মিত্র)

সপ্তম অধ্যায়

ময়নাগড়ে নবপরিণীতা—মহামদের প্রত্যাগমন

কর্ণসেন, মোলার অনুরোধ করিয়া, নব পরিণীতা পত্নী সহ ময়নাগড় অভিমুখে যাত্রা করিলেন। নাগরা, নিশান ও বিবিধ বাদ্য অগ্রে অগ্রে এবং বহু সৈন্য তাঁহাদিগকে বেষ্টন করিয়া চলিতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে তাঁহারা পদ্মা অতিক্রম পূর্ব্বক শীতলপুরের নিকট গঙ্গাতীরে উপনীত হইলেন। এখানে স্নান, পূজা, তর্পণ ও যাবতীয় ক্রিয়া সমাধা করিয়া গোলাঘাট, জামতি, অনন্দ, তাবাদিঘী প্রভৃতি বহুতর স্থান পার হইয়া মঙ্গলকোটে আসিয়া প্রবেশ করিলেন। এখান হইতে দামোদর নদ পার হইয়া উকেরগড়, একাল, আসিনা, উচালন প্রভৃতি জনপদ সমূহ অতিক্রম করিলেন। তাহার পর, বাঁকিকেশর নদীর অপর পারে ময়নাগড়ে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

ভূপতি অকল, গৌড়েশ্বরের পত্রোত্তরা পাইবামাত্র সদলবলে বাদ্যভাবে অগ্রসর হইয়া কর্ণসেনকে সাদর সম্ভাষণ পূর্ব্বক প্রণাম করিল এবং অবিলম্বেই তাঁহার বাসোপযোগী বড় বাড়ী প্রভৃতি প্রস্তুত করাইয়া দিল। প্রজাগণও সকলেই বহু অর্থ ও দ্রব্যাদি উপহার দিয়া, নবাগত রাজ-প্রতিনিধি কর্ণসেনকে সম্বর্দ্ধনা করিল। পুষ্পমালা, চন্দন চর্চ্চিত দূর্ব্বা ও ধান্যাদি দিয়া আশির্ব্বাদ করিলেন। কর্ণসেন ও সকলকেই যথাযোগ্য সম্ভাষণ ও প্রণামাদির পর মিষ্ট বাক্যে তুষ্ট করিয়া দিলেন।

কর্ণসেন, অল্পকাল মধ্যেই ময়নাগড়ে আপন অধিকার ও প্রভাব বিস্তার করিয়া রঞ্জাবতী সহ পরম সুখে বাস করিতে লাগিলেন। তাঁহার শাসন গুণে, ময়নাগড়, অচিরেই বহু জনসঙ্ঘ ও প্রভূত ঐশ্বর্য্যে সমৃদ্ধ হইয়া উঠিল।

এদিকে, মহামদ পাত্র প্রবল বন্যা বশতঃ ব্রহ্মপুত্র নদ অতিক্রম করিতে না পারিয়া সুদীর্ঘ কাল প্রতীক্ষার পর সৈন্যাদি সহ গৌড়ে প্রত্যাগমন করিল। রাজা, মহামদকে এত শীঘ্র প্রত্যাগমন করিতে দেখিয়া কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। মহামদ বলিল—গৌড়েশ্বর, আমি এ জীবনে এরূপ প্রবল বন্যা কখনও দেখি নাই। ব্রহ্মপুত্র নদ, প্রচণ্ড দাবানলের মত চতুর্দ্দিক জলময় হওয়ায় কালরূপ প্রবেশ, লঙ্কার মত দ্বীপের আকার ধারণ করিয়াছে। বিপুল সৈন্য লইয়া সুদীর্ঘ কাল অপেক্ষা করিয়াও বন্যার আশু নিবৃত্তি ঘটিবার কোন আশা পাইলাম না; নিশ্চেষ্ট সৈন্যগণ মশক সর্পাদির উপদ্রবে নিতান্তই চঞ্চল ও বিব্রত হইয়া পড়িল। এই নিমিত্ত আমি সম্প্রতি গৌড়ে প্রত্যাগমন করিতে বাধ্য হইলাম। আপনি কিছুকাল অপেক্ষা করুন—বন্যা প্রশমিত হইলেই, আমি ময়নাগড়কে আপনার সমীপে বাঁধিয়া আনিয়া দিব। রাজা ঈষৎ হাস্য করিয়া মহামদকে বিদায় দিলেন।

মহামদকে এত শীঘ্র নির্ব্বিঘ্নে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে দেখিয়া বৃদ্ধপিতা বেহুলার ও জননী মহুয়ার আনন্দের সীমা রহিল না। মহামদ, তাঁহাদিগকে প্রণাম ও কুশলাদি জিজ্ঞাসা করিয়া, তাঁহার প্রিয়তমা ভগিনী রঞ্জাবতীকে আহ্বান করিল—কিন্তু কোন উত্তর পাইল না। মহামদ গৌড়ে প্রত্যাগমন করিয়াই, সংপাত্র দেখিয়া রঞ্জাবতীর বিবাহ দিবার কতই না কল্পনা করিয়া নানাপথ অতিক্রম করিয়াছে। রঞ্জাবতী, আমাকে ক্ষণমাত্র দেখিতে না পাইলে চঞ্চল হইয়া উঠে—আর আমি দীর্ঘ প্রবাসের পর ঘরে প্রত্যাগমন করিলাম—সে কতই না আনন্দভরে আমার নিকট ছুটিয়া আসিবে? কিন্তু হৈ, তাহার ত কোন সাড়া পাইতেছি না—তবে কি রঞ্জাবতীর কোন অসুখ করিয়াছে, বা তাহার কোন অমঙ্গল ঘটিয়াছে?—এবম্বিধ নানারূপ কল্পনা, চকিতে বিদ্যুতের ন্যায়, মহামদের মনের মধ্যে খেলা করিতে লাগিল।

মহামদ, রঞ্জাবতীকে দেখিতে না পাইয়া যে রূপ চঞ্চল হইয়াছে, তাহাতে তাহার মত উপচিত্ত লোকের নিকট প্রকৃত ব্যাপার আর অধিকক্ষণ গোপন রাখা সঙ্গত নহে বুঝিয়া জননী মহুয়া ধীর-স্বরে বলিল—'বাছা, তোমার অনুপস্থিতি কালে রাজা, কর্ণসেন রাজের সহিত রঞ্জাবতীর বিবাহ দিয়াছেন—দক্ষিণ ময়নাগড় কোথায় কোন দেশে জানি না, দুখের বাছা রঞ্জাবতীকে আমার, কর্ণসেন সেখানে লইয়া গিয়া বাস করিতেছে।' মহামদ, যাহা আশঙ্কা করিতেছিল তাহাই ঘটিয়াছে। সে মায়ের নিকট, বৃদ্ধ কর্ণসেনের সহিত রঞ্জার বিবাহ সংবাদ শুনিয়া একেবারে

৬ মণি বারবেল ভাঁজা।

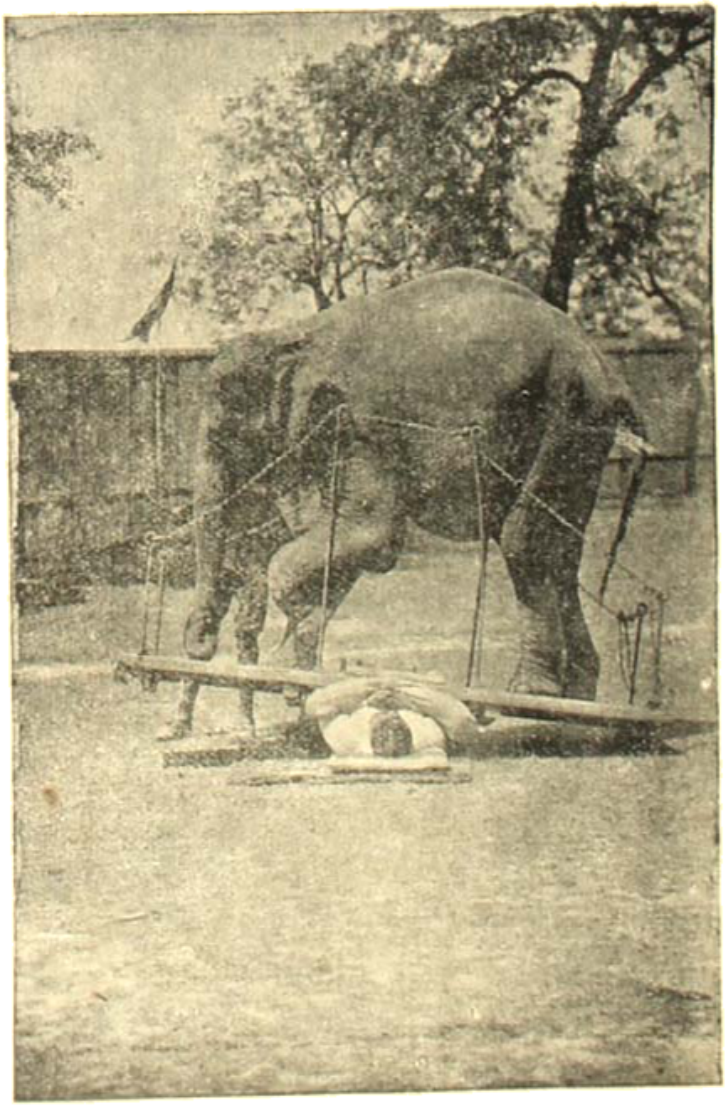

বুকের উপর দিয়া হাতি চলিয়া যাইতেছে।

বাঙ্গালী বীর ভীম-তথাকী।

তথাকীর বেতোয়াঁক্-বেশ।

ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিল—কিন্তু কিছুক্ষণ আহার বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না। পরে সে শিরে করাঘাত করিয়া বলিল—হায় হায় এ কি হইল? পায়ের জুতা মাথায় উঠিল। বাবা, চিত্ত কি বৃদ্ধ বয়সে এতই দুর্ব্বল হইয়াছে যে, রাজার প্রয়োচনায় আমাদের কত আদরের রত্নাকে, এক বৃদ্ধের করে সমর্পণ করিয়া জন্মের মত কোন্ দূর দেশে চিরতরে বিসর্জ্জন দিয়াছে। বাবা, রাজা শাসনের কর্ত্তা বটেন, আমাদের পারিবারিক ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিবার তাঁহার কি অধিকার আছে? যাহা কপালে ছিল, তাহাই হইয়াছে—কিন্তু মহামদ সহজে ছাড়িবে না। এখন যেরূপ ব্যাপার দাঁড়াইল তাহাতে বাবা-উগ্রসেন, এবং রত্নাবতী ভৈরবী রূপে পরিণত হইল—এখন আমাকেই কংসের ভূমিকা গ্রহণ করিতে হইবে।' এই বলিয়া পাত্র ক্রোধে ঘৃণায় ও লজ্জায় দাড়ী মুচড়াইতে লাগিল। রাজার প্রতি রাগ করা বৃথা—তাঁহার উপর প্রতিশোধ লইবার কর্ণসেনের কোন উপায় নাই। কিন্তু, কর্ণসেন রায় বা তৎসম্পর্কীয়ের প্রতি, এখন হইতে তাহার যে ক্রোধ জন্মাইল, তাহা আর কখনই নিবৃত্ত হইবে না—বরং ক্রমেই বর্দ্ধিত হইতে লাগিল।

রত্নাবতী সুদীর্ঘকাল শ্বশুরালয়ে আসিয়াছে—কিন্তু আজ পর্য্যন্ত, তাহার সংবাদ লইবার জন্য পিতামাতার নিকট হইতে কোন লোক আসিল না;—ইহাতে রত্না বড়ই উদ্বিগ্ন ও চঞ্চল হইয়া উঠিল। খাইতে শুইতে তাহার মন সর্ব্বদা উড়িয়া বেড়াইতে লাগিল। বাপ মা বৃদ্ধ—তাঁহারা হয়ত পরলোক গমন করিয়াছেন—দাদা হয়ত কার্য্যগতিকে মুঙ্গেরে হইতে প্রত্যাগমন করিতে পারেন নাই—ইত্যাকার নানা-রূপ দুশ্চিন্তা প্লাবিত হইয়া, তাহার চিত্তকে নিতান্তই ভারাক্রান্ত করিয়া তুলিল। এই নিমিত্ত রত্না, নানা অনুনয় সহকারে গৌড়ে গিয়া তাহাদের সংবাদ লইবার জন্য প্রার্থনা করিল। কর্ণসেন রত্নাকে বুঝাইয়া বলিল—দেখ, তোমার কথায় আমি যদি গৌড়ে না যাই, তাহা হইলে তুমি বাস্তবিকই বড়ই মনস্তাপ পাইবে। তাহারা সকলেই ভাল আছে—কিন্তু তাহারা আমাদের প্রতি অবজ্ঞা করিয়া,কোনরূপ তত্ত্ব তল্লাস করিতেছেন না। মহামদের চরিত্র জানিয়াই, গৌড়েশ্বর বিবাহের পূর্ব্বে ছল করিয়া তাহাকে স্থানান্তরিত করিয়াছিলেন। তাহারই ভয়ে তোমার পিতামাতা তোমার সংবাদ লইতে পারিতেছেন না। সুতরাং তুমি আমায় গৌড়ে পাঠাইবার জন্য আবদার করিও না।

রত্নার মন কিন্তু প্রবোধ মানিল না—সে পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিয়া কর্ণসেনকে বলিল—কুটুম্বিতা ইহকালের জন্য—পরকালের জন্য নয়—যাওয়া আসা না করিলে সম্পর্ক রহিবে কেন? তাহারা রাগ করিলে আমরা রাগ করিব কেন? আপনি একবার গৌড়ে গিয়া তাহার সংবাদ লইয়া আসুন—নচেৎ মন কিছুতেই সুস্থির হইতেছে না।

রত্নাবতীর সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ উপেক্ষা করিতে না পারিয়া কর্ণসেন, বিবিধ উপহার ও অনেক সামগ্রীসহ গৌড় রাজধানীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

স্বরূপ

(শ্রীলীলা দেবী।)

আলেখ্য তো আছে আঁকা
দেখো না চাহিয়া
লুকাক্ নয়ন
বিচিত্র প্রতিমা কত
ধাতু ও পাষাণ
তুলির লিখন
কত রূপ কত লীলা
কত কোটী রূপ
দেখো চোখ মেলে
নিখিল লোচনে কেন
বসে শুদ্ধ একা
এত তীর্থ ফেলে?

হে তীর্থ প্রবাসী মোর
পুরে না পিয়াস
আপনার মুখ
দর্পণে না হেরি—শুধু
চিত্তে নিরখিয়া
হয় তৃপ্তি সুখ?
চিত্র সে যে শুধু চিত্র
অচেতন জড়
স্বরূপ মুকুরে
অনির্ব্বচনীয় রূপ
চিন্ময় সুন্দর
তীর্থ বহু দূরে।

দ্বাদশ গোপাল

[শ্রীবিজয়রত্ন মজুমদার]

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

বাড়ীতে তখন উৎসব সমারোহ পূর্ণ মাত্রায় বর্ত্তমান, দম্পতী প্রণয়-জীবনের প্রথম গ্রন্থটি তখনও পড়ে নাই; ফুলশয্যা বাকী রহিয়াছে অগণিত আত্মীয় স্বজনে গৃহটি কোলাহল মুখরিত হইয়া রহিয়াছে, অদূরে একটি পলাশ গাছের তলায় মাদুর বিছাইয়া সানাইওয়ালারা সারাদিন ধরিয়া মিলন রাগিনী বাজাইয়া মধুর উৎসব মধুরতর করিবার চেষ্টা করিতেছে, বিমান সকলের অজ্ঞাতে খিড়কি দিকের ছাদে উঠিয়া বসিয়াছিল। আকাশ তখন বিচিত্র বর্ণে রঞ্জিত হইয়া উঠিয়াছে, নীড়াভিমুখী বিহগ কুল সেই রঙে রঙ মিশাইয়া কলকাকলি করিয়া চলিয়াছে, সানায়ের মিলনগান শব্দটিকে স্পষ্ট করিয়া উড়াইয়া আনিতেছে; বিমান একদৃষ্টে আকাশের দিকে চাহিয়াছিল, উৎকর্ণ হইয়া শুনিতেছিল। তবুও এমনি একটা শুরুভার তাহার বুকের উপর জমিয়া বসিয়াছিল যে কোন জিনিষটাই সে ভালরূপে দেখিতে বা শুনিতে পাইতেছিল না; অথবা যদিও কিছু শুনিতে পাইতেছিল—মনের মধ্যে কোনটাই স্থান পাইতেছিল না। থাকিয়া থাকিয়া মিলন রাগিনীর ধ্বনি ছাপাইয়া একটা সুর কাণের মধ্যে আসিয়া ঢুকিতেছিল—সে পটলের আনন্দ কোলাহল! পিতামাতার একমাত্র পুত্র—তাহার বিবাহ, সমস্ত বাড়ীটাই যেন উৎসবে মাতিয়া উঠিয়াছে, আর সেই আনন্দ উৎসবের মাঝে বিচিত্র সাজে সজ্জিত হইয়া মূর্ত্তিমান আনন্দের রূপ ধরিয়া পটল চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। বিমানের বুকের সমস্ত তার কটিতে সেই ধ্বনিই ধ্বনিত হইতেছিল; বুকটি যেন সহস্র নয়ন মেলিয়া সেই দৃশ্যই দেখিতেছিল। দেখিতে দেখিতে আকাশের রঙ তাহার চোখে নিষ্প্রভ হইয়া গেল, ঘুম নামিয়া আসিয়া স্বর্ণচূড় বৃক্ষশিখরগুলিকে গ্রাস করিয়া ফেলিল; বিমান চক্ষু মুদিয়া হাতের উপর মাথা দিয়া শুইয়া পড়িল।

কতক্ষণ কাটিয়া গেল, কে জানে! এমন সময়ে পটল আসিয়া বিস্মিতস্বরে বলিয়া উঠিল তুমি এখানে বিমানদা?

বিমান একলাফে উঠিয়া বসিয়া দুই প্রসারিত বাহুর দ্বারা পটলকে জড়াইয়া ধরিয়া বলিল—হাঁ ভাই!

আমি সমস্ত খুঁজে বেড়াচ্ছি। কি করছিলে বিমান দা? কবিতা লিখছিলে?

না রে কবিতা নয়, শুয়েছিলুম।

পটল এক মুহূর্ত্ত পরে বলিল—নীচে চল।

নীচে কেন রে? এইখানে আয় না, বসি।

পটল বলিল—আমি ও বসতে পারব না। নীচে যে আমার অনেক কাজ রয়েছে।

বিমান শুষ্ককণ্ঠে কুদ্ধ একটি—ও—বলিয়া পটলকে ছাড়িয়া দিল।

পটল বলিল—যাবে না?

কি দরকার?

খাবে না?

এত সন্ধ্যেবেলা কি বল?

এটা যে পাড়াগাঁ বিমানদা। এখানে সন্ধ্যেবেলাতেই খাওয়া দাওয়া সেরে হয়।

বিমান একমুহূর্ত্ত পরে বলিল, তা হোক্ গে—আমি এখন খেতে পারব না।

পটল দাঁড়াইয়া উঠিয়া মৃদুস্বরে বলিল—বৌ দেখবে না?

সেও সকাল সকাল দেখতে হয় না-কি রে?

পটল লজ্জিতভাবে মাথাটা নীচু করিয়া বলিল—কলকাতা থেকে ওঁরা সব এসে পড়বেন।

ওঁরা কে রে? তোর শ্বশুরবাড়ীর লোক বুঝি?

হাঁ। ওঁরা এসে পড়লে আর সুবিধে হবে না।

সন্ধ্যার ম্লান আঁধার আলোকে বিমান পটলের মুখের কোন স্থানটাই দেখিতে না পাইলেও নিষ্পলক দৃষ্টি মেলিয়া তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। পটল বলিল—আমি যাই···

বিমান অকস্মাৎ দাঁড়াইয়া উঠিয়া পটলের হাতদুটো চাপিয়া ধরিয়া অশ্রুগদগদকণ্ঠে বলিয়া উঠিল—আর এক মিনিট দেরী সইছে না পটল?

পটল কথাটার অর্থ বুঝিল না, অর্দ্ধমুহূর্ত্ত পরে বলিল—নীচে আমাকে সবাই খুঁজবে। যাই ত এখন।

আমি যাব না।

বেশ—বলিয়া পটল সিঁড়ির দিকে অগ্রসর হইল, বিমান ডাকিল পটল!

পটল ফিরিয়া দাঁড়াইয়া বলিল কি?

বিমান বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে কহিল আর তুই আমাকে ভালবাসিস্ নে, না?

পটল বাষ্পদৃষ্টি মেলিয়া একবার বিমানকে দেখিয়া লইবার ব্যর্থ চেষ্টা করিয়া কহিল—না।—বিমান তাহার হাতটা ছাড়িয়া দিতেই সে দ্রুতপদে সিঁড়িতে অদৃশ্য হইল।

বিমান ঠিক এইটাই কল্পনা করিয়া আসিতেছিল! বন্ধুর মূল্য বন্ধুর কাছে ঠিক ততদিন, যতদিন তাহাদের বন্ধুত্বের অন্ত তাহারা আর কেহ না জুটে! পটল বিবাহিত—বিমান যাহা শুনিয়াছে যদি সত্য হয়—পটলের কিশোরী বধূ সুন্দরী, শিক্ষিতা, সুগায়িকা! বিমানের একবার বড় ইচ্ছা হইয়াছিল, তাহাকে দেখিয়া আসে! দেখিয়া আসে পটলের হৃদয়হারিণীর অসামান্য রূপরাশি। বড় সাধ হইয়াছিল, তাহার মুখের দোটাকত কথা শুনিয়া আসে। কিন্তু পারে নাই। যে চিন্তা তাহার বুকের মাঝে অপার হলাহল ঢালিয়া দিতেছিল, সে সাধ মনে উঠিবামাত্র সর্বাঙ্গ কিসের এক বেদনায় ভারে দেহ-মন পীড়িত হইয়া উঠিল—সে ইচ্ছা ত্যাগ করিতে বিমানের বড় বেশী দেরী হয় নাই—কিন্তু এখনও, এখনও থাকিয়া থাকিয়া মন কেন যে ছুটিয়া ছুটিয়া সেই রূপলাবণ্যময়ীর সন্ধানে ধাবিত হইতে লাগিল—কে জানে।

পটল অদৃশ্য হইবামাত্র, তাহার পদশব্দ নীরব হইবা মাত্র বিমানের সারা দেহটি কে যেন সবলে দুমড়িয়া মুচড়িয়া দিতে লাগিল। পটল বলিয়াছে—না, সে চিন্তাও দুঃখের! কথাটা কতবার অভিমানের, বিদ্বেষাপকার কল্পনা করিয়া বিমান কত রকমে ভাবিতে লাগিল, কতবার মনে হইল পূর্বে কতবার এই রকমের কথা শুনিয়াছে—আধ ঘণ্টা না কাটিতেই সে আবার ছুটিয়া আসিয়া কাঁদিয়া কেলিয়া মিথ্যাভাষণের জন্য ক্ষমা চাহিয়া লইয়াছে, এই ক্ষণিকের বিচ্ছেদটুকু, অতীতকালের বিরহ বেদনাটুকু ধুইয়া মুছিয়া নিঃশেষ হইয়া গিয়া আবার ভরিয়া উঠিয়াছে; মিলনের আনন্দে! কিন্তু আজ আর এতখানি আশা করিতে কোনমতেই বিমানের সাহসে কুলাইতে ছিল না। আজ যেন সেই কথাটাই দুরাশা বলিয়া মনে হইতেছিল। আজ যেন মনটি তাহার ক্রমাগত বৈরাগ্যে ভরিয়া যাইতেছিল—আজ আর আশা করিবার কিছু নাই, সব আশা তরসা নিঃশেষ হইয়া গেছে। আজ আর সে একাগ্রিতা নাই, সে ঐকান্তিকতা নাই—যেন কিছুই নাই।

এই আশাহীন, উদ্যমবিহীন দুর্বহ জীবনটা অল্প কয়েক মিনিটের মধ্যেই তাহার নিকট এমন অবহ-অসহ হইয়া উঠিল যে সে যে পটলের বিবাহে নিমন্ত্রণ আসিয়াছে, অন্ততঃ পক্ষে তাহার পিতা ও আত্মীয়স্বজনের নিকট হইতে বিদায় না লইয়া যাওয়া অনুচিত—এ সব সে ভুলিয়া গেল। শুধু এই কথাই তাহার মনে হইতে লাগিল ছিঃ, ছিঃ, এখানে আসিয়া সে কি ভুলই না করিয়াছিল।

এবং যত শীঘ্র পারে সেই ভুলের সংশোধন করিতে সে সন্ধ্যার অন্ধকার ঢাকা গ্রামাপথ অতিক্রম করিয়া ষ্টেশনে আসিয়া সামনে একটা চলন্ত ট্রেণ প্ল্যাটফরম ত্যাগ করিতেছিল, তাহারই হাতল ধরিয়া উঠিয়া পড়িল।

মিনতি।

(Heine হইতে)

[শ্রীশ্রীপতিপ্রসন্ন ঘোষ]

এ পাপ বদনে রক্ষা করো না,
করুণা করো না মানব বলে,
মিথ্যা গর্ব আশ্রয় করি
পড়ে আছে যারা আঁধার তলে।
আলো দিতে যারা জনম লভেছে
মুক্তি তাদেরে দিও না প্রভু,
বিধান বলি অভিমানী যারা
তাদেরে রক্ষা করো না কভু।

প্রেমিক জনারে বঞ্চনা করে
যে রমণী সারা দিবস-নিশি,
আলোক তাহারে দিও না হে প্রভু,—
থাক্ সে নিবিড় আঁধারে মিশি।
মিথ্যা-কপট বন্ধু যাহারা
চিত্তে হাসিছে যাতনা সব,
বহির মত উল্কা উগারি
তাহাদের-প্রভু ধ্বংস কর।

বাঙ্গালী-বীর ভীম ভবানী

শক্তিচর্চ্চা আমাদের দেশে এক সময়ে খুবই প্রচলিত ছিল, এখনও কোথাও কোথাও এক আধটু আছে বলিয়া শুনা যায়, কিন্তু এই শক্তির বিরুদ্ধে এত রকম বেরকমের শক্তি নিয়োজিত আছে যে অধুনা শক্তিচর্চ্চার নাম শুনিলেই একটা আতঙ্ক আসিয়া উঠে! আমাদের বাঙ্গালা-দেশে এককালে গয়ে-ঘরে শক্তিমান পুরুষের কথা শুনা যাইত, এখন সে সব স্বপ্ন বলিয়াই মনে হয়। এমন কি পনেরো বিশ বছর আগে যে সব ছেলেদের চক্ষের সম্মুখে সুপুষ্ট ও সুস্বদেহ দেখিয়া আনন্দাপ্লুত হইতাম, তাহাদের অনেকেই আর এখন দেখিতে পাই না; শুনিতে পাই তাহারা জীবিত—কিন্তু কোথায় কে জানে! যে দিনে বাঙ্গালাদেশে শক্তিমান যুবক কিশোরদের লইয়া নানাধিক হইতে একটা কাঁড়াকাঁড়ি পড়িয়াছিল, ভীম ভবানী তখন অতি জীর্ণকায়, ম্যালেরিয়াগ্রস্ত কিশোর—বয়স ১৪।১৫ বৎসর মাত্র।

কলিকাতা ধর্ম্মতলাপাড়ায় তখন গুহ বাবুদের অসীম প্রতাপ। ধনে মানে তাঁহাদের খ্যাতিও যথেষ্ট, আবার তাঁহাদের বাড়ীতে তখন পালোয়ানের আখড়া। স্বর্গীয় কেতু গুহ মহাশয় তখন জীবিত। সারা ভারতবর্ষ হইতে নামজাদা পালোয়ানগণ তাঁহার আখড়ায় কুস্তি লড়িতে আসে। কেতু বাবুর আখড়ায় যাহা না মাখিয়াছে এমন পালোয়ান তৎকালে ভারতবর্ষে ছিল না। ভবানী কেতু বাবুর শরণ লইল। কেতু গুহের আখড়াতেই বাঙ্গালীর মুখোজ্জ্বলকারী দুইটি যুবকই কুস্তীর প্যাচ শিখিতে লাগিল। এই দু'জনেই আজ পৃথিবীর সর্ব্বত্র বীর বলিয়া পরিচিত—একটি আমাদের ভীম ভবানী, অন্যটি গোবর।

রামমূর্ত্তি কলিকাতায় খেলা দেখাইতে আসিয়া ভবানীর বীরমূর্ত্তি দেখিয়া তাহাকে সঙ্গে লইতে চাহিলেন। রামমূর্ত্তির সাদর আহ্বান ভবানী উপেক্ষা করিতে পারিলেন না। রামমূর্ত্তি ভবানীকে পাইয়া হর্ষ প্রকাশ করিলেন।

কিন্তু বাড়ীর লোকের মত পাওয়া শক্ত। জননী জীবিত, তিনি জানিতে পারিলে কিছুতেই রাজী হইবেন না। অতএব না বলিয়া পলায়ন করাই ভবানী যুক্তিযুক্ত বিবেচনা করিলেন। রামমূর্ত্তির দলের সহিত একেবারে রেঙ্গুন হইয়া সিঙ্গাপুর, যবদ্বীপ প্রভৃতি পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন। তখনও ভবানীর খেলা দেখান আরম্ভ হয় নাই, শিক্ষা চলিতেছে। এই সময় একটি ঘটনা ঘটিল।

যবদ্বীপে এক ওলন্দাজ পালোয়ান রামমূর্ত্তির বীরত্বে সন্দিহান হইয়া তাঁহার সহিত মল্লযুদ্ধের ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। কেহ চ্যালেঞ্জ করিলে প্রত্যাখ্যান করা বীর ধর্ম্মের বিরুদ্ধ; রামমূর্ত্তি সম্মত হইলেন। ভবানী নিকটেই দাঁড়াইয়া ছিলেন, বলিলেন, "গুরুদেব! আমি আপনার শিষ্য!—ও আমার সঙ্গে আগে লড়ুক, আমি হারিলে গুরুদেব আছেন!"

রামমূর্ত্তি বড়া খুসী। বলিলেন, "বহুৎ আচ্ছা বেটা! লড়ো!

তিন মিনিটের মধ্যে ওলন্দাজ পালোয়ান কাৎ! 'চিৎ' হইয়া পড়িতে রামমূর্ত্তি জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি সাহেব, আর লড়িবে?" সাহেব তখন উর্দ্ধশ্বাসে।

রামমূর্ত্তির স্নেহ ভোগ করা ভবানীর ভাগ্যে বেশীদিন ঘটে নাই। শুনিয়াছি কোন এক বিখ্যাত শিল্পী কলা-বিদ্যার পারদর্শিতায় শুরুকে ছাড়াইয়া উঠিতেছে দেখিয়া গুরু শিষ্যকে দূর করিয়া দিয়াছিলেন। রামমূর্ত্তিও ভবানীকে দূর করিয়া দিলেন। গুরুদ্বারা বিদ্যা লইয়া ভবানী বঙ্গদেশে ফিরিলেন। কিন্তু ঘরে আর মন বসে না! যারে-পেশীগুলা ফুলিয়া ফাঁপিয়া বিদায় দেয়—এই শরীর কি

বসাইয়া রাখিতে পারিবে? হাতে ধরিবে, মুখে ধরিবে, মড়িয়া পড়িবে; খাটাও, খাটাও।

প্রোফেসর কে, সার্কাসের রিংমাষ্টার তখন এসিয়া খণ্ডে খেলা দেখাইয়া বেড়াইতেছিল। দৈবক্রমে তাহারা ভবানীকে লইয়া সহরে বাহির হইল। ভবানী সেই প্রথম স্বচক্ষে ও স্বাধীন ভাবে আত্মবলের পরিচয় দিলেন। সে কি পরিচয়! কিছুদিন পূর্ব্বে লোকে রাম-মূর্ত্তির অদ্ভুত বলের পরীক্ষা দেখিয়াছিল, এবার যাহা দেখিল তাহা আরো ভীষণ।

রামমূর্ত্তি একখানা মোটর গাড়ী টানিয়া রাখিতেন, ভবানী দু'খানি দুই হাতে অচল করিয়া দিলেন; এ যন্ত্র বায়বেলাটাকে শিশুর ক্রীড়নকের মত টানা হেঁচড়া দেখাই-লেন; সিমেণ্টের পিপের উপর ৪।৭ জন লোককে বসাইয়া পিপের বাম হাতে চাপাইয়া শূন্যে ঘুরাইয়া দিলেন; বুকের উপর চল্লিশ মণি পাথর চাপাইয়া তাহার উপর পঁচিশজনকে খাবার খেয়াল গাহিবার অবসর দিলেন।—লোকে দেখিয়া অবাক হইয়া গেল।

সাঙ্ঘাইতে থাকিতে কার্পার নামে একজন মার্কিণ পালোয়ান ভবানীকে চ্যালেঞ্জ করে। ১০০০ ডলার বাজী। খেলায় হারিয়া, ১০০০ ডলার গণিয়া দিয়া খুসী বাড়িতে বাড়িতে মাঠ ছাড়িয়া চলিয়া যায়। কার্পার অপমানের প্রতিশোধ লইতে ভবানীর জীবন নাশের চেষ্টায় প্রবৃত্ত হয়। স্বামীর কল্যাণে ভবানীর প্রাণ রক্ষা করেন। কার্পারের ক্রোধের কারণ জানিয়া তিনি স্বচক্ষে একবার বাঙ্গালী বীরের শক্তির পরিচয় লইবার অভিপ্রায় জ্ঞাপন করেন। তাঁহার একখানি নূতন বিনার্ড মোটর গাড়ী ছিল। বলিলেন—আমি চালাইব, ভবানী যদি আমার গাড়ী থামাইতে পারেন, এই গাড়ী তাঁহার। ভবানী সম্মত হইলেন, বিনার্ড গাড়ীখানি পাইয়া ভবানী তাহা সেইখানেই বিক্রয় করিয়া দেন।

জাপানের মহিমান্বিত সম্রাট মিকাডো মহোদয় এক-বার ভবানীর বলের পরিচয় পাইয়া তাঁহাকে একখানি সুবর্ণপদক ও নগদ ৭৫০ টাকা পুরস্কার দেন।

এসিয়া জয় করিয়া ভবানী ভারতবর্ষে প্রত্যাগমন করিলেন। ভারতমাতা এই বীর পুত্রকে সযত্নে সগর্ব্বে বক্ষে ধরিলেন। সমগ্র ভারতবর্ষে ভবানীর বীরত্বের খ্যাতি বিস্তৃত হইয়া পড়িল। লোকের মুখে ভবানী আর ভবানী। তখনও তিনি 'ভীম' খেতাব পান নাই।

ভরতপুরের মহারাজ একবার বলেন, ভবানী যদি তিনখানা মোটর ধরিতে পারেন তবে তাঁহাকে হাজার টাকা পুরস্কার দিই। ভবানী ইতিপূর্ব্বে দুই হস্তে দুখানা মোটর ধরিয়া তাঁহার অমানুষিক বলের পরিচয় দিয়াছেন। কিন্তু তিনখানা যে কিরূপে ধরিবেন তাহা তাঁহার বুদ্ধির অগোচর ছিল। মহারাজ বলিয়াছিলেন, "এইবার বুঝিব বাঙ্গালী কেমন বীর!" ভবানী বলিলেন, "মহারাজ! আয়োজন করুন।"

ভরতপুরের মহারাজ বাহাদুর, ইংরাজ রেসিডেণ্ট ও রাজমন্ত্রী—তিনজনে তিনখানা মোটরে চড়িয়া বসিলেন। গাড়ীগুলির পিছনে প্রকাণ্ড রজ্জু বাঁধা হইল। ভবানী একটা কোমরে ও দুইটি রজ্জু দুই হস্তে ধরিয়া বলিলেন—"Go" তিনজনেই একসঙ্গে ষ্টার্ট দিলেন। বিরাট শব্দ করিয়া এঞ্জিন চলিল। স্পীডোমিটারে জানা গেল এঞ্জিন পুরাদমে চলিতেছে কিন্তু কোনও গাড়ীই এক ইঞ্চিও নড়িতে চড়িতে পারিল না। যেখানে ছিল সেইখানেই দাঁড়াইয়া রহিল। গাড়ী তিনখানির পিছনের চাকাগুলি শূন্যে উঠিয়া পড়িল—ঘর-র-র শব্দে চাকাই ঘুরিতে লাগিল। মহারাজ সন্তুষ্ট হইয়া গাড়ী হইতে নামিয়া সাদরে বঙ্গীয় বীর যুবকের করমর্দ্দন করিলেন।

একখানা পাঁচ ফুট তিন ইঞ্চি লোহার বরফার উপর ৩০ জন লোককে বসাইয়া কাঁধের উপর তুলাইয়া ভবানী কর্ত্তৃক সেখানাকে অর্দ্ধবৃত্তাকারে পরিণত করিতে দেখিবার সৌভাগ্য এই লেখকেরই ঘটিয়াছিল। সর্ব্বাঙ্গ লৌহ শিকলবদ্ধ ভবানীকে কেবলমাত্র নিশ্বাসের সঙ্গের সঙ্গেই যুক্ত হইতেও দেখিয়াছি। চক্ষের পলক ফেলিতে যতটুকু সময় লাগে, ততটুকু সময়ের মধ্যেই ভবানী ফুলের মালার মতই শিকলটাকে ছিন্নবিচ্ছিন্ন করিয়া দাঁড়াইয়াছেন।

একসঙ্গে মনুষ্য বোঝাই দুইখানি গো শকট (এক এক খানিতে ৫০ জন করিয়া) একই সময় বুক ও ঊরুদেশের উপর দিয়া চলিয়া যাইতে দেখা গিয়াছে।

তারপর বুকের উপর হাতী তোলা। ভবানীর শিক্ষা-গুরু প্রোফেসর রামমূর্ত্তি সর্ব্বপ্রথম বুকের উপর হাতী চালাইয়া অদ্ভুত ক্ষমতার পরিচয় দেন। পরে আরও দুই একজন বঙ্গীয় বীর বক্ষে হাতী ধরিয়াছেন। সে সকলই সার্কাস দলের শিক্ষিত হাতী। ভবানীও এতদিন সার্কাসের

হাতীই বুকের উপর তুলিতেছিলেন—এ পর্য্যন্ত অন্য হাতী তোলায় চেষ্টাও করেন নাই। একবার মুর্শিদাবাদের নবাব বাহাদুরের হাতীশালায় এক বুনো হাতী আসিয়া হাজির হয়। হাতীটা ওজনে ও আয়তনে, সচরাচর যে সব হাতী দেখা যায় তাহার চেয়ে অনেক বেশী! দৈর্ঘ্যে জীবটী নয় ফুট সাত ইঞ্চি। নবাব বাহাদুরের ইচ্ছা বুনো হাতীটাকে ভবানীর বুকের উপর দিয়া চালাইতে পারেন কি না পরীক্ষা করা। ভবানী নবাব বাহাদুরের অভিপ্রায় জানিতে পারিয়া বলিয়া পাঠাইলেন, নবাব বাহাদুরের সন্তোষ বিধানার্থ হাতীটাকে বুকের উপর দিয়া চালাইতে তিনি সম্মত আছেন।

ইতিপূর্ব্বে কোন বীরই এইরূপ একটা অশিক্ষিত বিরাটকায় হাতী বুকে তুলিবার দুরাশাও করিতে পারেন নাই। সাধারণতঃ সার্কাসে যে সব জন্তু থাকে, অনাহারে অর্দ্ধাহারে তাহারা কৃশ ও নিরীহ। ভবানী যখন সহস্র সহস্র দর্শকের সম্মুখে স্বয়ং নবাব বাহাদুর ও তদানীন্তন বঙ্গেশ্বরের সাক্ষাতে বুকের উপর দিয়া সেই হাতীটাকে চালাইয়া দিয়া সুস্থ ও অক্ষত দেহে উঠিয়া দাঁড়াইলেন, তখন দিগ্‌দিগন্তে তাঁহার জয়ধ্বনি উঠিল। বাঙ্গালীর অদ্ভুত শক্তি দেখিয়া স্বয়ং বঙ্গেশ্বরও স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছিলেন।

ভবানী সর্ব্বসুদ্ধ ১২০ খানি স্বর্ণ ও রৌপ্য পদক পাইয়াছেন। পদক ব্যতীত শাল আলোয়ান, আঙ্গুরী মোটর গাড়ী নগদ মুদ্রাও তিনি যথেষ্ট পাইয়াছেন। বাঙ্গালী জাতি —ভারতবাসী—তাঁহার সম্মানে সম্মানিত হইয়াছেন।

স্বদেশী মেলা বসিয়াছে। দেশবন্ধু (অধুনা স্বর্গ) সুরেন্দ্র বন্দ্যো, বিপিন পাল, মতিলাল ঘোষ প্রমুখ দেশের গণ্যমান্য ব্যক্তির সম্মুখে বীরত্ব লীলা দেখাইয়া ভবানী "ভীম" আখ্যা প্রাপ্ত হন। তখন গিয়াছে অমৃত বাবু বলিয়াছিলেন, মহাভারতের ভীম এমনই একজন বীর ছিলেন। তুমি দেখিতেছি কলিকালের ভীম। আজ হইতে আর তুমি শুধু ভবানী নহ, তুমি ভীম ভবানী।"

তখন হইতেই সাধারণে ইনি ভীম ভবানী বলিয়া পরিচিত। পশ্চিমাঞ্চলে ইহাকে লোকে "ভীমমূর্ত্তি" বলিয়া থাকে।

ভীমমূর্ত্তির আসল নাম হইতেছে, ভবেন্দ্রমোহন সাহা। ইহাদের পূর্ব্ব পুরুষগণ বীজন ষ্ট্রীটের সা-গণ বলিয়াই পরিচিত ছিলেন। ভবেন্দ্রের পিতা ৺উপেন্দ্র-মোহন সাহাও বলিষ্ঠকায় পুরুষ ছিলেন। ভবানীরা বর্ত্তমানে নয় সহোদর। ভবানী মধ্যম; তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতারা সকলেই ভবানীর শিক্ষকতায় শারীরিক বলের উৎকর্ষ সাধন করিয়াছেন। সমগ্র বঙ্গদেশে এমন সুস্থ বলিষ্ঠ ও বীর পরিবার অধুনা অত্যন্ত বিরল।

ভীম ভবানীর বর্ত্তমান বয়ঃক্রম ৩১ বৎসর। তিনি অকৃতদার। বিলাস বাসনা তাঁহার নাই বলিলেও চলে, অত্যন্ত মোটামুটি রকমের জীবন যাপন করাই ইহার জীবনের উদ্দেশ্য।

কিছু দিন হইতে তিনি আমেরিকায় যাইবার জন্য পাসপোর্টের চেষ্টা করিতেছেন; পাসপোর্ট পাইলেই ভবানী মার্কিন দেশ যাত্রা করিবেন। আমাদের গোবর পালোয়ান এখন আমেরিকায় আছেন; সে দেশের প্রায় সমস্ত পালোয়ানই গোবরের বশ্যতা স্বীকার করিয়াছে।

পরিশেষে ভীম ভবানীর খাওয়া দাওয়ার একটা মোটামুটি ফিরিস্তি দাখিল করিতেছি। প্রাতে ২০০ শত বাদামের সরবৎ, এক ছটাক গব্য ঘৃত; মধ্যাহ্নে সাধারণ ভাত ডাল; অপরাহ্নে ২৲ বা ২॥ টাকার ফল ও ৪০টি বাদামের সরবৎ এবং এক সের মাংস। রাত্রে আধসের আটার রুটী ও তিন পোয়া মাংস—ইহাই ভীম ভবানীর দৈনন্দিন আহার। ইহা ছাড়া, তাঁহাকে দুই সের মাংস জলযোগ করিতে দেখিয়াছি। ("স্বাস্থ্য ও ব্যায়াম")

আমেরিকার যুক্ত রাজ্যের আয়তি পদকে "ওলসেট" নামে একটী সুবৃহৎ ঘড়ী আছে। তাহার সম্মুখের ব্যাস ৩৮ ফিট। মিনিটের কাঁটাটি ২০ ফিট দীর্ঘ এবং ওজনে প্রায় নয় মণ। উহা প্রত্যেক মিনিটে ২৩ ইঞ্চি করিয়া অগ্রসর হয়।

ইতালীর অন্তর্গত রোমের পোপের নিকট পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা মূল্যবান একটী ঘড়ী আছে। উহার মূল্য নয় লক্ষ টাকা। ঘড়িটী হাতি দন্ত খচিত।

ইংলণ্ডেশ্বর পঞ্চম জর্জ্জ মহোদয়ের বাকিংহাম প্রাসাদে যখন কোন ব্যক্তি নিমন্ত্রিত হইয়া আসেন তখন দ্বারস্থ আদেশে তাঁহাকে ওজন করা হয়, এবং যখন প্রাসাদ পরিত্যাগ করেন, তখন তাঁহাকে ওজন করিয়া দেওয়া হয়।

আমেরিকার মিসিসিপি নদীতীরে রেলওয়ে ষ্টেশন ৮৯ বিঘা। প্যাসিফিক রেলওয়ে কোম্পানির মালক ষ্টেশন ৮০ বিঘা, এডিসনবার্গ ভেজোয়ালী ষ্টেশন ৮৯ বিঘা লণ্ডনের ভারটোরিয়া ষ্টেশন ৬৩ বিঘা এবং লিভারপুল ষ্টেশন প্রায় ৩০ বিঘা জমির উপর নির্ম্মিত হইয়াছে।

দেশ-বিদেশ

সিস-মিস-প্রতিষ্ঠাতা মিসিসের ইইলের নামে তাঁর একখানি চিঠি পাওয়া গেছে। সেই ক্ষুদ্র চিঠিতে তিনি তাঁর দেশবাসীকে সভ্যির সর্ব রকমে চলতে অনুরোধ করে গেছেন। তাঁর মতে সভ্যির দ্বারাই দেশের কাজ হবে এবং আর্থিক দুঃখও ঘুচবে।

আর্থার মিসিস

মিসরে এক সপ্তাহে এক জনের নামে ৫০০টি তারাক-বোর্কদমা ছিল; তার মধ্যে ২১৯টি এক সপ্তাহের মধ্যেই ফয়সালা হয়ে যায়। ঐ ৫০০টিই, এক তরফা প্রতিবাদী হাজির হয় নি।

—•—

একজন মন্ত্র ১২ মিনিটে ঐ রকম তিনটি ব্যাপের মকর্দমা নিষ্পত্তি করেছিলেন, তাঁরই মত হ'চ্ছে চিঠি পত্র পড়ো নয়, যাই পড়ো, কথাগুলো শুনে নিলেই হ'ল।

—•—

ফ্রেডেরেক ব্রাবের মিলট উপর্যুপরি দুইবার দুইটি ফেল দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে। একটি অমণীবিদের গাড়ীর ৭ জন হত এবং ১৬ জন আহত হইয়াছে। আর একবারে ট্রেণের উপর একটা ইঞ্জিন আসিয়া পড়ায় একটি লোক তৎক্ষণাৎ মৃত এবং বহু লোক আহত হয়।

—•—

আমেরিকায় বালক-আত্মহত্যার হিসাব, অনুসন্ধান করিয়া জানা গেছে যে, গত বছর ৮০০টি ছেলে-মেয়ে আত্মহত্যা করেছে—তাদের সকলেরই বয়স পনেরো, ষোল—এর বেশী নয়। ১৯১১ সালের আত্মহত্যার সংখ্যার চেয়ে শতকরা ৮০টি ছেলেমেয়ে এবছরে। অনেকে অনুমান করেন, এই সকল অপমৃত্যুর মূলে এই ভাল গুলিই উল্লেখ যোগ্য। স্কুল কলেজের পরীক্ষা ভীতি; আবার এর মধ্যি।

—•—

শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু স্বদেশসেবায় ব্রতী হইয়া বিশেষ কষ্ট পাইতেছেন। সম্প্রতি তাঁহাকে চিকিৎসকের পরামর্শ মত ডারবাইসায়ে বিশ্রামার্থ যাইতে হইতেছে। ভগবান তাঁহাকে নিরাময় করুন।

—•—

মিসরের মুসলমানি প্রধান পাশা লিটিলিসে সাম্রাজ্যিক ভাবে পঠিত। মিসরের মন্ত্র-পরী প্রধানমুখের মুক্তি কামনা করিয়া ব্রিটিশ গভর্নমেণ্ট বিশেষ আবেদন পাঠাইয়াছেন। দেখা যাক—কি হয়!

—•—

বাঙ্গালীর মেয়ে হিরণপ্রভা তাঁহার স্বামী হেনরীর বিরুদ্ধে বিবাহ বন্ধন ছেদন করিবার জন্য হাইকোর্টে মকর্দমা রুজু করিয়াছিলেন। হেনরীর অপরাধ সে অত্যাচার করিত, ব্যভিচার করিত। আদালত হিরণপ্রভার সপক্ষে রায় দিয়াছেন—হেনরী আর তাঁহার স্বামী নহে। ওকথায়। মামলা হিরণপ্রভা বলিয়াই আমাদের যা দুঃখ।

—•—

ঢাকা জেলার লোহজঙ্গ থানার অধীনে একটি গ্রামে ৩ জন ডাকাত ধরা পড়িয়াছে। তাহারা একটা বাড়ীর খড়ের সারার ভিতর ৩০টি বোমা, কতকগুলি লাঠি এবং মশাল লুকাইয়া রাখিয়াছিল।

—•—

লণ্ডন সিটি মিসালিটির বৎসরে ২৩ কোটি টাকা আয়। কলিকাতা ও বোম্বাই মিউনিসিপালিটীর প্রত্যেকের বাৎসরিক আয় প্রায় এক কোটি টাকা হইবে।

লর্ড মর্লি

এ বৎসর বি-এ পরীক্ষায় ১৪৩৭ টি ছাত্র পাশ করিয়াছে, তন্মধ্যে ১৩৯ জন সম্মান পাইয়াছে।

—

আইরিশ সেনাপতি মাইকেল কলিন্স গুলির আঘাতে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন। ব্রিটেন ও আয়ারলাণ্ডের জন্য শান্তি স্থাপনার্থ মিঃ কলিন্স প্রাণপণ করিয়াছিলেন। এই কার্য্যে কয়েকদিন পূর্ব্বে তাঁহার সহকর্মী মিঃ আর্থার গ্রিফিথ রোগে মারা যান। কলিন্স মৃত্যুকালে মাত্র একটি কথা বলিতে পারিয়াছিলেন, আমি তাহাদের কথা ভাবিলাম।'

লর্ড হ্যালসেল—যিনি ইদানীং ভারতে বাং-সঙ্কোচ সমিতির সভাপতি হইয়া আসিতেছেন—তাঁহার কন্যা লেডী এলসি ম্যাকে উঠে। তাহাদের পরীক্ষায় পাশ হইয়াছেন। তিনি নিজের আরোহীই আকাশপথে বিচরণ করেন।

আমেরিকার পাশার মৃত্যুসংবাদে লাহোর সহরে ধর্ম্মঘট হইয়াছিল।

যত বাঙ্গালী গ্রাজুয়েট চাকরীর সন্ধানে ব্রহ্মদেশ অবধি ধাওয়া করিয়াছিলেন। তথাকার কর্ম্মপক্ষ বাঙ্গালা দেশের যুবকদের অবস্থিতির জন্য কাজে কাজেই খবর পাঠাইয়াছেন, তাঁহারা যেন আর ব্রহ্মদেশ যাত্রা করিয়া অবিবেচনার পরিচয় না দেন। একটি দেশ সম্বন্ধে কথাবার্ত্তা উল্লেখ দেখিলাম, অনেক গ্রাজুয়েট না-কি কর্ত্তাদের বলিয়া থাকেন—সর্ব্বসমেত কয় বিঘা বিস্তারের হইতে পাশ করিলাম, তবে কেন আমাদের চাকরী তাঁহারা দিবেন না? প্রশ্ন মন্দ নয়, কিন্তু উত্তর দিবে কে—তাহা ত বুঝি না।

নিউবার্সীতে প্রকাশ, যান সঙ্কোচার্থ হইটি রেসিডেন্ট ম্যাজিষ্ট্রেটের পদ টাঁটিয়া গেল।

খদ্দর হাট ও মেলা

আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্রের বক্তৃতা

গত ২০শে আষাঢ় খদ্দর হাট ও মেলায় আচার্য্য শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র রায় মহাশয় নিম্নলিখিত মর্ম্মে বক্তৃতা প্রদান করেন।—

"আমি মনে করিয়াছিলাম যে, আমাদের দেশের মহিলাগণের দ্বারা খদ্দর সমাদৃত হইতে পারিবে না। কিন্তু সমবেত মহিলাদিগকে খদ্দর পোষাকে ভূষিতা দেখিয়া দেশের ভবিষ্যত আশা সম্বন্ধে আমি অনেকটা নিশ্চিন্ত। ঘরোয়াভাবী মহিলাদিগকে সভায় উপস্থিত দেখিয়া আমি অত্যন্তি সুখী এবং আহ্লাদিত।

"২০ কি ২৫ বৎসর পূর্ব্বে চরকা আমাদের দেশের ভূষণ ছিল। প্রত্যেক গৃহবাসীই তখন চরকা কাটিত। এবং তাহার সাহায্যেই দেশের বস্ত্র-সমস্যার সমাধান হইত। কিন্তু আজ এই দুর্দ্দিনে আবার আমাদের বাজার বিদেশী বস্ত্রে সম্পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে। অনেক দিন বিদেশে থাকিয়া আমি যে প্রভিজন্স লক্ষ করিয়াছি, তাহাতে বলিতে পারি, বিদেশী হাব ভাব, চাল চলন আমাদের সহ্য হইবে না,—আমরা সেই আবহাওয়ায় আবদ্ধ থাকিয়া দেশের উন্নতি সাধন করিতে পারিব না।

যে সকল রমণী প্রেমে পড়ে না, তারা পরের প্রেম-কাহিনীর মধ্যে ডুবে আছে।

প্রণয়ের পরম পরিণতি—পরিণয়।

চট্ করে প্রেমে পড়ে যারা তাদের প্রেম ভাঙ্গেও চট্ করে।

বিদেশী হাব ভাব আমাদের জাতীয় উন্নতির মূলে কুঠারাঘাত করিয়াছে, আমি জোড় হাতে সমবেত মহিলাদিগকে অনুরোধ করিতেছি, তাঁহারা যেন খদ্দর পরিধান করিয়া দেশের টাকা দেশেই রাখিতে প্রয়াস পান। যদিও খদ্দর পরিধানে একটু অসুবিধাজনক তবুও যেন তাঁহারা একটু কষ্ট স্বীকার করিয়া একটু ধৈর্য্য ধরিয়া, খদ্দরকে স্থান দান করিয়া দেশের ও জাতির উপকার করেন।

"আমি পুনঃ পুনঃ আপনাদিগকে খদ্দর পরিধান করিয়া, সুতা কাটিয়া, অভিবাদীকে সুতা কাটিতে শিক্ষা দিয়া দেশের এবং জাতির উপকারের জন্য অনুরোধ করিতেছি। আশা করি আমার অনুরোধ কার্য্যকরী হইয়া দেশের মঙ্গল সাধন করিবে।"

এই প্রসঙ্গে আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র যে একটি গল্প বলিয়াছেন তাহা এই:—

অনেকে যাঁহারা এখনও বিলাতী কাপড় জামা ছাড়েন নাই, তাঁহাদের জিজ্ঞাসা করিলে বলেন, আবশ্যক নাই।—(হাস্য)। আমাদের দেশের লোকের অর্থের এত সচ্ছলতা আছে কি যাহারা লোকে দুই তিন বৎসরের জামা কাপড় একেবারে বন্ধ করিয়া রাখিতে পারেন।

এক পাঁড়াখোর ছিল, তাহাকে পাঁড়া ছাড়িতে বলিলেই সে উত্তর দিত—এই ছিলিমটাই শেষ। এটি ফুরাইলে আর খাইবে না।—বলিয়া টাঁক দেখাইত। বলা বাহুল্য তাহার টাঁকের ছিলিমটি কখনই ফুরাইত না।

বিলাতী কাপড় যাঁহারা পরেন, তাঁহাদের পূর্ব্বেকার জমা কাপড় যে কবে শেষ হইবে—কে বলিতে পারে?

তিলক-স্বরাজ্য-ভাণ্ডারে মহামতি এণ্ড্রুজের দান

ইতিপূর্ব্বে আফ্রিকার পরিভ্রমণ কালে শ্রীযুক্ত এণ্ড্রুজ মহাশয় যে সমস্ত চাঁদা উপহার পাইয়াছিলেন, তাহার সমস্ত তিনি তিলক স্বরাজ্য ভাণ্ডারে দান করিয়াছেন। ভাণ্ডারের ট্রাষ্টিগণ আবার ওগুলি ওজরাট জাতীয় বিদ্যালয়কে অর্পণ করিয়াছেন। সেখানে বিশ্ববিদ্যালয়ে ঐগুলি সম্বন্ধে রক্ষা করা হইবে।

অবিবাহিতা মেয়েদের রুচি-বাগীশ ও লীল লোকদের কাছে খুব সতর্ক থাকা উচিত এই রকম একটা উপদেশ সেদিন একটা খবরের কাগজে পড়া গেল।

ডাক্তার। মা রোগী-টুগী না ছুটলে আর চলে না। কোন খাটায় কিছু হ'বার নামটি নেই।

স্ত্রী। এক কাজ কর—পাড়ার লোকগুলোকে নেমন্তন্ন করে খাবারের সঙ্গে কিছু খাইয়ে দাও···মুখে আসলে উঠে আসবে।

বাসন্তী

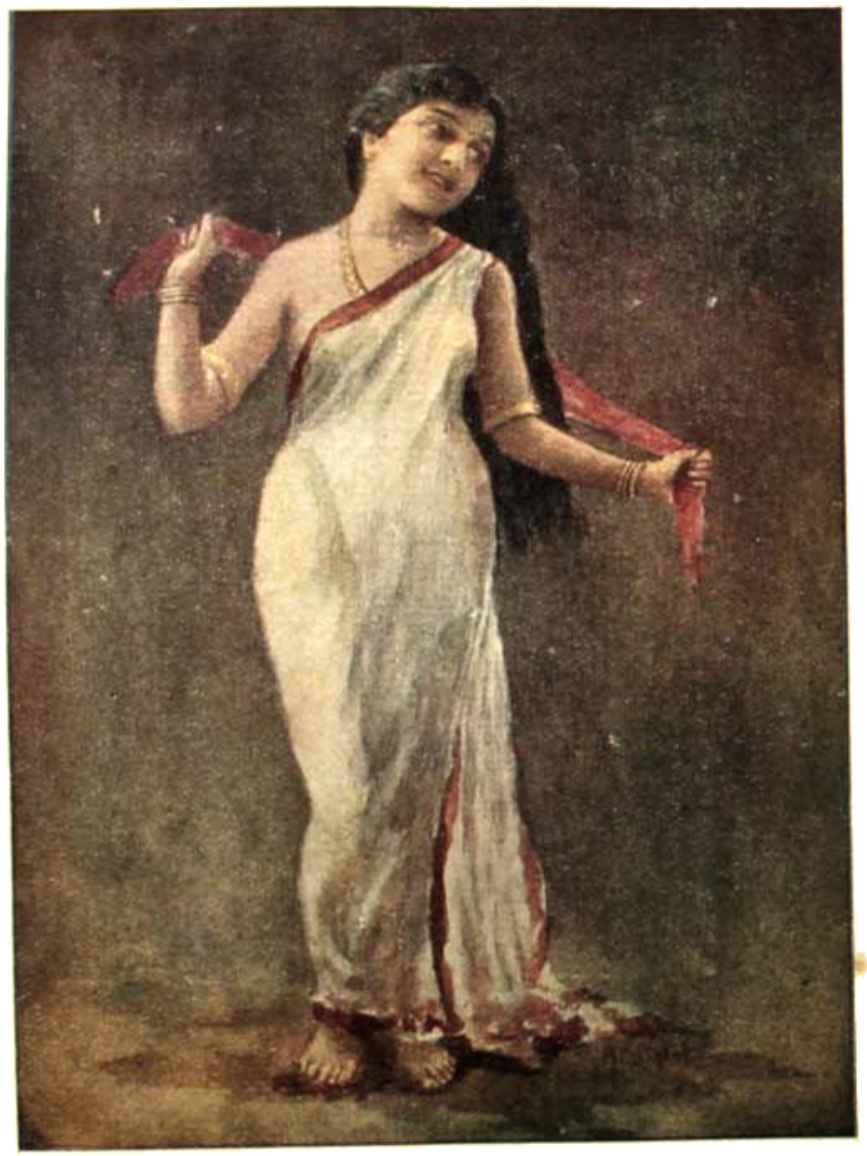

আপন-ধেয়ানে।

শিল্পী—শ্রীনারায়ণচন্দ্র মুখার্জী।

Lakshmibilas Press, Calcutta.

সচিত্র সাপ্তাহিক

বাসন্তী

১ম বর্ষ] ১৬ই ভাদ্র শনিবার, ১৩২৯ ইং ২রা সেপ্টেম্বর। [৯ম সংখ্যা

ও বাবাঃ

(একাঙ্ক নাটিকা)

[ত্রি]

শ্রীযুক্ত বিনয়কৃষ্ণ বসু-অঙ্কিত।

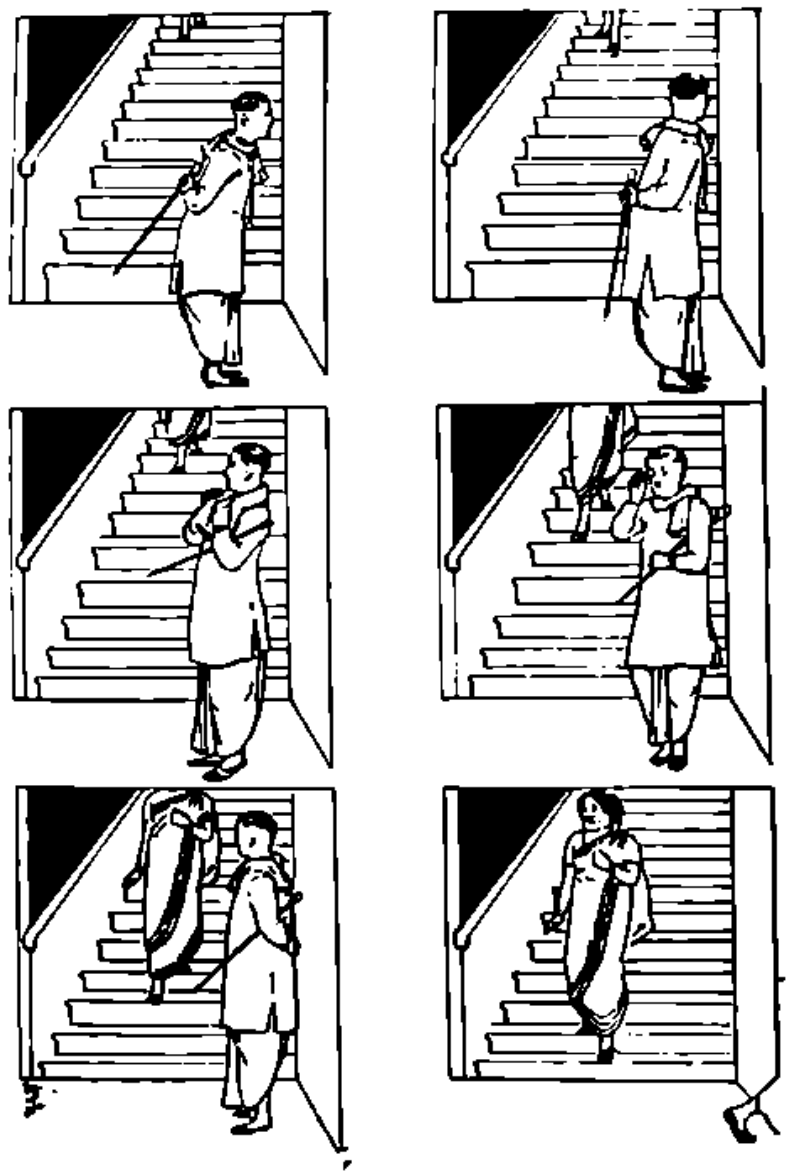

মহাত্মার পত্নী শ্রীমতী কস্তুরীবাই গান্ধী নবজীবন পত্রে দেশের অধিবাসীদের বলিয়াছেন 'জিহ্বার অলঙ্কার যেমন পবিত্র বিষয়ে কথা বলা, গাত্রের অলঙ্কারও সেইরূপ পবিত্র বস্ত্র। নিজ মাতৃভাষা অপেক্ষা পবিত্র আর কোন ভাষা নাই। বিলাস বাহুল্যে ও অমিতব্যয়ে আমাদের জীবন বিষাক্ত হইয়া গিয়াছে, এই জীবন ধারাকে সহজ ও শান্তিময় পথে চালাইয়া লইতে পারে স্বদেশী খদ্দর। স্বরাজের ভিত্তি খদ্দর—ইহা অপেক্ষা দৃঢ়তর ভিত্তি আর কিছুই নাই। জেলে যাইবার পূর্ব্ব মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত মহাত্মাজী আমাদিগকে শুধু খদ্দরের কথাই বলিয়া গিয়াছেন, জেলেও খদ্দরই তাঁহার জপ, প্রত্যহ তিনি তকলি চরকা কাটিতেছেন। কারাগারে এখনও আমাদের দেশের কত মহাপ্রাণ আবদ্ধ। আমার কাণে আজ শুধু খদ্দর কথাটিই ধ্বনিত হইতেছে। তাহাদের সম্মান আমরা শুধু খদ্দরের ব্যবহার দ্বারাই করিতে পারি।

• • • •

মহাত্মা গান্ধীর বিশ্বাস যদি ভারতের নারীরা ইচ্ছা করেন, তবে অন্য কারও সাহায্য ভিন্নও তাঁহারা ভারতকে অধীনতার শৃঙ্খল হইতে মুক্ত করিতে পারেন।

• • • •

মহাত্মা গন্ধীর শেষ কথা খদ্দর যে গৃহে নাই—সে গৃহে স্বাধীনতা প্রবেশ করিতে পারে না।

• • • •

কচুরীপানা বা ওয়াটার হিয়াসিন্থ পূর্ব্ববঙ্গের নদ-নদী বহিয়া আসিয়া পূর্ব্ববাংলার খাল বিল ডোবা প্রভৃতি একেবারে ছাইয়া ফেলিয়াছে। পূর্ব্ববঙ্গের অধিকাংশ শস্য-ক্ষেত্রই এই কচুরীপানার উপদ্রবে আর শস্য দিতে পারিতেছে না। এই-পানার একটি একবার যে গ্রামে বা যে ক্ষেত্রে প্রবেশ করে সেখিতে দেখিতে সে স্থানের প্রত্যেক ক্ষেত্রই এগুলি ছাইয়া ফেলে। এই পানাগুলি যেমন স্বাস্থ্যহানিকর তেমনি ক্ষেত্রের পক্ষে হানিকর। কয়বৎসর হইল এই পানার উপদ্রবে পূর্ব্ববঙ্গের অধিবাসীগণ অস্থির হইয়া উঠিয়াছে। গভর্ণমেণ্ট ও তার প্রাপ্ত মন্ত্রীদের কাণেও এ কথা উঠিয়াছে বটে কিন্তু কেহই এ পর্য্যন্ত এ উপদ্রব শান্তির কোন বিধান করিতে পারেন নাই। গাছ গাছড়ার জন্ম মৃত্যু ও শিকড় প্রভৃতির নিরূপক বিজ্ঞানাচার্য্য ডাক্তার জগদীশচন্দ্র বসু মহাশয় সম্প্রতি এই উপদ্রব নিবারণের জন্য গবেষণায় নিযুক্ত হইয়াছিলেন, আচার্য্যদেব নিশ্চয়ই কোন একটা উপায় করিতে পারিবেন আমরা এই আশা করিতেছিলাম। কিন্তু আচার্য্যদেবের গবেষণার ফল তেমন আশাপ্রদ হইল না দেখিয়া আমরা নিরাশ হইয়াছি। কচুরীপানার এই ভয়ানক প্রভাবে বাংলার অধিবাসীরা বিতাড়িত করিয়া বাংলার উপদ্রবের ভার বৃদ্ধি করিতে পারিত না যদি বাঙ্গালী গ্রামবাসীগণ প্রথম হইতেই স্ব-চেষ্টায় ইহা নিরাকরণের ব্যবস্থা করিতে পারিত।

কিন্তু আপনার চেষ্টায় উপদ্রব তাড়াইবার ব্যবস্থা আমরা প্রথম হইতে কোন দিনই করিতে অভ্যস্ত নই। সঙ্ঘবদ্ধ কার্য্য করিবার চেষ্টা বা উৎসাহ আমাদের নাই—যাহার বিপদ তাহারই ঘাড় ভাঙ্গুক। দূরে থাকিয়া আমরা অব্যাহতি পাই, এই যে নীচ জঘন্য মনোবৃত্তি ইহাই আমাদের দেশের ও জাতির সর্ব্বনাশ করিতে বসিয়াছে। পূর্ব্বে চেষ্টা করিলে প্রথম সময় হইতে এই কচুরীপানা ধ্বংস করিবার চেষ্টা করিলে যত সহজ ও অল্পব্যয় সাধ্য হইত এখন এই উপদ্রবের হাত হইতে দেশবাসীকে রক্ষা করিতে হইলে তাহার শতগুণ বেশী চেষ্টায়ও কুলাইবে কিনা সন্দেহ। তবে উপদ্রব অশান্তি সহিতে সহিতে এই বাঙ্গালী জাতি চির-অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছে। তাই দু'দিন পরে, দেশবাসী বিবি কচুরীপানাকে আপন করিয়া লইতে পারিবে।

• • • •

বাঙ্গালীকে ভারতের অন্যান্য প্রদেশের অধিবাসীবৃন্দ মোটেই আমল দেয় না, মোটেই প্রীতির চক্ষে দেখে না, বাংলার অন্যান্য প্রদেশে বাঙ্গালী কোথাও আর নিরাপদ করিয়া লইতে পারিতেছে না, অথচ বাংলাদেশ ভিন্ন দেশের অধিবাসীবৃন্দ আসিয়া একেবারে ছাইয়া ফেলিল। সহযোগী

'আনন্দবাজার' বলিতেছেন বাংলার একজন কৃতী-সন্তান লিখিয়াছেন 'সকল প্রাদেশিক জাতির সহিত ঘনিষ্ঠতা করিয়া দেখিলাম;—কি দেখিলাম? কি বুঝিলাম? তাহা অবর্ণনীয়। আমরা ভারতীয় অন্যান্য প্রাদেশিক জাতির নিকট অপাংক্তেয়, Untouchable, অস্পৃশ্য। ইহা ভাবগত বা Sentimental নহে। কার্য্যতঃ—ইহা প্রকৃত। বাঙ্গালী ভারতে অস্পৃশ্য জাতির মধ্যে পরিগণিত হইয়াছে।' সহযোগী ইহার কারণ নির্ণয়ে বলিতেছেন। ২৫।৩০ বৎসর পূর্ব্বেও বঙ্গের বাহিরে বাঙ্গালীর একটা সম্মান ছিল। শিক্ষা ও সভ্যতা বিস্তার, লোক-হিতৈষণা প্রভৃতি সকল কার্য্যেই অন্যান্য প্রদেশে বাঙ্গালীই Pioneer বা অগ্রগামী ছিল। আজ তাহার এ দুর্দ্দশা কেন? আজ ভারতের অন্য প্রদেশের লোক বাঙ্গালীকে অপাংক্তেয় করিতে বসিয়াছে কেন?

• • • •

বাঙ্গালী আজ ভিক্ষাপাত্র হস্তে দীনভাবে অন্য প্রদেশের দ্বারস্থ হইতেছে। ২৫।৩০ বৎসর পূর্ব্বে যে বাঙ্গালী অন্য প্রদেশে গিয়াছিল তাহারা গিয়াছিল পুরুষ সিংহের মত শিক্ষক গুরু ও পথ প্রদর্শকের বেশে। সেই সব মেরুদণ্ড বিশিষ্ট বাঙ্গালীর তেজ, বীর্য্য ও আত্মসম্মান জ্ঞানের উপযুক্ত মর্য্যাদা অন্যপ্রদেশের লোকেরা না করিয়া পারিত না। আর আজ বাঙ্গালী পেটের দায়ে—সামান্য কেরানীগিরি গোমস্তাগিরির ভিক্ষার ঝুলি লইয়া অন্যপ্রদেশের দ্বারস্থ হইতেছে। কাজেই এই অনুগ্রহপ্রার্থী, নতশির, কাঙ্গাল বাঙ্গালীকে পঞ্জাবী, মারাঠী, গুজরাটী, বেহারীরা সম্মান করিবে কেন?'

• • • •

'বাঙ্গালার পথ, ঘাটে, বনে-জঙ্গলে জলে-স্থলে আকাশে বাতাসে সোণা ছড়ানো আছে, মাণিক লুকানো আছে। বুদ্ধিমান, পরিশ্রমী, অধ্যবসায়ী অ-বাঙ্গালী আসিয়া তাহা দুই হাতে কুড়াইয়া লইতেছে। তাই বাঙ্গালীর আজ অন্নহীন, বস্ত্রহীন, কিন্তু তাহার রূপান্তরিত ঐশ্বর্য্যে মাড়বার, গুজরাট, পঞ্জাব ঐশ্বর্য্যশালী।'

• • • •

বাঙ্গালাদেশে অকাল মৃত্যুর হার দিন দিন বাড়িয়াই চলিয়াছে। দেশের শিক্ষিত সমাজেও এ মৃত্যুর হার যেমন বাড়িয়াছে অশিক্ষিত সমাজেও তেমনি। দেশের স্বাস্থ্য দিন দিন দেশ হইতে যেন লোপ পাইয়া পাইতে বসিয়াছে। যোগ্য শিক্ষিত সন্তানগণের স্বাস্থ্য ও মৃত্যুর বয়স দেখিলে আমাদিগকে শিহরিয়া উঠিতে হয়—শিহরিয়াই উঠি শুধু আমরা, চোখ কিন্তু খোলে না আমাদের!

• • • •

সহযোগী 'হিন্দুস্থান' বলিতেছেন কেশব সেন মনীষায় বড় ছিলেন, কিন্তু স্বাস্থ্য, ও দৈহিকশক্তির ধার দিয়াও যান নাই। ফল অকাল মৃত্যু। অধ্যাপক বিনয়েন্দ্র নাথ ও মোহিত চন্দ্র সেন দুইজনেই নির্ম্মল চরিত্র কিন্তু বিদ্যার চূড়ান্ত অনুশীলনও তাঁহাদিগকে অকালমৃত্যুর হাত হইতে রক্ষা করিতে পারে নাই। জজ দ্বারকানাথ জ্ঞানের রাজ্যে খুব নাম করিয়াছিলেন, কিন্তু অকালমৃত্যু তাঁহার দেহ অধিকার করিয়াছিল। এই নশ্বর সংসারে বাঁচিতে হইলে শরীরের স্বাস্থ্যের দিকেও ত তাকাইতে হয়। কারণ মানুষ ত অশরীরী আত্ম নয়, তাহার একটা স্থূলদেহও আছে, এই স্থূল শরীরের দিকেও দৃষ্টি দেওয়া তাহাদের কর্ত্তব্য, কেবল কর্ত্তব্য নহে, প্রধান এবং গোড়াকার কর্ত্তব্য। অথচ আমাদের শিক্ষিত ব্যক্তিরা একথাটা ভুলিয়া যান।

• • • •

আমরা সব দিক সর্ব্বস্ব হারা হইয়া দিনে দিনে যত হীন অধঃপতিত হইতেছি আমাদিগের আধ্যাত্মভাবের মাত্রাটা ততই যেন বাড়িয়া চলিয়াছে। আমরা কথায় কথায় লীল অশ্লীল আওড়াই কথায় কথায় নীতি কবিতার সৎ গাই। অথচ স্বাস্থ্যে চরিত্রে কোন বিষয়েই আমরা জগতের কোন জাতির অপেক্ষা উন্নত মোটেই নহি। এ বিষয়ে সহযোগী 'হিন্দুস্থান' বলিতেছেন 'আমাদের সমস্ত অনুষ্ঠানই যেন আধ্যাত্মিকতা বা তত্ত্ব কথার আখড়া হইয়া উঠিয়াছে, যে অনুষ্ঠানের যাহা আদর্শ সে অনুষ্ঠান সে হিসাবে পূর্ণতালাভের দিকে চেষ্টা করিতেছে না ইহার ফল এই হইতেছে যে, সেগুলি কোন হিসাবেই বড় হইতে পারিতেছে না। আমাদের একথাটা মনে রাখা উচিত যে, থিয়েটারগুলি আধ্যাত্মিকতার আখড়া নহে, ব্যায়ামাগার ও অহিংসার নৈষ্ঠিকাশ্রম নহে, কিম্বা সংবাদ পত্রগুলিও সব তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা নহে—সেগুলির প্রত্যেকটির স্বতন্ত্র আদর্শ আছে।'

• • • •

নূতন শাসন সংস্কার আইন বা ভারত বিকর্ষ এ্যাক্ট

অনুসারে সিভিলিয়ানদের সুবিধা খর্ব্ব করিবার জন্য শীঘ্রই নিম্ন প্রকার ব্যবস্থা হইবার কথা হইতেছে। সিভিলিয়ানেরা কার্য্য করিতে করিতে চারিবার বিনা ভাড়ায় হোমে যাতায়াত করিতে পারিবেন, তাঁহাদের স্ত্রীরা দুইবার বিনাভাড়ায় হোমে যাইতে পারিবেন। ইংলণ্ড ও ভারতের মুদ্রা বিনিময়ের হারে যে ক্ষতিপূরণ হয় সে ক্ষতিপূরণ সিভিলিয়ানেরা পাইবেন। অতি কম বা একেবারেই বিনা ভাড়ায় তাহারা বাস-গৃহ পাইবেন। পেন্সনের হার আরও বেশী করা হইবে। উত্তম। রিফর্ম্ম মহত ক্রমেই প্রকট হইয়া পড়িতেছে!

সম্প্রদান।

সিভিলিয়ানের প্রতি প্রধান মন্ত্রী-মহোদয়ঃ—

বাকী ছিল একটি করে' রাজকন্যা, এবার থেকে তাও দিলাম।

('অমৃতবাজারের পোহাই।)

জীবন দায়

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী

বাংলার জন সমাজের উচ্চস্তর হইতে নিম্নস্তরের দিকে চাহিবে সকলেই কোন না কোন দায়ে বিব্রত! অবশ্য দায়েরও উপকারীতা আছে। দায় ততক্ষণই ভাল যতক্ষণ তাহা সংসার বন্ধনে অনুরক্তি জাগাইয়া রাখে; সংসারের উন্নতি বিধানে মানুষের চেষ্টাকে সজাগ রাখে। কিন্তু দায় যখন মানুষের স্কন্ধে সিন্ধবাদের মত আঁকিয়া বসে, দায়ে যখন সংসার বন্ধনও মানুষের জীবন দুর্ব্বহ করিয়া তোলে, মনুষ্যত্বকে পঙ্গু অসাড় করিয়া ফেলে সে দায় বড় ভীষণ,—একেবারে অসহ্য হইয়া উঠে।

ভারতের জন-জীবনের উপর দিয়া আজ যে দায়ের বন্যা বহিয়া যাইতেছে, ইহাতে ভারতের জন-জীবন, সমাজ —জীবন ও জাতীয় জীবনকে ক্লিষ্ট পিষ্ট করিয়া ফেলিতেছে। পিতৃদায়, মাতৃদায়, পুত্রদায়, কন্যাদায়, সংসার ও পরিবারের দায় ভারে আজ দেশবাসী অস্থির পাগল হইয়া উঠিয়াছে। এ দায় ভার হইতে উদ্ধার পাইবার জন্য জন-সমাজ ত্রাহি ত্রাহি ডাকিতেছে।

মানুষের জীবনে যাহা কিছু শান্তি ও আনন্দের হেতু আজ তাহাই আমাদের জীবনে দায়রূপে পরিণত হইয়াছে। শান্তি সুখ, জীবনে সকলেরই প্রার্থনীয়। পুত্র কন্যা, পরিবার পরিজন, ইহারা মানুষের জীবনের শান্তি ও তৃপ্তির স্থল। কিন্তু আজ আমাদের জীবনে ইহারা শান্তি ও তৃপ্তির কারণ নহে। জীবনের যে একটা আনন্দ আছে, জীবনের বিকাশের মধ্যে যে একটা অনন্ত আনন্দের উৎস সদা উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিতেছে আজ আমাদের জীবন হইতে সে আনন্দ প্রবাহ লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। প্রত্যেক মানুষেরই নিজের জীবন নিজের কাছে দায় স্বরূপ বিবেচিত হইতেছে। জীবনের উপর এই যে পাষাণ চাপ চাপিয়া রহিয়া জীবনকে সব সময় দুর্ব্বহ বোধ করাইতেছে, এ ভার হইতে ঐ পাষাণ চাপ হইতে জীবনকে মুক্ত করিতে না পারিলে জাতির গতি ও মুক্তির আর কোন আশা নাই।

জীবন কেন দুর্ব্বহ বোধ হইতেছে? অভাবে অনটনে, চারি পার্শ্বের বেষ্টনীর বন্ধনে, স্ফূর্তির অভাবে, প্রাণ শক্তির স্পন্দনের অভাবেই আজ দেশের জীবন এমন জড়, মৃতবৎ প্রতীয়মান হইতেছে। দেশের জনসাধারণ আশা করিয়া যে দিকে হাত বাড়াইতে যায় সেই দিকেরই দ্বার রুদ্ধ দেখিয়া সে হতাশ চিত্তে ফিরিয়া আসে।

এই পুনঃ পুনঃ হতাশার ঘাতে সে ক্রমেই জীবনের উপর মমতা হারাইতে থাকে। নিজে যে অনাহারে মরিতেছে তাহার সংসারে আরও পাঁচটি খাইবার লোক বাড়িয়া গেলে সে কখনও তাহাদের আগমন আনন্দের সহিত গ্রহণ করিতে পারে না। তাই জীবনের আনন্দ পুত্র ও কন্যার জন্মগ্রহণে লোকে আর এখন বড় আনন্দিত হয় না। বিশেষতঃ কন্যার জন্মগ্রহণে ত মোটেই নহে। যাহার ঘরে কন্যা আছে তাহার মুখেই শুনিবে—কন্যাদায়, পিতৃদায়, মাতৃদায়, অপেক্ষাও ভীষণ—কন্যাদায়ের তুল্য দায় আর বাংলায় নাই। জীবনের আনন্দ ও শক্তির প্রধান স্থল যে নারী—সুপুত্র ও সুকন্যার জন্ম দিয়া যে দেশ জীবনকে গড়িয়া তুলিবে যে শক্তিময়ী ও মঙ্গলময়ী জাতির জীবনে শক্তি ও মঙ্গল আনিয়া দিবে, যে সংসারের সুখ শান্তি গড়িয়া তুলিবে, সংসারে তাহার আগমনকেই আমরা যদি ভীতির চোখে দেখি তবে জাতীয় জীবনের প্রধানতম আনন্দের কারণ হইতে ঐ স্থানেই আমরা বিশেষ ভাবে বঞ্চিত হইলাম।

এই যে আনন্দ—বঞ্চিত সহস্র দায় জর্জ্জরিত আমাদের জীবন ইহাকে এমন হীন অবস্থায় আনিয়া ফেলিবার জন্য দায়ী কে? দায়ী আমরা নিজেরাই। আজ বাহিরের বন্ধন ও দৈন্য-দশা হইতে মুক্ত হইবার জন্য জাতি চেষ্টা করিতেছে, কিন্তু অন্তরের বন্ধন ও দৈন্য দশা হইতে সে যতক্ষণ না মুক্ত হইতে পারিতেছে ততক্ষণ আর তাহার বাহিরের বন্ধন হইতে মুক্তি পাইবার আশা নাই। অন্তরের সহস্র বন্ধন দ্বারাই আমরা বাহিরের বন্ধনকে সাদরে নিজেদের মধ্যে জড়াইয়া লইয়াছি। আজ যদি জাতি আসিয়া তাহার অন্তরের বন্ধন ও দৌর্ব্বল্য সবলে ছিঁড়িয়া ফেলে তবে বাহিরের বন্ধন তাহার আপনিই কাটিয়া যাইবে।

আজ দেশের অস্পৃশ্য অনাচরণীয়েরা তাহাদের দায়ের জীবন হইতে মুক্তি পাইবার জন্য সমাজ ও জাতীয় জীবনের বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া ক্রমেই দূরে সরিয়া পড়িতেছে। হৃতপদ হারাইয়া জাতি কখনও তাহার মস্তিষ্ককে বড় করিতে পারে না। আর আজ সমাজে নারী জীবনকে যে দায় স্বরূপ করিয়া রাখা হইয়াছে তাহাতে জাতি তাহার হৃদয়কে ক্রমেই হারাইয়া ফেলিতেছে। হৃদয় হারাইয়া

বস্তিকের বিকাশ জাতীয় জীবনে ও জন-জীবনে কোন ক্রমেই সম্ভবপর নহে।

দেশের প্রত্যেকেরই যেন জীবনের উপর একটা বিদ্রোহ ভাব জাগিয়া উঠিয়াছে, জীবন আর তাহাদের আনন্দ দিতে পারে না। জীবনপ্রবাহ একভাবে বন্ধন দশায় থাকিয়া পঙ্কিল দূষিত হইয়া পড়িয়াছে। জীবন চাহে নিত্য নব নব অনুভূতি, নিত্য নব নব ভাবের বিকাশে তাহার ধারাকে পবিত্র উজ্জ্বল রাখিতে। তাহা রাখিতে না পারিলেই, পুরাতনের সহিত নূতনের যোগ সংঘটন করিয়া যাইতে না পারিলেই, সে জীবন দায় হইয়া পড়িবেই তাহা দুর্বহ বোধ হইবেই।

আজ দেশজীবন ও জাতীয়জীবন গঠন করিতে হইলে সর্ব্বাগ্রে আমাদের দেখিতে হইবে আমরা জীবনে দুর্বহ ভার ও দায় উপলব্ধি করিতেছি কোথায়? সেই দুর্বহ ভার ও দায় হইতে জনজীবন ও সমাজ জীবনকে প্রথমে মুক্তি দিতে হইবে।

এস আজ নব-জীবনের নূতন উৎসাহ, নব উদ্দীপনা, পঙ্কিল প্রবাহহীন জলাশয়ের জল পান করিবার জন্য নিজেদের মধ্যে রক্তবন্যা না বহাইয়া মুক্তধারার স্বচ্ছ প্রবাহের সাধনা করি। নিজেদের রক্ত নিজেরা শোষণ করিবার চেষ্টা না করিয়া, নিজেদের মধ্যে ঐক্য ও প্রীতির বন্ধন গড়িয়া তোল। নিজ ক্ষমতার অহমোহে দেশের ভাই ভগিনীদের বুকে পাষাণভার চাপাইয়া রাখিয়া নিজে বড় হইবার চেষ্টা বর্জ্জন কর। দেশের জীবনের দুর্ব্বহতার ও দায় হইতে দেশবাসীকে মুক্তি দাও।

সহস্র দায়ের ভারে আজ দেশের জীবন বড় ভারাক্রান্ত হইয়া উঠিয়াছে, এই দায়ভার হইতে দেশবাসীকে মুক্ত করিতে না পারিলে দেশের ব্যথা দেশের অভাব ঘুচিবে না। নিজেদের দায় হইতে নিজেদের হাতে যতটুকু মুক্ত হইবার ক্ষমতা আছে সেই ক্ষমতাই আজ দেশবাসীকে প্রথমে দেশ জীবন গঠন কামনায় প্রয়োগ করিতে হইবে। জীবনের দায়ভার কমাইয়া দিয়া—দায় ভার হইতে মুক্ত দেশবাসী একবার সত্য প্রাণের স্ফূর্ত্তিতে দাঁড়াইয়া দেশ জননীর সেবা করিয়া ধন্য হউক।

জন্ম সংরোধ

নারীর প্রতি নারীর উপদেশ

সাধারণ মানুষ ভাবিয়া চিন্তিয়া কাজ করে না—যাঁরা পথে চলা তাহাদের স্বভাব। জনসাধারণ যদি চিন্তাশীল হইত, তবে আজ পৃথিবীর অনেক দুঃখ দুর্দশা ঘুচিয়া যাইত।

শাস্ত্র বলিলেন "পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্য্যা"—অতএব আমরা সকলে যুগের পরে যুগ ধরিয়া প্রাণপণে সন্তানের জন্মদান করিয়া আসিতেছি। দেশের বর্ত্তমান অবস্থার সঙ্গে সাক্ষাতের আলোকে এই শাস্ত্র-বাণী তোমার যে পাপ খাইতেছে, একবারও সেটা ভাবিয়া দেখিতেছি না।

তাহার আর এক দল যুক্তির আশ্রয় লন, যাঁহারা "জন্ম-সংরোধের" নাম শুনিলেই শিহরিয়া উঠেন। তাঁহাদের মত, এটা আরো পাপ ও দুর্নীতি। কিন্তু আমরা ইতিহাসের চোখে আঙুল দিয়া দেখাইতে পারি যে, দেশের বর্ত্তমান অবস্থায় বাঙ্গালী যদি "জন্ম সংরোধের" নিয়ম বাঁধিয়া চলে, তাহারা যথার্থ কর্ত্তব্য পালনই করিবে। বরং যাহারা এই কর্ত্তব্য পালনে বাধা দিবে বা অবহেলা করিবে, তাহারাই পাপী এবং নীতির শত্রু।

আর সবচেয়ে হইতেছে সমাজের একটা প্রবল যুক্তি। সন্তান বিতাড়িত মানুষের সমাজে বাঁচিয়া থাকার দুইদিকেই তখন সমাজ ছাপিতে চেষ্টা পায়—এবং এই ওজনের তারতম্য হিসাবেই সমাজের ধর্ম-কর্ম সমস্ত নির্দ্ধারিত হয়। যেখানে দুইদিকের ওজন সমান নয়, সেখানে অনিষ্টপাত অবশ্যম্ভাবী।

যাহার তিনটাকা মাহিনা, সে যদি মাসে একশো টাকার বাড়ী ভাড়া করে, তার ফল কি দাঁড়ায়? ফল—দারিদ্র, অত্যাচার, ক্লেশ। এখানে একশো টাকার বাড়ী ভাড়া করা পাপ ভাড়া আর কিছুই নয়।

তোমার মাহিনা পঞ্চাশ টাকা। তুমি বাড়ী ভাড়া যাও পঁচিশ টাকা। পরিবারে তোমার মা আছেন, বিধবা বোন আছেন, স্ত্রী আছেন। তুমি অর্দ্ধাহারে কোন গতিকে তোমাদের প্রতিপালন কর। কিন্তু এমন অবস্থায় যদি তুমি আবার সন্তানের পিতা হইতেছ, তবে তোমাকে কি বলিব? পশু, পাষণ্ড, না দুর্নীতির সেবক? তুমি নিজেই এর জবাব দাও।

তুমি বেকার। তবু যদি বিবাহ কর, তবে তাহা পাপ ত? তার উপরে সেই বিবাহের ফলে যদি ছেলে মেয়ে হয়, তবে সেটা কি মহাপাপ বা গুরুতর পাপ হইবে না?

তোমার স্ত্রীর স্বাস্থ্য খারাপ। ডেমন অবস্থায় তাহাকে ছেলে-মেয়ের মা হইতে বাধা করিলে, বিশ্বাস তোমাকে নীতিবাগীশ বলিব না। দু-একটি সন্তানের জন্মের পরে অনেক স্ত্রীর দেহ একেবারে ভাঙিয়া পড়ে। তবু যদি স্বামীর দুর্বুদ্ধিতে সেই নারীকে দু-এক বৎসর অন্তরে ক্রমাগত সন্তান প্রসব করিতে দেখি, তবে স্বামীর কাজকে আমরা বলিব দেশের নীতিবিগর্হিত বলিতে প্রস্তুত নই। পরন্তু, তাহা যে হত্যার মতই গুরুতর অপরাধ, সে এ কথা অস্বীকার করিবে?

আমেরিকার Birth Control League এর প্রসিদ্ধ সভানেত্রী মিসেস সাঙ্গার বলিতেছেন :—"সর্ব্বত্রই আমরা দেখিতেছি যে, দারিদ্র্য ও অভাবে পরিবার একঘরে হইয়াছে। জাতির উন্নতির সঙ্গে যাহারা বাধার মত, তাহাদের সংখ্যাই রক্তস্রোতের মতন বাড়িয়া চলিতেছে। যে সব লোক সন্তান পালনে অক্ষম, রাষ্ট্র সরকার ও ধর্ম্মবিধান তাহাদিগকে সন্তানের জন্ম দিবার জন্য উৎসাহিত করিতেছে। ফলে এই সব সন্তানের অনেকে রুগ্ন ও দুর্বল হইয়া পড়িতেছে; অনেকে আবার চোর ডাকাতে পরিণত হইয়াছে। এই অবাঞ্ছিত ও অনাবশ্যক লোকগুলির ভার পড়িতেছে গিয়া জাতির স্বাস্থ্যবান উপাদানের উপরে।

কেবল তাহাই নয়, স্বাস্থ্যবান সন্তানদিগের জন্য নারীর স্বাস্থ্য ও

জীবনের অপচয় হইতেছে বৎসরোবাতি। এর ফলে অজ্ঞাত অলক্ষ্যের সঙ্গে আরো হইতেছে শিশু-মৃত্যুর সংখ্যা বৃদ্ধি ও জীবন যাত্রা নির্ব্বাহের আদর্শের অবনতি।"

এই কথাগুলি আলোচনার পরেও কোন শিক্ষিত লোক কি বলিতে চাহিবেন যে "জন্ম-নিরোধ" দুর্নীতির পরিচায়ক? নীতির মানে কি? ন্যায্য ব্যবহার—অর্থাৎ যুক্তিসিদ্ধ বা উচিতের ব্যবহার। যে শিশুকে খাইতে দিতে পারিব না এবং যাহার জন্মের ফলে নিজের দুর্দশা আর এক ধাপ বাড়িয়া যাইবে, তাহাকে ফেলিয়া দেওয়া কি ন্যায্য ব্যবহার? জন্তু, পশু বা পক্ষীমাত্রকে আক্রমণ করা কি অনুচিত? তাহা,—তাহা যুক্তি-সিদ্ধ বা ন্যায্য ব্যবহার নয়। স্বাস্থ্যহীনা নারীকে সন্তানবতী হইতে বাধা করাও ঠিক তাই নয় কি? অতএব সন্তানের পিতা হইবার আগে সকলেই যেন এই দুইটি বিষয়ে দৃষ্টি রাখেন, নিজের আর্থিক অবস্থা এবং স্ত্রীর স্বাস্থ্য। যাঁহারা এখনে অন্যের মত করিবেন, তাঁহারাই দুর্নীতির দোলায়।" পরন্তু তাঁহারা জাতির ও দেশের শত্রু। কেননা বাঙ্গালা দেশের বর্ত্তমান দারিদ্র্য সমস্যার প্রধান কারণ তাঁহারাই।

মিসেস স্যাঙ্গার নারীদের প্রতিও এই উপদেশ দিতেছেন :—

"দেশে স্বাস্থ্যবান ও উপযোগী সন্তানের সংখ্যা বৃদ্ধি করিতে হইলে, সর্ব্বাগ্রে মাতৃত্বের আদর্শকে উন্নত করিতে হইবে। গর্ভাধানের ভার যতদিন মৈথের হাতে থাকিবে ততদিন মাতৃত্বের সম্মান অক্ষুণ্ণ রাখা অসম্ভব।

আমাদের মত এই :—

১। দুই পক্ষের প্রেম-সহকারের ফলেই যেন গর্ভসঞ্চার হয়।

২। শিক্ষিতা জননীর সচেতন কামনার ফলেই যেন সন্তানের জন্ম হয়।

৩। সন্তানেরও যেখানে স্বাস্থ্যহানি হইবার সম্ভাবনা, সেখানেই যেন তাহার আগমন হয়।

এই তিনটি মতানুসারে কাজ না হইলে, কোন নারীই যেন নিজের স্বাধীনতা বর্জ্জন না করেন। মানব-সমাজের ভিত্তি-স্বরূপ এখানে নিয়ম-গুলি সকল নারীরই জানিয়া রাখা উচিত। পৃথিবীতে সন্তানকে আনি-বার আগে সমাজের প্রতি তাঁহাদের দায়িত্ব কতটা, সে-বিষয়েও নারীদের সচেতন হওয়া দরকার।

এই কথাগুলির সার্থকতার উপরেই নিজের জাতির ও ভবিষ্য মানব-সমাজের সমস্ত ভালোমন্দ সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করিতেছে।'

আশা করি এতক্ষণে সকলেই বুঝিতে পারিয়াছেন যে, "জন্মনিরোধে"র প্রকৃত উদ্দেশ্য কতটা উচ্চ ও কতটা মহৎ। এর সঙ্গে দুর্নীতি বা ব্যক্তি-গত স্বেচ্ছাচারের কিছুমাত্র সম্পর্ক নাই। 'হিন্দুস্থান'

রঙ্গালয়

জার্ম্মেণ থিয়েটার।

অধ্যাপক বিনয়কুমার সরকার এম-এ,

জার্ম্মেণীর থিয়েটারে-থিয়েটারে সর্ব্বাগ্রে "অতীত গৌরব-কাহিনী বাণী" প্রচারিত হইতেছে। যেসকল নাটকে পুরনো জার্ম্মেণ নর-নারীর বীরত্ব দেখিতে পাওয়া যায়, বার্লিন এবং অন্যান্য সহরের রঙ্গালয়ের কর্ম্মকর্ত্তারা প্রায়ই সেই সমুদায়ের পালা সাজাইয়া থাকেন। স্বাধীনতা, স্বাতন্ত্র্য, ব্যক্তিত্ব, মনুষ্যত্ব ইত্যাদি ফুটাইয়া তুলিবার দিকে ম্যানেজারদের লক্ষ্য দেখিতে পাই। এই প্রকার নাটকে প্রাচীন জার্ম্মেণীর বীর পুরুষগণের কীর্ত্তি ও কৃতিত্ব প্রকটিত হয়। আর এক প্রকার নাটকে নেপোলিয়ান ইত্যাদি যথেচ্ছাচারী 'শয়তান' নরপতির পতন দেখানো হয়। দাঁতো ইত্যাদি ফরাসী বিপ্লব নায়কগণের জীবনের তাত্ত্বিক করিবার উদ্দেশ্যে, কতকগুলো অভিনয় চলিতেছে। অধিকন্তু, জার্ম্মে-ণীর মোটা মোটা ঐতিহাসিক ঘটনা গুলাও রঙ্গমঞ্চে ফুটাইয়া তোলা হইয়াছে। বার্লিনের রাইনহার্ট (Rein-hardt) স্থাপিত থিয়েটারের পালাগুলা জার্ম্মেণ সমাজকে অতি গভীর ও সূক্ষ্ম উপদেশ দিয়া থাকে। এই রঙ্গালয়কে আমোদ-প্রমোদের ভবন বিবেচনা না করিয়া, এক প্রকার দর্শন বিজ্ঞানের বা ধর্ম্ম গৃহ বলা চলে। এখানে কোন রাত্রে প্রাচীন গ্রীক্ নাটক অভিনীত হয়। তাহাতে জার্ম্মেণরা 'দৈব' ঐশ্বরিক শক্তি ইত্যাদি অতি মানব ক্ষমতার সংস্পর্শে আসিতে পায়। বাধা-বিঘ্ন ও বেদনার দরিয়ায় স্নান করিয়া দর্শকমণ্ডলী চিত্ত দৃঢ় করিতে অভ্যস্ত হইতেছে। গোটের 'ফাউষ্ট' চিরকালই জার্ম্মেণদের আদরের বস্তু। 'ফাউষ্টের' গণ্ডা গণ্ডা নয়া সংস্করণ যখন-তখন বাহির হইতেছে। আজও জার্ম্মেণ নর-নারী গোটের পালা দেখিয়া মানব-জীবনে 'অসৎ' প্রবৃত্তির দাম যাচাই করিয়া লইতেছে। শক্তি,—সংগ্রামের শক্তি—সুশক্তি, কুশক্তি—এক কথায় শক্তিযোগ যে-যে চরিত্র পূর্ণমাত্রায় পরিস্ফুট, সেই সব চরিত্র পরাজিত জার্ম্মেণীর রঙ্গমঞ্চে সর্ব্বদাই হাজির হইয়া থাকে। শেক্‌সপিয়ারের শক্তিধরগণ—লিয়ার, সীজার, ম্যাকবেথ, ক্লিওপেট্রা ইত্যাদিও—জার্ম্মেণ থিয়েটারে প্রায়ই দেখা দিতেছে। ইবসেন, হ্যাউপ্টমান ইত্যাদি স্কাণ্ডিনাভিয় নাট্যকারের রচনা জার্ম্মেন সমাজে খুব চলে। এই সকল রচনায় আমেরিকা সাধারণতঃ মানব-চিত্তের স্বাধীনতা এবং সময়ে সময়ে সমাজ বিদ্রোহী ভাবুকতার স্বাদ পাইয়া থাকে। বলা বাহুল্য, বিদেশী নাট্যকারের রচনাই হউক, অথবা বিদেশী সমাজের চরিত্রাঙ্কনই হউক, জার্ম্মেণরা সবই জার্ম্মেণ ভাষায় পায়। থিয়েটারে গোটা দুনিয়া আসিয়া হাজির হয়—মায় ভারতের 'ঠাকুর' পর্য্যন্ত। সবই আসে অবশ্য খাঁটি আপনার জন ভাবে,—বিদেশী 'অতিথি' মাত্র রূপে নয়। জার্ম্মেণরা চিরকালই এই ধরণে 'বাহির' কে 'ঘরে' টানিয়া দিয়া আসিতেছে। ইহাতে জার্ম্মেণীর স্বদেশী সমাজ ভাসিয়া যায় নাই,—বরং নিজের ভিত্তির উপর দাঁড়াইয়া মজবুতই হইয়াছে। 'ভারতবর্ষ'

* * *

শুনিয়াছি বহুদিন পূর্ব্বে প্রাচ্যের বায়স্কোপ সম্রাট পার্শি বনকুবের ম্যাডান কলিকাতায় একটি সভায় বক্তৃতা দান কালে বলিয়াছিলেন 'কলিকাতা সহরে আমি যখন প্রথম বায়স্কোপ খুলিবার কল্পনা লইয়া আসি তখন এই কোম্পানীতে অর্থ দিয়া অংশ ক্রয় করিবার জন্য বহু বাঙ্গালী ধনকুবেরের দ্বারস্থ হইয়াছিলাম। বাঙ্গালী অতি, বুদ্ধিমান, ধনকুবেরগণ আমার কল্পনায় গম্ভীরভাবে হাত করিয়া বিজ্ঞের মত আমাকে উপদেশ প্রদান করিলেন 'মশায় বাঙ্গালী এত বোকা জাত নয় যে ছাকড়ার ছবি দেখিয়া তাহারা পয়সা দিবে।' তারপর কয়েক বৎসর চলিয়া গিয়াছে এখন দেখিতেছি বাঙ্গালীরাই ছাকড়ার ছবি দেখিয়া অজস্র পয়সা আমার কোম্পানীকে প্রদান করিতেছে। আজ শুধু বাংলায় নয়—সমগ্র ভারতে, এমন কি প্রাচ্যের অনেক স্থানই আমি বায়স্কোপ দিয়া ছাইয়া ফেলিয়াছি।'

• • • •

সাহেব কোম্পানী গুলির কথা ছাড়িয়াই দিই, ভারতেরই বিখ্যাত আনন্দ-ব্যবসায়ী জে-এফ-ম্যাডান মহোদয় এই কয় বৎসরের মধ্যে ভারতে আমদের যে বিরাট সৌধগুলি নির্ম্মাণ করিয়াছেন এবং তাহাতে সাজ সজ্জা, দৃশ্যপট, বসিবার স্থানাদির যেরূপ আরামদায়ক ব্যবস্থা করিয়াছেন, বাঙ্গালীরা কেহ তাহা কখনও করিতে পারিবে কি?

• • • •

এই বাংলাদেশে ম্যাডানের বাংলা থিয়েটারের মত দৃশ্য পট সাজ সজ্জায় বাহার বাঙ্গালী পরিচালিত কোন নাট্যশালায় কেহ কখনও দেখিয়াছেন কি। কি ভবিষ্যতে দেখিবার আশা রাখেন কি। অতি বিজ্ঞের মত নাসাকুঞ্চন, ও অপরের ভাল জিনিসে উপেক্ষা প্রদর্শন আমাদের একটা জাতীয় দৌর্ব্বল্য, জাতির কর্ম্ম প্রচেষ্টাকে বিনাশ করিবার একটা সাংঘাতিক ব্যাধি—এ ব্যাধি হইতে জাতি কবে মুক্ত হইয়া আবার আপন দেশের সর্ব্ব বিভাগের জিনিসগুলিতে নিজ কৃতিত্ব দেখাইতে সমর্থ হইবে কে জানে?

যুক্ত প্রদেশের ছোটলাট সার হার্কোর্ট বাটলার মহোদয় নিজ প্রদেশে যে সমস্ত নাট্য অভিনয়াদি হইবে তাহা নিজে সেন্সরী করিয়া পরে অভিনয়ার্থ অনুমতি প্রদান করিবেন এই মর্ম্মে এক ইস্তাহার জারী করিয়াছেন। ইস্তাহারের মর্ম্ম এই:—সম্প্রতি লক্ষ্ণৌ খেলায় কোন কোন স্থানে আপত্তিজনক (Objectionable) নাট্যাদি অভিনয় হওয়ায় দরুণ—আর তাঁহারা জেলা-ম্যাজিষ্ট্রেটের 'লাইসেন্স' অনুমোদন ভিন্ন নাট্যাদি অভিনয় করিতে পারিবেন না, যে নাট্যের অভিনয় হইবে সেই বহিও অন্ততঃ তিনদিন পূর্ব্বে জেলা-ম্যাজিষ্ট্রেটের সমীপে পৌঁছান চাই। বায়স্কোপের সেন্সর নিযুক্ত হইয়াছে,—কিন্তু তাহার জন্য প্রদেশে প্রদেশে সেন্সর নিযুক্ত করিবার আবশ্যক নাই। কিন্তু নাট্যাদির আপত্তিজনক অংশ ও ভাব বর্জ্জন করিয়া অভিনয় করাইতে হইলে সেজন্য প্রদেশে প্রদেশে নাট্য সেন্সর নিযুক্ত করিতে অবশ্যই হইবে। জেলা-ম্যাজিষ্ট্রেট একা আর কত কাজ দেখিবেন। নাট্যের আপত্তিজনক ভাব ও অংশ বর্জ্জন করিয়া ক্রমাগত ছ'বৎসর অভিনয় করিলে সে নাট্যে আর কোন ভাব ও অংশ থাকিতে পারিবে না। একেবারে ভাববর্জ্জিত নাট্য হইবে। আপত্তি ও অনাপত্তির নিষ্পত্তি এই ভাবে হওয়াই ভাল।

প্রসিদ্ধ পাশ্চাত্য নর্ত্তকী এ্যানাপাভলোভা ভারতে আগমন করিতেছেন। বোম্বাইয়েই ইনি মুজরা করিবেন। বাংলার রাজধানী কলিকাতায় আসিবেন কিনা এখনও স্থির নাই। শীতের সময় এবার পাশ্চাত্যের অনেক গায়িকা নর্ত্তকীই বোধ হয় ভারতে সাময়িক মুজরা গাহিতে আসিবেন। পাশ্চাত্যের কলাবিদ্‌গণ প্রাচ্যে আসিয়া অজস্র উপার্জ্জন, সম্মান অর্জ্জন করিয়া যান। প্রাচ্য বিশেষ করিয়া ভারত চিরদিনই কি দেখিয়া পয়সা দিবে? দেখাইয়া পয়সা আনিবে না?

পত্নী। এর নাম তোমার খাঁটি দুধ। আচ্ছেক জল, আচ্ছেক খড়ি—একেই আবার খাঁটি বল?

গোয়ালা। আজ্ঞে মা'ঠান্, খাঁটি লোকের কাছে সবই খাঁটি।

যেমনই কেন দেখ্‌তে হোক্ না, কোন কুমারী মেয়েকে অপরা, পত্নী, স্ত্রী ইত্যাদি বলে তব করলে সুফল ফল্‌তে পারে। অন্ততঃ তোমার সঙ্গে পরলোকে যাবার আর তার কোন আপত্তি থাকবে না।

দেশ-বিদেশ

মাইকেল কলিন্স।

মাইকেল কলিন্স আততায়ীর গুলিতে নিহত হইয়াছেন। আয়ারল্যাণ্ডের অস্থায়ী বিপ্লবের মৃত্যু তাহার অনেকটা হস্তেই ঘটিল। এ বীভৎস যুদ্ধের অবসানেও চিত্ত শিহরিয়া উঠে। আয়র্লণ্ডের অধোগ্রেহিকবিদের মধ্যে মাইকেল কলিন্স অনেকের মনে ঘৃণা করিয়াছেন কেহ বোধ করি তাঁর কেহ করেন নাই। তাঁহার সেবায় দেহ-প্রাণ বালকোচিত এমন শুদ্ধ বীর হারাইয়া আজও অনুশোচনা হয়।

—•—

ফরাসী মন্ত্রী পোঁয়াকেরে হত্যা করিবার চেষ্টায় আর্মাস শুদ্ধ সমিতির লোকেরা প্যারিসে ঘুরিয়া ফিরিয়া বেড়াইতেছে। পুলিস সন্দেহবশে একটি লোককে গ্রেপ্তারও করিয়াছে।

—•—

পুরীর পাণ্ডারাও বুঝি বা ধর্ম-ঘট করিয়া বসে। মন্দিরের অধ্যক্ষগণ যদি তাহাদের কার্যে বেশী হস্তক্ষেপ করেন, তাহারা Strike করিবেই। সেবকশিরোমণি ধর্ম-ঘট। কোন দিন শুনিব, দেবতারাও ধর্ম-ঘট করিয়া বসিয়াছেন।

—•—

হিন্দু। দেবতাদের মুক, নির্বাক, কমতাপুঞ্জ, এই কথাই প্রতিপন্ন করিবার জন্যে একটি মাদ্রাজী যুবক-কালাপাহাড় হিন্দু দেব দেবী দেব-মন্দির ভেঙ্গে ভেঙ্গে বেড়াচ্ছিল।

সবজান্তা সে বারবার রথ পুড়িয়েছে। দু'তিনটি মন্দির বিগ্রহ-শূন্য করেছে। তার বিচারের সময় সে ম্যাজিষ্ট্রেটকে বলে যে দেবতাগুলো নির্জীব—তাদের যতই অপিট করা যাক, ওরা কিছু করতে পারে না। সে তাই দেখে বেড়াচ্ছে তার কি হয়। সে আরও দেখতে চায়—মানুষের মাংস যদি সে খায়, তার কি হবে?—ডাক্তারেরা তার মস্তিষ্ক পরীক্ষা করে দেখেছেন, সেখানে বিকৃতির লেশ নেই, বেশ আছে। সে নিজেও তাই স্বীকার করলে।

একটা কথা কিছুদিন হইতে শুনা যাইতেছিল, মহাত্মা গান্ধী নেলে চা পানে করেন। বাস্তবিক পক্ষে ইহার মূলে কিছুমাত্র সত্য নাই—মহাত্মাজী কোনদিনই চা পান করেন না।

—•—

যুদ্ধকালে লর্ড কর্জনের ৬০০০০০০ টাকা মাসিয়া গিয়াছিল। তাঁহার আদ্যশ্রাদ্ধে প্রায় ২২০০০০০৲ টাকা খরচ হইয়াছে।

—•—

বর্তমান বর্ষার মাসের ১৯শে তারিখে যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে এ সপ্তাহে শহরের ডাকাতীর সংখ্যা খুব কমিয়া গিয়াছে। এ সপ্তাহে মাত্র দুইটি ডাকাতীর সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। জুন ও জুলাই মাসে ৮০ ও ৫২টি ডাকাতী হইয়াছিল।

আগ্রায় বিলাতের কমিটির চেষ্টায় তথায় মহরমে মুসলমানেরা সকলেই অনেকটা অসহ যন্ত্রণা পরিহার করিতেছেন।

—•—

বিলাতের প্রধান মন্ত্রী লয়েড জর্জ গত মহাযুদ্ধের একখানি ইতিহাস লিখিয়াছেন। এই পুস্তক প্রকাশে প্রায় ১৫০০০০০৲ মুদ্রা লাভ হইবে, এই টাকা মন্ত্রীবর যুদ্ধে অতিগ্রস্ত ব্যক্তিদিগের সাহায্যার্থে দান করিবেন।

—•—

১৯১৪ সনে কলিকাতা সহরে মোটর গাড়ী ছিল প্রায় ২০০০ সে জায়গায় এখন মোটর গাড়ীর সংখ্যা হইয়াছে প্রায় ১০০০০, ট্যাক্সি গাড়ীর সংখ্যা প্রায় ২০০০।

—•—

যুদ্ধের পূর্বে কলিকাতা সহরে গরুর গাড়ীর সংখ্যা ছিল ৫০০০, এখনও প্রায় তাহাই আছে, বিশেষ বৃদ্ধি প্রায় নাই।

—•—

১৯১৪ সনে মোটর লরীর সংখ্যা ছিল প্রায় পঞ্চাশখানা সেই জায়গায় এখন মোটর লরীর সংখ্যা হইয়াছে প্রায় ৬০৪।

—•—

ব্যারিষ্টার আর্চলি মইন আগামী মাসে রোম হইতে কলিকাতা আসিতেছেন।

—

কলিকাতা সহরে কালা-জ্বরের আতঙ্ক দেখা যাইতেছে। হয়তো বা ইহাই 'এপিডেমিক' হইয়া দাঁড়াইবে।

—

আলীপুর 'জু' পশুশালায় মক্ষিকাগণ বাড়িয়া হইতেছে।

—

'যেমন তেমনি' বাংলার বার সংকোচের বৈঠক গত সোমবার হইতে বসিতেছে। খবরের কাগজওয়ালাদের প্রবেশ নিষেধ।

—

ভূতপূর্ব আর্মেনি কাইসার নাকি এক বিধবা মহিলাকে বিবাহ করিতেছেন। বিধবার নাকি তিনটি ছেলেও আছে। পত্নী থাকিতে তাঁহাকে ত্যাগ না করিয়া পুরুষে কাইসার কি করিয়া বিধবার পাণিগ্রহণ করিবেন! এসব খবর আমাদের বোকা ভায়।

—•—

আয়ারল্যাণ্ডের প্রধান সেনাপতি কলিন্স সম্প্রতি আততায়ীর গুলিতে নিহত হইয়াছেন। যেদিনটি তাঁর বিবাহের দিন বলে ধার্য হইয়াছিল, কেবলমাত্র বন্ধু ও সহকর্মী গ্রিফিথের মৃত্যুর জন্য সেদিনে বিবাহ না হয়ে দিন পিছিয়ে দেওয়া হয়, আর সেইদিনই মৃত্যু। কোথায় মিলন—আর কোথায় মৃত্যু।

—

অতঃপর বিমান বিহারীরাও খুঁজে পেতে কলকাতায় আসা হ'ল। তাঁদের আহারের কোন সন্ধান আজ পর্যন্ত হয় নি। যাক্, বীর সাহেব-মেম যে প্রাণে প্রাণে বেঁচে এসেছেন, সেই যথেষ্ট।

—

বাঙ্গালী ছু-পর্যটক উপেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী বি-এ (লণ্ডন) ইঁ বয়ে করে ঘুরছেন। ঘুরতে ঘুরতে অনেক এসে পৌঁছেছেন—কি আর বলব, বাঙ্গালী।

—

"বঙ্গবাসীর" প্রতিষ্ঠাতা, দেশ ও সমাজ সংস্কার-কল্পে একনিষ্ঠ উপাসক—পরলোকগত যোগেন্দ্রচন্দ্র বসুর অষ্টাদশ বার্ষিক উৎসব সম্পন্ন হইয়া গেছে।

ভালোবাসার স্বরূপ

(শ্রীবিজয়রত্ন মজুমদার)

দুটি বছর যেন একটি রাত্রির মত কেটে গেল। যেন একটা স্বপ্নের মত, ঘুমের ঘোরে কখন এসেছিল আর কখন্ চলে গেছে, কতটুকু সময় স্বল্পটুকু কেগে ছিল জানি নে, চোখ্ মেলতেই দেখি ভেঙে গেছে। দু'বছর ধরে আমরা কাব্য-চর্চ্চায় এমনই বিভোর হ'য়েছিলুম যে সেই প্রগাঢ় কাব্যের নেশা যে কোন দিনই টুটতে পারে—আমাদেরই সে জানাই ছিল না। জান হ'ল তখন, যখন কাব্যবৃক্ষে ফল ধরল।

গরীবের ঘরে জন্মেছিলুম বলে' ষোল বছর বয়স পর্য্যন্ত বিধবা মা একজনদের বাড়ীর মেয়ে পড়িয়ে আমাকে পালনই করতে পেরেছিলেন, আর কিছুই পারেন নাই। হঠাৎ কোত্থেকে একটা চাঁদ-পাওয়ার মত সমস্ত জুটে গেল,—গুনলুম, যেমন অর্থবান, তেমনি বিদ্বান, কেবল দোষের মধ্যে দোজবরে। ছেলে-পুলে নেই বটে প্রথম স্ত্রী বর্ত্তমান—মনান্তর ঘটেছে, ত্যাগ করেছেন। আমার মা'র এমনি তখন মনের অবস্থা যে কাণা খোঁড়া কুটে হ'লেও তিনি জামাই করে ফেলে নিজের জাত-ধর্ম্ম এবং শ্বশুরকুলের বংশ গৌরব উজ্জ্বল রাখেন। আমি কিন্তু সারারাত মা'র বুকে মুখ লুকিয়ে কেঁদে-ছিলুম, মা'কেও কাঁদিয়েছিলুম। বিয়ের পর দু'টি দিন পর্য্যন্ত থেকে থেকে বুকের পাতা চোখের পাতা ভিজেই ছিল—শুকিয়ে গেল, ফুলশয্যার রাত্রে স্বামী যখন মুখখানাকে বেশ করে মুখের কাছে টেনে এনে অজস্র চুম্বনে ভরিয়ে দিলেন। আগে আমি জেনেই পাইনি যে, যে স্ত্রীর সঙ্গে ঘর করেছেন, একটি সন্তানও হ'য়েছিল যাঁর গর্ভে, এমনি যা কি মনের অমিল ঘট্‌তে পারে যে সেই স্ত্রী একেবারে মনের-ও বাইরে গিয়ে পড়বে!...কিন্তু বুঝতে পারলুম, তাঁর জন্যে একতিল স্থানও নেই আমার স্বামীর বুকে বা মনে। তাঁর কথা আমিও কোনদিন তুলি নি, স্বামীও না। বাড়ীর মধ্যে- ক্বচিৎ কোনদিন কথা উঠ্‌ত এক আধ মিনিটের জন্য। তা'ও তুলতেন, আমার কেপাটে গোছের এক উকীল দেবর ছিলেন, তাঁরই মাঝে মাঝে শোক উথ্‌লে উঠ্‌ত। তা'তে অন্য কেউ বড় কাণ দিত না। কার দায় পড়েছে পাগলার কথায় মাথা ঘামাবার জন্যে! বন্ধু পাগল। শুনি নাকি অনেক পাশ করেছেন, আমার ত বিশ্বাস হয় না। লেখাপড়া জানা লোক অমন অজন্ত হয়? আমি যে বাড়ীর মধ্যে একটি রমণী আছি, প্রায় এক যুগী—কতদিন সামনে পড়েছি, অসুখে-বিসুখে কতদিন শয্যায় কেটেছে, কখন মুখের কথায় খোঁজ নিয়েছেন, চেয়ে দেখেছেন? তারপর এমনি মাতৃভক্তি যে কি বলব। তাঁর মা না-কি তাঁর একটি বিয়ের সম্বন্ধ করছিলেন, শুন্তে পেয়েই মা'কে একদিন জোর করে কাশীতে কাশীবাসিনী করিয়ে দিয়ে এলেন। তারে তারে ও দেখাসাক্ষাৎ ছিল না বল্লেই হয়। বাইরের ঘরটায় তাঁর এক টেবিল আর তিন আলমারি ভর্ত্তি বই থাকত,একটা আঁধছেড়া মশারী,দু'টো মাথার, একটা পায়ের বালিস আর খানদুই তুলো বার করা তোষক—এই সমস্ত সম্পত্তির মধ্যে দিন এবং রাত্রি তাঁর কাটত। সে'খানেই খাবার যেত, খেতেন, আর এক-একদিন এমনই চেঁচামেচি করে গান গাইতে সুরু করতেন যে পাশের বাড়ীর ছুতির কচি-কচি ছেলে পুলেরা ভয় পেয়ে আঁৎকে উঠ্‌ত। তাঁর ঘরটায় উঁকি মেরে দেখছি, একদিকের দেওয়ালে একখানা গান্ধী মহারাজার ছবি অন্য দিকে আর একখানা—একটি স্ত্রীলোকের—শুনলুম সেখানা বিদ্যাসাগরের ছবি, আমার শাশুড়ীর।

দেড়বছর তাঁর উপেক্ষা উপদ্রব সহ্য করতে হ'য়েছিল কিন্তু সে দেড়বছর—আগেই বলেছি—একটা ছোট রাতের মত এক নিমিষে অন্তর্হিত হ'য়ে গিয়েছিল। হঠাৎ একদিন তারী তাম্রা বেঁধে বাহিরের ঘরখানাকে একদম খালি করে' দিয়ে সেই যে পশ্চিম চলুম বলে বেরুলেন, আর আমরা তাঁর খবর অনেকদিন পাই নি।

আমাদের অবিরাম সুখ-স্রোতে মাঝে মাঝে যদি না কখনো ব্যথা পড়ত সে অন্তরায় যখন বিদূরিত হ'ল, আমার আনন্দ দেখে কে?.....

মা'র অবস্থা ভালো নয়। যে মেয়েটিকে তিনি বাড়ীতে পড়াতেন, গান-বাজনা শেখাতেন, তার বিয়ে হ'য়ে যেতেই মা'র আয় অনেক কমে গিয়েছে। কিছু নগদ টাকা তার

যে'র সময় আর মাসিক পনের টাকা করে মাসোহারা পাচ্ছিলেন, তাইতেই কায়ক্লেশে তাঁর চলে যাচ্ছিল—তাই মা একমাত্র কন্যার সন্তান-সম্ভাবনা জেনেও নিয়ে যেতে চাইলেন না—একদিন কেবল আমাকে বলে গেলেন, সেই সময় আন্‌বে। আমি তা'তে অমত করি নি, তবে সেই সময় মা যাতে এখানেই এসে থাকেন তার জন্যে যথেষ্ট পীড়াপীড়ি করেছিলুম, তাতেও মা রাজী না হ'য়ে বলেছিলেন, মাস্তি না হ'লে থাকতে নেই, খেতে নেই। এ-সব মেয়েলি কথা আমার যার মত শিক্ষিতা মেয়েতে যে মানে তা আমি জান্‌তুম না। কিন্তু কি আর করব, তাইতেই সম্মত হ'লুম। মা বল্লেন—তোর কিসের দুঃখ সরলা! তুই যে মা রাজরাণী!

২

মেয়েটা এমনই ঘ্যানঘেনে প্যানপেনে হ'ল যে কি বল্‌ব! একমিনিটও যেন তার সোয়াস্তি নেই, সদাই যেন অসুখ, সদাই যেন কাঁদ-কাঁদ। উপরি উপরি কতগুলো যে চাকর-চাকরাণী বদলানো হ'ল তার ঠিকই নেই! মেয়েটার বয়স তখন ৭ মাস একটা দুটানী যুবতীকে এনে তার হাতে খুকীর ভার দেওয়া হ'ল! ভাবলুম আমাদের বিকটদর্শন ঘন-কৃষ্ণকায় লোকজনের কাছে বুঝি সুন্দরী মেয়ে আমার থাকতে চায় না—ওমা! এর কাছেও তাই! ক'দিন পরে ছুঁড়ীই পালাল। স্বামী বল্লেন—মেয়েটার কোন অসুখ আছে, ভেতরে-ভেতরে। ডাক্তার দেখাতে হ'বে।

ডাক্তার ডাকতে পাঠাচ্ছেন, আমি তাঁকে জানালুম, অমন হয়।

স্বামী ত অবাক্! বল্লেন—কি পাগলের মত বক্‌ছো, তার ঠিক নেই.....

আমি বল্‌লুম, পেট ভরে খেতে না পেলে.....

এত বড় অপবাদ। তাঁর ঘরে অমন পাঁচ গাড়ীটা চাকর-বাকর ঘোড়া গরু খেয়ে হিমসিম্ খেয়ে যাচ্ছে আর ঐটুকু মেয়েটা···স্বামী তর্ক করতে এলেন।

আমি বল্‌লুম—তোমার লোকজনেরা যা খায়, ও কি তা খেতে পারে। ওর যে শুধু দুধ সম্বল।

স্বামী ভাব্‌লেন গাইয়ের দুধ বন্ধ হ'য়েছে—একটা মূলতানী গাই কিনতে আছে—বল্লেন।

'দুঃখের ঘরে'র
চিত্র আগামী
সংখ্যায় দেখিতে
পাইবেন।

ভেবেছিলুম, অত সহজে অত ভাবে কথাটা বল্‌ব। তা আর হ'ল না, এমনি বল্‌তে হ'ল! শুনে স্বামীর মুখখানি ছাইয়ের মত সাদা আর সন্ধ্যার মত ম্লান হ'য়ে গেল। শুষ্কস্বরে বল্লেন—আবার!

প্রথম সন্তান মেয়ে হ'য়েছে বলে' তিনি প্রায়ই দুঃখ করতেন; বল্‌তেন—এবার ছেলে হ'বে—দেখো!

তবুও মুখের সে অপ্রসন্নতা ঘুচল না। তার পর কত-রকমে তাঁকে আনন্দ দেবার চেষ্টা করলুম, মুখে একটু আধটু হাস্‌লেন, আদর যত্নের কথাও বল্লেন, কিন্তু নারী আমি, আমার যে অভাব, যা খুঁজছি এবং যা না পেয়েই বার বার বিফল মনোরথ হ'চ্ছি তা আর আমার বুঝতে বাকী ছিল না। বুঝলুম, কন্যাতীতি কিছুতেই তাঁর মন থেকে দূরে যাচ্ছে না। সেইদিন থেকে যখনই নির্জ্জনে একটু অবসর পেতুম, জানি না কার চরণে লুটিয়ে পড়ে' কাতর কণ্ঠে প্রার্থনা করতুম—এবার যেন একটি ছেলে হয়!

ভগবান্ ছিলেন, আমার কাতর ক্রন্দনে তাঁর হয়ত হৃদয় গলেছিল, যা চেয়েছিলুম, তাই দিলেন। দাস-দাসীরা আপনাদের মধ্যে কে কি বিশেষ নিয়ে আমাদের কৃতার্থ করবে তারই তর্কে মেতে উঠলো; খোকার মা বলে' একটি প্রবীণা পরিচারিকা ছিলেন, আঁতুড় ঘরে বসেই বার তরিফ অমন পরলে কেমন তাঁ'কে মানাবে, তাও আমাকে শুনিয়ে দিলেন। কিন্তু স্বামী এলেন না। ইদানীং তিন চার মাস ধরেই তিনি এমনি বাইরে বাইরেই কাটাচ্ছিলেন। আসিনে কিসের ভাবনা এত তাঁর! জিজ্ঞাসা করলে উত্তর পাইনে, যদি বা পাই, এত অস্পষ্ট অসলের বুঝতে পারি নে। হলই বা মেয়ে—তাঁর ভাবনা কি! তাঁর ত আর কাল কি খাব, সে ভাবনা নেই, তবে? বাংলা দেশের নর-নারীর রক্তের সঙ্গেই কন্যাতীতি যেন মিশে গিয়েছে, কেউ সে ভয় থেকে নিস্তার পায় নি, যেন যেতে পারেও না। মেয়েটা আমার এই ঘরের চৌকাঠটির পরে মুখ চুণ করে বসে থাকত, থেকে-থেকে ঠোঁট দুখানি কেঁপে ওঠে, বড় বড় আয়তনেত্রদয় ভারে জলে ভরে আসে—কতবার আদর করে' কত মিষ্টি কথা বলে বুঝতে চাই যে তার কাছে যা, কত আদর করবেন, কত জিনিষ কিনে দেবেন, পড়ের মাঠে নতুন যে খেলা এসেছে সেখানে

দিয়ে যাবেন—ওঠে না—হয়ত আমার কথা বুঝতেই পারে না। পারবেই বা কোত্থেকে? এই ত মোটে একটা বছর পেরিয়েছে;—তার মায়ের কোলের দিকে চায় আর ছল-ছল চোখে যেন কি বলে, তার সে ভাষা বুঝি—এমন ক্ষমতা আমার নেই, আমরাও চোখ ভরে আসে।

ভাবি, কেন অমন হল? মাঝে মাঝে কেমন সন্দেহ হত স্বামীর আমার শরীর ভালো নেই, স্বাস্থ্যহানি ঘটেছে। চোখে সে দীপ্তি নেই, মুখের উপর যে একটা স্নিগ্ধ রমণীয়তা বিরাজ করত, তা যেন দূর হয়ে গেছে, দেহের লাবণ্য দিন দিন মলিন হয়ে যাচ্ছে; অঙ্গে কখনও তামাকটাও স্পর্শ করতেন না, ইদানীং যখনই তাঁকে দেখেছি—মুখে সিগারেট! লাল পাতলা ঠোঁট দু'টিও ধোঁয়ায় ধোঁয়ায় কালো হ'য়ে উঠেছে। বসে আমার মুখের দিকে দু' এক-মিনিট অবাক্ হ'য়ে চেয়ে চেয়ে বাইরে চলে যেতেন। এক-দিন বড্ড ধরে পড়েছিলুম, ডাক্তার দেখাতেই হবে!... উঠে গেলেন, যাবার সময় বলে গেলেন, দেখাব। ডাক্তার ত দেখালেনই না, সেই দিন থেকে তাঁর দেখা পাওয়া আমার পক্ষে দুষ্কর হ'য়ে উঠ্‌লো! যদিও মনে বড় কষ্ট হত—কেবলই কাছে পাবার জন্যে ব্যাকুল হ'য়ে পড়তুম, কিন্তু তাড়াতাড়ি করবার মত ক্ষমতা যা তাঁর প্রত্যাশায় জেগে বসে থাকবার সামর্থ্য সে সময়ে আমার ছিল না। পাছে দিনরাত দুর্ভাবনায় কাটিয়ে দেহের মধ্যে যে নবাগত অবস্থান করছে তার একটা অনিষ্ট ঘটে বসে—তেষ্টা করেই মনকে নিশ্চিন্ত রাখ্‌তে চাইতুম! কিন্তু এ-যে নারীর মন! সে-যে দুর্বল, সে-যে অস্থির, বাতাসের ভরে কাঁপে, মেঘের নাম শুনলে ভেঙে পড়ে!...

তবে কি এ পদ্মপত্রে নীর! সদাই টল টল করছে! কখনও সে স্থির হতে জানে না, স্থায়ী হয় না! আমার সতীনের সঙ্গে মনান্তরের কারণ আমি জানিনে; তাঁকে আমি চোখে দেখিনি, তাঁর প্রতিকৃতি দেখেছি। সুন্দর বলে ঠিক বলা হ'য় না, তার চেয়ে ঢের বেশী। শুনেছি, সুশীলা বলে অনেক কথা বলা হয়—এমনই ছিলেন তিনি। মানটিও তেমনি—বিদ্যুৎ! মনে হ'ল—এই কারণ নয় ত?—মনে হ'তেই পা থেকে মাথা পর্য্যন্ত ঝিম্ ঝিম্ করে' উঠ্‌লো সারা অঙ্গ বেদনায় ভারে নুয়ে পড়ল—দুর্বল শরীরে এত-খানি উদ্বেগ আশঙ্কা সইবে কেন?—শরীর লুটিয়ে পড়ল।

হায়রে নারীর মন! এই যে ঘরে-বাইরের টানাটানির পর অতিকষ্টে পৃথিবীর আলোক দেখতে পেয়েছে, অথচ অধীর হ'য়ে যার তার কত প্রতিজ্ঞাই করেছ, কত দেবতার পায়ে মাথা কুটে কতবার বলেছ, হোন্ স্বামী, হোন্ দেবতা পুরুষ জাতি ত। পুরুষের নাম-মাত্রে ভয় পেয়েছ—এক মুহূর্ত্তে, স্বামীর ঘরে না চুক্‌তেই সব যে উলট পালট হ'য়ে গেল!

৩

আঁতুড় থেকে বেরিয়ে যে দিন সেই ঘর খানিতে ঢুকলুম, মনে নূতন আনন্দ জেগে উঠ্‌লো। এতদিন পরে তাঁকে দেখ্‌ব!...স্বামী ঘরেই ছিলেন, একখানা লম্বা চেয়ারে এলিয়ে পড়ে চুরুট খাচ্ছিলেন, আমাকে দেখেই দাঁড়িয়ে উঠ্‌লেন। নত হয়ে প্রণাম করতে যাচ্ছি—থাক্ হ'য়েছে। বলে দু'টি আঙুল দিয়ে আমার শির স্পর্শ করলেন! আজ সে কথা বলতে আমার সর্ব্বাঙ্গ শিউরে উঠছে—দুটি আঙু-লের স্পর্শ ত, মনে হ'ল তখন দিগন্তবিস্তৃত বেলাভূমিকে ওয়েভোচ্ছাস যেন জড়িয়ে ধরছে!

কিন্তু চেয়ে দেখতেই বুকের রক্ত হিম হয়ে গেল! এ কি শুষ্ক করুণ বিষাদ-মূর্ত্তি! সোণার অঙ্গ কালি হ'য়ে গেছে, চোখের নীচে কে যেন সদ্যি কালের আলকাৎরা লেপে দিয়েছে! তাঁর ললাট কুঞ্চিত হয়েছে, তার দু'দিকে উঁচু উঁচু দুটো শির ফুলে উঠেছে, কতদিন যে কামান নি—কে জানে! সোনার মা'র কোলে খোকাকে দিয়ে রোয়ের পাশে দাঁড় করিয়ে রেখে এসেছিলুম, ডেকে দেখাব—স্বামীকে দেখে সে মনের কথা মনেই লোপ পেল; বল্লাম—কি হ'য়ে গেছ?

ম্লান দু'টি দৃষ্টি মেলে এক মুহূর্ত্ত আমার আপাদ মস্তক লক্ষ্য করে, অল্প একটু হেসে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি ভালো আছ সরমা?

সত্যি আমার দেহে কোন রোগ ছিল না, একটু দুর্ব্বলতা সে কিছু না, বল্লাম—আমি ত ভালোই আছি—তুমি যে···

হেসে আমার হাত ধরে সোফায় বসিয়ে নিজে ঘনে হাস্‌তে হাস্‌তে বল্লেন, সত্যি ভালো আছ? আমার বড় ভাবনা···

কথা শেষ হবার আগেই সগর্ব্বে সমস্ত অন্তঃকরণটি ভরিয়ে দিয়ে বল্লাম—আমার জন্যে এত ভাব, আর নিজে যে···

ও কিছু না, সেরে যাবে।

খোকাকে দেখ্‌বে না?

কৈ?

কি দিয়ে দেখ্‌বে?

আমার গালে চুম্বন করে বল্লেন—এই দিয়ে!

আমি বল্লাম—সে হ'বে না···

বল্লেন—তার দাম কি তার মা'র চেয়েও বেশী? তার মা'কে ত এই দিয়েই···

লজ্জায় রাঙা হ'য়ে—খোকার মা আপনা থেকেই ঝুঁকে পড়েছিল,—খোকাকে নিয়ে তাঁর কোলে দিলুম।

খাটের দিকে চেয়ে বল্লাম—তুমি বুঝি এখানে শুতে না?

না—আমি বাইরে শুই। তোমার বিছানা করে রেখে, ওদের কটওলোও এনে রেখেছি—ঘরেকে বলে দিচ্ছি।

আর তুমি?

বাইরে।

ইস্!

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বল্লেন—এখানে শোব?

শোবে না। যাবে। আমি বুঝি একলা থাক্‌ব! বেশ লোক ত।

সোহাগভরে আমাকে বুকে জড়িয়ে ধরে বল্লেন—বেশ, তাই হ'বে।

আবার যেন তাঁর দেহে লুপ্ত আত্মা কতকটা ফিরে আস্‌তে লাগ্‌ল। দেখে নারীচিত্ত আনন্দে উল্লাসে দুলিতে ভরে গেল। মেঘ-ঘেরা যে আকাশে বহুদিন চাঁদ হাসে নি, বন জঙ্গল ভরা যে বাগানে বহুকাল ফুল ফুটেনি—আবার চাঁদ হাসল, আবার ফুল ফুটল—আর নারী! নারী তার ইষ্টদেবতার সুখের পদমূলে আপনাকে সমর্পণ করে তার নারীত্ব সার্থক করলে।

৪

স্বামী বাইরে চা খাচ্ছিলেন, ব্যস্ত-সমস্ত হ'য়ে অন্তঃপুরে এসে দাঁড়াতেই আমি সেলিউটা ছুড়ে উঠে দাঁড়ালুম। বিস্তৃতমুখে জিজ্ঞাসা করলেন-তুমিই বুঝি করছিলে, সরযূ?

আমাকে উত্তর দিতে হ'ল না, স্বামী নিজেই দেখ্‌তে পেলেন। আমি তাঁর দিকে না চেয়েও তাঁর শুভ্র মুখখানি দেখ্‌তে পেলুম। নতমুখে দাঁড়িয়ে আছি, বল্লেন—বুঝি করছ কেন?

নতমুখেই উত্তর দিলুম—ক'দিনই করছি ত!

স্বামী নির্ব্বাক। নারী আমি, দু'দুটো সন্তানের জননী আমি, তাঁর মনের কথা যে আমি বুঝি নি, তা নয়, বুঝেছিলুম, কিন্তু একটা মিথ্যাবাক্যেও তাঁকে প্রবোধ দেবারও যে যো ছিল না আমার, কাঠের মত দাঁড়িয়ে আছি, নিষ্কম্প-স্বরে প্রশ্ন হ'ল—ক'মাস?

তিন—বোধ হয়!

স্বামী চলে গেলেন।

সেইদিনই খেতে বসে' বহুকালের পুরাণো জগন্নাথ ঠাকুরকে তাড়িয়ে দিলেন; সামছা দিতে দেরী হ'য়েছিল বলে ঘরে চাকর চুটিমুড়ো খেলে, শোবার ঘরে আমি আছি দেখেও দেখ্‌লেন না, চুরুটের কৌটো নিয়ে নেমে চলে গেলেন। আবার চেহারা তেমনি শুকিয়ে উঠ্‌তে লাগ্‌ল, খেতে বসে খেতে পারেন না, খাবার সময় খুকীকে পাশে নিয়ে বস্‌তেন, তুলিয়ে তুলিয়ে তা'কে চারটি খাওয়াতেন, খুকীর ভাত যেমন তেমনি পড়ে রইল, নিজে হাতে তাতে করে উঠে যান! ঘরে-চাকরের মুখে শুনলুম, সারারাত তাকে গা টিপ্‌তে হয়, বাবু চোখের পাতা বোজেন না! আমার মা যে বাড়ীর মেয়েটিকে পড়াতেন, সে বাড়ীর কর্ত্তারও এমনি একটা রোগ হ'য়েছিল, তাইতেই তাঁর মৃত্যু হয়—মা বলতেন ইনসমনিয়া!—একদিন কাঁদ কাঁদ হ'য়ে বল্লুম—শরীরের অযত্ন করছ কেন?...দিনকত একটু বিশ্রামেই না হয়.....

বল্লেন—তাই যাব ঠিক করেছি।

কোথায় যাবেন জিজ্ঞাসা করায় বল্লেন—জলধৌমি, দৈনিডাল পাহাড়ের কাছে, খুব ভালো যায়গা।

তারপর দু'তিন দিন ক্রমাগত বাহিরে বাইরে ঘুরলেন—বোধ করি সেই যাবস্থাতেই ঘুরে বেড়াচ্ছেন। একদিন সন্ধ্যের পর এসে আমাকে বল্লেন—মা'র কাছেই যাবে ত? একটা চাকর, একটা ঝি নিয়ে যাও, মাসে মাসে সমস্ত যোগাই·····

যখন-যেমন থাক, চিঠি লিখ্‌বে?

লিখ্‌ব বৈ-কি! লিখ্‌ব না, তোমরা—তুমি রইলে এখানে পড়ে, লিখ্‌ব না?

কতদিনের কত দুঃখ, কত গ্লানি, কত অতৃপ্তি যে এই কথা কটার তলে পড়ে গেল, তা আর কি বলব।

হায়রে পুরুষ! বুঝে এত মধু আর অমৃতে সে কি হলাহল!

বল্লেন—কাল আমি নিয়ে তোমায় রেখে আসব—কেমন?

কাল সেখানে থাকতে হ'বে কিন্তু!

কাল ত থাকতে পারব না সরমা! পর্শু যেতে হ'বে, কাল সব ঠিক না করে ফেরে—

আর আপত্তি করি নি। স্বামী যে স্বাস্থ্যান্বেষণে যাচ্ছেন।

মধুর—এখনত আর বেরুবে না? এস···

না,একটু পরে আস্‌ছি...বলে' একখানা ট্যাক্সি আনিয়ে বেরিয়ে গেলেন।

খোকাকে কটুখানিতে শুইয়ে দিয়ে তার পাশে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভগবানের কাছে প্রাণের কামনা নিবেদন করছি, হয়ে ঘরে ঢুকেই কাঁচু মাঁচু হ'য়ে বেরিয়ে যাচ্ছিল, ডাকলুম —কিরে?

হয়ে ভয় পেয়ে বল্লে—বাবু?

কেন?

হয়ে সোবার ঘরে হঠাৎ ঢুকে পড়ে অন্যায় করেছে ভেবে ভয় পেয়েছিল, অভয় পেয়ে সরে এল, বল্লে—বাবুর চিঠি আছে।

বাবু বেরিয়ে গেছেন। কোথাকার চিঠি—দেখি রে!

ভেবেছিলুম, বাবারই বন্দোবস্ত!—বাবারই বন্দোবস্ত বটে, তবে হলমৌনিতে নয়।

চিঠি খানায় লেখা;—

"অনেক কষ্টে মা'র মত করিতে পারিয়াছি। কাল রাত্রে আসিও, তোমার সঙ্গেই যাইব। তোমার অগাধ প্রেম প্রত্যাখ্যান করিবার সাধ্য কৈ?—বিহাৎ।"

হাত পুড়ে গেল, চোখ-ও তাই!

কিরতেই দেখি, স্বামী! চরণাঘাতে হয়ে ভূপতিত আর আমার দিকে চেয়ে—ওঃ! সে কি অগ্নিদাহ! জীবনে তেমন কখন দেখি নি!

মেয়েদের দাবী

[শ্রীসরসীবালা বসু]

সংসারে মেয়েরা মানুষ হয়ে জন্মালেও সংসারের সকল জিনিষে তাদের অধিকার নেই, এর জন্য তাদের ত্যাগ স্বীকার বা পুরুষের শক্তির আড়ম্বর কে কতটা দায়ী তার হিসাব না করলেও ক্ষতি নেই; তবে এটুকু বেশ বুঝতে পারা যায় যে খ্রীষ্ট যে বলেছিলেন "প্রার্থনা কর পাইবে" এটা খুব ঠিক কথা। মেয়েরা তাদের দাবী ভুলে বসে থাকলে পুরুষেরা যে উপযাচক হয়ে সব জিনিষ তাঁদের হাতে তুলে দেবেন এটাও তো আশা করা যায় না; তবে কোন অতীত যুগে কোন শাস্ত্রকর "ন স্ত্রী স্বতন্ত্রমর্হতি" বাক্যটি জোর গলায় ঘোষণা করে পিতার ধনসম্পত্তি হতে কন্যাকে পর্য্যন্ত বঞ্চিত করে ছিলেন আর সেই অনুশাসন আজ পর্য্যন্ত সমাজ মাথা পেতে মেনে আসছে তা বোধ হয় স্মরণ করা কঠিন, স্মরণ না করলে ক্ষতিও নেই, কিন্তু আজকের দিনে সব মেয়েদের সেই দাবী করা চাই, না করলেই বরং ক্ষতি। স্বামীর ধনে স্ত্রীর অধিকার নেই, পিতার অতুল সম্পত্তি থাকলেও মেয়েরা তার অংশভাগিনী নয়, এ অবিচার কেন মেয়েরা মেনে চলবে?

বিজ্ঞরা কেহ বলেন মেয়েদের বিষয় বুদ্ধি কম বলেই এ ব্যবস্থা প্রচলিত হয়েছে, কেহ বলেন সম্পত্তির অংশীদার বলে ভ্রাতায় ভ্রাতায় একটা শত্রুতার সম্বন্ধ চলে আসছে, ভগ্নীরাও যদি অংশভাগিনী হয়ে দাঁড়ায়, তা হলে ভগ্নীর সহিত ভ্রাতার মধুর সম্বন্ধও মুহূর্ত্ত মধ্যে তিক্ত হয়ে উঠবে; সেটা কিন্তু কাজের কথা নয়, সম্বন্ধ যেখানে তিক্ত হয়ে ওঠে সেখানে বুঝতে হবে আছে ঈর্ষাপূর্ণ অপ্রীতির গলদ। যাঁরা ন্যায়বান, যাঁরা সদ্বিবেচক তাঁরা অনায়াসেই মনেই পরস্পরে নিজেদের ন্যায্য অংশ নিয়েই পরিতৃপ্ত। মেয়েদের এই দাবীর কথা যদি কোনো চিন্তাশীল ব্যক্তি সব দিক থেকে একটু আলোচনা করে দেখেন তো ক্ষতি কি?

(শ্রীনারায়ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য ।)

একাদশ পরিচ্ছেদ ।

তারকনাথ আসিয়া মাতুলের মৃত্যুসংবাদ শ্রবণে শোকে মুহ্যমান হইল এবং পিতৃতুল্য মাতুলের মৃত্যুকালে উপস্থিত থাকিয়া তাঁহার মুখে শেষ এক গণ্ডুষ জল দিতে পারিল না বলিয়া যথেষ্ট দুঃখ প্রকাশ করিল। উইলে মামা তাহাকে কিছুই দিয়া যান নাই, মাত্র সামান্য একটা মাসহারার বন্দোবস্ত আছে শুনিয়া তারকনাথ কিছুমাত্র দুঃখিত হইল না; বরং সে সানন্দে স্পষ্টস্বরে সকলকে জানাইল যে, এই মাসহারাতেও তাহার কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই, কেননা গুরুদেবের আদেশে সে শীঘ্রই সন্ন্যাস ধর্ম্ম অবলম্বন করিবে, এবং সেই উদ্দেশ্যেই সে চাকরী ছাড়িয়া সকলের সঙ্গে শেষ সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছে। এই সাক্ষাৎশেষ করিয়া শীঘ্রই সে গুরুদেবের চরণপ্রান্তে উপস্থিত হইবে। সংসারে আর তাহার কিছুমাত্র আসক্তি নাই; আসক্তির আছেই বা কি? সুতরাং সে সর্প-দংশের ন্যায় এই মোহদুঃখময় সংসার ত্যাগ করিয়া শান্তিময় বৈরাগ্য ধর্ম্ম অবলম্বন করিবে ইহাই তাহার একমাত্র সঙ্কল্প।

তাহার এই সংকল্প শ্রবণে অনুপমা ব্যথিত হইল, এবং দাদাবাবুকে এই সঙ্কল্প ত্যাগ করিয়া সংসারী হইবার জন্য বিস্তর অনুরোধ উপরোধ করিল। মহেন্দ্র নাথ তাহাকে কিছু দিয়া না গেলেও সে নিজে সম্পত্তির কিয়দংশ ছাড়িয়া দিতে প্রতিশ্রুত হইল। তারকনাথ কিন্তু টলিল না; সে সন্ন্যাসধর্ম্মের বহু মহিমা কীর্ত্তন পূর্ব্বক অনুপমাকে সান্ত্বনা দিয়া বলিল, "আমার আর সুখে বিন্দুমাত্র স্পৃহা নাই বোন, এখন তুই সুখে থাক্ এই আমার গুরুদেবের চরণে একমাত্র প্রার্থনা।"

ব্যথিত কণ্ঠে অনুপমা বলিল, "তুমি যখন একেবারেই আমাদের মায়া কাটিয়ে দিয়ে যাচ্ছো, তখন আমার সুখে দুঃখে তোমার কি দাদা বাবু?"

বৃহ হাস্য সহকারে তারকনাথ বলিল, "মায়ার বাঁধন কাটিয়েছি বটে, কিন্তু তোর স্নেহের বাঁধন কাটিয়ে যাওয়া বড়ই শক্ত মনে হচ্ছে।"

অভিমানক্ষুব্ধ কণ্ঠে অনুপমা বলিল, "তেমন হ'লে তুমি কখনো যেতে পারতে না।"

চিন্তাগম্ভীর মুখে তারকনাথ বলিল, "সে কথা সত্য; কিন্তু কি করবো বলো, গুরুদেবের আদেশ।"

অনুপমার চোখদুইটা ছল ছল করিতে লাগিল। তদ্দর্শনে তারকনাথ তাহাকে আশ্বাস দিয়া বলিল, "তা ব'লে আমি আজিই যাচ্ছিনা, যেতে আমার এখনো দু'তিন মাস দেরী, বৈশাখী পূর্ণীমার পূর্ব্বে আমাকে গুরুদেবের কাছে উপস্থিত হ'তে হবে।"

অনুপমা যেন কতকটা আশ্বস্ত হইল। তারকনাথ অতঃপর বিষয় সম্পত্তির কিরূপ ব্যবস্থা হইতেছে তাহার তত্ত্বাবধানে মনোনিবেশ করিল। সে তারানাথের এ স্থানে আগমন বৃত্তান্ত শুনিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইল। তাহার সহিত আলাপ করিল; এবং তাহার তত্ত্বাবধানে বিষয় কর্ম্ম সুচারুরূপে নির্ব্বাহিত হইতেছে দেখিয়া যথেষ্ট আনন্দ প্রকাশ করিল। তারপর ভূপতি নাথ—হাসীমার মুখে ভূপতিনাথের পরিচয় পাইয়া তারকনাথ তাহার সহিত আলাপ পরিচয় করিয়া লইল এবং সে আলাপে দুইচারি দিনেই উভয়ের মধ্যে বেশ ঘনিষ্ঠতা জন্মিয়া গেল।

কয়েকদিন পরে ক্ষেমঙ্করী দেবী তারকনাথের নিকট ভূপতির অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলেন। শুনিয়া তারকনাথ কিয়ৎক্ষণ গম্ভীর হইয়া রহিল, তারপর, ভাবিয়া এ কথার উত্তর দিবে বলিয়া সেদিন অবকাশ লইল।

সে দিন তারকনাথ নির্জ্জনে ভূপতির সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বলিল, "কি গো ভূপতিবাবু, বামন হ'য়ে চাঁদে হাত বাড়াতে চাও যে?"

ভূপতি তাহার উক্তির মর্ম্ম বুঝিল; বুঝিয়া উত্তর করিল, "সুন্দর দেখ্‌লে সকলেই তাহার দিকে হাত বাড়িয়ে থাকে। বামনেরও সৌন্দর্য্য বোধ আছে।"

তার। কিন্তু হিতাহিত বোধ নাই। সাপের মাথার মণি দেখে কোনও বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিই তাকে পাবার জন্য হাত বাড়ায় না।

ভূপ। অনুপমা যে সাপের মাথার মণি তা 'আমি' জানতাম না।

তার। এখন জেনে রাখ, সে সাপের মাথার মণিও চাইতেও দুষ্প্রাপ্য।

ভূপ। জমিদারীর মালিক ব'লে বুঝি ?

তার। ঠিক তাই। পূর্ব্বকালের রাজারা কারো উপর প্রসন্ন হ'লে তাকে অর্দ্ধেক রাজত্বের সঙ্গে এক রাজ-কন্যা দান করতো। এ কিন্তু একটা গোটা রাজত্বের সঙ্গে এক রাজকন্যা।

ভূপতি ঈষৎ হাসিল ; বলিল, "তা আমি না হয় গোটা একটা রাজত্ব চাই না, অর্দ্ধেকটা হ'লেই যথেষ্ট।"

সহাস্যে তারকনাথ বলিল, "বাকী অর্দ্ধেকটা আমাকে দেবে নাকি ?"

ভূপ। ঘটক বিদায় তো আছে।

তার। কিন্তু কাল তো আমি সংসার থেকেই বিদায় নিচ্ছি। সন্ন্যাসীরা জমিদারী চালায় না।

ভূপ। সে যারা তিথারী সন্ন্যাসী। বড় বড় সন্ন্যাসী-দের বড় বড় জমিদারী, বড় বড় মঠ থাকে ; দশ হাজার বিশ হাজার নিয়ে নাড়া চাড়া ক'রে।

তারকনাথ হাসিয়া উঠিল বলিল, "বেশ, আমিও না হয় ঘটকালি ক'রে একটা মঠধারী হ'য়ে বস্‌বো। কিন্তু বিয়ে ফুরুলে ছুলনায় সাধি হবে না তো ?"

ভূপতি নাথ তাহার হাত দুইটা বাড়াইয়া ধরিয়া কাতর কণ্ঠে বলিল, "কখনো তা হবে না তারকবাবু। বিশ্বাস না হয়, আমি লেখাপড়া ক'রে দিচ্ছি।"

তারকনাথ তাহাকে শান্ত করিয়া বলিল, "আচ্ছা, লেখাপড়াটা এর পরে হ'লেও চলবে। আগে বিয়েটা হ'য়ে যাক্, অনুপমা তোমাকে আমরোক্তার নামা লিখে দিক্, তারপর তো আমি। এখন আমি ঘটকালির পাওনাটা হ'য়েই যেতে।"

অতঃপর তারকনাথ একদিন কথা প্রসঙ্গে অনুপমার নিকট বিবাহের কথাটা পাড়িল এবং নানাবিধ যুক্তি প্রমাণ দ্বারা তাহাকে বুঝাইয়া দিবার চেষ্টা করিল যে, এ পর্য্যন্ত সে অবিবাহিত থাকায় শুধু যে সকলে দুঃখিত তাহা নহে, ইহাতে সমাজধর্ম্মের ও হিন্দু শাস্ত্রের প্রতি সম্পূর্ণ অবজ্ঞা প্রদর্শন করা হইতেছে। অনুপমা বুঝিল কি না বলা যায় না, কিন্তু সে দাদাবাবুর কথায় একটিও উত্তর দিল না, নীরবে নতমস্তকে তাহার উপদেশ শুনিয়া গেল। তারকনাথ এই নীরবতায় আপনার উপদেশ সার্থক হইয়াছে ভাবিয়া তারকনাথ মনে মনে গর্ব্ব ও আনন্দ অনুভব করিল।

আর একদিন তারকনাথ বিবাহের প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়া অনুপমাকে জানাইল যে, ভূপতিনাথ তাহার পাণি-গ্রহণের নিমিত্ত লালায়িত ; তারকনাথের বিশ্বাস, তাহাকে স্বামীপদে বরণ করিলে অনুপমা নিতান্ত অপাত্রে পতিত হইবে না। ভূপতিনাথের কথায় অনুপমার ভ্রূযুগল ঈষৎ কুঞ্চিত হইল। কিন্তু সে কথাও বলিল না, শুধু আরক্ত মুখে নিঃশব্দে বসিয়া রহিল। তারকনাথ মৌনং সম্মতি লক্ষণং' বুঝিয়া সেইদিনই প্রচার করিয়া দিল যে, ভূপতি নাথের সহিত অনুপমার উদ্বাহকার্য্য সম্পন্ন হইবে।

(ক্রমশঃ)

"চুটকী"

[শ্রীধীরেন্দ্রনাথ রায়]

একজন লোক, যিনি যেমন পয়সা দিতেন তাঁহাকে সেইরূপ গল্প বলিতেন, এই ছিল তাঁহার ব্যবসা, এক আনা হইতে আরম্ভ করিয়া দশ হাজার মূল্যের গল্প তিনি বলিতে পারিতেন। একদিন একব্যক্তি তাঁহাকে চারিটী পয়সা দিয়া তাহার উপযুক্ত একটী গল্প বলিবার জন্য অনুরোধ করিলেন।

গল্প ব্যবসায়ী গল্প বলিতে আরম্ভ করিলেন—"এক ছিল রাজা, তাঁর প্রকাণ্ড রাজবাড়ী, বড় বড় থাম বড় বড় সিংহ-দ্বার রাজবাড়ীর কি শোভা, ইন্দ্রভুবনও তার কাছে পরাজিত। রাজা সেখানে রাণীদিগকে লইয়া বাস করেন, একদিন হঠাৎ সদরের দরজা এক প্রকাণ্ড বাঘ আসিয়া বহু লোকজন হত্যার পর রাজবাড়ীতে প্রবেশ করিল। রাজার মা তাহা দেখিয়া ভয়ে নিজের কপালের আগড় বন্ধ করিলেন।" যিনি গল্প শুনিতেছিলেন চীৎকার করিয়া উঠিলেন "সে কি মহাশয় ?" 'রাজার মা আগড় দিলেন' কি প্রকার ? এই আপনি বলিলেন 'প্রকাণ্ড রাজবাড়ী ইন্দ্রভুবনও তার সমতুল্য নহে' আবার এখন বলিতেছেন 'রাজার মা আগড় দিলেন' এ কেমন কথা ?"

গল্পের বক্তা বিরক্ত হইয়া বলিলেন "তা চার পয়সায় কি আর শার্শিওয়ালা দরজা, খড়খড়িওয়ালা জানালা হবে, যা শুনেছি চারপয়সায় ঐ পাওয়া যায় না, যেমন যেবে তেমনি ত পাবে ! রাগ করলে চলবে কেন বাপু।" যে লোকটী গল্প শুনিতেছিলেন তিনি ব্যাপার বুঝিয়া সরিয়া পড়িলেন।

কুহেলি।

(নাট্য)

[শ্রীসুরঞ্জন মল্লিক বি-এ]

পাত্র পাত্রীগণ

চন্দ্রলোকের রাজা।
মন্ত্রী
চন্দ্রাশীষ—সেনাপতি
চন্দ্রাভাস—কবি ও বিদূষক
রাজদূত, গালবঋষি কুশবর্ত্ত প্রভৃতি।

রাণী
চন্দ্রমল্লী—চন্দ্রাশীষ পত্নী
চন্দ্রপ্রভা—চন্দ্রলোকের মানসী কন্যা।
কুহেলি—চন্দ্রপ্রভার সখী
পরিচারিকা প্রভৃতি।

শুভোপ্রসন্ন।

—•—

পড়লো আলোর কালর ঝুলে
ঝাপ্‌সা মেঘের ঝরকাতে,
মিশলো আলো কালোর সনে,
অঞ্জনে আর নিরঞ্জনে,
জাগলো যোগন এক সাথেতে
মন্দির এবং দরগাতে।
পড়লো অসীম সসীম মাঝে,
নীরব সেতার সারঙ্গ বাজে,
ভাবুক যারা ভাবের সুতা
কাটুক মনে চরকাতে।

"পরিহাস বিকল্পিতং সখে পরমার্থেন ন গৃহ্যতাং বচঃ।"

প্রথমঙ্ক অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য

চন্দ্রলোক মহর্ষি গালবের আশ্রম

ঋষি বালকগণ :—

ধুলোনা থাকুক ছুটে
কুটজ কুসুম উটজ কোণে
এসেছি সবাই ছুটে
নারদ ঋষির নিমন্ত্রণে।
আজিকে হোম হবে না
'চন্দ্র' আজ কেউ লবে না
আজিকে বন্ধ যে পাঠ—
দখিন বায়ুর প্রবর্ত্তনে।

২

বেঁধে রাখ নীবার খেতে
আজকে যে ভাই হোমধেনুকে,
বসি' আজ অজিন পেতে
আন্ রে সেতার আন্ বেণুকে।
নির্ব্বানেই বহ্নি গেল
আজিকে অনুক আলো
আজি ভাই জাগুক প্রীতি
তুহিন-বিধুর নয়োজ বনে।

১ শিষ্য।—আমাদের চন্দ্রলোকে মহর্ষি নারদের শুভাগমন হবে, তাই গুরুদেব আজ আমাদের অবকাশ দিয়েছেন।

২য় শিষ্য।—আহা নারদ ঋষি। যাঁর জীবনে ভগবান সত্যই আনন্দময় হয়ে দেখা দিয়েছেন, যাঁর যোগ আরাধনা সব এক অখণ্ড আনন্দে পর্য্যবসিত হয়েছে, সেই চিরশিশু চিরবিশোর মহর্ষিকে দেখতে পাবো, তাঁর গীত শুনতে পাবো এ প্রকৃতই অপ্রাকৃতীন পুণ্যফল।

সকলে।—তাঁর আগমনে আমরা এই অভিনন্দন দেবো স্থির করেছি (পাঠ)

অন্নের শুভ্রতা মুক্তার কান্তি
হিমালয়ে অরুনিমা, সিন্ধুর শান্তি
হরিণীর অক্ষি হে, মধুপের গুঞ্জ
এলো হরি পদ ধৌতি, পাপিমাত ভঞ্জ।
অমরাইন বৃদ্ধ হে, শিশু ধ্রুব প্রহ্লাদ
নয়নের জল এলো, বুক ভরা আহ্লাদ
এলো পরাণের প্রীতি অধরের হাস্য
এলো মধু উচ্ছল সখ্য ও লাস্য।

যবীন নাট্যকাশে উল্কা-বেগে আসিয়া যিনি স্বীয় প্রতিভাবলে রঙ্গ-মঞ্চে যুগান্তর আনিয়া দিয়াছেন—

নাট্য-শিল্পের নবীন-যাদুকর

শ্রীযুক্ত রাধিকানন্দ মুখোপাধ্যায়

নাদির শাহ্ নাটকে
প্রধান ভূমিকায় রাধিকানন্দ :—
"হিন্দুস্থানের পরপারে অমূল্য রত্নের ভাণ্ডার দুনিয়ার মুকুটমণি ওই হিন্দুস্থান—
"আমার—আমার—আমার।"

পেলারামের স্বদেশিতা-নাটকে প্রধান চরিত্রে রাধিকানন্দ :—
ঐ বাদামতলায়···বসে কত উল্লত বাজিয়ে গান গেয়েছে, —"ফাঁকী দিয়ে প্রাণের পাখী উড়ে গেল"—মনে পড়ে মাষ্টার ?

চন্দ্রগুপ্ত নাটকে
এ্যান্টিগোনাস-চরিত্রে
রাধিকানন্দ :—
"পিতা—পিতা কে ?
বল নারী আমার পিতা কে ?"

বারাণসী হিন্দু-বিশ্ব-বিদ্যালয়।

এসো ফুল রসফুল এসো যৌবন নিত্য
কমনীয় রমণীয়, এসো ভীম ভীষ্য।
এসো গান এসো প্রাণ এসো পুণ্য গন্ধ
বিশ্ব মধুপ এসো, ঘরে মকরন্দ।

(স্ত্রীর প্রবেশ)

মন্ত্রী।—তোমরা এখানে অসময়ে গীত-বাদ্যের আয়োজন কি জন্য করছো? মহর্ষি গালব কোথায়?

১ম শিষ্য।—তিনি মহর্ষি মাধবকে প্রত্যুদ্গমন করবার জন্য গিয়েছেন। এ সভা মহর্ষিকে অভিনন্দন দেবার জন্য আহূত হয়েছে, আপনারও ত নিমন্ত্রণ হয়েছে।

মন্ত্রী।—তা হয়ে থাকবে কিন্তু আমার জন্য গুরুতর কার্য্য অপেক্ষা করছে। এখন বাজে গোলমাল সময় নাই। বিশেষতঃ একজন বিদেশীকে এমন ভাবে অভ্যর্থনা করা রাজার ইচ্ছা কি না, তা জানলে আমি যোগ দিতে পারিবে। বস্তুতঃ আমি মহর্ষি চন্দ্রলোকের বিরুদ্ধ মত।

শিষ্য।—তিনি বিদিতের মিত্র, চন্দ্রলোকেরই মত?

দ্বিতীয় দৃশ্য—মন্ত্রণাগার।

মন্ত্রী।—মহারাজ, সংবাদ পাওয়া গেল পৃথিবীতে একটা ভীষণ যুদ্ধ হয়ে গিয়েছে।

রাজা।—পৃথিবী বহুকালের পুরাতন। তবেছি সেখানে সভ্যতার আলোকও অনেকদিন প্রবেশ করেছে, তথাপি সেই আদিম বন্য বর্ব্বরতাকে ত্যাগ করতে পারেনি?

মন্ত্রী।—বর্ব্বরতাই উর্ব্বরতার জন্মদাতা। যেখানে নূতন সৃষ্টি সেইখানেই বর্ব্বরতা। বর্ব্বরতা সৃষ্টিকে চির নবীন রাখে, পুরাতন হতে দেয় না।

রাজা।—মন্ত্রী আমাদের এই চন্দ্রলোক কি শান্তির স্থান, কখনো রিপুর অস্ত্রের রব শুনা যায় নাই। সৌন্দর্য্য এখানে চিরস্থায়ী আসন নির্দ্দেশ করেছে।

মন্ত্রী।—মহারাজ, সাধনা অতিথি, কুটুম্ব, সে স্বাভাবিক হলেই তার অভিনবত্ব, তার মহত্ত্ব চলে যায়, সে সাধারণ হয়ে পড়ে। এখানকার সৌন্দর্য্য মর্ম্মর মূর্ত্তির ন্যায় কঠিন নীরস, এতে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করতে পরমকে কুৎসিতকে উদারকে গোড়ায় করে আনতে হবে।

রাজা।—এমন প্রশান্ত শান্তির মধ্যে তুমি কি চাতুরীর অট্টহাসি আনতে চাও? আমার প্রজাবর্গ যে তাতে বাধা দেবে।

মন্ত্রী।—আপনার প্রজারা অর্থের ও শক্তির প্রাচুর্য্যে অন্ধ ও অধীর হয়েছে, তারা ভূমণ্ডলকে তাঁটায় ভাব গড়িয়ে নিয়ে ভেঙ্গে চায়।

রাজা।—তাদের আরও শিক্ষা বিস্তারের আবশ্যক, প্রজার মধ্যে মূর্খের প্রাবল্যই ইহার কারণ।

মন্ত্রী।—আমার মনে হয় মূর্খ গড়বার জন্য বিদ্যালয়ের আবশ্যক হয়েছে। সেই সরল সুখময় মূর্খ আর নয়ন গোচর হয় না। কর্ম্মক্ষেত্রে সেই ফুলভরা আগাছার অভাবে ক্ষেত্রের অর্দ্ধেক সৌন্দর্য্যহানি হয়েছে। জ্ঞানীর চেয়ে জ্ঞানকে বড় করে দেখতে বিদ্যালয়ের চেয়ে বিদ্যাকে সম্মান করতে এক মূর্খেরাই জানে; ওই যে চন্দ্রাতুর আসছে রাজসভার বিদূষক, মূর্খ হলেও কবি। এসো চন্দ্রাতুর, মহারাজকে তোমার গীত শুনাও।

চন্দ্রাতুর।—মহারাজ এই সদ্যরচিত নিষ্ফলা গীত শ্রবণ করুন।

বৃথায় করিনু ভোগ দিনটা।
উঁসো আঙুরের থলো
চলে গেল এলেবেলো,
গ্রীষ্মের ছোট্ হল বিষের নিমটা।
গেল সিরাজীর সাজ
হীরা লিলা সোরাজ
বৃন্তের মাঝে এলো বিষের তিমটা।
একি ভোগ ব্যভীপাতে
পেনু আমি পাতি' হাত
অধরে ছোঁয়াই অধর ভিজটা।
বৃথায় করিনু ভোগ দিনটা।

রাজা। চমৎকার, মন্ত্রী, সৌন্দর্য্যে প্রাণপ্রতিষ্ঠা করবার জন্য তুমি সিংহকে আহ্বান করতে চেয়েছিলে, করতে হবে না, সে আপনি এসেছে। মূর্খের জন্য বিদ্যালয়ও সম্প্রতি দরকার হবে না, অভাব হতে বিলম্ব আছে।

চন্দ্রাতুর। মহারাজ, অবহিত শ্রবণ করুন, এটা একটা বিয়োগ গাথা।

নামটী তাহার সাতকড়ি,
সঙ্গীতেতে হয়নি তাহার
একেবারেই হাত খড়ি।
কিন্তু তাহার নূতন সুরে
ফুটতো শ্রোতা তখন ঘুমে

গাইত একাই মিষ্টি গলায়
আসরখানা মাৎ করি।
ছুটতো না'ক লাল কি ঘড়া
ছুটতো কেবল ছন্দ ছড়া
হঠাৎ গেল ছুটকে কোথায়
জীবন ভুলো কাৎ করি।

রাজা। সত্যিই বেচে, এ যে মনের অন্তরতম ঘুচকে কান্না আন্‌ছে।

চন্দ্রাদার। মহারাজ—মহর্ষি নারদ এসে এখানে উপস্থিত হয়েছেন। আমি দেশের কবি, আমাকে রাজকবি করে নিন্।

রাজা। করতে হবে না, আপনিই হবে। এত প্রতিভা বৃথায় যেতে পারে না। তবে তোমার গাধায় মানুষের মত ছুটকাবার চেষ্টা করো না।

মন্ত্রী। এ সব কবিকে রাজসম্মান দেওয়া দরকার, এরা দেশের মর্ম্মস্থলের সংবাদ রাখে। এরা সমীর প্রাণ, সহরের প্রহসন, এরা চন্দ্র সূর্য্যে মিলনের বিরোধী। জাতীয়তার উপাসক—লিখেছে—

"চন্দ্র যেমন পশ্চিমেতে সূর্য্য যেমন পূর্ব্বে
ঠাণ্ডা গরম প্রাণ দুখানা কোন সোহাগায় জুড়বে?"

এদের কাছে মহর্ষি নারদ তুচ্ছ।

রাজা। মহর্ষি নারদকে কেন কোন উপযুক্ত রাজসম্মান দেওয়া হয় নাই? তিনি বিশ্বপূজিত কবি, প্রকারান্তরে তাঁকে অপ্রাহ্যই করা হয়েছে।

মন্ত্রী। কথার ও সুরের বিদেশী বুদবুদি ওয়ালাকে রাজা আর কি পারিতোষিক দিবেন? বালকের করতালিই তার শ্রেষ্ঠ প্রাপ্য। তা তখনকার জনসাধারণ যথেষ্ট দিয়েছে।

তৃতীয় দৃশ্য—বৃক্ষ বাটিকা।

চন্দ্রপ্রভা :—

কোথায় আছহে তুমি অচেনা?
তুমি যে সুদূর বনে
মন আরও দোরে চলে
সে যে গো নিকট দূর নাহি না।
দুর্লভ তুমি হায়
প্রাণ তাই আরও চায়
পিয়াসা যাচেই বই ঘোচে না।
উদাসীন প্রাণপাখী
কেরে তব মন ডাকি
বিটপীর বুকে নীড় রচেনা।

সখি নারদ ঋষি যে ভাষের বাণী শুনিয়ে গিয়েছেন, তাঁর চরণেই আমি সমস্ত অর্পণ করেছি। তিনি কি সত্যই আশাতীত, ভবিষ্যবাক্য কি মিথ্যা হবে? দেখ সখি আমার রোপিত লতায় পুষ্প সমাগম হল, কই ভাষের নাগাল ত পেলাম না?

কুহেলি। ভাষ কে সখি?

চন্দ্রপ্রভা। সখি, ভাষ এই বিশ্বের মূর্ত্তপ্রেম, মূর্ত্ত যৌবন, কিশোরের চিরকৈশোর। সংসারের জীর্ণদেহে আনন্দ জোয়ার। অনুরাগীর প্রাণের চিরবসন্ত।

কুহেলি।—তাই বুঝি সখি অতিমাত্র আগ্রহে রুক্ষ-চূড়া ও মাধবীকে নিরীক্ষণ করছো?

চন্দ্রপ্রভা।—না সখি, আমাকে এই প্রবলতম প্রজাপতি জ্বালাতন করছে।

কুহেলি।—প্রজাপতি বড় রসিক, মধুলোলুপ জিনিষেরই সংবাদ নিয়েছে।

(বৃক্ষান্তরালে চন্দ্রাপীড়)

চন্দ্রাপীড়।—(স্বগত) ঠিক এমনি সময়েই এক মধুকরের সহায়ে রাজা দুষ্মন্তের শকুন্তলা লাভ হয়েছিল, আজ প্রকাশের এই সুযোগ্য সময়। না, একটু অপেক্ষা করা যাক্। কই দক্ষিণ বাহু ত এ পর্য্যন্ত স্পন্দিত হলো না অকারণে কতবার হয়।

চন্দ্রপ্রভা।—সখি কে এখানে অলক্তগুলি এমন করে ফেলে গিয়েছে?

চন্দ্রাপীড়।—(স্বগত) যখন গুলির কথা উঠেছে তখন আর অপেক্ষা করা চলে না। গুলির সহিত 'যোমার' আমদানী অসম্ভব নহে। বৃক্ষবাটিকাই যে ঐ সকল দ্রব্যের গুপ্তাগার। (প্রকাশ্যে) কে এই চন্দ্রালোকে সেনাপতি চন্দ্রাপীড় বিদ্যমান থাকতে বৃক্ষবাটিকায় গুলি নিক্ষেপ করে? শাস্তি তার জন্য অপেক্ষা করছে।

চন্দ্রপ্রভা।—(ভীত হইয়া) সখি কে ও লোকটা আমার প্রতি মর্ত্তলোকী দৃষ্টি নিক্ষেপ করে উপস্থিত হলো, উহাকে অনুগ্রহ করে যেতে বল।

কুহেলি।—মহাশয়, গুলি নয়, আমাদের সখি ফুল-

গুলির কথা বলেছিলেন। ধন্যবাদ, আপনি যেতে পারেন।

চন্দ্রাপীড়।—(প্রস্থান করিতে করিতে) মাঃ, এ কাব্য মাইকের কথা একেবারেই সত্য নয়। কোথায় পদ্মজল ছায়ার বেদিকা, কোথায় বা কুরুবক শাখা, বেতস কুঞ্জ, একটা মত্ত হস্তীর আগমন জ্ঞাপনও নাই। খাসুকা প্রত্যাখ্যান। চন্দ্রাতুরের কপায় কি নির্ব্বোধই সাজা গেল।

[প্রস্থান

চন্দ্রপ্রভা।—সখি দেশে যুদ্ধের আয়োজন হচ্ছে। স্বর্গের, সৌর্য্যের বাণিজ্যের পরিণাম কাটাকাটি। আমি চাই সেই চিরশান্তকে; আমি বড়ই দুরাকাঙ্ক্ষিনী।

কুহেলি। সখি ধৈর্য্য ধর, তিনি যে মহাব্রতে, তোমার মত কত তাঁকে আরাধনা করছেন।

চন্দ্রপ্রভা।—তাই বটে—

"তোমার অনেক আছে আমার কেবল তুমি যে"

[অশ্রুমোচন।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য—প্রাসাদ বাতায়ন।

সমবেত জনমণ্ডলী।

রাজা।—ধূমকেতু অশীম শক্তি সঞ্চয় করে আমাদের এই চন্দ্রলোকের উপর হানা দিতে আসছে। তাকে বাধা দিতে বিপুল স্বার্থত্যাগ ও ধৈর্য্যের আবশ্যক। আমরা যুদ্ধের বিরোধী, যুদ্ধজয় তরবারি নিষ্কাসিত করি নাই কিন্তু যখন করা হইয়াছে তখন তাহা সসম্মানে খাপে রাখতে পারি তার চেষ্টা প্রত্যেক প্রজাকেই করতে হবে। আজ রাজা প্রজা ভেদ নাই, আমরা সকলেই চন্দ্রলোকের অধিবাসী; একপ্রাণে শত্রুকে বাধা দিতে হবে। ভয়ে ভীত বা অত্যাচারে অধীর হলে চলবে না।

নাগরিকগণ।—আমরা প্রাণের রক্ত দিয়ে, অর্থ দিয়ে, সর্ব্বস্ব দিয়ে চন্দ্রলোকের সম্মান স্বাধীনতা রক্ষা করবো। জয় মহারাজের জয়।

মন্ত্রী।—এই বিরাট চন্দ্রলোক, যার রশ্মি বিরাট ব্রহ্মাণ্ডকে আলোকিত করছে, সে ধূমকেতুকে কেবল শিক্ষাই দেবে না; ব্রহ্মাণ্ডকে দেখাবে শান্তিপ্রিয় চন্দ্রলোক কি ভীষণ ভাব ধারণ করতে পারে।

নাগরিকগণ।—জয় মহারাজের জয় (মহোল্লাস)

দ্বিতীয় দৃশ্য—চন্দ্রাপীড়ের কক্ষ।

চন্দ্রাতুর।—প্রাণের কাছে বাজিয়ে গেল
কণক শিঞ্জিনী
বেণুটী করে রেণুটী কাণে
বাজছে রিন্ রিনি।
নিভলো স্মিত তড়িত লতা
ভাবছি বসে তাহার কথা
ঘণ্টাঘরে ঘরলো পাখে
ঘরলো রিন্ রিনি।

চন্দ্রাপীড়। সখা গীত থামাও, ঠেকে শিখলাম, কাব্য একেবারেই বস্তুতান্ত্রিক নয়। লক্ষ্যের মর্ম্ম বিদ্ধ করলে দ্রৌপদী স্বয়ম্বরা নিয়ে আসে না। কুষ্ঠী সেজে থাকলেও রাজকন্যা স্বয়ম্বরের বরমাল্য দেয় না। কুক্ষণে মহর্ষির আগমন হয়েছিল, চন্দ্রলোকের নেত্র-কৌমুদী ভ্রাতের জন্য ব্যাকুলা, চন্দ্রলোকের রাজলক্ষ্মী উন্মনা।

চন্দ্রাতুর।—সখা গীত দিয়ে বিশ্বকে আঘাতে ছেয়ে যাও।

চন্দ্রাপীড়।—গীত, গন্ধ, আলো, সবই মিশেছে সেই প্রেমে, প্রেম স্রষ্টার নব সৃষ্টি, জীবনকে নূতন করে ভেঙ্গে-চুরে গড়ে দেয়, অনাস্বাদিত সৌন্দর্য্য এনে বিশ্বকে মনোরম করে সাধারণকে অসাধারণ, ধূলিকে ধূলিত করে।

গীত।

সেফালির বেশ দেখে যায়
ঢেল্ করে ওই বলছে অলি,
কোথা সে সন্ধ্যেতারা কণক বোটা
কোথায় তোমার রূপ রূপালি
নিশি ও শিশির কণা আর দেবে না
ধূলায় মাঝে গন্ধাঞ্জলি
সুরভির ভিড় কমেছে শির নমেছে
এমন গরব যায় বিফলি।

(মরাল মুখীর প্রবেশ)

মরালমুখী।—মহিষী আপনাকে আমন্ত্রণ করলেন, অন্ত অন্তঃপুরে 'ভাঁজো' হবে।

চন্দ্রাপীড়।—চিত্তবিনোদনের এত উপায় বিদ্যমান থাকতে মহিষীর 'ভাঁজো'তে অভিরুচি হল কেন?

মরালমুখী।—কথায় ব্যঞ্জনায় ও সুরের মূর্চ্ছনায় ভাঁজো অপূর্ব্ব।

চন্দ্রাতুর।—সুরই বিশ্বের প্রাণ, তাই সুরলোকের এত সম্মান, সুর কথাকে অনন্তের দিকে নিয়ে যায় কাব্যে বাটীতে আঘাত করুন, সেযেন সুর ধীর পদক্ষেপে অনন্তের দিকে গমন করছেন। (আগামীবারে সমাপ্য)

দ্বাদশ গোপাল

(পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পরে)

১০

আমার উপন্যাসের নায়কটির মত যদি কোনও পাঠককে তৃতীয় শ্রেণীর রেল-কামরায় ঢুকিতে হইয়া থাকে, তিনি নিশ্চয়ই বুঝিবেন, সে কি দুর্ভোগ! এ আবার চলন্ত গাড়ীতে; বেশীর-ভাগ আরোহী সব গয়া এবং ছাপরা জিলায়, সেখানে পশ্চিম অঞ্চলের গাড়ী। গাড়ীর মধ্যে বিষম হৈ-চৈ বাঁধাইয়া ডাকুর শুয়ে কাণ মাথা চাদরে মুড়িয়া এমনই আড়ষ্ট জমাট হইয়া বসিল যে, তাহাদের ঠেলিয়া সরাইয়া একটু যে স্থান করিয়া লইবে সে সুযোগও নাই। ওদিকের একটা বেঞ্চের কোণে এক বিধবা নারী একটি শিশুপুত্রকে পার্শ্বে শোয়াইয়া দিয়া কাও দেখিতেছিলেন, বিমান সে দিকে চাহিবামাত্র, তিনি মিশ্রিত শিশুটিকে অঙ্কোপরি তুলিয়া লইতে-লইতে বলিলেন—এইখেনে এসে বসুন, বাবা!

কৃতজ্ঞতার অশ্রুটি ওরাইয়া লইয়া বিমান বেঞ্চটা উপকাইতে বেঞ্চে পা তুলিয়াছে, খোঁয়াটি এমনই বিকট আর্ত্তনাদ করিয়া গাড়ীশুদ্ধ লোকের তন্দ্রা ভাঙিয়া দিল যে বিমানের আর কোথাও যাওয়া হইল না। ডাকু যদি আবার চলা-ফেরা করিতে থাকে, কাহার না ভয় হয়? তার আবার ছাতু-কোজী! বাকী সময়টা সে দাঁড়াইয়া কাটাইয়া দিবে স্থির করিয়া দ্বারের সামনে আসিতেই তাহার সহযাত্রীরা আবার যে-যার অবগুণ্ঠন টানিয়া দিয়া মিটি মিটি লক্ষ্য করিতে লাগিল।

এই কৌতুকের মধ্যে সময়টা চট্ করিয়া কাটিয়া গেল। ষ্টেশনে গাড়ী থামিতে ডাকু যখন সর্ব্বাগ্রে উতারিল তখন তাহার বিপক্ষে কে-কি মতলব আঁটিয়া আত্মরক্ষার চেষ্টায় ছিল—তাহাই বিবৃত হইতে লাগিল।

বিমান একখানা গাড়ী ভাড়া করিয়া উঠিয়া বসিল। গাড়োয়ান মুখে ও হাতে বিচিত্র শব্দ করিতে করিতে গাড়ী হাঁকাইয়া দিল।.....রাওড়ার পুল পার হইয়া ট্রাঙ্ক রোড দিয়া ছুটো ট্রাম লাইনের উপর দিয়া গাড়ী চলিতেছে, ঘন ঘন শব্দ অপেক্ষাকৃত অল্প; পথ প্রায় নির্জ্জন, ক্বচিৎ কোথাও দোকান-ঘরের দ্বার খুলিয়া মুদী ও মুদিনী বিক্রী-কালাপ করিতেছে, গ্যাসের নীচে, বৃক্ষতলায় বস্তা ও গাড়ী-গুলি ঘুমাইয়া ঘুমাইয়াও রোমন্থরত, বিমান ভাবিতেছিল—এতক্ষণ তাহাদের বাড়ীতে কিরূপ ঘটনা ঘটিতেছে। একটা খুব গোলমাল হইবারই কথা। কত লোকে তাহার বক্তিকের স্থিরতাসম্বন্ধে সন্দিহান হইবে, কত লোক আরও-কত কি বলিবে! আর-পটল! সে কি বলিবে? সে কি আজ বলিবার অবসর পাইবে? আজ—আজ জীবন-যৌবনের প্রথম বিকাশ দিনে, আজ ইহকালের প্রথম মিলন রাত্রে—পটলের মনে কি অন্য লোকের কথা স্থান পাইবে? আজ কি কেহ তাহাকে মৃদু বাতাসে ফুলের কলিটির উন্মোচনের মত ধীর সলাজ হাসি দিয়া ভুলাইবে না? কণ্ঠে সুধাভাণ্ড গোপন করিয়া কেহ তাহার অমৃত স্বরে তাহাকে ডুবাইয়া দিবে না? আজ কি সে এই কথাটাই নীরবে, বুকে-বুকে মনের ভাষা দিয়া তাহাকে বলিবে না, আজ হ'তে তোমার চিন্তা এই; আমার চিন্তা আই! আজ থেকে তুমি কেবল আমার, আমিও তোমারি!...তবে কোন্ দিন জীবনে এমনই কতকগুলা কথা, কতকগুলি দৃষ্টি সে শুনিয়াছিল, দেখিয়াছিল, দুঃস্বপ্নের মতই সেগুলি তাহার মনে জাগ্রত হইয়া উঠিল! বিমানের মনে আছে, উত্তরে তাহার অকাতর দান ও সে গ্রহণ করিয়াছিলই, নিজের যা-কিছু আপন ছিল তাও অকুণ্ঠিত-হস্তে দিয়া ফেলিয়াছিল।

গাড়োয়ান স্বপ্ন ভাঙিয়া দিল। গোটাকত এমনই উদ্ভট স্থানের নাম করিল, বিমান যাহা কোনকালে কাণেই শুনে নাই। গাড়ীভাড়া করাইবার সময় সে যে বিমানের সেসের ধরচাটি পর্য্যন্ত জানা আছে বলিয়াছিল বিমান তাহা ভুলে নাই, মনে মনে হাসিয়া সোজা পথটি বলিয়া দিল।

বাবুঠাকুর এত রাত্রে জমাল ছুটিয়াছে ভাবিয়া অত্যন্ত মুষড়িত হইয়া পড়িয়াছিলেন, ভৃত্য তাহাকে নির্ভয় করিয়া দিয়া বলিল—বিয়ে বাড়ী থেকে আসছেন বাবু, তোমার যেমন বিদ্যে ঠাকুর! উঠে বস্যা...

ঠাকুর জানি-না কেন জাতি-বর্ণের উল্লেখ সহ্য করিতে পারিতেন না, চটিয়া ঘটিয়া চাকরটাকে ধমক দিয়া শুইয়া পড়িলেন।

যাহাকে লইয়া এতক্ষণের মধ্যে এই তর্ক আলোচনা চলিতেছে সে সেই মুহূর্ত্তে যে কতদূরে অবস্থান করিতেছিল বলা যায় না। তাহার মনে পড়িতেছিল, দশ বছর আগেকার কথা। শ্রীবিয়োগের পর বুদ্ধু পীড়িত ছেলেটি তার কোথা হইতে কেমন করিয়া এই সুচারু দর্শন লৌহ কিশোর টির উপর গিয়া পড়িয়াছিল। সেই প্রথম দর্শনেই অন্তর্ভেদী

একটা তীব্র দৃষ্টিপাতে তাহার স্নেহাসক্ত অন্তঃকরণের সবটাই দেখিয়া লইতে পারিয়াছিল। কি বিষম ভুল দেখাই সে দেখিয়াছিল! হৃদয়ের ছায়ামাত্র যেখানে নাই আশ্রয়হীন হৃদয় তাহার সেই খানেই আশ্রয় মাগিতে গিয়াছিল। এ কি ভ্রান্তি!—নিগৃঢ় দিনের ভুলটার আশা যে এত তীব্র, এত হৃদয়ভেদী হইতে পারে ইহাও যে কল্পনাতীত! অথচ কি অভিনয়ই না করিয়াছে! কি ধরণাটাই না চালাইয়াছে! অনুশোচনায় বিমান মৃতপ্রায় হইয়া গেল। ছি ছি কোথায় বাটিয়া করিয়াছে, জীবন্ত পাষাণদেবতার কাছে! তাও আবার এতদিন, এতকাল ধরিয়া!

কিন্তু তাহার সান্ত্বনা আছে। সে মাটীর বিগ্রহ জানিয়া কোন দিনই সেবা করে নাই, পূজা দেয় নাই—মানস-নেত্রে তাহার দেবতার মূর্ত্তিই জাগরূক ছিল, তাহার সেবা পূজা যা কিছু সে দিয়াছে, বিগ্রহ-পদতলে দিয়াছে, সে দেবতারই উদ্দেশে! কেমন করিয়া জানিবে, মানুষ এত হৃদয়হীন হয়! কেমন করিয়া বুঝিবে সেই সুন্দর মুখ, দীর্ঘ দৃষ্টির তলে এতটুকু পদার্থ ছিল না?—

যতখানি বিশ্বাস করিয়াছিল, সবটুকুই ব্যর্থ হইয়া গেছে জানিয়া তাহার কেবলই মনে হইতে লাগিল, বিশ্বাস করাই ভুল, বিশ্বাস পাওয়া ভুল—বুঝি-বা বিশ্বাস কথাটাই একটা প্রকাণ্ড ছলনা! এই ত সে প্রাণ ঢালিয়া বিশ্বাস করিয়াছিল; সে বিশ্বাসের মর্য্যাদা ত কৈ রহিল না! এক দিনে, এক মুহূর্ত্তে এক কথায় সে হিমাচলের শিখর ভাঙ্গিয়া চুরিয়া ধূলায় লুটাইল! বিশ্বাস করিয়া এতখানি নিগ্রহ হইবে জানিলে সে কি এত বড় অন্যায় করিত, না করিবার কল্পনাও করিত!

বিষমগতের অভিধান হইতে বিশ্বাস কথাটিকে লোপ করিয়া দিবার চেষ্টায় বিমান যখন অতিমাত্রায় তৎপর হইয়া উঠিয়াছে, তখন তাহার মনের কোন্ গোপন অংশে থাকিয়া কে তাহাকে জানাইয়া দিতেছিল যে তাহার জীবন বিফল হইলেও এমন লোকের অসদ্ভাব নাই যাহারা বিশ্বাস করিয়া না দিতিয়াছে! বিশ্বাস যদি উপযুক্ত পাত্রে ন্যস্ত হয়—সে কি কখনও ছুটে! এত অস্থায়ী সকল সে সামগ্রী নয়!

মনে আছে, শ্রীরামপুরের বাসর গোপালের বেলায় দিন—সেই মেয়েটা লাজের লোকের অনুরোধ উপরোধ কাকুতি-মিনতি ভিক্ষ করিয়া ঠেলিয়া তাহার একটা ইঙ্গিতে, একটা কথায় বিশ্বাস করিয়া তাহারই হাত ধরিয়া ভিক্ষের বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল! সে ত অবিশ্বাস করে নাই! সে ত ভাবে নাই এ তাহাদেরই একজন, যাহারা তাহাকে অনন্ত দুখে, রাজার হালে রাখিবে, এই আশ্বাসই বার বার দিতেছিল! আর পাকল বিশ্বাস করিয়া ঠকে নাই ত! বিমান কি প্রাণ থাকিতে তাহাকে প্রবঞ্চনা করিতে পারিত? মেয়েটিও তাহা বুঝিয়াছিল, নহিলে আসিবে কেন?—তবে বিমানেরই বুঝিবার ভুল? পটলকে সে এত ভুল করিয়াছিল?—মন তাহার সহস্রবার সম্মতি দিলেও সেকথা মানিয়া লইতে বিমানের বুক ভাঙ্গিয়া যাইতে লাগিল।

ক্রমশঃ

সঙ্গীত ও মাধুরী

(শ্রীকালিদাস রায় বি,এ)

ফুলের সুবাসে
মাধুরী করিল
দান।
কুসুমের বনে
গাহি গুঞ্জনে
প্রীতি,
অলি মৃদু-মধু
মধুর করিছে
মিতি।

গুণ গুণ গানে
গাহিয়া মোহন
কাণে,
গোপের দুলালী
গোরসে মাধুরী
ঢালে।
যুগ যুগ ধরি
গাহিয়া প্রেমের
সুর।
কবিয়াছে কবি
প্রেমে এত
সুমধুর।

স্বামী বিবেকানন্দ

(শ্রীবলাইদেব শর্মা)

রামকৃষ্ণের জীবন পথভ্রষ্ট উচ্ছৃঙ্খল পাশ্চাত্য মোহ মোহিত যুবকগণের ভিতরে একটা পরিবর্ত্তন আনিয়াছিল। যে সব শিক্ষিত যুবক প্রতিকোপাসনাকে পুত্তলিকা পূজা বলিয়া ঘৃণা করিত, যাহারা নিষ্ঠা—সদাচারকে কুসংস্কার বলিত, ভক্তির অভিব্যক্তি যাহাদের কাছে ছিল মানসিক দুর্ব্বলতা—গুরুবাদকে যাহারা নিতান্তই অবহেলা করিত তাহারাই দক্ষিণেশ্বরের কালি মন্দিরে রামকৃষ্ণের পদপ্রান্তে বসিয়া নিজেদের ধন্য বোধ করিতে লাগিল। আচার্য্য কেশবচন্দ্র বিজয়কৃষ্ণ প্রভৃতি যাঁহারা ইউরোপের পদাঙ্কেই আদর্শ করিয়া ধর্ম্মানুশীলন করিতেছিলেন তাঁহারাও এই প্রতিমা-পূজক পাশ্চাত্য শিক্ষায় ধর্ম্ম জ্ঞানহীন ব্রাহ্মদের কাছে ভক্তি ও ত্যাগের আদর্শ লাভ করিয়া ধন্য হইয়াছিলেন।

ইংরাজি শিক্ষার পূর্ব্বাবস্থায় যেমনই থাকুক; উহার প্রচলনের পর জনসাধারণ ব্যতিত শিক্ষিত বা অভিজাত সম্প্রদায় ধর্ম্মচর্চ্চা সাধুসঙ্গকে বড়ই অবজ্ঞা ও অবহেলা করিতেন। সাধু সন্ন্যাসী অধিকাংশ স্থলেই লোকসাধারণ দ্বারা পূজিত হইত। কিন্তু রামকৃষ্ণের আবির্ভাবে ঘটনাটি পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল। রামকৃষ্ণের সাঙ্গোপাঙ্গ রামকৃষ্ণের শিষ্যবৃন্দ সকলেই শিক্ষিত ঐশ্বর্য্যবান অভিজাত সম্প্রদায়। রামকৃষ্ণের ধর্ম্ম মত সর্ব্বাগ্রে এই ক্ষেত্রেই প্রচারিত হইয়াছিল।

ইহার একটু বিশেষ কারণ আছে। পরাধীন-যুগের পর দেশের যে আত্ম-স্বাতন্ত্র্য সুরু হইতেছিল, তাহা প্রধানতঃ শিক্ষিত সম্প্রদায়ের দ্বারাই। কৃষ্ণচন্দ্র জগৎশেঠ যেমন রাজশক্তিকে আহ্বান করিয়াছিলেন তেমনই পরবর্ত্তী কালে জাতির বাঁধারা নেতৃস্থানীয় তাঁহারাই জাতীয় ধর্ম্ম বিসর্জ্জন দিয়া পাশ্চাত্য সভ্যতাকে বরণ করিয়া লইলেন। ইঁহারাই দেশের আচার ব্যবহার যা কিছু সবকেই ঘৃণ্যতার চক্ষে দেখিয়া পশ্চিমের শিক্ষায় দীক্ষিত হইলেন। যেখান হইতে জাতির ধর্ম্ম সেই স্থান হইতেই গঠন আবশ্যক। ভারতের জনপ্রকৃতি চিরদিনই সাধুসন্তের প্রতি শ্রদ্ধা করিয়া আসিয়াছে, রামকৃষ্ণ যদি কেবল তাঁহাদের দ্বারাই পূজিত হইতেন, তবে বিশেষ যে কিছু হইত তাহা নহে। জনসাধারণ যাহাদের নেতৃত্বে পরিচালিত, যাহাদের আদর্শ অনুসরণ করিয়া তাহারা অগ্রসর হয় যাহাদের আচার আচরণ শিক্ষা সভ্যতা সমাজকে নিয়ন্ত্রিত করে তাহাদেরই সংস্কার আবশ্যক হইয়াছিল। কারণ সমাজের শ্রেষ্ঠ অংশই পাশ্চাত্য ভাবে সর্ব্বপ্রথমে মুগ্ধ হইয়া জাতির সর্ব্বনাশের সূত্রপাত করিয়া রাখিয়াছিলেন।

যে যুগ প্রবর্ত্তনার জন্য রামকৃষ্ণের আবির্ভাব তাহার উপযুক্ত পাত্রই সেই সময়ের শিক্ষিত সাধারণ। এই কারণেই দেখা যায় পুরোহিত মূর্ত্তি পূজক ব্রাহ্মণের চরণতলে বসিয়া দেশের পরিষ্কার অংশই ধর্ম্ম দীক্ষা—লইতেছে।

দেশ ধর্ম্মকেও সভ্যতার একটা অংশে বলিয়া গ্রহণ করিয়াছে—ধর্ম্ম সাধন ও চলিতেছে তাসা তাসা নিতান্তই সৌখীন ভাবে। গির্জ্জার ছাঁচে বসিয়, খৃষ্টীয় সাপ্তাহিক উপাসনার অনুকরণে উপাসনা কিছুরই ত্রুটি নাই ইউরোপের নিরাকার বাদের মতই অবিশেষ ব্রহ্মের পূজা সবই চলিতেছিল কিন্তু একটা বস্তু ছিল না তাহা সত্য।

ধর্ম্মের যাহা ফল তাহাই ফলিতেছিল না, মানুষের অন্তরে শুদ্ধি ছিল না, আর ছিল না শান্তি। ধর্ম্ম সাধন বাহ্যিক ভাবে চলিত বলিয়া সাধকের অন্তরাত্মা নিতান্তই তৃষিত হইয়া উঠিয়াছিল। মর্ম্মে মর্ম্মে মানুষ—পীড়িত হইতেছিল। এ পথ নয় এ পদ্ধতি নয়।

এই অসিদ্ধির অভিব্যক্তি মূর্ত্ত বিগ্রহ যেন বিবেকানন্দ। সকলে গতানুগতিক ভাবে চলিতে লাগিল; কিন্তু বিবেকানন্দ তাহা পারিলেন না। পারা তাঁহার পক্ষে একান্তই অসম্ভব। তিনি যে যুগ প্রবর্ত্তক। তিনি যে আনিয়াছেন জড় জাতির অন্তরে জাগরণ আনিতে। তাই নিরাশ-দগ্ধ অসিদ্ধ জিজ্ঞাসু বীর, সাধক আচার্য্যকে শুধাইলেন—"ঈশ্বর আছেন? আপনি প্রত্যক্ষ করিয়াছেন?" উত্তর মিলিল না।

এই উত্তর পশ্চিমের পদানুসারী জড় সভ্যতার সেবক বাসনা-পরায়ণ কাহারও কাছে মিলিতে পারে না, বিবেকানন্দও পাইলেন না। এ জিজ্ঞাসাটি যেন একটা রূপক। বিবেকানন্দের মূর্ত্তিতে পাশ্চাত্য সভ্যতায় সেবক ভারতবর্ষের ইউরোপের কাছে ধর্ম্ম জিজ্ঞাসা আর ঐ বিফলতা যেন নব সভ্যতার পরাজয়।

ভারতবর্ষের সাধনাতেই কেবল এ উত্তর পাওয়া সম্ভব। ভারতেরই অন্তরবাণী "শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রা"—আমি তাঁহাকে প্রত্যক্ষ করিয়াছি, আমি অমৃত লাভ করিয়াছি,

তোমরাও এই পথকে অনুসরণ করা ইহা ব্যতীত আর অন্য পথ নাই।

বিবেকানন্দ উত্তর পাইলেন রামকৃষ্ণের কাছে। আত্মপ্রত্যয় ধ্বনির মতই অন্তরবাসী উদ্গীত হইল—"হাঁ ঈশ্বর আছেন আমি তোমায় প্রত্যক্ষ করাইব।", পথভ্রষ্ট ভারত পথ পাইল আত্মসংস্থ হইল। বিবেকানন্দকে দীক্ষিত করিয়া রামকৃষ্ণ অবতারের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইল।

বিবেকানন্দ ঠাকুর রামকৃষ্ণের শক্তিলাভ না করিলে হইতেন হয়ত একজন বিশেষ প্রতিভাবান বক্তা রাজনৈতিক মনীষী। তাহা হইলে তিনি স্বামী বিবেকানন্দ হইতেন না। তাঁর আগমন অসিদ্ধ হইত।

স্বামী বিবেকানন্দ ভারতের নব জাগরণের অগ্রদূত। তিনি আসিয়াছিলেন ভারতকে আবার পূর্ণ গৌরবে সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে।

ভারতের প্রধান ব্যাধি পরাধীনতা এবং এই পরাধীনতা রাষ্ট্র অপেক্ষা মনোরাজ্যেই অধিক। আর ইহারই ফলে ভারত ধ্বংসের অভিমুখে অগ্রসর হইতেছে। রাজশক্তি হস্তান্তরিত, কিন্তু জাতির যে আদর্শ তার থাকিলে আবার রাষ্ট্রীয় স্বাতন্ত্র্য ফিরিয়া আসিতে পারে; তাহা অন্তর্হিত। জাতির অন্তরটি, পাশ্চাত্য ভাব মিমুগ্ধ, এবং যাহারা উহার অগ্রণায়ক, তাহারা দেশের আচার ধর্ম কর্ম সভ্যতা সকলই পরিত্যাগ করিয়াছেন কেবল ত্যাগ নহে তাঁহারা উহা ভাঙ্গিবার জন্য উদ্যত। স্বামী বিবেকানন্দ এই শ্রেণীভুক্ত এবং তিনিই এই দাসত্বের মোহ হইতে জাতিকে উদ্ধার করিয়াছেন।

ভয়ার্ত পশুরাজ :—
"আমি ভয় পেয়েছি ভারি।"

লাউসেন

অষ্টম অধ্যায়

মহামদের দুর্বুদ্ধি—কর্পসেনের অপমান

রাজা গৌড়েশ্বর, পাত্র-মিত্র, জ্ঞাতি-বন্ধু, বার-ভূঞা ইত্যাদি বহু স্বজনগণ ও সভাসদাদি পরিবেষ্টিত হইয়া, শ্রীমদ্ভাগবত পুরাণ শ্রবণ করিতেছেন। বসুদেব, কংস-ভগিনী দেবকীকে বিবাহ করিয়া যথাযোগ্যরূপে প্রত্যাগমন করিতেছেন—কংস, ভগিনীর প্রিয়কামনায়, অশ্বরশ্মি গ্রহণ করিয়া রথ চালনা করিতেছিল—এমন সময় পথিমধ্যে, এক অশরীরিণী বাণী, তাহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন—'অরে অধম কংস, তুই যাহাকে বহন করিতেছিস্—তাহারই অষ্টম গর্ভে তোর হন্তা জন্মগ্রহণ করিবে।' এই কথা শুনিবামাত্র খলস্বভাব কংস, তৎক্ষণাৎ ভগিনীর প্রাণবধ করিবার জন্য উদ্যত হইল এবং কেশ পাশ আকর্ষণ করিল। যখন ভাগবত-কথা এতদূর অগ্রসর হইয়াছে, তখন কর্পসেন, বিবিধ উপহার ও অনুচরবর্গ সহ রাজসভায় উপস্থিত হইয়া, গৌড়েশ্বরকে প্রণাম নিবেদন করিল।

গৌড়েশ্বর, কর্পসেনকে লক্ষ্য করিবামাত্র সাদর সম্ভাষণ পূর্ব্বক, তাঁহাকে নিকটে উপবেশন করাইলেন এবং কুশল প্রশ্নাদি জিজ্ঞাসা পূর্ব্বক বিবিধ আলাপে আপ্যায়িত করিলেন। পাত্র মহামদ, রাজার পার্শ্বে যথাস্থানে উপবিষ্ট ছিল।—যে কর্পসেনের প্রতি সে জাতক্রোধ হইয়া, জীবন প্রতিহিংসা লইবার সুযোগের প্রতীক্ষা করিতেছে—স্বয়ং গৌড়েশ্বর কর্তৃক তাহার ও সর্বজন সমক্ষে সভাস্থলে সেই কর্পসেনের এত সম্মান এত আদর যত্ন দেখিয়া, সে একবারে জ্বলিয়া উঠিল। ক্রোধ সম্বরণ করিয়া গোপন রাখিতে পারিল না—সে, সঙ্গে সঙ্গে রাজাকে সম্বোধন করিয়া বলিল—'আপনি রাজা—ভগবানের অংশ আপনাতে বিরাজমান রহিয়াছে—কিন্তু আপনি যেরূপ আচরণ করিতেছেন, তাহাতে বোধ হয়, বর্ণসঙ্কর বুদ্ধি-অন্তর্হিত পাইল! যে আঁটকুড়া পুত্রহীন ব্যক্তি পুত্রাদক নরকে আবহমান কাল বাস করিবে—আপনি, কোন্ ব্যবহার দেখিয়া অজ্ঞাতকুলশীল ব্যক্তিকে, সভামধ্যে আদর ও সম্মানাদি প্রদান করিয়া গৌরবান্বিত করিলেন? যাহার পত্নী বন্ধ্যা, এবং যাহার পাপমুখ দর্শন করিলে অন্নের পুণ্য নষ্ট হয়, আপনি সেরূপ ব্যক্তিকেও সম্মানিত করিয়া নিকটে উপবেশন করাইলেন! সত্য কথা অপ্রিয় হইলেও আমি বলিয়া থাকি—এইরূপ আমি চিরদিন। কিন্তু মহারাজ, আপনার এরূপ ব্যবহার কি সঙ্গত হইতেছে?'

গৌড়েশ্বর মহামদের এইরূপ কথা শুনিয়া বলিলেন—কি জানি, আমি অত সব কথা বুঝি না—কুটুম্ব ব্রাহ্মণকে আদর আপ্যায়িত করিলে রাজ-সম্মানের যে [illegible] তাহা জানিতাম না'—এই কথা বলিতে বলিতে রাজা সভা ত্যাগ করিয়া অন্তঃপুর মধ্যে চলিয়া গেলেন। মহামদের ক্রোধোদ্রেকের আপত্তায় রাজা, কর্পসেনের সহিত কোনরূপ বাক্যালাপ করিলেন না, বা সাধারণ অভ্যাগতের প্রাপ্য পরিচর্য্যাদিরও কোনরূপ ব্যবস্থা করিলেন না। দেখিতে দেখিতে রাজসভা শূন্য হইয়া গেল। কর্পসেন, যাহা আশঙ্কা করিয়াছিলেন, তাহাই ঘটিয়া গেল।—এই নিদারুণ অপমানে তাঁহার হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া গেল—তিনি মৃতপ্রায় হইয়া হুলহুল্ নেত্রে তৎক্ষণাৎ গৌড় পরিত্যাগ করিয়া স্বদেশাভিমুখে যাত্রা করিলেন।—মহামদের বাটী গিয়া তাহার শাশুড়ীর সহিত দেখা করা সঙ্গত হইল না।

কর্পসেন, বাটী প্রত্যাগত হইবামাত্র, রঞ্জাবতী তাড়াতাড়ি জলপাত্র লইয়া তাহার চরণ ধৌত করিবার জন্য অগ্রসর হইল। কিন্তু কর্পসেনের বিষণ্ণ মলিন বদন দেখিয়া, তাহার মন অতিশয় খুণ্ণ হইল—সে করযোড় করিয়া বলিল পিতামাতার সংবাদ পরে শুনিব—এখন আপনার এরূপ মলিনভাব দেখিয়া আমি বড়ই চঞ্চল হইয়াছি—আপনার মুখ ভার দেখিলে আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যায়—শীঘ্র বলুন আপনাকে এরূপ হইবার কারণ কি? কর্পসেন বলিলেন 'আমার যেমন পোড়াকপাল—তাহা সেইরূপ ঘটিয়াছে—রাজসভার মধ্যে, তোমার ভাই মহামদ আমার অপমানের একশেষ করিয়াছে—আমার মাথাকাটা গিয়াছে। সে আমায় 'আঁটকুড়া' এবং তোমায় 'বন্ধ্যা' বলিয়া গালি দিয়াছে—রাজাকে সর্বসমক্ষে বলিয়াছে—আমাদের মত মহাপাপী ও হতভাগাদের সহিত কোনরূপ সংস্রব রাখিলে মহাপাপ হয়—এইরূপ আরও যে কত কি বলিয়া গালাগালি দিয়াছে ও অপমান করিয়াছে তাহা আর কি বলিব? রাজা প্রথমতঃ, আমায় বেশ আদর অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন; কিন্তু মহামদের এই সকল বিদ্বেষ-পূর্ণ কথায় রাজা আমায় আর কিছু না বলিয়া অন্তঃপুর মধ্যে চলিয়া গেলেন—মহামদকে নিষেধ করিতে বা তাহার কথার প্রতিবাদ করিতে তাঁহার সাহস হইল না। রাজা চলিয়া গেলেন—রাজসভা শূন্য হইল—আমি একক আর কতক্ষণ থাকি,—চলিয়া আসিলাম। এমত অবস্থায় অবশ্য, মহামদের বাটী গিয়া তোমার পিতামাতার সহিত দেখা করা বা তাঁহাদের সংবাদ লওয়া হয় নাই। এখন বুঝ, তোমার অনুরোধ রক্ষা করিতে গিয়া গৌড় রাজসভায় আমাদের কতদূর মাথা হেঁট হইয়াছে—এত অপমান অপেক্ষা আমাদের মরণই ভাল। যাহা হউক, এখন হইতে তাহাদের প্রতি আমার আর কোন সম্বন্ধই রহিল না—ইহা ভিন্ন আমাদের আর কি উপায় আছে?'

রঞ্জাবতী, স্বামীর কথা শুনিয়া স্তম্ভিত হইয়াছিল। কিছুক্ষণ পরে দীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিল—'আমারও সেই কথা—আজ হ'তে আমি ও-পথে কাঁটা দিলুম—বিধাতা যদি কখনও মুখ তুলে চান, তবে এ সকল অপমানের কথা শুনিব—[illegible] গেলের মত আমার রাজরাজেশ্বর পুত্রকে দেখিয়া [illegible] এত অপমান, এত লাঞ্ছনা হইবে, তাহা স্বপ্নেও ভাবি নাই। আমি অবোধ নারী—আপনি আমায় ক্ষমা করুন।' এই কথা বলিতে বলিতে রঞ্জাবতী, কর্পসেনের পায়ে ধরিয়া অনেক অনুনয় বিনয় দ্বারা, তাঁহাকে কিছু শান্ত করিল এবং ক্লান্তি অপনোদনের জন্য, তাঁহার সেবা-পরিচর্য্যায় নিযুক্ত হইল।

ক্রমশঃ

বাসন্তী-চিত্র

সরম।

শিল্পী—শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ বিশ্বাস।

Lakshmibilas Press, Calcutta.

বাসন্তী

১ম বর্ষ] ২৩শে ভাদ্র শনিবার, ১৩২৯ ইং ৯ই সেপ্টেম্বর । [১০ম সংখ্যা

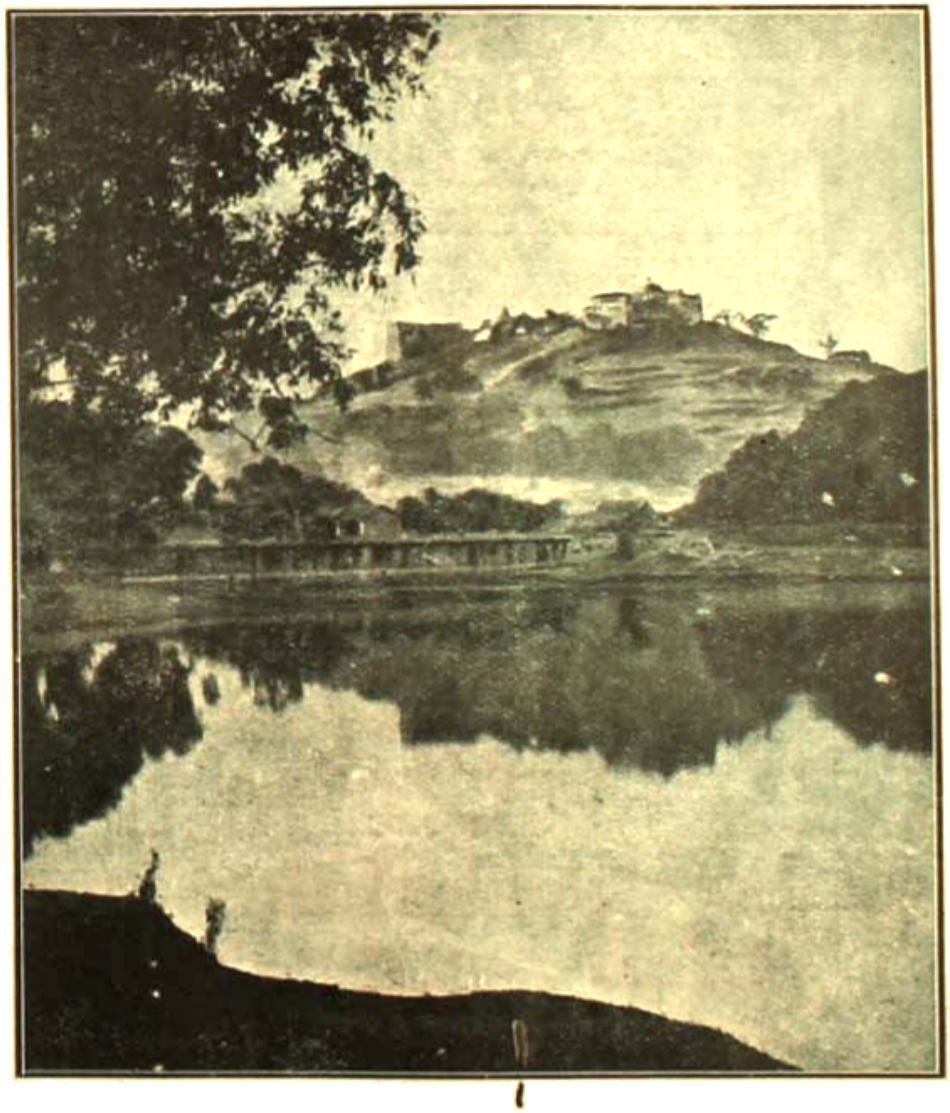

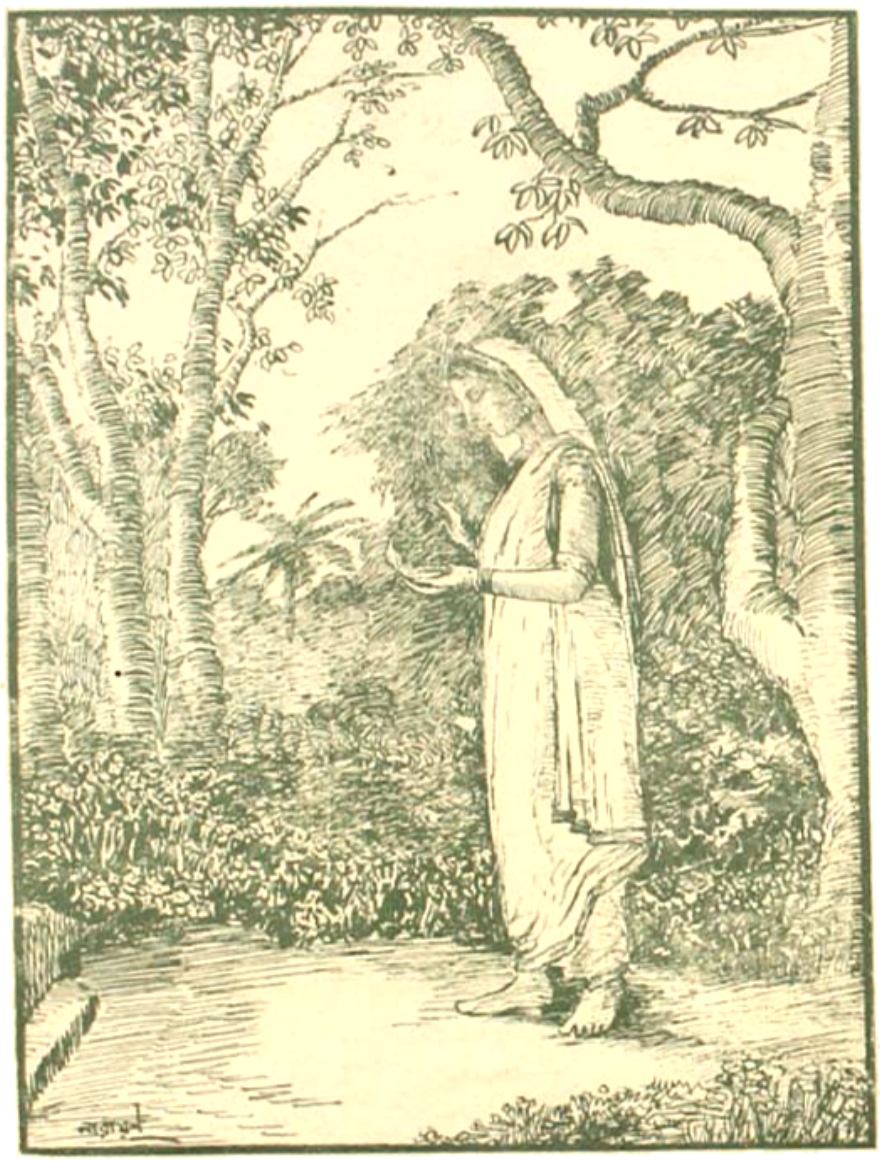

সন্ধ্যা-দীপ।

শিল্পী—শ্রীনারায়ণচন্দ্র কুমারী।

মতিলাল ঘোষ।

অমৃত বাজার পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা মতিলাল ঘোষ আর ইহলোকে নাই। সামান্য অবস্থায় অসীম কর্মঠতা লইয়া জন্ম গ্রহণ করিয়া যাঁহারা অবস্থার অপেক্ষা রাখেন না ও শ্রেষ্ঠত্ব জগতে দেখাইয়া গিয়াছেন অমৃত বাজারের প্রতিষ্ঠাতা ভ্রাতৃদ্বয়—শিশিরকুমার ও মতিলাল ছিলেন সেই ধরণের লোক। আত্মশক্তির উপর অটুট-নীর নির্ভর প্রভাবে ইহারা পর-শক্তিকে চিরদিন উপেক্ষা করিতে পারিয়াছিলেন—কাহারও নিকট নত না হইয়া নিজের উন্নত মস্তকে চলিতে পারিয়াছিলেন। তাই নিজশক্তি প্রভাবে ইহারা যশ, অর্থ, মান, সম্মান জীবনে সবই লাভ করিয়াছিলেন। দরিদ্র ও সাধারণের জন্য পড়িয়া ও তাহাদের দুঃখ বেদনার কথা কহিয়া—অভাব অভিযোগের প্রতীকার ব্যবস্থা করিয়া ইহারা অমৃতবাজারের যেসেবাশ্রী প্রতিষ্ঠা করিয়া গেলেন—শক্তি-শালী লোক-দিগের অনুগ্রহের ভিখারী হইয়া; কখনো জীবনে তাঁহারা হীন হইতে হাত নাই, আপন ক্ষমতায় ইহারা শক্তি ও অর্থের মুখাপেক্ষীকে লজ্জিত করিয়া গিয়াছেন। অপূর্ব কর্ম ক্ষমতা, অদ্ভুত সাধন ও মনের জোরই অমৃত বাজারের ঘোষ ভ্রাতৃদ্বয় দেশে তাঁহাদের নাম চিরস্মরণীয় করিয়া গিয়াছেন। দেশের জন মত গঠনে ও অন্যায় নিয়ন্ত্রিত করণে অমৃতবাজার দেশের প্রভূত মঙ্গল সাধন করিয়াছে। অমৃতবাজারকে রাজশক্তি ও প্রজাশক্তি উভয়েই চিরদিন মানিয়া লইতে বাধ্য হইয়াছে। বাংলা দেশের এই শক্তিধর পত্রিকার চালকের মৃত্যুতে বাংলার তথা ভারতের বিষম ক্ষতির কারণ হইল। তবে মতিলালের সত্য আদর্শের অনুপ্রেরণায় দেশবাসী তাঁহার প্রদর্শিত পথে চলিতে উদ্বুদ্ধ হইবে—আশান্বিত হইবে সন্দেহ নাই—শোকের সেই সান্ত্বনা।

• • • •

'সার্ভেন্ট' পত্রিকার সম্পাদকীয় বিভাগের আমূল পরিবর্তন হইয়া গেল। প্রমথবাবু, আনন্দবাবু প্রভৃতি সকলেই অপসৃত হইয়াছেন, অধুনা সম্পাদক পদে বৃত হইয়াছেন চট্টগ্রাম কলেজের ভূতপূর্ব সহকারী অধ্যক্ষ, প্রসিদ্ধ অসহযোগ কর্মী, সদ্যকারামুক্ত শ্রীযুক্ত নৃপেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। শুনিলাম এই পরিবর্তন সার্ভেন্ট প্রতিষ্ঠাতা শ্রীযুক্ত শ্যামসুন্দর চক্রবর্তীর ইচ্ছানুসারেই হইয়াছে। আমরা নবীন কর্মীদিগের সাফল্য কামনা করি।

• • • •

বিদ্যাসাগর স্মৃতিসভায় শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় বলিয়াছেন 'যে জাতি মনে করে বসে আছে যে অতীতের ভাণ্ডারের মধ্যেই তার সকল ঐশ্বর্য, সেই ঐশ্বর্যকে অর্জন করবার জন্যে তার সকীয় উদ্যমের কোন অপেক্ষা নেই, তা পূর্বযুগের ঋষিদের দ্বারা আবিষ্কৃত হয়ে চিরকালের মত সংস্কৃত ভাষায় পুঁথির শ্লোকে লক্ষিত হয়ে আছে, সে জাতির বুদ্ধির অবনতি হয়েছে, শক্তির অধঃপতন হয়েছে। নইলে এমন বিশ্বাসের মধ্যে স্তব্ধ হয়ে বসে কখনই সে আরাম পেত না। কারণ বুদ্ধির ধর্মই এই যে সে আপনার উদ্যমকে বাধার বিরুদ্ধে প্রয়োগ করে বা অজ্ঞাত বা অনধিকার অভিমুখে নিয়ত চলতে চায়; বহুমূল্য পাথেয় নিয়ে তৈরি কয়েদখানের প্রতি তার গৌরব স্থির করেছে, ইতিহাসে তার বিজয় যাত্রা স্তব্ধ হয়ে গেছে, সে জাতি শিল্পে সাহিত্যে বিজ্ঞানে কর্মে শক্তিহীন ও নিষ্ফল হয়ে গেছে। অতএব তার হাতের অপমানের দ্বারাই সেই জাতির মহাপুরুষদের মহৎসাধনার যথার্থ প্রমাণ হয়।...

ইউরোপে যে-সকল দেশ অতীতের খাঁচল ধরা, তারা মানসিক আধ্যাত্মিক যান্ত্রিক-সকল ব্যাপারেই অন্য দেশ থেকে পিছিয়ে পড়েছে। স্পেন দেশের ঐশ্বর্য ও প্রতাপ

এক সময়ে বহুদূর পর্য্যন্ত বিস্তার লাভ করেছিল, কিন্তু আজ কেন সে অন্য ইউরোপীয় দেশের তুলনায় সেই পূর্ব্ব গৌরব থেকে ভ্রষ্ট হয়েছে। তার কারণ হচ্ছে যে স্পেনের চিত্ত বর্ম্মে কর্ম্মে প্রাচীন বিশ্বাস ও আচার পদ্ধতিতে আবদ্ধ, তাই তার চিত্ত নূতনের উন্মেষ হয় নি। যারা এমনি ভাবে ভাবী কালকে অবজ্ঞা করে, বর্ত্তমানকে প্রহসনের বিষয় মনে করে, সকল পরিবর্ত্তনকে হাস্যকর দুঃখ কর লজ্জাকর বলে মনে করে, তারা জীবন্মৃত জাতি। তাই বলে অতীতকে অবজ্ঞা করাও কোনো জাতির পক্ষে কল্যাণকর নয়, কারণ অতীতের মধ্যেও তার প্রতিষ্ঠা আছে। কিন্তু মানুষকে জানাতে হবে যে অতীতের সঙ্গে তার সম্বন্ধ ভাবীকালের পথেই তাকে অগ্রসর করবার জন্যে। আমাদের চলার সময় যে পা পিছিয়ে থাকে সেও সামনের পা-কে এগিয়ে দিতে চায়। সে যদি সামনের পা-কে পিছনে টেনে রাখত তাহলে তার চেয়ে খোঁড়া পা শ্রেয় হত। তাই সকল দেশের মহাপুরুষেরা অতীত ও ভবিষ্যতের মধ্যে মিলন সেতু নির্ম্মাণ করে দিতে মহাপুরুষের চলার পথকে সহজ করে দিয়েছেন। আমি মনে করি যে ভারতবর্ষে জাতির সঙ্গে জাতির, স্বদেশীর সঙ্গে বিদেশীর বিরোধ তত গুরুতর নয় যেমন তার অতীতের সঙ্গে ভবিষ্যতের বিরোধ। এইরূপে আমরা উভয় কালের মধ্যে একটি অতল স্পর্শ ব্যবধান সৃষ্টি করে মনকে তার গহ্বরে ডুবিয়ে দিয়ে বসেছি। একদিকে আমরা ভাবীকালে সম্পূর্ণ অগ্রসর হতে পাচ্ছি না, অন্যদিকে আমরা কেবল অতীতকে আঁকড়ে থাকতেও পাচ্ছি না। তাই আমরা একদিকে মোটর-রেল-টেলিগ্রাফকে জীবন যাত্রার নিত্য সহচর করেছি, আবার অন্যদিকে বলছি যে বিজ্ঞান আমাদের সর্ব্বনাশ করলে, পাশ্চাত্য বিদ্যা আমাদের সইবে না। তাই আমরা না আগে না পিছে কোন দিকেই নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করতে পাচ্ছি না। আমাদের এই দোটানার কারণ হচ্ছে যে আমরা অতীতের সঙ্গে ভবিষ্যতের বিরোধ বাধিয়েছি, জীবনের নব নব বিকাশের ক্ষেত্র ও আশার ক্ষেত্রকে আমাদের অতীত করে রাখতে চাচ্ছি, তাই আমাদের দুর্গতির অন্ত নেই।...আশা আছে যে এমন একদিন আসবে যে দিন আমরাও সম্মুখের পথে চলতে গৌরব বোধ করব, ভূতগ্রস্ত হয়ে শাস্ত্রানুশাসনের বোঝায় পঙ্গু হয়ে পিছনে পড়ে থাকব না, যে দিন পুরাতন বেদি বলে প্রচলিত বিশ্বাসকে পরীক্ষা করে নিতে কুণ্ঠিত হব না। সেই জ্যোতির্ম্ময় ভবিষ্যৎকে অভ্যর্থনা করে আনবার জন্যে যাঁরা প্রস্তুতির আগ্রহ হয়েছিলেন, তাঁদের বলব বন্ধু তোমরা, তোমাদের তপস্যা ব্যর্থ হয়নি, তোমরা একদিন সত্যের সংগ্রামে নির্ভয়ে দাঁড়াতে পেরেছিলে, বলেই আমাদের অগোচরে পাষাণের প্রাচীরে ছিদ্র দেখা দিয়েছে। তোমরা একদিন স্বদেশবাসীদের দ্বারা তিরস্কৃত হয়েছিলে, মনে হয়েছিল, বুঝি তোমাদের জীবন নিষ্ফল হয়েছে, কিন্তু জানি সেই ব্যর্থতার অন্তরালে তোমাদের কীর্ত্তি অক্ষয়রূপ ধারণ করেছিল।'

সত্যপথের পথিকরূপে সন্ধানীরূপে নবজীবনের সাধনায় প্রবৃত্ত হবে, ভাবীকালের তীর্থযাত্রীদের সঙ্গে একতালে পা ফেলে যে দিন আমরা এই কথা বলতে পারব সেই দিনই এই সকল মহাপুরুষদের স্মৃতি দেশের হৃদয়ের মধ্যে সত্য হয়ে উঠবে। আশা করি সেই শুভদিন অনতিদূরে।

'প্রবাসী'

• • • •

ভারত বিশেষ করিয়া বাংলার অধিবাসিগণ বড় জোর-গলায় অনেক সময় বলিয়া থাকে তাহারা পরকালের চিন্তায় বড় বেশী রত—বড়ই আধ্যাত্ম ভাবাপন্ন—ধর্ম্মভাবে তাহাদের চিত্ত বসগুল, তন্ময়। ইহকালের ভাবনা মোটে না ভাবিয়া কিম্বা ভাবিবার ক্ষমতা হারা হইয়া নিঃসম্বল নিষ্ক্রিয়ভাবে যাহারা বাধ্য হইয়া পরকালের দোহাই দিয়া ইহকালের ভাবনায় নিশ্চিন্ত থাকিতে চাহে তাহাদের সম্মুখে ইহকাল যে চিরকালের জন্য চিরতমসাবৃত থাকিবে তাহাতে সন্দেহের লেশমাত্র নাই। এই নিষ্ক্রিয় আধ্যাত্মভাবের প্রতি বিদ্রোহভাব জাগাইয়া দিবার জন্য ভারতের অপূর্ব্ব মনীষী বাংলার গৌরব ভুবন বিখ্যাত স্বামী বিবেকানন্দ বার বার স্বদেশবাসীদিগের আত্মবোধ জাগাইবার জন্য প্রাণ ও ভাষা দিয়া তাহাদিগকে আহ্বান করিয়া গিয়াছেন। স্বামী বিবেকানন্দের বাণী শুনিবার জন্য এখনও দেখি এদেশের বহু অধিবাসী আগ্রহান্বিত এখনও স্বামীজীর গ্রন্থ সাহস্রণের পর সংস্করণ হইতেছে কিন্তু জাতির হৃদয়ে দেশবাসীর প্রাণে সে আত্মবোধ জাগরিত হইয়া উঠিয়াছে কি?

• • • •

ইহকাল যাহার নাই—ইহকালে যে নিষ্কর্ম্ম নিষ্ক্রিয়তার পায়ে জলাঞ্জলি দিয়া আত্মচেতনা হারাইয়া অক্ষম পঙ্গু হইয়া পড়িয়া আছে পরকালে তাহার যে কি হইবে তাহা একমাত্র আমাদের স্বদেশীয় জনসমাজই বুঝিতে সক্ষম—এই নিষ্ক্রিয় আধ্যাত্মবাদও কর্ম্মক্ষেত্র হইতে পলায়নের বিচিত্র কৌশল দেখিয়া জগতের অপরাপর ইহকাল সর্ব্বস্ব জাতি শুধু হাস্য করিবে, আর আমাদের দুর্ব্বলতার সুযোগ লইয়া আমাদের সেই ইহকালকে আরও জরাজীর্ণ কলঙ্ক মণ্ডিত করিয়া ফেলিবে তাহাতে সন্দেহ নাই।

• • • •

ভারতের রাজনীতিক্ষেত্র, ভারতের কর্ম্মক্ষেত্রে এ যুগে এক অসাধারণ পুরুষ অবতীর্ণ হইয়াছিলেন—তিনি দেশ বিদেশ স্বীকৃত মহাপুরুষ—মুগাবতার গান্ধী। কর্ম্মক্ষেত্র হইতে সুকৌশলে পলায়ন করিয়া তিনি আধ্যাত্মবাদের খেতপতাকা হস্তে জনসঙ্ঘী সন্ন্যাসী বা মুক্তপুরুষের বিপুল সম্মানভার মস্তকে বহন করাকে পরম অপমানকর জ্ঞান করিয়াছেন। মুক্ত পুরুষের জনসঙ্ঘী নামের চেয়ে তিনি সাধারণ মানুষ পদবাচ্য হইয়াই থাকিতে চাহিয়াছেন—তাহাই শ্রেয় মনে করিয়াছেন। এই মহাপুরুষের কর্ম্মপ্রাণতা বিচিত্র

কর্ম্মপদ্ধতি ও কর্ম্মপথে সহজ সরলভাবে আগাইয়া যাইবার সাধন ছিল একটা দেখিবার জিনিস। এই কর্ম্মচাঞ্চল্য এই দুর্জ্জয় সরল সত্য সাহসের প্রচণ্ডতা তিনি দেখাইতে পারিয়াছিলেন বলিয়াই আসমুদ্র হিমাচল নিখিল ভারতের জনমণ্ডলী তাহার সুরে প্রাণ পাইয়া হৃদয়ে হৃদয় মিলাইয়া কর্ম্মক্ষেত্রে অগ্রসর হইবার প্রেরণা পাইয়াছিল, তারপর কর্ম্মক্ষেত্র হইতে সেই সহজ সত্যপ্রাণ মহাপুরুষের নির্ব্বাসনের সঙ্গে সঙ্গে ভারতের কর্ম্মচাঞ্চল্যও যেন একেবারে নিভিয়া গিয়াছে। আছে তাহার স্থানে পলায়মান অস্পষ্ট আধ্যাত্মিকতার আবছায়া।

• • • •

নিজে যোগ্য হইয়া, আপন ক্ষমতায় সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া যে সেই ক্ষমতাকে সংহত করিয়া একমুখী করিয়া ভগবানে আত্মনিয়োগ করিতে পারে সে মানব সমাজে ধন্য হয়, পুরুষ সমাজেও সে পুরুষ নামের যোগ্যতা লাভ করে। ভারতের প্রাতঃস্মরণীয় ঋষিকুল আপন ক্ষমতায় সুপ্রতিষ্ঠিত হইতে পারিয়াছিলেন বলিয়াই নিশ্চিন্ত আধ্যাত্মপথে গিয়া যোগ সাধন করিতে সাহসী হইয়াছিলেন, তাহাতেও—তাহাদিগকে মাঝে মাঝে নানা দুঃখ দ্বারা লাঞ্ছিত উপদ্রুত হইতে হইয়াছে। কর্ম্মকে আপনার সম্পূর্ণ আয়ত্তে আনিয়া অধীনতা পাশে বদ্ধ করিয়াও তাহাদিগকে এই ভাবে উপদ্রুত হইতে হইয়াছে—সেস্থলে আমরা কি ভাবে পেটে না খাইয়া পরিবার কাপড় না পাইয়া অসহনে, উলঙ্গ অবস্থায় এইভাবে আধ্যাত্মপথে অগ্রসর হই তাহা তো বুঝিতে পারি না। তাই এক একবার বলিতে ইচ্ছা হয় ভগবান ভারতকে এই কর্ম্মপথ হইতে পলায়মান ব্যক্তিদিগের আধ্যাত্মপথ অবলম্বন হইতে রক্ষা কর, তাহাদিগকে কর্ম্মপথে চলিয়া সহিবার ও ভুগিবার ক্ষমতা দাও। সবগুলকে ভেকধারী সাজাইও না। এমন ভেকে বেজায় ভেল চলিবে—ভেলে জাতীয় অধঃপতনের পথ আরও মুক্ত হইবে।

• • • •

দাশেরের অ-সহযোগী ডাক্তার শ্রীযুক্ত ভরদ্বাজলু নাইডু মহাশয়ের কারামুক্তির পর দেশবাসী তাঁহার বাণী শুনিতে চাহিলে তিনি বলিয়াছেন 'মহাত্মা গান্ধী সর্ব্বত্যাগী হইয়াও আজ আমাদের সঙ্গেই কারাবন্দী। জগতে সত্যের মঙ্গলবার্ত্তা শুনাইতে আসিয়াছিলেন তিনি, যে গভর্ণমেণ্ট তাহার বিরুদ্ধ হইয়াছেন আমি তাহার সহায়তা করিতে পারি না। টাক্স দিয়া এ অবস্থায় আমি অন্যায়ের সহায়তা করিব না। ভগবান ও মানুষের সম্মুখে আমি বলিতেছি আমি টাক্স দিব না। সরকারকে বাৎসরিক আমি ১০০০৲ টাক্স দেই—তাহা আমি দিব না। ইহার ফল আমি জানি—জানি আমার পুত্র পরিজনকে পথে দাঁড়াইতে হইবে—আমার যথাসর্ব্বস্ব যাইবে, আমি কারারুদ্ধ হইব। ইহার জন্য হয়তো আমাকে কংগ্রেসের বিদ্রোহী সন্তানরূপে পরিগণিত হইতে হইবে। আমার কার্য্যের অনুমোদন যদি কংগ্রেস না করেন তবে আমি কংগ্রেসের বাহিরেই থাকিব। কত বিনিদ্র রজনী আমি এই কথা চিন্তা করিতেছি—চিন্তা করিয়া বুঝিয়াছি, মহাত্মাজী কারাগারে অবরুদ্ধ থাকিতে যদি এক কপর্দ্দকও টাক্স দেই তবে বিবেকের নিকট আমি বিষম অপরাধী হইব।'

• • • •

শ্রীযুক্ত নাইডুর এই সত্য সরল উক্তিতে সহযোগী আনন্দবাজার বলিতেছেন 'শীঘ্রই হয়তো আমরা শুনিতে পাইব শ্রীযুক্ত নাইডু সর্ব্বস্বান্ত হইয়া পুনরায় কারারুদ্ধ হইয়াছেন। স্বার্থান্ধ বিষয়ী কপট সহানুভূতির ভাণ করিয়া বলিবে, একটা মহৎ পাগলামীর খেয়ালে বেচারী নিজের সর্ব্বনাশ করিল মাত্র। কিন্তু এমন মানুষও আছে, যে অনেক শুদ্ধ হইয়া ভাবিবে, এই আত্মোৎসর্গের কি এইখানেই পরিসমাপ্তি? মরুভূমিতে বারিবর্ষণের ন্যায় কি ইহা একেবারেই ব্যর্থ হইয়া যাইবে? না, জগতে কোন কর্ম্মই নিষ্ফল নহে। যিনি সমস্ত সাধুচেষ্টাকে আপাততঃ ব্যর্থতার মধ্য দিয়া সাফল্যের মধ্যে সার্থকতা দান করিতেছেন,—তিনি নিদ্রিত নহেন।'

• • • •

দাশেরের এই সত্য অ-সহযোগী যখন মহাত্মার সহিত এক যোগে কার্য্য করিতেছিলেন তখন মহাত্মা তাঁহার অষ্টমবর্ষীয়া কন্যাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন 'তোমার বাবা আমার সঙ্গে কাজ করছেন যদি সরকার তাঁকে ধরে জেলে পোরেন তবে তুমি কি করবে?' অষ্টমবর্ষীয়া কন্যা দেবতুল্য গান্ধীর পানে তাহার সরল নির্ভীক চক্ষু দুটি মেলিয়া বলিল 'আমার তাতে ভয় নাই—গভর্ণমেণ্টের কাছ থেকে আপনি দেশকে মুক্ত করে বাবাকে ছাড়িয়ে নিয়ে আসবেন। 'অষ্টমবর্ষীয়া গৌরীর যে বিশ্বাস, যে সত্য সরল নির্ভর আছে দেশের মহা মহা জ্ঞানীদের তেমন সত্য নির্ভর আছে কি?

• • • •

পাপ-তাপ হইতে ধীরে ধীরে জগত কেমন আত্মমুক্ত হইয়া উঠিতেছে, তাহা বাংলা দেশের মাত্র একটি বৎসরের পাপ-কার্য্যের তালিকা খুটে বুঝিতে পারা যাইবে। ১৯২০ সালে কত রকমের কতগুলি অপকর্ম্ম সাব্যস্ত হইয়াছে, তাহার সংখ্যা নিম্নে দেওয়া গেল।

গুরুতর অপরাধ...	৩৯২৯টি
হত্যাপরাধ ও হত্যাচেষ্টার অপরাধ	৪২৩,
সাংঘাতিক আঘাতের অপরাধ	২০১৬,
দাঙ্গা কলহ এবং	
সম্পত্তি-সূচক অপরাধ...	৪৩৯৭৬,
ডাকাতি	৫৭২,
চুরি	৩৩১,

সিঁধ চুরি ইত্যাদি	৪১৭২৫,
সম্পত্তিহরকছোটখাট দাঙ্গা	৪০৫৫২,
পশু-চুরী	১০১১,
সাধারণ চুরী	২৯৮২৪,

এ সম্বন্ধে রাজপুরুষগণ অনেক রকম মত নির্দ্দেশ করিয়াছেন যথা, কেহ বলেন সংঘবদ্ধতা; কাহার মতে, মেলাভাবের অত্যধিক প্রচলনই ইহার কারণ; কেহ-বা পুলিসের সংখ্যা বাড়াইবার পরামর্শও দেন: কেহ বা শিক্ষা-দীক্ষার শাসনের দোষ দেখাইতেছেন, অনেকে বলেন, শিক্ষা রীতিমত হইতেছে না; অনেকে দারিদ্র্যকেই ইহার মূল কারণ বলিতেছেন। ইহা ছাড়া রাজপুরুষগণ আরও অনেক কথা বলিয়া থাকেন কিন্তু তাহাতে আমাদের বিশেষ আবশ্যক নাই। আমাদের মনে হয় দারিদ্র্যই এই সব পাপ-তাপ বৃদ্ধির একমাত্র হেতু। অভাবে স্বভাব চিরকালই নষ্ট হয়। আমাদের অভাবও ঘুচিবে না, স্বভাবও বদলাইবে না। কাজেই দিন দিন যে অপকর্ম্মের সংখ্যা বাড়িবেই তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই। যে দেশে দারিদ্র্য বাড়াইবার শত শত উপায় বিদ্যমান, যে দেশে শতকরা নিরানব্বইটি লোক দারিদ্র্য সলিলে আকণ্ঠ ডুবিয়া আছে, যে দেশে বহু পরিবার বৃদ্ধিকরাই মানুষের মনুষ্যজীবনের চরম ও পরম লক্ষ্য, যে দেশে জন্ম সংরোধ করার কথা মাত্রই অশ্লীল, দুর্নীতি, যে দেশে আয়ের অধিক অপব্যয় করাই রীতি, সে দেশে এমন হইবে না ত কি হইবে।

তাহার পর শিক্ষা। আধুনিক শিক্ষার প্রথার বৃদ্ধির সঙ্গে যে এগুলি হ্রাস পাইবে এ দুরাশা আমাদের কোনদিনই নাই। আধুনিক শিক্ষার ফলে উন্নতির কোন আশা থাকিলে পাশ্চাত্ত্য দেশের নীতি এমন পঙ্কিলতা পূর্ণ হইয়া উঠিত না। পাশ্চাত্যের জাহাজে চড়িয়া সমুদ্র পার হইয়া যে শিক্ষার প্রবাহ এ দেশে প্রবাহিত তাহাতে ফল হইবে না, তবে যদি কোন দেশ ও মনুষ্য-হিতকামী ব্যক্তি পাশ্চাত্যের সংমিশ্রণে প্রতীচ্যের চির পুরাতন ধর্ম্ম-শিক্ষার আয়োজন করিয়া দিতে পারেন তবে হয়ত আবার কোনদিন পাপ-কর্ম্মের তালিকা ক্ষুদ্র হইতে পারিবে—নতুবা নয়।

• • • •

ভারত শাসন ব্যাপারে দেশবাসী সাধারণের প্রদত্ত ট্যাক্স হইতে সরকার কর্ত্তৃক যাহা ব্যয় করা হয় তাহার মধ্যে সৈন্য বিভাগ ও রেল বিভাগের জন্যই সরকার সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ব্যয় করিয়া থাকেন। সৈন্য বিভাগ না হয় শুধু ব্যয়ের জন্যই শোষণ করা হইতেছে কিন্তু রেল-পথগুলি রীতিমত আয়ের ব্যবসায়। কিন্তু এই আয় ভোগী হয় কাহারা? বজেট যখন প্রস্তুত হয় তখন রেল বিভাগ সংরক্ষণের জন্য ব্যয়ের কথা শুনিয়াই দেশবাসী আতঙ্কিত হইয়া উঠে—সরকারও ব্যয় মঞ্জুর করিতে গিয়া চক্ষুলজ্জায় পড়িয়া যান। অথচ যে বিভাগ সংরক্ষণের জন্য দেশের ট্যাক্স এত বাড়ান হয়, দেশবাসীর কাছে সরকারকে এত কৈফিয়ৎ দিতে হয়, সে বিভাগের আয় তো সামান্য নয়—এই বিভাগের এই কোটী কোটী মুদ্রা যাহা আয় হয় তাহা তবে যায় 'কোথায়'? নিম্নে আমরা গত কয়ের বৎসরের রেল বিভাগের আয়ের একটি হিসাব দিলাম।

সন	উদ্বৃত্ত আয়। পাউণ্ড
১৮৯৯—১৯০০	৪১৫, ০১১
১৯০০—০১	৩৪৫, ১১১
১৯০১—০২	৩১৫, ৭৪৩
১৯০২—০৩	২৯৩, ৪২৩
১৯০৩—০৪	৩৩০, ৭০৫
১৯০৪—০৫	৩৪৬, ৫২৯
১৯০৫—০৬	৪১৮, ৯৯২
১৯০৬—০৭	৩৯০, ৩০৩
১৯০৭—০৮	৩৫০, ২৩৯
১৯০৮—০৯	৩৯৮, ৮৩৯
১৯০৯—১০	৩৯২, ৪৩৩
১৯১০—১১	৪০৪, ০১২
১৯১১—১২	৪৮২, ০০১
১৯১২—১৩	৭০৯, ৬৪২
১৯১৩—১৪	৪৪০, ৮৫৭
১৯১৪—১৫	৬৯০, ৮৯৮
১৯১৫—১৬	৩০৩, ৮৯৭
১৯১৬—১৭	৭৭০, ৪৪২
১৯১৭—১৮	৯৯৪, ৪০৪
১৯১৮—১৯	১, ২৩৪, ২০৭

• • •

ইউরোপীয় সৈন্য ও অফিসারদিগের স্থলে ভারতীয়দিগকে নিযুক্ত করিয়া সৈন্য বিভাগের ব্যয় সংক্ষেপ করিবার জন্য বজলাট কৌন্সিলে সম্প্রতি প্রস্তাব করিতেছেন। এই ভাবে ইউরোপীয় মোটা মাহিয়ানার কর্ম্মচারী ও সৈনিকদিগের স্থলে ভারতীয়দিগকে কিছু পরিমাণে নিয়োগ করিলে সৈন্য বিভাগের বিপুল ব্যয় প্রায় অর্দ্ধেক কমিয়া যাইতে পারে। এই ভাবে এ বিভাগ হইতে যে অর্থ বাঁচিয়া যাইবে তাহা যদি, ব্যবসায় বাণিজ্য ও শিক্ষার দিকে ব্যয় করা যায় তবে দেশের বড় উপকার হইতে পারে। উপকার দেশের নানা ভাবেই হইতে পারে কিন্তু তাহা করিবে কে? কাহার মাথা ব্যথা।

জাতি গঠন।

জনে জনের একতায় সমাজ, সমাজের একতায় জাতি, জাতির একতায় জাতীয়তা ও রাষ্ট্র গড়িয়া উঠে। রাষ্ট্র গঠন করিতে হইলে জন, সমাজ, জাতি ও জাতীয়তার গঠন ও তাহার উন্নতি সাধন অগ্রে করিতে হইবে। সমগ্র ভারতের কথা ছাড়িয়া দিয়া আমাদের বাংলা দেশকে ধরিলেই আমরা দেখিতে পাই ইহার জন-জীবনের সঙ্গে জাতীয়-জীবনের কোন যোগ নাই, সমাজ-জীবনের সঙ্গে জাতীয়-জীবনের কোন যোগ নাই। জন-জীবনের গতি সুনিয়ন্ত্রিত করিয়া জাতীয়-জীবনের ধারার সহিত তাহার মিলন সাধন করিতে না পারিলে আমাদিগের জীবনের এই নব জাগরণ ও জীবনের স্পন্দনকে আমরা কোন কাজেই লাগাইতে পারিব না।

আজ নিখিল ভারত ব্যাপিয়া একটা নূতন ভাব ও নব জীবনের স্রোত প্রবাহিত হইয়া যাইতেছে। জন সাধারণ ইচ্ছায় হউক অনিচ্ছায় হউক সে স্রোতে অঙ্গ ভাসাইয়া দিয়াছে। বদ্ধ পঙ্কিল জীবন ও সমাজ মানুষকে বহুকাল তৃপ্ত করিয়া রাখিতে পারে না। মানুষ চাহে নূতন নূতন ভাব, নিত্য নব জীবনের বিকাশ। অমানিশার ঘোর অন্ধকারের পর জন ও সমাজ একবার সূর্য্য-করোজ্জ্বল উদ্ভাসিত বসন্ত প্রভাতের সন্ধান পাইয়াছে, আর সে বসন্ত প্রভাতের মধুর কর্ম্মো-দীপনাময় জীবন ছাড়িয়া সেই বদ্ধ পঙ্কিল নিরাশাময় অন্ধকার অমা-রজনীর মধ্যে নিশ্চিন্ত জীবন লইয়া জীবন্মৃত হইয়া থাকিতে চাহিবে না।

আজ জীবনের মুক্ত ধারায় স্নান করিয়া ধন্য হইবার জন্য, জীবনকে সার্থক করিবার জন্য দেশবাসী অনন্ত আগ্রহ লইয়া ছুটিয়া চলিতেছে; কিন্তু এ মুক্তধারায় একাকী ছুটিয়া গিয়া ঝাঁপাইয়া পড়া চলে না। এ ধারায় স্নান জনে জনে মিলিয়া সঙ্ঘ-বদ্ধ হইয়া করিতে হইবে। মিলিয়া মিলিয়া দল বন্ধনে বদ্ধ হইয়া এ ধারায় স্নান না করিতে পারিলে সে স্নানের কোন ফল নাই—কোন সার্থকতা নাই।

জনে জনের ভিন্ন ভিন্ন স্বার্থ, ভিন্ন ভিন্ন মতবাদের কথা ভুলিয়া আজ দেশবাসীকে এক লক্ষ্য হইয়া ছুটিতে হইবে। সেই মুক্তধারার সন্ধানে দেশবাসী আজ একবার ভ্রাতৃভাবে বদ্ধ হইয়া প্রাণে প্রাণ মিশাইয়া তাই বলিয়া দেশবাসীকে আলিঙ্গন দিয়া ধর্ম্ম বদ্ধ হইয়া মুক্তিস্নান করিয়া আইস, একবার আপন ভুলিয়া সমাজ সৃষ্টি করিয়া সমাজ হইতে জাতি ও জাতীয়তার সৃষ্টি করিয়া লও,—দেখিবে নব বসন্তের কর্ম্ম জীবন তোমাকে কি আনন্দ সাগরে ভাসাইবে।

সৃষ্টির আদিকাল হইতে আজ পর্য্যন্ত কোন জাতি বা কোন প্রাণীই আপন ভাবে মত্ত হইয়া বড় হইতে পারে নাই। যে স্বার্থপরতায় অন্ধ হইয়া একমাত্র নিজ প্রতিপত্তি স্থাপন করিতে গিয়াছে তাহারই অধোগতি ও ধ্বংস হইয়াছে। তাই মানুষ ও অন্যান্য প্রাণীরা সমাজ বদ্ধ হইতে শিখিয়াছে। তাহারও নিজেদের নিজেদের মধ্যে জাতীয়তা গড়িয়া তুলিয়াছে।

আজ আমাদের দেশের সমাজ ও জাতি ভিন্নভাবে গড়িয়া তুলিতে হইবে। ক্ষুদ্র স্বার্থ, হিংসা, দ্বেষ ভুলিয়া আপনি একা বড় না হইয়া দেশের সঙ্গে মিলিয়া মিশিয়া সমাজ ও জাতীয়তার মধ্যে দিয়া বড় হইতে হইবে। দেশের সমাজ-জীবন ও জাতীয়-জীবনের অধঃপতনের সঙ্গে সঙ্গেই দেশের এই দুর্দ্দশা এই হীন জীবন্মৃত অবস্থা হইয়াছে। তাই আজ দেশের রাষ্ট্রজীবন গড়িয়া তুলিতে হইলে জনজীবন, সমাজ-জীবন ও জাতীয়-জীবনের উন্নতি করিতে হইবে।

বিভিন্ন সমাজ, বিভিন্ন জাতি সর্ব্বদেশে সর্ব্বকালেই আছে, যে দেশের মানুষ মানুষ বলিয়া পরিচিত হইবার সৌভাগ্য লইয়া ধরাপৃষ্ঠে সগৌরবে বিচরণ করিতেছে তাহারা সকলেই ঐ বিভিন্নতার মধ্যেও একটা অচ্ছেদ্য যোগ-বন্ধন বজায় রাখিয়াছে। আমরা যোগ-বন্ধন রাখিতে পারি নাই বলিয়াই আত্মকলহতা, সমাজ কলহতা ও জাতীয় কলহতা সব বিসর্জ্জন দিয়া হৃত-সর্ব্বস্ব হইয়া পড়িয়াছি।

জীবনে বন্ধন ভাল, নিয়মানুবর্ত্তন ভাল, কিন্তু তাহা ততক্ষণই ভাল থাকে যতক্ষণ সেই বন্ধন ও নিয়মানুবর্ত্তিতা জাতীয়-জীবনের বিকাশের সহায়তা করে, সেই বিকাশের ধারার সঙ্গে সমাজ বন্ধন ও নিয়মানুবর্ত্তিতার যোগ বিধান করিয়া লইতে হইবে। এ ধারার বিধান নির্ণয় দেশবাসীর নিজহস্তে—এ ধারার সঙ্গে চলিবার শক্তি ও যোগ্যতা তাহার প্রাণে রহিয়াছে। বাঁচিয়া থাকিবার ইচ্ছা হইলে আজ দেশবাসীকে আজ ভুলিয়া সমাজ ও জাতির সৃষ্টি করিতে হইবে। মুক্তধারায় মুক্তিস্নান করিয়া তাহাকে মানুষ বলিয়া পরিচয় দিতে হইবে।

বিলাতী থিয়েটার

(সার দেব প্রসাদ সর্ব্বাধিকারী)

লিরিক থিয়েটার

ব্যাঙ্কারস্‌বিথে লিরিক থিয়েটারে Beggar's Opera নাটক অভিনয় দেখিয়া শনিবার রাত্রি ১১টার পর বাড়ী ফিরিতে পথে ও আনুষঙ্গিক অনাহারে কষ্টও হইয়াছিল। .....এই 'বেগারস অপেরা' নূতন ধরণের পুরাতন নাটক। ১৭২৩ সালে gay কবির রচিত এই অদ্ভুত নাটক খুব প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিল। এখনও নূতন ধরণে তাহার পুনরভিনয় হইয়া প্রতিপত্তি বাড়িয়াছে।

'How happy could I be with either,
Were the other dear charmera way'

রচনাটা ইংরাজীতে স্থায়ী স্থান পাইয়াছে। কিন্তু অনেকেই বোধ হয় জানেন না ইহা Gay's Beggar's Opera হইতে উদ্ধৃত। খুব লেখাটাও একাল সেকালে সমান প্রতিপত্তি, তাই সে গাহিয়াছিলেন—...

আধুনিক Munition Board Case হইতে ছোট বড় অনেক সরকারী আমলা এই 'মহাসত্যের' সাক্ষ্য দিতেছে। তবে ব্যাপারটা ভারতবর্ষে কিম্বা কোন দেশ বিশেষে কোন কালেই আবদ্ধ নহে।

'গে' র আইন ব্যবসায়ীদের উপর রাগও যথেষ্ট—

It ever was decreed, Sir,
It Lawyer's hand is fee'd, Sir,
He steals your whole estate.

কবি চোরের মুখ দিয়া এ কথা বাহির করিয়াছেন বটে। কিন্তু কথাটা এ যুগেও খাটে বলিয়া অনেকের বিশ্বাস। যত চোর ডাকাত এই Beggar's Opera র নায়ক নায়িকা। যে ভিখারী-সমাজকে কবি এই চিত্রে আঁকিয়াছিলেন, তাহা ২০০ বৎসর পূর্ব্বে যেমন ছিল, এখনও তেমনই আছে। সেই জন্যই বোধ হয় এই পুরাতন পালা বাড়িয়া মুছিয়া, ঝালিয়া বাহির করাতে ইহার এত সমাদর হইয়াছে। উপর্য্যুপরি পাঁচশত রাত্রি এর অদ্ভুত অভিনয় চলিতেছে, তথাপি ইহার আদর কমে নাই। প্রতি গান হইবার তিনবার গাহিয়াও অভিনেতারা পরিত্রাণ পায় না। প্রতি রাত্রেই হলাল লোকে লোকারণ্য। ফাঁসীকাঠে উঠিবার সময়ও চোরের সর্দ্দার ম্যাকহিথ শৃঙ্খলাবদ্ধ অবস্থায় নাচিতেছে ধাদিতেছে গান গাহিতেছে—

The wretch of to day may be happy to-morrow। ভাবোদধির সমাজ এই আশায় বুক বাঁধিয়াই বাঁচিয়া আছে।

ড্রুরিলেন থিয়েটার।

সান্ধ্য আহারের পর 'Drury Lane Theatre' এ Abraham Lincoln নাটক অভিনয় দেখিয়া আনন্দিত হইলাম। Abraham Lincoln ও General Grant এর ভূমিকা যাহারা গ্রহণ করিয়াছিল, তাহাদের অভিনয় অতি সুন্দর হইল। আমেরিকার প্রেসিডেন্ট Abraham Lincoln দাসত্ব-প্রথার বিরুদ্ধে প্রাণপণ চেষ্টা করিয়া কৃতকার্য্য হন, কিন্তু পরিশেষে আততায়ীর হস্তে প্রাণ দিতে বাধ্য হন;—দেশভক্ত বীরের এই করুণ কাহিনী নাটকের অবলম্বন। পূর্ব্বে নিগ্রোজাতির প্রতি যে অমানুষ নির্য্যাতন হইত, বর্ত্তমান সুটিশসভ্যতায় তাহা সম্ভব না হইলেও সর্ব্বে-এই কালা-গোরার প্রভেদ যথেষ্ট আছে।.....মনে পড়ে American Slave war শেষ হইবার পরেই কলিকাতার Dane Carson সেই যুদ্ধের ছবি তখনকার প্রচলিত ম্যাজিক লণ্ঠনের সাহায্যে কোরিন্থিয়ান থিয়েটারে দেখাইয়াছিল, তখন বায়স্কোপ সিনেমার সৃষ্টি হয় নাই। তাহার কিছু পরে জেনারেল গ্রাণ্টও কলিকাতায় গিয়াছিলেন। .....জেনারেল গ্র্যাণ্টের ছোটখাট লাল চেহারা আমার মনে আঁকা ছিল—আজ তাঁহার ভূমিকায় অভিনেতা অবিকল সেই মূর্ত্তি অনুকরণ করিয়া, make up ও অভিনয়ের চূড়ান্ত দেখাইল। আমাদের রঙ্গমঞ্চে এদিকে আদৌ দৃষ্টি নাই। 'জানকী ও মন্দোদরী'

* * * *

সহযোগী হিন্দুস্থান 'পাটো আদর্শে' আমাদের দেশীয় রঙ্গালয়গুলি সম্বন্ধে লিখিতেছেন 'থিয়েটারে গিয়াছি চিত্ত বিনোদন করিতে। সেখানে গিয়া যদি ছারপোকার কামড় সহিতে হয়, দুর্গন্ধ সহ্য করিতে হয়, বসিবার আসনের অপরিচ্ছন্নতা ও সঙ্কীর্ণতায় মন খুঁৎ খুঁৎ করিতে থাকে, তাহা হইলে সে থিয়েটারের বিরুদ্ধে মন বিদ্রোহী হইয়া উঠে না কি? অথচ আমাদের দেশে ও প্রতীচ্যের সমালোচনার সময়ে আমরা জোর করিয়া আমাদের থিয়েটারগুলিকেই ভাল বলিব। নিজের ভালো ছেলেকে তুমি যদি গোরাচাঁদ বলিয়া ডাক তাহাতে তোমার মন প্রসন্ন হইতে পারে, কিন্তু সৌন্দর্য্যের আদর্শের মাথায় যে পদাঘাত করা হয়, তাহা কি একবার বিবেচনা করিয়া দেখিয়াছ? যাহারা থিয়েটারে যান, তাঁহাদের একবার অ-বাঙ্গালীর থিয়েটারগুলি দেখিয়া আসা উচিত।'

সহযোগীর কথাগুলি ভাবিয়া দেখিবার যোগ্য। আমাদের চারিদিকে ভাবিয়া দেখিবার যোগ্য জিনিস যথেষ্ট ছড়াইয়া পড়িয়া রহিয়াছে, মাঝে মাঝে আমাদের মধ্যে কেহ কেহ সেগুলি ভাবেনও, কিন্তু ভাবিয়া দেখিয়া অবশেষে জিনিষের উন্নতিসাধন করিতে যে উৎসাহ ও কর্ম্মদক্ষতার প্রয়োজন হয় আমাদের তাহারই একান্ত অভাব যেন বদ্ধমূল হইয়া রহিয়াছে। আমরা মুখে বলি, লিখিবার সময় লিখি—বঙ্গালয় জাতীয় শিক্ষার স্থান, জাতির গঠনের কেন্দ্র, অথচ কার্য্যকালে আমরা দেশীয় রঙ্গালয়গুলি যাহাতে সে পথে পরিচালিত হইয়া জাতির গৌরব মান রক্ষা ও বৃদ্ধি করিতে পারে সেরূপ কোন চেষ্টাই করি না।

আনন্দের বস্তু দেখিবার ও আনন্দিত হইবার সখ ও উৎসাহ যে বাঙ্গালীর কিছু কম আছে এমন ত বলে হয় না। বরঞ্চ কলিকাতা সহরে রঙ্গালয় ও বায়স্কোপের যেরূপ ক্রমশঃ বৃদ্ধি দেখা যাইতেছে তাহা দেখিয়াও ধারণা হয় দিনে দিনে বাঙ্গালীর এ সব জিনিস দেখিবার আকাঙ্ক্ষা বর্দ্ধিতই হইতেছে। অথচ গভীর দুঃখের ও ক্ষোভের বিষয় এই যে বাঙ্গালীর দেহের এই আনন্দের স্থানগুলির অধিকারও ক্রমশঃ বাঙ্গালীর হস্তচ্যুত হইয়া অ-বাঙ্গালীর হস্তগত হইতেছে। আমরা নিজেরা উদ্যোগী হইয়া কোন কিছু গঠন করিতে পারি না, কিন্তু পরে কিছু গঠন করিয়া তুলিলে এবং আমাদিগকে তাহাতে মোকর নিযুক্ত করিয়া মাসে মাহিয়ানা ধার্য্য করিয়া দিলে আমরা তাহাতে আমাদের শক্তি সামর্থ্য, শিক্ষা, মস্তিষ্ক নিয়োজিত করিয়া তাহা সংরক্ষণের নিমিত্ত প্রচুর চেষ্টা করিতে পারি। ইহাতে আমাদের যোগ্যতা অসীম।

দেশ-বিদেশ

নারী বিদ্রোহ—মার্কিন রাজ্যের ঔপন্যাসিক ও সাংবাদিক শ্রীমতী ফোরালিড টাইন্‌ব্রো —জেন মার্ণ বলেই যিনি সাধারণে পরিচিত সম্প্রতি ইংলণ্ডে আসিয়া পৌঁছিয়াছেন। তিনি শীঘ্রই ভারতবর্ষ ভ্রমণে ও আসিবেন, শুনা যাইতেছে। তাঁহার ভ্রমণের উদ্দেশ্য, বিবাহ-বিষয়ে মেয়েদের যথেষ্ট পরিমাণে স্বাধীন ও সুখী করিয়া তোলা। জেন্ মার্ণের মতে কাপড় জামা, ঘড়ি-বাটি, গাড়ী ঘোড়ার মত মেয়েরা পছন্দ না হ'লে স্বামী বদলাবার স্বাধীনতা পেতে থাক। সুখের শান্তির উদ্দেশ্যেই যে যখন মানব-জীবনে নারীরা বহুকাল হইতে মাথিয়া আসিতেছে, তাহা হইতে যদি সুখ ও শান্তি না মিলিল তবে কেন তাহার আমূল পরিবর্ত্তন করা না হয়? বন্ধুকে ভাল না লাগিলে বন্ধু ত্যাগ করা সম্ভব হইতে পারে আর আমরণের বন্ধু বলিয়া যাহাকে দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বৎসরের পর বৎসর আলিঙ্গন করিতে হইবে সে যদি না মনোমত হয় তাহাকে ত্যাগ করাই বা অসম্ভব কেন? স্বামী বাড়ী পছন্দ না হইলে অন্য স্বামী গ্রহণ করা চলে, চাকরী বা ব্যবসায় সুবিধা না হইলে অন্য একটি গ্রহণ করা হয়, তবে কেন না—স্বামী পরিবর্ত্তন করা সম্ভব হইবে?

শ্রীমতী নিজের জীবনে এইরূপই করিয়াছেন। তিনি মাত্র তিনটী বৎসর স্বামীর সহিত বাস করিয়াছিলেন, এখনও তাঁহার স্বামীর নামে এক বন্ধুত্ব ছাড়া আর কোনও সম্বন্ধ নাই। ভবিষ্যতে তিনি কখনও কোন পুরুষের সহিত বাস করিবেন না—বলিয়া দৃঢ় সংকল্প করিয়াছেন। তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার সম্পত্তির অর্দ্ধেক যাহাতে তাঁহার স্বামী পান সে ব্যবস্থাও করিয়াছেন। তাঁহার মতে বিবাহের পর তিন বৎসর কাল মেয়েরা স্বামীর সহিত বাস করিয়া যদি বোঝে যে সুবিধা হচ্ছে, তখনই ত্যাগ করিবে এবং ধীরে ধীরে যখন ভালবাসা অন্তর্হিত হইবে তখন মনোমত পাত্র খুঁজিলে আবার বিবাহ করিবে।

স্বামী বিদ্রোহীদলের নেত্রী "জেন মার্ণকে" ভারত প্রবেশের বিরুদ্ধে একটা আইন পাশ করিলেই কেমন হয়?

—•—

দম্পতির আত্মহত্যা—গত মঙ্গলবার বৌবাজারের শ্রীযুক্ত নেপ নেপে কার্ত্তিক চন্দ্র সেন এবং তাহার ষোড়শ বর্ষীয়া পত্নী একসঙ্গে আত্মহত্যা করিয়াছে। কার্ত্তিকচন্দ্র সাধারণ বেতনে এক সদাগরের আফিসে কাজ করিত। সে ঘোড়দৌড় খেলায় বড়ই আসক্ত ছিল। ফলে একেবারে সর্ব্বস্বান্ত হইয়া পড়ে। দুঃখ কষ্টের আর নিবারণ করিতে না পারিয়া স্বামী স্ত্রী দুই জনই আত্মহত্যা করিয়াছে। গত সোমবার শেষরাত্রে দুই জনই কেরসিন তৈলে কাপড় সিক্ত করিয়া অগ্নি সংযোগে সকল জ্বালার অবসান করিয়াছে। কার্ত্তিকের তখনই মৃত্যু হয়, পত্নী হাসপাতালে যায়া যায়।

—•—

খ্রীষ্টকর্ত্তৃক সন্ধির প্রার্থনা—গ্রীসের বর্ত্তমান অবস্থায় খ্রিষ্টভক্তদিগের দৃঢ় ধারণা জন্মিয়াছে যে, খ্রীষ্ট দৈবক্রমে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হইয়াছেন। গ্রীসের আর উপায়ের আশা নাই।

ঐক সরকার সন্ধির প্রার্থী হইয়া পঞ্জিপুত্রের নিকট আবেদন পাঠাইয়াছেন। যুদ্ধ স্থগিত রাখিয়া সন্ধি স্থির করার জন্য ইংরাজ, ফরাসী, ইটালী এবং কন্‌ষ্টাণ্টীনোপলের দূতই কনিংহামকে বিশেষ অনুরোধ করিয়াছেন। খুব সম্ভব অতি সত্বর যুবরাজ পঞ্জিপুত্রের প্রতিনিধিগণ শিমলেক মণ্ডলের কোন স্থানে সম্মিলিত হইয়া এ উদ্দেশ্যে আলোচনা করিবেন।

রুষিয়ার দুর্ভিক্ষের অবসান—আমেরিকার যুক্তরাজ্য হইতে ধান্যের সাহায্যকল্পে রুটী হইয়া রুশিয়া গিয়াছিলেন তাঁহাদের মেতা মিঃ হুভার সম্প্রতি তথ্য মেশের অবস্থা সম্বন্ধে রেখিয়া বিবরণ দিয়াছেন। তাঁহার মতে এবারে, রুশিয়ার শস্যোৎপন্ন ফসলের অবস্থা খুব আশাপ্রদ। সকলই ঈশ্বরের ইচ্ছায় দুর্ভিক্ষের অবসান হইবে।

কংগ্রেস।—পণ্ডিত মতিলাল নেহেরু প্রমুখ কংগ্রেসের নিখিল ভারতবর্ষীয় কংগ্রেস সমিতির বৈঠক আগামী ১০ই নবেম্বর তারিখে কলিকাতা নগরেই বসিবে। এই বৈঠকে বিজয়পুর আইন অমান্য সম্বন্ধে চরম-সিদ্ধান্ত পেশ করা হইবে।

যমজ সন্তান-পরিবার। ডাঃ রসিন জোন্স এক শিশু মঙ্গল রিপোর্টে প্রকাশ একটী অন্নী উপর্যুপরি পাঁচবার যমজ সন্তান প্রসব করিয়াছেন। আরও প্রকাশ যে ঐ অন্নী ও যমজ-সন্তানেরই একটী এবং তাঁহার সর্বকনিষ্ঠা বিবি বাইশটি সন্তানের অন্নী ছিলেন, তিনিও তাঁর যমজ-শিশুর একটি।

আগে রাজদ্রোহের দায়ে সম্পাদকেরা জেলে যাইতেন। এখন সেই স্থলে ঘটিয়াছে—ডিফামেশন বা মানহানি। মানহানির দায়ে অমৃতবাজার পত্রিকার সম্পাদক অর্ধদণ্ডে দণ্ডিত হইয়া, জেলে যাইতেছেন। অমৃতবাজার সিভগ্রামদেশের হিন্দুপত্রিকার অন্যতম সম্পাদক এই দায়ের দায়ে জেলে গিয়াছেন।

একজন আমেরিকান "Interview" আলাপ আলোচনা লিপিবদ্ধ করিবার একটী কল আবিষ্কার করিয়াছেন। ছই ভিনজনে বসিয়া যে আলোচনা হইবে এই কলে অবিকল তাহাই লিখিয়া যাইবে।

ভিসায়ারি অমলুল পাশাকে সিসিলিস্ হইতে ভিয়েনাটারে স্থানান্তরিত করা হইয়াছে। ভিসায়ারির স্ত্রীকেও তাঁহার সহিত থাকিবার অনুমতি হইয়াছে।

রেকরী সম্পাদক মেসর্স সার সিংহের মৃত্যু হইয়াছে।

প্রিন্সেস্ বারজিস নামী ৩৫ বৎসরের বিধবা রমণীর সহিত ভূতপূর্ব কাইসারের বিবাহ হইবে এইরূপ গুজব।

আমরা শুনিয়া সুখী হইলাম, বেথুন কলেজের মেয়েরা খাটালের অন্তঃপীড়িত ছাত্রদিগের সাহায্যার্থ একটী সাহায্য ভাণ্ডার খুলিয়াছেন। মেয়েরা আমাদের গ্রামের মাতৃ, তাঁহাদের কাছে ছাত্র সন্তানেরা যে সব সময়েই মাতৃত্বের স্নেহ; করুণা কামনা করিয়া উন্মুখ হইয়া পড়িয়া আছে—বিদেশী শিক্ষা ও ভাব ভাবের মধ্যে থাকিয়াও যে আমাদের এই বোধটুকু আছে ইহাতেই আমরা পরম সুখী। এই প্রসঙ্গে ছইটি ছাত্রীর নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য হয়—বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্রী শ্রীপূর্ণপ্রভা বসু ও ২য় শ্রেণীর ছাত্রী শ্রীকল্যাণী দাস—ইঁহারাই এই মহতী অনুষ্ঠানের অগ্রণী।

বিগ্রহ-বিসর্জন।

এইরূপে একে একে——

দুঃখের ঘরে।

(শ্রীবিজয়রত্ন মজুমদার)

স্বর্গগত পিতামাতার এক সন্তান আর স্বাধীন মতের মেসো-মাসীর ঘরে বাস করার ফল নিজেকেই পাণিপ্রার্থী স্বীকার করে মেয়ে দেখতে হ'ল। মনে হ'য়েছিল, সুন্দরী। লোকে বলে লক্ষ্মী নারীর ভূষণ, হ'বেও বা! তা হ'লে এই মেয়েটি ছিল ভূষণহীনা! নাম বলে আঙুর! সত্যি মনে হ'ল আঙুরই বটে! মাসীর কাছে মেয়েটির রূপ-গুণের বর্ণনা করে নিজের ঘরে আলো নিবিয়ে যখন শুয়ে পড়লাম, মনে হ'তে লাগল, আঙুর কাঁচা! আমার বয়সের অনুপাতে তা'কে অত্যন্ত ছোট বোধ হ'ল। বিষয়টা মাসীমাকে জানালুম এই বলে যে ঐ মেয়েটি আমাদের নলিনীর চেয়ে ছোটই হ'বে! মেয়েটি মাসীমার সম্পর্কে কি রকম নাতিনী, তার বয়সের হিসাব তাঁর একেবারে নখদর্পণে। মাসিমার মেয়ে ফুটন্ত নলিনী জন্মাবার ঠিক দেড়টি বছর আগে ভূমিকম্পের দিন রাত্রে জন্মেছিল অর্থাৎ ফুটন্তনলিনী তার চেয়ে দেড় বছরের ছোট। ফুটন্তনলিনীর বিয়ে হ'য়ে গেছে দু'বছর, এরও হওয়া এতদিনে উচিৎ ছিল, হয় নি কেবল ওর বাবা মেয়েকে খুব যত্ন করে লেখাপড়া শেখাচ্ছিল বলেই!

স্নেহ-সুকোমল
পাহাড়ী-মেয়ে
"নেপ্‌টা"
১১শ সাধ্যারণগল্প।

আমি যে ভুল দ্বিধার পঙ্কে ইতস্ততঃ করছিলুম, আঙুরই বিয়ের একদিন পরে তা ভেঙ্গে দিলে। মাসীমার চার মেয়ে, মাসীমার দুই জা আর তাঁদের উভয়ের পাঁচটি মেয়ে—সারা রাত্রি জানালার গরাদে ধরে কাটাবে জেনেই আমি আঙুরের সঙ্গে কথাবার্ত্তা কই নি, তবে এলোমেলো ভাবে হাতটা পাটা নড়ে চড়ে তা'কে স্পর্শ করছিল। হঠাৎ একবার হাতটাকে প্রথমে দূরে সরিয়ে দিয়ে আবার ঝপাৎ করে ধরে কাছে টেনে বল্লে, এক কাজ করতে পার? ঐ জানালাটার দু'টো গরাদে নেই, খপ্‌ করে খুলে দিতে পার? তাহ'লে বেশ হয়,—অনেকগুলো মাথা হুমড়ি খেয়ে পড়ে!···বুঝলুম, আঙুর খেপেছে।

'দেখতে দেখতে আঙুর বিবিটি হ'য়ে উঠ্‌ল। সর্ব্বাঙ্গ তার জেগে উঠ্‌ল। তাইই নিজের মুখে শোনা, সে তারি কম ভাবী ছিল, এখন একেবারে রাত জাগবার গল্প করবার একটি হ'য়ে পড়ল। এখন ফুটন্ত নলিনী বেচারা তার পাশে দাঁড়ালে তা'র সম্পর্কই লোকের কাছে ভুল হ'য়ে যায়। তবে আঙুর এই যে সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর হ'য়ে উঠ্‌ছিল তার জন্যে সে আমারও কিছু কিছু ক্ষতি করেছে। তার মধ্যে একটা খুব জোর দিয়েই বলতে পারি। সে'টি হ'চ্ছে, কলেজে রোজই বহি মাথায় দিয়ে এমন বিভোর হ'য়ে বেতুম যে ঘণ্টা-বাজার শব্দে চম্‌কে চেয়ে দেখ্‌তে হো'ত—মাষ্টার বদলে গেছে। দু'টো-বছর-খেটে-প্রাব, অনার্স ছাড়ি সাধে? তারপর রসিক এক মাষ্টার প্রায়ই বেরিয়ে যাবার সময় পেন্সিলের ঠোকা দিয়ে জাগিয়ে জিজ্ঞাসা করে যেতেন—আমার কোন Philanthropic association 'ধার্ম্মিক আশ্রম' আছে কি না! যাক্, খুব বরাত জোর যে সেখেটে নাম ছাপা হ'তে ভুল হয় নি।

ফুটন্ত নলিনী লেখাপড়া জানুত না তবে আমার ভালো হ'য়ে পাশ হবার সংবাদে তার লোভ ছিল, বল্লে, দাদার ঐ মুস্কিল!-আমার আঙুরটি কিন্তু বেশ, বল্লে—কিসের অনার্স! ফেল ত হও নি!

তারপরই এক কাজ জুটে গেল, বরাত জোর। সদ্য পাশ করা লোক, নাম শুন্‌লে বড়বাবুদের নাক সিঁটকে ওঠে, আর আজকালকার বি-এ পাশ করে ছেলেদের বর্ষা অবধি ছুটে গিয়ে তাড়া খেয়ে আসতে হচ্ছে—তাদেরই একজনের না জানি কি সুকৃতি বলে মিলার কোং-র বড়বাবু প্রাণধন গুঁড়ি (এই নামেই ইনি পরিচিত) মেসো মশাইকে বল্লেন—দাও না রমেশ শালির ছেলেটাকে,...দেখ'ন শ'খানেক!" ···আর বহি বগলে করে কেন.....! প্রাণধনের দীর্ঘায়ু কামনা করে সুবলের দাদাকে অযাচিত দান স্বরূপ, বহি-গুলো দিয়ে এলুম।

২

বড়-বাজারের আফিসে নেহাইৎ এক্কানো হয় বলে শ' তিনেক টাকা ব্যয়ে একটী আনন্দ ভোজের আয়োজন করতে হ'ল। ইচ্ছে ছিল না, কারণ হেডমা'টি টাকা তখা সত্ত্বেও কোন মাসে পাঁচটি টাকাও হাতে রাখতে পারতুম

না। মাসে মাসে বাড়ীভাড়া যতগুলি টাকা বেরিয়ে যায় তা'তে পাঁচটা প্রাণীর খাওয়া দাওয়া চলে! আর সংসারে নবাগতের সংখ্যা বাড়ছেই। কমছে না বলব না, কারণ ও কথায় আঙুরের পিত্তিতক জ্বলে ওঠে! প্রাণধনবাবু স্বর্গারোহণ না করলে তিন বছরে আরও কিছু বেড়ে যেত। অত শীঘ্র যে যাবেন তিনিও জানতেন না, আমিও না, অত বড় ফিলার কোম্পানীর বড় সাহেব মিঃ ভগ্লাসও না! মরবার দিনও সাহেবকে বাহান্ন বার সেলাম করে বলেছেন, সেরে উঠেই লম্বা-সায়রের সঙ্গে 'এলা' বলো···

বন্ধুরা খেতে বসে আবার এক নতুন আব্দার সুরু করে দিলেন, আঙুর পরিবেশন করবে। কথাটা আঙুর হেসে রাজী হ'য়েই উড়িয়ে দিলে। কিন্তু বন্ধুরা খাবার দেওয়া হ'য়েছে জেনেও যখন গাত্রোত্থান করলেন না এবং যুগপৎ সমস্বরে ঘোষণা করতে লাগলেন যে রামচন্দ্রের রাজত্বকাল হ'তে দেবর-জাতি এতই আদৃত হয়ে আসছে যে—হ্যান্ ত্যান্! অনুরোধ করতে এসে আমিই বিপদে পড়ে গেলুম। আঙুর মুখ বেঁকিয়ে বল্লে—তুমি কি পাগল হ'য়েছ! এই শরীর নিয়ে!···আমার যে সে কথা মনে ছিল না তা নয়, তবে কি জান? ওদের ত এবারের কথা বলি নি···আর বলিই বা কোন্ মুখে? একটির ভাত না হ'তেই...আঙুর বল্লে—হ্যাগো হাগো, তোমারই একলার কি-না! ফুটফ-ঠাকুরঝির কি হ'চ্ছে—এই ত খুকী তার এক বছর হয়েছে, আবার ত!

রইল পড়ে বন্ধুদের খাওয়া দাওয়া? কোত্থেকে খবর পেলে? চিঠিতে? তোমাদের বেল, না?

বন্ধুরা কিন্তু খাওয়া-দাওয়া ভুলে থাকতে রাজী ছিলেন না, হাকাহাকি—এই যোতো, মেলি কোথা? সব খাচ্ছিস্ বুঝি বসে বসে!

স্ত্রী—ম্যাগো, তুমি যেন কি! যাও, যাও!

কিন্তু কি করা যাবে?—স্ত্রী একমুহূর্ত্ত ভেবে বল্লেন—আচ্ছা, আসতে ত বল!

মন্থর কিছুমাত্র প্রয়োজন ছিল না, চাইলে—বৌদি একটু···দিন্ ত, এটায় একটু জল গুড়ে...

জান আবার তারে বাড়া, বল্লে, হ্যাঁ, বৌদির হাতে মিষ্টি ত খাবার যো নেই, সে এমনি মিষ্টি হ'বে যে গলা কিড় কিড়!···

ভবতোষ সবার উপরে যায়। খেতে খেতে আমার মুখের দিকে চেয়ে গম্ভীরভাবে বল্লে—আসছে বছরের মেয়রগুটা বৌদি ও দেখি আজই করে রাখ্‌লেন, বোধ হয় এই রকম সময়েই...

আঙুর মাংস দিচ্ছিল, হুলাৎ করে খানিক আমারই হাতের উপর উঁপড়ে পড়ল!

আবার আব্দার, ছেলের মা'র কোলে না বসিয়ে ছেলে দেখ্‌বেই না। আঙুর আমাকে দিয়ে বলে পাঠালে—দেখ্‌তে হ'বে না, আমাদের কালো ছেলে! বন্ধুর স্নেহ আরও বেশী—'রাত্তিরের হল্লা চল্‌বে।' আঙুর-খুব চটে আমাকে মজা দেখাবার ভয় দেখিয়ে জড়সড় হ'য়ে বল্‌ল! ঝিপিত ভবতোষ পোটা কত টাকা স্ত্রীর আঁচলে ও ছেলের ছোট হাতের তালুতে ফেলে ও গুঁজে দিয়ে বল্লে—বৌদি আপনিই সুখী! এমন সব এক-একটী চাঁদের মত ছেলে চারদিক্ থেকে যখন মা বলে ঘিরে দাঁড়াবে তখন আপনার মাতৃত্ব কানায় কানায় ভরপুর হ'য়ে উঠবে! বাস্তবিক বৌদি দেখ্‌বেন তখন আপনার এই মনে হ'বে যে জগতে আমার চেয়ে সুখী আর কেউ নেই!

ভবতোষটা বিয়ে করে নি, তবু মানবজীবনের সব দিকেরই সংবাদ সে রাখ্‌ত—কাজেই তার কথা বিফল হ'বে কেন? তিন ছেলের মা হ'য়ে আঙুর বত্রিশবুড়ী সেজেও আমাকে আফিসের ভাত দিয়েছে, অসুখে-বিসুখে সারা রাত জেগেছে, ছেলে পিলে বুকে করে' এমনই বহু অসুক্ত রাত কাটিয়েছে তবু বলেছে, "এমন সোনার চাঁদ আছে কার ঘরে?"—তিন ছেলেই মা'র সৌন্দর্য্য গর্ব্বের অংশ পেয়েছিল।

বন্ধুরা এখন আর খেতে চায় না, এখন তারা শুধে চায় শুদ্ধ খবর। তাও এই খবর যে ক'টি বৌদিকে মাতৃ সম্বোধন করছে, ক'টি ক্রোড়ে এবং অদৃষ্টটি কবে ধরার আলোকে নয়ন মেলে চোখ্ কোটাবে?

এ সব খবরে আবার ভাউচেল ভবতোষটার আগ্রহ সবার চেয়ে বেশী! নিজে বে-থা করে নি, হতভাগা পাষণ্ড। পরের খবর নিয়েই মাতামাতি। করতিস একটা বে—বুঝতিস্। আছিস ত পাগলা টাটু-টি!

ইদানিং এমনি দাঁড়াল যে ওকে নতুন খবর দেওয়াও যা, আর বিজন-গার্ডেনে দাঁড়িয়ে ঢাক ঢোল পিটিয়ে দিয়ে আসাও তাই!

৩

তিন ছেলের পর সর্ব্বলক্ষণযুক্ত একটি কন্যা প্রসব করে' আঙুর যখন খুব এক-চোট্ হুষ প্রকাশ করলে, ঠিক সেই সময়েই মিলার কোং ভারতবর্ষের কায় কারবার তুলে দিয়ে আমার মতন অনেক হতভাগার ডিটেমাটি চাটি করবার উদ্যোগ করে' দিয়ে পি এণ্ড্ ও কোম্পানীর জাহাজে উঠে সমুদ্র ডিঙোলে। এমন খবরেও আঙুরের চিত্তে কিছুমাত্র চাঞ্চল্য এলো না, সে বল্লে, ভাবনা কি! আফিস্ ত ঐ একটাই নয়।

কথাটা সত্যি। তার পরদিন থেকেই "হেঁহেঁস্যান" নিতে সুরু করে দিলাম: রোজ চার আনা করে' জাক-খরচও বেড়ে গেল কিন্তু আশ্চর্য্য এই, আমার চিঠির জবাব দিতে কেউ এক পয়সার একটি পোষ্টকার্ডও অপব্যয় করলে না। গোটা বেয়াল্লিশ টাকা ছিল আঙুরের বাক্সে, আঙুর একদিন খুব করে হিসেব নিকেশ মিলিয়ে জানালে, আর বৈকটি মুদ্রা আছে! সেদিন, সত্যই চোখে সর্ষের ফুল দেখ্লুম!—আঙুর বুদ্ধি দিলে, তাকে ত অত খরচাত দিলে, কোন কাজই হ'ল না, এইবার কেন সাহেবদের সঙ্গে একবার করে' দেখা করো না! পরদিন থেকে মাকে-মুখে গুঁজে দেখা করতেই বার হ'লুম! কিন্তু দেখা করব, কার সঙ্গে? সব আফিসের দ্বারেই আঁটা No Vacany—অর্থাৎ জ্বালাতন করো না! তবুও বরাত-বুকে গোটা দুই সাহেবের সঙ্গে দেখা করে' তাঁদের দুঃখ-সূচক দু'চারটে বাঁধা বুলি শুনে রৌদ্রে রাঙা হয়ে, ঘামে ভিজে হাপাতে হাপাতে বাড়ী ফিরে এলুম। আঙুর পাখায় বাতাস করে', কুঁজো থেকে ঠাণ্ডা জল ঢেলে খাইয়ে প্রকৃতিস্থ করে' বল্লে—এত কষ্ট, পারবে কেন? কোন-দিনের অভ্যাস ছিল না ত!

কিন্তু আমার মনে আমি যেন জানতুম এত অল্পে শ্রান্তি, ক্লান্তি, অনভ্যাসই তার হেতু নয়। মৃণ্ময়ী যাঁদের মত শরীরটা যে দাঁড়িয়ে আছে, বাইরে থেকে তার বিশেষ বৈলক্ষণ্য দেখা না গেলেও ভেতরটা যে কি হ'য়ে গেছ্ল, তা সেইদিন প্রথম বুঝতে পারলুম, যেদিন বাড়ী থেকে খুশ্তলার বোতের মাথায় তিনটে আফিস্ ঘুরে এলেই মাথার মধ্যে ঝিঁঝিঁ পোকার মত, কোন্ এক জানোয়ার বিকট শব্দ করে কাণে তালা ধরিয়ে দিতে লাগ্ল; প্রচণ্ড দিবালোকে চোখ্ মেলে চাইলেও কোন জিনিষটাই মাঝে মাঝে দেখ্তে পাই-নে, তার পর হাত-পা এগুলোও একেবারে এলিয়ে পড়ছে, এ কি একদিন দু'দিন পথে-পথে ঘুরলেই কারো হয়? অনভ্যাস কি মানুষকে এমনি অকর্ম্মণ্য, এমনই রোগ পঙ্গু করে দেয়? কে-জানে! আঙুরের মত—দুপুরবেলা, তাও আবার খালি মাথায়! একটা ছাতিই না হয় কেনো! বলে' সে তার সেজ ভগ্নির পাঁখাটা বের করে' বল্লে, এটা আমি পরি নে। যাচিয়ে এইটে বেচে ফেলে—একটা ছাতি, বড় খোকা, সময় আর যুকির জন্যে কটা জামা আজই কিনে আনো।

ছাতি কেনবার ইচ্ছে না থাকলেও ছেলেগুলোকে সদাসর্ব্বদা উলঙ্গ থাকতে দেখে মনটা বড্ড খারাপ হ'ত বলেই পাঁখা নিয়ে বেরুতে হ'ল—বেচে যা-যা দরকার আনলুম-ও, ছাতিও এল।

দুপুরের রৌদ্র আর মাথায় লাগে না, তবুও জানি না কেন রাত্রে ঘুম হয় না, মাথার মধ্যে একটা দপ্ দপানি শব্দে এপাশ ওপাশ করি। দুর্ব্বহ জীবন কবে যে শেষ হ'বে অন্ধকারে সেই ভাবনাটাই জেগে ওঠে! মাঝে মাঝে উঠে গিয়ে ছাদের হাওয়ায় বসি, বসে বিরক্তি ধরলে আবার ফিরে আসি! এই দু'চারবারের আনাগনার শব্দে আঙুরের ঘুম ভেঙে যায়। খুকীর সিক্ত কোঁথা বদলে, ঘুমন্ত, নশ্বর, অজর, এদের মাথায় বালিশ দিয়ে, কাউকে বা সোজা করে' শুইয়ে, আমার পাশটিতে এসে মাথায় হাত বুলিয়ে দেয়, পাখার বাতাস করে আর বলে, আচ্ছা তুমি অত ভাব কেন বল ত! ভগবান কি নেই? এত লোককে দেখ্ছেন আর আমাদের দেখবেন না?" এতো পুরোনো কথা, তবুও মনের মধ্যে একটা শান্তির স্নিগ্ধ স্রোত বয়ে গেল, ভীষণ অন্ধকারের মধ্যে অকস্মাৎ কিসের যেন মধুর আলো দেখ্তে পেলুম!

তারপর সে কত কথা! আহা এমন সব সোণার চাঁদ ছেলেমেয়ে—পেট ভরে না খেতে পেয়ে কি হ'য়ে যাচ্ছে। দেখ্লে বুক ফেটে যায়, চোখ্ অন্ধ হ'তে চায়; মুখে রা সরে না। আমাদের দু'জনের যেন কোন অভাবই নেই, আমরা যদি এমনি করে' দুজনে দুজনের বুকে শতাব্দীর পর শতাব্দী জন্ম হ'য়ে থাকি, আমাদের সুখেরও কাতর করতে পারবে না, কোন দুঃখই আমাদের বিঁধতে পারবে না,—কিন্তু ওদের!

আঙুর প্রায়ই বলত, মাসীমার বাড়ীই এখন আমাদের একমাত্র আশ্রয়। সে কথায় আমি কাণ দিই নি, দেবার সময় ছিলও না। ভাবতুম, পুরুষমানুষ ত!... তবে ছেলেপুলেগুলোর জন্যেই ভাবনা! ওরা যদি অমন ভিড় করে না আসতো, কিসের দুঃখ!

আঙুর জিভ্ কেটে অতিবচন উচ্চারণ করে' বলে উঠ্‌ত!—বাছারে! অমন করে বলে? ভগবান দিয়েছেন!

হা ভগবান! তোমার সব দান হাসিমুখেই যে নিত, তোমার দেওয়া বলে' অগাধ দুঃখেও যে বিচলিত হত না, তোমার ওপর অগাধ বিশ্বাস ভরে যে কোনদিন ছেলে-মেয়ের অসুখের সময় ডাক্তার ডাকাবার কথা মুখেই আনত না, তোমার সেই শ্রেষ্ঠ ভক্তটীও একদিন রাত্রে আমার বুকে মুখ লুকিয়ে কেঁদে বলে উঠ্‌ল—এবার মরে যাব! এবার আর তিনি রক্ষা করবেন না।

ভেবেছিলুম, এক বৎসর কাজকর্ম নেই, অভাব-অনটনের কথা স্মরণ করেই অথবা ঘন-ঘন বাড়ীর দরজায় কাবুলীওয়ালাদের আস্ফালন দেখেই আঙুর অমন করে' কেঁদে উঠেছে, তার মুখখানি মুখের কাছে টেনে এনে, তার পিঠে সস্নেহে হাত বুলোতে-বুলোতে বল্লুম—কি করবে আঙুর! হতভাগার হাতে পড়েছ, সুখের কথা ত ভুলোই যাক্, একদিনের জন্যেও.....

আঙুর নিজে কাঁদছিল, তবু আমার গলার স্বরে অল্প কল্পনা করেই মুখটি তার এমন ভাবে আমার মুখে স্থাপিত করলে যে আমি আর আমার কথা শেষ করতেই পারলুম না; একটু পরে আঙুর বল্লে—তার জন্যে আমি ভাবি নে। আজ কাজ নেই, কাল যদি একটী হয়, আবার যেমন ছিল তেমনি হ'বে—কিন্তু...

সস্নেহে বল্লুম—কিন্তু কি আঙুর?

আঙুরের কণ্ঠ আবার ভিজে উঠ্‌ল, বল্লে—সে আমি বলতে পারব না।

অনিশ্চিত আশঙ্কায় আমার হাত-পা অবশ হ'য়ে আসছিল। বিপদের মাঝখানে বাস করেও কত যে বিভীষিকা দিনরাত দেখ্‌তুম, কি বলব!

আঙুরের দু'টি শীর্ণ মাংসহীন হাত হাতের মধ্যে চেপে বল্লুম—ছিঃ আঙুর, বল।

আঙুর আরো জোরে কেঁদে উঠ্‌লো। দু'মিনিট ধরে বলি-বলি করে মুখখানা আঁচলে ঢেকে বল্লে—কোন্ মুখে বলব সে পাপ কথা!

পাপ কথাই বটে! গৃহে অন্ন নাই, দেনার দায়ে চুলটি বিকিয়ে আছে, কাবুলীওয়ালারা সুদ পায় নি, নালিশ করে সব-সময়ে গ্রেপ্তার হ'তে পারি যে, কিন্তু বংশবৃদ্ধির কসুর নেই! পাপ নয়? এর চেয়ে পাপ আর আছে?

আঙুর বল্লে—পৌষমাসে.....

মনে হ'ল, অগ্রাণেই এ জীবন-নাট্যের শেষ যবনিকা পাত হ'য়ে যায় ত আর কিছুই দেখ্‌তে হয় না। যে আঙুর আমার পাশে শুয়ে আমার বুকে মুখ রেখে আমারই বুকখানিকে ভাসিয়ে দিচ্ছে, তার কি দশা হ'বে ভাবতেই বেশী করে' মৃত্যুবাঞ্ছা জাগ্‌তে লাগ্‌ল! বেঁচে থেকেও যা, আমার মৃত্যুর পরেও তার তাই—বরং একটা কষ্ট থেকে তা'কে নিষ্কৃতি দিতে পারব—কথাগুলো মনে আসে আর অগ্রাণ পর্য্যন্ত অপেক্ষা করতেও ইচ্ছে হয় না, মনে হয় আজই এখনই ঘড়ি ধরে কর্পি-কল ঘুরিয়ে যবনিকাটি টেনে দিই! তারপর, আঙুর মাসীমার বাড়ীতেই থাক, আর যাই হোক্—হোক্ গে! মাসীমার দুই মেয়ে—বিশ্চ নলিনী আর ফুটন্ত নলিনী—এরই মধ্যে দু'তিনটি অপগণ্ডের হাত ধরে মাসীমার গৃহেই চিরাশ্রয় নিয়েছে, বোঝার ওপর শাকের আঁটি বৈ ত নয়—মেসোমহাশয় জীবিত, সহ্য হয়ে যাবে!

সকালে উঠে আঙুরকেও মুখ দেখাতে যেন লজ্জা হ'তে লাগ্‌ল! যেন চোর-ডাকাতেরও অধম কাজ করেছি, দুনিয়ায় আমার মত লম্পট, দুশ্চরিত্র, অপবিত্র কেউ নেই, কেউ নেই!

কিন্তু আঙুর তার স্বভাবসিদ্ধ স্নিগ্ধ হাসিভরা মুখটি নিয়ে খুব সকালেই আমাকে ডেকে বল্লে—দেখ, ভোর বেলা একটা স্বপ্ন দেখেছি—বুঝি ভগবান মুখ তুলে চেয়েছেন!

স্বপ্নটা কি—তা জানতেও ইচ্ছে হ'ল না, কোন কথা না বলেই কলঘরের দিকে চলে গেলাম।

৪

পরেশ একটা বাষ্পকোশ কোম্পানীর ম্যানেজার হ'য়ে লঙ্কায় যাবে, জাহাজ-কোম্পানীর আফিসে ভাড়ার হিসেব করছিল, আমি ঠিক তার পাশে দাঁড়িয়েই হরলালবাবুকে এগ্রিকেশন দিয়ে মিলার কোম্পানীতে থাকতে কি রকম

অনাম ও যশের সঙ্গে কাজ করেছি বলছি, পরেশকে আগে আমি দেখিনি—সে হঠাৎ আমার কাঁধে হাত দিয়ে বলে উঠ্‌ল—বতীন যে! কি করছিস? চাকরী খুঁজছিস্? ছেলে-পুলে? বেশ, বেশ! তারপর···

ভাই···

বাবি—সিলোন?

এখনি।

বৌ ছাড়বে?

ছাড়বে, আর তার বহন করবার ক্ষমতা তারও নেই।

সত্যি বাবি? না, কি···

পরেশ...

ঠিক হ'ল নগদ দু'শো টাকা মাইনে, এসিস্ট্যাণ্ট ম্যানেজার! পোষাক আষাক কেনবার জন্যে কিছু টাকাও দিলে, কথা রইল দশদিন পরে যাত্রা করতে হ'বে। আর পত্র—তাদের বেলগাছীর বাগানে গার্ডেন পার্টিতে ঠিক সাতটার সময় আমার হাজির থাকা চাই।

দুঃখের সংসারে হাসি কোটাতে আঙুরকে বল্‌তেই আঙুরের চোখ ছল ছল করে, মুখ শুকিয়ে এল, বল্লে—বিদেশ যেতে হবে?

তাকে বুঝিয়ে দিলুম যে, বিদেশ না গেলে অভ্যাগতের আগমনে কমা সেমিকোলন পড়বার সম্ভাবনা অল্প—এ শুধু দু'চার বছর পূর্ণচ্ছেদ পড়ে থাকবে।

না—আঙুরের সে-কি কান্না! তার মতে যিনি জীব দিয়েছেন, আহার তিনিই যোগাবেন। কিছুতেই সে আমাকে বিদেশে যেতে দেবে না।

এগ্রিমেণ্ট হ'য়ে গেছে, না গেলে তারা, বিশেষ বন্ধু পরেশ রাগ করবে—আর কাবলী ব্যাটারা কোন দিন মাথার খুলি উড়িয়ে দেবে, কত কি বোঝালুম কিন্তু হায়! অভাগিনী তা বুঝেও বুঝলে না। বলে, এত বড় ভারতবর্ষ, তেত্রিশ কোটী লোক···স্বদেশ ছেড়ে...

পরেশের ঠিকানা জানিয়ে, সেই বাগানের অপেক্ষায় রইলুম। বাগানে পৌঁছে দেখি বিরাট সমারোহ! তেমন কখনও দেখিনি। সাবিত্রী বিয়েটারের মাথার মণি হিরণ কুমারী গাইছেন, পরেশ তবলায় চাঁটি দিচ্ছে আর সব অপরিচিতেরা কত রঙ্গ বাঙ্গ করছে—আরও কত কি হ'চ্ছে।

পরেশ আমাকে হারমোনিয়মে বসিয়ে দিয়ে উপস্থিত জনমণ্ডলীর উদ্দেশে বল্লে—এঁর মত হারমোনিয়মে হাত দেখেন নি আপনারা!

বল্‌তে গেলুম, মনে নেই···পরেশ শুনলে না। তার পর কি কথা বল্‌তে এসেছি—পরেশ বল্লে, এখন—গো-অন্!

ক'খানা গানের পর হিরণকুমারী আমাকে নমস্কার ক'রে বল্লে—কোথায় বাজান আপনি?

আমার উত্তর শুনে মৃদুকণ্ঠে বল্লে—সত্যিই এমন হাত দেখি নি! আচ্ছা, আপনি বাজান না কেন?

কোথায় বাজাব?

হিরণ আমার খুব কাছে সরে এসে বল্লে—আমাদের থিয়েটারে আপনাকে পেলে···

পরেশ বল্লে—ছোঁড়ার বেজে হাত কিন্তু কদর নেই এদেশে কেউ পুঁছলে না...

হিরণ বল্লে—আপনি সাবিত্রীতে এলে আমি আপনাকে তখনি দেড়শো টাকা মাইনে করিয়ে দিতে পারি।

আমি ভাবছি, পরেশ তখন কোথায় সরে গেছিল—হিরণ আমার হাতটা ধরে বল্লেন—আসুন, আসবেন?

তবুও আমি নীরব। হিরণ বল্লে—আমি এই বাইশ বছর থিয়েটারে গান গাইছি কিন্তু এত সুখ কখনও পাই নি, গেয়ে। আসবেন?

আমি বল্লাম, তাঁদের ম্যানেজার-টার···

সে ভাবনা আপনার নয়। কাল সন্ধ্যেবেলা আসবেন, আমার নাম করে বলবেন, দেখা করতে চাই। আসবেন?

আচ্ছা।

ঠিক! ভুলবেন না?

না।

বিদায়কালে—আবার! পরেশ বল্লে, বেশ ত। বিদেশ যাওয়ার চেয়ে দেশে যদি হয়—আর "সাবিত্রী"তে হিরণের খুব প্রতাপ!

আঙুর শুনতে শুনতে কেঁদে ফেলে; বল্লে—তুমি লক্ষ্মীটি যাও, ওগো, লক্ষ্মীটি যাও। তোমার দু'টি পায়ে পড়ি তুমি বিদেশেই যাও, যেখানে খুশী—তোমায় দেখতে হ'বে না, থিয়েটারে ঢুকতে হ'বে না!

বল্লাম—আঙুর! বারবার-ন্যাকামি ভাল লাগে না, জান? সেদিন বল্লে, বিদেশ যেও না, আবার আজ বলছ,

এখানে থেক না·····ওদব আর চল্‌বে না। আমি কথা দিয়েছি।

আঙুরের গায়ে মুখ একেবারে মড়ার মত হ'য়ে গেল; স্থিরদৃষ্টিতে চেয়ে বলে উঠ্‌ল, কথা দিয়েছ? কা'কে কথা দিয়েছ?

হিরণকুমারী, সাবিত্রীর একজন···

আঙুর বোধ হয় কাঁপছিল, ডান হাতটা বাড়িয়ে জানালাটা ধরে ফেলে বল্লে—কথা ফিরিয়ে নাও, নইলে...

বল্লাম—উপায় নেই আঙুর।···একটু থেমে কথাটা আরো পরিষ্কার করে' বোঝাতে যাচ্ছি, বল্‌তে যাচ্ছি যে দিনরাত ঘরে বসে থেকে ভিখারীর সংখ্যা আর বাড়াতে চাইনে, আঙুর বলে উঠ্‌ল—আমি বুঝেছি বিদেশ যেতে আর কেন তোমার ইচ্ছে নেই···

কেন, আঙুর?

জান না?

তার হাতটা চেপে ধরে জিজ্ঞেস করলাম, না—বল?

তাদের ছেলে-মেয়ে হয় না।···

আমার চোখ-মুখ দিয়ে আগুন ছুট্‌ল! সেই আঙুরের মন এত নীচ এত সঙ্কীর্ণ! বলতে গেলাম—আঙুর!

কাঁপাত কাঁপতে ভীষণ একটা দৃষ্টিতে একবার আমার দিকে চেয়ে, দু'হাতে আঁচলটাকে টেনে চোখ ঢেকে বেরিয়ে গেল।

মূর্খ বাঙ্গালীর মেয়ে। অন্ত ঘরে ঢুকে কি করলে কে জানে। আমি আর খবর নিই নি। নিতে ইচ্ছেও হয় নি।

দুলাল স্বপ্ন দেখিল, "নো-বলের" সহিত সেও ছুটিতেছে, সকলে তাহাকেও "ব্যাক" করিয়াছে, বাজীও ধরিয়াছে।

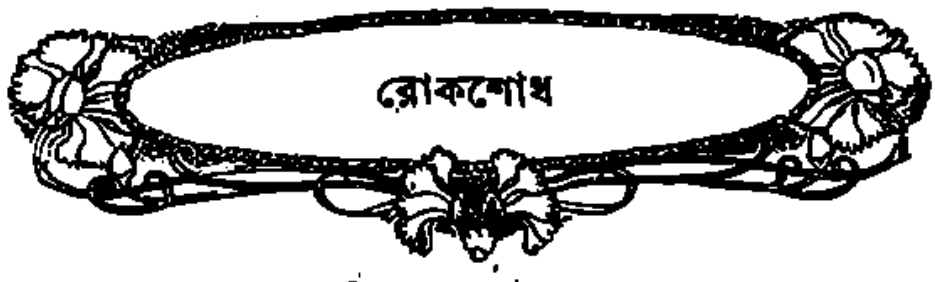

(শ্রীনারায়ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য ।)

আশ্চর্য্য পরিচ্ছেদ

হাসিতে হাসিতেই তারানাথ বলিল, "একটা খুব অদ্ভুত রকমের নূতন কথা শুন্‌ছি।"

অনুপমা বলিল, "নূতন কথা শুন্‌লে সেটা প্রথমে অদ্ভুত ব'লেই মনে হয়।"

তারানাথ বলিল, "কথাটা শুধু অদ্ভুত নয়, সম্পূর্ণ অসম্ভব ব'লেই মনে হচ্ছে।"

সহাস্যে অনুপমা জিজ্ঞাসা করিল, "সংসারে অসম্ভব ব্যাপার কিছু আছে কি তারানাথ বাবু?"

তারানাথ বলিল, "দু'একটা আছে বৈকি। তার মধ্যে ভূপতিবাবুর সঙ্গে আপনার বিবাহও একটা অসম্ভব—শুধু অসম্ভব নয়, অস্বাভাবিক ব্যাপার।"

অনুপমার মুখে যেন একটু গাম্ভীর্য্যের ছায়া পড়িল। সে ঈষৎ গম্ভীর স্বরে জিজ্ঞাসা করিল, "আপনার এরূপ অস্বাভাবিক মনে ক'রবার কারণ কি?"

গম্ভীরভাবে তারানাথ উত্তর দিল, "কারণ ভূপতিবাবু আপনার সম্পূর্ণ অযোগ্য পাত্র।"

অনুপমা কণকাল নীরব থাকিয়া ধীরে ধীরে বলিল, "আপনি বোধ হয় নিজেকে ছাড়া আর সকলকেই অযোগ্য মনে করেন?"

অনুপমার ওষ্ঠাধরে যেন একটু শ্লেষের বিদ্যুৎ চমকিয়া গেল। আরক্তমুখে তারানাথ বলিল, "আমি নিজেকে আপনার যোগ্য পাত্র মনে ক'রবো এটা আপনি বিশ্বাস করেন?"

সহাস্যমুখেই অনুপমা উত্তর করিল, "আমার বিশ্বাস, মানুষের আশার অবধি নাই।"

তারা। কিন্তু নিতান্ত নির্ব্বোধ ছাড়া এমন অসম্ভব আশা কেউ কর্ত্তে পারে না।

অনু। তা হ'লে আপনি ভূপতিবাবুকে নির্ব্বোধ বিশেষণটাও দিতে চান?

তারানাথ বিস্ময়পূর্ণ দৃষ্টিতে অনুপমার হাস্যপ্রফুল্ল মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। সে যথার্থই ভূপতিনাথকে বিবাহ করিতে প্রস্তুত কি না এ সম্বন্ধে তাহার যেন একটু সন্দেহ উপস্থিত হইল। তাহার বিস্ময়স্তব্ধ মুখের উপর হাস্যোজ্জ্বল দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া অনুপমা ধীর প্রশান্তস্বরে বলিল, "ভূপতিবাবু কিসে আমার অযোগ্য সেটা বুঝিয়ে দিতে পারেন?"

মুখ নীচু করিয়া গম্ভীরভাবে তারানাথ উত্তর করিল, "বোধ-চয় পারি।"

অনুপমা বলিল, "বেশ, এক সময়ে সেটা আমাকে বুঝিয়ে দেবেন।"

তারানাথ চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। অনুপমা হাতের কাগজখানা নাড়িতে নাড়িতে বলিল, "আপনি না সেদিন বালিকা বিদ্যালয়ে আর কিছু টাকা দেবার কথা বলছিলেন?"

তারানাথ বলিল, "হাঁ,—বিদ্যালয়টার অবস্থা এখন খুব ভাল নয়, আর কিছু খরচ করলে ওটার উন্নতি হ'তে পারে।"

অনুপমা বলিল, "কিন্তু আমার ইচ্ছা, ওটাকে তুলে দিই।"

সবিস্ময়ে তারানাথ জিজ্ঞাসা করিল, "তুলে দেবেন?"

অনুপমা বলিল, "রেখেই বা ফল কি?"

আর কেহ এমন কথা বলিলে স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারের প্রয়োজনীয়তা লইয়া তারানাথ খুব তর্ক বিতর্ক করিত; কিন্তু অনুপমার ন্যায় শিক্ষিতা মহিলার মুখে একথা শুনিয়া সে কোন কথাই বলিতে পারিল না, শুধু বিস্ময়বিস্ফারিত দৃষ্টিতে অনুপমার আনত মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। অনুপমা নতমুখে সম্মুখস্থ টেবিলের উপর অঙ্গুলির আঘাত করিতে করিতে বলিল, "যে দেশে কোন একটা বিষয়েই স্ত্রীলোকের হাত নাই, স্বাধীন মত ব্যক্ত করবার অধিকার নাই, সে দেশে স্ত্রীশিক্ষা একটা বিড়ম্বনা ছাড়া আর কিছুই নয়। লাভের মধ্যে শিক্ষা দিয়ে জ্ঞানের রাজ্যে টেনে

এনে তাদের যন্ত্রণাটা একটু বাড়িয়ে দেওয়া হয় মাত্র। তার চাইতে তাদের অন্ধ হ'য়ে থাকা খুব ভাল ব'লেই বোধহয়।"

অনুপমার স্বরে ও উক্তিতে যে একটা প্রচ্ছন্ন মর্মান্তিক অভিমান ব্যক্ত হইয়া আসিল, তাহাতে তাহার মনোভাব বুঝিয়া লইতে তারানাথের বিলম্ব হইল না। সে যে ভূপতিনাথকে বিবাহ করিতে আদৌ প্রস্তুত নয়, শুধু অপরের অনুরোধে বাধ্য হইয়াই তাহাকে সম্মতি দিতে হইয়াছে ইহা হৃদয়ঙ্গম করিয়া তারানাথ রোষে ক্ষোভে যেন উন্মাদ হইয়া উঠিল। সে সজোরে টেবিলের উপর একটা চপেটাঘাত করিয়া ক্রোধরুদ্ধ কণ্ঠে বলিল, "আপনার স্বাধীন মতের বিরুদ্ধে এ কাজ আমি কখনো হ'তে দেব না।"

"কার স্বাধীন মতের বিরুদ্ধে কাজ হচ্ছে তারকবাবু, অনুপমার?"

তারানাথকে গৃহমধ্যে প্রবিষ্ট হইতে দেখিয়া তারকনাথ যেন সন্ত্রস্ত হইয়া পড়িল। অনুপমার আরক্ত মুখখানা যেন টেবিলের সহিত সংলগ্ন হইবার উপক্রম হইল। তারকনাথ তাহাদের সম্মুখীন হইয়া স্নিগ্ধ প্রশান্তস্বরে বলিল, "অনুপমার স্বাধীন মতের বিরুদ্ধে কি কাজ হচ্ছে তারানাথ বাবু? এই বিবাহটা কি?"

তারানাথ অন্যদিকে মুখ রাখিয়া উত্তর করিল, "হাঁ, এই বিবাহের কথাই হচ্ছিল।"

ব্যস্তভাবে তারকনাথ বলিল, "তাহ'লে এ বিবাহে কি অনুপমার মত নাই? কৈ, একথা তো অনু আমাকে একবারও বলে নাই। বল্‌লে আমি কখনো—"

অনুপমা তাড়াতাড়ি মুখ তুলিয়া জোর গলায় বলিয়া উঠিল, "না দাদাবাবু, তোমাদের মতের উপর আমি কোন মত দেখাতে চাই না।"

একটা সগর্ব হাস্যে তারকনাথের মুখখানা উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। সে অনুপমার মুখের উপর স্নিগ্ধ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া ধীর গম্ভীরস্বরে বলিল, "সেটা আমি খুব ভালই জানি। জানলেও যখন কথাটা উঠেছে—না অনু, তুমি ঠিক ক'রে বল, তোমার কোন আপত্তি আছে কি না?"

বলিয়া তারকনাথ একটু থামিল; থামিয়া পুনরায় বলিতে লাগিল, "কথাটা অনেকের জানাজানি হ'য়ে গিয়েছে বটে, তা হোক, তোমার সুখের কাছে আমার মান অপমান খুবই তুচ্ছ মনে করি—"

বাধা দিয়া অনুপমা বলিল, "না দাদাবাবু, আমি মিনতি ক'রে বলছি, অপমান স্বীকার ক'রবার কোন প্রয়োজনই তোমার নাই। আমার যে আপত্তি নাই, এটা আমি মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার কচ্ছি।"

কথা সমাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে অনুপমা দ্রুত পদবিক্ষেপে কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল। তারানাথের দিকে গর্বপ্রফুল্ল দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া তারকনাথ ঈষৎ শ্লেষতীব্রকণ্ঠে বলিল, "দেখলেন তারানাথবাবু, মেয়েটার চিরকালই ঐ একভাব, দাদাবাবুর কথার উপর আর কথা নাই। নিজের ভাল মন্দ তাও দাদাবাবুর উপর নির্ভর। ও জানে, আমার চাইতে হিতৈষী জগতে ওর কেউ নাই। তা আমার চাইতে ওর মঙ্গলকামনা করবেই বা কে? কি বলেন?"

তারানাথ কি বলিবে ভাবিয়া না পাইয়া নীরবে মস্তক সঞ্চালন করিল মাত্র। তারকনাথও তাহার উত্তরের জন্য অপেক্ষা না করিয়া গুরু স্মরণ করিতে করিতে বাহির হইয়া গেল। তারানাথ হতবুদ্ধির ন্যায় বসিয়া রহিল।

কিছুক্ষণ বসিয়া থাকিয়া তারানাথ চিন্তিতভাবে উঠিবার উপক্রম করিতেছিল, এমন সময় অনুপমা ঠিক দমকা বাতাসের মত ঘরের ভিতর ঢুকিয়া যেন হাঁপাইতে হাঁপাইতে বলিয়া উঠিল, "না তারানাথবাবু, আমি এ সম্বন্ধে কোনই আপত্তি দেখাইতে চাই না, আপত্তি করা উচিতও নয়। আপনি কি বলেন, মেয়েমানুষ হ'য়ে সকলের কথার উপর কথা কওয়া ভাল?"

তারানাথ ধীরে ধীরে মাথা নাড়িয়া বলিল, "কিন্তু হৃদয়ের বিরুদ্ধে—"

বাধা দিয়া উত্তেজিতকণ্ঠে অনুপমা বলিল, "হৃদয়? হৃদয়ের সঙ্গে কার কি সম্বন্ধ তারানাথবাবু? হৃদয়ের কথা বুঝবে কে? আজ যদি বাবা থাকতেন—"

অনুপমা আর বলিতে পারিল না, অন্তরের কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিল। চোখে আঁচল চাপা দিয়া সে ঘর হইতে ছুটিয়া পলাইল। তারানাথ একটা দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বাহিরে চলিয়া গেল। (ক্রমশঃ)

কুহেলি।

(শেষার্দ্ধ)

[শ্রীসুদর্শন মল্লিক বি-এ]

তৃতীয় দৃশ্য

চন্দ্রাপীড়ের অন্তঃপুর।

ভাঙো

দুদিন ধরে নেইক ঘরে
খোকা খুকীর বাপ্ সখি
আস্‌কে গড়ে হাসকে দিনাম
তাদ্ খেলিতে আসবো কি ?
যায়নি আজ আর খাঁচার শালিক,
বাইরে বাড়ীর মলিন মালিক,
অহঃরহ দুর্ব্বিসহ এই বিরহ টকরকি।
বেশটা মলিন কেশটা রুখো,
কাঁদছে কাতর কলকে হুঁকো,
অলক্ষ্য কোন পোড়ারমুখো বন্ধ দিলে দাপ সখি।
বিচ্ছেদে রই আমার তারি,
বিচ্ছে যে সই দারার আড়ি,
মনের সাথে তার করাতে প্রেমের চেয়ে লাত সখি।

চন্দ্রাপীড় ।—সহসা আমাকে আহ্বান কেন ?

চন্দ্রমল্লী ।—আজ বসন্তোৎসব, মদনদেবের পূজা তাই আমার মদনদেবকে আহ্বান করেছি।

চন্দ্রাপীড় ।—এখন বসন্তোৎসব কি রকম ? তখনকার ভাঁজো হচ্ছে।

চন্দ্রমল্লী ।—পূর্ব্বে ইন্দ্রোৎসব বসন্তোৎসব নাম ছিল, তাতে লক্ষ প্রচুর, অর্থ কম। এখন তার নাম হয়েছে ভাঁজো, কথাটা যেমন ছোট তেমনি ভাবব্যঞ্জক ও লাগসই।

চন্দ্রাপীড় ।—এতে কে কে যোগ দিয়েছেন ?

চন্দ্রমল্লী ।—রাজী হতে প্রজ্যেকেই, যেন নাই কেবল চন্দ্রপ্রভা তিনি তাদের আবাহনার মধ্য।

(হংসপদীর প্রবেশ)

হংসপদী ।—মহারাজ, সীমান্ত দূত অপেক্ষা করছে।

চন্দ্রাপীড় ।—সত্বর পথ প্রদর্শন কর।

(দূতের প্রবেশ)

দূত ।—সেনানাথ ধূমকেতুর সৈন্যদল দেখা দিয়েছে বহু যোজনব্যাপী বিচিত্র ব্যূহ।

চন্দ্রাপীড় ।—তুমি অগ্রগামী হও, আমি সত্বর মিলিত হব।

(দূতের প্রস্থান)

চন্দ্রাপীড় ।—প্রিয়ে সমর সংক্ষেপ, আমার উপর এই বিশাল চন্দ্রলোকের গৌরব নির্ভর করেছে। রাজা ও প্রজার ন্যস্ত বিশ্বাসের যোগ্য হবার চেষ্টা আমাকে করতে হবে। হয়ত তোমার আমার আর দেখা না হতেও পারে। প্রিয়ে প্রেম অমর তার মাঝে দূরত্ব আসে না।

চন্দ্রমল্লী ।—আমি ও বীরের পত্নী, স্বামী হৃদয়ের মহত্ত্ব বুঝি। আর্ত্ত সৈন্যের সেবায় জীবন উৎসর্গ করবো, আমরা কেবল রমণীর জাতি নই, জননীর জাতি।

চতুর্থ দৃশ্য

রাজসভা

রাজা ।—সভাসদগণ, আজ আমাদের শান্তির রাজ্যে অশান্তির কৃষ্ণছায়া পড়েছে। যুগান্তের সাহিত্য শিল্প, সমাজ রীতি, নীতি হয়ত এই সংঘাতে চূর্ণীকৃত হয়ে যাবে। কিন্তু আমরা নিরুপায়। আমাদের ভবিষ্যৎ বংশধরগণের জন্য, আমাদের প্রাচীন সনাতন সভ্যতার জন্য, বিশ্বের সুখশান্তির জন্য অস্ত্রধারণ করতে হয়েছে।

মন্ত্রী ।—সেনানাথ চন্দ্রাপীড় সংবাদ পাঠিয়েছেন, ধূমকেতু দ্রুতগতি অগ্রসর হচ্ছে, চন্দ্রলোকের অর্দ্ধেক বাহিনীই পর্য্যুদস্ত। ধূমকেতুর পশ্চাত সৈন্যের সংঘর্ষে বিশ্ব হয়ত চূর্ণমার হয়ে যাবে, গ্রহগণ কাটায় বেঁধবার ভয়ে স্থায় একেবারে বন্ধ পড়বে।

রাজা ।—তখন বাহিনীকে চন্দ্রাপীড়ের সাহায্যে পাঠানো হয়েছে। ভগবান আমাদের চেষ্টা জয়যুক্ত করবেন, জয় নিশ্চিত।

মন্ত্রী ।—ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নক্ষত্রে বিপ্লবের চিহ্ন দেখা দিয়েছে।

রাজা ।—তাদিকে জানিয়ে দাও, চন্দ্রলোক রাজার একা নয়, ইহা সকলের। তাঁর উপর এ ভার চাপিয়েছে কোন এক সময়ের জনসাধারণ এবং তাঁর সৌভাগ্য বা দুর্ভাগ্য তিনি তাহা বহন করে আসছেন, প্রজারা যাহাতে অভিশাপকে বর বলে গ্রহণ না করে রাজার তাই দেখাই কর্ত্তব্য।

সকলে ।—আমরা যন প্রাণ দিয়ে যুদ্ধ চালাবো, আমাদের সর্ব্বস্ব রাজার জন্য উন্মুক্ত থাকবে।

কুশাবর্ত্ত ।—আপনি যুদ্ধ চালনার পক্ষে, সেনাগণের প্রাণ নিয়ে খেলা করা পছন্দ করিনে। যুদ্ধ হয় রাজার ও মন্ত্রীর আদেশে চলে সেনাপতির ইঙ্গিতে প্রাণ দেয় দরিদ্র প্রজাগণ।

সকলে ।—ধিক্ ধিক্ এ বিপ্লবের কথা অসন্তোষের কথা। যুদ্ধের ফল, রাজা কি সম্পদ ভোগ করবে না বহে আনি। বর্ত্তমানকে ভবিষ্যতে ডুবিয়ে, স্বার্থকে জাতীয়তায় মিশিয়ে দেখবার শক্তি এদের নাই।

রাজা ।—কুশবর্ত্ত, আবশ্যক হলে রাজা প্রাণ দিতে

সর্ব্বাগ্রে প্রস্তুত। রাজা তোমাদেরই একজন, এক ভাবেই জীবনযাপন করছেন। তোমরা যদি তোমাদের ভবিষ্যৎ বংশধরগণকে ক্রীতদাস করতে চাও রাজা নাচার।

কুশাবর্ত্ত।—প্রজাবর্গ রাজার সহিত একপ্রাণ উদ্ধত মন্ত্রী সভার বিরোধী।

মন্ত্রী।—মন্ত্রীসভা নিজের কর্ত্তব্য জানেন। দুষ্টের নিন্দা প্রশংসায় বিচলিত হবার পাত্র নন।

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

শিবির

চন্দ্রাপীড়।—যুদ্ধের সংবাদ পাগলের কথা। ধন তরবারি উদ্যম অসম্ভব। একটা অন্তের অভাব দুর্ব্বার শক্তির বলা দিয়ে অন্যান্যকে মজ্জিত পদ্ধতিতে বিশেষিত করতে হবে। যুদ্ধে আইন চলে না, সে স্বাধীন আইনের বেড়ি মানতে না। আমি রণনীতি অর্থে বুঝি রণক্ষেত্রের শ্রেষ্ঠ পথ। সম্মুখে দক্ষিণে বামে তরবারির আঘাত কর, রণরঙ্গে রণচণ্ডীর আরতি কর। শিরকে পরশলিত কর শিরস্ত্র যুদ্ধের জ্বালা কণ্ঠে ধারণ কর। আবশ্যক হয় নিজের শির বলি দাও।

সৈন্যগণ।—আমরা চাই জয়। তার চিরদিন জয়ীর পদলেহন করে। মৃত মানুষও হয়ে যেন যেতে।

(দূতের প্রবেশ)

দূত।—যুদ্ধকেতুর বাহিনী পশ্চাৎ অনুসরণ করছে।

চন্দ্রাপীড়।—সৈন্যগণ ধীরে পশ্চাত ধাবমান হও। আগ্নেয় অস্ত্রের বহ্নিজালে বিপক্ষ আচ্ছাদিত করে রাখ।

(দ্বিতীয় দূতের প্রবেশ)

দূত।—মন্ত্রীর সন্দেশ বহন করে এনেছি।

চন্দ্রাপীড়।—দূত রেখে যাও, বাক্যের বোঝা, ফুলটের বস্তা, উপদেশের ফাঁক বুঝি। আমি চাই জয়।

(শ্বেত পতাকা হস্তে অন্য দূতের প্রবেশ)

অঃ দূত।—আমরা চব্বিশ ঘণ্টার বিরাম প্রার্থনা করি, যুদ্ধের সংকারের জন্য।

চন্দ্রাপীড়।—মুহূর্ত্ত বিরাম দেব না। আমার আগ্নেয়াস্ত্র চায় সম্পূর্ণ আত্ম সমর্পণ।

অন্য দূত।—এ বীরের বা রণের প্রথা নয়।

চন্দ্রাপীড়।—আমি প্রথার ধার ধারিনে। যদি অদ্য জয়ী হই প্রথাই আমার অনুসরণ করবে। যদি পরাজিত হই আমি প্রথা ভঙ্গের দণ্ড নিতে জীবিত থাকবো না।

অন্য দূত।—আপনার আগ্নেয়াস্ত্র শস্ত্রাগারে গোলা নিক্ষেপ করছে।

চন্দ্রাপীড়।—আমারি আদেশে। শস্ত্রাগার যদি রণসম্ভার বা সেনাগণের অন্যত্রগমন হয় তা হলে তার বিপুল চিহ্ন ও তাকে রক্ষা করতে পারবে না বরং বন্ধুকে আহ্বান করে আনবে।

(দূতের প্রস্থান)

চন্দ্রাপীড়।—সেনাগণ আজ আমরা জয়ী। এসো প্রাণভরে ভগবানকে ধন্যবাদ দিই। তোমরা সন্ধ্যার পূর্বে প্রত্যাগমন করবে।

সেনাগণের গীত।

আমরা রাজার আপনা বটি
মাইনে নেহাৎ নাম্‌লা পাই,
চাইনে মোরা হস্তী ঘোড়া
গ্রামের গরীব নাম লেখাই।
খাটতে খেতে যাচ্ছি মোরা,
তোমরা কর ভাগ বাটোয়া
গোয়ালে কাঁদে কোঁয়ালে বাছুর
হাম্‌লে ঘরে শাম্‌লা গাই।
যত মানুষ মরণ ঘিরে,
শান্তি পড়াও কাগজ ঘিরে,
তোমরা এখন চড়ক বাজাও
মিট্‌লো মোদের মামলা ভাই,
আমরা রাজার আপনা বটি
মাইনে নেহাৎ নাম্‌লা পাই।

দ্বিতীয় দৃশ্য—গুপ্ত মন্ত্রণাগার।

ষড়যন্ত্র-কারিগণ :—

বাজ্‌ছে বিষাণ নাচছে ঈশান
শীর্ণ যা তাই টুটবে,
রক্ত স্রোতের রথের পথে
জীর্ণ পাতাই লুটবে।
আন্‌বে নবীন ভাঙ্গন কাঁচ
তার লাগিয়াই আসন রচি,
ভাঙুক তোরক লাজের মোড়ক
অটুট যে ভাই টুট্‌বে।
আন্‌বে ভালো উষার আলো
ঘুমের তলায় মন্ত্রে,
প্রভাত কালে দেবেই ফেলে
সন্ধ্যা-দীপের যন্ত্রে।
বাঁধ ভেঙ্গে যায় বন্ধ সলিল,
যায় খুলে যায় রুদ্ধ অনিল,
হয় যে মালায় থাকের গাথায়
বীজ মরেতেই গল্‌তে।

মন্ত্রী।—রণক্ষেত্রে একটা ভীষণ পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করছি। চন্দ্রাপীড়ের ক্ষমতা এখন অসীম, সে আমাকে যথেষ্ট সম্মান করে, যাতে রাজশক্তি আমাদের হাতে আসে তার চেষ্টা করতে হবে। রাজা ও প্রজাগণ যা বলবে তাই করবেন। আমাদের উপায়।

চন্দ্রাঙ্কুর।—রাজ্য ত আমাদের হাতে এলো বলে। এখন তাকে আমাদের নিজস্ব করতে হবে। না সাধু না অসাধু। ঋষিকে বধ করলে চলবে না তা হলে ঋষি অসাধু হয়ে পড়বে। আর চোরকে চৌর্য করলেও সে অতি আত্মার সাধু হয়ে পড়বে। প্রথমেই তাদের উপর আধিপত্য বিস্তার করতে হবে।

ষড়যন্ত্র-কারীগণ।—হবে না, অবশ্যই হবে, এখন থেকে যে উহা আমাদের সম্পত্তি হল।

চন্দ্রাপীড়।—প্রত্যেক সেনাকে জায়গীর দিতে হবে, প্রত্যেক গ্রামে সৈন্যদের জন্য বিনামূল্যে ভোজনাগার পানাগার প্রভৃতি স্থাপন করতে হবে।

সকলে।—তা ত হবেই আমরা ত আপনাকেই রাজা করবো। তবে 'রাজা' কথাটার সঙ্গে অনেক কষ্টের স্মৃতি জড়িত আছে তাই এখন আমাদের যে কর্ত্তা হবেন তার নাম হবে 'কর্ত্তা'।

চন্দ্রাপীড়।—আমি সে সম্মানের উপযুক্ত নই। সামান্য একজন সৈনিক মাত্র।

মন্ত্রী।—তুমি আমাদের কেবল কর্ত্তা নও, গৌরব, রক্ষা কর্ত্তা।

চন্দ্রাঙ্কুর।—আমরা কর্ত্তা তোমার বল করবো

চন্দ্রাপীড়।—রাজা কি এ সংবাদ জানেন?

মন্ত্রী।—তাঁকে আমি প্রকারান্তরে জানিয়েছি। তাঁর প্রজারা সাধারণক হয়েছে নিজেরাই দেশ শাসন কর্ত্তে চায়, তিনি তাতে বললেন "যে দিনের জন্য আমি অপেক্ষা করছিলাম সে দিন এসেছে এ'ত সুখের সংবাদ।"

চন্দ্রাপীড়।—যদি সব প্রকাশ হয়ে পড়ে?

মন্ত্রী।—সে ভাবনা নাই, রাজা ক্ষমাশীল।

তৃতীয় দৃশ্য—নগর প্রান্ত।

বন্ধন বেলে রাজা রাণী

প্রজাগণ :—

প্রাণের রাজা যায় গো চলে
দাঁড়াইতে বল,
নয়ন ভরে দেখবো কেবল
শ্রীমুখ কমল।
এমন স্নেহ আর কে জানে
দিয়েছে কে প্রজার প্রাণে
বিশ্বজয়ী বুকের পাটা
পুণ্য আখণ্ডল।

দাঁড়াইতে বল।
তোমার সুখের দুখের ভাগী
শোণিত দিলাম তোমার লাগি
চরণ পরে ঢালবো আজি
অশ্রু সুশীতল।

রাজা।—তোমরা আমার কাছে কাতর ভাবে দাঁড়িয়ে কেন? তোমাদিকে কিছু দেবার সাধ্য নিয়ে ত আমরা আসি নাই।

প্রজাগণ।—আমরা আপনাকেই চাই। পথ আঁধার করে কোথায় যান?

রাজা।—বৎসগণ, প্রজার সুখেই রাজার সুখ, তোমরা নিজে এই রাজ্য শাসন কর্ত্তে চেয়েছ তার চেয়ে আর সুখের কি আছে। পুত্র উপযুক্ত হলে মাতাপিতাকে তার উপর রাজ্যভার দিয়ে বাণপ্রস্থ নিতে হয়। তোমরা আমার অসংখ্য পুত্র তোমরা সুখী হও, যোগ্যতর হও, ইহাই প্রার্থনা। তোমাদিগকে সুশিক্ষিত করে রাজ্য পরিচালনের উপযুক্ত করতে পেরেছি এই আমাদের গৌরব।

কুশাবর্ত্ত।—প্রভু রাজা, আমরা তোমার সঙ্গে যাবো।

রাজা।—বৎস কুশাবর্ত্ত। তুমি ত নিজেই এ ভার প্রদানে সমর্থন করেছিলে, নিজেদের শাসন চেয়েছিলে।

কুশাবর্ত্ত।—আমরা পিতার কাছে একশোবার আবদার করবো আমরা তোমার অধীন হয়ে স্বাধীন হতে চাই। অধীনতে আনন্দ পাইমে। তুমি অখণ্ড শান্তি এনেছ, তুমি কুপ্রথার মূলচ্ছেদ করেছ, তুমি জ্ঞান ও শক্তি দিয়েছ তুমি ছেড়ে যেয়ো না।

রাজা।—বৎস, একটা জিনিষ চিরদিন থাকে না, থাকতে পারে না ভালের তা ইচ্ছা নয়। প্রাচীন নূতনকে স্থান দেবেই। নবীন নূতন শক্তি নিয়ে আসবে। পুরাতনকে শান্তিতে বিদায় নিতে দাও।

প্রজাগণ :—

ক্লান্ত রবি দিনের শেষে
অস্তাচলে যায় চলে,
কোরক ফুলের বাসের সাথে
কাঁদবে না কি তাই বলে?
ওই আলোতে মুখ ফুটেছে
ওই আলোতে দুখ টুটেছে
কোমল করে চোক মুছানো
কেমন করে যায় ভুলে।
পড়ছে মনে সাঁঝের বেলা
বিপুল তোমার জ্যোতির মেলা
অমল আঁখি সজল হ'ল
বুকের ব্যথা যায় গলে।

না না রাজা আমরা তোমায় ছাড়তে পারবো না।

তোমার স্নেহদত্ত দ্রব্য জোর করে নেব। ষড়যন্ত্রকারীগণ মিথ্যা সংবাদ রটিয়েছে আমরা তাদের শাস্তি দেব।

রাজা।—বৎসগণ, তাদের উপর অত্যাচার করো না, আমি কিরূপে এখে একটা রঙ্গমঞ্চের আয়োজন করা হল। তবে এখন থেকে আমি সেই মহা নাট্যকারের আয়োজনের রাজা অভিনয়ের রাজা হয়েই থাকবো তাঁর নামেই রাজ্য শাসন করবো।

প্রজাগণ।—(উল্লাসে) মহারাজ সত্যই তুমি প্রজা বৎসল।

চতুর্থ অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য—সপ্তর্ষি মণ্ডল।

১ম ঋষি।—সূর্য্যমণ্ডলের উপর দিয়ে একটা তীব্রতির সঞ্চার করে ধূমকেতু অস্তমিত হলো। গ্রহে গ্রহে কত উদ্বেগ আন্দোলন চলছে, চলবে। রাজারা রাজায়-রাজায় সংবাদ রাখে না, প্রজারা বিশ্বগামী ঐশ্বর্য্য শক্তি জানকে বিশ্বরাজের আসনে বসিয়ে কোঁচ ফিটছে না শান্তি আনবার চেষ্টা করছে কিন্তু শান্তির আবাসের ঠিকানাই এরা জানে না।

২য় ঋষি।—গ্রহগণ বার বার কক্ষ দিয়ে আবর্ত্তন করছে তারা যাকে চায় তার সংবাদ পায় না। তারা অস্থায়ীতে সুর বেঁধে সঙ্গীত গেয়ে চলেছে কোথায় 'সম্' তার সংবাদ রাখে না কোন ক্রমেই বিশ্ব সঙ্গীতের সঙ্গে সুর মিলাতে পারছে না।

৩য় ঋষি।—নারদ ঋষি যে বিশ্ব সঙ্গীতের সংবাদ দিয়েছেন তাহারা তা গ্রাহ্য করে না। গ্রহণ করে না।

৪র্থ ঋষি।—সমস্ত গ্রহ উপগ্রহকে জানানো হ'ক তারা ভুল পথে চলেছে তারা বিশ্বসঙ্গীতে নিজ নিজ কণ্ঠ যোগ দেওয়ার পরিবর্ত্তে বিপরীত সুরে ঐকতান শুরু করে ভীষণ কোলাহলের সৃষ্টি করছে।

৫ম ঋষি।—ওরা অশান্তির দ্বারা শান্তি আনবে, কোলাহলের দ্বারা গীত সৃষ্টি করবে। দম্ভ তাদের এমনি বাড়িয়ে তুলেছে।

৬ষ্ঠ ঋষি।—যত বিশৃঙ্খলার মূল, সেই বিশ্বের রাজা হতে দূরে থাকা তাঁর সংসর্গ দূরতর হওয়া।

৭ম ঋষি।—আমারও তাই মত। দুরন্তের জন্যই এই বিভ্রাট, সমস্ত গ্রহগুলী একত্র হয়ে তাঁর সান্নিধ্য প্রার্থনা করুক।

দ্বিতীয় দৃশ্য—তপোবন।

চন্দ্রপ্রভা।—সখি আমার শিরীষ তরু পুষ্পিত হল, রসাল ফলবান হল। আমার আশা যে বিফলে যায় সখি।

কুহেলি।—সখি ধৈর্য্য ধর। অব দুঁহু মিলবে মুরারী।

চন্দ্রপ্রভা।—আরও কঠিনতর তপস্যায় এ দেহ পাত করতে হবে, এজন্মে তাঁকে আর পাব না সখি। জন্মান্তরের প্রাপ্তির আনন্দে আমি দেহত্যাগ করবো।

(এক সম্ভ্রান্ত রাজ দূতের প্রবেশ)

কুহেলি।—সখি এক সম্ভ্রান্ত রাজদূত এসেছেন, তাঁকে অভ্যর্থনা কর।

চন্দ্রপ্রভা।—আসুন, আমাদের আতিথ্য গ্রহণ করে ধন্য করুন।

রাজদূত।—পুণ্য চরিতে, আপনার আশ্রমের তরুকুল ফলবান আছে ত, অতিবৃষ্টি বা অনাবৃষ্টিতে নীবার ক্ষেত্রের ক্ষতি হয় নাই ত?

চন্দ্রপ্রভা।—না মহাশয়।

রাজদূত।—এখানে আরণ্যক মৃগগণ গৃহকার্য্যে বিমুখী নন ত? তাঁদের সন্তানস্নেহ, সত্যাগ্রহ, হরতাল প্রভৃতিতে যোগ দেয় নাই ত?

চন্দ্রপ্রভা।—না মহাশয়।

রাজদূত।—তবে প্রদেশ শান্ত, আপনি কি রূপ তপস্যা করছেন জানতে পারি কি?

কুহেলি।—উনি পতিকামনায় তপশ্চরণ করছেন।

রাজদূত।—বাঃ উনি বস্ত্রে কেরোসিন লাগাইয়া দেহ দাহন না করে যে তপস্যা করছেন এতে সন্তুষ্ট হলাম। গৃহে "পুণ্যিপুকুর" প্রভৃতি ব্রত করলেই হ'ত, এখানে আসার আবশ্যক?

কুহেলি।—ইনি বড় উচ্চ পাত্রের অভিলাষী, তাঁকে পেতে হলে পরমার্থের প্রয়োজন।

রাজদূত।—অর্থের ত প্রয়োজন বটেই গো। সব জিনিষের ন্যায় পাত্রেরও দর বেড়েছে। উচ্চ পাত্রের ত কথাই নাই। অর্থাভাবে যদি উনি মনোমত পাত্র হতে বঞ্চিত হন, আমার কিছু সঞ্চিত অর্থ আছে তাহার কিছু দিয়া উঁহার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করতে পারি। তবে জানতে চাই পাত্রটী কে?

কুহেলি।—সখি বড় উচ্চাভিলাষিনী। উনি তাঁকে পতি চান তিনি বিশ্বের সম্রাট।

রাজদূত।—আপনার সখি কি বলেন?

চন্দ্রপ্রভা।—দেব, সত্যই আমি দুরাকাঙ্ক্ষিনী। তাঁকেই পতি চাই।

রাজদূত।—আমি তাঁকে চিনি, আমি এ বিষয়ে অনুমোদন করতে পারলেম না। তিনি রাখালরাজ, তিনি নটবর তাঁর হাওভাবের কথা জগৎবিখ্যাত তিনি দরিদ্রের সঙ্গে মিলে থাকেন। সামান্য লোকের বিপদ-আপদে ছুটে যান। সম্মান জ্ঞান নাই।

চন্দ্রপ্রভা।—তিনি যেই হন, আমি তাঁর পিয়াসী।

রাজদূত।—কোন নির্ব্বোধ যুবিকার মালা নাগর-দোলায় দুলিয়ে দেয়। এরূপ ব্রত করতে দেওয়া উচিত নয়। তিনি কপর্দ্দক চরিত্র—

চন্দ্রপ্রভা।—সখি উহাকে নিবারণ কর। মহতের নিন্দা শোনাও পাপ। অথবা আমিই দূরে প্রস্থান করি।

(প্রস্থানোদ্যত)

(সহসা রাজদূতের অপরূপ মোহন ভাব বেশ ধারণ ও বেণুধ্বনী চন্দ্রপ্রভার হস্ত ধারণ।)

কিন্নরীদের গীত।

এ ঘর যাহার কর ঘরে
শিউরে উঠে কমল কোটে
নয়ন ঘরে ঘরঘরে।
ভুবন তাহার পারনা সাড়া,
হয় সে হারা পাগল পারা
এমনি পীড়িত হিয়ন হরিৎ
এক ঘরেতে ঘর করে।
ডাক্ দিয়ে যায় সকল কাণে
রাগ দিয়ে যায় সকল প্রাণে
গড়ায় তাদের 'ছালনাতলা'
ঘুক্তা মণি রত্নরে।

ঘুহেলিঃ—কই কই সখি, চন্দ্রলোকের গরবিণী রমণী কোথায়। হায় কনক জ্যোতি কোথায় উধাও হয়ে আমলে মিশে গেল। শুধু কুহেলি পড়ে রইলো।

পতন ও মূর্চ্ছা।

রাজার প্রবেশ—

রাজা:—কোথায় তুমি সম্রাট, বিশ্বের সম্রাট, তার বৃন্দাবনের চির কিশোর। যাঁকে যুগ যুগ ধরে অন্বেষণ চলছে, যাঁর অন্বেষণে প্রাপ্তির আনন্দ, যাঁর নামে দর্শন পর্শনের সুখ। নারদ ঋষি যাঁর বীণার সুরে বিশ্বস্তব্ধ করেছেন,—যাঁর সংবাদ কে দেবে? এ নকল রাজা সেই আসল রাজাকে সিংহাসন ছেড়ে দিয়ে কবে কৃতার্থ হবে?

দূরে গীত।

তাহার কথায় ভাবছে সবাই
ভণছে গণক কর গণি,'
খুঁজছে যে সেই পরশমণি
ঘণক ঘরায় ঘরখানি।'
তাহার গানই গাইছে কবি
চিত্রী আঁকি তাহার ছবি,
দর্শন ও তার অদর্শনে
খুঁজছে মাথা হয় কপট।
মণ্ডপেতে ঘণ্টা বাজে
ঢাক ডাকেতে তারেই ডাকে,
'তার বিহনে' তাহার ঘরণ
বুঝতে নারে 'মাধবনি'

জাগরণ

(গান)

[শ্রীশ্রীপতিপ্রসন্ন ঘোষ]

আজিকে বিশ্ব-আলোক সভায়
নিদ্রিত প্রাণ জাগরে,—
ঝলক ঝলক রশ্মিছে আলোক
গগনে গহন-প্রান্তরে।
নিখিল ভুবন পুলক মগন,
জড়তাভাস লভে জাগরণ,—
কাল মেঘ টুটি উদিল তপন
নির্ম্মল নীল-অম্বরে।
আজিকে বিশ্ব-আলোক-সভায়
নিদ্রিত প্রাণ জাগরে।

কে আছ কোথায় দুঃখ-পীড়িত—
শূন্য-হৃদয়ে পড়ি,—
ঘরে আনন্দ—হৃদয়-কুন্ত
নহ আনন্দে ভরি'।
দুখের রজনী হল অবসান
ভুলে যাও শোক-লাজ-অপমান,
ধনী-নির্ধন রহে একপ্রাণ
তাঁরি বন্ধন মাঝারে।
আজিকে বিশ্ব-আলোক-সভায়
নিদ্রিত প্রাণ জাগরে।

দ্বাদশ গোপাল

(পূর্ব-প্রকাশিতের পরে)

১১

সন্তানহারা জননীর মত বিমান যখন রাত্রিশেষে ব্যথায় ঘুমাইয়া পড়িল, তখন পূর্বাকাশ রাঙাইয়া উঠিয়াছে। হঠাৎ কতকগুলা মহলা-ফেলা গাড়ীর এলো-মেলো কল্ কলানিতে তাহার ঘুমটি ভাঙিয়া যাইতেই বুকের মাঝে সেই বেদনাটাই জাগিয়া উঠিল যেটাকে সে সারারাত দু'বাহুতে চাপিয়া রাখিয়া দিয়াছিল। রাতটা তাহার এমনি করিয়া কাটিয়াছে, এমনি করিয়া থাকিয়া থাকিয়া বুকটা খালি হইয়া কোঁপাইয়া কোঁপাইয়া দুলিয়া উঠিয়াছে আর খালি মনে করাইয়া দিয়াছে, নাই, নাই, সে নাই। যে ছিল সে নাই, হারাইয়া গেছে! সমুদ্র স্নান করিতে গিয়াছিল, প্রিয় বস্তুটি ভাসিয়া গেছে, সমুদ্রের তলে অথবা অন্য কোথায় কে জানে!

বিমান একবার মাত্র চোখ মেলিয়াই আবার বালিশে মুখ চাপিয়া দিনের আলোক হইতে আত্মরক্ষা করিল। আলোকের আঘাতে তাহার বেদনা যেন বেশী করিয়া চেতনা পাইয়া উঠিতেছিল। যে গেছে সে যেন তাহার সমস্ত পথের সমস্ত আলোটাই লুটিয়া মুছিয়া নিঃশেষ করিয়া লইয়া গেছে, এখন যে আলোক ধরার বক্ষটিকে রাঙাইয়া তুলিয়াছে যেন সে তাহারই ছায়া মাত্র। আসলের সহিত এতটুকু মিল তাহার নাই। সে সৌন্দর্য নাই, সে প্রচণ্ড তেজ নিয়াছে, কেবল একটু খানি ছায়া লইয়া তাহাকেই রঙ করিতে আই বাহিরে দাঁড়াইয়া আছে।

হঠাৎ কাহার করস্পর্শে চমকিয়া উঠিল। মুখ তুলিতেই বিমান বিহ্বলের মত লাফাইয়া উঠিয়া, কাপড়টা গুছাইতে গুছাইতে কহিল—অজিত!

অজিত বিছানায় বসিতে বসিতে বলিল—এত বেলা অবধি ঘুমুচ্ছিলে? তুমি যে খুব সকালে উঠ্‌তে বিমান দা!

আয় ভাই!—কথাটা বলিতে গিয়াও বলিতে পারিল না। হিয়ার তলদেশে কোথাকার একটা বাষ্পোচ্ছ্বাস হঠাৎ জমিয়া উঠিয়া তাহার কণ্ঠরোধ করিয়া ফেলিল।

অজিত জিজ্ঞাসিল—কি দাদা...

হ্যাঁরে অজিত! তুই নাকি আর একদিন এসেছিলি? আমায় তুলে তাই দেখা হয় নি।

তা-তো হয়-ই নি। আমি সেদিন এসে দেখা না পেয়ে একখানা কার্ড অবধি ফেলে গেলুম যে দাদা নিশ্চয়ই একবার যাবে—তা তিন চারদিনের মধ্যে বোধ করি সময়ই হ'ল না?

বিমান অজিতের হাতটা টানিয়া নিজের কপালের উপরে রক্ষা করিয়া বামহস্তে তাহাকে নিকটে টানিতে টানিতে স্নেহনিসিক্ত স্বরে কহিল—হ্যাঁ ভাই, সময় হ'য় নি।

অজিত সানন্দে বলিল—আজ কাল না-কি ছবি আঁকছ?

বিমানের মুখ চোখের স্তিমিত ভাব দূর হইয়া গেল; দেখিতে দেখিতে মুখে একটা আনন্দ তৃপ্তির সুনিবিড় ছায়া পড়িল, সে সহর্ষকণ্ঠে কহিল—বিশ্বরাণী দেখেছিস বুঝি তুই? ও-ভাই আমার ছেলে-বেলার আঁকা ছবি, সে-দিন যেখনাদ বাবু এসে নিয়ে গেলেন। কেমন দেখলি বে?

আমি দেখিনি দাদা, কাল রাত্রে কিরণ দা' এসেছিলেন, তিনিই বল্‌ছিলেন। তোমার কাছে "বিশ্বরাণী" আছে একখানা?

আমার কাছে ত নেই ভাই!

পাও নি?

পেয়েছিলুম—কে নিয়ে গেছে।

অজিত বিরক্ত ভাবে বলিয়া উঠিল—আঃ জ্বালাতন করেছে! কে-আমার নিয়ে গেল এমি ধারা, আচ্ছা ত? বলি তোমার যে কাগজ-পত্র গুলো নষ্ট করো না...

বিমানের মুখ আবার আঁধার করিয়া আসিল, এক মুহূর্ত পরে বলিল—আর নষ্ট হবে না ভাই। এবার থেকে সব রাখ্‌ব।

অজিত বলিল—বেশ, রেখো। কিন্তু আমি যে সেইটা দেখ্‌বার জন্যই ছুটে-ছুটে আস্‌ছি—আনাতে পার না? কে নিয়ে গেল?

বিমান নতমুখে বলিল—সে-ই ভাই, সেই নিয়ে গেছে।

অজিত অবাক্ হইয়া চাহিয়া রহিল, বিন্দুমাত্র বুঝিতেও পারিল না। কিন্তু বিমানের গলার স্বরে তাহার মনের মধ্যে কেমন একটি সূক্ষ্ম খোঁচা জাগিয়া উঠিয়াছিল, দুই মুহূর্ত নীরব থাকিয়া বলিল—কে বল দিকিন বিমান দা?

সে কথার কোন উত্তর না দিয়াই বিমান দু'হাতে অজিতকে জড়াইয়া ধরিয়া বলিয়া উঠিল—তোকে একখানা এনে দেব' খন অজিত, সে কথা যেতে দে—ভাই!

সন্দেহের মাত্রা আরও অনেকখানি বাড়িয়া গেল, কিন্তু সন্দেহ ভঞ্জন করিয়া লইবার মত দৃঢ়তা বা সাহস তাহার হইল না। বিশেষ করিয়া বিমান তখনও তাহাকে আলিঙ্গন বদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে, তখনও তাহার মুখখানা অজিতের বুকের উপর দুলিতেছে। কথাটার সঙ্গে যে বিমান-দা'র একটা দুঃখের ইতিহাস জড়িত হইয়া আছে এটুকু বুঝিতে তাহার বিলম্ব হয় নাই এবং বার বার সে-কথায় উল্লেখে যে দুঃখ বাড়িবে বৈ কমিবে না ইহা জানিত বলিয়াই অজিত বলিল—থাক্ গে, তুমি বিকেলেই আমাকে একখানা আনিয়ে দিচ্ছ ত?

বিমান মুখ তুলিতে, অজিত স্তম্ভিত হইয়া গেল, সে কি পাণ্ডুর, মুখ, ব্যথা-ম্লান চোখ দু'টি। বিমান বলিল—দেব ভাই দেব, আনিয়ে দেব।...সে থামিল, এক মিনিটপরে গদ্‌গদস্বরে আবার কহিল—তুই তা'কে চিনিস্, অজিত?

কা'কে দাদা?

পটলকে?

কৈ না। কে, দাদা?

নাঃ! তারপর, তোর কি খবর বল্?

চলো, ডিসপেন্সারী করেছি, দেখ্‌বে না?

অজিতের পিঠটায় খুব জোরে গোটা কুড়ি কুলা চাপড় মারিয়া বিমান বলিল—করেছিস্ বুঝি? কোথা রে?

ঐ বিজন-গার্ডেনের দামনে। আচ্ছা তা'লে, এখান থেকে আমার ওখানে, গিয়ে চা-টা খেয়ে যাওয়া যাবে।

বিমান মৃদু হাসিয়া বলিল—হাতে তুই ডাক্তার?

অজিতও হাসিয়া, বলিল—কি মনে হয়?

উঁহু, তোকে ডাক্তার বলে কিছুতেই মনে হয় না অজিত।

কিন্তু ডাঃ অজিতকুমার ঘোষ, বি এস্-সি এম্-বি—এ আর সন্দেহ করবার যো-টি নেই।—বলিয়া অজিত হাসিতে হাসিতে দাঁড়াইয়া উঠিল।

সেই বুঝি?—বলিয়া বিমানও উঠিল, বলিল—একাতই যেতে হ'বে?

হ্যাঁ গো—হবে। নাও, একটা জামা-টামা গায়ে দিয়ে নাও।

বিমান যখন অজিতের বাহু সবল বেষ্টনে বাঁধিয়া পথে বাহির হইয়া পড়িল তখন যেন সে অনেকটা পরিত্রাণ লাভ করিয়া সুস্থ হইয়া উঠিয়াছে। অজিত গল্প করিতে করিতে তাহার মাতুলমহাশয়ের গাড়ী বারান্দার নীচে আসিয়া যখন বলিল—আমার মামার বাড়ীতেও তুমি পরিচিত—তখন বিমানের সত্যই এইরূপ অনুভূত হইল যে অনেক দিনের রোগভোগের পর স্বাস্থ্যকর স্থানে বায়ু পরিবর্তন করিয়া এই মাত্র সে ফিরিয়াছে, দেহে-মনে যথেষ্ট স্বাস্থ্য সঞ্চয় করিয়া। কোথাও আর তাহার অভাব বা শূন্যতা বলিয়া কোনো পদার্থ নাই! সে হাসিতে হাসিতে ঝিঙলে উঠিয়া অজিতের বসিবার ঘরে বসিয়া পড়িল।

১২

পশ্চিমাকাশে মেঘ উঠিয়া ওদিকটা একেবারে কালো করিয়া ফেলিয়াছে, এদিকটায় তখন সূর্য্য কিরণ ওদিকের কৃষ্ণ-বক্ষে প্রতিফলিত হইয়া দিগন্ত ভেদে এ-দিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছে, একটা কাঠের রেলিং দেয়া বারান্দার রেলিঙের উপর চিবুক রাখিয়া একটি বাইশ চব্বিশ বছরের মেয়ে একরাশ চুল ছড়াইয়া দিয়া সতৃষ্ণমুখে রাস্তার লোক চলাচল দেখিতেছিল। পথচারী যুবা-বৃদ্ধ সকলেরই তীক্ষ্ণ খর দৃষ্টি গুলি যে তাহাকেই বিদ্ধ করিয়া যাইতেছে তাহাও তাহার অজ্ঞাত ছিল না। অথচ আকাশ যখন একটা আলো আঁধারের খেলায় নবীন রূপ বারণ করিয়া লোকের দৃষ্টি মোহিত করিয়া দিতেছিল, প্রভাতের মধুর মোহ যখন মনে প্রাণে সজীবতা সঞ্চার করিয়া তুলিবারই কথা, সে হেন সময়েও মেয়েটির শরীরে এমন আলস্য বিরাজ করিতেছিল যে লোকগুলার ঘৃণিত ও লালসা পূর্ণ দৃষ্টির সম্মুখ হইতে একটু ঘুরে সরিয়াও যে দাঁড়াইবে এ ইচ্ছা মনে জাগিলেও কার্য্যকর হইতেছিল না। সেই যে রেলিঙটায় ভর দিয়া সে দাঁড়াইয়াছিল যেন বহুকাল হইতে ঐ ভাবেই সে দাঁড়াইয়া আছে ও অনন্ত কাল দাঁড়াইয়াই থাকিবে। হঠাৎ কোন-কোন পথিকের শানিত দৃষ্টি তাহাকে এমনই খোঁচাইয়া দিতেছিল যে কতবার মনে হইল, থাক্ ভিজা চুল, সরিয়া যাই আবার তখনি অজিতকে মুখ করিয়া ভাবিল—কেন সরিবে? মরে-মরুক না কতকগুলা অপদার্থ জীব—তাহার কি। দেখিয়া দেখিয়া আপনা হইতেই সরিয়া যাইবে।

হায়রে! এই পাকলেরই একদিন ছিল যখন কারণে অকারণে প্রয়োজনে অপ্রয়োজনে, সময়ে এবং অসময়ে সৌন্দর্য্য পিপাসু লোক গুলির উৎসুক দৃষ্টিকে এমন অবহেলা করিয়া ফিরানো তাহার পক্ষে অসম্ভবই ছিল। যখন সেই দৃষ্টিকে আলাইয়া পোড়াইয়া ঘাঁবাইয়া দিতে এই চোখের তারা দুটিকে সব সময়েই সে আয়ত্ত ও শাসনাধীন করিয়া রাখিয়াছিল। সে যেন বালকের সামনে ক্রীড়নক! দেখিলেই চাই! ফুটবল, একটুখানি গড়াইয়া দিতেই হইবে, খেলাধূলাই হৌক, আর নাই হৌক! অতি ক্ষুদ্র, অতি তুচ্ছ লোকের দৃষ্টিকেও অনাদরে সে ফিরায় নাই, সমুচিত উত্তর দিয়াছে!

আর আজ! আজ মনে হইল মরে মরুক। আপনা হইতে মরুক! তাহার কি! সে তাহাদের মরণে এতটুকু সাহায্যও করিবে না, মরণের পানে কাহাকেও ডাকিবে না, কাহাকে আসিতেও দিবে না, তবু যদি কোন মূঢ় জীব আসে, আসুক, মরে মরুক!

অথচ এই হত্যার আনন্দ ছিল সবার চেয়ে বেশী তাহারই। রূপের বহ্নি জ্বালাইয়া অভাগা পতঙ্গদের পুড়াইয়া মারিতে ভগবান সে আগুনকে যেমন মনোরম করিয়া সাজাইয়া দিয়েছেন, তাহাকে দর্ব্বগ্রাসী করিতে কলা কৌশল চাতুর্য্য—এ শিক্ষাও তেমনি হইয়াছিল পাকলের সর্ব্বোচ্চ শ্রেণীর! কিন্তু সেদিন গিয়াছে! আজ হত্যার নামে সে নিজেই শিহরিয়া উঠে! অবোধ মূর্খ, শক্তিহীন ছাগশিশু গুলাকে বলি দিয়া, কি করিয়া যে এত আনন্দ পাইয়াছে, বিশ্ব অন্বেষণ করিয়া আজ আর সে তাহা বুঝিতে পারে না। আজ সে অকপটে স্বীকার করিয়াছে, অক্ষম ক্ষমতাভিমানী মানুষ তাহাকেই বধে, যে অসহায় দুর্ব্বল, ছাগশিশুর মতই যে বেচারী হায়! আর সিংহ, সে গহন বনেই থাকে, তাহার কেশর স্পর্শ করাও মানুষের সাধ্যায়ত্ত নহে! তবে কিসের, তাহার ক্ষমতার অভিমান! কিসের গর্ব্ব করিয়া মিথ্যা মরে সে। মানুষ তবেই হইত শক্তিমান, ক্ষমতা-

পারী যদি সে ঐ ৩টা চিত্র প্রকৃতির জীবের উপর সমভাবেই তাহার প্রভাব বিস্তার করিতে পারিত। তা যখন তাহার ক্ষমতার অতীত, তখন থাক সে আপন বিষয়ে মাথা গুঁজিয়া। কাজ নাই আর তার আস্ফালনে—খাক্।

(ক্রমশঃ)

কংগ্রেসের "প্রোগ্রাম।"

(শ্রীহেমন্তকুমার সরকার)

(২)

গতবারের প্রবন্ধে বলিয়াছি—"স্বরাজকে খুব ভবিষ্যতের লক্ষ্য রাখিয়া আপাতত সামনে একটা কিছু রাখিয়া আন্দোলনের সহিত আমাদিগকে বুঝিতে হইবে। সেই "একটা-কিছু" কি, তাহা ঠিক করাই পরবর্ত্তী কংগ্রেসের কার্য্য।" হুহুক চিরকাল চলিতে পারে না—উত্তেজনার পর অবসাদ আসিবেই! উত্তেজনায় যারা জাতি বড় হয় না। এসকল কথাই সত্য। কিন্তু যুদ্ধের সময় যাত্তের প্রাণমাতানো সুরের যেমন প্রয়োজন, আমাদের এই অহিংস যুদ্ধেও একটা প্রাণমাতানো কিছু চাই। এখন আমাদের লক্ষ্য জাতির সকলকে খদ্দর পরানো। শুধু এই কাজটা করিতে হইলে অন্তত ৫০ বৎসর লাগিবে, তাহাতেও হইয়া উঠিবে কিনা সন্দেহ। কারণ ইহার অর্থনৈতিক ভিত্তি সুদৃঢ় না হইলে সফলতার সম্ভাবনা নাই। সস্তায় খদ্দর বিলাইয়া বস্ত্রসমস্যার সমাধান বৃথা চেষ্টা। ক্যাক্টরি করিয়া খদ্দর তৈয়ারি করিয়া দেশের অভাব পূরণ করিতে গেলে বিদেশীর প্রতিযোগিতা সব নষ্ট করিয়া দিবে। যতদিন না ঘরে ঘরে তুলার গাছ ও চরকা হইতেছে, ততদিন খদ্দর আন্দোলনের সফলতা সুদূরে। কংগ্রেসের কাজ হওয়া উচিত যথাসম্ভব অল্প মূল্যে অথবা বিনামূল্যে ঘরে ঘরে তুলার বীজ বিতরণের ব্যবস্থা। লোকে অনেক সময় চরকা চাহিয়াও পায় না—কোন্ চরকায় কম পরিশ্রমে বেশী তুলা হয় তাহা জানে না। অনেক গরীব লোক চরকা পাইলে পরে সুতা কাটিয়া মজুরী হইতে দাম শোধ দিতে পারে। তাঁতিরা চরকার সুতা প্রায়ই বুনিতে চায় না। পরিশ্রম করিয়া সুতা কাটিয়া যদি বিক্রয় না হয়, বা বুনিয়া লইতে না পারা যায় তাহা হইলে উৎসাহ কেমন করিয়া থাকিবে? এই সকল সমস্যা সমাধানের চেষ্টা অবিলম্বে কংগ্রেসকে করিতে হইবে। মাঠে তুলার চাষ করিয়া তুলা বিক্রয়ের বন্দোবস্ত হইলে বিদেশী যে কোনও মুহূর্ত্তে আমাদের আন্দোলন ব্যর্থ করিবার জন্য অসম্ভব মূল্যে সেই তুলা কিনিয়া লইতে পারে। সেইজন্য ঘরে ঘরে তুলার গাছ ও চরকা এবং গ্রামে গ্রামে তাঁত বসানো—এই লক্ষ্য রাখিয়া কাজ করিতে হইবে।

কিন্তু কাজ করিবে কাহারা? যে কয়েকজন স্কুল কলেজের ছাত্র এখনও লাগিয়া আছে, তাহারা অনাহারে আর কত দিন কাজ করিবে? কংগ্রেসের সভ্য হইতে লোকে আর চায় না—তিলকতাণ্ডারে টাকা—খুব কমই উঠিতেছে। কেন এমন হইতেছে, তর্ক করিলে উপবাসী কর্ম্মীগণের পেট ভরিবে না। আমাদের কর্ম্মক্ষমতার অভাবে এমন হইয়াছে। মায়ের অসুখ করিলে সন্তান শুধু যদি দিন-রাত অশ্রুবর্ষণ করে এবং দুই হাতে টাকা ছড়ায়—তাহাতে অসুখ সারে না। রীতিমত বৈজ্ঞানিক উপায়ে চিকিৎসা দরকার। বিকারের রোগীকে ওষুধ হাতে দিয়া পাঁচ মিনিটে ঘুম ছাড়াইয়া আরাম করিবার চেষ্টার ন্যায় আমাদের চেষ্টা বিফল হইবে। পুত্রের মাতৃভক্তিই মাকে আরাম করিয়া দিবে না। রোগ যাহাতে সারে তাহার বন্দোবস্ত আমাদের কাজের মধ্যে ছিল না—অদূর ভবিষ্যতে হইবে এমন সম্ভাবনাও দেখা যাইতেছে না।

ইহার ভবিষ্যৎ ফল কি হইবে, অনুমান করা দুঃসাধ্য নহে। যে সকল যুবক সর্ব্বস্ব বিসর্জ্জন দিয়া এখনও টিকিয়া আছে, তাহারা একটা শেষ না দেখিয়া ছাড়িবে না। বর্ত্তমান উপায়ে না হয়, তাহারা অন্য পথ দেখিবে। বুভুক্ষু জনসংঘের অভাবের ও লাঞ্ছনার ভার কদিন না। প্রতীক্ষায় না হইলে কোন দিন হঠাৎ আগ্নেয়গিরির বিস্ফোরণের মত সমাজে কি বিপৎপাত উপস্থিত হইবে কে জানে? গবর্মেণ্ট ও গবর্মেণ্টের রক্ষাকারী স্বার্থ সম্বন্ধে অতির উচ্চস্তরের সমাজ তখন কি অবস্থাপ্রাপ্ত হইবে? বর্ত্তমান নেতাগণের হাত হইতে এ আন্দোলন ছুটিয়া যাইবে। হয় তো অন্ধ বিদ্রোহী শক্তির সম্মুখে তাঁহাদিগকেই প্রথমে বলি হইতে হইবে।

সেইজন্য জাতীয় শক্তিকে নিয়ন্ত্রিত করিবার জন্য আট ঘাট বাঁধিয়া কংগ্রেসকে চলিতে হইবে। জাতির সমস্যাগ্রস্ত শক্তিকে মঙ্গলময় পথে পরিচালিত করিয়া দিতে হইবে—তাই আপাতত সামনে একটা লক্ষ্য করিয়া দিতে হইবে—যাহা লইয়া সকলে লড়িতে পারে এবং লড়িতে লড়িতে সিদ্ধির পথে অগ্রসর হইতে পারে। আগামী প্রবন্ধে এই লক্ষ্য সম্বন্ধে আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল।

"মৃগেশ বাহিনী মহেশ ঘরণী
সুরেশনন্দিনী বামা।"

Laksmibilas Press, Calcutta

সচিত্র সাপ্তাহিক পত্রিকা

বাসন্তী

১ম বর্ষ] ৬ই আশ্বিন শনিবার ১৩২৯, ইং ২৩শে সেপ্টেম্বর। [১২শ সংখ্যা

দুর্গোৎসব তত্ত্ব।

(স্বর্গীয় রায় বাহাদুর কালীপ্রসন্ন ঘোষ, বিদ্যাসাগর,
সি-আই-ই, মহোদয়ের অসমাপ্ত রচনা।)

মহালয়ার মহা মোহময় অন্ধকার। মেঘের গর্জ্জন, মুষলধারায় বৃষ্টি, মুহুর্মুহুঃ বজ্রের লোক-ভয়ঙ্কর কড়মড় শব্দ। যে সময়ে সময় বিশেষে মৃদু মৃদু প্রবাহিত হইয়া কম-বিকসিত কুসুম-কলিকার আনন্দাশ্রু স্বরূপ শিশির বিন্দুটি লইয়া খেলা করে, এবং অট্টালিকার সুচারুচিত্রিত গবাক্ষপথে প্রবেশ করিয়া বিলাসিনীর অলকদামে বিলম্বিত রহে, আজি সে একাই এক কোটি বৃত্রাসুরের আসুর বল প্রয়োগ করিয়া হুহুঃ শব্দে গর্জ্জিতেছে,—গাছপালা উপাড়িয়া ফেলিতেছে, ঘর দুয়ার উড়াইয়া নিতেছে, এবং নদী ও সমুদ্রের বক্ষে পর্ব্বতের মত তরঙ্গ তুলিয়া জলে স্থলে এক করিয়া লইতেছে। ইহা কি? ভাবিবার পথ পাই না। ভাবিয়াও এ বিশ্ব-রহস্যের অন্ত পাই না। জগতের এসকল শক্তি কোথা হইতে আসে? কোথায় চলিয়া যায়? জড়বিজ্ঞান জীবকে জগদ্গুরুর ন্যায় উপদেশ করিতেছে যে—কিবা জন্ম, কিবা বৃদ্ধি, কিবা নাশ, কিবা সৃষ্টি, সমস্তই জগদ্বিহিত অন্ধশক্তির উন্মাদ লীলা, তুমি সেই শক্তির তত্ত্ব বুঝিতে বরপর হও। উহার কাছে ভালমন্দ ভেদ নাই, সাধু অসাধু বিচার নাই,—তুমি উহাকে শরণ করিয়া ধন্যতম হও।

ভয়ে ও বিস্ময়ে অভিভূত এবং চিন্তায় বাহ্যজ্ঞান হারা অবসন্ন হইয়া পড়িয়া রহিলাম। ভাবিলাম, যদি অন্ধ শক্তির এত খেলাই জগতের অনন্ত লীলা, তাহা হইলে জীব কাহার কাছে দাঁড়াইবে? দুঃখে কাহার শরণ চাহিবে? সুখেই বা কাহার কাছে মাথা নোয়াইবে? এমন সময় কাণে যেন শুনিলাম—কে কহিল জানি না, কিন্তু কাণে যেন ভক্তি-বিজ্ঞানের প্রতিধ্বনি-স্পষ্টই শুনিলাম যে, যিনি এই বিশ্বসংসারের সূক্ষ্ম ও স্থূল শক্তি লইয়া অনন্তকাল হইতে অনন্তকাল এইরূপ লীলা করিতেছেন, তিনিই সকল শক্তির মূলশক্তি, তিনি মূঢ় ও মতিহীনের চক্ষে কখনও কখনও অন্ধতমসা বিকরালার ন্যায় পরিলক্ষিত হইলেও আলোকই তাঁহার তনু। তাঁহার নাম অনাদ্যা যোগমায়া। তিনিই জীবের দুঃখদুর্গতি-হারিণী দুর্গা। তাঁহাকে মাতৃজ্ঞানে পূজা কর। যদি হৃদয়ে শীতল হইতে চাও, তাঁহাকে মা বলিয়া ডাক।০

তুমি অশক্ত দুর্ব্বল, সেই মহাশক্তিরূপিণী মায়াময়ী মায়ের কাছে শক্তি প্রার্থনা কর। তুমি অন্নাভাবে ভিখারী, মাতা অন্নপূর্ণার কাছে অন্নপানীয় ভিক্ষা চাও। তুমি জল ও বায়ু প্রভৃতি প্রাকৃতশক্তিনিচয়ের জগৎ-আলিঙ্গী ভৈরব-লীলা দেখিয়া হৃদয়ে ভয় পাইয়াছ, মাকে অভয়া বলিয়া ডাকিতে থাক। তুমি অসুর রাক্ষস সদৃশ শত্রুচয়ের ঈর্ষ্যাজনিত পাপাচারে প্রপীড়িত হইয়াছ, অথবা জীবনের দুঃখদুর্গতিতে রথ-চক্র-নিষ্পেষিত জীবের ন্যায় কতবিক্ষত হইয়া পড়িয়া রহিয়াছ, এ সময়ে মাকে

০ অনুক্রম।

একবার উচ্চৈঃস্বরে দুর্গা বলিয়া ডাক। ইহাই সকাম উপাসনা এবং ইহাই তোমার উপাসনার আরম্ভ। যে সেদিন মায়ের স্তন্যপান করিয়া পুষ্টিলাভ করিয়াছে এবং চিত্তের পরিতুষ্টির জন্য বনলতার ফুল ও পাতা আহরণ করিয়াছে, সকাম সাধনাই তাহার প্রকৃষ্ট পথ। তুমি শিশু—মায়ের কাছে কামনা জানাইতে ভয় পাইবে কেন? তোমার যে বিষয়ে যে কোন কামনা থাকে তাহা লইয়াই মায়ের কাছে উপস্থিত হও, এবং যিনি এই অনন্ত বিশ্ব-প্রসবিনী ভুবন-মোহিনী মা, তাঁহাকে কিরূপ ভক্তি ও কিরূপ ভালবাসায় ভজিতে হইবে তাহা শিশুর প্রাণে, শিশুর জ্ঞানে, শিশুর ধ্যানে এবং শিশুর অনতি বিকশিত শক্তির পরিমাণে, এইভাবে ও এইরূপে শিক্ষা করিতে আরম্ভ কর।

কথাগুলি হৃদয়ে পশিল। হৃদয় স্তম্ভিত হইল। স্তম্ভিত হৃদয় অতীত ঐতিহাসিক কথার আশ্রয় লইয়া কালের স্রোতে উজান চলিল। তখন দেখিলাম, সাগর-পরিবেষ্টিত স্বর্ণ-লঙ্কার দ্বারদেশে জীবের দুঃখহারি ধনুর্দ্ধারী রাম, এবং তাহার সম্মুখে আরাধনার অমল পদ্মাসনে অনন্ত-শক্তিরূপিণী অনাদিকাল-বিলাসিনী দুঃখ-রূপ দনুজ-নাশিনী দুর্গার আনন্দ-বিগ্রহ।

শ্রীরামচন্দ্র কলাপক্রতা জানকীদেবীর পুনরুদ্ধারের জন্য স্তুতিপাঠ করিতেছেন—

"নমস্তে সর্ব্বাণী, ঈশানী ঈড্যাণী,
ঈশ্বরি ঈশ্বর জায়া।
অপর্ণা অভয়া, অন্নপূর্ণা অম্বা,
মহেশ্বরী মহামায়া।
দেবী বিশ্বম্ভরী, দুর্গে দুর্গা অরি,
কালিকে করাল বেণী।
শিবে শঙ্করাত্মা, চণ্ডী চন্দ্রচূড়া,
ঘোর রূপা এলোকেশী।
সর্ব্ব জ্যোতিষ্মতী, ত্রৈলোক্য মোহিনী,
নমস্তে লোলরসনা।
দিক্-বিদিগন্তা, সর্ব্বত্র ব্যাপনা,
বিশ্বা বিকট দশনা।
সারিণী বরদা, তারিণী তারিণী,
অম্বা মোক্ষদা জায়া।
মৃগেশ বাহিনী, মহেশ ঘরণী,
সুরেশ নন্দিনী বামা।
কামাখ্যা কল্যাণী, হারা
মহারমা কাত্যায়নী।
শমন ত্রাসিনী, অরিষ্ট নাশিনী,
দয়াময়ী দাক্ষায়ণী॥
হের মা পার্ব্বতি, আমি দীন অতি,
আপদে পড়েছি বড়।
সর্ব্বথা চঞ্চল, পদ্মপত্রে জল,
ভবে ভীত জড় সড়।
বিপদে আমার, না হয় তোমার,
বিড়ম্বনা করা আর।
অকিঞ্চনে দয়া, করগো অভয়া,
দুঃখার্ণবে কর পার।"

শ্রীরামচন্দ্রের সেই পুরাতন উৎসবই আজি ভারতের গৃহে গৃহে দুর্গোৎসব। বোধহয় পৃথিবীর কোন দেশে কোন কালেই কোনরূপ জাতীয় উৎসব এমন আনন্দের উৎসবরূপে পরিণত হয় নাই। কেননা, যিনি উৎসবের আরাধ্যা, তিনি আনন্দময়ী মা, এবং যাহারা উৎসবে ব্যাপৃত, তাহারা কপিলের ন্যায় জ্ঞানী, কুবের তুল্য ধনী অথবা রাজাধিরাজ চক্রবর্ত্তী হইলেও, আজি মাতৃস্নেহের ভিখারী শিশু। যে কাঙ্গাল, সে কাঙ্গালের-ভাবে মায়ের যত বিবসন আর নয়নজল মাত্র আহরণ করিয়া মা বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতেছে। যাহার গৃহ ঐশ্বর্য্যের অক্ষয়ভাণ্ডার, সেও আজি মায়ের প্রীত্যর্থে শত সহস্র লোকের প্রাণ শীতল করিয়া ঐ কাঙ্গালের কাছে কাঙ্গালের মত যুক্তকরে দণ্ডায়মান হইতেছে।

বস্তুতঃ ভারতের এই দুর্গোৎসবই ধর্ম্ম—অর্থ—কাম মোক্ষ রূপ চতুর্বর্গ ফলের কল্পপাদপ, ভক্তি ও শক্তির সুখ-সম্মিলন-ক্রীড়াভূমি, জীবের সহিত জীবের ধর্ম্মসঙ্গত ভ্রাতৃপ্রেমের স্পৃহনীয় প্রস্রবণ, এবং ভগবতীর পদারবিন্দ, প্রাণের পুষ্প-পত্রাঞ্জলিপূত পবিত্র সোপান। মা অনন্ত বিশ্বরাজ্যের রাজরাজেশ্বরী, তথাপি তিনি ভিখারীর মা। মা দশটি ভুজে খড়্গ, খেটক, বজ্রাদি নানাপ্রহরণধারিণী, মহিষাসুরমর্দ্দিনী, মত্তসিংহবাহিনী, ভয়ঙ্করী। তথাপি তিনি বরাভয় করা, করুণ-স্নিগ্ধ-নয়না, অভয়া। মা ত্রিভুবনৈশ্বর্য্য-বিলাসিনী, ত্রিকালদর্শিনী, মুণ্ডমালিনী। কিন্তু তথাপি

তিনি শতচন্দ্রসমুজ্জ্বলা, সৌরাননা, সুন্দরী। যাহারা এই বিষসংসাররূপ মহাসমুদ্রের মন্থনজনিত গরলরাশির মধ্যে অমৃতের জন্য লালায়িত, মায়ের চরণ-পদ্মই তাহাদিগের আশ্রয়স্থান। আজি জগদ্ধাত্রী জগজ্জননীকে আমার প্রাণারাধ্যা মা বলিয়া পূজা করিব; ইহার পর আর সৌভাগ্য-সম্পদ কি?

কিন্তু মায়ের এ আনন্দ কোলাহলময় অপূর্ব্ব উৎসবে আর একটি অতি গূঢ়ভাব ও অতি গভীর রস নিহিত রহিয়াছে। যখন উপাসকের হৃদয় সে ভাবে উদ্ভাসিত ও সে রসে পরিপ্লাবিত হয়, তখন নয়নে আপনা হইতেই অজস্র ধারা বহে, তখন পাষাণের কঠিন প্রাণ ও নবনীতের ন্যায় দ্রবীকৃত হইয়া মায়ের দিকে প্রধাবিত হয়। মা সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়-রূপিণী অচিন্ত্যশক্তি হইয়াও ভারতের এ দুর্গোৎসবে, দীন দুঃখী কাঙ্গালের ঘরেও মেনকার উপস্থার মেয়ে।

বেচারা খোকা।

মায়ের সখী। তাই ত ভাই মনোরমা, তোমার এমন অসুখ-টা হ'ল! তা কি ওষুধ বিষুধ খাচ্ছ?

মা। কি আর খাব ভাই? ওর কি কোন ওষুধ আছে?

মেয়ে। আছে মা, আছে।

মায়ের সখী। এই নাও তোমার মেয়ে ধন্বন্তরি হ'য়ে পড়েছে। কি ওষুধ রে শশি?

মেয়ে। পর-নিন্দে। বাবা রোজ মা'কে বলে—— পরনিন্দে না করলে ভাত হজম হয় না!

পূজোর ছুটি

(শ্রীবিজয়রত্ন মজুমদার)

শৈলেশ বাড়ীর মধ্যে পা দিতেই শৈলেশের জননী গাঢ় স্বরে বলে উঠ্‌লেন—আমার চিঠি পাস্‌-নি শৈল ?

শৈল মাতার প্রশ্নে অবাক হয়ে গেছল ; পূজা বাড়ী এসেছে, পূজা আসার আর জননীর মুখে এই প্রশ্ন ! বল্লে—কৈ-না। কবে লিখেছিলে ?

মা ভেবে বল্লেন—পর্ত্ত। পাস্‌-নি ?

না—বলে সে ব্যাগটা রোয়াকের কোনে ধপ্‌ করে' ফেলে মা'র পায়ের কাছে নত হ'য়ে বলে উঠ্‌ল—বাড়ীর সব ভালো মা ?

জননী শৈলেশের চিবুক স্পর্শ করে বল্লেন—হ্যাঁ। তুই ভাল ছিলি ?

শৈলেশ ভালই ছিল, বল্লে। বলে' সেইখানেই বস্‌ল। মা আর একটি কথাও বল্লেন না, কোন প্রশ্ন করলেন না, সন্ধ্যা আগত দেখে ছড়ানো আতপ তণ্ডুলগুলি ধামায় তুল্‌তে লাগ্‌লেন।

শৈলেশ যথেষ্ট বিস্মিত হ'য়ে দেখ্‌ছিল, জিজ্ঞাসা করলে—কিছু দরকার ছিল না-কি মা ?

মা একবার মাত্র মুখটি একটু তুল্লেন, অস্পষ্ট স্বরে একটা যেন কি বল্লেন অথবা বলবার মত ভাব করলেন, শৈলেশ অত কাছে বসে থাকা সত্ত্বেও কিছু কিছুই বুঝতে পারলে না ; আবার জিজ্ঞাসা করলে—চিঠিতে কি লিখেছিলে মা ?

মা নতমুখে চাল তুল্‌তে তুল্‌তে বল্লেন—লিখেছিলুম, এ ক'দিন বাদে এলেই ভালো হ'তো !

শৈলেশ নির্ব্বাক, হতভম্ব ! ক'দিন বাদে এলেই ভালো হ'তো—অর্থ ? ছুটী হয়ে গেছে, যেসে পড়ে থাকবে—ব্যাপার কি ! প্রশ্ন কর্ত্তে যাবে মা ধীরে ধীরে ধামাটা কাঁকে তুলে বল্লেন—বা, জামা কাপড় ছাড়গে। বৌমা কৈ ...ঐ যে বৌমা ! বৌমা, ব্যাগটা নিয়ে যাও ত মা !—বলে তিনি ভাঁড়ার ঘরের দিকে চলে গেলেন। বধূ ঘোমটার ভেতর থেকে একটা হাসির ফোঁয়ারা ছেড়ে, ব্যাগটি তুলে ঘরে ঢুক্‌তেই নিরুপম নিরুপম শৈলেশ জিজ্ঞাসা করে—কি ব্যাপার ?

বধূ হেসে বল্লে—জল্‌...প্রণাম করে' পায়ের ধুলো মাথায় নিলে। শৈলেশ অন্যমনস্ক ছিল তাই, নইলে এই প্রণাম যে কেমন করে ফিরে দিতে হয় সে তা বেশ ভাল করেই জানত—কিন্তু তার মাথার মধ্যে তখন সেই চিঠির কথাটাই ঘুরেফিরে বেড়াচ্ছে, প্রণামের উত্তর দেওয়া হ'ল না ; জিজ্ঞাসা করলে—মা কি চিঠি লিখেছিলেন, জান ?

বধূ তার জামার বোতাম খুল্‌তে খুলতে বল্লে—জানি !—বলে' সে মুচকি হেসে জামাটা ছাড়িয়ে নেবার চেষ্টা কর্ত্তে লাগ্‌ল।

শৈলেশ বাধা দিয়ে বল্লে—কি লিখেছিলেন ?

বধূ হাসিমুখে তার দিকে চেয়ে একমুহূর্ত্ত চুপ থেকে বল্লে—আমার যাবার দিন হ'য়েছে যে...

মা লিখেছিলেন কি তাই শুনি ?

বধূ ধমক খেয়ে আরও বিব্রত হ'য়ে গেল, বল্লে সোমবারে আমার যাবার দিন হ'য়েছে কি-না...

আঃ—জ্বালাতন করেছে !

বল্‌ছি ত !—বলে বধূ পুনরায় হেসে ফেল্লে।

শৈলেশ খাট্‌ থেকে উঠে পড়ে বল্লে—বাড়ী আসাও দায় হ'য়ে উঠেছে দেখি !

বধূ কাতর স্বরে বলে উঠ্‌ল—বল্‌ছি? বোস। মা তোমাকে এ ক'টা দিন বাদ দিয়ে আসতে লিখে—

কোন্‌ ক'টা দিন ?

এই ক'টা দিন ! ব'লে বধূ একটুখানি নীরব থেকে গম্ভীর মুখে আবার আরম্ভ করলে—আট মাসে ত যেতে নেই কি-না ! এ মাসের ক'টা দিন গেলেই ন'মাসে পড়বে, তাই ওমাসের গোড়াতেই আমার যাবার দিন হ'য়েছে।

শৈলেশ তখনও কথাটা ঠিক ধরতে পারে নি, কোন্‌ খানটা যেন তার বুদ্ধি বিবেচনার অগোচরই ছিল,—বল্লে—আমাকে আন্‌তে বারণ করবার কারণ ?

বধূ এত সহজ কথাটা স্বামী কেন-যে বুঝতে পাচ্ছেন না, তা ভেবেই পেলে না। প্রথমটা সে ভেবেছিল, বুঝতে পেরেও তিনি অমনটা করছেন, এমন হ'তো কি-না তাদের—কিন্তু পরোপরি স্বামীর মুখের গম্ভীর মূঢ় ভাব দেখে সে ধারণা তার দূর হ'য়ে গেলো, তবে সহজ জিনিষটা না বোঝবার দরুণ যেন একটা রঙ্গের ভাব তার মনে জমে উঠেছিল, তাই একটু হাসি-হাসি গলাতেই

বলে—আহা! কচি খোকা আর কি? কিছুই যেন জানেন না।

শৈলেশ বিরক্ত হ'য়ে বলে—কি জানব?

এবার আর বধূর অপ্রস্তুত হইল না যে বাস্তবিক তিনি কিছুই জানেন না। এক মিনিট ভেবে, পাখাটা দু'হাতে ঘুঁইতে ঘুঁইতে সহ মিহি সুরে বলে—মা বলেন, আট ন'মাসে স্বামীর কাছে থাকতে নেই!—তার মাথাটা ঝুঁকে-ঝুঁকে এসে ঠেকল। তার পরেই প্রসারিত বাহুদ্বয়ে স্বামীর গলাটা জড়িয়ে ধরবার জন্যে হাত বাড়িয়েছে, শৈলেশ একটু সরে বসে' তা'কে বাধা দিয়ে জিজ্ঞাসা করলে—এ কথা মা তোমাকে বলেছেন?

বধূ পাখা নাড়তে নাড়তে জবাব দিলে—হ্যাঁ।

শৈলেশ স্তম্ভিত হ'য়ে গেল; দু দুহূর্ত্ত তার মুখ দিয়ে কথা বেরুল না। তারপর ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসা করলে—এ কথার মানে কি, শিশির?

শিশিরকণা মুখটা একটু ঘুরিয়ে, উজ্জ্বল হাসিটা ঘরময় বিদ্যুতের রেখার মত ছড়িয়ে দিয়ে বলে—মানে আবার কি?

শৈলেশ আরও আশ্চর্য্য হ'য়ে গেল এই ভেবে যে, যে কথাটা মা আলোচনা করেছেন শুনেই তার সর্ব্বাঙ্গ অমন সঙ্কুচিত হ'য়ে উঠেছে, শিশির সে কথাতেও হাসে কেমন করে?—এদের কি লজ্জা ঘেন্না বলে কোন জিনিষ নেই?—এই ভাবছে, শিশির খপ্ করে শৈলেশের কান দুটো ছুলে নিজের মুখে চেপে ধরে' বলে উঠল—ভেবে যে কাঠ হ'য়ে গেলে গো! এত কিসের ভাবনা?—বলে সে শৈলেশের গলা জড়িয়ে ধরলে।

শৈলেশের বিস্ময় অনেকটা হ্রাস পেয়েছিল; সে স্থির স্বরে জানতে—শিশির!

কি?

সত্যি এ কথার মানেটা···

শুনতে নেই গো, শুনতে নেই। ছি'ল? বুঝলে তুমি? নাও এখন ওঠ, হাত পা ধোও, জলটল খেতে হবে না?

শৈলেশ—উঁহুঁ—বলে শুয়ে পড়ল।

২

শৈলেশ আবার বলেছে, তোলা উনানে গুলগনে আঁচে কড়া চড়িয়ে মা গরম-গরম লুচি ভেজে তার পাতের ওপর ফেলে দিচ্ছেন, বধূ আসরে বসে' লুচি বেলছে, আর যদি সত্য কথা বলতে হয় মাঝে মাঝে চোখের তারা ঘিরে গোপনে এমন সব মর্ম্মভেদী কথা বলে উঠছে যে বেচারা শৈলেশের গলার ছিঁড়ে লুচির টুকরাগুলোও আড়ষ্ট হ'য়ে আটকে যাচ্ছে। মা মাঝে মাঝে অনুযোগ করছেন—কি খাচ্ছিস্ শৈল!—এই যে! বলে শৈল সবেগে কবিত্বপূর্ণ করবার চেষ্টা করছে।

দুধের বাটীটা এগিয়ে দিয়ে, মা বলেন, নবী ঠাকুরপোর বাড়ীতে চণ্ডী হ'চ্ছে, আমরা শুনে যাচ্ছি শৈল!

শৈল মুখ তুলে মা'র দিকে চেয়ে বলে—এখন চণ্ডী?

এই ত সময় রে!—বলে মা হাসলেন।

আরো দু'দিন আমরা পেছুলুম যে! বর্দ্ধমান থেকে একজন কথক এসেছেন, যেমন নধর দেহ, তেমনি কি গলা, যেন মধু ঢেলে দিচ্ছেন—বলতে বলতে, মা'র ভক্তি-প্রবণ হৃদয় গাঢ় হয়ে এল।

নাপতে বুড়ো এসে আমাদের নিয়ে যাবে।—বলে মা ছোট একটা রেকাবিতে করে' ক'টা সন্দেশ ও দু'টো নারকেল নাড়ু শৈলেশের পাতের সামনে ধরে' দিলেন।

'আমাদের' শুনে শৈলর বুকটা ছ্যাত করে উঠেছিল, কিন্তু সে একটি মুহূর্ত্তের জন্য; অসহায় মনে হ'তেই দুশ্চিন্তা দূর হ'য়ে গেল।

লুচি বেলা শেষ হ'তেই মা বধূর দিকে ফিরে বলেন—শৈলর পান কৈ বৌ-মা?

বধূ কোঁচার ঘর থেকে পান সেজ করে আনলে, শাশুড়ী বলেন—এইখানে রাখ বৌ-মা। আর এক কাজ কর ত বাছা, আমার আলমারিটা খুলে সবচের কাপড়খানা বের করে নিয়ে এস ত! ঐ যে কুলুঙ্গীতে চাবি।

বধূ চলে গেল, শৈলেশ আচমন করে' পান কটা হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, মা বলেন—তুই শুবে না শৈল! সারাদিন গাড়ীতে এসেছিস্।

এই যাই—বলে শৈল শয়নঘরে প্রবেশ করতেই, শাশুড়ী শিশিরকে ডেকে বলেন, যাও এস বৌ-মা!

নাপতে বুড়ো এসে শৈলেশের রেখে যাওয়া কলকাতা সহরের বর্ত্তমান অবস্থা, মহাত্মা গান্ধী জেল থেকে, এত ক্ষমতা থাকতেও কেন বেরিয়ে আসছেন না, পূজার বাজারে ধনীর বেচাকেনার সংবাদ-সম্বন্ধে আলোচনা করে' বেরিয়ে গেল, শৈলেশ বিছানার পরে কত কথাই ভাবতে লাগল। পাঁচ ছয় বৎসর বাড়ী এসেছে, পাঁচ মাসের

দারুণ ও দীর্ঘ বিরহভোগের পর আজ তার প্রিয়া মিলনের দিন! রাত্রি যতই বাড়ছে, তার দেহ-মন ততই অস্থির, ততই চঞ্চল হ'য়ে উঠ্‌ছিল। আলোটা কমিয়ে দিয়ে একদৃষ্টে দরজার দিকে চেয়ে পড়ে আছে, মা ডেকে বল্লেন, শৈল দরজাটা বাবা বন্ধ করে দে!

শৈলর মাথায় আচম্বিতে আকাশ ভেঙে পড়ল; অন্ধকার যেন বিকট হয়ে উঠে তাকে ভয় দেখাতে এল। কাঁপতে কাঁপতে শয্যা ত্যাগ করে আলোটি বাড়িয়ে দেবে, মা কাশতে কাশতে উদ্বেগে বল্লেন—চল বুড়ো!—শৈল যখন বাইরে এসে দাঁড়াল, কেউ কোথাও নেই,—অন্ধকার রাত্রি হাঁ করে পড়ে আছে,—ননী বুড়ো সদর দ্বার বন্ধ করছে।

শৈলেশ ফিরে এসে মুখ গুঁজড়ে শুয়ে পড়ল।

সারারাত চোখের পাতায় তার ঘুম এল না। রোষে ক্ষোভে জলে জলে রাত যখন পুইয়ে এল তখন মার গলার স্বর শুন্তে পেয়ে শৈল একেবারে লম্ফঝম্ফ গারণ করে' দুপ্‌দাপ শব্দ করে বাইরে চলে গেল।

৩

শৈল ঠিক করেছিল, এ বাড়ীতে সে স্নানও করবে না, এক গ্লাস জল-ও ছোঁবে না, মানুষ অনেক সময় যা ভাবে, কাজে তা হয়ে ওঠে না। তার ছেলেবেলাকার বন্ধুরা আট-টা বাজতেই ভিড় জমাতে সুরু করে' দিলে। ম্যালেরিয়ায় ভুগে, দারিদ্রে—আরো অনেক কারণে তাদের বেশীর ভাগই মৃতকল্প হ'য়েছিল, তারাও শৈলকে ধিক্কার দিয়ে বলে উঠল, সহরে থেকে থেকে ওটা অমানুষ হ'য়ে গেছে।...শৈলর অপরাধ সে দুপুরবেলাটায় কানাই রক্ষিতের তালপুকুরের লোভনীয় মাছের বংশ নির্ব্বংশ করতে প্রস্তুত হয় নি! রাজেন ঘরের কোণে বসে শৈলেশের আনীত সদ্য কলাকার 'ডেলি ছাত্র'খানার আদ্যন্ত পাঠ করে' মুদ্রাকরের নামের ওপর চোখ বোলাচ্ছিল বলে' উঠ্‌ল, শৈলের মৌয়ের পেটে নিশ্চয় যমক ছেলে আছে, নইলে পেট-টা এত বড় হ'বে কেন?

শৈল ছাড়া সকলে হো-হা করে' হেসে রাজেনকে ঘিরে পড়ল—কবে দেখ্‌লে? কেমন করে দেখ্‌লে এবং কি-বৃত্তান্ত!

রাজেন মুদ্রাকরের নাম ঠিকানা মুখস্থ করে বল্লে—কাল যে আমাদের বাড়ীতেই ছিল!

কাল??? তোদের বাড়ীতে? হঠাৎ? শৈল যে বল্লে, কাল সন্ধ্যেবেলা এসেছিল,—হ্যারে?

শৈল গুম্!

মুখ—মিছে কথা! বলে সবাই রাজেনকে ছেঁকে ধরে উড়িয়ে দেবার উপক্রম করলে!

রাজেন গম্ভীরভাবে বল্লে—না-হয় শৈলকে শুধো!

কেউ কোন প্রশ্ন করবার আগেই একটা হাঁ বলে শৈল উঠে দাঁড়াল, বল্লে, সে এখন একটু ব্যস্ত আছে, যদি সম্ভব হয় বৈকালে গঙ্গার ধারে meet করবে।

চরণ মাছ ধরবার প্রস্তাবটা আর একবার উত্থাপন করে' সাড়া পেলে না, তখন বন্ধুরাও পা তুললে। সবার শেষে রাজেন বেরুচ্ছে, শৈল বল্লে—দাঁড়া!

রাজেন দাঁড়িয়ে গেল। অন্য সকলে অদৃশ্য হতেই শৈলেশ বল্লে—তোর মেয়ে কেমন রেজো?

ভালোই ত!

ক'মাসের হ'ল রে? এইখানেই হ'য়েছিল না?

এই তিন। হ্যাঁ। এইখেনেই বই কি!

তোর শ্বশুর নিয়ে যেতে চান্-নি?

রাজেন হেসে বল্লে—চাইলেই বা যেতে দিচ্ছে কে? আমি পাই বলে দিইছিলুম, ওসব হ'বে না, বাবা! ওঃ কি আমার আত্তি গো! আমি শালা এদিকে মরি!—রাজেন খুব জোরে জোরে হাসতে লাগ্‌ল।

তা বটে!—বলে শৈল বাড়ীর মধ্যে ঢুকে গেল। মা গঙ্গাস্নানে গেছলেন, পিসির ভাঁড়ার ঘরের দোরের সামনে বসে পিঠের ওপর একরাশ এলো চুল ছড়িয়ে দিয়ে শুকাচ্ছিল—তা'কে দেখেই চাসিমুখে দাঁড়িয়ে উঠল, শৈলও সঙ্গে সঙ্গে ঘরে ঢুকে বল্লে—চান করবে না, জলটল...

শৈল রুক্ষভাবে তার দিকে চেয়ে বলে উঠল, কাল রাজেনের সঙ্গে দেখা হ'য়েছিল?

ওদের বাড়ীতেই ত ছিলুম আমরা। সুন্দর মেয়েটি হ'য়েছে ওদের—পিসির অতি জ্ঞানঘরে কথা ক'টি বলে আঁচলে জলহাত মুছতে লাগল!

তাদের বাড়ী চণ্ডীপাঠ হচ্ছিল?

না।

ঘৃণায় বিরক্তিতে শৈলেশের চিত্তমধ্যে আগুন জ্বলে উঠল! ছি! ছি! মা হ'য়ে এই মিথ্যাচরণ...

বধূ বল্লে—মা-ও তাই বল্‌ছিলেন?

কি?

বল্‌ছিলেন যে বাধা হ'য়ে মিথ্যে কথা···

হুঁ।

একমিনিট পরে শৈল গাঢ়স্বরে জিজ্ঞাসা করলে—শিশির! আমি কতদিন পরে এলেছি এবার?

হিসাব শিশিরের করাই ছিল, বল্লে—পাঁচ মাস! ঠিক পাঁচ মাস।

শৈল গম্ভীরভাবে বল্লে—পাঁচ মাস কি ভাবে কেটেছে, জান?

শিশির তা জান্‌ত, কিন্তু তার উত্তর নির্জ্জন ঘরেও প্রিয়তমের কাছে দিতে তার জিভে আটকে গেল।

বাইরে কার পায়ের শব্দ শোনা গেল, শিশির তাড়াতাড়ি "দুপুরবেলা থাক্‌ব—বুঝলে"—বলে' হেসে বেরিয়ে যাচ্ছিল, শৈল তার আঁচল ধরে' বলে উঠ্‌ল—কলকাতা যাবে?

শিশির নতস্বরে বল্লে—কলকাতা?

হ্যাঁ। এখানে আর আমার থাকবার ইচ্ছে নেই।—যাবে?

বধূ নীরব। হঠাৎ সে কি উত্তর দিবে?

শৈল অধিকতর গম্ভীরকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলে—যাবে?

মা?

সে ভাবনা তোমার নয়। তুমি যাবে কি-না তাই বল?

শিশির ভয় পেয়ে গেল; মনের ইচ্ছা কোনমতেই মুখে প্রকাশ করতে পার্চ্ছিল না, চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল।

শৈল তার আঁচল ছেড়ে দিয়ে দৃঢ়স্বরে বলে উঠ্‌ল—যাও।

শিশির গেল না। সেইখেনে নীরবে নতমুখে দাঁড়িয়ে ভাবতে লাগল।

শৈল পরুষ কণ্ঠে বলে উঠ্‌ল—দাঁড়িয়ে রইলে কেন? যাও—খুব হ'য়েছে।

এবার শিশির কেঁদে ফেলে! সে-ও যে সারারাত কেঁদেছে, কেঁদে কেঁদে বুক তার খালি হ'য়ে গেছে, কিন্তু কি করবে? একান্ত নিরুপায় বলেই যে শাশুড়ীর নির্দ্দয় আদেশ তাকে পালন করতে হ'য়েছে, নইলে স্বামী যাতে কষ্ট পান, তাতে তার সুখ? তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে কাজ করে অভাগিনী সুখী হবে! হায়রে!

শৈল বল্লে—তবু দাঁড়িয়ে রইলে যে! যাও বল্‌ছি!

শিশির খাটেতে বসে পড়ল; দুহাতে বস্ত্রাঞ্চল তুলে মুখ ঢেকে জোরে কেঁদে উঠ্‌লো!

এতখানি ছলনা শৈলর অসহ্য হ'য়ে পড়েছিল, সে বিকৃত কণ্ঠে বলে উঠ্‌লো—বাইরে গিয়ে কাঁদ গে...

শিশির কাঁদতে কাঁদতে বল্লে—আমার দোষ কি... মা যে···

আচ্ছা, যাও—বলে ঘর ছেড়ে শৈল বেরিয়ে যাবে, শিশির তার পা চেপে বলে উঠ্‌ল—আমি যাব।

আর যেতে হবে না···

না, আমায় নিয়ে চল, বলে শিশির তার শিশির ভেজা ফুলের মত মুখখানি শৈলর দু'পায়ের মধ্যে গুঁজে বল্লে—বল, নিয়ে যাবে?

৪

বধূ বাইরে আস্‌তেই শাশুড়ী বলে উঠ্‌লেন—তোমায় যে আঁস ছেঁসেলের ছাড়াটা চড়িয়ে দিতে বলে গেছলুম বৌ-মা!···বধূ শাশুড়ীর মুখে বিরক্তির সুস্পষ্ট চিহ্ন দেখেও নড়তে পারল না। তার শরীরের মধ্যে কেমন একটা অস্বস্তির ভাব জেগে উঠেছিল।

শৈল ওদিকের দরজা খুলে বাইরে চলে যেতেই শাশুড়ী জিজ্ঞাসা করলেন—শৈল কি বল্‌ছিল?

শিশির নীরব।

তুমি কি বল্লে?

শিশির নতস্বরে মুখটি একবার তুলে বটে, কিন্তু কথা বল্‌তে পারলে না।

শাশুড়ী বিরক্ত ভাবে আপন মনেই বল্‌তে লাগলেন—এমনই আজকালকার বৌ-ঝি বটে! ছিঃ ছিঃ এতটুকু হাতাকাণ্ড জ্ঞান যদি থাকে! আ তোর ভাল হক্—তোদেরেই ভালোর জন্যে না মরি আমরা!

ছেঁসেলের ধোঁয়ায় মুখখানি রাঙা করে এসে, চোখের জল মুছ্‌তে মুছ্‌তে নতমুখী বধূকে জিজ্ঞাসা করলেন—তোমার ভাই কবে আসবে বাছা—

শিশিরের কাণের মধ্যে তখনও বাজ্‌ছিল—আজকালকার বৌ-ঝি এমনই বটে! শক্তির প্রশ্ন তার কাণেও গেল না।

শাশুড়ী রুক্ষচক্ষে বল্লেন—অমন গোঁজ্‌ড়া মুখ করে'

দাঁড়িয়ে রইলে কেন মা? বলি হ'ল কি?—বোধহয় দু' তিন মুহূর্ত্ত তিনি কৈফিয়তের আশায় থেকে, না পেয়ে ক্ষুব্ধ হ'য়ে বলে উঠ্‌লেন—এ সব আইন কানুন তোমাদের ভালোর জন্যেই আমার বলা বাছা, নইলে যা খুসী কেন তাই হোক্ না, ঘরে ঢেলেও আমি কথা কইতে যেতাম না। পেটে একটা হ'য়েছে, তার মঙ্গলটা ত দেখ্‌তে হ'বে! ভালোয় ভালোয় চায় ত্যাগ আলাদা হ'য়ে যাক্, তোমাদেরই সুখ! আমার আর ক'টা দিন!

শিশির তখনও নীরব, নতমুখ।

শাশুড়ী বল্‌ছিলেন—দুপুরবেলা খাওয়া-দাওয়ার পর ঘরে যেয়ো, বুঝিয়ে বলো, বুঝ্‌লে! রাত্রে চণ্ডী...

শিশির মুখ তুল্‌তেই শাশুড়ী সন্দিগ্ধ স্বরে বল্লেন—কি? বলেছ বুঝি?—তা'কে মুখ নীচু কর্‌তে দেখে শাশুড়ীর ধৈর্য্যের বাঁধ ভেঙ্গে গেল। হতাশ ভাবে বলে উঠ্‌লেন—তোমাদের ঘুরে ঘুরে দণ্ডবৎ! তোমরা সব করতে পার বাছা!—ঘড়ির আলনায় গামছাখানাকে ছড়িয়ে দিতে দিতে আপনার মনে বল্‌তে লাগলেন—এমন বেহায়া ছেলেছেলে ত আমার বাবার কালেও দেখি নি বাবা! ছেলেদের দোষ দেব কি! এই সব বেহায়া স্ত্রীলোক যেখানে...

শিশির তার ঘরে ঢুকে বিছানায় মুখ গুঁজিয়ে কেঁদে ফেল্লে! এমন কান্না সে অনেকদিন কাঁদেনি, বুকের ওপর যেন তার পাহাড় ভেঙ্গে পড়ছিল।

কাঁদতে কাঁদতে ফুলতে ফুলতে এই কথাটাই তার গলার স্বরে উঠ্‌ছিল যে তাঁরই আদেশ পালন করতে স্বামীর আদরও সে হারাল, আবার তিনিও অপ্রসন্ন। এমনই পোড়া অদৃষ্ট তার!

এমন প্রকৃতির লোকও সংসারে বিরল নয় যাঁরা প্রবৃত্তির উত্তেজনায় সেবেই নিজের ভ্রান্তি সংশোধন করে নিতে, অত্যাচারীর কাছে হীনতা স্বীকার করতেও কুণ্ঠিত হ'ন না। বধূ যে তাঁর সামনেই কেঁদে ফেলেছিল এবং তার সে-সময়কার শরীরের ওপর সেটা অত্যাচারই করবে যেমন মনে পড়া আর তাঁর রাগও রইল না, ক্ষোভও না। ঘরে ঢুকে দেখলেন, বধূ শয্যার ওপর উপুড় হ'য়ে পড়ে ফুলে ফুলে কাঁদছে।

শাশুড়ী সস্নেহে পিঠে হাত বোলাতে বোলাতে ডাক্‌লেন—বৌ-মা! ছিঃ মা! রাগ করতে আছে কি?

বধূ যন্ত্রণাকাতর পাণ্ডুমুখ তুলে চাইতেই শাশুড়ীর প্রাণ উড়ে গেল; আবার রুদ্ধকণ্ঠে ডাক্‌লেন—বৌ-মা! একটা কথা যদি মা ঘরে বলেই থাকি, মা,...

বড় যন্ত্রণা মা—বলে শিশির আবার মুখটি বিছানায় লুকোলে।

শুনে শাশুড়ীর হাত-পায়ের শিরাগুলো অবধি শিথিল হ'য়ে ঠক্ ঠক্ করে কাঁপতে লাগল।

কি কৌতূহলের বশে ঘরে ঢুকে এই কাণ্ড দেখে এক মুহূর্ত্তে পাড়া মাথায় করে' তুলে। তাই শুনে পরাইয়ের গিন্নীরা ছুটে এসে বুনো-বৌ-দাইকে ডাক্‌তে গেলো।

বুনো বৌ এসে যা বল্লে, শিশিরের শাশুড়ী তা শুনেই মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়লেন। তাঁর এত সতর্কতা, এত চেষ্টা সব ব্যর্থ হ'য়ে গেল! সাধে কি আর তিনি তাকে এ কটা দিন বাদ দিয়ে আসতে লিখেছিলেন! হায় হায়! তাঁর বন্ধুর বংশের প্রথম বংশধর এমন করে বিনষ্ট হ'য়ে গেল?

বুনো বৌ বল্লে—এ সময় কোথায় সাবধানে সুখলে থাকবে, তা নয়, এত কান্নাকাটি, চোখের জল! বুনো-বৌ শিশিরের বিছানা বদলাতে বদলাতে বল্লে—এত কান্নাকাটিও করে বাছা! মাথার বালিশই ভিজে গেছে!—বলে সে কাড়ুক্ ক সুরু করে দিলে।

চাঞ্চল্য শুনে শৈলও বাড়ীর মধ্যে এসে পড়েছিল, দরজার বাইরে থেকে সব দেখে শুনে কি-কে জেনে বল্লে, আমার জামাটা আর ঐ ব্যাগটা আন ত দি!

তার মা বেরিয়ে বল্লেন—যাস্ কোথা শৈল? বৌমা যে...

শৈল জামা গায়ে দিয়ে বল্লে—আমি জানিনে কিছু!

তার মার চক্ষুঃস্থির! এই পুত্র! এই বিপদের সময় ফেলে যেতে চায়! বল্লেন—ও শৈল কোথা যাস্ বাবা? তোর ত এখন পূজোর ছুটি, শৈল—

কলকাতায়। সেখানে আমি থাকি ভালো। ছুটিতে আমার দরকার নেই, যথেষ্ট হ'য়েছে।

শুনে যা, শৈল, শুনে যা...

শৈলেশ চল্‌তে চল্‌তে বল্লে—বাড়ী আলো তোমরাই এই সব দেখ্‌তে, না?

মা'র চক্ষে পৃথিবীটা তখন ঘো ঘো করে ঘুরছিল, কোন কথা না-বলতে পেরে' সেইখেনেই বসে পড়ছিলেন, বুনো-বৌ জেকে বল্লে—পোয়াতীর ঘরে জেবো না গো, পেটেরটা—সে যাচ্ছে তোমার বরাত।

বরাতই বটে!

আঁধারে আলো।

(শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়)

মোহাই পাবে না। চুরি না—চুমুক।

সত্যেন্দ্র জমিদারের ছেলে এবং জাল ছেলে। এম-এ পাশ করার ফলে হইবে বলিয়া সে বৈকুণ্ঠের লক্ষ্মীপ্রতিমার মত রাধারাণীকে মা'র বহু জেদাজেদী সত্ত্বেও বিবাহ না করিয়া কলিকাতায় চলিয়া গেল। গিয়া এম্-এ পাশের পড়া পড়িতে লাগিল। কিন্তু সেই যে রাধারাণীকে দেখিয়া তাহার চোখ দুইটা তাহাকে লক্ষ্মীঠাকরুণটী বলিয়াছিল, ইহাতেই হইল সর্ব্বনাশ। দিনকত রুচি মুখ দেখে আর মিলায়। কোন একটা বিশেষ বয়সের মেয়ে দিনরাত তার মনের মাঝে ফুল ছড়াইয়া বেড়ায়।

একদিন গঙ্গাস্নানে গিয়াছে একটি মেয়ে স্নান সারিয়া পাণ্ডাঠাকুরের সামনে বসিয়া ললাটটি চন্দন-চিত্রিত করিতেছিল, সত্য পাণ্ডার কাছে কাপড় রাখিতে গিয়া চমকিয়া গেল। একসঙ্গে এতরূপ সে আর কখন নারীদেহে দেখে নাই। মেয়েটির বয়স ১৮।১৯ এর বেশী নয়। দুজনের চোখোচোখী হইল। সত্য তাড়াতাড়ি স্নান সারিয়া উপরে উঠিল, কিন্তু অসামান্যা রূপসী তখন চলিয়া গিয়াছে। পরের দিন খুব সকালে উঠিয়াই মা গঙ্গার ছোঁচকা টানে সত্য গঙ্গাযাত্রা করিল, আজও তিনি তেমনি ললাট চিত্রিত করিতেছিলেন। আরও কয়দিন চোখোচোখী হইল, কথা হইল না। বোধ করি তাহার প্রয়োজনও ছিল না। কারণ, যেখানে চাহনিতে কথা হয়, সেখানে মুখের কথাকে মূক হইয়া থাকিতে হয়। একদিন কিন্তু কথা হইল—'একবার ডুবুন।' রূপসীর সঙ্গের কি সেদিন আসে নাই, রমণী সত্যর সহায়তা করিল, যদি ঘাটের দিকে একটু এগিয়ে দেন। সত্য ইতঃস্তত করিতেছিল, রমণী একটু মৃদু হাসিলেন। সে হাসি নয়, সে-যে কি তাহাও আমরা জানি-না। শুধু এই জানি যে সত্য ত ছেলেমানুষ, অনেক পিতামহেরও মুণ্ড ঘুরিয়া যায়। সত্য তৎক্ষণাৎ চলুন বলিয়া এগিয়ে দিতে গেল। বিদায় কালে 'নমস্কার'—নমস্কার—সেদিন সমস্ত দিন ধরিয়া তাহার বুকের মধ্যে যে-কি করিতে লাগিল, সে কথা লিখিয়া জানান অসাধ্য। যৌবনে পঞ্চশরের প্রথম পুষ্পবাণের আঘাত

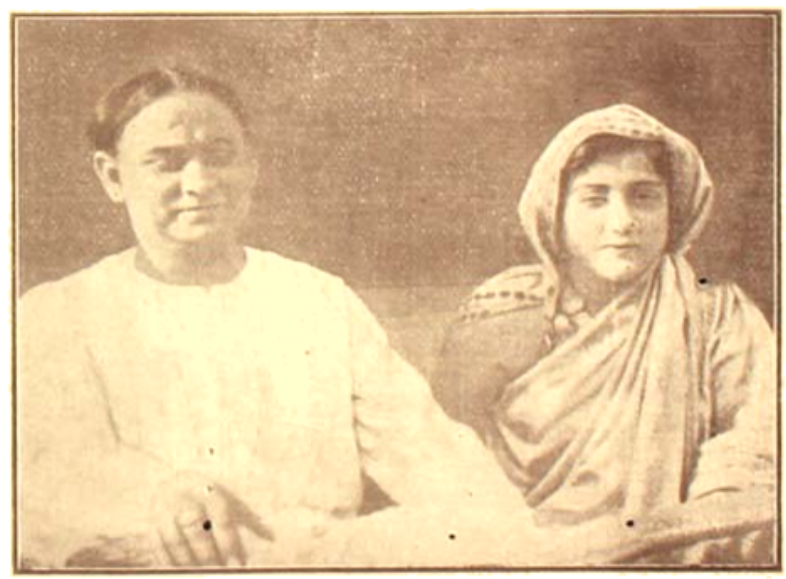

যাহাকে লইতে হইয়াছে, শুধু তাঁহারই মনে পড়িবে, শুধু তিনিই বুঝিবেন, সে দিন কি হইয়াছিল।

তারপর দিন রমণী পথিমধ্যে চোর-বাগানে সত্য থাকে জানিয়া, হাসিয়া বলিল—"চোরবাগানে কি কেবল চোরেরাই থাকে?" "কেন"? "আপনি ত চোরের রাজা।"—সত্য জানিত, তাহার মনটিও চুরী গিয়াছে, আজ শুনিল, সেই ভুবনভুলানো রূপ-সীর মন চুরী গিয়াছে এবং চোর যে কে রমণী তাহাকে চিনেও! সত্যর হৃদয়ে এত বড় কটু অপবাদটাও যে কি মধু বর্ষণ করিল, কে বলিতে পারে।

কিন্তু হায়! তারপর ক'দিন আর দেখা নাই! সত্য স্নান করিয়া বাসায় ফিরিল। দৃষ্টি ক্লান্ত, সজল। চোখের পাতা আর্দ্র। আকাশ পাতাল কত কি-যে এই কয়দিন সে ভাবিয়াছে, তাহার সীমা নাই। মাঝে মাঝে এ দুশ্চিন্তাও মনে উঠিয়াছে, হয়ত তিনি বাঁচিয়াই নাই! হয়ত মৃত্যুশয্যায়—কে জানে।

বাড়ী জানে না, যাইয়া যে দেখিয়া আসিবে সে যো নাই। পুলিটা জানে, সত্য পুলিটা দিয়া চলিতে লাগিল, যদি খবর পায়—কোথায় থাকেন! যদি দেখিতে পায়—জীবিত আছেন!

পথে দেখা দাসীর সঙ্গে। শুনিল, বড় অসুখ, খুব জ্বর। সত্যকে দেখিতে চান।

খুব বড় বাড়ী, দারবান, সিঁড়ি বাহিয়া তেতালার বারান্দার কোণের একটা ঘরের পর্দা সরাইয়া দাসী মৃদু-উচ্চকণ্ঠে সত্যর আগমন জ্ঞাপন করিল—দিদিমণি, এই নাও তোমার নাগর।

ভিতরে যাহা দেখিল, সত্যর তাহাতে সমস্ত মস্তিষ্ক উলট-পালট হইয়া গেল। কোনমতে জোর করিয়া সে, সেইখানেই বসিয়া পড়িল।

তাহাকে এমনভাবে বসিতে দেখিয়া সেই রূপসী সত্যর একটা হাত ধরিয়া খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া বলিল—বঁধুর মিয়সী ব্যামো আছে না-কি!...রূপসীর তখন, দুইপায়ে একরাশ ঘুঙুর বাঁধা, নানা অলঙ্কার সর্ব্বাঙ্গে দুলিত—সুরারঞ্জিত চোখ দু'টি চুলু চুলু করিতেছে। ঘরে মাতাল মদ খাইতেছে, তবলচীর হাতে তব্‌লা, আরও দুতিনটি পুরুষ।

প্রবল তড়িৎ-স্পর্শে হতচেতন মানুষ যেমন করিয়া কাঁপিয়া নড়িয়া উঠে, ইহার করস্পর্শেও তেমনি করিয়া সত্য কাঁপিয়া নড়িয়া উঠিল। বিজ্‌লী তখনো মূর্চ্ছে নাই—কি ঘটিল বা ঘটিতেছে। সত্যর পায়ের কাছে বসিয়া কি ভাগ্যে তাহার আজকার রজনী প্রভাত হইয়াছে, তাহাই মনে করিয়া বলিতে লাগিল। একটা অরসিকের কাছে বিজ্‌লীর মত রূপসী রমণীর এই প্রেম নিবেদন মনবিহারীদের সহ্য হইতেছিল না, বলিল—কেন বেচারাকে মিছিমিছি সঙ্ সাজাচ্ছ?

বিজ্‌লী বলিল—ও সত্যিকারেরই সঙ্!—সত্যকে জিজ্ঞাসিল—আচ্ছা মাথা খাস্ হাবু, সত্যি বল্ত ভাই, কি আমাকে তুই ভেবেছিলি? কি মৎলবে চুটিয়ে পীরিত করছিলি বল ত? বিয়ে করবি বলে, না ভুলিয়ে লখা দিবি বলে?...তারপর আরও কত কথা হইল, সত্য একটিবার মুখ তুলিল না, একটা কথার জবাব দিল না, কি ভাবিতে ছিল কে-জানে!

বিজ্‌লী খাবার আনিল। সত্য বলিল—আমি খাব না। বিজ্‌লী বলিল—খাবেই। এই বল্‌ছি তোমাকে, দু'দিন পরেও অন্ততঃ—সত্য বলিল—এজন্মে নয়, আগামী জন্মে নয়, কোনকালেই আপনার ছোঁয়া খাব না।—সত্য উঠিয়া পড়িল। বিজ্‌লী আবার দেখা হইবে কি-না জানিতে চাহিল, সত্য জানাইল—না। ঘৃণায় এমনই সুস্পষ্ট রেখাগুলি সত্যর মুখের উপর দৃঢ় হইয়া উঠিল, যে তাহা পাঠ করিয়াই বিজ্‌লীর বুক ভাঙিয়া গেল, কান্নায় তার কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিল। সত্য কোনদিকে না চাহিয়া চলিয়া গেল।

মাতাল বলিল—কি বাইজী, চোখের পাতা ভিজে যে! তাহার একটা কথাও বিজলীর কাণে গেল না।

পুতুলের তোড়া খুলিয়া ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিল। বিজলীর ঘরের মাতাল জিজ্ঞাসিল—খুন্‌লে যে! বিজলী কাঁদিতেছিল, একটু হাসিয়া বলিল—আর পরব না বলে। মাতাল বলিল—অর্থাৎ? অর্থাৎ বাইজী মরেছে। যে রোগে সুখি উঠ্‌লে রাত্রি মরে—আলো জ্বল্‌লে আঁধার মরে, আজ সেই রোগেই তোমাদের বাইজী চিরতরে মরে গেল, বন্ধু!

চার বৎসরের পরের কথা। রাধারাণীর ছেলের অন্নপ্রাশন; নিচের উঠান নিমন্ত্রিত ভদ্রলোকে ভরিয়া গেছে, রাধারাণী উপরের চিকের পার্শ্বে বসিয়া বাইজীদের দেখিতেছিল। সত্য স্ত্রীর কাছে আসিয়া বলিল। রাধারাণী সব চেয়ে রুগ্ন বাইজীর রূপের প্রশংসা করিতে সত্য বলিল—লোকে বলে চার পাঁচ বছর আগে ও খুব ভাল গাইত—এখন পারবে কি না বলা যায় না।—বলিয়া তবু তাহাকে সবার চেয়ে বেশী টাকা দিয়া কেন আনাইয়াছে, তাহা বলিল। স্বামীর মুখে সমস্ত শুনিয়া রাধারাণী আঁচলে চোখ মুছিল। নারীর অপমান সহিতে তাহার বুক পীড়া বোধ করিতেছিল। স্বামীকে বিদায় দিয়া রুগ্নকায়া যমুনীকে ডাকিয়া পাঠাইল। তাহার কোলে তাহার ছেলেটীকে দিয়া জিজ্ঞাসিল—চিনেচ দিদি? বিজলী স্বর জড় করিয়া কাঁদিয়া ফেলিল—চিনেছি বোন্।

বিজলী রাধারাণীর কাছে স্বীকার করিল, তাহার গর্ব চূর্ণ হইয়াছে। তবে গর্ব চূর্ণ হইলেও আজ তাহার পুত্রকে দেখিয়া তাহার চিত্ত ভরিয়া গিয়াছে—ইহাতে সব দুঃখ তার অন্তর্হিত হইয়া উঠিয়াছে।

বিদায়কালে রাধারাণী জিজ্ঞাসিল—আবার কবে দেখা হ'বে দিদি?

দেখা আর হ'বে না বোন্। আমার একটা ছোট বাড়ী আছে, সেইটে বিক্রী করে চলে যাব। তোমার কথা, এরা যখন বাইনা করতে যায়, একটা মিথ্যে নাম করেছিল কেন বলতে পার?

রাধারাণী অনুরূপ পূর্বে সেকথা স্বামীর মুখে শুনিয়াছিল, কিন্তু বলিতে পারিল না।

বিজলী বুঝিল, বলিল—আমাকে অপমান করবেন বলে?

রাধারাণীর মাথা আরও হেঁট হইয়া গেল। বিজলী বলিল—তার পায়ে আমার শত কোটি প্রণাম জানিয়ে বলো সে হ'বার নয়। আমার নিজের বলে আর কিছু নেই। অপমান করলে সমস্ত অপমান তাঁর গায়েই লাগ্‌বে।

রাধারাণী নমস্কার করিল।

বিজলীও নমস্কার করিল। আশির্বাদ করিল না। বলিল—প্রার্থনা করি বোন্ তোমার হাতের নোয়া অক্ষয় হোক্।

ঝড় উঠিলে।

পিতা। বিকর্ণার বাড়ি! কেবল অন্নের কাড়ি মিলবে আর কাপড়ের কাড়ি মিলবে? পুত্র। (কম্পান্বিত)
পুত্র। (স্ত্রীকে) ওরে বাবার পায়ের ধুলো কেবল... পুত্রবধূ। (মুখ ভেংচাইয়া)

পুত্রবধূ। (রামাকে) গিলবে আর ঘুমুবে—ঘুম হত, ঘুম হত। (খুন্তি পড়িয়া যায়)
রামা। (গরীবিকে) ভাতারের পরসা চুরী করিস্ বিই বলে? (অবশেষে সাধু হইবে, বলিতেছে।

গরী-বি। (খোকার চাকরকে উনুনমুখো হোঁড়া বাবে মাবে আছ-পাড়া বেকাবে?... খোকার চাকর। (পাড়াই ভেঙ্গে বলিতেছে আর কাঁদিতেছে)
চাকর। পালায় বেকাল, আমি ছুটো খেতে পাইনে বলে, আমার পাতে মুখ দেবেক... মেথি। (পলায়নপর) যাঁও।

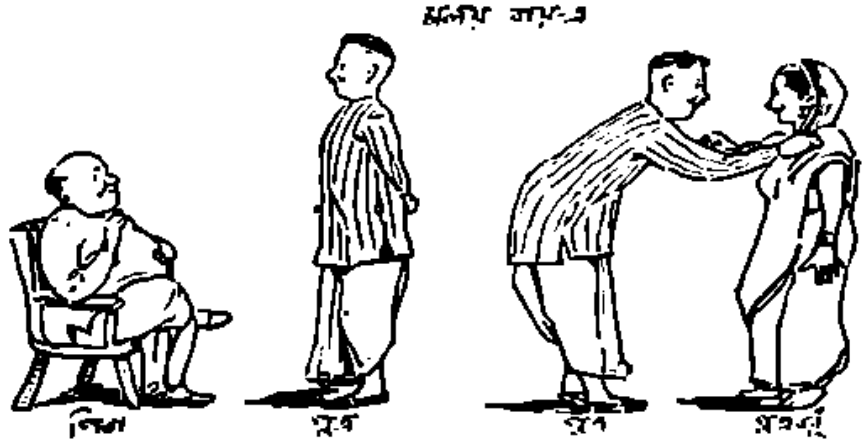

পিতা। যাক, শিবে যে হ'য়ে তা আমি ত আশাই করিনি, বেশ, বেশ—আমি খুসী হ'য়েছি

পুত্র। (স্ত্রীকে) চলেযখনি, এ শুধু তোমার পরেই পুত্রবধূ। (তোমার সে চলন)

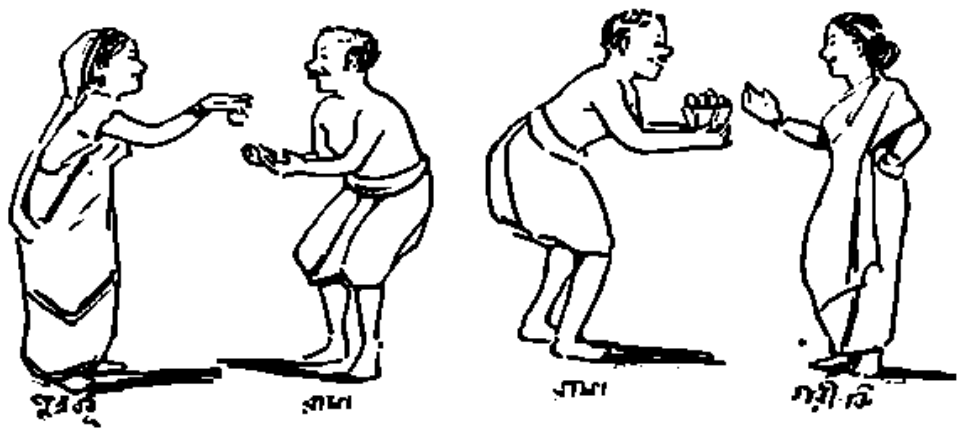

পুত্রবধূ। (শ্যামাকে) আহা, মা বাবা, মা—তোমা আমিনে, তোমের অন্তেই ত···

শ্যামা। (পত্নী-ঝিকে) যাও, ঘর, শিশুটীর ঘর কে আবার এসে পড়বে!

পত্নী-ঝি। (খোকার চালচলনে) ওরে আমার সোনারে... খোকার চলন। (নতমস্তক)

খোকার চলন। (মেঝিতে) মেঝি, মেঝি, পুল্ পুল্ আঃ মেঝি, পুল্ পুল্। মেঝি। মাঁাও—এ্যাও। (মেঝ ঘুলাইয়া)।

সভ্য বানর

(শ্রীসতীশচন্দ্র ঘটক)

১
রাত্রি তিনে
পড়ি আমি
সভ্য মানুষের,
ঘুমে ঢোলে আসে
চোখ দুটো
মনে হয় যেন
মরে যাই আমি।

২
কাকার থেকে
'কলার' কিনে
এনেছি মনে মনে
সারাদিন আজ
সাধ্যমত
খুব এক পিলে।

৩
সারাদিন আমি
ঘুমাই যখন
এনেছি মনে ভাই,—
'সভ্যের সাজাই
কাজ করে
মানুষ মারা যাই।'

৪
ইস্কুলেতে
যাই যবে
হয়ে ওঠে দুষ্টু
মানুষের সাথে
আমি কাজুয়ার।

৫
কিন্তু এমনি
লাফাবার বেগ
পড়ে এসে যেন
চলবার যত
ফুরালো এই
উড়ছে যেন মেঘ।

৬
সোজা হয়ে
এটি ধরে
কাজ করি আমি,
পরতে পরে
যেকোনো ঢঙ
দুষ্টু করি আমি।

নিরজনে।

শিল্পী—শ্রীহেমেন্দ্রনাথ মজুমদার।

Lakshmibilas Press, Calcutta.

যদি পারো

(শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক)

যদি বলে তুমি রেখে দিতে পার
চঞ্চল তব চিত্তকে,
ত্রাস বলে যদি জেনে নিতে পার
তুমি তব সব বিত্তকে।
সন্তোষে যদি বহে যেতে পার
হয়েছে যে তার অর্পিত,
সম্পদে যদি রহিগহ্বরে
নাহি হও তুমি গর্ব্বিত,
প্রেমেতে সরস করে নিতে পার
যদি এ নীরস পৃথ্বীকে
বিকলতা মাঝে বরে নিতে পার
যদি চিরাগত সিদ্ধিকে।

২

সমভাবে যদি সহে যেতে পার
তুমি সম্মান লাঞ্ছনা,
বঞ্চিত হয়ে যদি তুমি কভু
অপরে না কর বঞ্চনা।
ভোগে উন্মুখ, ত্যাগে উদ্‌গ্রীব
সত্যেতে চির বিশ্বাসী,
ধরণীর রস মধুপের মত
যদি নিতে পার নিঃশেষি'
অভাবেও যদি ভাবের অলকা
গড়ে নিতে পার বক্ষেতে,
দুখের মাঝেও হরির লাগিয়া
যদি ধারা ঝরে চক্ষেতে।

৩

না হয়ে ঘৃণিত ঘৃণা সহ যদি
নিন্দা না কর নিন্দুকে,
বড় করে যদি নিজ চোখে দেখ
নিজ ক্ষীণ দোষ বিন্দুকে।
ছোট করে যদি দেখ তুমি শুধু
আপন সুনাম সুখ্যাতি,
আপনার বলে মনে ভাবো যদি
অপরের ক্লেশ দুঃখাদি।
মুক দুঃখেতে ঘুমাইতে পারো
যদি বিদ্রোহ বিগ্রহে,
বিবেকের বুকে জুড়াইতে পার
যদি অপমান নিগ্রহে।

৪

অত্যাচারীরে বাধা দিতে পার
পাহাড়ের মত নির্ভয়ে,
দুঃখের তুমি পার পাদপ
যদি করুণার ক্ষীর বহে,
একসুরে যদি বেঁধে নিতে পার
তব ভাষা আর কর্ম্মকে,
সব চেয়ে তুমি বড় বলে যদি
দেখ মনে প্রাণে ধর্ম্মকে,
বুঝিবে তখন মানুষ হয়েছ
করেছে করুণা মন্থনে,
স্বরাজ তোমার এসেছে হাতে
পেতে দিয়ো দুটী হস্তকে।

হিসাবের কড়ি

(শ্রীআশুতোষ সান্যাল)

(১)

আফিমের নেশার মত অর্থ সঞ্চয়ের প্রবল লালসা বেচারামের সমস্ত হৃদয়ের ওপর ধীরে ধীরে আধিপত্য বিস্তার করে বসেছিল। ইস্কুলের জলখাবারের পয়সা হ'তে আরম্ভ করে, চিরদিন সে কেবল পয়সা জমিয়েই যাচ্ছিল। সহপাঠিরা অনেকেই মনে করত যে বেচারাম হয়ত ভবিষ্যতের কোন কল্পিত আশাকে ফলবতী করতে, নিজের আত্মাকে বঞ্চিত করছে। কিন্তু যে কারণেই হোক্, সে যখন এণ্ট্রেন্স পাশ করেই পড়া ছেড়ে চাকরীতে ঢুকল, তখন সকলেই একটু আশ্চর্য্য হ'ল।

সংসারে বেচারামের প্রত্যাশী বড় একটা কেউ ছিল না। আপনার জনের ভেতর এক বৈমাত্র বড় ভাই ছিলেন, তিনিই এতদিন তার পড়ার খরচ যুগিয়ে এসেছিলেন। তাঁর অবস্থা স্বচ্ছল ছিল, কাজেই তাঁকে সাহায্য করার আবশ্যক ছিল না। ভ্রাতৃজায়ার সঙ্গে বেচারামের কোনদিনই বনিবনাও ছিল না, তাই পড়া ছেড়ে চাকরীতে ঢুকে, কলিকাতার খুব নিকটে হলেও বাড়ীর প্রতি তার কিছুমাত্র টান দেখা গেল না। দাদার সংসারে থেকে, তাঁকে টাকাকড়ির হিসাব দেওয়া এবং রেলভাড়া সংসার খরচ প্রভৃতিতে কলিকাতার মেসের খরচের অপেক্ষা বেশী ব্যয় করাটা সে আদৌ যুক্তিসঙ্গত বলে বিবেচনা করল না।

বেতনের তিরিশ টাকার অন্ততঃ যাতে পনের টাকা সঞ্চয় হয়, তার হিসাব সে আগে থাকতে এমন কড়ায় গণ্ডায় করে রেখেছিল যে, সংসারের কোন 'লজিক্‌ই'—তার একটি পয়সা বৃদ্ধি করতে সক্ষম নয়। লোকে এ বিষয়ে তাকে পরামর্শ দিতে এলে বা সঞ্চয়ের উদ্দেশ্য জিজ্ঞাসা করলে, সে মৌমাছি, পিপীলিকা প্রভৃতির উদাহরণ দেখিয়ে দিত; এবং অনেক সময় সে একথা বলতেও ছাড়ত না যে শরীর এবং সেই শরীরের হাড়-ভাঙা পরিশ্রমের পয়সা তার নিজের—তার জন্য অন্য কাহারও মাথা ঘামাবার আবশ্যক নেই।

আফিসের বাবুদের একটা মেস্ ছিল, বেচারাম প্রথমে সেই মেসেই আশ্রয় নিয়েছিল; কিন্তু সেখানকার গুরুপাক ভোজনের ব্যবস্থা এবং অনাবশ্যক আড়ম্বর দেখে সে মেস্ ছেড়ে, নেবুতলায় একটা গলির ভেতর খোলার ঘরে আফিসের অনকতক ওমন সরকারের সঙ্গে আস্তানা নিয়েছিল। এখানে অসুবিধা একটু-আধটু থাকলেও, বাবুদের মত বেহিসাবী—অপব্যয় ছিল না।

(২)

বছর দুই এক আফিসে রীতিমত ভাবে চাকরী করার পর বড়বাবুর অসীম অনুগ্রহে বেচারামের যখন মাত্র দুই টাকা আট আনা বেতন বৃদ্ধি হল, তখন তার প্রাণে বড় আঘাত লাগল। এতদিন সে বড়বাবুর মুখচেয়ে, আশায় আশায় মনকে আশ্বস্ত রেখেছিল, কিন্তু খোসামোদ, তোসামোদ হতে আরম্ভ করে ইতর বড়বাবুর ছেলে পড়ান, হাট-বাজার করা, এমন কি শোনা যায়—বড়বাবুর স্ত্রী কয়েকদিনের জন্য পিত্রালয়ে গেলে, বেচারাম রন্ধন কার্য্যও নাকি সমাধা করেছিল। (তবে তার কতটা সত্য তা' বলা যায় না।) এত করেও যখন বড়বাবু তার 'কোয়ালিফিকেসন' এর মূল্য নগদ আড়াই টাকা ধার্য্য করলেন, তখন সে অতি দুঃখে প্রতিজ্ঞা করল যে, বর্দ্ধিত বেতনের একটি টাকা পর্য্যন্ত সে প্রতি মাসে তাক-খরচা করে অন্যত্র চাকরীর জন্য দরখাস্ত করবে।

সেই থেকে—বৎসরাধিক চেষ্টার ফলে ঘরিয়ার নিকট একটা কোলিয়ারীতে বেচারাম একেবারে পঞ্চাশ টাকা বেতনের চাকরী পেল। যেদিন এই নিয়োগ পত্র তার হস্তগত হল, সেদিন আনন্দে আত্মহারা হয়ে সে বৌবাজারের 'ফিরিঙ্গী কালীর' এক বছরের মানসিক প্রণামী গুলার পরিশোধ করতে সওয়া-পাঁচ-আনার হরিলুট দিয়ে ফেলল; কারণ ঠাকুর দেবতার কাছে কর্জ্জ রাখা যে সুবিধার নয় তা' তার ধারণা ছিল।

নূতন চাকরী পেয়ে সে পুরাতনে জবাব দিল। বড়-বাবু অবশ্য ভদ্রতার খাতিরে তাকে এ কার্য্য করতে বার বার নিষেধ করলেন এবং বড় সাহেবকে তার বিষয় বিশেষ বিবেচনা করতে অনুরোধ করবেন বলে আশ্বাস দিলেন। কিন্তু বেচারাম কিছুতেই রাজী হল না। চাকরী ছেড়েও বড়বাবুর হাতে নিষ্কৃতি নেই,—অবাধ্য বেচারামকে তিনি নানা প্রকারে বাধা দিতে চেষ্টা করলেন। বেচারাম কিছুতেই যখন বড়বাবুকে পেয়ে উঠ্‌ল না, তখন মরিয়া হয়ে আফিসের ছোট সাহেবকে সব কথা বুঝিয়ে বল্ল। ছোট সাহেব লোকটা মন্দ ছিল না, বেচারামের প্রতি দয়া পরবশ হয়ে তাকে এক মাসের পরিবর্ত্তে চব্বিশ ঘণ্টার নোটিসে ছেড়ে দিলেন। বেচারাম ছোট সাহেবকে অসংখ্য ধন্যবাদ দিয়ে এবং আফিসের বাবুদের নিকট বিদায় নিয়ে বাসায় ফিরে গেল।

বাসায় ফিরে, ঠাকুর-দেবতার কাছে এবং খুচরা যা দুচার পয়সা দেনা-পাওনা ছিল মিটিয়ে, পরদিন সংসারের গাড়ীতে নিজের যা কিছু সম্পত্তি ছিল এবং আবশ্যকীয় দু'একটা জিনিষ-পত্র কিনে নিয়ে, কলিকাতা পরিত্যাগ করল।

(৩)

কোলিয়ারীতে সরকারী ওজন সরকারের কাজ করে কিছুদিনের মধ্যেই বেচারাম বেশ দুপয়সা গুছিয়ে নিল।

কোলিয়ারীটি ছোট হলেও, এখান কার লোকজনের মনের মিল ছিল। সর্ব্ববিষয়ে খুঁতখুতে সহরের লোকের তীব্র চক্ষুর অন্তরালে এসে সে যেন নিশ্বাস ফেলে বেঁচেছিল। এখানে সকলেই কাজের লোক, পেটের দায়ে স্বদেশ স্বজন ঘুরে ফেলে রেখে এসে, তারা এই বিদেশে সকলের সঙ্গে আত্মীয়তা স্থাপন করে মনের সুখে বাস করছে। সকলেই আপনাপন কার্য্য নিয়ে ব্যস্ত। অকেজো লোকের মত পরনিন্দা, পরচর্চ্চা করে সময়ের অপব্যবহার করবার অবসর বা প্রবৃত্তি তাদের ছিল না। এদের সঙ্গে বেচারাম বেশ আনন্দেই দিন কাটাত। এমন কি, কিছু কিছু পরিবর্ত্তন যে তার না হয়েছিল তা নয়, তবে তা—হিসাবের কড়ির বাইরে নয়। ফড়েরা যেমন লাভ খতিয়ে জিনিষের দাম ফেলে এবং জিনিষ নষ্ট হওয়া সত্ত্ব করেও দাম কমিয়ে বেচতে পারে না, বেচারামও তেমনি শরীরের ওপর দিয়ে লোকসানের কড়ি উসুল করে নিত। জিজ্ঞাসার উত্তরে সে চিরদিনের মত একই ভাবে বলত—'শরীরের নাম মহাশয়, যা সহাও তাই সয়'।— আর মনে মনে 'গামছা হারিয়ে দাড়ী না কামাবার' গল্পটা লোকের উপহাসের জিনিষ হলেও, উপদেশ মনে করে সে পালন করত।

পাশের একটা কলিয়ারীতে তার যাতায়াত ছিল। এই কোলিয়ারীর 'হাজিরা বাবুর' এক অবিবাহিতা কন্যা ছিল। বেচারামের পালটি ঘর দেখে, অনেকেই তাকে এই মেয়েটিকে বিবাহ করে দরিদ্র হাজিরাবাবুকে কন্যাদায় হতে উদ্ধার করতে অনুরোধ করত। মেয়েটি কাজে কর্ম্মে এবং দেখতে শুনতে বেশ ভালই ছিল। কথাটা বেচারামের মনেও লেগেছিল, কারণ হাত পুড়িয়ে রেঁধে খাওয়া এবং চির জীবন নিঃসঙ্গ ভাবে জীবন অতিবাহিত করা যে খুব সুখের নয়—তা তার অবিদিত ছিল না, এবং তাই বুঝেই, কয়েকমাস ধরে নিজের মনের সঙ্গে সে এই বিষয়টারই তর্ক বিতর্ক করেছিল, কিন্তু সহস্র যুক্তিতর্কেও মন তার এ প্রস্তাব সমর্থন করল না। একটা বিষয়—যেটা তার রক্ত-মাংসের সঙ্গে মিশে অস্থি মজ্জাগত হয়ে দাঁড়িয়েছিল, সেই অর্থলোলুপতার জিহ্বা,সে কিছুতেই করে উঠ্‌তে পারল না। ক'মাসের মধ্যে অন্ততঃ পাঁচ সাতটা সংসারের আয় ব্যয়ের হিসাব সে খতিয়ে দেখেছে—সকলেরই আয় অপেক্ষা ব্যয় বেশী। যে খুব হিসাবী—তার ঋণ না থাকলেও সঞ্চয় কিছুই নেই। বিবাহ করলে, উপস্থিত অর্থ দূরের কথা, সঞ্চিত অর্থেও যে হাত পড়বে সেটা সে বেশ বুঝতে পারল। কাল্যকাল হতে যে সঞ্চয় অক্ষুণ্ণ রাখতে সে সহস্র লাঞ্ছনা, গঞ্জনা সহ্য করে এসেছে সেই সঞ্চয়ের বিফলতা—বেঁচে থেকে সে কিছুতেই দেখতে পারবে না। তার জন্য যদি তাকে আজীবন অবিবাহিত থাকতে হয়—তাও স্বীকার! লোকে বলে 'কবে ভোগ করবে'—'কে ভোগ করবে'! ভোগ আবার করবে কে—ভোগ তো সে নিজেই করছে। শরীরের সুখভোগ না হলে কি ভোগ হয় না! অহোরাত্র দিন সকলের যে নেশায়—তার প্রাণ ভরে আছে, আর তা যে কত সুখের—কত তৃপ্তির, তা যে করে সেই উপভোগ করে।

হিসাব নিকাশ খতিয়ে, বেচারাম বিবাহের প্রস্তাব প্রত্যাখান করতে বাধ্য হল। সে বেশ সরল ভাবেই লোককে বুঝিয়ে দিল যে, তার মত অবস্থার লোকের বিবাহ করা আদৌ সমিচীন নয়।

(৪)

বেশী বেতনের লোভে, অর্থলোভী বেচারাম পূর্ব্বের কোলিয়ারী ছেড়ে রাণীগঞ্জের নিকট একটা অস্বাস্থ্যকর স্থানের কোলিয়ারীতে শুদামবাবুর চাকরী নিয়ে এসেছিল। এখানে আসার পাঁচ ছ'মাস পরেই তার মাঝে মাঝে জ্বর হতে লাগল। সাবধান হওয়া দূরের কথা, অসুস্থ শরীরে ক্রমাগত কার্য্য করে এবং আবশ্যক মত ঔষধ পথ্য না করে, শীঘ্রই তার শরীর ভেঙ্গে পড়ল। কলিয়ারী ডাক্তার পরীক্ষা করে, কুইনাইনের ব্যবস্থা করলেন, দু' একদিন খেয়ে বেচারাম বিরক্ত হয়ে ঔষধ খাওয়া ছেড়ে দিল। দিন কতক ছুটি নিয়ে কোথাও বেড়িয়ে আসার জন্য অনেকে পরামর্শ দিল, নূতন চাকরীতে ছুটি নিলে বেতন কাটা যেতে পারে, এবং বেড়াতে গেলে পয়সা খরচের আবশ্যক; কারণ আজকাল অন্যান্য খাদ্যদ্রব্যের দুর্ম্মূল্যতার সঙ্গে হাওয়া খাওয়ারও দাম বেড়ে গেছে। কাজেই, দুদিকে লোকসান করে লোকের পরামর্শ মত কার্য্য করতে সে সক্ষম হল না। শীঘ্রই সেরে যাবে মনে করে সে হাওয়া খাওয়ার বাসনা পরিত্যাগ করল। অসুস্থ শরীরে অতিরিক্ত পরিশ্রম করে, ফিতে বিপরীত হল—রোগ মারাত্মক হয়ে দাঁড়াল। ডাক্তার দেখে বললেন "হৃদরোগের লক্ষণ, কলকাতায় গিয়ে

ভাল চিকিৎসার ব্যবস্থা না করলে এবং বিশেষ সতর্ক না হলে জীবনের আশা কম।"

ডাক্তারের মুখে রোগের অবস্থা শুনে বেচারাম একেবারে মুষড়ে পড়ল, মৃত্যুর বিকট দর্শন তাকে অস্থির করে তুলল। অনেক চিন্তার পর সে দাদাকে পত্র লেখাই যুক্তিযুক্ত বিবেচনা করল।

পত্র পেয়ে বেচারামের দাদা টেলিগ্রাম করে, তাকে বাড়ী ফিরতে বললেন। বেচারাম এক মাসের ছুটী নিয়ে বাড়ী গেল।

(৪)

কলিকাতায় ভাল ডাক্তার দিয়ে পরীক্ষা করিয়ে দেখা গেল, যে, পয়সা জমানর ক্ষুধা নিবৃত্তি করতে বেচারাম তার আয়ু শেষ করে এনেছে, এবং সে কারণ যে কোনও দিন—যে কোনও মুহূর্ত্তে তার মৃত্যু সম্ভব।

বেচারামের চরিত্র সম্বন্ধে তার দাদার কোন সন্দেহ ছিল না। এরূপ শারিরীক অবস্থার হেতু অনুসন্ধান করাতে, বেচারাম নির্ব্বিকারচিত্তে উত্তর দিল "অর্থের অনাটনেই সে অনিচ্ছাসত্ত্বেও শরীর ও মনের উপর অত্যাচার করিতে বাধ্য হয়েছিল, কারণ অনেক চিন্তা করেও—হিসাব ঠিক রেখে, সে শরীর ও মনের সুস্থতার খোরাক জোগাতে সক্ষম হয়নি।" বেচারামের দাদা অনাবশ্যক বিবেচনায় আর কিছু জিজ্ঞাসা করেন নি।

বেচারামের জীবন প্রদীপের তৈল ক্রমেই নিঃশেষ হয়ে এল, সে বুঝতে পেরেছিল যে পরপারে যাত্রার দিন নিকটবর্ত্তী। অনেক চিন্তা করেও সে তার সঞ্চিত অর্থের কোন কিনারা করে উঠতে পারল না। তার এতদিনের সুখ দুঃখের সাথীদের সহিত অবশ্যম্ভাবী বিচ্ছেদ স্মরণ করে, একদিন রাত্রে, বেচারাম তার সারাজীবনের হিসাবের কড়ির, শেষ হিসাব নিকাশ করে রাখল। সকালে উঠে সকলে দেখল, সারা বিছানায় ছড়ান নোট ও টাকার ওপর —বেচারাম চিরনিদ্রিত। ধরাধরি করে বিছানা থেকে নাবাতে গিয়ে তার বালিশের নীচেয় একখানা হিসাবের খাতা পাওয়া গেল। খাতার হিসাবে দেখা গেল—বেচারাম আট বছর বয়স থেকে এই টাকা জমাতে সুরু করেছিল।

এতদিনের রক্ত জল করা সঞ্চিত অর্থ চিরজীবনের মত ছেড়ে যেতে হবে এবং সেই অর্থ অন্যে অপব্যবহার করবে, এই চিন্তাই বেচারীর মৃত্যুর কারণ হয়েছিল।—তাই বোধ হয় সঞ্চিত অর্থের রাশি বুকে জড়িয়ে ধরে নিজের মনের সঙ্গে সারা রাত্র যুদ্ধ করেছিল। কাউকে সে প্রাণ ধরে সে টাকা দিয়ে যেতে পারে নি—কোন যুক্তিরই মীমাংসা করবার আগেই উৎকট ব্যাধি তার ক্ষীণ দুর্ব্বল হৃদপিণ্ডটাকে চেপে ধরে, তার নিশ্বাস বন্ধ করে দিয়েছিল।

বেচারামের মৃত্যুতে তার দাদা বড়ই ব্যথিত হলেন। ভ্রাতার কষ্ট সঞ্চিত অর্থ তার আত্মার মঙ্গলার্থে তিনি দরিদ্র ভাণ্ডারে পাঠিয়ে দিলেন।

প্রাচীন ভারতের মন্ত্রী।

শ্রীসুধাংশুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বি-এ।

নৃপতি কোন কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে সুগঠিত সংসদে কি কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করিতেন। সে স্থানের আলোচ্য বিষয় সমস্তই গোপন রাখা হইত। এজন্য সংসদে উপস্থিত সকলের উপর রাজা সতর্ক দৃষ্টি রাখিতেন এবং এই নিমিত্তই মন্ত্রী মনোনয়নের সময় লোক চরিত্রাভিজ্ঞতা ও নিপুণ দৃষ্টি প্রয়োগের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হইত।

কৌটিল্য মতে কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ জন্য তিন চারিজন মন্ত্রীর সহিত পরামর্শ করিতেন। এই পরামর্শ সভায় কি উপায়ে কাজ হাসিল করিতে হইবে, যথেষ্ট অর্থ ও জন বল সংগ্রহ, স্থান কাল নির্দ্দেশ, বিপদবারণ উপায় এবং পরিণাম কেমনে জয়শ্রী বিমণ্ডিত হইবে, এই কয়েক বিষয়ের বিশিষ্ট আলোচনা হইত। নৃপতি মন্ত্রীদের ভিন্ন ভিন্ন ভাবে প্রদত্ত কিংবা সকলের একসঙ্গে আলোচিত মতও যুক্তি প্রয়োগ বিবেচনা করিয়া, প্রত্যেক মতের সারবত্তা অনুভব করিতেন।

এই পরামর্শ সভা ব্যতীত মন্ত্রী-পরিষৎ নামে আর এক সভা ছিল। যথাসাময়ীক অর্থাৎ রাজ্য সুপরিচালনের

অন্ত প্রয়োজন মত মন্ত্রী লইয়া এই মন্ত্রী পরিষদ গঠিত হইত। অনারব্ধ কার্য্যারম্ভ, আরব্ধ কার্য্য সম্পাদন, সম্পন্ন কর্ম্ম আরও উন্নত প্রণালীতে সেব করিবার প্রয়াস এবং রাজবিধি যাহাতে একটুকুও নড়চড় না হইয়া যথাযথ প্রতিপালিত হয় সে বিষয়ে ক্ষমতা নিয়োগ, ইহাও তাহাদের অবশ্য করণীয় ছিল। মন্ত্রীগণ রাজচক্ষু বলিয়া বিবেচিত হইত। রাজা নিকটস্থ মন্ত্রীদের কার্য্য নিজেই অন্য কর্ম্মচারীদের সমভিব্যাহারে পরিদর্শন করিতেন এবং দূরস্থ যাহারা তাহাদের বিশ্বস্ত চর ব্যবহার দ্বারা জ্ঞাত হইতেন।

উপস্থিত বিপদমূল অবস্থায় রাজা মন্ত্রী ও মন্ত্রী-পরিষদ্ দুই-ই আহ্বান করিয়া তাহাদের নিকট সকল অবস্থা বিবৃত করিতেন। তাহাদের মধ্যে অধিকাংশের মতানুযায়ী কাজেই তিনি প্রবৃত্ত হইতেন এবং কার্য্যসিদ্ধির জন্য প্রদর্শিত প্রকৃষ্ট উপায়কে আঁকড়াইয়া ধরিতেন।

স্বেচ্ছাচার রাজত্ব যে সম্ভব নয়, অপরের সাহায্যের যে প্রয়োজন আছে, তাহা স্বীকৃত হইয়াছে, একা এক চাকা চলিতে পারে না, সেরূপ রাজাও একা অগ্রসর হইতে পারেন না,—তাঁহারও মন্ত্রী নিয়োগ করিতে এবং তাহাদের মতামত শ্রবণ করিতে হয়। মন্ত্রীরা যেরূপ সর্ব্বদা বিপদ-আপদে রাজাকে সতর্ক করিত এবং তাঁহার পাপ নাশিতে তৎপর রহিত, রাজাও সেরূপ তাহাদিগকে প্রীতি ও সম্মানের চক্ষে দেখিতেন।

উচ্চবংশোদ্ভূত, বিজ্ঞতা সম্পন্ন, সাধুউদ্দেশ্যে গরীয়ান্, সাহসী এবং রাজভক্ত লোকদিগকেই মন্ত্রী নিযুক্ত করা হইত। কার্য্য বিভাগ এবং স্থানকাল নির্দ্দেশ করতঃ অমাত্যরূপে ইহাদিগকে নিয়োগ করা হইত। কর্ম্ম বিভাগে কার্য্য করণার্থ উদ্দিষ্ট এই সকল নিয়োজিতদের সভাসদ্ হইবার যোগ্যতা ছিল না।

সভাসদ্ নিযুক্ত করিবার সময় বংশ ও কুল-মর্য্যাদা, শিক্ষা দীক্ষা, যুক্তি ও প্রয়োগজ্ঞান, বীর্যশক্তি, মেধা, স্বভাবের কমনীয়তা, বাগ্মীতা, কার্য্যকুশলতা, ধৈর্য্য, উদ্যম, সাহসিকতা, সচ্চরিত্রতা, সপ্রেম ব্যবহার, রাজভক্তি, আচার ব্যবহার, শক্তি সামর্থ্য, স্বাস্থ্য, তেজ, আলস্য ও চপলতার অপরাঙ্মুখীতা, সন্দেহ ও বিষজনীন প্রেমানুকূল স্বভাব প্রভৃতি বিষয়ে তীক্ষ্ণদৃষ্টি দেওয়া হইত এবং প্রত্যেক বিষয়ে সে-সম্বন্ধে অভিজ্ঞ জনের মতামত সংগ্রহ করা হইত।

প্রত্যক্ষ, পরোক্ষ ও প্রমাণিত এই তিন প্রকারের রাজকর্ত্তব্য ছিল। বিভিন্ন স্থান ও দূরবর্ত্তী প্রদেশের এই সকল কার্য্য সম্পাদনার্থ রাজা মন্ত্রী নিযুক্ত করিতেন এবং ইহাই ছিল এই সকল মন্ত্রীদের করণীয় কার্য্য।

শাস্ত্রানভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ মন্ত্রী-পরিষদের আলোচনা শুনিবার অনুপযুক্ত বলিয়া বিবেচিত হইত। শত্রুর দুরধিগম্য হইবার পক্ষে মন্ত্রী-পরিষদের উপদেশ ও নির্দ্দিষ্ট পন্থা যে অন্যতম অমোঘ অস্ত্র, তাহা অর্থশাস্ত্রে স্পষ্ট স্বীকৃত হইয়াছে।

মন্ত্রীদের সচ্চরিত্রতা ও সুশীলতা নানা উপায়ে পরীক্ষা করা হইত। রাজা যে গুপ্তচর কিংবা অন্যবিধ উপায়ে তাহাদের কার্য্যাবলী নিরীক্ষণ করিতেছেন, এবং কখন যে কিরূপ কাজের মধ্য দিয়া তাহাদের দুরভিসন্ধি এবং অসদুদ্দেশ্য আবিষ্কার করিয়া বসেন, এই চিন্তা মন্ত্রীদের মনে অবজ্ঞস্ততা সৃষ্টি করিয়া তাহাদের কাজের স্বাভাবিক গতিকে প্রতিহত করিত, সন্দেহ নাই।

যাহাদের কর্ম্ম বিভাগে কাজ করিতে হইত, তাহাদের মধ্যে রাজদ্রোহীদিগকে শাসন করিবার জন্য যেরূপ কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা ছিল, তাহাদের কর্ম্মের দায়িত্ব ও ক্ষমতার গুরুত্ব হিসাবে তাহা অনুচিত বিবেচিত হইবে না। অর্থশাস্ত্রকার রাজার মৃত্যু সময়ে এবং মৃত্যুর অব্যবহিত পরে মন্ত্রীর যে কর্ত্তব্য নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহা পাশ্চাত্য দেশ প্রচলিত যে কোন আধুনিক মতবাদের সহিত তুলনার যোগ্য।*

* অর্থশাস্ত্র অবলম্বনে-লিখিত।

"নরেন, গাধা ইস্পিল্ কোথাকার! এ কাগজপত্র তোমার এখানে রাখতে কোন্ শুয়ার বলেছে?"

"আজ্ঞে, আপনিই বলেছিলেন।"

"আচ্ছা থাক্, কিন্তু তুমি কাল থেকে আর আমার আফিসে এস না।"

"আ-জে?"

"মনিবকে শুয়োর বলে আবার চাকরীর আশা রাখ?"

সাধের মরণ

(শ্রীকালিদাস রায়)

এ হেন জ্যোৎস্নাময়ী শারদ নিশায়
সুরভি সৌরভ শোভা ভুলায় এ দেহ।
"কি হইতে, কি করিতে এবে সাধ যায়?"
আমারে শুধায় যদি লীলাচ্ছলে কেহ,
আমি তবে বলি "বন্ধু এ অমৃতক্ষণে
সব হ'তে বাঞ্ছনীয় সুখের মরণ,
হেন চন্দ্রমসী নিশা জননী-চরণে
মাথা রেখে লভি যদি প্রাণবিসর্জন।
জানিনাক কোন অজ্ঞ দুর্যোগের সাঁঝে
কোথা কোন মরুকে ত্যজিব ভুবন।
প্রাণ যদি যায় এই মহাপ্রাণ মাঝে
আহা তব এ মরণে অনন্ত জীবন।
হেন পুণ্য পৌর্ণমাসী নিশা মম প্রাণ
করিবে কি তার শুভ্র শুচিতায় স্নান?"

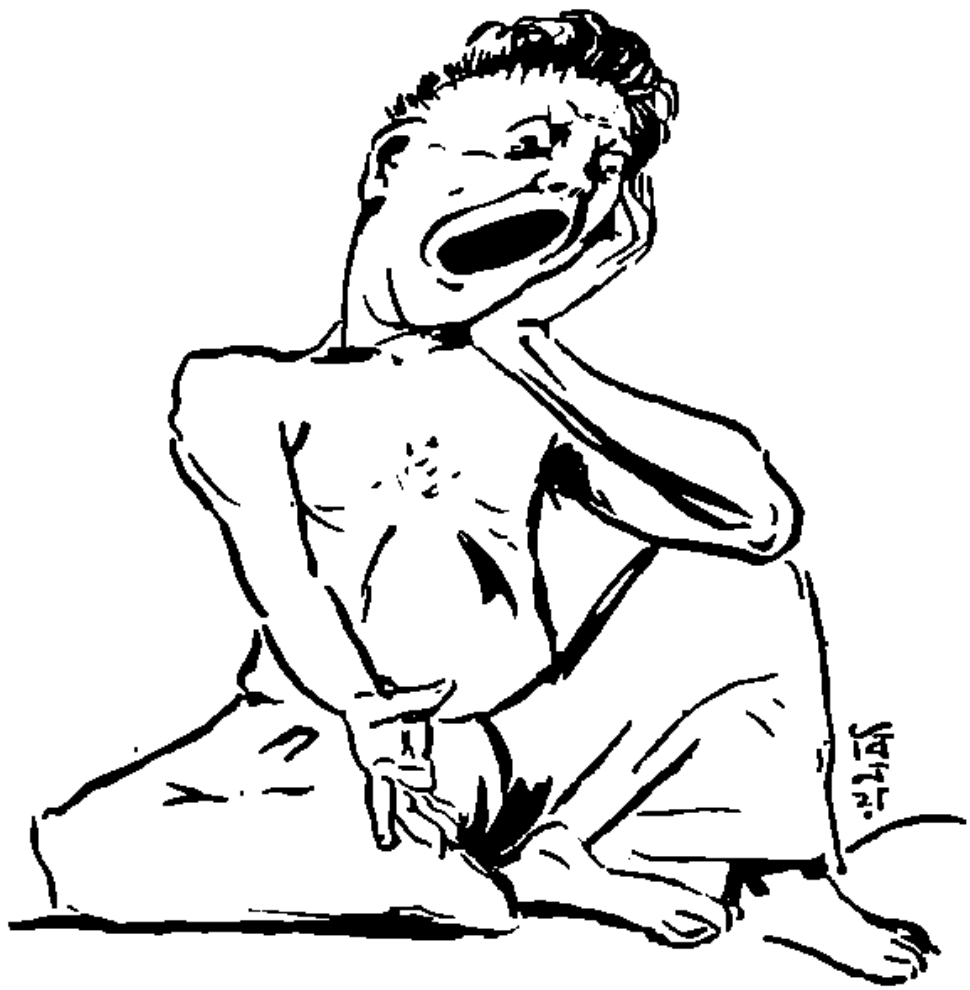

সা ———

ব্যর্থ-সঙ্গীত

(শ্রীসাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়)

কত আর গাব গান
গান গেয়ে মন পাই না তোমার
কেঁদে ওঠে সারাপ্রাণ।
গানের ছন্দে চাহিয়া তোমায়
লজ্জায় মরে যাই
সারা সুর বৃথা তোমারে খুঁজিয়া
করিতেছে হায়-হায়
একবার শুধু শুধু একবার ফিরে চাও
আমার গানের মূর্চ্ছনাটুকু চরণে লুটাতে দাও।
অবশ অঙ্গ ঘেরিয়া আমার
আঁধার নামিল ধীরে
কণ্ঠ যে মোর রোধ হয়ে আসে
পঞ্জর ভাঙ্গে গভীর হতাশে
প্রাণ ফেটে যায় মরণ কাঁদনে
বুক ভাসে আঁখি নীরে।
কতদূর তুমি, কতদূর ওগো আছ তুমি কতদূরে?
তোমার চরণপরশে লভিতে গান আমি কোন সুরে?
তুমি কি গানের পারে?
সুর কাটা সুরে এত আহ্বান
ফিরে আসে বারে বারে।

পাশ না ফেল

(শ্রীসরসীবালা বসু.)

১

যদিবাবু রেলওয়ে হাসপাতালের চাকরীতে পক্কেশ হইয়াছেন সহরে ও পল্লীতে আছে, কৃপণ,—সুতরাং দুপয়সা যে জমাইতে পারিয়াছেন সে বিষয়ে কাহারও সন্দেহ নাই, একমাত্র পুত্র হরেন্দ্র যে মানুষ হইয়া উঠিতেছে না এই বড় দুঃখ। তাঁহার স্ত্রী এক পুত্র এক কন্যা রাখিয়া পরলোক গমন করিয়াছিলেন, পূর্ণ যৌবন বয়সে,—অর্থাৎ চল্লিশের কোঠা পার হইয়া পত্নীহীন হইয়াও তিনি আর দ্বিতীয় দারপরিগ্রহ করেন নাই কেবল ছেলেমেয়ের মুখ চাহিয়া। নববিবাহিতা তরুণীস্ত্রী, স্বামীর দু পাঁচ বছর বয়স বেশীর অনুহাতে মাথায় চড়িয়া বসিয়া যে দুইহাতে তাঁহার শ্রমার্জ্জিত অর্থের অপব্যবহার করিয়া নিজের ছেলেমানুষীর সাধ মিটাইবে কল্পনায় এ দৃশ্য দর্শনে শিহরিয়া উঠিয়া তিনি আগে ভাগেই সাবধান হইয়াছিলেন, বন্ধুবান্ধবদের সদুক্তি উপেক্ষা করিয়া, পুরাতন ভৃত্য সুখলালের জিম্মাতেই গৃহস্থালীর ভার দিয়া নিশ্চিন্ত ছিলেন, ছেলেছুকরে মানুষ করিবার জন্য দেশ হইতে কোনো আত্মীয়কে ও আমদানী করেন নাই, মেয়েটির অল্প বয়সে বিবাহ দিয়া দায়মুক্ত হইয়াছিলেন যা কিছু ভাবনা ছিল হরেনকে লইয়া। পড়াশুনায় তার মোটেই মন ছিল না, থার্ডক্লাসে বার দুই ফেল হইয়া যখন নানা অছিলায় স্কুল কামাই করিতে লাগিল, তখন বুদ্ধিমান ডাক্তারবাবু অনর্থক স্কুলের মাহিনা গণিয়া দেওয়া সুবিবেচনার কাজ মনে করিলেন না, ছেলের স্কুল ছাড়াইয়া রেলের অফিসে ভর্ত্তি করিতে চাহিলেন, হরেন হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল। স্কুল ছাড়িয়া সে ছয় আনা দশ আনা ছাঁটের টেড়ী সংসাধনে ও চুড়ীদার আজানুলম্বিত প্রায় চরণ চুম্বিত পাঞ্জাবী পরিধানে মনঃযোগ করেন, তবে অফিসের ধার দিয়া মোটেই-হাঁটিল না। বাড়ীতে স্ত্রীলোক একটি না থাকিলে সংসারের অবস্থা মোটেই প্রীতিকর হয় না, মেয়ে লীলা বয়সে এগার বছরেরটি হইলেও তাঁহারের ভার তারই হাতে ছিল, বিবাহের পর শ্বশুরবাড়ী যাওয়ায় তাঁহারঘরের অধিষ্ঠাত্রীর অভাব বিশেষভাবে অনুভূত হওয়ায় ডাক্তারবাবু হরেনের বিবাহ দিয়া ঘরে বউ আনিলেন, কৃতা সুখলাল ইহাতে যথেষ্ট আশ্বস্ত হইল, যেহেতু ডাক্তারবাবুর ডাক্তারখানার কাজ হইতে তাঁহার তদারক এবং সব বিষয়ের উপযুক্ত হিসাব সে আর দিয়া উঠিতে পারিত না, অথচ না দিলে মনিবের নিকট রেহাই ও ছিল না।

গুরুজনের বাসাই শুভদৃষ্টে বার বছরের নববধূ উমার সহিত হরেনের প্রথম আলাপের সঙ্কোচ, লজ্জা খুব সহজেই কাটিয়া গিয়া যে ভাবটি জমিয়া উঠিল কাব্যশাস্ত্রে তাহাকে প্রণয় সংজ্ঞা দেওয়া যায় কি না জানি না, তবে হরেন না কি তার বন্ধুমহলে অনেক সময়ে দুঃখ করিত যে বউটা তার বড্ড ছেলেমানুষ, আঠার বছরে স্বামীর নবযৌবন উপেক্ষা করিয়া পুতুল খেলার দিকে তার মনযোগই খুব বেশী, তবে কি না 'সবুরে মেওয়া ফলে' এ প্রবাদ বাক্যটি মনের মধ্যে গাঁথিয়া লইয়া সে তাঁর বালিকা

বধূর করমাস মত পুঁতির মালা, কড়ির বাক্স, পুতুল ছেলে মেয়ের জন্ত বিছানা, খাট ইত্যাদি যথারীতি যোগাইতে লাগিল, পাশের বাড়ীর মৃনালিনীর পুতুল ছেলের সহিত উষার পুতুল মেয়ের বিবাহ, তার ব্যয়নির্ব্বাহ, তার উপর ডাক্তারখানার খরচ—পকেট খরচ হইতে এ সব ব্যয় সঙ্কুলান নিতান্তই দুর্ঘট দেখিয়া হরেন এইবার সুযোগ বালকের ন্তায় রেলের অফিসে আঠার টাকা মাহিনার কাজেই গিয়া লাগিয়া পড়িল, পুত্রের এহেন যোগোদয় দেখিয়া ডাক্তারবাবু মনে মনে খুব খুসী হইয়া পরমত বধূটিকে প্রশংসার চক্ষেই দেখিলেন, এবং অফিসের Head clerk দেবীবাবুকে পুত্রের যাহাতে পদোন্নতি হয় তার জন্ত অনুরোধ করিলেন।

কৃতভোগীগণ জানেন রেলের চাকুরীতে ছুটীর কি অবস্থা, ডাক্তারবাবুর অনুগ্রহ ভিন্ন ছুটী ও জায়গাটিতে মোটেই সুলভ নয়, এহেন ডাক্তারবাবুকে কাহমনে সকলেই মানিয়া থাকেন, দেবীবাবুও জানেন তিনি ডাক্তারবাবুর অনুরোধে বিনয় করিয়া কহিলেন "হরেন আমাদের ঘরের ছেলে, ওর জন্তে বেশী কিছু বললে আমাদের লজ্জা দেওয়া হয় ওকে ফেরার সাহেবের কাছে টেলিগ্রাম পিঠতে দিন; তিনের স্কুলে ছোকরারা সব দানাপুরে Examine দিতে যাবে সেই সঙ্গে গিয়ে Examine দিয়ে পাশ করে ফেলুক তখন দেখা যাবে ওকে আমরা কোনখানে বসাই।"

এহেন সুযুক্তি ডাক্তারবাবু সানন্দচিত্তেই মানিয়া লইয়া মিষ্টার ফেরারের নিকট ছেলের টেলিগ্রাম পিঠিবার ব্যবস্থা করিয়া দিলেন।

যথাসময়ে বারজন শিক্ষার্থী দানাপুরে পরীক্ষা দিতে গিয়াছে, তন্মধ্যে অবশ্য চরেন্দ্র একজন পরীক্ষার আটজন অনুত্তীর্ণ, তন্মধ্যে ও হরেন্দ্রর নাম বাদ পড়ে নাই, সংবাদটি সবেমাত্র তারে আসিয়া অফিসে পৌঁছিয়াছে, সংবাদটি জানিবার জন্ত বড় বেশী আগ্রহ ছিল সুরেশের এবং জানিয়াও ছিল সেই সর্ব্বাগ্রে।

ডাক্তারবাবুর প্রতি শ্রদ্ধা তার আদৌ ছিল না, অথচ হরেন ছিল তার অন্তরঙ্গ বন্ধু, বন্ধুর পিতার প্রতি শ্রদ্ধা হীনতার যে কোনো যুক্তিপূর্ণ কারণ ছিল জানা যায় নাই, তবে সে যে বেকার বসিয়া মামার অন্ন ধ্বংস করিতেছে এবং "কড়ক" ইহা সকলেই জানিত। নিজে 'বেকার' হইলেও ছোটখাট উমেদার ছোকরার দল তার বেশ একটু যোগাযোগ করিত, যেহেতু সে দেবীবাবুর ভাগিনা, সুতরাং অফিসের জ্ঞাতব্য অনেক সংবাদই তার নিকট হইতে জানা যাইত।

হরেন যে দিন পরীক্ষার্থীদের সহিত দানাপুর রওনা হয় সেদিন সুখলাল নগদ সাড়ে তিন টাকা দিয়া আগা সাহেবের নিকট হইতে একটি কুকুরের ছানা স্থানীয় পীর বাবার উদ্দেশ্তে যখন কিনিয়া লইয়া যায় তখন সুরেশ ছিল চাক্ষুষী সাক্ষী, অবশ্য হরেন পরীক্ষায় পাশ না হইলে পূজায় বলি উৎসর্গ হইবে না পীরবাবা যে আগেভাগে পূজা খাইয়া পরিশেষে পূজাকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখাইবেন ডাক্তার বাবুর কাছে সে কথা অসম্ভব। সেই মুহূর্ত্তেই সুরেশ মনে মনে আগাগোড়া একটি প্রহসন কল্পনা করিয়া লইয়া পীর বাবার উদ্দেশ্তে যে প্রার্থনা নিবেদন করিল, মানুষের ব্যবহার উহাকে বন্ধুপ্রীতির নিদর্শন কিছুতেই বলা চলে না, যাহা হউক, সেই প্রহসনটি কার্য্যে পরিণত করিবার জন্ত সুরেশের উদ্বেগের অন্ত ছিল না, সে উদ্বেগ মনে লইয়াই সে অফিসে পরীক্ষার্থীদের পাশের সংবাদ জানিতে আসিয়া যাহা জানিল, তাহাতে মুখখানায় তার বিদ্যুতের চমক হানিয়া গেল।

সেইদিন বৈকালে চারিটার সময় সে হাসপাতালের কম্পাউণ্ডের সামনে ঘুরিয়া বেড়াইয়াছিল, কম্পাউণ্ডার গাঙ্গুলী মহাশয় যেমন হাসপাতাল হইতে বাহিরে আসিয়াছেন সেও খুব ব্যস্তভাবে পথে হাঁটিতে সুরু করিল, গাঙ্গুলী মশাইএর পাশাপাশি হইবামাত্র সে ভদ্রভাবে তাঁহাকে নমস্কার করিয়া কহিল, এই যে গাঙ্গুলী মশাই, কোথা যাচ্ছেন, ভাল আছেন তো, চিন্‌তে পাচ্ছেন না?" গাঙ্গুলী সুরেশকে কচিৎ এক আধদিন দেখিয়াছেন মাত্র, চিনিয়া রাখিবার মত ঘটনা তার সঙ্গে তাঁর কোনো দিনই হয় নাই। তার উপর কৃত্রিম গোঁপ জোড়াটায় সুরেশের মুখশ্রী একেবারে নূতন রকম দেখাইতেছিল, কিন্তু ভদ্রলোকের ছেলে যাচিয়া যখন কুশল প্রশ্ন করিতেছে তখন চিনিতে না পারাটা মোটেই ভাল দেখায় না, তাই তিনি ভদ্রতার হাসি হাসিয়া মিষ্টমুখে কহিলেন "আছি এই এক রকম, আপনি ভাল আছেন তো, যাচ্ছেন কোন দিকে।"

সুরেশ কহিল—"আজ্ঞে একবার আফিসে গেছ্‌লাম, ছোকরারা সব দানাপুরে একজামিন দিতে গেছ্‌ল, 'রেজাল্ট' টা জেনে এলাম, এখন একবার—"

গাঙ্গুলি সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করিলেন, "হ্যাঁ মশাই বলতে পারেন কে কে পাশ হয়েছে? পারি বই কি, আটজন পাশ, চারজন ফেল, বলেন ঘোষ, হতীন মাল্লা, হরেন ঘোষ" মুখের কথা লুফিয়া লইয়া গাঙ্গুলী কহিলেন "কোন হরেন ঘোষ, আমাদের ডাক্তারবাবুর ছেলে তো?—"

সুরেশ নির্ব্বিকার চিত্তে কহিল, "আজ্ঞে সেই বই কি, হরেন ঘোষ আর তো কেউ যায় নি" গাঙ্গুলী কহিলেন

"যাক্ সুখবর তা হ'লে,—তাই তো আমার একবার 'মিনিয়ালস্ কোয়ার্টারে' রুগী দেখতে যাবার কথা ছিল, কি করব তাই ভাবছি, ডাক্তারবাবু দুটোর সময় রুগী দেখতে গেলেন, এখুনি ফিরবেন, খবরটা তাঁকে শুনিয়েই যাব না কি?"

গাঙ্গুলীকে ইতস্ততঃ করিতে দেখিয়া সুরেশ কহিল—"মিনিয়ালস্ কোয়ার্টারে এমন রুগী টুগী কেউ আছে কি যে এখন-তখন অবস্থা, তা যদি না হয় তবে আমার ভয় কিসের, দুঘণ্টা দেরী করেই যাবেন, সুখবরটা ডাক্তার-বাবুকে শুনিয়ে যাওয়া ভাল, আমার সঙ্গে তো পরিচয় নেই না হ'লে আমিই শুনিয়ে যেতাম, যাচ্ছি যাদের বোসের বাড়ী, সে আমার পরিচিত, তার কাকা খবরটা জানবার জন্যে ঠা করে আছেন" সুরেশ চলিয়া গেল, তার ঠোঁটের কোণের বক্রহাসি সরলচিত্ত গাঙ্গুলী লক্ষ্য করিলেন না, ডাক্তারবাবুর মর্জ্জি হইলে এ বৎসর তাঁর পাঁচটি টাকা মাহিনা বৃদ্ধির সম্ভাবনা, সুতরাং এহেন ডাক্তারবাবুকে খোসখবর শুনাইয়া খুসী করিতে পারিলেই ভাল এইরকম সাতপাঁচ ভাবিতে ভাবিতে তিনি মৃদু-পাদ-বিক্ষেপে হাসপাতালের হলে আসিয়া দাঁড়াইলেন, ইতি-মধ্যে ডাক্তারবাবুও ফিরিয়া আসিলেন, হাতের ছাতাটি একটি কোণে ঠেস দিয়া রাখিয়া কম্পাউণ্ডারের দিকে রুক্ষ-দৃষ্টে চাহিয়া কহিলেন "খুব শীগ্‌গীর 'মিনিয়ালস্ কোয়ার্টার' থেকে ফিরেছ যে"

গাঙ্গুলী মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে ধীরস্বরে কহিলেন —"আজ্ঞে, সেখানে এখনও যাই নি।"—"এঁ্যা, কেন যাও নি, তোমার যে মন মর্জ্জি কাজ দেখছি হে, চাকরী কোন্ দিন বিপদে ফেলবে আর কি, একে তো শালার রেলের চাকরী না বকমারী, তত গণ্ডা লাইফের রেসপন্-সিবিলিটি যে আমাদের ঘাড়ে তুমি তা আজও বুঝলে না, এতো খানি বয়েস হতে চল্‌ল" গাঙ্গুলী মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে উত্তর দিলেন, "আজ্ঞে তা আর না, তবে কি-না একটু কারণ আছে"

ডাক্তারবাবু ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া গাঙ্গুলীর মুখের দিকে বাঁকা চাহনী হানিয়া প্রশ্ন করিলেন, "কি কারণ তা খুলেই শুনি না হে, যে কারণই থাক্ নিজেদের duty neglect করা তা বলে উচিৎ হয় হয় না, duty it duty"

সুখলাল কলিকায় ফুঁ দিতে দিতে আসিয়া প্রভুর সম্মুখে হুঁকাটি বাড়াইয়া ধরিল, ডাক্তারবাবু চেয়ারে বসিয়া পড়িয়াই দু চারটা টান টানিয়া ভ্রমণ-জনিত ক্লান্তি হইতে মুক্তি লাভ করিলেন, সময় বুঝিয়া গাঙ্গুলী কহিলেন "হরেন এগজামিনে পাশ হয়েছে, রাস্তায় বেরুচ্ছি, এই সুন্দর খবরটা পেলাম, অমন সুখবর আপনাকে না শুনিয়ে আর কোথাও যেতে মন সরল না।" চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া ডাক্তারবাবু কহিলেন—"সত্যি না কি, কে বল্‌লে হে?"

"আজ্ঞে, একটি ছোকরা অফিস থেকে খবর জেনে ফিরছিল। তার বন্ধু কে পাশ হয়েছে সেই খবর তার বাড়ীতে দিতে যাচ্ছিল, তারই কাছে জান্‌লাম" ডাক্তার-বাবুর ঘন গোঁফ জোড়াটির মধ্যে মেঘ মধ্যে বিদ্যুত বিকাশের ন্যায় একটু আনন্দের আভাস দেখিয়া গেল, তিনি প্রীতমুখে কহিলেন; "ছোকরা তা হ'লে সত্যিই হলো, যে মিনমিনে আমার তো ভরসাই হয় নি, তা আপিসে যখন খবর এসেছে তখন মিছেই বা হয় কি ক'রে, তবে দেখীবাবুর উচিৎ ছিল খবরটা আমার পাঠিয়ে দেওয়া।"

গাঙ্গুলী কহিলেন, "আফিস যে আজ, কাল দুদিন বন্ধ, ও ছোকরা বোধ হয় privately জেনে এসেছে"

সুখলাল কহিল, "হুজুর, আপলোগোঁ তো বলী বিশওয়াস নেহী করতে হোঁ বাকী হামারা বাত মান্-লিজিয়ে, খোকাবাবু নে জরুর পাশ হুয়া হোগা, পীর বাবাকো মানৎ করনেসে, উনকা নামসে জরুর কাম হাসীল হোতা হ্যায়, আপ ই বাতমে দোকা মৎ কিজিয়ে"

ডাক্তারবাবু কহিলেন, "তা সত্যি গাঙ্গুলী, নইলে এদেশের লোক পীর বাবাকে এতো মান্‌বেই বা কেন, ওরে ব্যাটা সুখলাল, সে পাঁঠা টাকে ভাল করে খেতে দিচ্ছিস্ তো রে?" সুখলাল জিভ্ কাটিয়া কহিল, "ক্যা হাম্ দেবতাকী ধন উপাস রাখেগা বাবুজী? হামারা ডর নাহী হ্যায়?" গাঙ্গুলী কহিলেন, প্রথমে আমারও বিশ্বাস হয় নি, তারপর সব কথা খুঁটিয়ে জিজ্ঞেস করতে বুঝতে পারলাম যে আমাদেরই হরেন বটে, বারজন এগ্‌জামীন দিতে গেছ্‌ল আটজন পাশ হয়েছে, চারজন ফেল করেছে।"

ডাক্তারবাবু কহিলেন, ছোকরার নাম কি, থাকে কোথা, কি করে, এসব particulars জেনে নিলে না কেন?" গাঙ্গুলী প্রমাদ গণিয়া কহিলেন, "সেইটেই ভুল হ'য়ে গেছে, সেও খবরটি দিয়ে তাড়াতাড়ি হন্ হন্ ক'রে চ'লে গেল, আমারও সুখবরটা শুনেই প্রথমটা এতো আনন্দ হ'লো—" গাঙ্গুলীর শেষ কথাটি উহ্য রহিয়া গেল,- ডাক্তারবাবু কহিলেন "সে যাক্,—ছোকরা আপিসের বাবুদেরই কেউ আপনার জন হবে, নইলে কি আর আপিসে গিয়ে খবর জান্‌তে পারে? তা মিনিয়ালস্ কোয়ার্টারে কাল সকালেই যেয়ো, কারু শক্ত ব্যারাম নেই তো?"

গাঙ্গুলী আশ্বস্ত হইয়া কহিলেন "রাম; কারু বা নাকে সর্দ্দি, কারু বা একটু পেটের অসুখ, কারু বা জ্বর, তাতেই

সিক্ রিপোর্ট করে ঘরে বসেছে; ও ব্যাটাদের সহজে কি কিছু হয়?"

সুখলাল কহিল—"বড়ী ঠিক বাত্ হ্যায় বাবুজী, ই জাত্‌কো কেইসন্ না বীমার হো জায়, জল্‌দীসে দম ছুটে তো নেহী, সকই অউর ঘুঁট খাতে খাতে হজ্জী একদম পথল বন্ যাঁয়।"

ডাক্তারবাবু চিন্তামগ্ন চিত্তে তামাকু টানিতে লাগিলেন, সুখলালের টীপ্পনীর কোনো উত্তর দেওয়া আবশ্যক মনে করিলেন না; কিছুক্ষণ পরে মুখ তুলিয়া কহিলেন "দেখ গাঙ্গুলী কালকের রাত্তের ট্রেণে যা হ'লে ছোকরারা ফিরবে, তুমি কাল সকালে আগা সাহেবের কাছ থেকে আর একটা পাঁঠা কিনে এনো, দাম বুঝেচ কি, না—বেশী না হয়, না হয় ছোটো দেখে দুটো কিনে নিও, আর অফিসের দেবীবাবু, হেমবাবু, মতিবাবু এঁদের নিমন্ত্রণ করে এসো, পরশু রাত্রে এদের সব মাংস আর লুচি খাইয়ে দেওয়া যাবে, কিন্তু খবরদার যেন বলে বোসোনা ডাক্তারবাবু ছেলে পাশ হয়েচে বলে খাওয়াচ্ছেন, সেটা শুনতে মোটেই ভালো লাগবে না, তা ছাড়া আমরা তো এখন কোনো খবর শুনিও নি, গায়ে পড়ে শুনতে যাবারও দরকার নেই, কি বল?" গাঙ্গুলী সোৎসাহে কহিলেন "জ্ঞে বটেই তো, আমাকে আর আপনাকে কিছু বলতে হবে না, আমি সব ঠিক করে নেবো।"

৩

আগা সাহেব মধ্যাহ্ন ভোজনে বসিয়াছেন, মোটা মোটা রুটী, আর গোস্ত কাবাব, ক্ষুধার তাড়নায় খুব শীঘ্র শীঘ্র গলাধঃকরণ করিতে ব্যস্ত, বেড়া ঘেরা আঙিনায় এক পাল হাঁস ও মুর্গী চরিয়া বেড়াইতেছে, কয়েকটি ছাগশিশু ও কয়েকটি পুষ্ট দেহ ছাগ বৎস সারি সারি খুঁটিতে বাঁধা, স্থপাকার অশ্বত্থ ও বট পাতা তাহাদের সম্মুখে পড়িয়া আছে, বেছারীরা তাহা চিবাইতে চিবাইতে মাঝে মাঝে চীৎকার করিয়া উঠিতেছে, আগা সাহেব উহাদিগের দিকে লক্ষ্য করিয়া আহারের মধ্যে লাভের হিসাবটা খতাইয়া রাখিতেছে এই সময় বাহির হইতে ডাক আসিল "আগা সাহেব বাড়ীতে হ্যায়?"

আগা সাহেব সাগ্রহে উত্তর দিল "হ্যায় বাবুজী, চলা আইয়ে" গাঙ্গুলী, সুখলালের সহিত বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিয়াই নাকে কাপড় দিয়া বলিয়া উঠিলেন "রাম-রাম, প্রেতের ভবনে প্রেত লীলা!"

আগাসাহেবের আহারের আয়োজন দেখিয়া ভদ্রতার খাতিরেও নিরামিষ ত্যাগ করা তাঁর পক্ষে দুর্ঘট হইয়া উঠিল, মুখে কাপড় চাপিয়া তিনি এক পাশে দাঁড়াইলেন, সুখলাল কহিল "ছুটো পাঁঠা, লেনেকো আয়া হুঁ, ডাক্তারবাবু খানা-পিনা করেছে"।

আগা সাহেব প্রসন্ন চিত্তে কহিল "জরুর, জরুর, টেরো। জারী আদমী কো কামই হ্যায়, লিজিয়ে জো পসীন্ বহুৎ পাঁঠার হ্যায় আপলোগোঁ কো সাজ্‌তা।"

সুখলাল দুটি সুপুষ্ট ছাগ বৎস পছন্দ করিয়া দামের কথা জিজ্ঞাসা করাতে আগা কহিল আপলোগোঁ সে হাম মোলাইড়ো নহী করেঙ্গে, ডাক্তার বাবুকা খুসীসে জো মিল্ জায় উসী মে হাম্ রাজী, পেলিজিয়ে ছয় রুপইয়া, বেশী হাম মজিগেওলা নেহী হ্যায়"

"ওরে সুখলাল গোটা চার টাকা বলে দিস্, কত বা মাংস হ'বে, বড় জোর দুটোয় চার সের,—তেটানো যায় চল্লাম আমি" বলিয়া গাঙ্গুলী অবিলম্বে স্থান ত্যাগ করিলেন, সুখলাল দুই কক্ষে দুটি ছাগল ছানা লইয়া আগাকে সেলাম দিয়া গাঙ্গুলীর অনুসরণ করিল, গাঙ্গুলী সুখলালকে বাসায় যাইতে বলিয়া বাবুদের নিমন্ত্রণ করিতে গেলেন, দুটীতে সকলেই বাড়ী ছিলেন, ডাক্তারবাবুর অকস্মাৎ সাদর নিমন্ত্রণে তাঁহারা আশ্চর্য্য হইয়া গেলেন, কেহ বা আবৃত্তি করিলেন "পূর্ব্বের সূর্য্য বুঝি পশ্চিমে উদয়।"

কোনো সূক্ষ্মদর্শী নিমন্ত্রণের কারণ অনুসন্ধানে মন দিলেন, বন্ধুতত্ত্ব পথিকও সব সুদ্ধ পথ ছাড়িয়া গরম গরম লুচি মাংস ও রসভরা রসগোল্লার চিন্তায় মগ্ন হইয়া তামাকু টানিতে লাগিলেন, মিতব্যয়ী কোনো জন্ম সন্তান স্ত্রীটিকে আজ হইতে তাঁহার কাল রাত্রির আহার তৈয়ার করিবার জন্ম নিষেধ করিয়া রাখিলেন, কি জানি, যদি সকালে অফিসের তাড়ায় বলিতে ভুল হইয়া যায়।

৪

সন্ধ্যার পরই আহার করা ডাক্তারবাবুর নিত্যকার অভ্যাস, আজ কিন্তু বধূমাতাকে তিনি বলিয়া দিয়াছেন একটু রাত করিয়াই যেন তাঁর রুটী প্রস্তুত করা হয়। রাত্রি দশটার ট্রেণে হরেন্দ্র আসিতেছে, সে আসিলে এক সঙ্গেই আহার করিবেন।

শীতের সন্ধ্যায় পর ঘণ্টাগুলা হঠাৎ যেন অতিরিক্ত লম্বা হইয়া পড়ে, বিশেষ করিয়া পাহাড়ের দেশে শীতে আড়ষ্ট হইয়া তাহাদের গতিও বোধহয় জড়সড় হয়।

সন্ধ্যা কি এখন হইয়াছে! দশটা বাজিবার আর নাম নাই যে, সুখলাল কলিকার পর কলিকা রাঙিয়া ক্লান্ত হইয়া পড়িল, ডাক্তারবাবুও আর উৎসাহের সহিত হুঁকায় টান দিতে পারিতেছেন না, নিদ্রাদেবী সারাদিনের কর্ম্ম ক্লান্ত, শীতার্ত্ত গাঙ্গুলীর চোখ দুটি বার বার চাপিয়া ধরিতেছেন, তবু দশটা আর বাজিতে চাহে না, ডাক্তারবাবু খুটখাট শব্দ হইলেই বিস্তীর্ণ হলের মধ্যে চাহিয়া দেখিতেছেন, বিজয় গৌরব দীপ্ত হরেন্দ্র আসিয়া সম্মুখে দাঁড়াইল কি, না। কতক্ষণ পরে সত্য সত্যই এক হাতে হারিকেন ও অন্য হাতে একটি কম্বল লইয়া হরেন্দ্র আসিয়া

দেখা দিল, খুবই ধীরে ধীরে লণ্ঠনটি ভূমিতে রাখিয়া কম্বলখানি বেঞ্চে রাখিতেই ডাক্তারবাবু জোর গলায় বলিয়া উঠিলেন, "এসেচিস্ যে এই ঠেন্ড, ঝাড়ীশুদ্ধো লোক শীতের রাত্তিরে তোর জন্যে জেগে বসে—তুই বুঝি আর একটু পা চালিয়ে আস্তে পারিস্ না. নিড়ি নিড়ি আর কোনোকালে ঘুচ্‌লো না রে!"

হায় হায় বাড়ীশুদ্ধো লোক জাগিয়া থাকিবার কি আবশ্যক ছিল, হরেন্দ্র তো কাহাকেও মাথার দিব্য দিয়া জাগিতে বলে নাই, সে মৃদুকণ্ঠে উত্তর দিল—"আজ্ঞে, গাড়ী তো এইমাত্র এসে পৌঁছেচে, পনেরো মিনিট লেট ছিল আজ—আপনারা কষ্ট করে জেগে আছেন কেন, শুলেই পারতেন।"

ডাক্তারবাবু রাগিয়া কহিলেন "তা বল্‌বি বই কি, তুই পাস হয়েচিস্ শুনে আমাদের কত খুসী, গাঙ্গুলী, সুখলাল সবাই তাই জেগে বসে আছি, যা হোক্ করে পাস্ তো হলি, এখন একটু চট্‌পটে হ' যে কাজ গুছিয়ে নিতে পার্‌বি" সর্ব্বনাশ, এ প্রবঞ্চতা কে শিখিল, ফেলের পরিবর্ত্তে পাসের সংবাদ শুনাইয়া কে হুজুতা দেখাইয়া গিয়াছে? হরেন্দ্রের নিঃশ্বাস রুদ্ধ হইয়া আসিল. অতি-কষ্টে আত্মসম্বরণ করিয়া বেচারী কহিল "আজ্ঞে, ভুল শুনেচেন আপনি, পাস তো হইনি, ফেল হয়েচি, যে তাড়াতাড়ি Message দিচ্ছিল, ঘণ্টায় পঁচিশটা word receive করা কি সহজ কথা, ব্যাটারা তা তো বুঝবে না, দিলে ফেল করে।"

ডাক্তারবাবু বিরক্ত হইয়া কহিলেন—"সব জানিস্ তা'হলে তোর আখিরে যে কি হবে তাই ভাবি আমি—আরে হতভাগা নিজে পাস হয়েচ সে খবরটাও জান না, আপিসে তার এসেচে, আটজনা পাস, চারজনা ফেল, পাসের মধ্যে তোর নামও রয়েচে, না হবিই বা কেন, পীর বাবার নামে পাঠা কেনা রয়েচে, কি বলিস্ সুখলাল?"

হরেন্দ্র বড় বিপদেই পড়িল, সে কোথা হু পাঁচটা বকুনী বকুনী খাইবার জন্য প্রস্তুত হইয়াই আসিতেছে, না হয় তার উপর দশটা বিশটা বেশীই হইত, কিন্তু এ সমাদরের অত্যাচার যে একেবারেই অসহ্য, নিশ্চয় এর ভিতর কোনো দুষ্ট বুদ্ধির কারচুপী আছে, কিন্তু বাবা যে তাহা বুঝিবে না সে হইতেছে আরো বিপদ, তথাপি একবার প্রাণপণ চেষ্টা করিয়া কাঁচুমাচু মুখে সে কহিল, "আপনি ভুল শুনেচেন বাবা, আটজনা ফেল, আর চারজনা পাস, আপিসে যে Message receive করেচে হয় তো সেই ভুল করে ভুল খবর দিয়েছে।"

"যা যাঃ তোকে আর জ্যেঠামী করতে হবে না, খেয়ে মেয়ে শুগে যা, কাল আবার পাঁচজন ভদ্রলোককে খেতে বলা আছে, ওঠো হে গাঙ্গুলী, রাত অনেক হয়ে গেল" বলিয়া ডাক্তারবাবু গাত্রোত্থান করিলেন, হরেন্দ্র বেগতিক দেখিয়া আগে ভাগেই সরিয়া পড়িল, গাঙ্গুলী তখন সভয়ে দুর্গা নাম স্মরণ করিতে সুরু করিয়াছিল, যেহেতু ডাক্তারবাবু বিশ্বাস না করিলেও হরেন্দ্রর কথায় তাঁর এতোটুকু অবিশ্বাস হয় নাই, এবং এই শুভ সংবাদটি সেই প্রথমে ডাক্তারবাবুকে দিয়া যেমন তিনি তাঁহার 'খুসী' আদায় করিয়া ধন্য হইয়াছিলেন এইবার আসল ব্যাপার প্রকাশ হইলে ডাক্তারবাবুর বিরক্তির পরিমাণ খুসীকে যে তিনগুণ পরিমাণে ছাপাইয়া যাইবে আর তার চাপ গাঙ্গুলী বেচারীকেই সহিতে হইবে তাহাতে আর ভুল নাই, সুখলালও এইরকম একটা আশঙ্কা করিতে করিতে "হর হর" নাম উচ্চারণ করিয়া ডাক্তারবাবু জন্য আর এক ছিলিম কলিকা সাজাইতে মন দিল, উকো খবর অপেক্ষা খোকাবাবুর কথাটাই সত্য তাহা বলিয়া প্রভুর মনঃক্ষুণ্ণ করিতে তার সাহসে কুলাইল না।

৫

রাত্রে বন্ধুর সহিত সাক্ষাৎ, উমা হরেন্দ্রর চিন্তাম্লান মুখের পানে চাহিয়া ঝিক্ করিয়া হাসিয়া কহিল "এই-বার? বলেছিলে যে পাস হলে একটা গ্রামোফোন কিনে দেবে, তা দিচ্ছ তো?"

কাটা গায়ে নুনের ছিটা আর কি, হরেন্দ্র উমার সহিত কহিল "বাবা যেমন মিথ্যে খবর শুনে হৈ চৈ করচেন তুমি আর তা কোরো না, কোথাকার কে বলে গেছে অমনি তার কথা বিশ্বাস করে লোকজনদের পর্য্যন্ত নেমন্তন্ন করে বসে আছেন, কেন্ রে বাপু, আমার শ্রাদ্ধ নাকি?"

উমা রাগিয়া কহিল "শ্রাদ্ধ হ'লে বুঝি লোকের এতো খুসী হয়? আমার মাথে হাত দিয়ে তিন সত্যি করে-ছিলে যে পাস হলে গ্রামোফোনো কিনে দেবে, তাইতেই না বলচি, না দাও না দেবে, তার আর কি, আমি তো তোমার গাঁটের কড়ি কেড়ে নিতে যাচ্ছি না,—"

হরেন্দ্র অসহ্য বিরক্তিতে নিজের কাণ মলিয়া কহিল, "সত্যি ক'রে আচ্ছা বোকামী করেছিলাম, তার জন্যে কাণমলা খাচ্ছি, বলছি যে পাস হইনি, হইনি, ফেল হয়েছি,- তবু কি বিশ্বাস হয় না, আমি কি এতোই মিথ্যে! বালী রে বাপু, যে আমার কথা কেউ বিশ্বাস করছে না?

এ হেন তীব্র জবাবদিহিতেও পরিত্রাণ পাই না হায়রে সংসার! উমা অবিলম্বে বিছানার উপর উপুড় হইয়া পড়িয়া ফোঁপাইতে সুরু করিল, হতবুদ্ধি হরেন্দ্র নিদ্রাহীন চক্ষে চেয়ারের উপর বসিয়া বধূর কান্না শুনিতে লাগিলেন, আর কোল সংলগ্ন ঘড়িটা নির্ব্বিকার চিত্তে আপনার হর ভাঁজা ঘোষণা করিয়া চলিল।

৬

বেলা তখন বারোটার কাছাকাছি, অফিসগৃহ সরগরম করিতেছে, কেরাণীবাবুরা ঘাড় গুঁজিয়া কলম পিষিতেছেন, কিন্তু সকাল সাড়ে নটা হইতে একটানে বসিয়া বসিয়া পিঠ ধরিয়া যাইবার উপক্রম, তাহার উপর বহুক্ষণ তামাক না খাইয়া পেট ফুলিয়া উঠিল আর কি, দু-একজন আর থাকিতে না পারিয়া আড়চোখে কেবলি দেখিতেছেন ডি. টি, এস বাহির হইল কি, না, কিছুক্ষণ পরে জুতার মস মস শব্দে ও শিস্ দিয়া প্রিয় কুকুরটিকে ডাকিবার আওয়াজে কেরাণীকুল হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিলেন. কেহ তো পকেট হইতে সিগারেট বাহির করিয়া, চেয়ারে ঠেস দিয়া টেবিলে পা তুলিয়া ফুঁকিতে সুরু করিলেন কেহ বা তাড়াতাড়ি তামাক সাজিয়া হুঁকায় টান দিতে লাগিলেন, ও রসে বঞ্চিত কেহ বা শুধু দুটা পান চিবাইতে চিবাইতে খোসগল্প জুড়িলেন. রেলের অফিসে দুপুরবেলা এক ঘণ্টা, পল্লীগ্রামের কেহ বা এই এক ঘণ্টাকাল অবকাশ প্রিয়ার সংসর্গে কাটাইবার জন্য বাড়ীর দিকে ছুটিলেন, আহার বিমুখ কোনো বাবু বা একমনে কাজই করিয়া চলিলেন।

এই সময়ে ডাক্তারবাবুর আবির্ভাব হইল, তাঁহাকে দেখিয়া সকলের মধ্যে একটা ব্যস্ততা পড়িয়া গেল।

প্রবীন ডাক্তারবাবুর সম্মানের জন্য নবীনের দল, সিগারেট লুকাইল, হুঁকার টান বন্ধ হইল, কেহ বা চেয়ার আগাইয়া ডাক্তারবাবুকে বসিতে দিলেন, কেহ বা হুঁকাটি বাড়াইয়া তাঁহার সামনে ধরিলেন, ডাক্তারবাবু এ সব সমাদর উপেক্ষা করিয়া সরাসরি দেবীবাবুর নিকট গিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "হাঁ মশাই, ছোকরারা যে ধানাপুরে টেলিগ্রাফ একজামীন দিতে গেছ্‌ল ফিরেছে?"

দেবীবাবু কহিলেন "আজ্ঞে ফিরেছে বই কি, আটজন ফেল আর চারজন পাশ হয়েছে।"

বলাবাহুল্য, হরেন্দ্র ফেল হইয়াছে বলিয়াই এ অপ্রিয় সংবাদটি আর ডাক্তারবাবুকে বলিয়া পাঠাইতে দেবীবাবুর মন সরে নাই, ডাক্তারবাবু চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া কহিলেন "official message এ কোনো ভুল টুল নেই তো, আটজনা পাশ, চারজনা ফেল এমন হয় নি তো?"

ডাক্তার বাবুর প্রশ্নের ধরণ শুনিয়া বাবুর দল চোখ টেপাটেপি সুরু করিলেন, দেবী—বাবু ঈষৎ হাসিয়া কহিলেন "message এ ওরকম ভুল যাবে না, এই দেখুন না message"।

ডাক্তারবাবু পকেট হইতে চশমা বাহির করিয়া চোখে লাগাইয়া সাবধানে সেই মেসেজ খানির উপর দৃষ্টি সঞ্চালন করিলেন, না :—আর সন্দেহ করা চলে না, এ একেবারে চক্ষু কর্ণের চূড়ান্ত বিবাদ ভঞ্জন, উত্তীর্ণ চারিজনের মধ্যে হরেন্দ্রের নাম নাই। ডাক্তারবাবু বিনাবাক্য ব্যয়ে গম্ভীর পাদক্ষেপে অফিসগৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেলেন, বিপিনবাবু দেবীবাবুকে জিজ্ঞাসা করিলেন "হাঁ মশাই, ব্যাপার কি?"

দেবীবাবু কহিলেন "হরেন টেলিগ্রাফ পরীক্ষা দিতে গেল পাশ হয়েছে কি, না জানতে এসেছিলেন, ছোকরা পাশ হ'লে একটা ভালো কাজে লাগিয়ে দেবো বলেছিলাম কি, না তা যে dull!"

বিপিনবাবু কহিলেন "বটে, তা—আজ রাত্রে ওঁর ওখানে নিমন্ত্রণ টা কিসের তা তো বুঝতেই পারছি না, ছেলে পাশ হয়নি বলে মুখ তো তোলোহাঁড়ী করে বেরিয়ে গেলেন—

ঔদরিক শ্যামবাবু কহিলেন "তার সঙ্গে আর নেমতন্নর সম্পর্ক কি, হয় তো বউ-মা-টির কিছু বার ব্রত আছে তাই পাঁচজনকে খাইয়ে দিচ্ছেন, রূপসের বাড়ীতে পাতপেড়ে লুচি মণ্ডা খাওয়া বড় আমোদের জিনিষ হে!"

এদিকে ডাক্তারবাবু বাসায় ফিরিয়া কম্পাউণ্ডারকে কহিলেন "হাঁ হে, ছোকরা সত্যিই বলেছে, পাশ হয়নি, ফেলই হয়েছে, তা ও আমার জানা কথা, তুমি যেমন কাঁচা লোক, কোথাকার কে একটা উড়ো খবর দিয়ে গেল, তা নিয়ে মত্ত হৈ, চৈ।

আমি তো বিশ্বাসই করতে চাই-নি, কেবল তোমারি পায়ায় পড়ে— এ সুখলাল, আভী যাও, পাঁঠাটো সব আপা সাহেবকো কে সুরার দেও, আউর রুপেয়া লেকে আঁটা, ঘি, সব সুরাও দেও মুহু কাহ নাহী হ্যায়"

সাঙ্গুলী কম্পিত কলেবরে সব আদেশ শুনিয়া যাইতে লাগিলেন, দ্বিরুক্তি করিবার কিছুমুই নাই, সুখলাল কিন্তু সাহসে বুক বাঁধিয়া জোড়হাতে কহিল "আভী হাম সব চীজ সুরায় দি আওরে পা হুজুর, বাকী দেও ত কী নাম সে তো পাঠক লায়া, উহী পাঠক ঠো উন্‌কোই—

বাকী কথা উহ্য রহিয়া গেল, ডাক্তারবাবু ধমক দিয়া কহিলেন—"তুম্‌হার খুসী হোয় তুম ঐ পাঠক পীরবাবাকো নাম সে চড়ায় দেও হাম এইসা বুজ্‌রুক নাহী হ্যায় যে বুট্ মুট্ উন্ কো নাম সে পূজা চড়াও রেঙ্গে—পীরবাবা, পীরবাবা, কাম নহী দেখ্‌নাবা, পূজা খানে ওয়ালা!"

বাক্য ব্যয় বৃথা এবং বসিয়া প্রভুর তিরস্কার পাইয়া পরিণাক শক্তির পরিচয় দেওয়া ততোধিক বৃথা বুঝিয়া সুখলাল তৎক্ষণাৎ আদেশ পালন করিতে চলিয়া গেল, গাঙ্গুলীও সঙ্গে চলিলেন।

৭

রাত্রি তখন সাড়ে আটটা, ডাক্তারবাবু বারেন্দায় বসিয়া ধূমপান করিতেছেন, গাঙ্গুলী সামনের ঘরে বসিয়া প্রয়োজনীয় রিপোর্ট লিখিতেছেন, সুখলাল মোটা কম্বল ঘাড়ে জড়াইয়া, ডাক্তারবাবুর আর এক ছিলিম তামাক সাজিবার আদেশের অপেক্ষায় এক পাশে বসিয়া ঢুলিবার উপক্রম করিতেছে, এই সময় বিপিনবাবু, যতিবাবু, শ্যামবাবু আসিয়া দেখা দিলেন, ডাক্তারবাবু "আসুন, আসুন" বলিয়া অভ্যর্থনা করিয়া সুখলালকে তামাক দিবার আদেশ করিলেন, গাঙ্গুলীর কিন্তু চমক হইল, যে আটা বি ফেরৎ দিবার সময় বাবুদের নিকট যাইয়া নিমন্ত্রণটা প্রত্যাহার করিয়া লওয়া হয় নাই, কি সর্ব্বনাশ, এখনি তো আরও চার পাঁচজন আসিয়া উপস্থিত হইবেন, দেখিতে দেখিতে সত্য সত্যই বাকী নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণ আসিয়া দেখা দিলেন, ডাক্তারবাবুরও তখন স্মরণ হইল যে দোকানে ঘি ময়দা ফেরৎ দিবার হুকুম আসার সময় নিমন্ত্রণটা প্রত্যাহার করিবার কথা বলিয়া দেওয়া হয় নাই, আর কি রক্ষা আছে? তা তিনি না হয় পাঁচ জনাটের মানুষ, তাঁর না হয় সেটা ভুল হইয়া গিয়াছে। গাঙ্গুলীর তো সেটা শোধরাইয়া লওয়া উচিত ছিল, আর নিমন্ত্রিত ভদ্রলোকরাই বা কি, তাঁহাদের তো সেই আগের দিন নিমন্ত্রণ করিয়া রাখা হইয়াছে মাত্র, ইতিমধ্যে কতগুলা ঘণ্টা কাটিয়া গিয়াছে, তার ভিতর গৃহস্বামীর শারীরিক বা মানসিক অবস্থা খারাপ হওয়া তো কিছু বিচিত্র নয়, মানুষের রক্ত, মানুষেরই শরীর তো বটে, ভদ্রলোকদের উচিত ছিল খবর লওয়া যে তরকারী কুটিয়া, লুচীর ময়া, নিমন্ত্রণ কর্ত্তার গৃহে সত্য সত্যই চাপান হইল কি, না,—তা নয়, হট্ করিয়া সব নিমন্ত্রণ খাইতে আসিয়া হাজির হইয়াছেন, কথায় বলে, "জীবনান্তে জীবন পাওয়া যায়, কিন্তু কলারাত্তে কলার মেলা দুষ্কর" ইহারা সেই শ্রেণীর পেটুকের দল আর কি! রাগে ডাক্তারবাবুর সর্ব্বাঙ্গ রি, রি করিয়া জ্বলিয়া উঠিল, আর সঙ্গে সঙ্গে মাথা ঘুরিয়া গেল, তৎক্ষণাৎ কর্ত্তব্যবুদ্ধি প্রণোদিত হইয়া তিনি সট্ করিয়া উঠিয়া পড়িয়া অন্য গৃহে আসিয়া গাঙ্গুলীকে ডাকিলেন, রুদ্ধকণ্ঠে কহিলেন—"তোমাদের জ্বালায় আমার আর মান সম্ভ্রম—কিছু রইল না দেখ্‌চি, এখন উপায় কি ঠাওরাচ্ছ শুনি।"

গাঙ্গুলী হাত কচলাইতে কচলাইতে কহিলেন "আজ্ঞে আপনার হুকুম হলে কিষণ হালুয়াইএর দোকান থেকে এখুনি চট্ করে, গরম গরম লুচি ভাজিয়ে, যেগুন ভাজা আর আলুর দম আর কিছু পেঁড়া সন্দেশ—"

"এঁ্যা, বল কি, সে যে অনেক খরচ, প্রায় দশ বারো টাকা?" ডাক্তারবাবুর ললাটে অন্ধকার ছায়া ঘনাইয়া আসিল, অবশ্য সেটা আলোরই বিপরীত দিক্ কিন্তু উহারই পশ্চাতে যে দুশ্চিন্তার ছায়া নিবিড় হইয়া উঠিতেছে গাঙ্গুলী তাহা বুঝিতে ভুল করেন নাই, সুতরাং কহিলেন "তবে না হয় সের দুই মিষ্টি এনে শুধু—"

বিরক্তি ভরা কণ্ঠে ডাক্তারবাবু কহিলেন "তোমায় বাপু পরামর্শ দিতে ডাকি নি, আমার মাথা ধরেছে, শুতে চল্লাম, তুমি বাবুদের বলো বাবুর শরীর খারাপ, তার ওপোর একটা দুর্ভাবনায় পড়েছেন, কাজেই খাবার খাবার জোগাড় করতে পারেন নি, বেশ বুঝিয়ে বলো বুঝলে, যেন কিছু মনে না করেন, ভদ্রলোকের ছেলে সব, মান খাতির রেখে কথা বোলো, বিনয় জানিয়ো, নইলে যে সহরে এখুনি টি, টি পড়ে যাবে, তিলকে তাল করা অভ্যাস তো দেশের লোকের আছেই "অতঃপর ডাক্তারবাবুর রঙ্গালয় হইতে প্রস্থান ও গাঙ্গুলীর প্রবেশ,—শরীর ও মন উভয়ই তাঁর কাঁপিতে সুরু হইয়াছিল, সেটা যে দারুণ শীতে নয়, তাহা আমরা বেশ জানি। বাবুরা ততক্ষণে ক্ষুধায় কাতর হইয়া বিগুণ শীত অনুভব করিতেছেন, কথাবার্ত্তার মধ্যে সবারই কাণ দুটি "পাত হয়েছে গা তুলুন" এই দুষ্টি ডাকটুকু শুনিবার জন্য উন্মুখ হইয়া আছে, গাঙ্গুলীকে দেখিয়া আগে ভাগেই তাঁহারা আহার স্থানে যাইবার জন্য উঠিয়া দাঁড়াইলেন, কিন্তু গাঙ্গুলী এ কি বলিতেছেন, "মহাশয়গণ, মাপ করবেন, ডাক্তারবাবু হঠাৎ শরীর খারাপ হওয়ায় আপনাদের আর বলা হয় নি যে আজ নিমন্ত্রণ বন্ধ রইল। আপনাদের অনর্থক কষ্ট দেওয়া হলো মাপ করবেন। বুঝলেন কি, না—" ভবেশবাবু বলিয়া উঠিলেন "আজ্ঞে আর বলবেন না, বুঝতে পেরেছি, ওহে ওঠো সব, আর ভদ্রলোককে লজ্জা দিয়ো না, দোকান ঘরের ঝাঁপ ঠেলতে হবে বোধহয়"

বাবুর দল উঠিয়া পড়িলেন, গেটের বাহিরে আসিয়া হেম-বাবু চীৎকার করিয়া উঠিলেন "বেশ খাওয়া হোল বাবা বিপিনবাবু কহিলেন "বামুন মশাই, করেন কি, গাহারাওলা মাতাল মনে করবে যে, চন্দন সরপা চালিয়ে, দোকান বন্ধ হলেই সর্ব্বনাশ, সিপাহী বকে রাখবেন না।"

যাহা ভয় করা গেল, তাহাই হইল, দোকান দশটা বাজিতেই বন্ধ হইয়া গিয়াছে। অতঃপর বাবুরা দুর্গা নাম স্মরণ করিতে করিতে নিজ নিজ বাড়ীতে উপস্থিত হইলেন, কাহারও স্ত্রী আহারান্তে শিশুকে দুধ খাওয়াইতে-ছিলেন স্বামীকে দেখিয়া বলিলেন "খুব শীগগীর ফিরলে তো, কেমন খাওয়ালে?"

"বেশ খাইয়েছে,ঘরে চাট্টি মুড়ি চিঁড়ে কিছু আছে কি?"

কাহারও স্ত্রী আহারান্তে সবে উঠিয়া মুখশুদ্ধি লইতে-ছেন, স্বামী,আসিয়া কহিলেন, "হাড়ীতে চাট্টি আছে না কি, অন্ততঃ তোমার পাতের প্রসাদ?"

স্ত্রী সচকিতে কহিল "ওমা সেকি খেয়ার কথা গো, কোনদিন নেমন্তন্ন খেতে গেছ্‌লে শুনি" ইতিমধ্যে সদ্য নিদ্রাভঙ্গে খোকা উঠিয়া কান্না জুড়িল "বাবা, তুমি আমায় কেন ছক্কেশ খেতে নিয়ে গেলে না, আমি ছক্কেশ খাবো।"

বাঙ্গালীর ভবিষ্যৎ

(শ্রীরমেশ বসু, এম-এ।)

বাঙ্গালী আজ বর্ত্তমানের ভাবনায় অস্থির। বর্ত্তমান সময়ের সমস্যাগুলি তাহার আহার, বিহার ও চিন্তাকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিয়াছে। সৌভাগ্যক্রমে জাতীয় জীবনের সমস্ত দিক দিয়া একটা বিপুল আশা ও আয়োজনের সূত্রপাত হইয়াছে। চারিদিকে নৈরাশ্যান্ধকারের মধ্যেও বাঙ্গালীকে ভবিষ্যতের জন্য প্রস্তুত হইতে হইতেছে। দেশে একটা আত্মজাগরণের ভাব দেখা যাইতেছে। ইহা দেখিয়াই আজ নিরশন ও অভাবের দুঃখেও বাঙ্গালী সহিয়া যাইতেছে।

বর্ত্তমানের প্রচেষ্টা ও প্রতিষ্ঠানগুলিকে যদি আমরা সুনিয়ন্ত্রিত করিতে পারি তবেই আমাদের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল হইবে, নতুবা আমাদের অন্ধকার আর ঘুচিবে না। আমা-দের বর্ত্তমানে যেমন সেল ভবিষ্যৎ ও তেমনি হইবে, অথবা, কে জানে, আরও অন্ধকার হইতে পারে।

ভবিষ্যৎকে ফলপ্রসূ করিতে হইলে বর্ত্তমানেই তাহার বীজ বপন করিতে হইবে। সাহিত্য দ্বারা নাটক দ্বারা, চিত্র দ্বারা, চিন্তা দ্বারা, বিজ্ঞান দ্বারা, বাণিজ্য দ্বারা, শিক্ষা দ্বারা এবং সর্ব্বোপরি জীবন ও অনলস কর্ম্মদ্বারা ভবিষ্যৎকে গঠিত করিতে হইবে। আর ইহা না পারিলে, অশিক্ষা, কুশিক্ষা, অনাহার, কদাহার, চির রোগ ও চির অশান্তি বাঙ্গালীর জীবনকে মানুষের অযোগ্য করিয়া তুলিবে। শুধুই তখন আমাদের মনে হইবে—"রেখেছে বাঙ্গালী করে, মানুষ করনি।"

দেশের ভবিষ্যতের কথা ভাবিতে গেলে ভবিষ্যতের যাহারা আশাস্থল তাহাদের কথাই প্রথমতঃ মনে আসে। একদিকে দীর্ঘকায় বর্ত্তমান, ক্ষীণদৃষ্টি, ভগ্নস্বাস্থ্য ও অন্যদিকে ম্যালেরিয়া বাহন, স্ফীতোদর, অথবা মাংসপিণ্ড যুবকদের দ্বারা কি আশা করা যায়? স্বাস্থ্য, সরলতা, সুচিন্তা, সুখাদ্য ও জীবনের অধিকারী না হইলে এই যুবকবৃন্দ ভবিষ্যতে দেশের কি করিতে পারিবে?

"স্বদেশী" সময়ের বাঙ্গালী যদি সুযোগ্য নায়কের দ্বারা পরিচালিত হইত তবে আজ বাঙ্গালী কৃষি, শিল্প, ও বাণিজ্যক্ষেত্রে পশ্চাৎপদ থাকিত না, অন্নকষ্ট তাহার জীবনকে তিক্ত-বিষাক্ত করিতে পারিত না। সে যুগ এখন অতীতের গর্ভে লীন হইয়াছে। আমাদের অদূরবর্ত্তী ভবিষ্যৎ যেন আবার সেইরূপ চালকের অভাবেও অথবা ক্ষিপ্রকারিতার বিনষ্ট হয়। অতীতের বিফলতা যেন আমাদিগকে বর্ত্তমানে সজাগ করিয়া দেয়, তাহা হইলে আমরা অতন্দ্রিত চেষ্টা দ্বারা ভবিষ্যতের গৌরব-সৌধ গড়িয়া তুলিতে পারিব।

অনেকে মনে করেন, আগামী যুগে বাঙ্গালী আবার সেকালের বাঙ্গালীর মত জীবন যাপন করিবে, অথবা সেইরূপ করাই উচিত। কিন্তু ব্যক্তিবিশেষের ন্যায় সমাজ-জীবনেও ক্রমশঃ নানা পরিবর্ত্তন আসে—কালে ইহাদিগকে আর পরিহার করা যায় না, তাহারা ক্রমে স্থায়ী হইয়া জাতীয়-চরিত্রে পরিণত হয়। ইংরেজী শিক্ষা ও সভ্যতার সংস্পর্শে আসিয়া বাঙ্গালীর জাতীয় জীবনেও অনেক পরিবর্ত্তন হইয়াছে—এবং কতকগুলি পরিবর্ত্তন স্থায়ী হইয়াছে। তবে এতদিন পর্য্যন্ত বাঙ্গালী পাশ্চাত্য সভ্যতার বাহির-দেখিয়াই বিমুগ্ধ ছিল, এখন সে উহার মধ্যে প্রবেশ করিতে শিখিতেছে। এতদিন সে সাহিত্য, বিজ্ঞান, ইতিহাস, বাণিজ্য প্রভৃতির বিরাটত্ব শুধু বাহির হইতে দেখিয়াছে—কিন্তু উহাকে নিজের করিতে পারে নাই। আজ বাঙ্গালীর আত্মজাগরণের অভাবে চারিদিকে আপ-

নার শক্তি উদ্বুদ্ধ করিয়া তুলিবার জন্য যাত্ত হইয়াছে।

এই যে বাণ ডাকিয়াছে, ইহা যেন বৃথা না চলিয়া যায়। জাতীয় জীবন তরী যাঁহারা বাহিয়া লইয়া যাইবেন, এই তাঁহাদের মহাসুযোগ। এ সুযোগ বার বার আসে না। ভারতবর্ষে ইংরেজ শাসনের ইতিহাসে ইহাই বাঙ্গালীর দ্বিতীয় জাগরণ। ইহা যেন কর্ম্মী ও নায়কের অভাবে পুনরায় বিনষ্ট না হয়। আজ যেন আমরা শত দুঃখ ও দারিদ্র্যের ভিতরে ডুবিয়া থাকিয়াও ভবিষ্যৎকে মঙ্গলময় করিতে পারি। এবার অসাবধান হইলে আর আমরা শীঘ্র উঠিতে পারিব না।

ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশ আজ শিক্ষা ও বাণিজ্য জাগিয়া উঠিতেছে। বাঙ্গালী চিরকাল মস্তিষ্কের বড়াই করে। কিন্তু বর্ত্তমানের কার্য্যকলাপ দ্বারাই তাহার মস্তিষ্কের পরিচয় পাওয়া যাইবে। যদি সে জীবন যুদ্ধে বাঁচিয়া থাকিবার উপায় ও আয়োজন করিতে পারে ও সঙ্গে সঙ্গে অন্যকে চালাইতে পারে, তবেই সে তাহার চিরকালের সম্মান বজায় রাখিতে পারিবে। আর না পারিলে এই জীবন-আহবানে সে ক্রমশঃ পশ্চাৎ, মহারাষ্ট্র ও মাদ্রাজ হইতে পিছাইয়া পড়িবে।

হে ভারত ভাগ্যবিধাতা! তুমি বাঙ্গালীর শরীরে স্বাস্থ্য ও শক্তি, মনে সাহস ও বীর্য্য প্রেরণ কর। বাঙ্গালী যেন ভবিষ্যতেও তাহার আসন অটল রাখিতে পারে। চারিদিকে সংগ্রামের মধ্যেও যেন অর্থ ও সামর্থ্যে বরণীয় হইতে পারে ভারতের প্রদেশে প্রদেশে বাঙ্গালী প্রথম পতাকা বহন করিয়াছিল, তাহার চেষ্টায় সকল প্রদেশ আজ জাগিয়া উঠিতেছে—আজ যেন তাহাদের সঙ্গে বাঙ্গালীর ভবিষ্যৎ মহান্ হইয়া উঠে! আজও যেন বাঙ্গালী পতাকা বহন করিতে পারে এবং কর্ম্ম দ্বারা বলিবার অধিকার লাভ করে যে—"তব পতাকা যারে দাও, তারে বহিবারে দাও শকতি।"

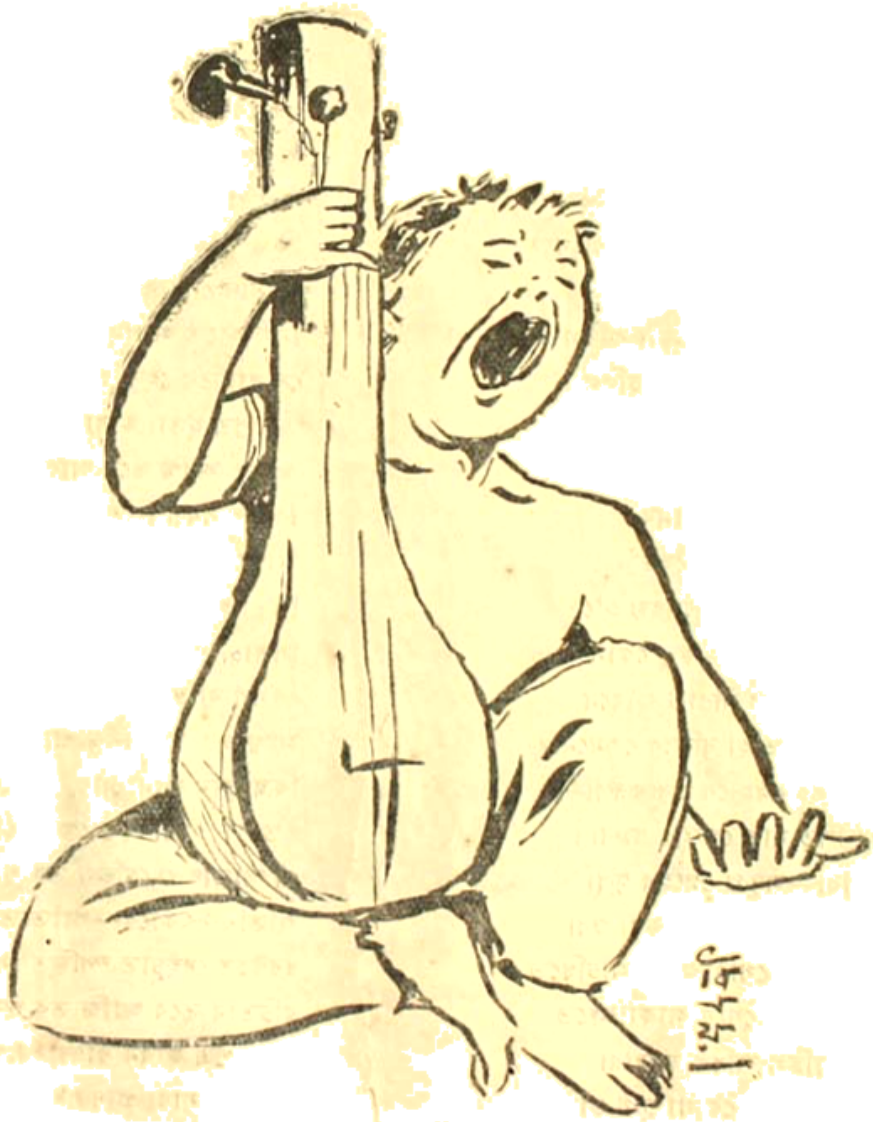

রে——

কর্ণ

(শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়)

উষার আকাশতলে একদা সন্ধ্যায়
অন্ধকার জনশূন্য নদী সিকতায়
হয়েছিল অন্ধকারে তব। জননীর
খেয়ালে অথবা মোহে লভিয়া শরীর
রমণীর গূঢ়তারে মূর্ত্তিমন্ত করি
ভূমিলে মহীতে, কর্ণ, শিশুরূপ ধরি।
গুপ্ত মাতৃকের দেহে রক্তচিহ্ন যথা,
চোরের বমাল, মা'র নিদারুণ ব্যথা,
রমণীর আত্মঘাতী ভুল, আমরণ
কলঙ্কের ডালি, সরমের নিমর্দ্দন,
চরম অধর্ম্মখানি, চির উপহাস—
তোমারে তাদারে দিয়ে করিল বিনাশ।
হয়ত বা বেজেছিল তব প্রসূতির
প্রাণে ব্যথা, কিন্তু তাহা এমনি অস্থির—
কাটিতে পারে নি দাগ, পারে নি রাখিতে
পুত্র-বিসর্জ্জন-চিহ্ন জননীর চিতে,
সন্ধ্যার শ্রমের ক্রোড়। জননী করিল
বড়—ভুলে, মাতৃস্নেহ ভাসিয়া চলিল।

আজীবন মাতৃস্নেহ বক্ষ প্রবাহিত
যে দুর্ভাগা, অভিশপ্ত বিধাতৃ লাঞ্ছিত,
জগতের স্বর্গভ্রষ্ট,—প্রথম মানব
লভে মাতৃত্বের সনে বিপুল বৈভব
সেবা, স্নেহ প্রেমরূপে—অন্ধকার হ'তে
হারায়েছ তুমি তাহা। কর্ণ কোন মতে
হয় নি সৌভাগ্য তব সারাটি জীবনে
যে সুধা-আস্বাদ, তাহা বুঝিবে কেমনে?

সূত-দম্পতির স্নেহ সে শুধু করুণা—
নহে তাহা পিতৃ মাতৃ স্নেহের বরুণা।
অপুত্রক তারা—অতৃপ্ত স্নেহের সুধা
পালিয়া তোমারে মাত্র এক কণা তথা
পেয়েছিল চিত্তের খোরাক। আচম্বিতে
বিনায়াসে কুড়াইয়া পেয়ে আকাঙ্ক্ষিতে
বিস্ময় মানিয়াছিল অধিক তাহারা
পুলক হইতে। সুখ কোথা দুঃখ ছাড়া?
যে সুখের মূলে নাই ভয় ও ভাবনা
অহরহ আশঙ্কা ও অতৃপ্তি কামনা—
ভাগ্য, দৈব, যাহা বল—নহে তাহা সুখ।
সুখ—যার তরে সহি কায়েমনে দুখ।
রাধা তোমা ধরে নাই গর্ভ স্বর্গে কভু
অজ্ঞাত অপরিচিত তুমি, নারী তবু
শরীরের মর্য্যাদায় রাখিতে সম্মান
করিল স্নেহের সেবা অধীর অজ্ঞান।
অনন্ত রাধার স্নেহ দেহে বটে বহ'
প্রকৃতির শিশু তুমি মানবের নহ'।'

শিখিলে আচার্য্য পাশে যবহিন ধরে'
যুদ্ধ বিদ্যা। বীর নামে বীরের ভিতর
অগ্রগণ্য হলে। তাহে ভ্রাতৃদ্রোহী তুমি।
ধর্ম্মদ্রোহী—অধর্ম্মের পদরেণু চুমি।
কিন্তু তুমি দাতা নামে লভেছ' যে খ্যাতি
অতিথি সেবার তরে, ওরে পুত্র-ঘাতি,
নিজ হাতে আপনার আত্মজে বধিয়া—
সে খ্যাতির হেতু আমি পাই না খুঁজিয়া।
এই পুত্র-হত্যা কার্য্য পুণ্য যদি হয়
জগতে অধর্ম্ম তবে আর কা'রে কয়?
বিশ্বের সমগ্র পিতা যে কাহিনী স্মরি
আতঙ্কে কাঁপিয়া উঠে চমকি শিহরি,
পিতা হয়ে সে কার্য্য যে সাধিবারে পারে
পিশাচে, পশুরো হেয়, সে সৃষ্টি সংসারে।

দর্প ব্যাজ কুন্তীর রাক্ষস আপনার
আত্মজের তরে নিজ প্রাণ করে ছার—
কিন্তু তুমি জানী বীর, করিলে কেমনে
এত বড় হত্যাকাণ্ড ক্ষোভ-হীন মনে?
যে অতিথি যেচেছিল তব পুত্রশির
অতিথি-সৎকারে—পাতিতে যদ্যপি বীর
ধরণীতে দেহচ্যুত স্পন্দিত সে মাথা,
রচিতাম তবে আমি তব গুণ গাথা।

যে পুত্র জীবন রাজ্য-সর্ব্বস্ব অধিক
প্রিয়তম, দারা প্রাণ সদা অনিমিখ

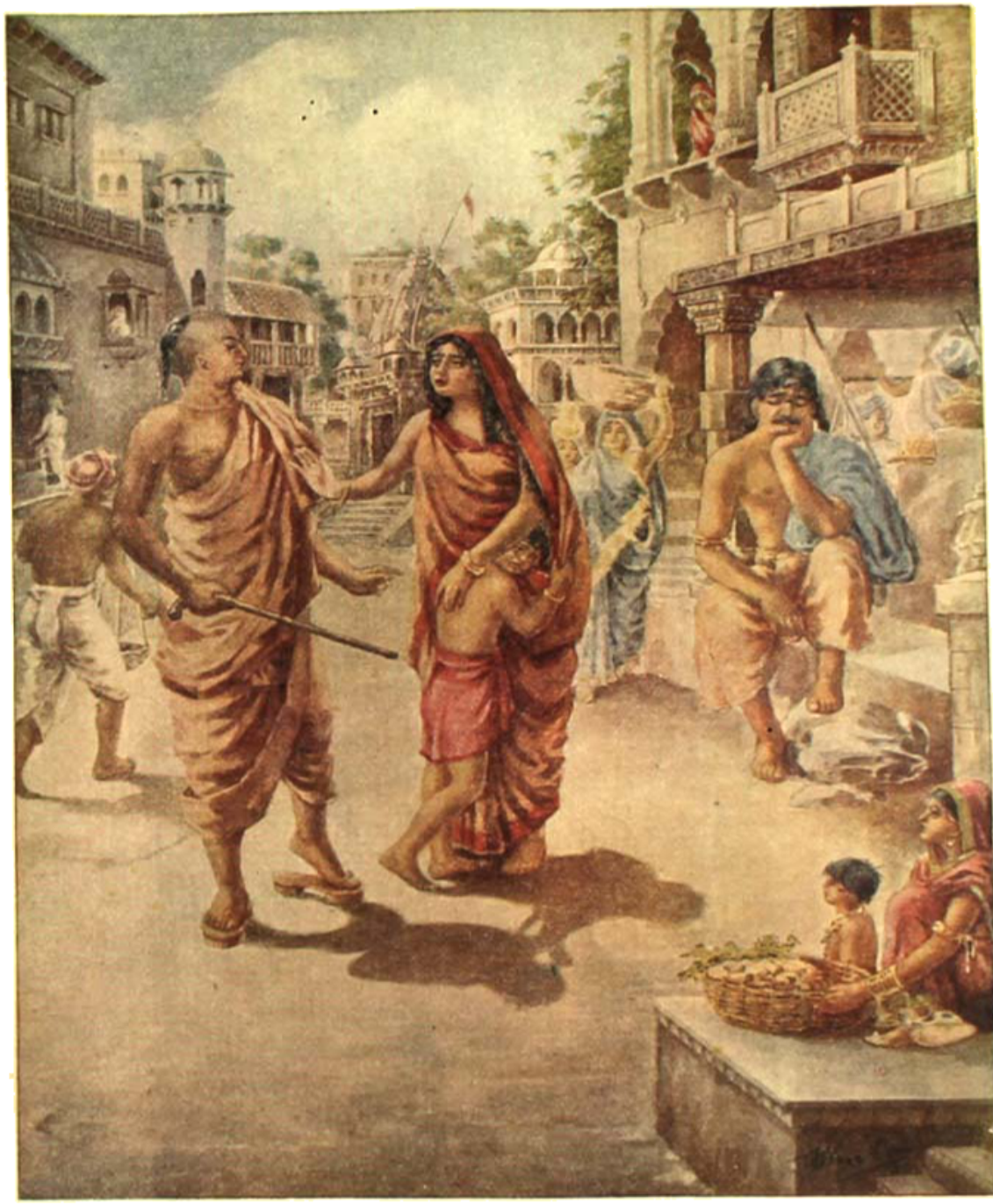

শেষ দৃশ্য।—(রাজা হরিশ্চন্দ্র)

শিল্পী—শ্রীযুক্ত বনমোহন মুখোপাধ্যায়।

[আমাদের এখান হইতে প্রকাশিতব্য "চিত্রে রামায়ণের" ছবির নমুনা]

Lalamibilas Press, Calcutta.

চেয়ে থাকে যার মুখ পানে রাত্রিদিন,
জীবনান্ত কালাবধি জাগে ক্লান্তি হীন
যার মুখ, তারে যদি যে হয় ধার্ম্মিক
আমি তারে উচ্চ কণ্ঠে দিই শতধিক্।
পুত্রহন্তা পতির অধম ছবি হীনে,
বড় ধাতা কয় কোন্ মূর্খ অর্ব্বাচীনে?
পুত্র যদি বিধাতার অলঙ্ঘ্য শাসনে
হয় অস্ত রবি কভু নিশ্চয় মরণে
অন্ন ব্যঞ্জন শেষ শুষ্ক তপ্ত চম্বণে—
আয়ের গিন্নির মত পিতার হৃদয়—
পড়ি রহে নিরাকুল বিরাট পঞ্জর
অশ্রুশ্বাসে খদে' পড়ে বক্ষ ও পঞ্জর।
পুত্রক যাহার খুসী করি দয় পান
পুত্র রক্তে রয়া এই উদ্ধারে নিশান,
যাতকের রক্তমাখা পদে দিক সবে
রক্ত চন্দনের অর্ঘ্য ধর্ম্মের গৌরবে—
শুধু আমি একা বিশ্বপিতৃ-প্রতিনিধি
হয়ে তোমা দিব ধিক্ চির নিরবধি।
একদিকে সকলের জয় জয়কার
অন্যদিকে এ কবির অনন্ত ধিক্কার।

কংগ্রেসের "প্রোগ্রাম।"

(শ্রীহেমন্তকুমার সরকার)

৪

বিলাতী বস্ত্র বর্জ্জন ও খাজনা বন্ধ।

"কাশী মিত্তিরের ঘাটও চিনি, নিমতলার ঘাটও চিনি—কি আর বলবো ম'রে আছি"—একজন মাতাল বড় হয়েই এই কথা বলিয়াছিল। তাহার সঙ্গীরা মড়া লাঞ্ছাইয়া কাঁধে করিয়া তাহাকে নিমতলার ঘাটে না আনিয়া কাশীমিত্রের ঘাটে লইয়া গিয়া ফেলিয়াছে—এবং কোথায় আনা হইল বলিয়া ঝগড়া করিতেছিল। মড়া বেচারার তখন একটু জ্ঞান হইয়াছিল—সে ঝগড়া শুনিয়া ঐ কথা কয়টি বলিয়াছিল। আমাদের দেশের বিরাট শবদেহে একটু চৈতন্য আসিয়াছে—কি করিলে কি হয় তাহা এখন বোঝা যাইতেছে। কিন্তু আমাদের যে মরিয়া থাকিতে হইতেছে।

অসহযোগ কার্য্যতালিকার মাদকদ্রব্য ও বিলাতী কাপড়বর্জ্জন অর্থ নৈতিক হিসাবে আমাদিগকে অনেক সাহায্য করিবে। কিন্তু দেশশুদ্ধ লোক নেশা ছাড়িলেই বা বন্ধন পরিলেই স্বরাজ হইবে, এমন নয়। রাজনৈতিক হিসাবে এই আন্দোলনের অপ্রত্যক্ষ ফল কিছু আছে। কিন্তু একথা মনে রাখা দরকার ল্যাঙ্কাসায়ার যে মাল তৈয়ারি করে তাহার শতকরা ৪৫ অংশের গ্রাহক। এই অংশের জন্য অন্যত্র যোগাড় পাইলেই ইংরেজের গোলমাল চুকিয়া যাইবে। পৃথিবীর নানাস্থানে ইংরেজের ছানা বাড়িতেছে—সেখানে এই মাল বিক্রয় করার বন্দোবস্ত অনায়াসে হইতে পারিবে। তবে সমর না দিয়া হঠাৎ বিদেশী বর্জ্জন সম্পূর্ণ করিতে পারিলে আশানুযায়ী ফল হইতে পারিত। কিন্তু বর্ত্তমান গতিতে অগ্রসর হইলে ২০ বৎসরেও আমাদের সে আশা নাই। অবশ্য বাহিরের দিকে না তাকাইয়া আমরা নিজের পরিধেয় বস্ত্র নিজে তৈয়ারি করিয়া লইব—এ খুব ভাল কথা ইহা আত্মনির্ভরশীলতার পরিচয় এবং ভবিষ্যৎ স্বাধীনতা লাভের সহায়ক। কিন্তু এতখানি গুণের মালিক হওয়ার সম্ভাবনা আমাদের নিকট ভবিষ্যতের মধ্যে আছে কি?

অসহযোগ কার্য্যতালিকার শেষ কথা—খাজনা বন্ধ। এই ব্যাপারটা গুরুতর এবং ইহার প্রত্যক্ষ ফল আছে। কিন্তু বাংলাদেশে খাজনা বন্ধ হইলে জমিদারের ঘাড় দিয়াই সব অত্যাচারটা যাইবে। তাহাতে গবর্ণমেণ্ট খাজনা না পাইলে ঘর্ঘা, সোনা প্রভৃতি লেলাইয়া দিবে—তাহাদের অমানুষিক অত্যাচার সহিয়া থাকিবার ক্ষমতা দেশের লোকের আছে কি? অবশ্য স্বীকার করি আমাদের ভাই-ভাইরাই আমাদের উপর অত্যাচারের যন্ত্র স্বরূপে ব্যবহৃত হয়, তাহারা না করিলে ভাবনা কি? কিন্তু সে সোণার যুগ কবে আসিবে? পাঞ্জাবে আজও তো দেশী পুলিশ দেশী লোকের উপর কেমন অত্যাচার করিতেছে। আর অত্যাচার সওয়াটাই আমাদের মুক্তি আনিবে কি? অত্যাচার প্রতিরোধের ক্ষমতা সঞ্চিত না হইলে কি পরিত্রাণ আসিবে?

হাসি

(শ্রীশ্রীপতিপ্রসন্ন ঘোষ)

ভুবন ভরিয়া শুধু হাসির লহর,—
তরুরে জড়ায়ে লতা উঠিতেছে হাসি,
ধরণীর বুকে রচি ফুলের নগর
হাসির সাগর হতে আসে ফুল রাশি।
নিতি চাঁদ শ্রীতিধারা হাসে শিশুগণ,
তাদেরি হাসির সাথে হাসিছে ভুবন।

মথিয়া চাঁদের সুধা মধু-জ্যোছনায়
মরমে মুকুতা ঢালি আসে কোটি পরী,
তটীনীর বুকে তারা নাচিয়া বেড়ায়—
নদী জল টলমল সেই সুর ধরি।
আনন্দ কমল ফোটে দিগন্ত উজলি,
হাসির কমল ওঠে অন্তরে উথলি।

ভারতীয় বাদ্য-যন্ত্র

(শ্রীশরচ্চন্দ্র ঘোষাল, এম-এ বি-এল্)

(২)

প্রাচীন সংস্কৃত সঙ্গীতশাস্ত্রে বাদ্য সকলকে চার প্রকারে বিভক্ত করা হইয়াছে। এই চার প্রকারের নাম, তত, অবনদ্ধ বা আনদ্ধ, সুষির ও ঘন।

সঙ্গীতদামোদরে মূরলাধ্যায়ে আছে:—

"চতুর্ব্বিধং তৎ কথিতং তত্তং সুষিরমেব চ।
অবনদ্ধং ঘনকেতি তত্তত্ত্রিগতং ভবেৎ॥"

(সংগীতরাগ কল্পদ্রুম সাহিত্যপরিষৎ সংস্করণ, ৩১পৃষ্ঠা)

অর্থাৎ বাদ্য চার প্রকার, তত, সুষির, অবনদ্ধ ও ঘন। তন্ত্রি বিশিষ্ট বাদ্যকে তত বলে।

সঙ্গীত রত্নাকর ও সঙ্গীতনারায়ণে আছে :—

"তততানদ্ধং সুষিরক ঘনমীতি চতুর্ব্বিধঃ।
তত্তং বীণাদিকং বাদ্যমানদ্ধং মুরজাদিকম্।
কাংস্যাদিকন্তু সুষিরং কাংস্যতালাদিকং ঘনম্॥
(সঙ্গীতরাগ কল্পদ্রুম, ৩১পৃষ্ঠা)

অর্থাৎ বাদ্য চার প্রকার, তত, আনদ্ধ, সুষির ও ঘন। বীণাদি বাদ্যকে তত, মৃদঙ্গাদি বাদ্যকে আনদ্ধ বংশী প্রভৃতি বাদ্যকে সুষির ও কাংস্যতাল প্রভৃতিকে ঘন বলে।

আমরা একে একে এই বাদ্যযন্ত্র-গুলির বিষয় আলোচনা করিব।

তত।

তাঁত বা তার যুক্ত বাদ্যযন্ত্র-গুলি তত নামে প্রসিদ্ধ। এগুলি নানা প্রকারের। সংস্কৃতে এক সাধারণ নাম 'বীণা' দিয়া, তাহার বহুপ্রকার ভেদ কল্পিত হইয়াছে। সঙ্গীত দর্পণে নিম্নলিখিত নানা প্রকার বীণার নাম প্রাপ্ত হওয়া যায় :—

"আলাবণী ব্রহ্মবীণা কিন্নরীতি নিগদ্যতে।
বিপঞ্চী বল্লকী জ্যেষ্ঠা চিত্রা ঘোষবতী তথা॥
হস্তিকা কুব্জিকা কূর্ম্মী সারঙ্গী পরিবাদিনী
ত্রিশরী শততন্ত্রী চ নকুলোষ্ঠী চ বংশরী।
ঔড়ম্বরী পিনাকী চ নিবদ্ধ পুষ্কর তথা।"

সঙ্গীত রত্নাকরেও এইরূপ বিভিন্ন শ্রেণীর বীণার নাম প্রদত্ত হইয়াছে :—

"বীণা ঘোষবতী চিত্রা বিপঞ্চী পরিবাদিনী।
বল্লকী কুব্জিকা জ্যেষ্ঠা নকুলোষ্ঠী চ কিন্নরী॥
তথা কূর্ম্মী পিনাকী চ হস্তিকা শত-তন্ত্রিকা।
ঔড়ম্বরী চ ষট্‌কর্ণা শ্রীনো রাবণহস্তক:॥
সারঙ্গাদ্যাপিনীত্যাদেঃ কৃতপাত্তত্ত্ববাদকাঃ।"

এই বাদ্য গুলির মধ্যে সকলগুলির বর্ণনা আমরা জানি না। কতক-গুলির অস্তিত্ব এখনও ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশে দেখিতে পাওয়া যায়। অবশ্য অনুমান বলে কতকগুলির নাম দেওয়া যাইতে পারে। প্রথমে আমরা বীণার উদ্ভাবন সম্বন্ধে পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের যুক্তি আলোচনা করিয়া, অধুনা প্রচলিত বাদ্য যন্ত্রগুলির পরিচয় দিবার চেষ্টা করিব।

বীণাদি তার বা তাঁতের যন্ত্রের উৎপত্তি সম্বন্ধে পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ বলেন যে ধনুকই সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন

তত যন্ত্র। ধনুকের রজ্জু ধরিয়া টান দিয়া ছাড়িয়া দিলে যে শব্দ হয়, উহাই এই শ্রেণীর যন্ত্রের ধ্বনি। শুনা যায়, ত্রিবঙ্কুরের নায়ারগণ এখনও সময় বিশেষে এইরূপ ধনুকের ধ্বনি করিয়া থাকেন। এইরূপ ব্যবহার হইতে হইতে পরে এক ধনুকে ছোট বড় অনেকগুলি রজ্জু সংযোজিত করিয়া শব্দ করার প্রণালী উদ্ভাবিত হয়। কেবল ধনুকে রজ্জু বা তাঁত টানিয়া ছাড়িয়া দিলে জোরে শব্দ হয় না দেখিয়া, যাহাতে বেশী শব্দ উৎপন্ন করা যায়, তদ্বিষয়ে লোক চিন্তা করিতে প্রবৃত্ত হইল। এই চিন্তার ফলে, আবিষ্কৃত হইল যে যদি কোন কাঁপা জিনিষের উপর তাঁত ধ্বনিত হয়, তাহা হইলে শব্দ প্রবল হইয়া থাকে। তখন কাঁপা যন্ত্র তৈয়ার করিয়া তাহার উপর তাঁত স্থাপনের ব্যবস্থা হইল। ব্রহ্মদেশে নৌকার ন্যায় আকারের এক কাঁপা যন্ত্র দেখিতে পাওয়া যায়, ইহার উপর ঐরূপ তাঁত বসান আছে। আর এক প্রকার যন্ত্রের ছড়ে চতুর্দশটি তাঁত লাগান দেখিতে পাওয়া যায়। এইরূপ উদ্ভাবনের সঙ্গে সঙ্গে যন্ত্রগুলির "কাণ" সৃষ্টি ও হইয়া পড়িল। আনন্দ লহরী বা গাব্‌গুবাগুব্ যন্ত্র এই কাণ, তাঁত ও কাঁপা অংশের সংযোগে উদ্ভাবিত। গোপীচাঁদ নামক ছোটনাগপুরের বাদ্যযন্ত্র কতকগুলি সরু সরু বংশদণ্ডে প্রস্তুত। এগুলির দ্বারা তাঁত ইচ্ছামত ঢিলা বা কসা করা যাইতে পারে ইহার একটি 'কাণ' ও আছে। তাঙ্গোরের প্রচলিত বহুখোনা যন্ত্রে একটি কাঁপা কোষের মধ্যে একটি দণ্ড সংলগ্ন থাকে ও ইহাতে দুইটি 'কাণ' থাকে। ক্রমে বীণার উদ্ভব। কিন্নরী শ্রেণীর বীণা খুব প্রাচীন। ইহাতে তিনটি লাউ, একটি দণ্ড ও দুইটি তাঁত থাকে। কাণ ও সংযোজিত হয়। ক্রমশঃ বহুবিধ কাণ, ঘাট সম্বলিত সেতার, এসরাজ প্রভৃতির উদ্ভব হইয়াছে।

H. E. Popley রচিত The Music of India নামক গ্রন্থের ১১৪।১১৫ পৃষ্ঠায় এই মত অভিব্যক্ত হইয়াছে। কলিকাতার Indian Museumএ ভারতীয় বাদ্যযন্ত্রের যে সংগ্রহ আছে তাহা অতুলনীয়। যাঁহার কৌতূহল হইবে, তিনি এই মিউজিয়মে গিয়া বাদ্যযন্ত্রগুলি দেখিলে খুব সাধারণ যন্ত্র হইতে ধীরে ধীরে কিরূপ জটিল যন্ত্র নির্ম্মিত হইল তাহা বুঝিতে পারিবেন। Dr. A. M. Meerwarth প্রণীত Guide to the Musical Instruments in the Indian Museum, Calcutta নামক গ্রন্থখানি সঙ্গে লইলে দর্শক বিশেষ উপকৃত হইবেন। বোম্বাই নগরীতে পার্শ্বর্ষ মহাবিদ্যালয়েও ভারতীয় বাদ্যযন্ত্রের সুন্দর সংগ্রহ আছে।

তাম্বুরা

তম্বুরা বা তানপুরা ভারতবর্ষের মধ্যে সর্ব্বত্র প্রচলিত যন্ত্র অতি সাধারণ যন্ত্র। ইহা সকলেই বোধ হয় দেখিয়াছেন সুতরাং ইহার অবয়বাদির বিশেষ বর্ণনা দেওয়া নিষ্প্রয়োজন। ইহার সুরবাঁধার নিয়ম নিম্নে প্রকটিত হইল।

"তাম্বুরায় চারিটি তার থাকে। কণ্ঠস্বরের ওজন বিশেষে মধ্যের দুইটি তারকে মুদারা গ্রামের ষড়্‌জ করিয়া বাঁধিতে হয় ও বামদিকের তারটি ঐ সুরের উদারার পঞ্চম এবং দক্ষিণের তারটি ঐ সুরের উদারার ষড়্‌জ করিতে হয়। উদারার ষড়্‌জ বাঁধিবার রীতি এই যে ঐ তারটিতে পাঞ্চারের ধ্বনি উৎপন্ন হইয়া ষড়্‌জে আসিয়া লীন হয়। ঐরূপে অগ্রে তাম্বুরাটি বাঁধিয়া সুরের সহিত কণ্ঠস্বরের ঐক্য করিবে, এবং তাহাকে মুদারা গ্রামের ষড়্‌জ স্থির করিয়া ক্রমান্বয়ে এক এক স্বর চড়াইয়া অপর দুইটি স্বর নির্ণয় করিবে। এইরূপে মুদারা, উদারা এবং তারা-সপ্তক অনুলোম বিলোম ক্রমে পুনঃ পুনঃ যে পর্য্যন্ত সুর সকল শুদ্ধ ও স্পষ্টরূপে কণ্ঠে প্রকাশ না পায়, তাবৎ সাধনা করা কর্ত্তব্য।" [সঙ্গীত-মঞ্জরী, রামপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় ৩৬ পৃঃ]

* "In shape it is something like the Vina, without the extra gourd and without the elaborate head-piece. The bowl is usually a large one about ten inches wide, and in the best kinds, it is made of wood from the jack-tree and hollowed out. The cheaper kinds have a gourd in place of the wooden bowl. The bridge is placed on the bowl in the centre and is made either of wood or of ivory. The strings pass through holes in a ledge placed near the pegs. The tunning—pegs of the first and second strings are fixed at the side of the neck, and those of the third and fourth strings at right angles to the head. The strings are all of metal, three being steel and the lowest one of brass. Little pieces of silk are placed between the bridge and the strings in order to increase the buzzing effect. The strings also have beads near their attachment in order to render perfect tunning easier. The instrument is often played on the open strings by the fingers, without any plectres. The strings are never

stopped. The instrument is held upright with the left hand, and played by gently pulling the four strings one after the other, from the highest to the lowest, with the fingers of the right hand."

(The music of India P. 110.)

তাম্বুরা যন্ত্রের দোষের কথা এইবার উল্লিখিত হইবে। সমগ্র ভারতবর্ষে প্রায় সকল কালোয়াৎ-ই তাম্বুরা সহায়তায় গান করিয়া থাকেন। এই যন্ত্রের দোষের কথা উল্লেখ করিলে অনেকে বিশ্বাস করিতে না পারেন। বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে শিখিতে সঙ্গীতাচার্য্য আমাদের দেশে বিরল। বাঙ্গালাভাষার যত প্রকারের সঙ্গীত বিষয়ক গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে তন্মধ্যে মৌলিক যুক্তিপূর্ণ গ্রন্থ লেখক একমাত্র—কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায়। তাম্বুরা-যন্ত্র সম্বন্ধে তাঁহার উক্তি আমরা সকলকে আলোচনা করিতে অনুরোধ করি।

"তাম্বুরা যন্ত্রের যে ধ্বনি, তাহা বাজখাঁই আওয়াজের ন্যায়। ঐ যন্ত্রের সওয়ারির উপর সূতা দিয়া যে জোয়ারি করা হয়, তাহাতেই তারের বাজখাঁই ধ্বনি হয়। ঐ সূতা তারে লাগাইয়া সওয়ারির উপর টানিয়া ক্রমে এমন স্থানে দিতে হয়, যেখানে রাখিলে তার কম্পনের সময় সওয়ারির উপর ক্রমাগত আহত হইতে থাকে তাহা হইলেই এক প্রকার চেরা কাঁজি আওয়াজ উৎপন্ন হয়। সেই জোয়ারি করা আওয়াজই বাজখাঁই আওয়াজ। তাম্বুরা যন্ত্র যে প্রকারে নির্ম্মিত, তাহাতে তারের স্বাভাবিক ধ্বনি তত প্রবল না হওয়াতেই উক্ত প্রকারে জোয়ারি দিয়া তাম্বুরার ধ্বনি প্রবল করা হয়।

ওস্তাদেরা চিরকাল তাম্বুরা লইয়া গান করিয়া থাকেন; সুতরাং উহার জোয়ারিকৃত আওয়াজের সহিত গলার আওয়াজ মিল করিবার জন্য কণ্ঠস্বরেও তাঁহারা জোয়ারী দেন, তাহাতেই বাজখাঁই আওয়াজ হয়। ...ওস্তাদী গায়কেরা যন্ত্র ভিন্ন যে গাইতে ইচ্ছা করেন না, তাহা সকলেই জানেন। তাহার কারণ এই যে, তাঁহারা জোয়ারী করা আওয়াজে গান গাওয়া অভ্যাস করাতে, সাদা গলায় ভাল গাইতে পারেন না। তাম্বুরার সাহায্য ব্যতীত গলার জোয়ারী সুবিধামত আইসে না, আসিলেও তত পরিষ্কার হয় না। তাম্বুরার জোয়ারীকৃত ধ্বনির সহিত কণ্ঠ মিলাইয়া গাইলে কণ্ঠে জোয়ারী পরিষ্কার হয়, এবং যন্ত্রের সহিত মিলিত হইয়া কিঞ্চিৎ সুশ্রাব্য হয়।

বহুকাল হইতে তাম্বুরা লইয়া গান করার প্রথা বদ্ধমূল হওয়াতে এবং তাম্বুরা ব্যতীত গানের সাহায্যকারী অন্য উৎকৃষ্টতর যন্ত্র না থাকাতে, ওস্তাদেরা তাম্বুরার অনুরোধে কণ্ঠস্বরেও জোয়ারী করিয়া বাজখাঁই স্বরসাধনা করিতে বাধ্য হইয়াছেন। এক্ষণে দেখা যাইতেছে যে তাম্বুরা মাত্রই যত অনিষ্টের মূল।...(তাম্বুরার) সহিত কণ্ঠ সাধন করিতে হইলে...তাহাতে জোয়ারী না দিয়া তাহার স্বাভাবিক ধ্বনির সহিত স্বর সাধনা করিবে। তাহা হইলে কণ্ঠে জোয়ারী জন্মিবে না। তাম্বুরায় যথেষ্ট জোয়ারী দিয়া, অথচ তাহার সহিত স্বাভাবিক কণ্ঠে গান সাধা প্রায়ই সম্ভব হয় না। সর্ব্বদা জোয়ারীর অনুসঙ্গী হইলে, কণ্ঠে জোয়ারীর অনুকরণ নিবারণ করা দুঃসাধ্য হইয়া পড়ে; কারণ কর্ণ সর্ব্বদা যাহা শুনে, অর্থাৎ কাণের কাছে যেরূপ আওয়াজ অনবরত ধ্বনিত হয়, কণ্ঠ তাহা অনুকরণ না করিয়া থাকিতে পারে না; শারীর অনুকৃতির বল রোধ করা দুঃসাধ্য। তানকাওয়ালী বাইজীগণ সর্ব্বদা সারঙ্গীর সহিত গান গাওয়াতে তাহাদের কণ্ঠস্বরও ঐ যন্ত্রের ন্যায় ঘুমিষ্ট হয়। যাহার কণ্ঠে স্বাভাবিক আওয়াজ উত্তম প্রস্তুত হইয়া উহাতেই গাওয়া অভ্যাস হইয়া গিয়াছে, তিনি তাম্বুরায় জোয়ারীকৃত ধ্বনির সহিত গাইয়া কণ্ঠ অবিকৃত রাখিতে পারেন।

তাম্বুরার সহিত উচ্চস্বরে গাওয়া অভ্যাস করিলে, গলায় জোয়ারী হইতে পারে না; কেননা পূর্ব্বেই ব্যক্ত হইয়াছে, বাজখাঁই স্বর কখনই চড়ে না; অধিক চড়াইতে হইলে জোয়ারী একেবারে ত্যাগ করিতে হয়। সুবিখ্যাত খেয়ালী মৃত আহম্মদ খাঁ অতি উচ্চকণ্ঠে গাইতেন, এইজন্য তাঁহার কণ্ঠে জোয়ারী ছিল না। এবং অতি বৃদ্ধ বয়স পর্য্যন্তও তাঁহার গলায় জোর ছিল। তিনি আন্দাজ ৮০ বৎসর বয়সের সময় লোকান্তর প্রাপ্ত হইয়াছেন। তাঁহার কণ্ঠের মধুরতার বিষয় অনেকেই জানেন; উহা বেশ বিখ্যাত।

ভারতীয় কারিকরগণের সমধিক শিল্পনৈপুণ্য না থাকাতে, এপ্রকার তাম্বুরা যন্ত্র প্রস্তুত হয় নাই, যাহাতে জোয়ারী না দিয়া স্বাভাবিক তারে সুন্দর সবল ধ্বনি উৎপন্ন হয়। আমাদের সেতার যন্ত্রের জোয়ারী আছে; কেবল ছড় বিশিষ্ট যন্ত্রে জোয়ারী নাই।—অতএব ছড় বিশিষ্ট যন্ত্রই গানের সাহায্যার্থে বিশেষ উপযোগী।"

তাম্বুরা বাদন প্রণালী

"তাম্বুরায় চারিটি তার থাকে। মধ্যের দুইটি পাকা ইস্পাতের তার। তাহাদের দুই পাশের তার দুইটি পিত্তলের। মধ্য তারদ্বয়ের একটিকে গায়কের প্রয়োজন মত চড়াইয়া,অপরটিও তাহারই সমসুরে বাঁধিতে হয়। এই তারদ্বয়কে খরজের জুড়ী কহে। উহা মুদারার খরজ। ইহাদের দক্ষিণ দিকে যে পিত্তলের তার তাহাকে প্রথম তার বলা যায়, তাহাকে ঐ খরজের নীচে উদারার প-সুরে বাঁধিবে। এবং ঐ জুড়ীর বামদিকের যে পিত্তলের তার, তাহাকে চতুর্থ তার কহে, তাহাকে ঐ খরজের খাদ অষ্টম, অর্থাৎ উদারার খরজ করিয়া বাঁধিবে। তাম্বুরার তারে সুতা দিয়া যে জোয়ারী করা তদ্বিষয়ে আমার আপত্তি আছে। তাহা···ব্যক্ত করা হইয়াছে।···

আসনপিঁড়ি হইয়া বসিয়া, তাম্বুরার তুম্বী কোলের উপর করিয়া তার গুলি দক্ষিণ দিকে লইয়া, তাবী গায়ক অর্দ্ধগোল যে লম্বা কাষ্ঠ তাহার মধ্যদেশ দক্ষিণ হস্তের বৃদ্ধা ও অনামিকা কিম্বা মধ্যমা (যাহাতে যাহার সুবিধা হয়) সেই অঙ্গুলি দিয়া এমন ভাবে আলগোছে ধরিবে যেন তারগুলি করতলে না লাগে। এই প্রকারে ধারণ পূর্ব্বক দক্ষিণ তর্জ্জনী দ্বারা ১ম, ২য়, ৩য় ও ৪র্থ তার পর পর ধ্বনিত করিবে; তর্জ্জনী দ্বারা প্রত্যেক তারকে মুদ্ধার দিকে ঈষৎ আকর্ষণ করিয়া অমনি ছাড়িয়া দিবে, তাহা হইলে তার ভালরূপে ধ্বনিত হইবে।" (কৃষ্ণধন বন্দ্যো—গীতসূত্রসার)

তাম্বুরার সুর বাঁধিবার প্রণালীতে কি কি দোষ আছে ও কি উপায় অবলম্বন করিলে, সেই দোষ পরিহার করা যায়, কৃষ্ণধন বাবু তাহার বিশদ আলোচনা করিয়াছেন। এক কৃষ্ণধনবাবু ব্যতীত আর কাহাকেও এ সম্বন্ধে আলোচনা করিতে দেখি নাই। এই আলোচনার প্রয়োজনীয় অংশ উদ্ধৃত হইল :—

তাম্বুরার "কেবল সা ও প এই দুইটিমাত্র সুর পাওয়া যায়। গ্রামত্রয় (অর্থাৎ উদারা, মুদারা ও তারার) সকল সুরের সহিতই কি সা ও প-এর মিল আছে? তাহা নাই। অতএব উহারা অনেক স্থলেই গানের মাধুর্য্য নষ্ট করে। যে যে রাগিনীতে গ, প ও নি সুর প্রবল, যেমন ইমন কল্যাণ বেহাগ, কালাংড়া ইত্যাদি, তাহাদের সময় তাম্বুরার আওয়াজ অসঙ্গীত হয় না; কেননা খাদ খরজের তারে স ও প এবং প-এর তারে নি মধ্যে মধ্যে ধ্বনিত হয়। যে সকল রাগে গ ও নি কোমল, তাহাদের সময় তাম্বুরার ধ্বনি কাণ্ ইইয়া পড়ে। কিন্তু অভ্যাসে সকলই সহ্য হয়, তজ্জন্যই সঙ্গীত সমাজে ঐ প্রকার দোষ অনুভূত হয় না। অনেক রাগে প বর্জ্জিত; সে সকল রাগ গান করিবার সময়, তাম্বুরার প-এর তার ম-এ বাঁধা উচিত। কিন্তু সা-এর সহিত ম-এর মিল তত মিষ্ট হয় না বলিয়া, ঐরূপ করিয়া সকলে বাঁধে না। এই স্থানে এক বিষম অসঙ্গতি রহিয়াছে। অতএব গানের সহিত প্রচলিত নিয়মে তাম্বুরার সঙ্গীত কখনই উৎকৃষ্ট বলা যাইতে পারে না।"

কৃষ্ণধনবাবু এই দোষ কথঞ্চিৎ নিরাকরণের জন্য নিম্নলিখিত উপায় অবলম্বন করিতে বলেন।

"তাম্বুরায় আরও দুইটি তার যোগ করিয়া, ছয়টি তার বিভিন্ন সুরে বাঁধিতে হইবে। যে রাগের যে যে সুর ও গ্রাম এবং বাদী ও সম্বাদী, সেই চারি সুরে চারি তার এবং খরজ সুরে দুইটি তার; এই প্রকারে তাম্বুরা বাঁধিয়া, তাহা প্রচলিত রীতির ন্যায় অনবরত না বাজাইয়া যখন যখন ঐসকল সুর গানে স্পষ্টরূপে উচ্চারিত হইবে, তদনুসারে তার কয়টি ধ্বনিত করিলে, গানের শোভা যথেষ্ট বর্দ্ধিত হইবে। এ বিষয়ে একণে এক অসুবিধা এই যে আধুনিক সঙ্গীতে বাদী, সম্বাদী গ্রহ ও ন্যাস এই সকল প্রাচীন কথার নামমাত্র আছে, রাগ রাগিনীর মূর্ত্তি পরিবর্ত্তিত হওয়াতে, একণে ঐ সকল সুরের নিশ্চয়তা নাই। অতএব একণে ঐ নামগুলি ব্যবহার না করিয়া, যে যে সুর গানের মধ্যে প্রধান সেই কয়েকটি সুরে তাম্বুরার তারগুলি বাঁধিতে হইবে। প্রত্যেক গান গাইবার সময় তাম্বুরার খরজের তার ব্যতীত অন্যান্য তারের সুর বদলাইতে হইবে। তাহাতে কোনই হানি নাই।

তাম্বুরা বাঁধার জন্য, প্রত্যেক গানের স্বরলিপিতে উহার সঙ্গীতের সুর কএকটি একবার লিখিত থাকা উচিত। গাইবার সময় তদনুসারে তার বাঁধিয়া, যখন যখন ঐ সকল সুর স্পষ্টবিধানে কণ্ঠে উচ্চারিত হইবে, তখন সেই সেই সুরের তারে আঘাত হইবে। যেমন ইমনে প, ন, স, র, গ কেদারায় প, ধ, ন, স, ম, কানাড়ায় প, ন (কোমল) স, র, ম, ভৈরবীতে প, ধ (কোমল), স, গ (কোমল),

ন, ইত্যাদি অল্প সুরের সময় এবং দ্রুত আরোহনা-বরোহনের সময় স্বরগ্রামের ছুটী ধ্বনিত হইবে।

আবার এক রাগের ভিন্ন ভিন্ন গানের সঙ্গতের স্বর বিভিন্ন হইতে পারে। এই প্রকার সঙ্গীত যে সর্ব্বাংশে নির্দ্দোষ তাহা নহে, কেননা গানের ব্যবহার্য্য আরও যে যে স্বর, উহাতে বাকী থাকিতেছে (যেমন কড়ি-ম) তাহাদের সময় স্বরজ্ঞানির তত মিল হইবে না। কিন্তু সংক্ষেপে ঐ প্রকার সঙ্গীত ব্যতীত উৎকৃষ্টতর সঙ্গীত হওয়া অসম্ভব।" (কৃষ্ণধন বন্দ্যো গীতসূত্রসার, ১৩ শ পরিচ্ছেদ)

বুঝি পূজার ছুটী উঠিল রে!

ভাই পিয়ারী

(শ্রীশৈলজা মুখোপাধ্যায়)

ঐ বেলী পোড়ারমুখী আস্‌ছে দুধের বাটি নিয়ে, একটুখানি দধটুকু না গিলিয়ে ছাড়বে না। কি জ্বালা! এ অত্যাচারের মরণও হবে না ছাই, আর ওরাও ছাড়বে না! এই তো দিব্বি রোগ-শয্যায় শুয়ে আছি;—জানালার সুমুখে সেণ্ট্রেল্ এভিনিউএর চওড়া রাস্তার খানিকটা দেখ্‌তে পাচ্ছি, বৈকালের সূর্য্যের রক্ত-আভা গিয়ের উপর পড়ে' বেশ এক একবার চক্ চক্ করে' উঠ্‌ছে, রাস্তার দু-পাশে নানা রঙ্-বেরংএর লোকজনের আসা-যাওয়ার ভিড়' ক্রমেই বেড়ে উঠ্‌ছে, মোটর গাড়ীগুলা সান্ধ্য ভ্রমণের আনন্দযাত্রীদিকে নিয়ে তাদের অভ্যেসমত বাজাতে বাজাতে ছুটছে!...ওই একজোড়া কালো 'ওয়েলারের' ঘোড়ায় ফেটিন্ খপ্ খপ্ করে' ছুটে' গেল। বাঃ, বেশ ফুটফুটে মেয়েটি তো!—পাশের যুবকের চোখের চশ্‌মার কাঁচের উপর সূর্য্যের শেষ রশ্মিটুকু পড়ে ঝক্ ঝক্ করে' উঠ্‌ছে!...এ ছোঁড়ার মজা আছে! ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে' আমার মুখের পানে তাকিয়ে তাকিয়ে চলেছে। এ মুখে কি আছে রে হতভাগা মিন্‌সে? কি তীব্র কঠোর দৃষ্টি! মাগো, যেন চা করে' খেতে আস্‌ছে! হে হরি, ওই মোটরটা যেন ওর গায়ের উপর দিয়ে চলে' যায়! এই—এই—এই যা! ফস্ করে'

নয়ে পড়েছে।...রিক্সা-ওয়ালা ঘুঙুর বাজিয়ে ছুটলো!...

'এদিকে দুধ যে ঠাণ্ডা জল হয়ে গেল দিদি, খেয়ে নাও না?'

'বেরো বল্‌ছি হতভাগী, আমি ওসব খাব না', বলে' টান্ মেরে' নেলীর হাত থেকে' দুধের বাটিটা জান্‌লা গলিয়ে ফেলে' দিলুম।

নেলী রাগে গন্ গন্ করে' ঘর থেকে' বেরিয়ে গেল। বলে' গেল,—'তোমার আদরের ভাইটিকে ডেকে দিচ্ছি, দাঁড়াও, কেমন করে' না খাও দেখ্‌ছি।'

'ডাকিস্ না বল্‌ছি নেলী, আমার মাথা খা'স্!'

তাকলেই বা! ধীরেন কি আমায় ধরে' বেঁধে খাওয়াতে পার্‌বে কিনু? ভালোবাসি বলে' তাকে কি আমি সব অধিকারটুকুই ছেড়ে দিয়েছি! আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কথা কইবার কে সে? মা, বাপ্, ভাই, বোন্, কেউ নেই তার,—রাস্তায় কেঁদে' কেঁদে' ফির্‌ছিল, তাই দয়া করে' ঘরে স্থান দিয়েছি।—এই তো। আমার নিজের ভাই নেই বলেই দুধের সাধ ঘোলে মিটানো। না,—কিছুতেই না, সে বল্লেও আমি কিছু খাব না—আমি মর্‌ব। না খেয়ে মর্‌ব!...থাক্,—বেশ ত' দেখ্‌-ছিলুম –

আ-মর্! এ আবার কি লো? পুঁটুলি বাঁধা রাস্তার মতন লাল নীল সাড়ীতে সর্ব্বাঙ্গ ঢাকিয়ে ফেটিনে চড়ে' চলেছে।—কা'রা? পর্দ্দানশীন্ বাঙালী মেয়েরা বোধহয় থিয়েটারে যাচ্ছেন!...আহা, এ বেচারী হয় ত' অফিসের কেরাণী! ওই যে জরাজীর্ণ ছাতাখানি হাতে নিয়ে প্যানেলার জুতো পায়ে, মলিন মুখে বাড়ী ফির্‌ছে! বাড়ী ফিরে' হয় তো দেখ্‌বে, রাত্রে আহারের বন্দোবস্ত নেই, এদিকে পয়লার দুধের দাম বাকী, সে পয়লা আদা-য়ের জন্যে দাঁড়িয়ে আছে, মুদী তাগাদা কর্‌তে এলো বলে'—ধোপারও সন্ধ্যায় আস্‌বার কথা। ছেলেটার জ্বর হয়েছে, ডাক্তার দেখাতে হবে—হাতে একটি পয়সা নেই! আহা, চারিদিকের ঝঞ্ঝাটে আর পাওনাদারের তাগাদায় ব্যতিব্যস্ত হয়ে হয়ত' রাত্রে হতাশ হয়ে শুয়ে ভাব্‌বে,—তার স্ত্রী কোলের উপর তার স্বামীর মাথাটি তুলে' নিয়ে, রুক্ষ চুলের ফাঁকে আঙুল দিয়ে কইবে,—অত ভেবো না লক্ষীটি, দিন দিন ভেবে' ভেবে'—দূর্ ছাই! কী সব সাত ভূতের চিন্তা যে মনের মধ্যে এসে' পড়ে!...

মেয়েদের স্কুলের 'বাস্'টা ঘর্ ঘর্ করে' চলে' যাচ্ছে! মেয়েটির মুখখানি তো বেশ!—চোখের চাউনিটি কেমন যেন উদাসিনীর মতন! মনে হচ্ছে, কি যেন কার কথা হঠাৎ মনে পড়ে গেছে। বোধহয় কয়েকদিন আগে শোনা রবীন্দ্রনাথের একটা গানের সুর! চায়ানট্ কি পুরবি এমনি একটা কিছু হবে। না, আর কিছু! দূর! পাশের মেয়েটা কি চঞ্চল! রাস্তায় এক ছোক্‌রার গায়ে খুখুই ফেলে দিলে! আবার মুখ টিপে টিপে দুষ্টু হাসিও হচ্ছে! হ্যাঁ, এই তো ঠিক্। আর একজন মেয়েছে তার গালে এক চড়! বা-রে!

'আস্থো মেজদি, তোমার ধীরেন আমার কের সেই কথাটা'—হো হো করে' একগাল হেসে' ধীরেন ঘরে ঢুকেই বল্‌লে,—কি, বল্ না, নেলী! কি কথাটা, বল্ না কি বলেছি। বলেই আবার হাসি!

মুখ ফিরিয়ে বল্লুম,—'আঃ কি হচ্ছে কী! ওকে আবার রাগালি কেন ধীরেন?'

'জিজ্ঞাসাই কর না দিদি, আমি ওকে কি বলেছি। কি বলেছি জান? সেই—সেই গল্‌দা চিংড়ী'—

রাগে নেলীর গালদুটো লাল হয়ে উঠেছিল, ধীরেন মুখের পানে তাকিয়ে দুষ্টু হাসি হাস্‌ছিল।

'গল্‌দা চিংড়ী বলে' তাকলে ওর যদি রাগ হয় তাহ'লে বলিস্ কেন ধীরেন?...বল্ আর বল্‌বি নে, আমার গা ছুঁয়ে তিনসত্যি করে বল্?'

নেলীর সুমুখে তার এ পরাজয় স্বীকার কর্‌তে লজ্জা হলো; বল্‌লে—এখন ওকে এখান থেকে' দূর করে' দাও আগে—

'আচ্ছা তুই যা, ও আর বল্‌বে না।' বল্‌তেই নেলী আপন মনে বিড্ বিড্ করে'বক্‌তে বক্‌তে বেরিয়ে গেল।

...ধীরেন ধীরে ধীরে দিদির কোলের কাছে মাথাটা রেখে' বল্লে দুধের বাটী জান্‌লা গলিয়ে ফেলে দিয়েছ?'

এই যা! সব গোলমাল হয়ে গেল। কথা কব্‌ না ভাব্‌ছিলুম, কিন্তু এবার কি বলি? এ দস্যি তাই তো ছাড়্‌বে না! বল্লুম,—'না ধীরেন, আমি তো খাব না বলিনি।'

'একটু গরম দুধ এনে' দেব ?···বল খাবে ?

'হ্যাঁ, খাব।'

রাত্রি তখন প্রায় আটটা। ডাক্তার বলে' গেল,—আমি নাকি ভাল আছি। ধীরেন পা টিপে' টিপে' আমার বিছানার শিয়রের কাছে এসে' বস্‌লো! আমার হাতটা তার হাতের মুঠার মধ্যে ধরে' বল্‌লে—দিদিমণি, আজ একটা সত্যি কথা বল্‌বে ?

'কি কথা ধীরেন ?'

'সেদিন আমার জামা, কাপড়, জুতো কিন্‌তে যে টাকা দিলে, সে টাকা কোথা পেলে বল ?'

বুকটা ধ্যাৎ করে' উঠ্‌লো! বল্লুম, কেন, কি হয়েছে,—আর চাই ?

'হ্যাঁ, আরও চাই বৈ কি ? যাও! আমি সব জানি। ও বাড়ীর নিলীমার কাছে হাতের চুড়ি রেখে টাকা এনেছ ?

'এই, চুপ্, চুপ্! মা যেন না জান্‌তে পারে।'

'যাও! তোমার সঙ্গে আর কথা বল্‌ব না আমি।' বলে' ধীরেন তাড়াতাড়ি উঠে' চলে' গেল।

আঃ! বুকের বেদনা টন্ টন্ করে' উঠ্‌লো! আমি যে তোর দিদি হয়েছি ভাই!

একদিন মা হঠাৎ জান্‌তে পারলেন, আমি চুরি বন্ধক রেখে টাকা খরচ করেছি,—কি জন্যে এবং কখন সে খবর তিনি পেলেন না। মা আমায় গালাগালি কর্‌তে আরম্ভ কর্‌লেন—এত বড় ধাড়ি মেয়ে, দুদিন পরে বিয়ে হবে, একটু কাণ্ডজ্ঞান নেই! চুড়ি বেচে' সখ উড়ালেন।

নেলীর মার্ফৎ ধীরেনের কাণে সে সংবাদ গিয়ে পৌঁছুলো। দিনের বেলা তার খাওয়াই হলো না। সমস্তটা দিন ঘরে খিল্ বন্ধ করে' বসে' থাক্‌লো।·····সন্ধ্যার কিছু পরেই ধীরেন আমার ঘরে ঢুকে ডাকলে,—দিদি!

সমস্তটা দিন গালাগালি খেয়ে মন খারাপ হয়ে গিয়েছিল তাই মেঝের উপরে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিলুম। চেয়ে দেখি, ধীরেন। আমার হাতে একটা কাগজে বাঁধা জিনিস দিয়ে বল্‌লে,—এই নাও দিদি তোমার চুড়ি। কেমন ?—টেরটা পেয়েছ ? আর কখনও এমন কাজ করো না। একটা পাতানো ভাইএর উপর ভারি দরদ দেখাতে গিয়াছিলেন।

মনে কর্‌লুম, জিজ্ঞাসা করি কোথা সে টাকা পেলে! কিন্তু আমার মুখ থেকে কোন কথা বেরোবার আগেই ধীরেন বাইরে চলে' গেল। ডাক্‌লুম, ধীরেন! ধীরেন! —কোন সাড়া পেলুম না।

* * *

দিন পাঁচ ছয় পরে, সে এক হুলুস্থুল কাণ্ড!...ধীরেন আটস্কুলে পড়্‌তো। একদিন স্কুল থেকে খবর এলো,—সে না কি নোট জাল করে' পাঁচখানি দশ টাকার নোট চালানো অপরাধে পুলিশের হাতে ধরা পড়েছে!

কথাটা শুনে' আমার মাথাটা ঝিম্ ঝিম্ করে' ঘুর্‌তে লাগ্‌লো, হাত, পা, অবশ হয়ে এলো—চারিদিক অন্ধকার! এ অভাগীর জন্যে তুই এমন কেন কর্‌তে গেলি ভাই! তোদের জন্যে যে কত কঠোর নির্য্যাতন সইতে পারি আমরা, সে কথা তুই কেমন করে'জান্‌বি ধীরেন!

আমার যথা সর্ব্বস্ব দিয়ে তোকে ফিরিয়ে আন্‌ব—আয়, আয় ভাই ফিরে আয়! পঞ্চাশটি টাকার জন্যে আমার চোখের সুমুখ দিয়ে তোকে বন্দুকধরা কয়েদীর গাড়ীতে নিয়ে চলে' যাবে,—এ দৃশ্য দেখ্‌বার আগে আমার মৃত্যু হোক্ ভগবান! ধীরেন! ধীরেন! লক্ষ্মী ভাইটি আমার!

* * *

হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল। ওমা, এযে স্বপ্ন!

বন্ধু। সে কি হে! তুমি যে ভারি হিন্দু ছিলে, এখন আবার এ কি কথা হে? "হিন্দুর মেয়ে বিয়ে করার চেয়ে আর পাপ নেই?"—তোমার মুখে এই কথা···

সত্যচরণ। আহা····বড় চেঁচাচ্ছ···

বন্ধু। চেঁচাব না? চোদ্দপুরুষ তোমরা খ্রাস্ত, তুমি হিঁদু হ'য়ে হিঁদুর মেয়ে বিয়ে করলে আর আজ বলছ কি-না হিঁদুর মেয়ে জঘন্য?

সত্যচরণ। বন্ধু! এক্‌সপিরিয়েন্স থেকেই বল্‌ছি।

"যাক্ সুখবর তা হ'লে,—তাই তো আমার একবার 'মিনিয়ালস্ কোয়ার্টারে' রুগী দেখতে যাবার কথা ছিল, কি করব তাই ভাবচি, ডাক্তারবাবু ছুটোর সময় রুগী দেখতে গেছেন, এখুনি ফিরবেন, খবরটা তাঁকে শুনিয়েই যাব না কি?"

গাঙ্গুলীকে ইতস্তত: করিতে দেখিয়া সুরেশ কহিল—"মিনিয়ালস্ কোয়ার্টারে এমন রুগী টুগী কেউ আছে কি যে এখন-তখন অবস্থা, তা যদি না হয় তবে আবার তয় কিসের, সুখবরটা দেরী করেই যাবেন, সুখবরটা ডাক্তার-বাবুকে শুনিয়ে দেওয়া ভাল, আমার সঙ্গে তো পরিচয় নেই না হ'লে আমিই শুনিয়ে যেতাম, যাঁদের বাড়ীতে বোসের বাড়ী, সে আমার পরিচিত, তার কাকা খবরটা জানবার জন্যে হাঁ করে আছেন" সুরেশ চলিয়া গেল, তার ঠোঁটের কোণের বক্রহাসি সরলচিত্ত গাঙ্গুলী লক্ষ্য করিলেন না, ডাক্তারবাবুর মর্জ্জি হইলে এ বৎসর তাঁর পাঁচটি টাকা মাহিনা বৃদ্ধির সম্ভাবনা, সুতরাং এহেন ডাক্তারবাবুকে খোসখবর শুনাইয়া খুসী করিতে পারিলেই ভাল এইরকম নানাপাঁচ ভাবিতে ভাবিতে তিনি মৃদু-পাদ-বিক্ষেপে হাসপাতালের হলে আসিয়া দাঁড়াইলেন, ইতি-মধ্যে ডাক্তারবাবুও ফিরিয়া আসিলেন, হাতের ছাতাটি একটি কোণে ঠেস দিয়া রাখিয়া কম্পাউণ্ডারের দিকে রক্ত-চক্ষু চাহিয়া কহিলেন "খুব ঠিগ্‌গির 'মিনিয়ালস্ কোয়ার্টার' থেকে ফিরেচ যে"

গাঙ্গুলী মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে ধীরস্বরে কহিলেন —"আজ্ঞে, সেখানে এখনও যাই নি।"—"এঁ্যা, কেন যাও নি, তোমায় যে মন মর্জ্জি কাজ দেখচি হে, চাকরী কোন্ দিন বিপদে ফেল্‌বে আর কি, একে তো শালার রেলের চাকরী না রকমারী, তত পও নাইকের রেস্‌পন্-সিবিলিটি যে আমাদের ঘাড়ে তুমি তা আজও বুঝলে না, এতো খানি বয়েস হতে চল্‌ল" গাঙ্গুলী মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে উত্তর দিলেন, "আজ্ঞে তা আর না, তবে কি-না একটু কারণ আছে"

ডাক্তারবাবু ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া গাঙ্গুলীর মুখের দিকে বাঁকা চাহনী হানিয়া প্রশ্ন করিলেন, "কি কারণ তা খুলেই শুনি না হে, যে কারণই থাক্ নিজেদের duty neglect করা তা বলে উচিৎ হয় হয় না, duty it duty"

সুখলাল কলিকায় ফুঁ দিতে দিতে আসিয়া প্রভুর সম্মুখে হুঁকাটি বাড়াইয়া ধরিল, ডাক্তারবাবু চেয়ারে বসিয়া পড়িয়াই দু চারটা টান দিয়া ভ্রমণ-জনিত ক্লান্তি হইতে মুক্তি লাভ করিলেন, ইহা বুঝিয়া গাঙ্গুলী কহিলেন "হুজুর এপয়ামিনে পাশ হয়েছে, রাস্তায় দেখচি, এই সময় খবরটা পেলাম, অমন সুখবর আপনাকে না শুনিয়ে আর কোথাও যেতে মন সরল না।" চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া ডাক্তারবাবু কহিলেন—"সত্যি না কি, কে বল্‌লে হে?"

"আজ্ঞে, একটি ছোক্‌রা অফিস থেকে খবর জেনে ফিরছিল। তার বন্ধু কে পাশ হয়েছে সেই খবর তার বাড়ীতে দিতে যাচ্ছিল, তারই কাছে জান্‌লাম" ডাক্তার-বাবুর ঘন গোঁফ জোড়াটির মধ্যে মেঘ মধ্যে বিদ্যুত বিকাশের ন্যায় একটু আনন্দের আভাস দেখিয়া গেল, তিনি প্রীতমুখে কহিলেন: "ছোক্‌রা তা হ'লে সত্যিই হলো, যে মিন্‌মিনে আমার তো ভরসাই হয় নি, তা আপিসে যখন খবর এসেচে তখন মিছেই বা হয় কি ক'রে, তবে দেরীবাবুর উচিৎ ছিল খবরটা আমায় পাঠিয়ে দেওয়া।"

গাঙ্গুলী কহিলেন, "আফিস যে আজ, কাল দুদিন বন্ধ, ও ছোক্‌রা বোধ হয় privately জেনে এসেছে"

সুখলাল কহিল, "হুজুর, আপলোগোঁ তো জল্‌দী বিশওয়াস নেহী করতে হোঁ বাকী হামারা বাত মান্-লিজিয়ে, খোকাবাবু যে জরুর পাশ হুয়া হোগা, পীর বাবাকো মানৎ করনেসে, উনকা নামসে জরুর কাম হাসীল হোতা হ্যায়, আপ ই বাতমে ধোকা মৎ কিজিয়ে"

ডাক্তারবাবু কহিলেন, "তা সত্যি গাঙ্গুলী, নইলে এদেশের লোক পীর বাবাকে এতো মান্‌বেই বা কেন, ওরে ব্যাটা সুখলাল, সে পাঁঠা টাকে ভাল করে খেতে দিচ্ছিস্ তো রে?" সুখলাল জিভ্ কাটিয়া কহিল, "কা হাম্ দেবতাকী ধন উপাল রাখেগা বাবুজী? হামারা ডর নাহী হ্যায়?" গাঙ্গুলী কহিলেন, প্রথমে আমারও বিশ্বাস হয় নি, তারপর সব কথা খুঁটিয়ে জিজ্ঞেস করতে বুঝতে পারলাম যে আমাদেরই হবেন বটে, বারজন এপ্‌জামীন দিতে গেছ্‌ল আটজন পাশ হয়েছে, চারজন ফেল করেছে।"

ডাক্তারবাবু কহিলেন, ছোকরার নাম কি, থাকে কোথা, কি করে, এসব particulars জেনে নিলে না কেন?" গাঙ্গুলী প্রমাদ গণিয়া কহিলেন, "সেইটেই ভুল হ'য়ে গেছে, সেও খবরটি দিয়ে তাড়াতাড়ি হন্ হন্ ক'রে চলে গেল, আমারও সুখবরটা শুনেই প্রথমটা এতো আনন্দ হ'লো—" গাঙ্গুলীর শেষ কথাটি উহ্য রহিয়া গেল," ডাক্তারবাবু কহিলেন "সে যাক্,—ছোকরা আপিসের বাবুদেরই কেউ আপনার জন হবে, নইলে কি আর আপিসে গিয়ে খবর জান্‌তে পারে? তা মিনিয়ালস্ কোয়ার্টারে কাল সকালেই যেয়ো, কারু শক্ত ব্যারাম নেই তো?"

গাঙ্গুলী আশ্বস্ত হইয়া কহিলেন "রামঃ কারু বা নাকে সর্দ্দি, কারু বা একটু পেটের অসুখ, কারু বা জ্বর, তাতেই

দিক্ রিপোর্ট করে ঘরে বসেছে; ও ব্যাটাদের সহজে কি কিছু হয়?"

সুখলাল কহিল—"বড়ী ঠিক্ বাত্, হাথ বাবুজী, ই জাত্‌কো, কেইসন্ না বীমার হো জায়, অল্‌দীসে দম ঘুটে তো নেহী, মকই আউর ঘুঁট খাতে খাতে চঙ্গী একদম পখল বন্ গীয়া।"

ডাক্তারবাবু চিন্তামগ্ন চিত্তে তামাকু টানিতে লাগিলেন, সুখলালের টীকনীর কোনো উত্তর দেওয়া আবশ্যক মনে করিলেন না; কিছুক্ষণ পরে মুখ তুলিয়া কহিলেন "দেখ গাঙ্গুলী কালকের রাতের ট্রেণে তা হ'লে ছোকরারা ফিরবে, তুমি কাল সকালে আগা সাহেবের কাছ থেকে আর একটা পাঁঠা কিনে এনো, দাম বুঝেচ কি, না—বেশী না হয়, না হয় ছোটো দেখে দুটো কিনে নিও, আর অফিসের দেবীবাবু, হেমবাবু, মতিবাবু এঁদের নিমন্ত্রণ করে এলো, পরশু রাত্রে এদের সব মাংস আর লুচি খাইয়ে দেওয়া যাবে, কিন্তু খবরদার যেন বলে বোসোনা ডাক্তারবাবু ছেলে পাশ হয়েচে বলে খাওয়াচ্ছেন, সেটা শুনতে মোটেই ভালো লাগবে না, তা ছাড়া আমরা তে এখন কোনো খবর শুনিও নি, গায়ে পড়ে শুনতে যাবারও দরকার নেই, কি বল?" গাঙ্গুলী সোৎসাহে কহিলেন "তা বটেই তো, আমাকে আর আপনাকে কিছু বলতে হবে না, আমি সব ঠিক করে নেবো।"

৩

আগা সাহেব মধ্যাহ্ন ভোজনে বসিয়াছেন, মোটা মোটা রুটী, আর গোস্ত কাবাব, ক্ষুধার তাড়নায় খুব শীঘ্র শীঘ্র গলাধঃকরণ করিতে ব্যস্ত, বেড়া ঘেরা আঙিনায় এক পাল হাঁস ও মুর্গী চরিয়া বেড়াইতেছে, কয়েকটি শীর্ণকায় ও কয়েকটি পুষ্ট দেহ ছাগ বৎস সারি সারি খুঁটিতে বাঁধা, স্বল্পাকার অশথ ও বট পাতা তাহাদের সম্মুখে পড়িয়া আছে, বেছারীরা তাহা চিবাইতে চিবাইতে মাঝে মাঝে চীৎকার করিয়া উঠিতেছে, আগা সাহেব উহাদিগের দিকে লক্ষ্য করিয়া আহারের মধ্যে লাভের হিসাবটা খতাইয়া রাখিতেছে এই সময় বাহির হইতে ডাক আসিল "আগা সাহেব বাড়ীতে আছ?"

আগা সাহেব সাগ্রহে উত্তর দিল "হাঁ বাবুজী, চলা আইয়ে" গাঙ্গুলী, সুখলালের সহিত বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিয়াই নাকে কাপড় দিয়া বলিয়া উঠিলেন "রাম-রাম, ছেড়ের ভবনে ছেড় লীলা"

আগাসাহেবের আহারের আয়োজন দেখিয়া ভদ্রতার খাতিরেও নিরীষ ত্যাগ করা তাঁর পক্ষে দুর্ঘট হইয়া উঠিল, মুখে কাপড় চাপিয়া তিনি এক পাশে দাঁড়াইলেন, সুখলাল কহিল "দুঠো পাঁঠা লেনেকো আয়া জী, ডাক্তারবাবু পানা-সিনা করেঙ্গে"।

আগা সাহেব প্রসন্ন চিত্তে কহিল "সরুর, সরুর, ইতো ভারী আদমী কো কামই হায়, লিজিয়ে জো পসীন্ বহুৎ পাঁঠের হায় আপলোগোঁ কো সাজ্‌মুনে।"

সুখলাল দুটি সুপুষ্ট ছাগ বৎস পছন্দ করিয়া দামের কথা জিজ্ঞাসা করাতে আগা কহিল আপলোগোঁ সে হাম মোলাইতেঁ নহী করেঙ্গে, ডাক্তার বাবুকা খুশীসে জো মিস্ আয় উসী মে হাম্ রাজী, মেহিজিয়ে দুয় রুপইয়া, বেশী হাম মডিগেওলা নেহী হায়"

"ওরে সুখলাল গোটা চার টাকা বলে দিস্, কত বা মাংস হ'বে, বড় জোর দুটোয় চার সের,—তেঠানো যাব চল্লাম আমি" বলিয়া গাঙ্গুলী অবিলম্বে স্থান ত্যাগ করিলেন, সুখলাল দুই রুপে দুটি ছাগল ছানা লইয়া আগাকে সেলাম দিয়া গাঙ্গুলীর অনুসরণ করিল, গাঙ্গুলী সুখলালকে বাসায় যাইতে বলিয়া বাবুদের নিমন্ত্রণ করিতে গেলেন, ছুটীতে সকলেই বাড়ী ছিলেন, ডাক্তারবাবুর অকস্মাৎ সাদর নিমন্ত্রণে তাঁহারা আশ্চর্য্য হইয়া গেলেন, কেহ বা আবৃত্তি করিলেন "পূর্ব্বের সূর্য্য বুঝি পশ্চিমে উদয়।"

কোনো সূক্ষ্মদর্শী নিমন্ত্রণের কারণ অনুসন্ধানে মন দিলেন, বস্তুতঃ পথিকও সব সুক্ষ্ম পথ ছাড়িয়া গরম গরম লুচি মাংস ও রসভরা রসগোল্লার চিন্তায় মগ্ন হইয়া তামাকু টানিতে লাগিলেন, মিতব্যয়ী কোনো ক্ষুদ্র সন্তান স্ত্রীটিকে আজ হইতে তাঁহার কাল রাত্রির আহার তৈয়ার করিবার জন্য নিষেধ করিয়া রাখিলেন, কি জানি, যদি সকালে অফিসের তাড়ায় বলিতে ভুল হইয়া যায়।

৪

সন্ধ্যার পরই আহার করা ডাক্তারবাবুর নিত্যকার অভ্যাস, আজ কিন্তু বধূমাতাকে তিনি বলিয়া দিয়াছেন একটু রাত করিয়াই যেন তাঁর রুটী প্রস্তুত করা হয়। রাত্রি দশটার ট্রেণে হরেন্দ্র আসিতেছে, সে আসিলে এক সঙ্গেই আহার করিবেন।

শীতের সন্ধ্যার পর ঘণ্টাগুলা হঠাৎ যেন অতিরিক্ত লম্বা হইয়া পড়ে, বিশেষ করিয়া পাহাড়ের দেশে শীতে আড়ষ্ট হইয়া তাহাদের গতিও বোধহয় অতসড় হয়।

সন্ধ্যা কি এখন হইয়াছে! দশটা বাজিবার আর বাকি নাই যে, সুখলাল কলিকার পর কলিকা ঝাড়িয়া ক্লান্ত হইয়া পড়িল, ডাক্তারবাবুও আর উৎসাহের সহিত হুঁকার টান দিতে পারিতেছেন না, নিদ্রাদেবী সারাদিনের কর্ম্ম ক্লান্ত, শীতার্ত্ত গাঙ্গুলীর চোখ দুটি বার বার চাপিয়া ধরিতেছেন, তবু দশটা আর বাজিতে চাহে না, ডাক্তারবাবু খুটখাট শব্দ হইলেই দিগন্তবিস্তীর্ণ পথের মধ্যে চাহিয়া দেখিতেছেন, বিজয় গৌরব দৃপ্ত হরেন্দ্র আসিয়া সম্মুখে দাঁড়াইল কি, না। কতক্ষণ পরে সত্য সত্যই এক হাতে হারিকেন ও অন্য হাতে একটি কম্বল লইয়া হরেন্দ্র আসিয়া

দেখা দিল, খুবই ধীরে ধীরে লণ্ঠনটি তুলিতে রাখিয়া কম্বলখানি বেঞ্চ রাখিতেই ডাক্তারবাবু জোর গলায় বলিয়া উঠিলেন, "এসেচিস্ যে এই ঠেরু, বাড়ীশুদ্ধো লোক শীতের রাত্তিরে তোর জন্যে জেগে বসে—তুই বুঝি আর একটু পা চালিয়ে আস্‌তে পারিস্ না, নিড়ি নিড়ি আর কোনোকালে ফুরুলো না রে?"

হায় হায় বাড়ীশুদ্ধো লোক জাগিয়া থাকিবার কি আবশ্যক ছিল, হরেন্দ্র তো কাহাকেও মাথার দিব্য দিয়া জাগিতে বলে নাই, সে মৃদুকণ্ঠে উত্তর দিল—"আজ্ঞে, গাড়ী তো এইমাত্র এসে পৌঁছেচে, পনেরো মিনিট লেট ছিল আজ—আপনারা কষ্ট করে জেগে আছেন কেন, শুলেই পারতেন।"

ডাক্তারবাবু গর্জিয়া কহিলেন "তা বল্‌বি বই কি, তুই পাশ হয়েচিস্ শুনে আমাদের কত খুশী, গাঙ্গুলী, সুখলাল সবাই তাই জেগে বসে আছি, যা হোক্ করে পাস্ তো হলি, এখন একটু চট্‌পটে হ' দে কাজ গুছিয়ে নিতে পার্‌বি" সর্ব্বনাশ, এ শঠতা কে সাধিল, ফেলের পরিবর্ত্তে পাসের সংবাদ শুনাইয়া কে হৃদ্যতা দেখাইয়া গিয়াছে? হরেন্দ্রের নিঃশ্বাস রুদ্ধ হইয়া আসিল, অতি-কষ্টে আত্মসম্বরণ করিয়া বেচারী কহিল "আজ্ঞে, ভুল শুনেচেন আপনি, পাশ তো হইনি, ফেল হয়েচি, যে তাড়াতাড়ি Message দিচ্ছিল, ঘণ্টায় পঁচিশটা word receive করা কি সহজ কথা, ব্যাটারা তা তো বুঝবে না, দিলে ফেল করে।"

ডাক্তারবাবু বিরক্ত হইয়া কহিলেন—"সধু জানিস্ তা'হলে তোর আখিরে যে কি হবে তাই ভাবি আমি—আরে হতভাগা নিজে পাশ হয়েচ সে খবরটাও জান না, আপিসে তার এসেচে, আটজনা পাশ, চারজনা ফেল, পাশের মধ্যে তোর নামও রয়েচে, না হবিই বা কেন, পীর বাবার নামে পাঁঠা কেনা রয়েচে, কি বলিস্ সুখলাল?"

হরেন্দ্র বড় বিপদেই পড়িল, সে কোথা দু পাঁচটা বকুনী বকুনী খাইবার জন্য প্রস্তুত হইয়াই আসিতেছে, না হয় তার উপর দশটা বিশটা বেশীই হইত, কিন্তু এ সমাদরের অত্যাচার যে একেবারেই অসহ্য, নিশ্চয় যে ইহার কোনো দুষ্ট বুদ্ধির কারচুপী আছে, কিন্তু বাবা যে তাহা বুঝিবে না সে হইতেছে আরো বিপদ, তথাপি একবার প্রাণপণ চেষ্টা করিয়া কাঁচুমাচু মুখে সে কহিল, "আপনি ভুল শুনেচেন বাবা, আটজনা ফেল, আর চারজনা পাশ, আপিসে যে Message receive করেচে হয় তো সেই ভুল করে ভুল খবর রটিয়েছে।"

"যাঃ যাঃ তোকে আর ওকালতী করতে হবে না, খেয়ে দেয়ে শুগে যা, কাল আবার পাঁচজন ভদ্রলোককে খেতে বলা আছে, ওঠো হে গাঙ্গুলী, রাত অনেক হয়ে গেল" বলিয়া ডাক্তারবাবু গাত্রোত্থান করিলেন, হরেন্দ্রের বেগতিক দেখিয়া আগে ভাগেই সরিয়া পড়িল, গাঙ্গুলী তখন মনে মনে দুর্গা নাম স্মরণ করিতে সুরু করিয়াছিল, যেহেতু ডাক্তারবাবু বিশ্বাস না করিলেও হরেন্দ্রর কথায় তাঁর এতোটুকু অবিশ্বাস হয় নাই, এবং এই শুভ সংবাদটি সেই প্রথমে ডাক্তারবাবুকে দিয়া যেমন তিনি তাঁহার 'খুসী' আদায় করিয়া ধন্য হইয়াছিলেন এইবার আসল ব্যাপার প্রকাশ হইলে ডাক্তারবাবুর বিরক্তির পরিমাণ খুসীকে যে তিনগুণ পরিমাণে ছাপাইয়া যাইবে আর তার চাপ গাঙ্গুলী বেচারীকেই সহিতে হইবে তাহাতে আর ভুল নাই, সুখলালও এইরকম একটা আশঙ্কা করিতে করিতে "হর হর" নাম উচ্চারণ করিয়া ডাক্তারবাবু বন্ধ আর এক ছিলিম কলিকা সাজাইতে মন দিল, উঃ খবর অপেক্ষা খোকাবাবুর কথাটাই সত্য তাহা বলিয়া প্রভুর মনঃক্ষুণ্ণ করিতে তার সাহসে কুলাইল না।

৫

রাত্রে বন্ধুর সহিত সাক্ষাৎ, উমা হরেন্দ্রর চিন্তাম্লান মুখের পানে চাহিয়া ফিক্ করিয়া হাসিয়া কহিল "এই-বার? বলেছিলে যে পাশ হলে একটা গ্রামোফোন কিনে দেবে, তা দিচ্ছ তো?"

কাটা গায়ে নুনের ছিটা আর কি, হরেন্দ্র উমার সহিত কহিল "বাবা যেমন মিথ্যে খবর শুনে হৈ হৈ করচেন তুমি আর তা কোরো না, কোথাকার কে বলে গেচে অমনি তার কথা বিশ্বাস করে লোকজনদের পর্য্যন্ত নেমন্তন্ন করে বসে আছেন, কেন্ রে বাপু, আমার শ্রাদ্ধ নাকি?"

উমা হাসিয়া কহিল "শ্রাদ্ধ হ'লে বুঝি লোকের এতো খুসী হয়? আমার গায়ে হাত দিয়ে তিন সত্যি করে ছিলে যে পাশ হলে গ্রামোফোনো কিনে দেবে, তাহলেই না বল্‌ছি, না দাও না দেবে, তার আর কি, আমি তো তোমার গাঁটের কড়ি কেড়ে নিতে যাচ্ছি না,—"

হরেন্দ্র অসহ্য বিরক্তিতে নিজের কাণ মলিয়া কহিল, "সাধ্যি ক'রে আজ্ঞা বোকামী করেছিলাম, তার জন্যে কানমলা খাচ্ছি, বলছি যে পাশ হইনি, হইনি, ফেল হয়েছি, তবু কি বিশ্বাস হয় না, আমি কি এতোই মিথ্যে! বাণী রৈ বাপু, যে আমার কথা কেউ বিশ্বাস করছে না?

এ হেন তীব্র জবাবদিহিতেও পরিত্রাণ পাই না হায়রে সংসার! উমা অবিলম্বে বিছানার উপর উপুড় হইয়া পড়িয়া কোঁপাইতে সুরু করিল, হতবুদ্ধি হরেন্দ্র নিদ্রাহীন চক্ষে চেয়ারের উপর বসিয়া বধূর কান্না শুনিতে লাগিলেন, আর কেবল সংসার ঘড়িটা নির্ব্বিকার চিত্তে আপনার জয় ডঙ্কা ঘোষণা করিয়া চলিল।

৩

বেলা তখন বারোটার কাছাকাছি, অফিসগৃহ গম গম করিতেছে, কেরাণীবাবুরা ঘাড় গুঁজিয়া কলম পিষিতেছেন, কিন্তু সকাল সাড়ে নটা হইতে একটানে বসিয়া বসিয়া পিঠ ধরিয়া যাইবার উপক্রম, তাহার উপর বহুক্ষণ তামাক না খাইয়া পেট ফুলিয়া উঠিল আর কি, দু-একজন আর থাকিতে না পারিয়া আড়চোখে কেবলি দেখিতেছেন জি, টি, এস বাহির হইল কি, না, কিছুক্ষণ পরে জুতার মস মস শব্দে ও শিস্ দিয়া প্রিয় কুকুরটিকে ডাকিবার আওয়াজে কেরাণীকুল হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিলেন, কেহ তো পকেট হইতে সিগারেট বাহির করিয়া, চেয়ারে ঠেস দিয়া টেবিলে পা তুলিয়া ফুঁকিতে সুরু করিলেন কেহ বা তাড়াতাড়ি তামাক সাজিয়া হুঁকায় টান দিতে লাগিলেন, ও রসে বঞ্চিত কেহ বা শুধু দুটা পান চিবাইতে চিবাইতে গোসগল্প জুড়িলেন, রেলের অফিসে দুপুরবেলা এক ঘণ্টা, পত্নীপ্রেমিক কেহ বা এই এক ঘণ্টাকাল অবকাশ প্রিয়ার সংসর্গে কাটাইবার জন্য বাড়ীর দিকে ছুটিলেন, আলস্য বিমুখ কোনো বাবু বা একমনে কাজই করিয়া চলিলেন।

এই সময়ে ডাক্তারবাবুর আবির্ভাব হইল, তাঁহাকে দেখিয়া সকলের মধ্যে একটা ব্যস্ততা পড়িয়া গেল।

প্রবীন ডাক্তারবাবুর সম্মানের জন্য নবীনের দল, সিগারেট লুকাইল, হুঁকার টান বন্ধ হইল, কেহ বা চেয়ার আগাইয়া ডাক্তারবাবুকে বসিতে দিলেন, কেহ বা হুঁকাটি বাড়াইয়া তাঁহার সামনে ধরিলেন, ডাক্তারবাবু এ সব সমাদর উপেক্ষা করিয়া সরাসরি দেবীবাবুর নিকট গিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "হ্যাঁ মশাই, ছোকরারা যে দানাপুরে টেলিগ্রাফ এক্সচেঞ্জে দিতে গেছ্‌ল ফিরেছে?"

দেবীবাবু কহিলেন "আজ্ঞে ফিরেছে বই কি, আটজন ফেল আর চারজন পাশ হয়েছে।"

বলাবাহুল্য, হরেন্দ্র ফেল হইয়াছে বলিয়াই এ অপ্রিয় সংবাদটি আর ডাক্তারবাবুকে বলিয়া পাঠাইতে দেবীবাবুর মন সরে নাই, ডাক্তারবাবু চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া কহিলেন "official message এ কোনো ভুল টুল নেই, তো, আটজন পাশ, চারজন ফেল এমন হয় নি তো?"

ডাক্তার বাবুর প্রশ্নের ধরণ শুনিয়া বাবুর দল চোখ টেপাটেপি সুরু করিলেন, দেবী—বাবু ঈষৎ হাসিয়া কহিলেন "message এ ওরকম ভুল যাবে না, এই দেখুন না message"।

ডাক্তারবাবু পকেট হইতে চশমা বাহির করিয়া চোখে লাগাইয়া সাবধানে সেই মেসেজ খানির উপর দৃষ্টি সঞ্চালন করিলেন, না:—আর সন্দেহ করা চলে না, এ একেবারে চক্ষু কর্ণের চূড়ান্ত বিবাদ ভঞ্জন, উত্তীর্ণ চারিজনের মধ্যে হরেন্দ্রের নাম নাই। ডাক্তারবাবু বিনাবাক্য ব্যয়ে গম্ভীর পাদক্ষেপে অফিসগৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেলেন, বিপিনবাবু দেবীবাবুকে জিজ্ঞাসা করিলেন "হ্যাঁ মশাই, ব্যাপার কি?"

দেবীবাবু কহিলেন "হরেন টেলিগ্রাফ পরীক্ষা দিতে গেল পাশ হয়েছে কি, না জানতে এসেছিলেন, ছোকরা পাশ হ'লে একটা ভালো কাজে লাগিয়ে দেবো বলেছিলাম কি, না তা যে dull!"

বিপিনবাবু কহিলেন "বটে, তা—আজ রাত্রে ওঁর ওখানে নিমন্ত্রণ টা কিসের তা তো বুঝতেই পারছি না, ছেলে পাশ হয়নি বলে মুখ তো তোলোহাঁড়ী করে বেরিয়ে গেলেন—

ঔদরিক ভামবাবু কহিলেন "তার সঙ্গে আর মেয়েতরর সম্পর্ক কি, হয় তো বউ-মা-টির কিছু বায়ু রোগ আছে তাই পাঁচজনকে খাইয়ে দিচ্ছেন, কপালের বাড়ীতে পাতপেড়ে লুচি মণ্ডা খাওয়া বড় আমোদের জিনিষ হে!"

এদিকে ডাক্তারবাবু বাসায় ফিরিয়া কম্পাউণ্ডারকে কহিলেন "হাঁ হে, ছোকরা সত্যিই বলেছে, পাশ হয়নি, ফেলই হয়েছে, তা ও আমার জানা কথা, তুমি যেমন কাঁচা লোক, কোথাকার কে একটা উড়ো খবর দিয়ে গেল, তা নিয়ে মত্ত হৈ, চৈ।

আমি তো বিশ্বাসই করতে চাই-নি, কেবল তোমারি পাল্লায় পড়ে— এ সুখলাল, আজী যাও, পাঁঠাটো সব আগা সাহেবকো কে ঘুরাব দেও, আউর ডেপুটা লেকে আঁটো, খি, সব ঘুরাও দেও কুছ কাম নাহী হ্যায়"

খাজুলী কম্পিত কলেবরে সব আদেশ শুনিয়া যাইতে লাগিলেন, দ্বিরুক্তি করিবার কিছুমাই নাই, সুখলাল কিন্তু সাহসে বুক বাঁধিয়া জোড়হাতে কহিল "আজী হাম সব চীজ ঘুরায় দি আওরে গা হুজুর, বাকী দেও ত কী নাম সে তো পাঁঠক লায়া, উহী পাঁঠক ঠো উন্‌কোই—

বাকী কথা উহ রহিয়া গেল, ডাক্তারবাবু ধমক দিয়া কহিলেন—"তুম্‌হার খুসী হোয় তুম ঐ পাঁঠক পীরবাবাকো নাম সে চড়ায় দেও হাম এইসা বুজ্‌রাক নাহী হ্যায় যে বুট্ মুট্ উন্ কো নাম সে পূজা চড়াও রেঙ্গে—পীরবাবা, পীরবাবা, কাম নহী দেখ্‌না, পূজা খানে ওয়ালা!"

বাক্য ব্যয় বৃথা এবং বলিয়া প্রভুর তিরস্কার খাইয়া পরিপাক শক্তির পরিচয় দেওয়া তত্তোধিক বৃথা বুঝিয়া সুখলাল তৎক্ষণাৎ আদেশ পালন করিতে চলিয়া গেল, গাঙ্গুলীও সঙ্গে চলিলেন।

৭

রাত্রি তখন সাড়ে আটটা, ডাক্তারবাবু বারেন্দায় বসিয়া ধূমপান করিতেছেন, গাঙ্গুলী সামনের ঘরে বসিয়া প্রয়োজনীয় রিপোর্ট লিখিতেছেন, সুখলাল মোটা কম্বল ঘাড়ে জড়াইয়া, ডাক্তারবাবুর আর এক ছিলিম তামাক সাজিবার আদেশের অপেক্ষায় এক পাশে বসিয়া ঢুলিবার উপক্রম করিতেছে, এই সময় বিপিনবাবু, মতিবাবু, শ্যামবাবু আসিয়া দেখা দিলেন, ডাক্তারবাবু "আসুন, আসুন" বলিয়া অভ্যর্থনা করিয়া সুখলালকে তামাক দিবার আদেশ করিলেন, গাঙ্গুলীর কিন্তু চমক হইল, যে আটা ঘি ফেরৎ দিবার সময় বাবুদের নিকট যাইয়া নিমন্ত্রণটা প্রত্যাহার করিয়া লওয়া হয় নাই, কি সর্ব্বনাশ, এখনি তো আরও চার পাঁচজন আসিয়া উপস্থিত হইবেন, দেখিতে দেখিতে সত্য সত্যই বাকী নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণ আসিয়া দেখা দিলেন, ডাক্তারবাবুরও তখন স্মরণ হইল যে দোকানে ঘি ময়দা ফেরৎ দিবার হুকুম জারীর সময় নিমন্ত্রণটা প্রত্যাহার করিবার কথা বলিয়া দেওয়া হয় নাই, আর কি রক্ষা আছে? তা তিনি না হয় পাঁচ জমাটের মানুষ, তাঁর না হয় সেটা ভুল হইয়া গিয়াছে। গাঙ্গুলীর তো সেটা শোধরাইয়া লওয়া উচিত ছিল, আর নিমন্ত্রিত ভদ্রলোকরাই বা কি, তাঁহাদের তো সেই আগের দিন নিমন্ত্রণ করিয়া রাখা হইয়াছে মাত্র, ইতিমধ্যে কতগুলা ঘণ্টা কাটিয়া গিয়াছে, তার ভিতর গৃহস্বামীর শারীরিক বা মানসিক অবস্থা খারাপ হওয়া তো কিছু বিচিত্র নয়, মানুষের রক্ত, মানুষেরই শরীর তো বটে, ভদ্রলোকদের উচিত ছিল খবর লওয়া যে তরকারী কুটিয়া, লুচীর কড়া, নিমন্ত্রণ কর্ত্তার গৃহে সত্য সত্যই চাপান হইল কি, না,—তা নয়, হুট্ করিয়া সব নিমন্ত্রণ খাইতে আসিয়া হাজির হইয়াছেন, কথায় বলে, "জীবনান্তে জীবন পাওয়া যায়, কিন্তু কলারাতে কলার মেলা দুর্ঘট" ইহারা সেই শ্রেণীর পেটুকের দল আর কি! রাগে ডাক্তারবাবুর সর্ব্বাঙ্গ 'রি, রি করিয়া জ্বলিয়া উঠিল, আর সঙ্গে সঙ্গে মাথা খুলিয়া গেল, তৎক্ষণাৎ কর্ত্তব্যবুদ্ধি প্রবোধিত হইয়া তিনি লাফ করিয়া উঠিয়া পড়িয়া অন্দর মহলে আসিয়া গাঙ্গুলীকে ডাকিলেন, সক্রোধে কহিলেন—"তোমাদের জ্বালায় আমার আর মান সম্ভ্রম—কিছু রইল না দেখ্‌চি, এখন উপায় কি ঠাওরাচ্ছ শুনি।"

গাঙ্গুলী হাত কচলাইতে কচলাইতে কহিলেন "আজ্ঞে আপনার হুকুম হলে কিষণ হালুয়াইএর দোকান থেকে এখুনি চট্ করে, গরম গরম লুচি ভাজিয়ে, বেগুন ভাজা আর আলুর দম আর কিছু পেড়া সন্দেশ—"

"এঁ্যা, বল কি, সে যে অনেক খরচ, প্রায় দশ বারো টাকা?" ডাক্তারবাবুর ললাটে অন্ধকার ছায়া ঘনাইয়া আসিল, অবশ্য সেটা আলোরই বিপরীত দিক্ কিন্তু উহারই পশ্চাতে যে দুশ্চিন্তার ছায়া নিবিড় হইয়া উঠিতেছে গাঙ্গুলী তাহা বুঝিতে ভুল করেন নাই, সুতরাং কহিলেন "তবে না হয় সের দুই মিষ্টি এনে শুধু—"

বিরক্তি ভরা কণ্ঠে ডাক্তারবাবু কহিলেন "তোমার বাপু পরামর্শ দিতে ডাকি নি, আমার মাথা ধরেছে, শুতে চল্লাম, তুমি বাবুদের বলো বাবুর শরীর খারাপ, তার ওপোর একটা দুর্ভাবনায় পড়েছেন, কাজেই খাবার দাবার জোগাড় করতে পারেন নি, বেশ বুঝিয়ে বলো বুঝলে, যেন কিছু মনে না করেন, ভদ্রলোকের ছেলে সব, মান খাতির রেখে কথা বোলো, বিনয় জানিয়ো, নইলে যে সহরে এখুনি ঢি, ঢি পড়ে যাবে, তিলকে তাল করা অভ্যাস তো দেশের লোকের আছেই "অতঃপর ডাক্তারবাবুর বহির্গমন হইতে প্রস্থান ও গাঙ্গুলীর প্রবেশ,—শরীর ও মন উভয়ই তাঁর কাঁপিতে সুরু হইয়াছিল, সেটা যে দারুণ শীতে নয়, তাহা আমরা বেশ জানি। বাবুরা ইতিমধ্যে ক্ষুধায় কাতর হইয়া বিগুণ শীত অনুভব করিতেছেন, কথাবার্ত্তার মধ্যে সবারই কাণ দুটি "পাত হয়েছে গা তুলুন" এই ভূমিষ্ঠ ভাকটুকু শুনিবার জন্য উন্মুখ হইয়া আছে, গাঙ্গুলীকে দেখিয়া আগে ভাগেই তাঁহারা আহার স্থানে যাইবার জন্য উঠিয়া দাঁড়াইলেন, কিন্তু গাঙ্গুলী এ কি বলিতেছেন, "মহাশয়গণ, মাপ করবেন, ডাক্তারবাবু হঠাৎ শরীর খারাপ হওয়ায় আপনাদের আর বলা হয় নি যে আজ নিমন্ত্রণ বন্ধ রইল। আপনাদের অনর্থক কষ্ট দেওয়া হলো মাপ করবেন। বুঝতেন কি, না—" ভবেশবাবু বলিয়া উঠিলেন "আজ্ঞে আর বলবেন না, বুঝতে পেরেছি, ওহে ওঠো সব, আর ভদ্রলোককে লজ্জা দিয়ো না, দোকান ঘরের কাঁস চেলতে হবে বোধহয়"

বাবুর দল উঠিয়া পড়িলেন, গেটের বাহিরে আসিয়া হেম-বাবু চীৎকার করিয়া উঠিলেন "বেশ খাওয়া হোল বাবা বিপিনবাবু কহিলেন "বামুন মশাই, করেন কি, পাহারাওলা যাতাল মনে করবে যে, চলুন সব পা চালিয়ে, দোকান বন্ধ হলেই সর্ব্বনাশ, সিন্নীরা রক্ষে রাখবেন না।"

যাহা ভয় করা গেল, তাহাই হইল, দোকান দশটা বাজিতেই বন্ধ হইয়া গিয়াছে। অতঃপর বাবুরা দুর্গা নাম জপ করিতে করিতে নিজ নিজ বাড়ীতে উপস্থিত হইলেন, কাহারও স্ত্রী আহারান্তে শিশুকে দুধ খাওয়াইতে-ছিলেন স্বামীকে দেখিয়া বলিলেন "খুব শীগগীর ফিরলে তো, কেমন খাওয়ালে?"

"বেশ খাইয়েছে,ঘরে চাট্টি মুড়ি চিঁড়ে কিছু আছে কি?"

কাহারও স্ত্রী আহারান্তে সবে উঠিয়া মুখশুদ্ধি লইতে-ছেন, স্বামী আসিয়া কহিলেন, "হাতীতে চাট্টি আছে না কি, অন্ততঃ তোমার পাতের প্রসাদ?"

স্ত্রী সচকিতে কহিল "ওমা সেকি খেয়ার কথা গো, কোনদিনী নেমন্তন্ন খেতে গেছ্‌লে শুনি" ইতিমধ্যে সদ্য নিদ্রাভঙ্গে খোকা উঠিয়া কান্না জুড়িল "বাবা, তুমি আমায় কেন ছন্দেশ খেতে নিয়ে গেলে না, আমি ছন্দেশ খাবো।"

বাঙ্গালীর ভবিষ্যৎ

(শ্রীরমেশ বসু, এম-এ।)

বাঙ্গালী আজ বর্ত্তমানের ভাবনায় অস্থির। বর্ত্তমান সময়ের সমস্যাগুলি তাহার আহার বিহার ও চিন্তাকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিয়াছে। সৌভাগ্যক্রমে জাতীয় জীবনের সমস্ত দিক দিয়া একটা বিপুল আশা ও আয়োজনের সূত্রপাত হইয়াছে। চারিদিকে নৈরাশ্যান্ধকারের মধ্যেও বাঙ্গালীকে ভবিষ্যতের জন্য প্রস্তুত হইতে হইতেছে। দেশে একটা আত্মজাগরণের ভাব দেখা যাইতেছে। ইহা দেখিয়াই আজ নিরন্ন ও অভাবের দুঃখও বাঙ্গালী সহিয়া যাইতেছে।

বর্ত্তমানের প্রচেষ্টা ও প্রতিষ্ঠানগুলিকে যদি আমরা সুনিয়ন্ত্রিত করিতে পারি তবেই আমাদের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল হইবে, নতুবা আমাদের অন্ধকার আর ঘুচিবে না। আমা-দের বর্ত্তমানে যেমন মেল ভবিষ্যৎ ও তেমনি হইবে, অথবা, কে জানে, আরও অন্ধকার হইতে পারে।

ভবিষ্যৎকে ফলপ্রসূ করিতে হইলে বর্ত্তমানেই তাহার বীজ বপন করিতে হইবে। সাহিত্য দ্বারা নাটক দ্বারা, চিত্র দ্বারা, চিন্তা দ্বারা, বিজ্ঞান দ্বারা, বাণিজ্য দ্বারা, শিক্ষা দ্বারা এবং সর্ব্বোপরি জীবন ও অনশন কর্ম্মদ্বারা ভবিষ্যৎকে গঠিত করিতে হইবে। আর ইহা না পারিলে, অশিক্ষা, কুশিক্ষা, অনাহার, কদাহার, চির রোগ ও চির অশান্তি বাঙ্গালীর জীবনকে মানুষের অযোগ্য করিয়া তুলিবে। তখন আমাদের মনে হইবে—"রেখেছে বাঙ্গালী করে, মানুষ করনি।"

দেশের ভবিষ্যতের কথা ভাবিতে গেলে ভবিষ্যতের যাহারা আশাস্থল তাহাদের কথাই প্রথমতঃ মনে আসে। একদিকে দীর্ঘকায় পঞ্চবেদ, ক্ষীণদৃষ্টি, ভগ্নস্বাস্থ্য ও অন্যদিকে ম্যালেরিয়া বাহন, স্ফীতোদর, অথবা মাংসপিণ্ড যুবকদের দ্বারা কি আশা করা যায়? স্বাস্থ্য, সবলতা, সুচিন্তা, সুশান্ত ও জীবনের অধিকারী না হইলে এই যুবকবৃন্দ ভবিষ্যতে দেশের কি করিতে পারিবে?

"স্বদেশী" সময়ের বাঙ্গালী যদি সুযোগ্য নায়কের দ্বারা পরিচালিত হইত তবে আজ বাঙ্গালী কৃষি, শিল্প, ও বাণিজ্যক্ষেত্রে পশ্চাৎপদ থাকিত না, অন্নকষ্ট তাহার জীবনকে তিক্ত-বিষাক্ত করিতে পারিত না। সে যুগ এখন অতীতের গর্ভে লীন হইয়াছে। আমাদের অদূরবর্ত্তী ভবিষ্যৎ যেন আবার সেইরূপ চালকের অভাবেও অথবা ক্ষিপ্রকারিতার বিনষ্ট হয়। অতীতের বিফলতা যেন আমাদিগকে বর্ত্তমানে সজাগ করিয়া দেয়, তাহা হইলে আমরা অতন্দ্রিত চেষ্টা দ্বারা ভবিষ্যতের গৌরব-সৌধ গড়িয়া তুলিতে পারিব।

অনেকে মনে করেন, আগামী যুগে বাঙ্গালী আবার সেকালের বাঙ্গালীর মত জীবন যাপন করিবে, অথবা সেইরূপ করাই উচিত। কিন্তু ব্যক্তিবিশেষের ন্যায় সমাজ-জীবনেও ক্রমশঃ নানা পরিবর্ত্তন আসে—কালে ইহাদিগকে আর পরিহার করা যায় না, তাহারা ক্রমে স্থায়ী হইয়া জাতীয়-চরিত্রে পরিণত হয়। ইংরেজী শিক্ষা ও সভ্যতার সংস্পর্শে আসিয়া বাঙ্গালীর জাতীয় জীবনেও অনেক পরিবর্ত্তন হইয়াছে—এবং কতকগুলি পরিবর্ত্তন স্থায়ী হইবেই। তবে এতদিন পর্য্যন্ত বাঙ্গালী পাশ্চাত্য সভ্যতার বাহির দেখিয়াই বিমুগ্ধ ছিল, এখন সে উহার মধ্যে প্রবেশ করিতে শিখিতেছে। এতদিন সে সাহিত্য, বিজ্ঞান, ইতিহাস, বাণিজ্য প্রভৃতির বিরাটত্ব শুধু বাহির হইতে দেখিয়াছে—কিন্তু উহাকে নিজের করিতে পারে নাই। আজ বাঙ্গালীর আত্মজাগরণের অভাবে চারিদিকে আপ-

নূতন শক্তি উদ্বুদ্ধ করিয়া তুলিবার জন্য ব্যগ্র হইয়াছে।

এই যে বাণ ডাকিয়াছে, ইহা যেন বৃথা না চলিয়া যায়। জাতীয় জীবন তরী যাঁহারা বাহিয়া লইয়া যাইবেন, এই তাঁহাদের মহাসুযোগ। এ সুযোগ বার বার আসে না। ভারতবর্ষে ইংরেজ শাসনের ইতিহাসে ইহাই বাঙ্গালীর দ্বিতীয় জাগরণ। ইহা যেন কর্ম্মী ও নায়কের অভাবে পুনরায় বিনষ্ট না হয়। আজ যেন আমরা শত দুঃখ ও দারিদ্র্যের ভিতরে ডুবিয়া থাকিয়াও ভবিষ্যৎকে মঙ্গলময় করিতে পারি। এবার অসাবধান হইলে আর আমরা শীঘ্র উঠিতে পারিব না।

ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশ আজ শিক্ষা ও বাণিজ্য জাগিয়া উঠিতেছে। বাঙ্গালী চিরকাল মস্তিষ্কের বড়াই করে। কিন্তু বর্ত্তমানের কার্য্যকলাপ দ্বারাই তাহার মস্তিষ্কের পরিচয় পাওয়া যাইবে। যদি সে জীবন যুদ্ধে বাঁচিয়া থাকিবার উপায় ও আয়োজন করিতে পারে ও সঙ্গে সঙ্গে অন্যকে চালাইতে পারে, তবেই সে তাহার চিরকালের সম্মান বজায় রাখিতে পারিবে। আর না পারিলে এই জীবন-অভিযানে সে ক্রমশঃ পঞ্জাব, মহারাষ্ট্র ও মাদ্রাজ হইতে পিছাইয়া পড়িবে।

হে ভারত ভাগ্যবিধাতা! তুমি বাঙ্গালীর শরীরে স্বাস্থ্য ও শক্তি, মনে সাহস ও বীর্য্য প্রেরণ কর। বাঙ্গালী যেন ভবিষ্যতেও তাহার আসন অটল রাখিতে পারে। চারিদিকে সংগ্রামের মধ্যেও যেন অর্থ ও সামর্থ্যে বরণীয় হইতে পারে ভারতের প্রদেশে প্রদেশে বাঙ্গালী প্রথম পতাকা বহন করিয়াছিল, তাহার চেষ্টায় সকল প্রদেশ আজ জাগিয়া উঠিতেছে—আজ যেন তাহাদের সঙ্গে বাঙ্গালীর ভবিষ্যৎ মহান্ হইয়া উঠে! আজও যেন বাঙ্গালী পতাকা বহন করিতে পারে এবং কর্ম্ম দ্বারা বলিবার অধিকার লাভ করে যে—"তব পতাকা যারে দাও, তারে বহিবারে দাও শকতি।"

রে——

কর্ণ

(শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়)

উদার আকাশতলে একদা সন্ধ্যায়
অন্ধকার জনশূন্য নদী সিকতায়
হয়েছিল অন্ধকার তব। জননীর
খেয়ালে অথবা মোহে লভিয়া শরীর
রমণীর মূঢ়তারে মূর্ত্তিমন্ত করি
জন্মিলে মহীতে, কর্ণ, শিশুরূপ ধরি।
গুপ্ত ঘাতকের দেহে রক্তচিহ্ন যথা,
চোরের কপাল, মা'র নিদারুণ ব্যথা,
রমণীর আত্মঘাতী ভ্রূণ, আমরণ
কলঙ্কের ডালি, সরমের নিদর্শন,
চরম অধর্ম্মগ্লানি, চির উপহাস—
তোমারে তাদারে দিয়ে করিল বিনাশ।
হয়ত বা বেজেছিল তব প্রসূতির
প্রাণে ব্যথা, কিন্তু তাহা এমনি অস্থির—
কাটিতে পারে নি দাগ, পারে নি রাখিতে
পুত্র-বিসর্জ্জন-চিহ্ন জননীর চিতে,
লজ্জায় ভ্রূণের কোড। জননী করিল
বড়—ভুলে, মাতৃস্নেহ ভাসিয়া চলিল।
আজীবন মাতৃস্নেহ বক্ষ প্রবঞ্চিত
হে দুর্ভাগ্য, অভিশপ্ত বিধাতৃ লাঞ্ছিত,
জগতের স্বর্গভ্রষ্ট,—প্রথম মানব
লভে মাতৃস্তন্য সনে বিপুল বৈভব
স্নেহ, স্নেহ প্রেমরূপে—জন্মারম্ভ হ'তে
হারায়েছ তুমি তাহা। কভু কোন মতে
হয় নি সৌভাগ্য তব সারাটি জীবনে
যে সুধা-আস্বাদ, তাহা বুঝিবে কেমনে?
সূত-দম্পতির স্নেহ সে শুধু করুণা—
নহে তাহা পিতৃ মাতৃ স্নেহের বরুণা।
অপুত্রক তারা—অতৃপ্ত স্নেহের সুধা
পালিয়া তোমারে মাত্র এক কণা তথা
পেয়েছিল চিত্তের [illegible] আচম্বিতে
বিনায়াসে কুড়াইয়া পেয়ে আকস্মিতে
বিস্ময় মানিয়াছিল অধিক তাহারা
পুলক হইতে। সুখ কোথা সুখ ছাড়া?
যে সুখের মূলে নাই ভয় ও ভাবনা
অহরহ আশঙ্কা ও অতৃপ্তি কামনা—
ভাগ্য, দৈব, যাহা বল—নহে তাহা সুখ।
সুখ—যার তরে নহি কারেমনে দুখ।
রাধা তোমা ধরে নাই গর্ভ অর্গে কভু
অজ্ঞাত অপরিচিত তুমি, নারী তবু
শরীরের মর্য্যাদার রাখিতে সম্মান
করিল স্নেহের সেবা অধীন অম্লান।
অনন্ত রাধার স্নেহ দেহে বটে বহ'
প্রকৃতির শিশু তুমি মানবের নহ'।'
শিখিলে আচার্য্য পাশে বহুদিন ধরে'
যুদ্ধ বিদ্যা। বীর নামে বীরের ভিতর
অগ্রগণ্য হলে। তাহে ভ্রাতৃদ্রোহী তুমি।
ধর্ম্মদ্রোহী—অধর্ম্মের পদরেণু চুমি।
কিন্তু তুমি দাতা নামে লভেছ' যে খ্যাতি
অতিথি সেবার তরে, ওরে পুত্র-ঘাতি,
নিজ হাতে আপনার আত্মজে বধিয়া—
সে খ্যাতির হেতু আমি পাই না খুঁজিয়া।
এই পুত্র-হত্যা কার্য্য পুণ্য যদি হয়
জগতে অধর্ম্ম তবে আর কা'রে কয়?
বিশ্বের সমগ্র পিতা যে কাহিনী স্মরি
আতঙ্কে কাঁপিয়া উঠে চমকি শিহরি,
পিতা হয়ে সে কার্য্য যে সাধিবারে পারে
পিশাচ, পশুরো হেয়, সে সৃষ্টি মাঝারে।
সর্প ব্যাঘ্র কুম্ভীর রাক্ষস আপনার
আত্মজের তরে নিজ প্রাণ করে ছার—
কিন্তু তুমি জ্ঞানী বীর, করিলে কেমনে
এত বড় হত্যাকাণ্ড ক্ষোভ-হীন মনে?
যে অতিথি দেছিল তব পুত্রশির
অতিথি-সৎকারে—পাচিতে যজ্ঞসি বীর
ধরণীতে দেহচ্যুত স্খলিত সে মাথা,
রচিতাম তবে আজি তব তব গাথা।
যে পুত্র জীবন রাজ্য সর্ব্বস্ব অধিক
প্রিয়তম, সারা প্রাণ সদা অনিমিখ

"মোহন মুরলীধারী।"

Lakshmibilas Press, Calcutta.

পূজা আসিয়া পড়িয়াছে। বাংলা দেশের ঘরে বাইরে আজ কত আনন্দ উৎসব। ঘরে যাহারা রহিয়াছেন তাঁহারা দূর প্রবাসী প্রিয়জনের আগমনের আশায় নিত্য প্রভাতে একটি দিনকে সংক্ষেপ করিয়া ফেলিয়া প্রিয়-জনের আগমন দিনকে নিকটে আনিয়া ফেলিতেছেন। দূরে প্রবাসে যাঁহারা রহিয়াছেন তাহারাও এমনি ভাবে উদ্‌গ্রীব আকাঙ্ক্ষাভরা চিত্তে ছুটির দিনটিকে বন্দনা করিতেছেন। কতদিন পরে—এই ছুটির সময় পিতা মাতা, স্বামী স্ত্রী, ভ্রাতা ভগিনী, পুত্র কন্যা বন্ধু বান্ধব আত্মীয় স্বজনের সঙ্গে সাক্ষাৎ হইবে—এ ছুটি আনন্দে বরণ করিয়া লইবার মত ছুটি বটে।

• • • •

দেশের যে কয়েকজন পয়সাওয়ালা বড় বড় লোক আছেন তাহারা কেহ এই পূজার ছুটীতে কোন শৈল শিখরে সমুদ্র তীরে কিম্বা কোন বিশেষস্বাস্থ্যকর স্থানে ভ্রমণে যাইতেছেন, যাহাদের পয়সার অভাবে তেমন স্বাস্থ্যকর স্থানে যাইবার সামর্থ নাই তাহারা কার্যাস্থান হইতে নানা ব্যাধিগ্রস্ত পল্লীর অস্বাস্থ্যের মধ্যে গিয়া পড়িয়া স্বজন বান্ধবদের সহিত সাক্ষাতের আনন্দ মিটাইতেছেন।

• • • •

পূজার ছুটীর আনন্দটা এখনও তবু এদেশে আছে. কিন্তু শক্তিরূপিনী শারদলক্ষ্মী মহামায়াকে বরণ করিয়া লইবার, তাঁহার সেই বিচিত্র রূপ প্রাণে ধ্যান করিবার শক্তি দেশবাসী যেন হারাইয়া ফেলিয়াছে। যে যুগ যুগান্ত ধ্যানে রাজা সুরথের প্রাণ হইতে চামুণ্ডারূপিনী চণ্ডীর চণ্ডীত্ব দমুখিত হইয়াছিল—যে পুরুষ প্রধান শ্রীভগবানের অংশ স্বরূপ শ্রীরামচন্দ্র মহামায়ার আবাহনে—তাঁহার প্রজার জন্য—নীলোৎপল সদৃশ নিজ নয়ন বিসর্জ্জন দিতে উদ্যত হইয়াছিলেন তেমনভাবে লোকপালিনী জগজ্জননী মহামায়াকে আরাধনা করিবার, পূজা দিবার সামর্থ্যদেশ-বাসী হারাইয়া ফেলিয়াছে। আজ সে ভাবের শক্তি সাধনা দেশের পক্ষে স্বপনের সমান মনে হয়। দেশবাসী যেন শারদলক্ষ্মীকে বরণ করিবার সময়—এভাবে যে শক্তি-ময়ীকে সাধনা করিয়া হৃদয় মন্দিরে বরণ করিতে হয় তাহা একেবারে ভুলিয়া গিয়াছে।

• • • •

শরতের শুভ্র প্রভাতে সপ্তমীর আবাহন বাদ্য যখন বাজিয়া উঠে—সেই বাদ্য,—দেবীর সেই হাসি ভরা মুখের উল্লসিত দৃষ্টি—কমলা ও বিনাপানির সেই শ্রী ও জ্ঞান বিজ্ঞানের স্ফূর্তি, কার্ত্তিক ও গণেশের নির্লিপ্ত সন্ন্যাস ও জ্ঞানের সঙ্গে অপূর্ব্ব যুদ্ধশক্তি—জগজ্জননী মাতার অসুরে পদস্থাপন করিয়া বক্ষে তাহার বর্শা বিদ্ধ করণ—পশুরাজবাহিনী মাতার সেই শান্ত ও উগ্র স্নিগ্ধ কোমল—অথচ ভীষণ রসের রূপ দেখিবার আশায় দেশবাসী কত।

প্রাণভরা আশা আকাঙ্ক্ষা লইয়া সারাটি বরষ কাটা-ইত—অপেক্ষায় যে প্রাণভরা আশা—সে ব্যাকুল তীব্র আকাঙ্ক্ষার অনন্ত বেদনা ও উল্লাস আজ যেন আর দেশ-বাসীর মনে নাই।

• • • •

কর্ম্ম ও জ্ঞান, প্রীতি ও কর্ত্তব্য, স্নেহ ও নির্ম্মমতা এ সকলের সামঞ্জস্য বিধান করিয়াই সংসারে বাস করিতে হয়। এ সকলের সামঞ্জস্য বিধানে শৈথিল্য করিলে মানুষ মানুষ নামের অযোগ্য হইয়া পড়ে। মানুষের উৎসাহ লোপ পায়, তাহার কর্ম্মক্ষমতা থাকে না। সে অবশ পঙ্গু হইয়া পড়ে।

• • • •

আজ দেশের ধনী দরিদ্র সকলের ঘরে ঘরে আর মাতৃপূজার মঙ্গল শঙ্খ তেমন করিয়া আগের মত বাজিয়া উঠে না। যে প্রাণের ভক্তি ও প্রীতিতে আগে মায়ের পূজা সহজসাধ্য হইত এখন আর তেমনটি হয় না। এখন দেশের অনেক গৃহেই মায়ের পূজা নাই,—পূজার ব্যয় বহন করিবার শক্তি দেশবাসীর নাই। যে দেশবাসী নিজেরা অনাহারে না থাকিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইতেছে—যে দেশবাসী পরণের কাপড় অভাবে অর্দ্ধোলঙ্গ ও উলঙ্গ অবস্থায় দিন কাটাইতেছে সে দেশবাসী মাতৃপূজার খরচ বহন করিবে কোথা হইতে? যাহাদের সামর্থ আছে যাহারা সক্ষম মায়ের পূজা তাহাদের নিকটও একটা বিপুল আনন্দের কারণ না হইয়া দায় স্বরূপ তার স্বরূপ গণ্য হইতেছে। না করিলে নয়—বহুদিন হইতে চলিয়া আসিতেছে তাই বংশের চলিত প্রথা রক্ষার জন্য না করিলে নয় এই ভাবে তাঁরা দায় রক্ষা করিতেছেন, নিজের নিজের জীবন রক্ষা করাই যে দেশে পরম দায় বলিয়া গণ্য হইয়া উঠিয়াছে সে দেশে মাকে আবাহন করিয়া লইয়া তাহার পূজা দায় বলিয়া গণ্য হইবে, একটা উপরন্তু ভার বলিয়া বিবেচিত হইবে ইহাতে আশ্চর্য্য হইবার কি আছে?

• • • • • •

আনন্দময়ীর আগমনে দেশ কি লইয়া আনন্দ করিবে? দেশে স্বাস্থ্য নাই।—নানা রোগে ভুগিয়া দেশের লোক নিত্য অকালে কালগ্রাসে পতিত হইতেছে। ঘরে ঘরে ব্যাধি পীড়ার উপদ্রব আছেই। তাহার উপর দেশের অধিকাংশ অধিবাসীই নিরন্ন, ঘরে অন্ন নাই—কেহ একবেলা খাইয়া—কেহ সমস্ত দিন উপবাসী রহিয়া দিন কাটাইতেছে। ক্ষুধার তাড়না দেশের কোন কোন সংসারে এমন ভীষণ বীভৎস মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে যে স্বামী স্ত্রী পুত্র কন্যাদের জীবন্ত অবস্থায় নাশ করিয়া আপনারাও আত্মঘাতী হইয়া ক্ষুধা রাক্ষসীর কবল হইতে নিষ্কৃতি পাইতেছে। কন্যাদায় পিতামাতার রক্ত শোষণ করিতেছে। আরও সহস্র দায়ে দেশবাসী বিব্রত অধীর হইয়া নিজেদের জীবন বিসর্জ্জন দিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠিয়াছে। এ অবস্থায় এই সহস্র অশান্তির মধ্যে শান্তি ও আনন্দ আসিবে কোথা হইতে! ইহা আসিতে পারে না—ইহা অসম্ভব!

• • • •

এই অসম্ভবকে আজ এ দেশবাসীর সম্ভব করিতে হইবে। হারানো সুপ্ত আনন্দকে আবার প্রাণ দিতে হইবে। অগজ্জয়ী বীরশ্রেষ্ঠ নেপোলিয়ানের ভাষায় জগতে অসম্ভব বলিয়া কোন জিনিস নাই—এই কথায় আজ আবার দেশবাসীকে প্রাণের ক্ষমতা লইয়া অগ্রসর হইতে হইবে। এই ক্ষমতাকে জাগাইবার জন্যই, এই ক্ষমতাকে বিকশিত করিবার জন্যই ভারতে যুগাবতার মহাত্মার আবির্ভাব! একমাত্র মহাত্মারই বোধহয় এ প্রাণহীন দেশে প্রাণশক্তি জাগাইবার ক্ষমতা ও ধৈর্য্য ছিল। আজ দেশে আর তেমন লোক দেখা যাইতেছে না—আসমুদ্র হিমাচল নিখিল ভারতে যিনি এমনভাবে দেশ শক্তি উদ্বুদ্ধ করিতে পারেন। আজ জগৎপূজ্য সেই মহাত্মা ভারতে কারারুদ্ধ রহিয়াছেন—ভারতের, ভারতবাসীর অবনমিত—হেট লজ্জিতমুখ আরও কলঙ্ক মাখা হইয়া পড়িয়াছে—ভারত—ভারতবাসী কি করিয়া আনন্দ করিবে?

• • • •

শারদ প্রভাতে শরৎ লক্ষ্মীর আগমনে দেশ আনন্দ করিবে—দেশে আনন্দের উৎসব বহিয়া যাইবে!—সত্য কথা—একদিন বোধ হয় এই সুফলা সুফলা শস্য শ্যামলা দেশে তাহাই যাইত—আনন্দের উৎস প্রবাহ বোধ হয় এদেশে অব্যাহত ছিল,—এই দেশই বুঝি চির আনন্দের রাজ্য ছিল। কিন্তু অন্ন প্রথা দেশ ছাড়িয়া পালায় নাই বটে—জীবন্মৃত অবস্থায় প্রথার কাঠামো এখনও দেশে বিরাজমান বটে,—কিন্তু প্রথাতে প্রাণ সঞ্চার করিবার মত প্রাণ ও শক্তি আর এ দেশবাসীর নাই। প্রথাতে প্রাণ দিয়া সেই প্রথায় দেশবাসীকে চকিত উদ্বুদ্ধ করিবার মত ক্ষমতা বুঝি আর দেশবাসীর নাই। কর্ম্ম ভুলিয়া—কর্ম্মকে কর্ম্মনাশার জলে জলাঞ্জলি দিয়া আধ্যাত্ম সাধনার ফাঁকা চালে যাঁহারা ভারতের বৈশিষ্ট দেখাইবার জন্য ব্যগ্র ও নিজেরা কর্ম্মক্ষেত্রের সহন-বেদনা হইতে নিষ্কৃতি পাইবার অভিলাষী তাঁহারা এক ভাবে মোক্ষ লাভ করিতে পারেন বটে—কিন্তু সে মোক্ষ-সাধনায় দেশবাসীকে জড়াইয়া দেশকে আরও পঙ্গু করিয়া ফেলিয়া লাভ নাই।

• • •

আজ শারদলক্ষ্মীর আগমনে দেশবাসীর শুধু একটি দিক্ দিয়া আনন্দ করিবার অধিকার এখনও আছে। সে হইতেছে শক্তিময়ীর বিরাট প্রচণ্ড শক্তির ধ্যান ও সেই শক্তির অধিকারী হইবার ঐকান্তিক একাগ্র কামনা, আর কর্ম্ম বিমুখতা ও কর্ম্ম অবসাদ সবলে ঝাড়িয়া ফেলিয়া দিয়া কর্ম্ম পথে চলিবার অদ্ভুত সাহস সাধনা। ইহা ব্যতীত খতাইয়া দেখিতে গেলে দেশবাসীর আনন্দ করিবার উল্লাস করিবার আর কোন কারণ দেখা যায় না। সত্য তেমন কোন আনন্দ দেশবাসীর প্রাণে নাই।

• • • •

তবে কি দেশবাসী চিরকাল এমন আনন্দ হীন, এমনি জীবন্মৃতই থাকিবে? আনন্দময়ী যিনি স্মরণাতীতকাল হইতে দেশে আনন্দের প্লাবন বহাইয়া আসিয়াছেন তাঁহার আগমনেও দেশ এমনি নিরানন্দ রহিবে! এদেশের আনন্দ করিবার মত অবস্থা ও শক্তি কি কোন দিনই আসিবে না?

• • • •

পূজার সময় দেশবাসীর দায় যে শুধু মাত্র ঐ মাড় আবাহনের দিকেই তাহা নহে। ইহা ব্যতীত আরও নানাদিক হইতেই নানাদায়ে দেশবাসী বিব্রত হইয়া উঠে। বহুকাল হইতেই দেশে চলিত প্রথা আছে—পূজার সময় লোকে নূতন কাপড় নূতন পোষাক পরিয়া থাকে। পরিবারের উপার্জ্জনক্ষম যাহারা এ সব জিনিস জোগাইবার ভার তাহাদের উপরেই পড়ে। অথচ উপার্জ্জনের মাত্রা দেশের অধিকাংশ অধিবাসীরই এখন যাহা দাঁড়াইয়াছে তাহাতে কোন ক্রমে মোটা ভাত মোটা কাপড়ের সংস্থান ভিন্ন অপর কিছু করিবার দরকার হইলেই তাহাদের অপরের নিকট হাত পাতিতে হয়—কিছু ধার করিতে হয়। কিন্তু ধার আজ কাল মেলে না। অথচ চিরচলিত প্রথা পূজায় এ সমস্ত জিনিস দিতে হইবেই—তাই এও পূজার একটা দায়, এবং অত্যন্ত বড় এবং সাঘাতিক দায়!

• • • •

পূজার বাজারে অনেকেই এই দায় মিটাইবার জন্য অনেক রকম জিনিস কিনিয়া লইয়া যাইবে। আত্মীয় স্বজন ও প্রিয়জনের হাতে তাহাদের প্রিয় জিনিসগুলি তুলিয়া দিয়া তাহাদের হাসিমুখ দেখিয়া দায়-দৈন্যের কথা

ক্ষণতরে বিস্মৃত হইয়া সুখের সাগরে ভাসিবে। দেশবাসীর এই পূজার দায় মিটাইবার জন্য বাংলার রাজধানী কলিকাতা সহরে পূজার বাজারে বহু প্রকার বিদেশী পণ্যের আমদানী হইয়াছে। নানা রকম খুঁটি নাটি জিনিস হইতে কাপড় চোপড়, জামা,. জ্যাকেট—সাবান, তেল, রুমাল প্রভৃতি বহু বিদেশী জিনিস কলিকাতার বাজার ছাইয়া ফেলিয়াছে। বাংলা দেশের অধিবাসী বাঙ্গালীরা বিদেশী পণ্যে তাহাদের দোকানগুলি রং-চংএ করিয়া সাজাইয়া দেশীয় খরিদ্দারগণের মনোহরণ করিতেছে। দলে দলে বাঙ্গালী খরিদ্দারেরা দোকানে ঢুকিয়া সেই বিদেশী মালগুলি অর্থ ও অমূল্য সম্মান ও মনুষ্যত্ব বিনিময়ে ক্রয় করিয়া দোকান হইতে চুপি চুপি অপরাধীর মত বাহির হইয়া আসিতেছে। মনে শঙ্কা ভয় কে কোথা হইতে এই বিদেশী মাল কিনিতে দেখিবে—তাই তাড়া-তাড়ি পলায়ন চেষ্টা!

* * * * *

মহাত্মা গান্ধীর অ-সহযোগ আন্দোলনের প্রথম ও প্রধান প্রস্তাব ছিল দেশবাসী বিদেশী বস্ত্র বর্জ্জন করিবে। স্বদেশে—প্রস্তুত হাতে বোনা খদ্দর ব্যবহার করিবে। সে কথা—সে প্রতিজ্ঞা,—দেশ জাগরণের সেই পরম প্রস্তাব আমরা এমন লজ্জিত অধমের মতই রক্ষা করিতেছি বটে! এ ধর্ম্ম কার্য্যে মায়ের আবাহনে মাতৃপূজার সম্মান রক্ষার্থ নয়, নিজেদের লাঞ্ছিত বিধ-দগ্ধ জীবনের অভাব ও দায় মিটাইবার জন্যই আমরা দেশের কলঙ্কিত অধম মায়ের উপর আরও কলঙ্কের গ্লানি ছাপ অনুলেপন করিয়া যাইতেছি।

* * * *

নিখিল ভারত আইন অমান্য তদন্ত সমিতি ও খিলাফৎ অনুসন্ধান সমিতির তদন্তের কোন ফলাফল আজ পর্য্যন্ত সাধারণ্যে প্রকাশিত হইল না। দেশের কার্য্যগতি কোন পথে পরিচালিত হইবে দেশ মহাত্মা প্রবর্ত্তিত অহিংস অ-সহযোগ নীতি অনুসরণ করিয়া চলিবে না এ নীতি দেশবাসী চালাইতে অক্ষম বলিয়া সময়োপযোগী অপর কোন নীতি দেশে প্রবর্ত্তিত হইবে এই সব অনুসন্ধান সমিতির মূল কার্য্য ভার বোধ হয় ইহাই। এই উভয় সমিতিরই কার্য্য কলাপ শেষ হইয়াছে—বিভিন্ন প্রদেশের লোক মত গ্রহণ ও সাক্ষ্য গ্রহণ ও হইয়াছে। তবে তদন্ত সমিতির রিপোর্ট বাহির হইতে বিলম্ব হইতেছে কেন? বোধ হয় তদন্ত সমিতির সভ্যগণ সকলে একমত হইতে পারেন নাই। জাতীয় কার্য্যে এবং দেশের কার্য্যে একমন এক প্রাণ হওয়াই ভাল—মতামত ও সমবেত নেতৃ বৃন্দের একরূপ হওয়াই ভাল। যদি এমন গুরুতর কিছু থাকে যাহাতে সমবেত সভ্য-বৃন্দের একমত হওয়া অসম্ভব তবে এমন গুরুতর মতভেদ কেন হইল তাহা দেশের লোকে জানিতে ইচ্ছা করিতে পারে এবং এ ইচ্ছা হওয়া স্বাভাবিক। বিভিন্ন দেশের প্রতিনিধিবৃন্দ অনুসন্ধান সমিতির সভ্যগণের সম্মুখে কি সাক্ষ্য দিলেন তাহা জানিতে পারিলেও জাতি তবু কতকটা বুঝিতে সক্ষম হইবে যে এই আন্দোলনের ফলে আজ তাহার কতটা দূর অগ্রসর হইতে পারিয়াছে। দেশের সমগ্র অধিবাসী একটা অদম্যনীয় আকাঙ্খার প্রেরণে চলিতে চলিতে হঠাৎ এমন একটা জায়গায় বাধা পাইয়া থমকিয়া দাঁড়াইয়া পড়িয়াছে—যে বন্ধ বায়ুতে শ্বাস রোধ হইয়া তাহাদের প্রাণ বাহির হইবার উপক্রম হইয়াছে। তাই এ সময়ে এত বড় একটা বিরাট দেশের অগণিত অধিবাসী-বৃন্দের চালাইবার ভার গ্রহণ করিয়া যাঁহারা কর্ম্মক্ষেত্রে চালন নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়াছেন তাঁহাদের ইহা কর্ত্তব্য নহে যে, এমন প্রয়োজনীয় জিনিস বাহির করিতে তাঁহারা এমন অযথা বিলম্ব ঘটাইবেন।

আকালী শিখদিগের সহিত পাঞ্জাব গবর্ণমেণ্টের গুরদোয়ারের অধিকার লইয়া যে দ্বন্দ্ব চলিতেছে তাহা ক্রমেই ভীষণাকার ধারণ করিয়াছে। গুরুতলবের গুরু-কা-বাগের অধিকারী কয়েকজন আকালী তথা হইতে জ্বালানীর জন্য কয়েকটি গাছ কাটে। গুরু-কা-বাগ যদিও আকালীদের অধিকারে ছিল কিন্তু গাছগুলি ছিল তথাকার মোহান্তের অধিকারে—তারপর বোধ হয় মোহান্তের ইচ্ছানুসারেই শিখদিগকে আইনের দ্বারে পেশ করা হয়—বিচারে চুরির অপরাধে আকালীদের ভীষণ দণ্ড হয়। এই সামান্য ঘটনা হইতেই এই মহা উত্তেজনা ও অত্যাচার। শিখেরা তখন বলিতে লাগিল গুরু-কা-বাগের গাছগুলি ও তাহাদেরই অধিকারের। দলে দলে আকালী শিখেরা তাহাদের বাগানে গাছগুলির অধিকার রক্ষা করিতে মন্দিরের পথে চলিল,—এদিকে সরকারী কর্ম্মচারীরাও পুলিশের

দল সহ আকালীদের হাত হইতে গাছগুলি রক্ষা করিতে ছুটিল। দলে দলে আকালীরা পুলিসের হাতে ধৃত হইতে লাগিল—আবার দলে দলে আকালী ঘটনাস্থানে উপস্থিত হইতে লাগিল। পুলিস তাহাদের দলবদ্ধ আসনে বাধা দিতে লাগিল—আকালীরা পথে বসিয়া ধরণা করিতে লাগিল, পুলিস শক্তির সাহায্যে তাহাদের ছত্র ভঙ্গ করিতে লাগিল। পুলিস নির্ম্মম ভাবে তাহাদের পঞ্জির বহুর লাঠি চালাইতে লাগিল—শত শত আকালী শিখ ভীষণ ভাবে আহত হইল। এই আকালী শিখেরা অস্ত্র-যোদ্ধা, জন্মিবার পর হইতেই ইহারা শানিত ক্ষুদ্রিকাকে ক্রীড়নক মনে করে। যুদ্ধই ইহাদের ব্যবসায় —যুদ্ধেই ইহাদের আনন্দ ও তুষ্টি। কিন্তু এই যোদ্ধা জাতিও বুঝি বা মহাত্মার অ-হিংস মন্ত্রে প্রভাবিত হইয়া পড়িয়াছে—তাই সহজভাবে নিজা নির্য্যাতিত হইয়াও কুকুর বেড়ালের মত লাঠির গুঁতা সহিয়াও ইহারা নীরবে আপনাদিগের ধর্ম্ম গত অধিকার রক্ষার চেষ্টা করিতেছে।

দেশনেতা পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য মহাশয় প্রত্যহ ঘটনাস্থানে উপস্থিত হইয়া স্বচক্ষে এই হৃদয়-ভেদী অত্যাচার লীলা দেখিতেছেন। জানি না এমন হৃদয়-ভেদী অত্যাচারের উদ্ভব সত্য কি ঘটনা হইতে হইয়াছে —কিন্তু অবস্থা এখন যেমন দাঁড়াইয়াছে তাহাতে এমন ভাবে আইন ও শৃঙ্খলার কার্য্য চলিতে থাকিলে তাহার ফল কি ভীষণ হইবে তাহা কল্পনাও করা যায় না।

• • •

আকালী হাঙ্গামা প্রসঙ্গে সহযোগী আনন্দ বাজার লিখিতেছেন 'কৃষ্ণ উষ্ণীষ-মণ্ডিত শির সগৌরবে উন্নত করিয়া প্রত্যহ একশত আকালী শিখবীর বৃন্দসহ গুরু-কা-বাগ অভিমুখে চলিয়াছে।...গুরু-কা-বাগ—গুরু দরবারের সম্পত্তি। যাহা ধর্ম্মার্থে উৎসর্গীকৃত, তাহার উপস্বত্ব ভগবানের সেবায় অর্পণ করিবার অধিকার ভক্তের আছে। এই স্বাভাবিক অধিকার হইতে পার্থিব কোন শক্তি ভক্তকে বঞ্চিত করিতে পারে না; কেন না, করা উচিত নয়। কিন্তু আজ পাঞ্জাব সরকারের এই ঔচিত্য বুদ্ধি কি বিলুপ্ত হইয়াছে? স্বয়ং উদাসী সন্ন্যাসী বলিয়া পরিচয় প্রদান করা সত্ত্বেও মহান্ত নিজেকে ধর্ম্মার্থে উৎসর্গীকৃত গুরু-কা-বাগের মালিক বলিয়া দাবী করিয়াছেন। এই দুর্নীতি মূলক দাবীই দেখিতেছি পাঞ্জাব সরকারের নিকট অতীব সঙ্গত বলিয়া মনে হইয়াছে নিরস্ত্র শান্ত সংযত শিখ সত্যা-গ্রহীদের বাধা দিতে গিয়া প্রবল প্রতাপান্বিত পাঞ্জাবী পুলিস অমানুষিক নিষ্ঠুরতার সহিত এ পর্য্যন্ত প্রায় দুই হাজার শিখকে নানা প্রকার পুলিস সুলভ ধরণে আহত ক্ষত বিক্ষত ও অঙ্গবিহীন করিয়া ফেলিয়াছে। ইণ্ডিপেনডেণ্ট পত্রিকা এই ব্যাপারের যে বর্ণনা দিয়াছেন তাহাতে জানা যায় 'বহু শিখের অণ্ডকোষ অস্ত্র বিশেষে আঘাত করিয়া তাহাদের সহজে অচৈতন্য করিয়া ফেলা হইয়াছে। বস্ত্রহীন নৃশংসতা যে কোথায় গিয়া পৌঁছিতে পারে তাহার চূড়ান্ত প্রমাণ! তার পর রক্তি বাধিয়া টানা হাত মোচড়াইয়া দেওয়া, ধাক্কা দিয়া অচৈতন্য ব্যক্তিকে কর্দ্দমাক্ত খানায় ফেলিয়া দেওয়া এসব তো সোজা কাজ। প্রকাশ্য রাজপথে সহস্র সহস্র দর্শকের সম্মুখে, পণ্ডিত মালব্যজী, হাকিম আজমল খাঁ প্রভৃতি ভারতমান্য নেতা এবং পঞ্জাবের ব্যবস্থাপক সভার সভ্যগণের সম্মুখে—দিবা দ্বিপ্রহর 'শান্তি শৃঙ্খলা' রক্ষার দোহাই দিয়া এই সব কার্য্য করা হইতেছে।'

• • • •

দু'এক শতাব্দী পূর্ব্বেও যাহা অমানুষিক হৃদয়হীন বর্ব্বরোচিত কার্য্য বলিয়া পরিগণিত হইত বিংশ শতাব্দীর সভ্য-আবহাওয়ায় তাহার যথেষ্ট পরিবর্ত্তন হইয়াছে এই ছিল লোকের একটা দৃঢ়ধারণা। জাগতিক শান্তি রক্ষা, বলশালীর দুর্ব্বলের উপর উৎপীড়ন নিবারণ, সাম্য মৈত্রী স্বাধীনতার ঘন-ঘোর ঢক্কানিনাদ এই সমস্ত শব্দময়ী বাক্য ও উচ্চঅঙ্গের বাকবিন্যাস আমাদিগকে এমনি বিভ্রান্ত ও নিষ্ক্রিয় করিয়া রাখিয়াছে যে দেশের মধ্যে এই সভ্য বিংশ শতাব্দীতে যে সমস্ত অত্যাচার হইতেছে দেশগুলিতেও আমরা বিচলিত হই না। ইতিহাসের হোক-নাহোক নবাব সিরাজের অন্ধকূপ হত্যার কাহিনী শুনিয়া আমরা নবাবের হৃদয়হীনতায় শিহরিয়া উঠি আর এই যে এই যুগে বিংশ শতাব্দীর শত উগ্র সভ্যতামণ্ডিত ভারতে মালাবারের চলন্ত অন্ধকূপ হত্যা হইয়া গেল জালিওনওয়ালা বাগে নিরস্ত্র জাতির উপর সসস্ত্র ক্ষমতা অন্ধ জাতির গোলা নিক্ষেপে রক্ত গঙ্গা বহিয়া গেল, এই যে সত্যাগ্রহী আপন ন্যায্য অধিকার প্রয়াসী আজন্ম শস্ত্রধারী আকালী শিখের দল স্বেচ্ছায় নিরস্ত্র সাজিয়া পুলিশদলের ভীষণ নির্ম্মম বীভৎস অত্যাচার সহিতেছে—ইহাতে দেশবাসী শিহরিয়া উঠি-তেছে না?

• • • •

পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য এই নির্ম্মম অত্যাচার স্বচক্ষে দেখিয়া বলিয়াছেন 'আকালীদের পৃষ্ঠে প্রতিটি লাঠির আঘাতে ভারতের সঙ্গে ইংলণ্ডের সম্বন্ধের ভিত্তির উপর কুঠারের আঘাত করিবে।'

• • • •

দেশের পক্ষ হইতে কংগ্রেসের পক্ষ হইতে পণ্ডিত মালব্য, পণ্ডিত মতিলাল, হাকিম আজমল খাঁ, স্বামী শ্রদ্ধানন্দ প্রভৃতি তথায় গিয়াছেন। শুনিলাম বাংলার

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনও পণ্ডিত মতিলালের অনুরোধে কাশ্মীর যাইবার পথে অমৃতসরে গিয়াছিলেন। দেশবাসীর পক্ষ হইতে এই নিদারুণ সমস্যার দ্রুত অনুসন্ধান হওয়া কর্ত্তব্য এবং তাহার প্রতীকার হওয়াও আবশ্যক। পুলিশের কার্য্য অমানুষিক ও হৃদয়হীন বটে কিন্তু ভারতের অন্যান্য প্রদেশবাসী যদি এ ভাবে তাহাদের নিজ ভ্রাতৃবৃন্দকে অন্যায়ের পদতলে দলিত ও নির্য্যাতিত হইতে দেখিয়াও চুপ করিয়া থাকে তবে তাহাতে দেশবাসীর পক্ষেও কম অমানুষিকতা ও হৃদয়হীনতার পরিচয় দেওয়া হইবে না।

• • • •

এই পাঞ্জাবেই বার বার নৃশংস অত্যাচারের লহর লীলা বহিয়া যাইতেছে। তারারী কাণ্ড—জালিয়ওয়ালা বাগের স্মৃতি ভারতবাসীর প্রাণ হইতে কোন কালে মুছিবার নহে। তার পর ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে কত কাণ্ড হইয়া গেল। পাঞ্জাব কেশরী লালা লাজপত আজ কারারুদ্ধ, পাঞ্জাবের দেশ বিদেশ মান্য নেতা মতিলাল লাঞ্ছিত নির্য্যাতিত, গ্রিণ্ড নামে খ্যাত বিলাসী পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত জহরলাল দণ্ডিত, এখনও কারারুদ্ধ; তারপর যাহারা সরকারের কথা অমূলী হেলন মাত্র সময়ে প্রাণ বিসর্জ্জন দিতে যায় তাহাদেরই উপর এই নির্ম্মম অত্যাচার লাঞ্ছনা! রক্তের বান দেখিতেই কি পঞ্চনদের চির আকাঙ্খা—চির তৃষাতুর পঞ্চনদের জলস্রোতের কি চিরকালই লালে লাল হইয়া বহিবার ইচ্ছা! কে জানে কবে ভারতের এই লাঞ্ছনার শেষ হইবে!

• • • •

গাজীমুস্তাফা কেমাল পাশার জয়ে সমগ্র ইওরোপ ব্যাপী যেন আবার একটা সমর তৃষ্ণা জাগিয়া উঠিতেছে। হৃত-দর্প তুর্ক যে এত শীঘ্র আবার তাহার আহত সম্মান ফিরে আসলে ফিরাইয়া লইতে পারিবে আবার সে বীরের ন্যায় সোজা সরল হইয়া দাঁড়াইয়া আপন বাণী পরিষ্কার কণ্ঠে শুনাইতে পারিবে ইহা অপরাপর শক্তিবর্গ কেহই আশা করিয়াছিলেন না। সমগ্র ভারতীয় মুসলমানের তীব্র আবেদন অনুনয়ের প্রতি যে সহৃদয়তা ইওরোপীয় শক্তিবর্গ দেখাইতে পারেন নাই—বীর মুস্তাফা কেমাল আপন বাহুবলে তাহা অর্জ্জন করিয়াছেন। কিন্তু তুর্কের এ প্রতিষ্ঠায় ইওরোপের অপরাপর শক্তিবর্গ চঞ্চল হইয়া পড়িয়াছে। গ্রীক হারিয়া কাঁদা গাহিতেছে। ১৮১৪ সালের সেই সন্ধি, তারপর ভার্সেলিসের ও সেভার্সের সন্ধি যে অন্যায় অবিচার তুর্কের উপর দেখাইয়াছিল কালের গতিতে তাহার সংশোধন হইয়াছে। চক্ষুরুন্মিলিত সম্পত্তি স্মার্ণা আবার তুর্কদিগের দখলে আসিয়াছে। তুর্কের কৌশলের সুযোগে যে স্মার্ণা গ্রীকের হস্তগত হইয়াছিল আজ কেমালের বিজয়ীবাহিনী উড়ে এসে জুড়ে বসা গ্রীকবলকে তথা হইতে বিতাড়িত করিয়াছে। কেমাল পাশা নিজে তাহার অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন—তুর্কেরা সিরিয়া বা মেসোপোটেমিয়া চাহে না। তাহারা ম্যারিজা নদ পর্য্যন্ত বিস্তৃত কনষ্টানটিনোপল এবং থ্রেস চাহে। দার্দেনিলস প্রণালীর নিরপেক্ষ পরীর উপর তিনি হস্তক্ষেপ করিবেন না কিন্তু কনষ্টানটিনোপল রক্ষার জন্য মর্ম্মোরা সাগর তীরে আত্মরক্ষার ব্যবস্থা তিনি করিবেন। জগতের শান্তিরক্ষার জন্য এ জিনিসগুলির কোন উপযোগিতা না থাকিতে পারে কিন্তু তুরস্কের নিজের শান্তি রক্ষার জন্য ইহা অপেক্ষা সু-প্রস্তাব আর কি হইতে পারে? তুর্কের নিজ ঘরের শান্তি রক্ষার এই প্রয়াসে যদি ইওরোপে আবার রণ ডঙ্কা বাজিয়া উঠে তবে আশা আছে শক্তিমান কেমাল তাহা সামাল দিতে পারিবেন।

• • • •

পর্ব্বত, কখনও সুপ্ত চির নিদ্রা ভোর করিয়া বলে বিনা যুদ্ধে নাহি দিব সূচ্যগ্রভূমি। মুলসী সত্যাগ্রহ ব্যাপারে দেশীয় টাটা কোম্পানীও সেই পন্থাই অবলম্বন করিয়াছে। এইবার তৃতীয় পক্ষ মুলসী সত্যাগ্রহ আরম্ভ হইয়াছে—এপর্য্যন্ত এই ব্যাপারে প্রায় পঞ্চাশ জন লোক জেলে গিয়াছে। বর্ষার প্লাবনে নদ নদী এখন কূলে কূলে ভরা, তাই টাটা কোম্পানীর কার্য্য এখনও জোরে আরম্ভ হয় নাই—দু'এক মাসের মধ্যেই জোর কার্য্য আরম্ভ হইবে—মুলসী সত্যাগ্রহ ব্যাপারটীও আবার জাঁকাইয়া উঠিবে। তিন হাজার লোক দুঃখ—ব্রতীর জেল গমন না পর্য্যন্ত মুলসীরা এই কার্য্য ধারার জন্য কোনরূপ পরিবর্ত্তন করিবে না। এই ত্যাগ ও আত্মদানের প্রতি অর্থ ও ক্ষমতাশালী টাটা কোম্পানী চির উপেক্ষা দেখাইয়া আসিতেছে। টাটা কোম্পানী আমাদেরই স্বদেশী কোম্পানী তাহাদের কি উচিত নয় যে আপন প্রাণ্য অধিকার রক্ষা প্রয়াসী মাতৃসন্তানের ত্যাগ ও আত্মদানের মর্য্যাদা রক্ষা করে?

• • •

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মাটতি ছিল মাত্র পাঁচ লক্ষ টাকা। বাংলা সরকারের নিকট হইতে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এই টাকাটা পাইবার আশা করিয়াছিলেন এবং এই টাকায় তাহার দেনা মিটিয়া যাইবে মনে করিতেছিলেন। বাংলা সরকার হইতে বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য আড়াইলাখ টাকা মঞ্জুর হইয়াছিল—কিন্তু শিক্ষা মন্ত্রীর, তখন হইতে অদ্যুনা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিকট যে প্রস্তাব আসিয়াছে তাহাতে জানা যায় কলিকাতা

বিশ্ববিদ্যালয় যদি কয়েকটি দান করেন তবেই এই আড়াই-লাখ টাকা পাইতে পারিবেন এরূপ নহে। যদি এই সর্ত্তে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় রাজী হন তবে যে উদ্দেশ্য লইয়া বিশ্ব বিদ্যালয় এতকাল চলিতেছিল সে দিক তাহাকে খর্ব্ব করিতে হইবে। দেশের শিক্ষিত মণ্ডলি - যাহাদের পরিচালনায় এতকাল কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্ব্ব-প্রকার ব্যবস্থা চলিতেছিল তাহাদের পক্ষেও ইহা বড় গৌরবকর হইবে না। দেশের শ্রেষ্ঠ শিক্ষিত সন্তানগণের পরিচালনার এত বড় একটা প্রতিষ্ঠান যে যোগ্যভাবে চলিতে পারে নাই এই ব্যাপারে তাহাও প্রমাণিত হইবে। ইহা বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালকগণের পক্ষে অগৌরবের ও লজ্জার বিষয়!

• • •

মহামতি গ্লাডষ্টোন বলিয়াছিলেন 'একমাত্র স্বাধীন প্রতিষ্ঠান গুলিই দেশের লোককে স্বরাজ লাভের যোগ্য করিয়া গড়িয়া তুলিতে পারে। দেশবাসীকে স্বাধীন প্রতিষ্ঠান দিতে অস্বীকার করিলে স্বরাজ লাভের যোগ্য শিক্ষা ক্ষেত্র হইতে তাহাদের দূরে সরাইয়া রাখা হয়।"

• • • •

রেলের অনেক রেলগাড়ীতেই প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর যাত্রীদের বিদেশী আচারে আহারের ব্যবস্থা আছে। এই প্রকার আহারের ব্যবস্থা হিন্দু মতেও যাহাতে দেশীয় রেল গুলিতে চলিতে পারে এই মর্ম্মে কলিকাতার মাড়োয়ারী সভা রেলওয়ে বোর্ডের নিকট এক প্রস্তাব পাঠাইয়াছেন। দেশী মতের এই ভাবের আহার ব্যবস্থা রেলগুলিতে থাকা কর্ত্তব্য। হিন্দুমতের লোক যাহারা রেল ভ্রমণ করেন তাহাদের এ ব্যবস্থা হইলে আর কোন কষ্ট থাকিবে না।

• • • •

চন্দ্রবারকার কমিটির অনুমোদন অনুসারে বোম্বাই সরকার তথায় প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তারের ব্যবস্থা করিতেছেন। দশ জন হইতে পনের জন সভ্য লইয়া স্কুল বোর্ড গঠিত হইবে, এই সভ্যদিগের মধ্যে সরকার কর্ত্তৃক মাত্র তিন জন মনোনীত হইতে পারিবেন, অপর সভ্যগণ সাধারণ কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত হইবেন। এই শিক্ষা বিস্তারে খরচ যাহা পড়িবে মিউনিসিপ্যালিটি সমূহ তাহার অর্দ্ধেক গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে পাইবে, ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ড-গুলি দুই তৃতীয়াংশ পাইবে। মিউনিসিপ্যালিটি বা ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ড এইভাবে প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তারের বিরোধী হইলে স্কুল বোর্ডের সভ্যগণ স্বাধীন ভাবে প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তারের ব্যবস্থা করিতে পারিবেন। মিউনিসিপ্যালিটি বা ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ডের সভ্যগণের সহিত স্কুল বোর্ডের সভ্যগণ একযোগে মিলিয়া কার্য্য করিয়া যাইতে পারিলেই বোম্বায়ে প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তারের পথ সুগম হইবে।

আমাদের দেশের দারিদ্র্য ক্রমেই বাড়িয়া যাইতেছে। কিন্তু এ ভীষণ দারিদ্র্যের মধ্যেও দুটি জিনিসের উপর আমাদের প্রচণ্ড লিপ্সা দেখা যায়। এক বিবাহ করা অপর সন্তানের জন্ম দেওয়া। এই বাংলা দেশে বিবাহেরও যেমন বিরাম নাই। সন্তানের জন্মেরও তেমনি অবধি নাই। বর ও কনের পিতামাতা উভয়েই ছেলে ও মেয়ের বিবাহ দিবার জন্য অতি ব্যগ্র। বরের বাপ আশা করেন ছেলের বিবাহে কনের বাপের ঘাড় ভাঙ্গিয়া অর্থ শোষণ করিবেন—কনের বাপ কন্যার বিবাহে সর্ব্বস্বান্ত হইবেন জানিয়াও কন্যার বিবাহের সময় উত্তীর্ণ হইয়া গেল ভাবিয়া শঙ্কিত হইয়া পড়েন। এ গেল সমাজের এক দিক, অপর দিক—বাংলা দেশে শিশু-মৃত্যুর হার বাড়িলেও জন্মের হার কিন্তু কম নহে। দশ এগার বৎসরের বালিকা হইতে ৪০।৫০ বর্ষ বয়স্কা নারীও গর্ভের জননী সাজিতেছেন। তনি দারিদ্র্যে ইন্দ্রিয় লিপ্সা বাড়িয়া চলে—সত্য কথা। যে দেশ যত দরিদ্র সেই দেশে শিশু জন্মের হার তত অধিক। অনাহার অর্দ্ধাহার অনশনেও এ প্রবৃত্তিকে রোধ করিয়া না দিয়া আরও বাড়াইয়া দেয়। জন্ম দিয়া হতভাগ্য কতকগুলি প্রাণীকে সংসারে আনিয়া তাহাদের জীবনকে পরম দুঃখময় করিয়া তোলা হয়। যাহাদের নিজেদের খাইবার পরিবার সংস্থান নাই তাহারা কি করিয়া এমন ভাবে হতভাগ্যের সংখ্যা বৃদ্ধি করিতে পারে তাহা আমরা বুঝি না। দেশের হতভাগ্য দলের এই বৃদ্ধিতে দেশ ক্রমেই মনুষ্যত্বহীন নির্বীর্য্য হইয়া পড়িতেছে। অথচ শ্লীলতার খাতিরে আমরা ইহার আলোচনা করিতে দ্বিধা বোধ করি। কার্য্য করিতে শ্লীলতার ধার ধারি না, দশ বৎসরের মেয়ের গর্ভাধানের ব্যবস্থা করিতে পারি, তের বৎসরের বালিকাকে দু'তিন সন্তানের জননী দেখিয়া পুলকিত হইতে পারি অথচ পারি না সেই সন্তানদের যোগ্যতা দিতে, পারি না তাহাদের যোগ্য আহার যোগ্য বসন দিতে। সমাজের এই সমস্যার সমাধান করিতে পাশ্চাত্যের মহামহা মনীষী দল নানা উপায় চিন্তা ও উদ্ভাবন করিতেছেন, অথচ আমরা শ্লীলতা চক্রে পিষ্ট হইয়া জাতীয় অধঃপতনের পথ-মুক্ত করিতেছি। বাসন্তীতে নর-নারীর সমস্যা মূলক ও অন্য সমস্যা মূলক কতকগুলি অতি বাস্তব সত্য জীবনের গল্প আমরা প্রকাশ করিয়াছি। ভবিষ্যতে আরও করিব। ইহারই কতকগুলি গল্প শারদীয়া পূজার পরেই 'স্ত্রীর চিঠি' নামে প্রকাশিত হইবে। আশা করি এগুলি জাতীয় জীবনের উন্নতির পথের সহায়ক হইতে পারিবে।

• •

বঙ্গীয় গবর্ণমেণ্টের আদেশ অনুযায়ী বঙ্গদেশের আমোদ সমূহের উপর একটা শুল্ক বসিল। গবর্ণমেণ্টের শুল্ক সহ আমাদের রঙ্গালয় গুলির প্রবেশ মূল্য কিরূপ হারে বর্দ্ধিত হইবে, তাহার বিস্তারিত বিবরণ—আমাদের সঙ্গীয় রঙ্গমঞ্চের অধ্যক্ষিকারীগণের প্রদত্ত ইস্তাহার—নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম :—

"এতদ্বারা সাধারণকে জ্ঞাত করান যাইতেছে যে বঙ্গীয় গবর্ণমেণ্টের আদেশ অনুসারে বর্ত্তমান ১৯২৪ ১লা অক্টোবর হইতে সহরের আমোদ প্রমোদ সম্বন্ধীয় যাবতীয় অনুষ্ঠানের উপর কর ধার্য্য হইয়াছে এবং ঐ কর শ্রেণীভেদে টিকিটের মূল্যের উপর বিভিন্ন হারে প্রতি দর্শকের নিকট আদায় হইবে। উপযুক্ত নিদর্শন ব্যতীত অভিনয় কালীন দর্শকদের প্রবেশ নিষিদ্ধ হইয়াছে। তদ্ব্যতীত প্রচলিত প্রবেশমূল্যের পরিবর্ত্তন প্রয়োজন হওয়াতে থিয়েটার সমূহে ঐ তারিখ হইতে শ্রেণীভেদে নিম্নের হারে প্রবেশ মূল্য নির্দ্ধারিত হইল। আরও জ্ঞাত করান যাইতেছে যে ফ্রি (Free) সিজন্ কর্ম্মচারী পাশ বা বিনা পাশে যে সমুদয় বন্ধু ও অনুগ্রাহকবর্গ থিয়েটারে যাতায়াত করিয়া অনেক আমোদ কর সম্বন্ধীয় ঐ আইনের বিধান অনুসারে তাঁহাদের সম্বন্ধেও বিশেষ বিধি নির্দ্ধারিত হইয়াছে। থিয়েটারের কর্ত্তৃপক্ষের নিকট অনুসন্ধান করিলে সে বিষয় জ্ঞাত হইতে পারা যাইবে।

শ্রেণী—প্রবেশ মূল্য কর সমেত—	
গ্যালারী (Gallery)—	৸০
পিট (Pit)—	১।০
ষ্টল (stall —	২।০
ফ্রন্টষ্টল (Front stall)—	৩।০
ড্রেস সারকেস (Dress circle —	৪৲
ফ্রন্ট ড্রেস সারকেস—	৬৲
বক্স (৪ চারজন বসিবার)—	২০৲ ও ২৪৲

মহিলাদিগের প্রবেশমূল্য যথাক্রমে—১।০, ২।০ ও ৩।০

খবরা-খবর

দেশ বিদেশ পূজিত, ভারতগৌরব মহাত্মা গান্ধী আহমদাবাদে আশ্রমে বাস করিতেছেন। তাঁহার দীর্ঘ ছয় বৎসর—আজ তাঁহার ১২১ দিন অতিবাহিত হইল। আরও কতদিন :

—•—

তুর্কীবিজয়ের বিজয়ে সমগ্র ইয়োরোপবাসী একটা ঔৎসুক্য প্রকাশ করিতেছে। কেহ কেহ আশঙ্কা করিতেছেন নিজই আবার একটা মহাযুদ্ধ বাধিতে পারে।

—•—

বোম্বাইয়ে ট্রাম ধর্ম্মঘট চলিতেছে। ধর্ম্মঘটকারীরা তাহাদের অকাল অভিযোগের প্রতীকার চাহে।

—•—

বোম্বাই টেণ্ট হুর্ঘটনার সরকারী ইস্তাহারে সার্জ্জেণ্ট এণ্ড্রুজকে দোষী করা হইয়াছে। ইয়োরোপীয়ান এ্যাসোসিয়েসনের অভ্যর্থনাধ্যক্ষ সার্জ্জেণ্টের পক্ষে দাঁড়াইয়াছেন ও তাহার জন্য ছইজন ব্যারিষ্টার নিযোগ করিয়াছেন।

—•—

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন গত ১২শে তারিখে পরিবারাদিসহ অমৃতসর হইতে কাশ্মীর যাত্রা করিয়াছেন।

—•—

ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভার ১৮ই সেপ্টেম্বরের অধিবেশনে মুদ্রণ পুলিশ বিল পাশ হইয়াছে।

—•—

গত ১২শে সেপ্টেম্বর হুগলির হইতে আকাশে একটি নব নব নক্ষত্র দেখা যাইতেছে। সূর্য্যগ্রহণ বিকটবর্ত্তী তাই কি আমাদের সূর্য্য জ্যোতিতে এই তারকার আবির্ভাব?

—•—

মির্জ্জাপুর পার্কে ও সেণ্ট্রাল কলেজে খেলা খেলা হইতেছে।

—•—

বাইশ মাইল সন্তরণ প্রতিযোগিতায় শ্রীমান বীরেন্দ্রকৃষ্ণ বসু প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছেন। এত বড় সন্তরণ প্রতিযোগিতা আমাদের এদেশে আর হয় নাই। পাশ্চাত্যে তিন্নার ক্যাইল পর্য্যন্ত হইয়াছে বটে। ইংলিস চ্যানেলে এই প্রতিযোগিতা হইয়াছিল। আমরা বাঙ্গালীর ছেলে বীরেন্দ্রকৃষ্ণকে অভিনন্দন করিতেছি।

—•—

এই সন্তরণ প্রতিযোগিতার সময় কারমাইকেল মেডিকেল কলেজের অধ্যাপক এল, চাটার্জ্জি মোটর বোট উল্টাইয়া হ্রদে ডুবিয়া যান। তাহাতেই তাঁহার প্রাণ বিয়োগ হইয়াছে।

—•—

আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র ঢাকা ও খুলনা প্রচারার্থ ময়মনসিংহ গিয়াছেন।

ঢাকা ইউনিভারসিটির মুক্তির হলে আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র তুর্কীর কেমালের বিজয়োৎসবে বলিয়াছেন কস জাপান যুদ্ধের পর এসিয়া ইয়োরোপের উপর নিজ প্রাধান্য বজায় রাখিল তাই এ জয়ে তিনি আনন্দিত। কেমাল পাশার বিজয়ে ইসলাম গৌরব হয় কিন্তু অধিকার সম্বন্ধে তাহার মুক্ত আলোচনা করিতে চাহিয়াছেন। তাই খিলাফতের 'ক্রেনী হেল' ও মর্লির লোই আশঙ্কিত হইয়া বলিয়াছেন, কেমাল পাশার দাবী বর্ত্তমান অবস্থায় আদৌ অনুমত নহে। সুতরাং যুদ্ধোদ্যম করিয়া তাহাকে আরও দুর্দ্ধশাগ্রস্ত করিয়া কেমাল তাহার দাবী জানিয়া লওয়াই ভাল।

—•—

চিত্তরঞ্জন দেশিল প্রভৃতি বঙ্গদেশিক নেতারা কেমালের প্রতি সহানুভূতি জ্ঞাপন করিয়াছেন, গুজরাটের কিষয় ঠিপ্পিরাজ, টেলিগ্রাফ অফিসে প্রধান চলিতেছে।

—•—

বাঙ্গালোরে সম্প্রতি বহুলোক এক কারাগার হইতে অব্যাহতি পাইয়াছেন।

বোম্বাই মোহাটির হিন্দু মুসলমান, শিখসম্প্রদায় তুর্কীর কেমালের বিজয়ে শোভাযাত্রা করিতে চাহিয়াছিল। কেন্তুটি কমিশনার ৬৪বিধির ১৪৪ধারা অনুসারে শোভাযাত্রার আদেশ দেন নাই।

ক্রিমেনস্ জার্মাণ হইতে ফেরে ফ্রান্সিকেল। একটি ঘর উপযুক্ত করার তাহার নামে নালিশ হয়। বিচারক ফ্রান্সিকেল কে ২০০৲ জরিমানায় মুক্তি দিয়াছেন।

মহারাজাধিরাজ বর্দ্ধমান বার্ষিলিএ আছেন।

শিক্ষা মন্ত্রী মাননীয় শ্রীযুক্তপ্রভাসচন্দ্র মিত্র বার্ষিলিএ পূজা যাপন করিবেন।

শ্রীযুক্ত সতীশরঞ্জন দাস মহাশয়ও বার্ষিলিএ পূজা যাপন করিবেন।

কৃষিমন্ত্রী মাননীয় নবাব আলী বার্ষিলিএ আছেন।

পণ্ডিত মদন মোহন মালব্য, পণ্ডিত মতিলাল নেহেরু, হাকিম আজমল খাঁ প্রভৃতি দল নায় কলহ পঞ্জাবে আকালী দুর্ঘটনা দেখিতেছেন।

শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রকুমার সরকার কৃষ্ণনগরে কংগ্রেসের কার্য্যে ব্যাপৃত আছেন।

প্রবাসবন্ধু সম্পাদক রায় নলিনী দেব বাহাদুর বার্ষিলিএ পূজা যাপন করিবেন।

বাসন্তী সম্পাদক শ্রীযুক্ত বিজয়রত্নবাবু তাঁহার পল্লীভবনে পূজা যাপন করিবেন। অন্যতম সম্পাদক জ্ঞানেন্দ্র বাবুর পারিবারিক অসুবিধার জন্য তাঁহাকে কলিকাতাতেই থাকিতে হইতেছে।

পরিচালক শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র মিত্র দুর্গা নবমী বার্ষিলিএ যাত্রা করিতেছেন।

আমরা গ্রাহক, গ্রাহিকা পাঠক-পাঠিকা ও বন্ধুবান্ধবগণকে পাল্লীয়ার শুভ সম্ভাষণ জ্ঞাপন করিতেছি।

পূজার ছুটি

৪৮ খণ্ড পত্রিকায় বাসন্তীর বৎসর পূর্ণ হইবে। পূজার সংখ্যার পর তিন শনিবার অর্থাৎ তিন সপ্তাহ কাগজ বন্ধ থাকিল। চতুর্থ শনিবার প্রাতঃকালে আমার বাসন্তী সুধীজন সমক্ষে আত্মপ্রকাশ করিবে। বড়দিনের ছুটির সময়েও কাগজ এক সপ্তাহ অপ্রকাশিত থাকিবে। মোটের উপর চার সপ্তাহ বাদ হইলে গ্রাহকগণ ঠিক ৪৮ খণ্ড কাগজই পাইতেছেন।

৪ঠা কার্ত্তিক ১৩২৯, ২১শে অক্টোবর ১৯২২ শনিবার বাসন্তীর ত্রয়োদশ সংখ্যা বাহির হইবে।

নাট্য-সংবাদ

'পেলারামের স্বদেশিতা' প্রণেতা শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় একখানি নাটক রচনা করিয়াছেন, নাম তার—"ফুলশর"। ফুলশর-এর সঙ্গে আমাদের হৃদয়ের একটা যোগ চিরদিনই আছে; ফুলশর শুনিলে ভয়ও হয় যেমন, আনন্দও হয় তেমনি প্রচুর। নাট্যখানি আজ শনিবার সন্ধ্যায় মিনার্ভা থিয়েটার কর্ত্তৃক অভিনীত হইবে। মিনার্ভার ও গ্রন্থকারের অদৃষ্টযোগে তাঁহাদের সর্ব্বজন প্রশংসিত 'পেলারাম' অকালে কালের কবলে আত্মসোপন করিল, দেখা যাক—ফুলশরের অদৃষ্টে আবার কি আছে? শুনিতেছি "ফুলশর"-টিকে সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর ও সর্ব্বজন মনোরঞ্জক করিতে মিনার্ভার কর্ত্তৃপক্ষগণ চেষ্টা যত্ন ও ব্যয়ের ত্রুটি করিতেছেন না, কাজেই আশা করা যায় "ফুলশর" আবালবৃদ্ধ বণিতাকে আনন্দদান করিতে পারিবে। আর একটা সু-খবর, "ফুলশর" কাহার হাতের জ্যামুক্ত হইয়া আসিবে জানেন? বঙ্গ-নাট্যাকাশের নাইটিঙ্গেল্ শ্রীমতী সুবাসিনী এই ফুলশরের খেলা খেলিবেন বলিয়াই শুনা যাইতেছে।

• • • • • •

প্রবীণ নাট্যরথী শ্রীযুক্ত অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের ত্রয়োদশ গীতি-নাটিকা 'সুধামা' অচিরই তাঁর থিয়েটারে অভিনীত হইবে। আমরা অপরেশবাবুর গীতিনাট্যের ভক্ত, আশা করি সুধামা ও সাধারণের মনোরঞ্জন করিতে পারিবে।

• • • • • •

তাজমহল বিক্টরি বেঙ্গল কোম্পানী।—মহালয়ার শুভ সন্ধ্যায় আমরা বসু থিয়েটারে "আঁধারে আলো"র অভিনয় দেখিতে গিয়াছিলাম। ইতিপূর্ব্বে অস্মদেশীয় শিল্পীগণের দ্বারা অভিনীত আরও কয়েকটি ছায়া চিত্রের অভিনয় দেখিয়াছি কিন্তু কোনটিই আমাদের তৃপ্তি দান করিতে পারে নাই—"আঁধারে আলো" দেখিয়া আমাদের সে ভাব ঘুচিয়াছে। শরৎচন্দ্রের সেই মনোমুগ্ধকর উপন্যাস, আর সেই উপন্যাসখানির নায়কের অংশ-অভিনয় করিয়াছেন, শ্রীযুক্ত শিশিরকুমার ভাদুড়ী এম্-এ, মহাশয়—কাজেই সত্যেন্দ্রের ভূমিকা যে অতুলনীয় সুন্দররূপে অভিনীত হইয়াছে, তাহা বলাই অত্যুক্তিমাত্র। নায়িকা বিজলীর অংশে ছায়া-চিত্র-রঙ্গে শ্রীমতী দুর্গারাণী যে কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন আমাদের দেশে, চিত্র-শিল্পের এই নব উন্মেষের দিনে তাহা বাস্তবিকই প্রশংসার্হ। যাঁহারা এখনও আমাদের দেশের শিল্পীগণ কর্ত্তৃক অভিনীত ছায়াচিত্র দেখিয়া মনোভাব গঠন করিয়া উঠিতে পারেন নাই, আমরা মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি "তাজমহলের" এই ছবিটি দেখিলে তাঁহারা স্বীয় মত পরিবর্ত্তিত করিয়া লইতে পারিবেন। একটা কথা পরিশেষে বলিতে চাই যে সুপ্রসিদ্ধ আলো-চিত্র-শিল্পী শ্রীযুক্ত সাতাল মহাশয় "আঁধারে আলো"র চিত্র তুলিয়াছেন, তাহা সত্ত্বেও কেন যে পোষাক পরিচ্ছদে মাঝে মাঝে অস্পষ্টতা, জড়তা থাকিয়া গেছে, বুঝিলাম না।

পুস্তক পরিচয়।

আহুতি।—ছোট উপন্যাস, শ্রীসরসীবালা বসু প্রণীত, গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় ও সন্সের ১০ গ্রন্থ পর্য্যায়ভুক্ত। লেখিকা উপন্যাসখানিতে কন্যাদায় কি ভাবে বঙ্গ সংসারকে বিব্রত করিয়া তুলিয়াছে তাহারই চিত্র দেখাইয়াছেন। নারী হইয়া লেখিকা নারীর ব্যথা ফুটাইবার চেষ্টা করিয়াছেন তাই আলেখ্যটি সুচারুরূপে ফুটিয়াছে।

অসাধ্য-সাধনাশ্রম

কেশতৈলের রাণী "নিরুপমার" ষষ্ঠ বর্ষের পুরস্কার বহিটি আমরা সাদরোপহার প্রাপ্ত হইয়াছি। 'নিরুপমা' 'হিমানী' প্রভৃতি স্বদেশী সুগন্ধ দ্রব্যের প্রচারক 'শর্ম্মা ব্যানার্জ্জি-কোম্পানী' আজ ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র পরিচিত। ব্যবসায়ের শ্রীবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ইহারা যে সাহিত্যের প্রচলনের চেষ্টা করিতেছেন, তজ্জন্য আমরা তাঁহাদের ধন্যবাদ দিতেছি। বিগত ছয় বৎসর যাবত ইহারা "নিরুপমা" ক্রেতাগণকে পূজার সময় এক একখানি গ্রন্থ উপহার দিয়া আসিতেছেন। পূজায় উপহার দেওয়া আমাদের দেশের সনাতন রীতি, এ বছর ইহারা যে উপন্যাস খানি তাঁহাদের ক্রেতাগণকে উপহার দিতেছেন, রূপে গুণে তাঁহাদের পণ্য-দ্রব্যের মতই সে খানি সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর। এমন ছাপা, এমন কাগজ এমন ছবি সচরাচর বাজারের বহিতেও দেখা যায় না। সর্ব্বোপরি প্রেমের চর্ব্বিত চর্ব্বণ নাই, গল্পে নূতনত্ব আছে, বিষয় নির্ব্বাচনও বেশ। যাঁহারা পূজার বাজারে প্রিয়জনের জন্য নিরুপমা লইয়া গৃহে ফিরিবেন তাঁহারা যে এই ফাউটি পাইয়া সুখী হইবেন, সে বিষয়ে আমাদের কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।